বার্ষিক
৪।০

প্রতি সংখ্যা
১

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৯

বিষয় সূচী

পুস্তক-পরিচয়

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৯

পরিচয়

পথ ও পাথেয়

কিছুদিন আগে স্বনামধন্য উর্দ্দু কবি ইকবালের কাব্যের আলোচনায় কয়েকদিন কাটাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর পার্শীতে লেখা আস্‌রার-ই-খুদির ইংরেজী অনুবাদ বহুপূর্ব্বেই পড়েছিলাম। এবার তাঁর রচনার সঙ্গে আরো একটু পরিচয়ের ফলে বোঝা গেল ইকবালের প্রতিভা মুস্‌লিম ভারতে, হয়ত বা মুস্‌লিম জগতে, এক বিশেষ অর্থপূর্ণ প্রতিভা। ভারতীয় মুসলমানদের কথাই প্রধানতঃ আমাদের আলোচনার বিষয়। কিছুদিন থেকে এই ভারতীয় মুস্‌লিম নবপ্রতিষ্ঠালাভের পথ ও পাথেয়ের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ফিরছে—সেই ব্যাকুল সন্ধানীদের সামনে ইকবাল দাঁড়িয়েছেন নেতৃত্বের দাবী নিয়ে। তাঁর সেই দাবী উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে। শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানদের ভিতরে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন তাঁরা বড়-জোর ভাবুকতার দিনমজুরী করছেন—তাই তাঁদের চাইতে সূক্ষ্মতরদৃষ্টিসম্পন্ন, সুপণ্ডিত, সর্ব্বোপরি অনুপমবাক্‌শক্তিশালী ইকবাল যে অচিরে তাঁদের সবারই অন্তরে সম্ভ্রমের আসন লাভ করবেন তা স্বাভাবিক।

কিন্তু ইকবাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একথা ভুললে তাঁর প্রতিভার অবমাননা করা হবে যে তিনি কবি। তাঁর চিন্তা-ভাবনার মূল্য যাই থাকুক তাঁর শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা তাঁর কবিত্বের জন্য। উর্দ্দু কবিগণ স্বভাবতঃ রচনানিপুণ ও সৌন্দর্য্যরসিক। ইকবালের প্রতিভায় সেই সঙ্গে মিশেছে দার্শনিকতা ও এক অদ্ভুত জ্বালা-বোধ।

কিন্তু কবি ইকবাল আজ আমাদের আলোচনার বিষয় নন, আজ আমাদের আলোচনার বিষয় মুস্‌লিম নেতা ইকবাল। এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে তাঁর এই ক'খানি কাব্য থেকে—আস্‌রার-ই-খুদি, শেক্‌ওয়া ও জওয়াব-ই-শেক্‌ওয়া। আস্‌রার-ই-খুদি বা 'আত্মতত্ত্ব'-এ (Secrets of the Self) পাওয়া যাবে তাঁর চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি, শেক্‌ওয়া বা 'অনুযোগ'-এ পাওয়া যাবে তাঁর অঙ্কিত মুসলমানের পতনের ছবি ও

তাব জন্য তাঁব নিদারুণ ক্ষোভ, * আব জওযাব-ই-শেক্‌ওয়া বা 'অনুযোগেব প্রত্যুত্তব'-এ পাওয়া যাবে মুস্‌লিম জাগবণ সম্পর্কে তাঁব পথ-নির্দ্দেশ।

আস্‌রার-ই-খুদি-ব ইংবেজী অনুবাদের ভূমিকায় Dr Nicholson বলেছেন, দার্শনিক নিট্‌শের প্রভাব ইকবালেব উপব পড়েছে। তা নিট্‌শের প্রভাবেব ফলেই হোক অথবা অন্য কাবণেই হোক ইকবাল শক্তিমত্তায একান্ত বিশ্বাসী। তিনি বাববাব বলেছেন—শক্তিমান হওযাই জীবনেব ধর্ম্ম, যে শক্তিমান হ'তে পারলে না সে জীবন নষ্ট কবলে। † তাঁর এই শক্তিবাদ সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলেছেন—দার্শনিক বার্গসঁব মতে পবিবর্ত্তন-প্রবাহে মানুষ ভেসে চলেছে; কিন্তু তাঁব ধাবণা, এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ নিযন্ত্রিত কববাব ক্ষমতাও মানুষেব আছে। কোবআনে ও মুস্‌লিম সাধকদেব জীবনে এব এক অতি-বড় পবিচয তিনি পেযেছেন। তাই তাঁব মতে মহাসাধনা ইস্‌লাম নিযতিব দাস নয়—ববং তাব প্রভু।

একজন সাধারণ মুসলমানও বিশ্বাস কবেন—ইস্‌লাম আল্লাহ্‌ব মনোনীত ধর্ম্ম-ব্যবস্থা, আল্লাহ্‌ব বাণী কোবআনেব দ্বাবাই প্রতিষ্ঠিত। তাই ইস্‌লাম ও কোবআন অবিনশ্বব, অপবিবর্ত্তনীয, চিবশক্তিমন্ত। এব সঙ্গে ইকবালেব পার্থক্য এইটুকু যে এই বিশ্বাসই তাঁব পক্ষেও সব চাইতে বড কথা কিনা সে সম্বন্ধে কিছু না ব'লে তিনি ইস্‌লামেব মহিমা প্রচাবে ব্রতী হয়েছেন দার্শনিক যুক্তিতর্ক ও এক নিবিড় উপলব্ধিব সাহায্যে।

এই জন্যই তাঁব কথাব প্রভাব অনেক বেশী। আমাদের বাংলা দেশে জনৈক খ্যাতনামা 'আলেম' মুস্‌লিম তরুণদেব কাবো কাবো সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যাব দিকে প্রবণতা দেখে ও 'আলেম'দেব এসবেব প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা লক্ষ্য ক'বে এই প্রমাণ করতে প্রয়াস পেযেছেন যে ইস্‌লাম সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যাব বিবোধী নয়। এই ধবণেব ব্যাখ্যা দ্বাবা ইস্‌লামেব আধুনিকতা প্রতিপাদনেব অন্য মূল্য যাই থাকুক এব খুব বড ত্রুটি এইখানে যে এ-ব্যাখ্যায় সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যাব মাহাত্ম্য বাড়ে না; অপর পক্ষে জীবনেব এক নিয়ামক আদর্শ হিসাবে ইস্‌লামেব মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়। এতে ইস্‌লামেব অবস্থা হয় শক্তিহীন বৃদ্ধ পিতাব মতো, শক্তিমান যুবক পুত্রেব আচবণ সমর্থন না ক'বে যাঁব উপায় নাই। অপর পক্ষে ইকবালেব যে-কথা—

---

* শেক্‌ওয়ার সূচনার দুটি লাইন এই :—

আয্‌ খোদা। শেক্‌ওযা-ই-আব্‌বাবে ওফা ভি সুন্‌লে।
খুগারে হাম্‌দ-সে থোড়াসা গেলা ভি সুন্‌লে॥
হে খোদা, একান্ত নতশিরদের অনুযোগও কিছু শোনো।
প্রশংসায চির অভ্যস্ত মুখ থেকে নিন্দাও কিঞ্চিৎ শোনো॥

† In solidity consists the glory of life,
Weakness is worthlessness and immaturity.—*Secrets of the Self.*

ইস্‌লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ তার জীবনের সত্যকার স্বাদ পেতে পারে, সারা জগৎ সন্ধান ক'রে এ তিনি বুঝেছেন,—এতে ইস্‌লামকে দাঁড় করানো হয় এক সুমহৎ বিশ্ব-আদর্শ হিসাবেই, তার বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা বা কার্য্যকারিতাই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল হয় না।

কিন্তু যুক্তির সাহায্য যে ইকবাল্ বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন, অথবা করতে চেয়েছেন এতেই বহু শ্রেণীর যুক্তিবাদীর আঘাতের স্থল তাঁকে হ'তে হয়েছে, আর এই যুদ্ধে কোনো প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হ'লে পরম বিনয়ে হার স্বীকার না ক'রে তাঁর উপায় নাই। অন্যভাবে কথাটি বল্‌লে দাঁড়ায়—যুক্তির সাহায্যে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তিনি যুক্তিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অর্থাৎ যুক্তির আশ্রয় তিনি যখন নিয়েছেন তখন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে যুক্তিতে যা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয় তাই-ই শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে Dr. Nicholson তাঁর অনূদিত Secrets of the Self-এর ভূমিকায় বলেছেন—

Iqbal's philosophy is religious, but he does not treat philosophy as the handmaid of religion Holding that the full development of the individual presupposes a society, he finds the ideal society in what he considers to be the Prophet's conception of Islam

ইকবালের মতবাদ এইবার একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

বলা হয়েছে তিনি শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী—নিজের শক্তিতে যে বিকশিত হয়ে উঠ্‌তে পারলেনা, তাঁর মতে সে কৃপার পাত্র। এই শক্তির বাণী প্রচার ক'রে একদিকে যেমন পতিত মুসলমানের কানে জড়তা বিসর্জ্জনের মন্ত্র দেওয়া হলো অন্যদিকে তেম্‌নি তার কল্পনা উদ্দীপ্ত করা হলো, তার অবসন্ন শিরায় শিরায় এক নূতন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল,—মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের এক মহাসার্থকতার দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হলো।

এম্‌নিতর অনুভূতির পরক্ষণে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক—এই সার্থকতা লাভ হবে কোন্ পথে?

মানুষের মুখে এ বড় নিষ্ঠুর প্রশ্ন। কিন্তু নেতারা এ প্রশ্নের উত্তর দেন—ইক্‌বালও দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—মুসলমানের পতনের কারণ সে ইস্‌লাম ছেড়ে দিয়েছে, তার পূর্ব্বপুরুষ বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন ইস্‌লাম অবলম্বন ক'রে। এই কথাটি একটি ইংরেজী বক্তৃতায় খুব জোরালো ক'রে তিনি বলেছেন এই ভাবে—

In times of crises in their History it is not Muslims that saved Islam, on the contrary, it is Islam that saved Muslims

এ উত্তরে বুঝতে পারা যাচ্ছে ইস্‌লাম বলতে অনেকখানি সুস্পষ্ট এক আদর্শ তাঁর মনে আছে, তার মাহাত্ম্য তাঁর কাছে অপরিসীম। কিন্তু

তাঁর এই উক্তির ত্রুটি এই যে তিনি এখানে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন নূতন অর্থে। ইস্‌লাম ব'লতে তিনি বোঝেন শক্তিমত্তা, কিন্তু বহু প্রাচীন মুস্‌লিম মনীষী ইস্‌লাম ব'লতে বুঝেছেন আত্মসমর্পণ। কেউ ব'লতে পারেন, এ দুইয়ে আসল পার্থক্য হয়ত নেই। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে শক্তিবাদী ইকবাল বিশেষভাবে চাচ্ছেন মুসলমানের জন্য রাজনৈতিক গৌরব, কিন্তু সমর্পণধর্ম্মী অনেক মুসলিম মনীষী ঠিক তাই-ই চান নাই।

তারপর ঐতিহাসিক ঘটনারও তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন, সঙ্কটকালে ইস্‌লাম মুসলমানকে উদ্ধার করেছে। একটি সুপরিচিত সঙ্কটকালের কথা ভাবা যাক—মোতাজেলা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের সংঘর্ষ-কাল। ইস্‌লামের সেই সুপরিচিত সঙ্কটকালে ইমাম গাজ্জালি জয়ী হয়েছিলেন ও মোতাজেলা-নেতা ইবনে রোশ্‌দ (Averroes) পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ জয় ইস্‌লাম ও মুসলমানের জন্য সত্যকার জয় হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে মুস্‌লিম চিন্তাশীলদের ভিতরেই প্রবল মতভেদ বিদ্যমান। এই সম্পর্কে এই ব্যাপারটির উল্লেখ হয়ত অসঙ্গত হবে না যে পরাজিত ইবনে রোশ্‌দের চিন্তার প্রভাব যাঁদের উপর পড়েছিল তাঁদের সন্ততি বর্ত্তমান ইয়োরোপ, আর বিজেতা ইমাম গাজ্জালির চিন্তার প্রভাব যাঁদের উপর পড়েছিল তাঁদের সন্ততি বর্ত্তমান মুস্‌লিম জগৎ। বলা যেতে পারে—ইতিহাস শেষ হয়ে যায় নাই। তা সে-শেষ বিজেতা বিজিত কারো জন্যই হয় নাই।

উর্দ্দু কাব্যরসিকরা এ বিষয়ে বোধ হয় একমত যে মুসলমানের পতনের জন্য বেদনা যাতে ব্যক্ত হয়েছে সেই শেক্‌ওয়া-র চাইতে তার প্রতিকারের কথা যাতে বলা হয়েছে সেই জওয়াব-ই-শেক্‌ওয়া কাব্য-হিসাবে নিকৃষ্টতর। এর থেকে দৃষ্টিমানরা সহজেই বুঝতে পারেন প্রতিকার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত অকুণ্ঠিত বাণী উচ্চারণ করতে ইকবাল পারেন নাই—যদিও তার সন্ধানে তিনি ফিরছেন। কিন্তু তা না পারলেও তাঁর এই সব কথার প্রভাব কম না হওয়াই সম্ভবপর। তিনি যা বলছেন মুসলমান সমাজে তাই-ই প্রচলিত মত, তার উপর এর সঙ্গে তাঁর সংস্রব এ'কে নূতন শক্তি দিয়েছে।

ইকবালের রচনায় দার্শনিকতা থাকলেও আসলে তিনি কবি—ইস্‌লাম বলতে এক নূতন সৌন্দর্য্যচ্ছবি * তাঁর মনোনেত্রে আবির্ভূত হয়েছে, তার মাহাত্ম্যে তিনি একান্ত বিশ্বাসবান্।

---

* কবিদের উদ্দেশ্যে গ্যেটে এই একটি সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন :—যখন হৃদয় মন উধাও হয়ে ওঠে তখন, হে তরুণ, মনে রেখো কল্পনাদেবী (Muse) সঙ্গিনী হতে পারেন কিন্তু অভ্রান্ত পথনির্দ্দেশ তাঁর নয়।—Goethe by B Croce, p 4

এই একান্ত বিশ্বাস অশ্রদ্ধার যোগ্য নয় বরং শ্রদ্ধেয়,—নূতন বিশ্বাসে মানুষ তার অন্তরে অন্তরে এক নিবিড় পুলক অনুভব করবে ও অপরকে সেই আনন্দ উপহার দেবে এর চাইতে ভাল কাজ সে আর কি করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের প্রভাব মানুষের উপর এ না হয়ে হয় অন্য রকমের—এর প্রভাবে মানুষ হয়ে ওঠে নিদারুণ অত্যাচারী। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছে—একালের জাতীয়ত্ব-বাদীরা নূতন ক'রে এই অভিশাপগ্রস্ত হয়েছেন। ইকবাল বলছেন, ইস্‌লাম মানুষের জন্য "আবে হায়াত" (Elixir), ডাঃ মুঞ্জে বা শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, হিন্দুত্ব মানুষের জন্য অমোঘ বিধান—এসব কথা মানুষ কখনো ধীরে-সুস্থিরে বুঝে দেখতে চেষ্টা করবে কিনা জানিনা, কিন্তু এর প্রভাবে ভারতবাসীর জীবন যে হয়ে উঠ্‌ল দুর্ব্বহ। মনীষী সাদী বলেছেন—সাধু উদ্দেশ্যের মিথ্যা অসাধু উদ্দেশ্যের সত্যের চাইতে ভাল; ইকবাল বা আধুনিক হিন্দু মনীষীদের ব্যাখ্যাত ইস্‌লাম-আদর্শ বা হিন্দুত্ব-আদর্শ যদি যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে অভ্রান্তও হতো তবু সে-সবের এমন ভয়াবহ পরিণতি দেখে মানুষের জন্য সে-সবের উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করা অসঙ্গত হতো না।

ইকবালের ইস্‌লাম-ব্যাখ্যার দুর্ব্বলতা কোথায় তা কিছু বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। এর উৎপত্তি-সূত্র খুঁজলেও বুঝতে পারা যাবে এর দুর্ব্বলতা—আধুনিক জগতে মুসলমান এক পতিত সম্প্রদায় অথচ এ জ্ঞান তাঁদের আছে যে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ জগজ্জয়ী হয়েছিলেন,—রুগ্নের পক্ষে উত্তেজনা অকল্যাণকর।

কিন্তু যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে কোনো মতবাদ দুর্ব্বল হ'লেও মানুষের জীবনের উপর তার প্রভাব প্রবল হ'তে বাধ্‌তে না-ও পারে, বিশেষতঃ ইকবালের বাণীতে যখন রয়েছে প্রত্যয়ের তেজ ও এক অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছটা।

ইকবালকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ না ক'রে ভারতীয় মুসলমান হয়ত পারবেন না যদি অন্য কোনো সবলতর বা সুন্দরতর চিন্তাধারা তাঁদের সামনে উন্মুক্ত না হয়।

ইকবালের চিন্তার চাইতে অন্য কোনো সবলতর বা সুন্দরতর চিন্তাধারা ভারতীয় মুসলমানদের সামনে আছে কিনা বলা শক্ত। তবে এ কথা সত্য যে অন্য একটি চিন্তাধারাও কিছুদিন থেকে তাঁদের সামনে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ধারা প্রবর্ত্তিত করেছেন মুস্তফা কামাল।

মুস্তফা কামালের সত্যকার অনুরাগী ভারতীয় মুস্‌লমানদের ভিতরে তেমন বেশী হয়ত নেই,—অন্ততঃ 'আলেম'-সম্প্রদায়ের ও নেতা-ও সম্পাদক-

সম্প্রদায়ের কথাবার্ত্তা শুনে তাই-ই মনে হয়। তবে তরুণ মুসলিম কামালের কর্ম্মচেষ্টার অর্থ পুরোপুরি না বুঝেও মোটের উপর হয়ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই তাঁর পানে চেয়ে আছেন। বাংলা দেশে এই দল নিজেদের আদর্শের নাম দিয়েছেন—বুদ্ধির মুক্তি।

ইকবালের ইস্‌লাম-আনুগত্যের আদর্শ আর মুস্‌লিম তরুণদের এই বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ পরস্পর-বিরোধী মনে হ'তে পারে। এ দুয়ে খুব বড় পার্থক্যও আছে,—একের দৃষ্টি শাস্ত্রের পানে খুব বেশী, অপরের দৃষ্টিতে শাস্ত্র জীবনের বহু উপকরণের এক উপকরণ, একের ভিতরে রয়েছে একটি আদর্শের জন্য আকুলতা, অপরের ভিতরে আছে আত্মপ্রকাশের আনন্দ ও সহজ জগৎ-প্রীতি,—তবু এই দুয়ের ভিতরে এই বড় মিল রয়েছে যে দুই-ই যুক্তিপন্থী, দুয়েরই চরম লক্ষ্য সত্য ও জগতের কল্যাণ।

বাংলার মুস্‌লিম সমাজে এই 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদীদের উদ্ভবের মূলে তিনটি বড় কারণ দেখতে পাওয়া যাবে ঃ—প্রথমতঃ, ইসলামের সত্যকার সামাজিকরূপ বাংলার মুস্‌লিম জীবনে নগণ্য অথচ এরও উপর ধর্ম্মের হুকুম প্রবল করতে চেষ্টা করা হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ, বাংলা আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মসাধনার দেশ, আউল-বাউলের দেশ, ধর্ম্মসংহিতাদির প্রভাব এ দেশের লোকদের জীবনে অল্প। শতাধিক বৎসর আগে চট্টগ্রামের জনৈক মুসলমান দরবেশ তাঁর 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থে হজরত মোহম্মদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

মোর পরে পয়গাম্বর না জন্মির আর ॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন ॥
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দিআ।
প্রভুপ্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িআ ॥

বাংলার মুসলমান বাউলদের রচনায় চিন্তার স্বাধীনতা খুবই লক্ষ্য-যোগ্য; তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজে শতাধিক বৎসর যাবৎ চিন্তা ও কর্ম্মের বিশ্বধারায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাতে বাংলার জাতীয় জীবনে আশানুরূপ ফল ফলেছে কিনা সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও বলা যায় এ ঢেউ আজো যে প্রবল তার আধুনিকতম প্রমাণ শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'। এ ঢেউ যে বাংলার মুস্‌লিম সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদীদেরও লাগ্‌বে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু এরও চাইতে বড় কারণ এই অভিনব মুস্‌লিম জাগরণের মন্ত্রের মূলে হয়ত আছে। আধুনিক তুর্ক যে ইউরোপের ইতিহাস থেকে নিজেদের কর্ম্মচেষ্টার নজির সংগ্রহ করছেন এ কথা অনেকেই বলেছেন,

তাব সঙ্গে একথাও কেউ কেউ বলেছেন যে এই ধবণেব কর্ম্মপ্রেরণাব উৎস ইস্‌লামেব নিজের ভিতবেই আছে। ইস্‌লাম দেবদেবীব মূর্ত্তি চূর্ণ কবেছে, পৌবহিত্য বহিত কবেছে, নবনাবীনির্ব্বিশেষে ব্যক্তিব স্বাধীনতা ঘোষণা কবেছে, কাণ্ডজ্ঞানেব এই জয়যাত্রা শাস্ত্রেব দুর্জ্জেয় মাহাত্ম্যেব সামনে যুগেব পব যুগ প্রতিহত হবে, এ আশা কবা সঙ্গত না-ও হ'তে পারে। ইকবাল নিজেই তাঁব নবপ্রকাশিত Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে এক জাযগায় বলেছেন—

The birth of Islam is　　　the birth of inductive intellect In Islam prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition (p 176)

এই বুদ্ধিব মুক্তিব জন্মবেদনা বাববাব মুস্‌লিম জগতে অনুভূত হযেছে। পশ্চিমেব আবু হানিফা ও মোতাজেলা সম্প্রদায় ও পূর্ব্বেব আকবব ও আবুল ফজল এব কিছু কিছু প্রমাণ।

তা উৎপত্তি-সূত্র যাই-ই হোক তাব চাইতে বড় কথা এব অনুবর্ত্তীদেব অন্তবে এব জন্য অনুবাগ ও সমসামযিক জীবনেব জন্য এব প্রয়োজন। এব অনুবর্ত্তীদেব অন্তবে এ এক অভিনব স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তিব আনন্দ এনে দিয়েছে বুঝতে পাবা যাচ্ছে, আব এব প্রয়োজন সুগভীব ব'লেই মনে হয়। আমবা গৃহে বাস কবি সত্য কিন্তু সে-গৃহ নির্ম্মিত হয় আকাশেব নীচে। বিভিন্ন জাতীয়ত্ব বা সাম্প্রদায়িকতাও তেমনি মানুষের জন্য অসত্য নয়, কিন্তু সকলে মিলে মানুষ এক বিশ্ব-পবিবাব সেখানে পবস্পরেব প্রতি পবস্পবেব অপবিহার্য্য কর্ত্তব্য বয়েছে; এই বৃহত্তব জীবনের কথা মানুষ যখন বিস্মৃত হয় তখনই আবম্ভ হয তাব দুর্দ্দিন। মুস্‌লিমত্বেব অভিমান বা হিন্দুত্বেব অভিমানেব চাইতে বুদ্ধিব মুক্তির আদর্শ যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভাবতবাসীব জন্য পবম কল্যাণকব আদর্শ, একথা হয়ত নিঃসন্দেহে বলা যেতে পাবে।

মুস্‌লিম জাগবণ সম্পর্কে ইকবালেব যে-সব কথাব আলোচনা আমবা কবেছি সে সব তাঁব আগেকাব লেখা কাব্য থেকে নেওযা। মনে হয কিছু মত-পবিবর্ত্তন সম্প্রতি তাঁব হযেছে। তাঁব নবপ্রকাশিত Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে (এব উল্লেখ একবাব কবা হয়েছে) তুর্কীব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু সতর্ক-বাণী উচ্চাবণ কবেও তিনি তা'ব সংস্কাব চেষ্টা মোটেব উপব শ্রদ্ধা ও আনন্দেব দৃষ্টিতে নিবীক্ষণ কবেছেন। এ সম্পর্কে তাঁব কযেকটি কথা প্রণিধানযোগ্য—

If the Renaissance of Islam is a fact, and I believe it is a fact, we too one day, like the Turks, will have to revaluate our intellectual inheritance　. .　. The truth is that among the
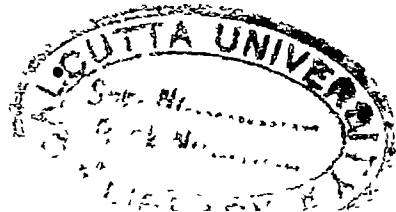
Muslim nations of to-day Turkey alone has shaken off its dogmatic slumber, and attained to self-consciousness She alone has claimed her right of intellectual freedom, she alone has passed from the ideal to the real—a transition which entails keen intellectual and moral struggle To her the growing complexities of a mobile and broadening life are sure to bring new situations suggesting new points of view, and necessitating fresh interpretations of principles which are only of an academic interest to a people who have never experienced the joy of spiritual expansion It is, I think, the English thinker Hobbes who makes this acute observation that to have a succession of identical thoughts and feelings is to have no thoughts and feelings at all Such is the lot of most Muslim countries to-day They are mechanically repeating old values, whereas the Turk is on the way to creating new values

কিন্তু ইকবাল নিজে বদলালেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাব মুস্‌লিম জনসাধারণের উপর অন্য রকমের হওয়া বিচিত্র নয়। মনীষী বার্ণার্ড শ বলেছেন—পরাধীনতায় যে ভুগছে তার অবস্থা 'ক্যান্‌সার'গ্রস্ত রোগীর মতো, যে-কেউ চেঁচিয়ে বলে সে ওষুধ জানে তারই শরণাপন্ন সে হয়। 'মুসলমান বড় অবনত পতিত' এই inferiority complex-এর জন্য তার উপর ইকবালের বাণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত রকমের হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মুস্‌লিম জনগণের সামনে এই যে দুই পথ তার বিচিত্র পাথেয় নিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে এর কোন্‌টি শেষ পর্য্যন্ত তাদের অবলম্বন হবে সে-উত্তর আজ দেওয়া সম্ভবপর নয়। বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ নিশ্চয়ই খুব সহজসাধ্য আদর্শ নয়; তবে মানুষের সাধনা দিন দিন কঠিনতর হচ্ছে, আর এতেই তার আনন্দ, তাই ভয় পাবারও কিছু নেই। আজ হয়ত মুসলমানের পক্ষে প্রয়োজন একান্ত ক'রে ভাবা কোন্‌টির কি ফল। তারই সঙ্গে সঙ্গে inferiority complex-এর স্থানে জীবনে আনন্দ ও শ্রদ্ধা এবং মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস তাঁর পক্ষে যদি সত্য হয় তবে সেটি হবে তার পক্ষে ও জগৎ বা বৃহত্তর দেশের পক্ষে যেন এক দৈব অনুকম্পা।

তাহ'লে আজকের এই পতিত ভারতীয় বা বাঙালী মুসলমানই হবে অন্ততঃ তার নিজের দেশের জন্য কল্যাণের সিংহদ্বার।

কাজী আবদুল ওদুদ।

বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া

পশ্চিমেব সঙ্গে পূর্ব্বেব সম্বন্ধ, উত্তবেব সঙ্গে দক্ষিণেব সম্বন্ধ, আপাততঃ অসম্ভব মনে হোলেও জগতে নিত্যই ঘোট্‌ছে। আমবা মনে মনে নিজেদেব চাবিদিকে, পবিবাবের চাবিদিকে, দেশেব চাবিদিকে দেয়াল গেঁথে বাখতে চাই, কিন্তু নিযতিব বিচিত্র বিধানে সে দেযাল ধোসে যাচ্ছে। প্রতিনিয়তই বিবোধেব সঙ্গে সঙ্গে মিলনের বার্ত্তাও আকাশে বাতাসে ভেসে আসে, আমাদেব ইচ্ছা-অনিচ্ছাব ওপর তা কিছুমাত্র নির্ভব কবে না। ইউবোপ, আমেবিকা ও ভাবতবর্ষ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—কত বিভিন্ন; বেশ-ভূষা, জীবনযাত্রাব প্রণালী, পাবিবাবিক সম্বন্ধ—কত দিকে উভয়েব মিল নেই; কিন্তু অমিল সত্ত্বেও পবস্পরে মিলবাব একটা চেষ্টা—হয়ত তাদেব অজ্ঞাতসাবেই—চোল্‌ছে। তাই সাত সমুদ্র তেব নদী পেবিয়েও ইংবাজেব সাহিত্য, আমেবিকাব কাব্য, ফবাসীব ফ্যাশান, জার্ম্মানীব মাল, বাসিয়াব সাধনা হিমালয় দ্বাবা সুবক্ষিত, সমুদ্র দ্বাবা পবিবেষ্টিত ভাবতভূমিব মধ্যে আত্মপ্রকাশ কোব্‌ছে। তাই শেক্সপিযাব ও হুইটম্যান, গেটে ও লিঙ্কন্, টলষ্টয় ও লেনিন, এঁদেব জীবনেব সাধনা ও ভাবধাবাব সঙ্গে আমবা অল্পবিস্তব পরিচিত।

আমাদেব এই পবিচয় তো নিতান্ত অল্পদিনের নয়। ঐতিহাসিকেবা দুহাজাব বৎসবেব পূর্ব্বেও ভাবতেব ও গ্রীসেব যোগ আবিষ্কাব কোবেছেন। প্রাচীন ইতিহাসেব কথা ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমান যুগেব আলোচনায় দেখতে পাই, ইউবোপীয় জাতিদেব মধ্যে পোর্ত্তুগীজবাই সর্ব্বপ্রথমে ভাবতবর্ষে আসবার সহজ পথ বেব কবে; ভাস্কো দা গামা ভাবতে আসবাব এই নব পথ প্রথম প্রদর্শন কবেন। ১৪৯৮ খ্রীঃ তিনি পূর্ব্ব উপকূলে মান্দ্রাজের নিকটে কালিকটে জাহাজ লাগান, সেখানকাব অধিপতি তাঁকে অতিথি-সমুচিত সমাদবে বরণ কবেন। এসব ইতিহাসেব কথা। সেই বিচিত্র জলযাত্রাব ফলে ভাবতেব যে-ঐশ্বর্য্য পোর্ত্তুগীজেব কাছে প্রতিভাসিত হোয়ে উঠ্‌ল, যে-ঐশ্বর্য্যভাণ্ডাবেব চাবী তাদের হাতে এসে পোড়্‌ল, সে-সম্বন্ধে জাতীয় মহাকাব্য পর্য্যন্ত বচনা হোযেছিল; কামোযেন্সেব লুসিয়াদ্ পোর্ত্তুগীজ সাহিত্যেব এক অতি উজ্জ্বল বত্ন, ইউবোপীয় সাহিত্যেব এক মহতী কীর্ত্তি; কামোযেন্স অদ্ভুতকর্ম্মা গামাব গৌববে উল্লসিত হোযে বোল্‌ছেন,—

I sing a daring Lusitanian name,
O'er Neptune and o'er Mars to rule ordained;
Cease all the Ancient Muse resounds, for lo!
Another valour bolder front doth show (Canto I, St. III.)

"সেই সাহসী পোর্ত্তুগীজ, বীবেব কীর্ত্তিকাহিনী গাইছি, যিনি জলদেবতা ও যুদ্ধ দেবতাব উপবেও প্রভুত্ব কোবেছিলেন ; প্রাচীন কবি-কাহিনীব সকল প্রতিধ্বনি থামুক—আবও সাহসেব পবিচয় দিযে বীর্য্যবান পুরুষ উপস্থিত হোযেছেন যে।" ভাবতেব নূতন পথ আবিষ্কাব কোবে গামা এরূপে জাতীয প্রশংসাব ভাজন হন।

(পশ্চিমের সহিত পূর্ব্বেব এই অভিনব সংস্পর্শেব ফলে এইরূপে পাশ্চাত্য সাহিত্যে নূতন হাওয়া, নূতন সুব এল বটে, কিন্তু তাব চেযেও অনেক বেশী পবিবর্ত্তন এল ভাবতেব সাহিত্যে, ভাবতেব প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিব মধ্যে ; নূতন অনুভূতিব বিচিত্র স্পন্দনে তাদেব সুব ঝঙ্কাব দিযে উঠলো, সৃষ্টি হোলো এক অভিনব কাকলীব, এক সুমধুব সঙ্গীতেব, এক নূতন ভাবনাব, এক নূতন ভঙ্গীর। আমাদেব বাংলা দেশে সেই ভাবতবঙ্গেব প্রতিঘাত এসে লেগেছিল, সে প্রতিঘাত এখনো থামেনি, তার সঙ্ঘাতলব্ধ দোলায আমবা এখনো দুলছি ; প্রথম দিনেব প্রচণ্ডতা হ্রাস পেয়েছে বটে, কিন্তু মনেব দোলা আজও একেবাবে থামেনি, কোনওদিন থাম্‌বে কিনা কে জানে, কে বোলতে পাবে ! জীবন পথে চোল্‌তে গেলে দোল খাওয়া তো একেবাবে থামে না, নিত্যনূতন অনুভূতিব প্রয়াস আমাদেব চিত্তকে নিযতই চঞ্চল কোবে বাখে। চিত্তেব সজীবতা হাবিযে ফেল্‌লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা বোল্‌তে হবে। তখন তো মানুষ বেঁচে থাকে না, তখন সে কলেব পুতুলমাত্র।)

(পশ্চিমেব সঙ্গে সংস্পর্শেব ফলে বাংলায যে ভাবতবঙ্গেব আবির্ভাব হয, তাব বিশেষ পবিচয দেখা দিচ্ছে আমাদেবি বর্ত্তমান যুগেব সাহিত্যেব মধ্যে।) বাঙ্গালী ভাবতেব বিভিন্ন জাতিব মধ্যে এই সাহিত্যেবি গৌবব নিযে দাঁড়িযে আছে ; অন্যান্য বিষয়ে যতই তাব অযোগ্যতাব, অকর্ম্মণ্যতার কথা শোনা যায়, এবিষয়ে কিন্তু সকলেই তাব প্রতিভা স্বীকাব কবে ; প্রতিবেশীদেব মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাব ভাব স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রতিবেশী জাতিবাও স্বীকাব কোরতে বাধ্য হোযেছেন যে, বর্ত্তমান বাংলার সাহিত্যসৃষ্টি বাস্তবিকই বিচিত্র, অভিনব ; তাঁবা প্রাচীন বাংলার ভাবদৈন্যেব কথা বলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য কোব্‌তে ভবসা পান না। রবীন্দ্রনাথেব অপূর্ব্ব সৃষ্টি জগতে বাংলা ভাষাব আসন সুপ্রতিষ্ঠিত কোরে দিয়েছে, বাংলাব সাহিত্য-সমৃদ্ধিব কথা বিশ্বেব দববাবে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায সকলকে শুনিয়েছে।

(আমাদের নবযুগেব এই সাহিত্যসৃষ্টিব ওপব পশ্চিমেব ছাপ পোড়েছে একথা আব কিছুতেই অস্বীকাব কবা চলে না। অস্বীকার কর্‌বার প্রয়োজনও কিছু নেই। চিন্তাব একটা বিশ্বজনীনতা আছে,

দেশের গণ্ডী বা ব্যবধান কিছুই সে মানে না,—আমাদের মধ্যে যে-সব ভাব সুপ্ত আছে, বিদেশের স্পর্শে তা জেগে ওঠে।) বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পশ্চিমের ছাপ কতখানি, অতি সংক্ষেপে তাই আমরা আজ আলোচনা কোর্‌বো।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের সূত্রধর; তাঁর নাম দেওয়া হোয়েছিল সাহিত্য-সম্রাট। তখনকার দিনে তিনি সমস্ত বাংলা সাহিত্য সংহতমুখী ক'রে দেশের সেবায় লাগিয়েছিলেন, দেশের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ সকল ভাবের মুখপাত্র কোরে বিশ্বের দরজায় হাজির কোরতে চেয়েছিলেন। দেশের যত চিন্তাধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সে সমস্ত যেন নবরূপ পেল; তাদের সামনে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়িয়েছিলেন দেশভক্তির প্রতীক স্বরূপে। তাঁর পূর্ব্বগামী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজেও সমসাময়িক সাহিত্যকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে পেরেছিলেন। প্রতি বৎসরের ১লা বৈশাখে গত বর্ষের সাহিত্যিক একটা হিসাব-নিকাশ করবার চেষ্টা ছিল তাঁর; ইংরাজী সাহিত্য থেকে নানা কবিতার বঙ্গানুবাদ তাঁর কাগজে স্থান পেত, তাদের ভঙ্গী হয়ত হোত কিম্ভূতকিমাকার, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয় হোচ্ছে বাংলাকে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত কোরে দেবার তাঁর এই চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন,—ঠিক্ এই সূত্রে তিনি কতখানি পাশ্চাত্যের অনুগামী হোয়েছিলেন জানি না, কিন্তু তিনিও বরাবর পাশ্চাত্যের সাধনালব্ধজ্ঞান যাতে আমাদের দেশের লোকে পায় সেজন্য বিশেষ চেষ্টা কোরেছিলেন। তখনকার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যজগতে ছন্দোবিষয়ে ও কাব্যের উপজীব্যবস্তু নিয়ে বিস্তর পরিবর্ত্তনের কারণ হোয়েছিলেন, কিন্তু মধুসূদনকে বিরোধেরই সম্মুখীন হোতে হয়, জাতিকে তিনি আর নূতন পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি, তাঁর প্রতিভা হোয়েছিল বিদ্রূপের কারণ, তাঁর প্রতিভার দীপ্তরশ্মি সমসাময়িক বাংলা সহ্য কোরতে পারে নি, অনেক কিছু নিয়েছিল বটে, তবে বিস্তর বিলম্বে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে অন্যকে পরিচালনার শক্তি ছিল, নেতৃত্ব ছিল তাঁর পক্ষে সহজ, সুতরাং পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার তিনি যতটা কোরতে পেরেছিলেন মধুসূদন তাঁর অসামান্য প্রতিভা সত্বেও তা পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—উপন্যাস ও অন্য গদ্য, যেমন কৃষ্ণচরিত্র ও কমলাকান্তের দপ্তর। এর ভেতর উপন্যাস সাহিত্যই আমাদের আজ বেশী প্রিয়, যদিও কালপ্রভাবে সে উপন্যাসও আমরা আজকাল না পোড়েই ভাল বোল্‌তে শিখেছি। বড় লোকের লেখার দোষই এই, বর্ত্তমান যুগের মহিমাই এই। সাধারণ লোক

অতীতকে ফেলে বর্ত্তমানেবই আদব কবে বেশী, বড়লোকেব লেখাও কালেব তাপে ঝোবে যায়। তাই আজ বঙ্কিমেব উপন্যাসও লোকে মুখে ভাল বলে, পড়ে কিন্তু অন্য সবাব উপন্যাস—পববর্ত্তী সমযেব উপন্যাস। তবু বঙ্কিমেব দুর্গেশনন্দিনী, বাজসিংহ, সীতাবাম, কৃষ্ণকান্তেব উইল,—এ সবেব মধ্যে একটা অতীতের সুখময় স্মৃতি বিজড়িত আছে, আমবা তা অস্বীকাব কোব্‌তে পাবি না। এব মধ্যে, বাজপুতানাব কাহিনীব মধ্যে, বাঙ্গালীর সুখদুঃখেব গল্পে, পশ্চিমেব পদচিহ্ন কোথায়, তা অবশ্য একটু বুঝে নেওয়া দবকাব।

(বঙ্কিম যে-নূতন পথ পেলেন, সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের যে-নূতন ধাবা প্রবর্ত্তন কোব্‌লেন তা উপন্যাস।) তাঁব পূর্ব্বে বিলিতি উপন্যাসেব আদর্শ এ দেশেব জনসমাজে, শিক্ষিত সমাজে আদব লাভ কোবেছিল, সে ধরণেব লেখবাবও চেষ্টা হোয়েছিল। কিন্তু অক্ষমের চেষ্টা আব প্রতিভাশালীব চেষ্টা, এ দুইযে প্রভেদ বিস্তব। (বঙ্কিমেব দুর্গেশনন্দিনী অনুবাদ নয়, কোনও বই সামনে বেখে লেখার চেষ্টা নয়, মনেব তটভূমিতে যে-সব ভাবতবঙ্গ এসে এসে লাগ্‌ছিল, কল্পনাব সাহায্যে তাদেব একটা ছায়া, একটা আভাস দেওয়াব চেষ্টামাত্র।) গড মান্দাবণে সেই দুর্য্যোগেব মধ্যে জগৎ সিংহ তিলোত্তমাব সাক্ষাৎ—তা কি কোবে এ দেশে আধুনিক ইংবাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীব মনশ্চক্ষে ধবা দিল? সেই যে 'খড়্গো খড়্গো' কোলাকুলি, বোগশয্যা থেকে যুদ্ধ পবিদর্শন, এসব বাঙ্গালীব কল্পনাব জালে কি কোবে ধবা পোড়্‌ল? সেই যে নবাবনন্দিনী আয়েষাব আধো-আলোক আধো-আঁধাব ছবি, একদিকে জগৎসিংহ অন্য দিকে ওস্‌মান এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীব মাঝখানে দাঁড়িয়ে—এই ছবি যিনি ভাব্‌তে পাবলেন তিনি কি কোবে তা ভাব্‌লেন? তাঁকে এই ভাবনাব খোরাক কে জোগালে? এসব ভাবতবঙ্গেব মূলে কি? অভিজ্ঞতা, না নিছক প্রতিভা, না নিছক কল্পনা? সেদিন এক দল সমালোচক ভেবেছিল. বঙ্কিমবাবু নিশ্চয় ইংবাজ ঔপন্যাসিক স্কটেব বই দেখে তাঁব Ivanhoe থেকে দুর্গেশনন্দিনীব অনেকখানি নিয়েছেন। বঙ্কিমবাবু সে কথাব চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোবে গেছেন, বোলেছেন, তিনি কখনো দুর্গেশনন্দিনী লেখাব পূর্ব্বে স্কটেব লেখা Ivanhoe পড়েন নি। স্কটেব লেখা নাই পড়ুন, কিন্তু ইংবাজী ভাবেব ভাবুক তিনি, নূতন ধবণেব শিক্ষা যাঁরা সেদিন পেযেছিলেন তিনি তাঁদেবই একজন। মধ্যযুগে ইউবোপে chivalry-ব যে-পূজা হোয়েছিল, সে পূজাব সঙ্গে তাঁব নিশ্চিযই নিবিড় পবিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ছেলেবেলায তাঁর দাদাব মুখে অনেক পাশ্চাত্য গল্পেব উপন্যাসের সাবাংশ শুনেছিলেন, তা মনেব কোণে জমাট হোয়েছিল এবং তাই বেবিয়েছিল দুর্গেশনন্দিনীর

রূপ ধোরে। তখন থেকেই পাশ্চাত্য ভাবসাগরে আমরা আকণ্ঠ নিমগ্ন হোয়ে থাক্‌তে সুরু কোরেছি,—কোথা থেকে কোন্ ভাব এসেছে তা ভালো কোরে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু সে-সব ভাব যে নূতন, তা বুঝতে পার্‌ছি যখন দেখি যে আমরা অনেকেই সে ভাবের পক্ষপাতী, সে ভাবের গুণগ্রাহী, সে ভাবের আদর আমরা কোর্‌তে জানি, অথচ সে সমস্ত ভাব এ দেশের নয়, আমাদের আশে পাশে সে ধরণের কিছু ঘটে না।

দুর্গেশনন্দিনীতে যে-আবহাওয়ার সৃষ্টি, বঙ্কিমের পরবর্ত্তী উপন্যাস-গুলিতে তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে তার সঙ্গে অন্য অনেক জিনিষ মিশেছে; 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে' সীতারামের এই মূলমন্ত্র, দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠে মাতৃমন্ত্রের উপাসনা, গীতাকে প্রতিদিনকার কর্ম্মের সাধনায় জীবন্ত কোরে তোলা, গীতার সঙ্গে মানুষের সামাজিক ধর্ম্মের একটা মহা সমন্বয় সাধন করা,—এই সব ভিন্ন ভিন্ন সুর এসে দুর্গেশনন্দিনীর আবহাওয়াকে আরও জটিল আরও সূক্ষ্ম কোরে তুলেছে। বলবার ভঙ্গীও যে নিত্য নূতন নূতন বিচিত্রতায় মধুরতর হোয়ে ওঠে নি তা বলা যায় না, কারণ 'রজনীর' আত্মকথা, অমরনাথের আত্মকথার একান্ত ঘনিষ্ঠ সহজ সুর অভিনব প্রণালীতে বেজে উঠেছে; আর তার উৎস যে পশ্চিমের উপন্যাসে সে কথা বঙ্কিমবাবু নিজেই বোলে দিয়েছেন। রোহিণী ও কুন্দনন্দিনীর মনের গোপন কথাটি কি-অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কানে শুনিয়ে গেলেন, দিবা-নিশার শান্তি-চঞ্চলকুমারীর ভেতরে নারীর মহীয়সী মূর্ত্তির সঙ্গে শক্তি ও মাধুর্য্যের সুন্দর সমন্বয় আমাদের চোখের সামনে তুলে ধোর্‌লেন, তাঁর ভবানন্দ পশুপতি গঙ্গারামের মধ্য দিয়ে পাপপুণ্যের প্রবল দ্বন্দ্ব পাঠকের চারদিকে সমস্ত বিশ্ব কাঁপিয়ে দেয়। এসব কথা আমাদেরি ঘরের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্বেও এমন কোরে এসব কথা কেউ তো আমাদের সাহিত্যে বলে নাই! আমরা যে পৃথিবীর কথা সহজ সাদা চোখে তেমন না দেখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতাম গোপনসঞ্চারী দেবদেবী বিগ্রহের ওপর; কখন নর্ত্তনশীলা কোন্ অপ্সরার তালভঙ্গ হবে, ভূতলে তাঁর জন্ম হবে বিশেষ কোনও দেবদেবীর পূজা প্রচারের জন্য, এই তো ছিল আমাদের পূর্ব্বকার সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বস্তু; নয় তো নিত্যবৃন্দাবনলীলারসিক রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ মিলন বিরহ-গীতি—মানুষের চিরন্তনী আবেগধারার উপর ভর রেখে সুস্বর কাকলীতে সকল দিগ্‌ভূমি ভোরে দিত; অথবা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ উপাখ্যান হোতে সংগ্রহ কোরে বাংলা ভাষার সাহায্যে জনশিক্ষার ব্যবস্থা কোরতো। এই সমস্ত পুরাণো কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল সত্যি, আমরা তাদের সঙ্গে জীবনের নানা গ্রন্থিতে বাঁধা থাক্‌তাম, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের

কথাশিল্পেব ভেতর দিয়ে নূতন আদর্শে বাঁধা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধবণেব কাহিনী আমাদেব মন মুগ্ধ কোবে ফেল্‌ল,—সেকথা অস্বীকাব কববাব জো নেই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রেব সাধনা শুধু উপন্যাসবচনায পর্য্যবসিত হয় নি। ইংবাজ কবি ওযার্ডস্‌ওযার্থ, মিল্‌টন, এঁবা ভাবতেন কবি হওয়াই জীবনেব শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, পবম পবিণতি, নয, শিক্ষক হোতে হবে, I wish to be a teacher or nothing। বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাসবচনায তেমন স্ফূর্ত্তি পান নি। তাঁব সাব কথা তিনি বলেছেন কৃষ্ণচবিত্রে। শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে ভগবান বোলে, আদর্শ মানুষ বোলে বিশ্বাস কোবতেন। এ বিষযে তাঁব কোনও সন্দেহ ছিল না। তবু তিনি জানতেন যে তাঁব সমসামযিক অনেক লোকে মনে কবে, কৃষ্ণ ছিলেন দুর্নীতিপবাযণ; যে-সব বিশেষণে তাবা শ্রীকৃষ্ণকে শোভিত কোবতো, সে সব পুনবাবৃত্তি কোবে লাভ নেই, কবাব প্রযোজনও নেই; কিন্তু প্রগাঢ ভক্তি সত্বেও বঙ্কিম এই সব প্রতিকূল সমালোচনা খণ্ডন কববাব জন্য কৃষ্ণকে ভগবানেব আসন থেকে সবিযে মানুষেব মাপকাঠিতে তাঁব চবিত্রেব ও কীর্ত্তিব পবিমাপ কবেন। প্রসঙ্গক্রমে মানুষেব মাপকাঠিও একটু অদলবদল হোযেছে। শাবীবিক মানসিক আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ culture-এব ফলই হচ্ছে মনুষ্যত্ব, এবং এই মনুষ্যত্ব শ্রীকৃষ্ণতে পূর্ণমাত্রায বিবাজমান, বঙ্কিমচন্দ্রেব এই সব কথাব মূলে যে-আদর্শ, যে-ভাব, তা নিয়েই আমাদেব আলোচনা। মানুষ যেমন ভগবান হোতে পাবে, কাব্যেব অনুবোধে সমাজেব সুব্যবস্থাব জন্য মানুষকে যেমন উচ্চাসন দেওযা হয, ভগবানেব উচ্চাসনে বসানো হয়, এযুগে আবাব ভগবানকেও তেমনি মানুষেব মাপকাঠিতে বিচাব কবা হচ্ছে। আদর্শ মানুষ না হোলে, সাধাবণ জীবনে পদে পদে কর্ত্তব্যেব ত্রুটি হলে ভগবানও আব আমাদের কাছে ভক্তি পাবেন না। এই যে যুক্তি দিযে ভগবানেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কবা, মানুষেব মাপকাঠিতে ভগবানকে দেখা এবং মানুষেব সকল বৃত্তিব সুসমঞ্জস অনুশীলনই হচ্ছে প্রকৃতধর্ম্ম এ কথা বলা,—এ সবেব মধ্যেই অল্প বিস্তব পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা যায। তাঁব কমলাকান্তেব দপ্তবও অপূর্ব্ব জিনিষ, এবং তাব মধ্যেও ডিকুইন্সি, স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতি লেখকেব প্রভাব স্পষ্টই ধবা দিচ্ছে। অবশ্য পাশ্চাত্যেব নিকট এই সব বিষয় ঋণ কোবতে গিযেও বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতি থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হন নি; বর্ত্তমান যুগে বাহ্যসম্পদেব পূজাকে বিদ্রূপ কোবেছেন, নূতন ফ্যাসানেব বিদ্যা সমাজ-বিজ্ঞানকে ভূযসী প্রশংসা কোবেছেন, কিন্তু তার পাযে নিজেকে একেবাবে বিকিযে দেন নি, সর্ব্বদাই একটা আলোচনা কববাব ইচ্ছা তাঁব বচনাব মধ্যে দেখতে পাওয়া যায। বঙ্কিমের মতি ছিল স্থিব, এবং স্থিতধী ছিলেন বোলেই সমস্ত জাতি ও

তার সাহিত্যকে তিনি একেবারে বিপরীত আদর্শের অনুসরণ থেকে কিছু না কিছু রক্ষা কোরতে পেরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর এই ভাবে সাহিত্যের অধিনায়কত্বে কেটে যায়। তাঁর সময়ে বিশেষ যে-পরিবর্ত্তন হয় তার আলোচনা রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যুগ তার পর থেকেই আরম্ভ হয়। তিনি কথা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রথম হোতেই নূতন পথে চলেন। তাঁর রাজর্ষি ও বৌঠাকুরাণীর হাটের মধ্যে আমরা রাজবাড়ীর ঐশ্বর্য্য দেখতে পাই না, অট্টালিকা আমাদের চোখে পড়ে না, শুধু হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা, ছোটখাট সুখদুঃখের কথা, মানবের অন্তঃশীলা রসধারার কথা শুনতে পাই। তার বহুপূর্ব্বেই পাশ্চাত্যেও রোমান্সের আমদানী কোমে গিয়েছিল, মানুষের সাহিত্যিকের দৃষ্টি পোড়ছিল সাধারণ ঘটনার ওপর; সাধারণ ঘটনার ভেতরে সাধারণ অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ কেমন ভাবে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, নিজেকে চালিয়ে নেয়, তাই নিয়ে কথাশিল্পীরা বেশী ব্যস্ত থাকতে আরম্ভ করেন। রোমান্সের শেষ কোনও দিন তো হবে না, শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যতদিন মানুষ সুদূরের পিয়াসী থাকবে, যতদিন অপরিচিতের—অজানার—হাতছানি তাকে সমুখপানে ডাকতে থাকবে ততদিন তার পক্ষে রোমান্সের গণ্ডী একেবারে পার হোয়ে যাওয়া সম্ভব হোতেই পারে না।

কিন্তু ইউরোপ রোমান্সের বহু চর্চ্চা কোরে এখন একটু আল্‌গা দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর পর যে-দুটি উপন্যাস লেখেন তাদের মধ্যে এইটি লক্ষ্য করবার বিষয়। নৌকাডুবি ও চোখের বালি,—এ দুটি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের অসাধারণ ঘটনা নিয়ে লেখা বটে, কিন্তু বড় ঘরের ওপর লেখকদের যে-একটা টান ছিল, ঐতিহাসিক চিত্র না হোক ইতিহাসের কাঠামোকে অবলম্বন কোরে চলবার যে-একটা রীতি ছিল তা এতে খোসে যায়। তার পরে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হোচ্ছে গোরা। গোরার সঙ্গে কোনও বিদেশী উপন্যাসের মিল আছে, কিন্তু সে মিল দেখানো আমার এখন উদ্দেশ্য নয়; আমি শুধু গোরার মূল কথাটার ওপর জোর দিতে চাই। সকল প্রকার পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে গোরা হচ্ছে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ। তার মধ্যে এমন সব বস্তু আছে যা যুক্তিসহ নয়, তবু একটা প্রচণ্ড আগ্রহ আছে, যার জোরে বিদেশের সাধু সমালোচনা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। গোরা ও পানুবাবুর তর্কের মধ্যে এইটিই আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয়। তার পর আর এক পরিবর্ত্তনের আভাসও গোরাতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে এনেছেন একেবারে সদর রাস্তায়—বিশ্বের রাজপথে। নিজের পরিচয়ে

সে যখন দেখতে পেলে যে হিন্দুয়ানীর ওপর, হিন্দু সভ্যতার ওপর তার কোনও দাবী নেই, দাবী থাকতেই পারে না, তখন সে জগতের সামনে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে ভারতের দেবতার মন্ত্র পরেশবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিল। গোরা তাই শুধু সাধারণ মানুষের কথা নয়, সে যেন রবীন্দ্রনাথেরই সেই সময়ে যে-পরিবর্ত্তন হয় তার মূর্ত্ত প্রতীক, সে এই পরিবর্ত্তনের কথা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বোলে গেল,—দেশের মধ্যে থেকেও তার আত্মা যেন দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও এক বিশালতর দৃষ্টি অর্জ্জন কোর্‌লে,—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় অন্ততঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের আলোচনায় গোরার মূল্য তাই এত বেশী।

তার পরে আর একটী উপন্যাস আমরা আজ আলোচনা কোর্‌ব—ঘরে বাইরে। ঘরে বাইরের জন্য রবীন্দ্রনাথকে তখন বিস্তর প্রতিকূল সমালোচনা শুনতে হোয়েছিল; কিন্তু ঘরে বাইরে ও নৌকাডুবির তুলনা কোরলে বোঝা যাবে,—ঘরে বাইরের মধ্যে এমন কিছু ঘোটেছে যার অস্তিত্ব নৌকাডুবিতে নেই। বহিঃপ্রকৃতি যেন তাঁকে চঞ্চল করবার, মুগ্ধ করবার অবসর পাচ্ছে না, মানুষের মনে যে-বিপ্লব লেগেছে, যা দেশবিদেশের গণ্ডী মেনে চলে না, যা বহিঃপ্রকৃতির ছায়া মাত্র নয়, যা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ব্যাপার, সেই অন্তর্বিপ্লবের এক ছবি তিনি এঁকেছেন; অল্প কথায়, প্রায় অনাড়ম্বর বোললে চলে এমন ভাষায়, স্বামীস্ত্রীর প্রেম কোথায় জীবন্ত, আর কোথায় শুধু কলের ব্যাপার, তা নিখিলেশ ও বিমলার পরস্পর প্রীতিঘন বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু স্রষ্টা নন, নিপুণ সমালোচক; বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে সমগ্র দৃষ্টি আছে, তাঁর শিল্পীহৃদয়ের মধ্যে যে-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য আছে, তার জন্য তিনি উপন্যাস লিখতে গিয়ে লোকে যাতে শুধু অনুবাদ না করে এবং অনুবাদের সাহায্যে আবহাওয়া নষ্ট না করে সে কথা বারবার বোলেছেন। এই নজীরে পাশ্চাত্য ভাল উপন্যাসও আমাদের ভাষায় অনুবাদ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু পাশ্চাত্য উপন্যাসের সহিত ব্যাপক পরিচয়ের ফলে তাঁর শিল্পধারা যে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হোয়েছে, সে কথা অস্বীকার কোরবার উপায় কি? ঘরে বাইরে-তে আমরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পের যে-অবস্থা দেখতে পাই, তার মূলে পাশ্চাত্য প্রভাব অনেকখানি জোড়িয়ে আছে, এ কথা বোল্‌তেই হবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। তাঁর গীতিকবিতা বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বাঙ্গালীর অতি আদরের বস্তু। এই গীতিকবিতার জন্যই মুখ্যতঃ বিশ্ববরেণ্যদের মধ্যে তাঁর আসন। তার মধ্যে যদি আমরা পশ্চিমের পদচিহ্ন খুঁজতে যাই, তবে আমাদের অসুবিধা বিস্তর। কবি তাঁর পূর্ব্বতন লেখাগুলি পুনঃপ্রকাশের পথ বন্ধ কোরে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা নয় যে

এই সব অপরিণত রচনা সাধারণের সামনে এনে ধরা হয়। কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই সে কথা লিখে জানিয়েছেন, সুতরাং এবিষয়ে আমাদের আর আশা করবার কিছু নেই। কিন্তু কোনও প্রতিভাশালী লেখকের মধ্যে বাইরের কাব্যে প্রভাব দেখতে হোলে আমাদের খুঁজতে হবে সে লেখকের প্রথম রচনা, যখন বিচার কোরে সমালোচনা কোরে বাদ দেওয়ার প্রবৃত্তি বেড়ে ওঠেনি, যখন ভালবাসার পাত্রের দোষগুণ চোখে পড়ে না, যখন প্রতিভা একটা স্বতন্ত্র পথ বেছে নেওয়ার মত পরিণতি লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বতন কবিতাগুলি পুনর্মুদ্রিত হোতে না দিয়ে এই পথ বন্ধ কোরেছেন। সুতরাং আমাদের উপায় হোচ্ছে অন্য পথ ধরা, যে-সব কবিতা তাঁর কাছ থেকে জাতি পেয়েছে, সেই সব অমূল্য কবিতার ভিতর দিয়েই এরূপ আলোচনার একটা ধারা বা পথ বেছে নেওয়া। প্রথমতঃ, আমরা কাব্যের গঠনের কথা বিচার কোর্‌লে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বগামী ভারতচন্দ্রের মতো পুরাতন ছন্দ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি, বহু নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন কোরে গেছেন। সে সব কথা ছেড়ে দিয়েও একটি বিশেষ রূপের সম্বন্ধে বলা চলে,—চতুর্দ্দশপদী কবিতা, যা কিনা মাইকেল মধুসূদন আমাদের দেশে চালিয়ে গেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের হাতে অনেক প্রকারের হোয়ে পোড়েছে। এ সম্বন্ধে দুইটি কবিতার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, তা থেকে বুঝতে পারা যাবে মাইকেলের দানকে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন।

প্রথমতঃ, মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহু-বিধ পিক যেথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাগ্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি।
উপহার রূপে আজি আরপি রতনে॥

—ফরাসী-দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, রচিত।

তারপর রবীন্দ্রনাথের ৩৫ বৎসর পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত—

মুক্ত কর, মুক্ত কর নিন্দা প্রশংসার
দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হ'তে। সে কঠিন ভার
যদি খ'সে যায় তবে মানুষের মাঝে
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে,—
তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে, নাথ।
তোমার চরণপ্রান্তে করি' প্রণিপাত
তব দণ্ড পুরস্কার অন্তরে গোপনে
লইব নীরবে তুলি',—নিঃশব্দ গমনে
চ'লে যাব কর্ম্মক্ষেত্র মাঝখান দিয়া,
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তিবলে; নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয় মাঝে নানা কর্ম্ম সারি'
সমুদ্রের পানে ল'য়ে বন্ধহীন বারি।

—নৈবেদ্য

মধুসূদনের পদবিন্যাস ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো নয়, পায়ে পায়ে মিলের ওপরে ভর কোরে চোল্‌ছে রবীন্দ্রনাথের চতুর্দ্দশপদী, আর মধুসূদনের চোল্‌ছে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে, ইংরাজি বা ইতালীয় সনেটের মতো; এ ছাড়া আরো কত রকমে চতুর্দ্দশপদীকে যে রবীন্দ্রনাথ আপন কোরে নিয়েছেন তা তাঁর উৎসর্গ বা গীতাঞ্জলির পাতা ওল্‌টালেই বোঝা যাবে। শুধু চতুর্দ্দশপদী কেন, অন্য সকল কবিতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোরেছে; কবিতার অন্তর্নিহিত যে-ভাব তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব দান আছে, আর সে দানের সঙ্গে পাশ্চাত্য কবিদের মর্ম্মকথার নিগূঢ় সম্বন্ধ। প্রকৃতির মধ্যে আমরা পূর্ব্বে দেখতাম শুধু অচেতন শোভা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, এখন আমরা অন্যরূপ দেখতে আরম্ভ কোরেছি; প্রকৃতি এখন প্রাণময়ী, সে এখন আমাদের অতীত সুখদুঃখের সাথী, এখন তার স্পর্শে আমাদের মনের কলকব্জা নোড়ে ওঠে, প্রকৃতির অধ্যাত্মস্পর্শে আমরা অনন্ত জীবনের আস্বাদ পাই, অধ্যাত্ম-আলোকের কিরণসম্পাতে নবজীবনের স্পর্শ লাভ করি। তা ছাড়া পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের পল্লীসৌন্দর্য্য যে হতশ্রী হয়, তা দেখে যৌবনে পদ্মার নিবিড় সঙ্গলাভে আনন্দপুষ্ট কবির মনে বড় বাজে; তখন তিনি কার্লাইল-রাস্কিনের মতোই প্রাচীন ভারতের জন্য আক্ষেপ করেন, বর্ত্তমান ভারতের এই নিরানন্দ সমস্যাম্লানমুখচ্ছবি তাঁকে ব্যথা দেয়। তাঁর দেশপ্রীতি, বিশ্বপ্রেম এ উভয় বস্তুই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক পরিণাম। তাঁর

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যে-সহজ সমন্বয়ের ভাব, কৃচ্ছ্র সাধনার প্রতি, কঠোর বৈরাগ্যের প্রতি যে-বিতৃষ্ণা, তার মূল আমাদের সনাতন পল্লীর ভেতরে বাউল-বৈরাগীর ভাবসংস্পর্শে কতটা হোয়েছে আর পৈতৃক বা নিজের জীবনে ইউরোপ-আমেরিকার প্রটেষ্টাণ্ট-ইউনিটারিয়ান্ ধর্ম্মমতের আদর্শে কতটা বেড়েছে কিম্বা প্রাচীন ভারতের উপনিষদ্‌রাজির মধ্যে যে-অমূল্য রত্ন নিহিত আছে তার জন্য কতখানি, এসব কথাও ভেবে দেখবার বিষয়। অবশ্য মনে হোতে পারে যে, কবিকে এরকম কোরে কাটাকুটি কোর্‌লে কাব্যরস শুকিয়ে যাবে, বিচারের অত্যাচারে কাব্যের সরসতা আর থাকবেনা। কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নেই, কবিকে সব দিক দিয়েই আমাদের বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। না বোঝবার আনন্দের চেয়েও বোঝার আনন্দ ঢের ভাল, মনের সুস্থ অবস্থায় একথা সকলে নিশ্চয় স্বীকার কোর্‌বেন। পাশ্চাত্য প্রভাবের আলোচনা এই কাব্য-বিচারের, সাহিত্য-বিচারের, একদিক মাত্র; তবে এটা বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ ইউরোপ-আমেরিকা ও ভারতের বিশেষ সম্বন্ধের জন্য, একটা প্রধান দিক, এই কথা বুঝে তবে এ বিষয়ে আলোচনা স্থুরু করা ভালো, এবং আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেও একথা মনে রাখা উচিত। যদি রসগ্রহণে আমাদের সামর্থ্য বাড়ায় তবেই না এ সব আলোচনার সার্থকতা, আর যদি আমাদের লাভ হয় শুধু শুষ্কতা, শুধু কথার কাটাকাটি, তবে লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্ক বেশী হবে; সেটা যাতে না হয় তার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কথা বল্‌তে গিয়ে আমরা গিরিশচন্দ্রের কথা বাদ দিয়ে এসেছি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে বাদ দেওয়া যেতে পারে না। আমাদের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য কোথা থেকে কোথায় এসে পৌছেছে তা বুঝতে হোলে গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বগামী নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা প্রয়োজন। ইং ১৮৫২ সালেই ইংরেজী আদর্শে বাংলা নাটক লেখ্‌বার প্রথম চেষ্টা হয়। তার পর কুড়ি বৎসর ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ পর্য্যন্ত হরচন্দ্র, রামনারায়ণ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি অনেকেই নাট্যসাহিত্যে আমাদের যে-অভাব ছিল তা পূরণ করবার জন্য ব্যস্ত হন। এ বিষয়ে মধুসূদনের দানও নিতান্ত কম নয়। তবু গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চের একটা ভাল ব্যবস্থাই ছিল না; কাঞ্চন-কৌলীন্য যে থিয়েটারের বেলায় খাটবে, টাকা দিয়ে কোনও লোক যে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ লাভ কর্‌বে, সনাতন ভাবধারায় পরিপুষ্ট বাঙ্গালী সমাজ সেটা প্রথমে নির্ব্বিবাদে হজম কোরতে পারে নি। তার ওপর বাজনা, নাচ, স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী নামানো, নানারকম নাটক লেখা ও অভিনয় করা—এসব একটা ভয়ানক ওলট-পালটের ব্যাপার। তখনকার দিনে মানুষের রুচি কেমন ছিল

তা একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। মধুসূদনেব কৃষ্ণকুমাবী বিয়োগান্ত নাটক। সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নেই, থাকতে পাবে না, অলঙ্কাব শাস্ত্রে তাব স্পষ্ট নিষেধ আছে। কৃষ্ণকুমারী অভিনয় কবাব জন্যে কোলকাতাব বিদ্যোৎসাহী কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেব বাড়ীতে আয়োজন হয় ; কিন্তু ভদ্রলোকের মা কিছুতেই তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে এই অভিনয় হোতে দিলেন না। আমবা আজ সেই অবস্থা থেকে অনেকদূব এগিয়েছি। বাইবেব বাস্তবিক ঘটনাব সঙ্গে আমাদের নাট্য-অভিনয়ের যাতে একটা ভালোমত সঙ্গতি থাকে তাব জন্য আমাদেব আজ বিস্তর চেষ্টা। আজকাল রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালী জীবনেব এক আদরেব বস্তু, এমন কি প্রয়োজনীয় বস্তু বোল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থা যে হোয়েছে তার মূলে গিরিশচন্দ্রের সাধনা। ১৮৭২ থেকে ১৯১২ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসব তিনি বাংলা বঙ্গমঞ্চেব উন্নতির জন্য জীবনপাত করেন। এই উন্নতিব মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব যে কতদূব পোড়েছে তা তখনকাব বঙ্গমঞ্চগুলির নাম আলোচনা কোব্‌লেও খানিকটা বোঝা যাবে ; এমারেল্ড, ক্লাসিক, গ্রেট ন্যাশনাল, কোরিন্থিয়ান্ ইত্যাদি ; আব আজ যে হাওয়া অন্য দিকে বইছে তার দৃষ্টান্ত, নাট্যনিকেতন, নাট্যমন্দিব ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়ারেব ম্যাকবেথেব আক্ষবিক অনুবাদ কোবে গেছেন, অথচ বসেব অপকর্ষ ঘট্‌তে দেন নি ; শেক্সপীয়াবেব অন্যান্য নাটকেব ঘটনা সমাবেশও কিছু কিছু নিয়েছেন, যেমন তাঁব 'বিষাদ', পাশ্চাত্যে যাঁবা অভিনয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছেন তাঁদেব জীবনী পাঠ কোবে তাঁদেব অভিজ্ঞতার সাহায্যে এদেশী অভিনেতা-অভিনেত্রীদেব শেখাতে চেষ্টা কোবেছেন ; আব সাক্ষাৎভাবে বিলিতি অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমনধাবা অভিজ্ঞ ইউবোপীয় বিদ্বযীব সঙ্গে আলোচনায়ও তিনি এ বিষযে অনেক কিছু শিখেছিলেন, তবে অন্যান্য বড়লোকেব মতো তাঁব সম্বন্ধেও এই কথা খাটে যে, তিনি যা কিছু গ্রহণ কোবেছেন তাই নিজস্ব কোবে নিতে পেবেছেন— দেশেব মাটিব সঙ্গে যোগ ছিল ব'লে তাঁব দৃষ্টি পবগাছা হয়নি, পশ্চিমেব হাওযায় বেড়েছে বটে, কিন্তু মূল তাব আমাদেবি বাংলা দেশের মাটিতে।

ববীন্দ্রনাথেব পবই আসে শবৎচন্দ্রেব কথা। এখনকাব দিনে তিনি কথাসাহিত্যে জনসাধাবণের দৃষ্টিপথে অত্যুজ্জ্বল বত্ন। তাঁব মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব খুঁজতে গেলে হতাশ হোতে হয়। তাঁব কাছে আমরা অনেক নূতন কথা পেয়েছি, অনেক ভালো কথা পেযেছি, কিন্তু সে সব কথাব মূলে পশ্চিমের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রেব জীবনের অনেক ঘটনা আমবা জানি, ববীন্দ্রনাথ তাঁব জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রেব মধ্য দিয়েও আমাদেব কাছে তাঁব জীবনেব একাংশ উন্মুক্ত কোবে দিয়েছেন, কিন্তু শবৎচন্দ্রের

জীবন-কথা আজও বহস্যজালে ঢাকা। তাঁব শিক্ষানবিশীব কোনও কথাই তো আমাদেব জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি যে, ববীন্দ্রনাথেব কাব্য-উপন্যাস বহুদিন অতি যত্নেব সঙ্গে তিনি পোড়েছিলেন, সাধনাব বস্তু কোরে নিয়েছিলেন, আব জানি যে, বাঙ্গালী জীবনের বহু বিভিন্ন স্তবেব সহিত তাঁব ঘনিষ্ঠ পবিচয়। প্রতি পদে তিনি আদর্শকে বাস্তবেব সঙ্গে সুসঙ্গত কোবে তাঁব লেখাব মধ্যে প্রয়োগ কোবেছেন।

তাই বল্‌ছিলাম, শবৎচন্দ্রেব যুগে আমবা আমাদেব চাবদিকে আঘাত-সঙঘাতেব ফলে যে-সমাজ গোড়ে উঠেছে তাব সঙ্গে জোড়িয়ে পোড়েছি, পশ্চিমেব দিকে আমাদের আব তেমন তাকাবাব উপায় নাই,—পল্লী-সমাজেব দলাদলি, বাঙ্গালীব বেঙ্গুনযাত্রা, সস্তাদবে খেলনা বাড়ী নিয়ে যাওয়ায় কেরাণী জীবনেব যে-দুর্ল্ভ আনন্দ তাতেও ব্যাঘাত, বর্ত্তমানযুগেব বিবাহসমস্যা, এইসব নানারূপ দুঃখকষ্ট সুখআনন্দ আমরা আব অবহেলা কোবতে পাবি না, আব বুঝি যে এ সব দুঃখকষ্টেব মধ্যেও নিবিড় আনন্দেব উৎস আছে, ইন্দ্রনাথেব বন্ধুত্বলাভেব মতো শ্রীকান্তেব জীবনে আব কখনও এত লাভ হয় নি, তা সে জীবন যত পর্ব্বেই ছড়িয়ে যাক্ না কেন। পাশ্চাত্য প্রভাব এখন যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতব হোয়ে পড়্‌ছে, জাতীয় সাহিত্যেব কলবোল আব কানে পর্য্যন্ত এসে পৌছুতে পাব্‌ছে না।

প্রসঙ্গক্রমে 'অতি-আধুনিক কথাসাহিত্য' সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলাব মাসিকপত্রগুলি বিতণ্ডা-মুখব হোয়ে উঠেছিলো; তাদেব বিতণ্ডাব বিষয ছিল বর্ত্তমান গল্প ও উপন্যাসেব রুচি ও ঘটনাসংস্থান। যাঁবা ছিলেন বিরুদ্ধবাদী অতি-আধুনিকতাই ছিল তাঁদেব কাছে নিন্দাব হেতু। অন্য পক্ষে যাঁবা ছিলেন, তাঁবা তারুণ্যেব গর্ব্বে স্ফীত হোয়ে স্পর্দ্ধাভবে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচবণ কোবতে লাগ্‌লেন,—"আমবা চলি সমুখপানে কে আমাদেব রুখ্‌বে" এইভাবে। যাঁবা বিরুদ্ধবাদী তাঁদেব মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী; তাঁব আপত্তিব কাবণটা আমাদেব বোঝা দরকাব। সে কারণ তিনি বহুবার বোলেছেন, বহুবাব নবীন সাহিত্যিকদেব সাবধান কোবে দিয়েছেন। তাঁব আপত্তি রুচিগত নয়, শুচিবাইয়েব চীৎকাব নয়, তার চেয়ে সাব কথা আছে তাঁব যুক্তিতে,—পশ্চিমের হাওয়ায় যে-কৃত্রিম সাহিত্য গোড়ে উঠেছে বোলে তাঁব ধাবণা, তাঁব আপত্তি সেই কৃত্রিম সাহিত্যেব বিরুদ্ধে। ভাবেব ঘবে মেকী চলে না, সাহিত্যে কৃত্রিমতাব স্থান নেই, যে-দেশে যে-সমস্যা উপস্থিত নেই, সমাজগঠনেব বিশেষ নিয়মহেতু উপস্থিত হোতে পাবে না, সেই দেশেব সাহিত্যে সেই সমস্যাব উপস্থাপন দোষেব বোলে তাঁব

ধাবণা আব সেই ধাবণাব জন্যই তিনি এই অতি-আধুনিক সাহিত্যসেবীদেব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এব বহুদিন পূর্ব্বে প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসব পূর্ব্বে কবি যখন সাধনা-পত্রিকাব কর্ণধাব ছিলেন, তখনো মনে পড়ে ফবাসী কোনও ভালো উপন্যাসেব বাংলা অনুবাদে তাঁব আপত্তি ছিল প্রচুব, কাবণ তিনি বোল্‌তেন—ফবাসী উপন্যাসে যে-অতিসূক্ষ্ম কাজ আছে অনুবাদেব অত্যাচাবে তাব আব্রুটুকু চোলে যাবে, তাব মাধুর্য্যটুকু নষ্ট হবে, ফুটন্ত গোলাপ ফুল গাছ থেকে নিয়ে ঘব সাজালে যেমন তাব আভা ম্লান হোয়ে যায়, সাহিত্যেও ঠিক তেমনি ধাবা হবে, সুতবাং তাতে সৌন্দর্য্যকে নষ্ট কবাই সাব হবে, তাকে জীইয়ে বাখা হবে না। আধুনিক ও অতি-আধুনিকেব তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তবে এই কথাই মনে বাখা দবকার যে, সাহিত্য পরগাছা নয়, পশ্চিমের হাওযা তাকে চঞ্চলতা দিতে পাবে, তাকে নূতন পথে চলাব কথা বোল্‌তে পারে, তাকে প্রেবণা দিতে পাবে, কিন্তু প্রাণ দিতে পাবে না।

পশ্চিমেব প্রভাব তাহলে আমাদেব ওপবে কি দাগ রেখে যাবে? আলেকজান্দাব যখন এ দেশে আসেন তখন হয় তো গ্রীক প্রভাব ভাবতে যথেষ্ট বিস্তাব লাভ কোবেছিল। কিন্তু এখন? এখন সে প্রভাবেব বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। পাশ্চাত্য প্রভাবও কি দুদিনেব জন্য আমাদেব ওপবে কাজ কোবে শেষ হোয়ে গেছে, ক্ষয হোয়ে গেছে—সে প্রভাবেব দরুণ আমাদেব যে-সাহিত্যসম্পদ, বঙ্কিম-ববীন্দ্র-গিবিশ-শবতেব সাধনাব ফলে পুষ্ট বঙ্গসাহিত্য, তাও কি কালপ্রভাবে লুপ্ত হোয়ে যাবে, গবেষণাব জন্যও কিছু অবশিষ্ট থাক্‌বে না? এ সব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কবা আপাততঃ নিবাপদ বটে, কিন্তু সহজ নয। শুধু ১৩২০ সালে বঙ্গপুব সাহিত্য-পবিষদ অধিবেশনে জগদীন্দ্রনাথেব অভিভাষণের কথাগুলির পুনরুক্তি কোবেই আজকেব মতো ক্ষান্ত হওযা যাক্—

"আমাদেব মধ্যে অনেকে ভাবেন যে, যাহা কিছু পুবাতন, যাহা কিছু সাবেক, তাহাই কেবল দেশেব জিনিষ। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ আমাদের দেশেব পুবাতন পদার্থ। উত্তবকালে যাহা কিছু হইবে, তাহা যদি কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণী ছন্দে না হয, কিম্বা তাহাব মধ্যে যদি আমাদেব আধুনিক শিক্ষাব কোন প্রবর্ত্তনা দেখা যায়, তবে তাহা দেশেব জিনিষ হইল না। তাহাকে বিদেশী আখ্যা দেওযাই সঙ্গত, এবং তাহা দ্বাবা আমাদেব আত্মপবিচযেব খর্ব্বতা ঘটে। জডবস্তু সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পাবে বটে, কাবণ যাহা তাহাব পূর্ব্ব পবিচয, তাহাব উত্তব পবিচযও তাহাই; কিন্তু প্রাণবান্ পদার্থেব যথার্থ পবিচয পবিবর্ত্তনেব মধ্যেই প্রকাশ পায। . . . ইউবোপীয সাহিত্যে যে-প্রাণেব স্পন্দন আছে, তাহাব সুললিত ছন্দে আমাদেব সাহিত্যও স্পন্দিত হইযা উঠিয়াছে, বঙ্কিমেব প্রতিভা যখন এই বার্ত্তা ঘোষণা কবিল, তখনই বঙ্গসাহিত্য-লক্ষ্মীব উটজ-প্রাঙ্গণে আনন্দময় মঙ্গলশঙ্খ বাজিযা উঠিল। . স্তুতিনিন্দাব জন্য তখনও

আমাদিগকে পশ্চিমাভিমুখী হইয়াই থাকিতে হইত। তখনও আমরা মিল্, বেন্থাম, কোঁত, মিল্টন্, বাইবেল, স্কটের মধ্য দিয়া জগতের সমস্ত পদার্থ দেখিতাম; কারণে অকারণে যদি কখনও আমাদের পাশ্চাত্য গুরুর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছি, তথাপি সেই ঔদ্ধত্যের দ্বারাই আমাদের হৃদয়ের বন্ধনদশা সূচিত হইয়াছে। ...এইজন্য তখনকার সাহিত্যের মূলদেশ আমাদের দেশের মাটির সহিত সংলগ্ন ছিল না, সে যেন "অরকিডের" মত আর এক গাছে উচ্চ শাখায় ঝুলিতেছিল। সে-সাহিত্য যে প্রাণবান্ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার প্রাণরস অন্য দেশের সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইত।"

আমরা আজ এ অবস্থা ছাড়িয়ে গিয়েছি, আর ছাড়িয়ে গিয়েছি বোলেই আমরা পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ মত পোষণ কোর্তে পারি না। আমাদের সাহিত্য তার সমগ্রতা বজায় রাখতে পারবে না এরূপ আশঙ্কা আমাদের আজ আর নেই।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
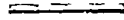
সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর মূলসূত্র

১

আজকের দিনে দেশে দেশে সোশ্যালিষ্ট্‌ আন্দোলন যে প্রবল হ'য়ে উঠেছে শুধু তা' নয়, সোশ্যালিষ্ট্‌ মতামত আধুনিক চিন্তাধারার উপর নানারূপে প্রভাব বিস্তার কর্‌ছে একথাও স্বীকার কর্‌তে হবে। সোশ্যালিষ্ট্‌ ভাবস্রোতের ঢেউ আজকাল আমাদের দেশেও পৌঁচেছে, যদিও অনেকে এটা নিতান্ত ক্ষোভের কথা মনে করেন। অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক এ সম্বন্ধে আগ্রহ বা আলোচনাকে পশ্চিমের সস্তা অনুকরণ ব'লে ব্যঙ্গ করেছেন—এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ও সর্ব্বোপরি ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও আমরা প্রায় শুনতে পাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশ থেকে সাহিত্য, সামাজিক প্রথা, শিক্ষাপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে নূতন নূতন মত ও আদর্শ আহরণ কর্‌তে কুণ্ঠিত হন না—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জাতীয়তা-বোধের প্রসারের বিপুল চেষ্টা পাশ্চাত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে অনেক প্রবল যুক্তি আছে কিন্তু তাকে বিদেশী ব'লে বর্জ্জন করার উপদেশ শ্রেণীস্বার্থের সুন্দর উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক সভ্যতার বিশেষত্ব আছে—একথা নিশ্চয়ই সত্য। বিদেশী আদর্শের অনুকরণ না করার প্রবৃত্তিও অনেক স্থলে প্রশংসনীয়। কিন্তু সকল বিষয়েই যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পার্থক্য থাকবে এমন কোন কথা বলা চলে না। বর্ত্তমান যুগে সহজ যাতায়াত ও ভাবের নিয়ত আদান-প্রদানের ফলে মানুষের ঐক্য স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। বিজ্ঞান যেমন জাতি ও দেশের সীমা অতিক্রম করে, আর্থিক বিধিব্যবস্থার মূলসূত্রগুলিও তেমনই আজ সকল দেশে একই রূপ ধারণ করেছে। একই আর্থিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে একই পরিণতি আজ সকল সমাজের লক্ষ্য। চীন ও জাপানের প্রাচ্য সভ্যতা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে নি। সোশ্যা-লিজ্‌ম্‌-এর সমস্যা সকল দেশে সমান তীব্র হ'যে না উঠলেও কোনো সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সে আলোচনা ও আন্দোলন বন্ধ রাখতে পারবে না।

আমাদের দেশে সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর স্থান যাই হোক না কেন, ইউরোপে অন্ততঃ তাকে উপেক্ষা কররার আর উপায় নেই; গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে তার প্রভাব পাশ্চাত্য জীবনকে আলোড়িত ক'রে তুলছে। পশ্চিমের সাহিত্য ও বাদানুবাদের মধ্যে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে অনেক তর্কই আমরা শুনি কিন্তু এই বিরাট আন্দোলনের স্বরূপ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। যে-কোনো মতবাদের প্রকৃত বিচারের পথে অজ্ঞতা

ও অস্পষ্ট ধাবণা বিশেষ বাধাব সৃষ্টি কবে। সোশ্যালিষ্ট্‌ চিন্তাধাবা ও দৃষ্টিভঙ্গীব কিছু বিস্তাবিত পবিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য।

২

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীব প্রায় সর্ব্বত্র যে-আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বয়েছে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ তাবই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবেছে। এই ব্যবস্থাকে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ বা ধনতন্ত্র বলা হয়। এব একটি মূলসূত্র বহু প্রাচীন—ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি ভোগেব নিয়ম ও উত্তবাধিকাব প্রথা। অপবটি ইতিহাসে খুবই নূতন—গত দেড়শ বৎসরেব ভিতব ধনোৎপাদন-প্রণালীব বিপুল পবিবর্ত্তন। প্রতি দেশেই ধনোৎপাদনের জন্য যা' কিছু প্রয়োজন তাব মধ্যে শাবীবিক পবিশ্রম বা গতব ছাড়া অন্য সবই অতি অল্পসংখ্যক লোকেব সম্পত্তি। নূতন আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি আবাব ধনী ভিন্ন অন্যদেব আয়ত্তেব বাহিবে। ফলে প্রতি সমাজেই দুটি প্রধান স্তব দেখা যায—একদিকে অল্পসংখ্যক ধনিকেব হাতে সমস্ত আর্থিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, সকল ব্যবসাযবাণিজ্যে লাভ পায় তাবাই, দেশে তাবাই প্রকৃত প্রভু; অন্যদিকে অসংখ্য শ্রমজীবীব দল—তাবা পবিশ্রমেব পবিবর্ত্তে যে সামান্য মজুবি পায তাতে হযতো কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে এবং সেটুকুব জন্যও তাদেব নির্ভব কবতে হয ধনিকদেব উপব। সমাজেব অন্য অন্য অংশগুলি এই দুই মুখ্য শ্রেণীব সঙ্গে সংযুক্ত—তাদেব স্বার্থ ধনিক কিংবা শ্রমিকেব স্বার্থেব সঙ্গেই বিজড়িত।

ধনিকদেব প্রভুত্ব এবং ধনিক ও শ্রমিকেব মধ্যে এই বিবাট প্রভেদেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিছু নূতন নয়। ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রেব প্রাবম্ভে অনেক সহৃদয লোক তাব তীব্র সমালোচনা কবেছিলেন—তাঁদেব মনে হযেছিল যে, দেশেব পূর্ব্বতন একতা চূর্ণ ক'বে ধনিক ও শ্রমিকেব বিবোধ স্ফুট ক'বে তুল্‌লে একই দেশে যেন দুটি বিভিন্ন জাতি গ'ড়ে উঠ্‌বে। সম্প্রতি ইউবোপে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ও সমাজেব মঙ্গলেব জন্য ধনিকদেব স্বেচ্ছাচাবে বাধা দেবাব কথা তুলেছে। আমাদেব দেশেও ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌-এব বিরুদ্ধে আপত্তি বিবল নয—সনাতন আর্থিক বিধিব্যবস্থা অনুসবণেব উপদেশ এবং যন্ত্র-সভ্যতাব অমানুষিকতা ও সৌন্দর্য্যহীনতাব আলোচনায় আমবা অভ্যস্ত।

কিন্তু এই ধবণেব আপত্তি ও সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এব ভিতব অনেক পার্থক্য আছে। উপবে যাঁদেক কথা বলা হযেছে—তাঁবা যন্ত্রেব বহুল প্রচাব ও ধনিকদেব নির্ম্মম ও যথেচ্ছ ব্যবহাবেব প্রতিবাদ কবেন কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিভোগেব উপব সমাজ-প্রতিষ্ঠা তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ও ন্যায্য মনে হয়। সোশ্যালিষ্ট্‌বা কিন্তু যন্ত্রপাতিব বিবোধী নন কেন-না

যন্ত্রেব সাহায্য ছাড়া অল্প আয়াসে ও অল্প সময়েব মধ্যে ধনোৎপাদন সম্ভব নয় এবং নূতন পদ্ধতিগুলি পবিত্যাগ কর্‌লে মানুষেব দাবিদ্র্য বা শ্রমভাব লাঘবেব অন্য উপায থাকেনা। তাঁদেব মতে ধনতন্ত্রেব অমঙ্গলেব মূল কাবণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগেব অধিকাব, যন্ত্রেব ব্যবহাব নয়; তবে আধুনিক যান্ত্রিক যুগে নূতন ধনোৎপাদন-প্রণালীগুলি ব্যয়সাধ্য ব'লে ধনিকেব প্রতাপ প্রচণ্ডতব হ'য়ে উঠেছে। ধনোৎপাদনেব জন্য যা' কিছু প্রয়োজনীয় সে সমস্ত সাধাবণেব সম্পত্তি হ'লে অন্যায় অত্যাচাব, দাবিদ্র্য ও দাসত্ব অসম্ভব হবে, এই বিশ্বাস সোশ্যালিষ্ট্‌দেব মজ্জাগত।

এই নিয়মেব অভাবেই ধনতন্ত্রকে অসীম অমঙ্গল ও অশেষ দোষেব আকব ব'লে সোশ্যালিষ্ট্‌বা মনে কবেন। ধনতন্ত্র প্রতিযোগিতাব উপব প্রতিষ্ঠিত কাবণ সকলেবই উদ্দেশ্য অপবকে অতিক্রম ক'বে বড হওযা। ফলে মানুষেব সঙ্গে মানুষেব সহজ সম্পর্কেব বদলে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বার্থেব সঙ্ঘাতই বড হ'য়ে দেখা দেয—আব তাব সঙ্গে থাকে অজস্র অপচয়। ধনতন্ত্র পুষ্টিলাভ কবলে অবশ্য প্রতিযোগিতা হ্রাস হয় কিন্তু তখন আবাব অল্পসংখ্যক ধনিকেবা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে দেশেব সমস্ত আর্থিক জীবন নিজেদেব কবাযত্ত ক'বে ফেলে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক দেশে বা সমাজে স্বদেশী ও বিদেশী ধনিকেব আধিপত্য স্থাপিত হয—নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকেব হাতে থাকে প্রভুত্ব আব জনসাধাবণকে জীবিকা-নির্ব্বাহেব জন্য নির্ভব করতে হয় তাদেব উপব। আজকাল অনেক লোকে অর্থ সঞ্চয় কবে বটে কিন্তু সে অর্থ ধনোৎপাদনেব কাজে লাগে ধনিকদেবই ইঙ্গিতে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিব মধ্য দিয়ে দেশেব সঞ্চিত অর্থ যায় শুধু সেই সব দিকে যেখানে ধনিকদের প্রভূত লাভেব সম্ভাবনা—সমাজেব কল্যাণ বা জনসাধাবণেব উন্নতি লক্ষ্য হিসাবে নিতান্তই গৌণ হ'যে থাকে। জনগণেব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলকে খর্ব্ব ক'বে মুখ্যতঃ অল্পসংখ্যক লোকেব শ্রীবৃদ্ধিব জন্য ব্যবসাবাণিজ্য-পবিচালন ধনতান্ত্রিক সমাজেব একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাবেকি অর্থশাস্ত্রেব যুক্তি ছিল এই যে, প্রত্যেক লোকেবই কিসে নিজেব মঙ্গল হবে তা' স্থিব ক'বে সেইমত কাজ কববাব শক্তি ও সামর্থ্য আছে; ফলে সমষ্টিব কল্যাণ আপনা হ'তেই সাধিত হ'যে যায়। আধুনিক ইতিহাস কিন্তু সাক্ষ্য দেবে যে, এই মত আসলে ভিত্তিহীন। কর্ম্মক্ষেত্রে সাধাবণ লোকেব স্বাধীনতা বা আত্মবক্ষাব উপায়েব বস্তুতঃ কোন অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য ধনিকদেব অপর্য্যাপ্ত লাভেব দিনেও কখনও শ্রমজীবীদেব দাবিদ্র্য ঘোচে না এবং ব্যবসাযে ক্ষতিব সময বেকাব-সংখ্যা বেড়ে চলে। আধুনিক যুগের ফ্যাক্টবি-জীবনকে অনেকে দাসপ্রথাব নূতন রূপ ব'লে গণ্য কবেন। যে-সমস্ত বিদ্যা বা বৃত্তিব অনুশীলন মানুষেব প্রধান সম্পদ, বর্ত্তমানেব

আর্থিক ব্যবস্থায় দবিদ্রেবা তাতে বঞ্চিত। অল্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন ভাগ্যবানই এই জীবনে অধিকারী। কিন্তু তাদেব আবাম-অবসব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পবিশীলন-সম্পদ সমস্ত নির্ভব কবছে অপবেব শাবীবিক পবিশ্রমেব উপব। অবশ্য জীবনে উৎকর্ষলাভ সকলেব স্বভাবগত অধিকাব না হ'তে পাবে কিন্তু সে অধিকাব কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন লোকেব আয়ত্তে থাকবে, এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। পৃথিবীতে প্রভু ও ভৃত্য শ্রেণীব প্রভেদ স্মবণাতীত কাল থেকে চলে আসছে বটে কিন্তু কেন চল্‌বে এ প্রশ্নেব উত্তব খুব সন্তোষজনক নয়। এই প্রশ্ন থেকেই সোশ্যালিজ্‌ম্-এর উৎপত্তি।

৩

সমাজেব সমস্যা নিয়ে যাঁবা চিন্তা কবেন তাঁদেব প্রায় সকলেব কাছেই ক্যাপিটালিজ্‌ম্-এব দোষগুলি সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁদেব অনেকেবই বিশ্বাস যে, দেশে গণতন্ত্র পূর্ণভাবে স্থাপিত হ'লে সংখ্যাধিক দবিদ্রেবা ভোটেব ক্ষমতা ব্যবহাব ক'বে অনায়াসে ধনিকদেব প্রভুত্বকে খর্ব্ব কবতে পাববে। এই কাবণে সমাজেব আমূল পবিবর্ত্তনেব জন্য সোশ্যালিষ্ট্ আন্দোলনেব প্রযোজনীয়তা তাঁবা অস্বীকাব কবেন। গত শতাব্দীতে বিশেয ক'বে গণতন্ত্রই সকল প্রশ্নেব সমাধান কববে, এইবকম একটা বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল—আমাদেব দেশে বোধ হয় এই মত এখনও অবিচল।

সোশ্যালিষ্ট্‌দেব কাছে এ ধাবণা ভ্রান্ত ব'লে মনে হয়। পশ্চিমেব গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণীভেদেব হ্রাসেব কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধনিকেব তুলনায় শ্রমিকেব আর্থিক অবস্থাব উন্নতিও ডিমোক্র্যাসি আজ পর্য্যন্ত ক'বে উঠতে পাবেনি। এব কতকগুলি কাবণ নির্দ্দেশ কবা সম্ভব।

সহস্র দুঃখভোগ সত্বেও সাধাবণ লোকে যে পলিটিক্সেব প্রতি উদাসীন, নিজেদেব অবস্থাব প্রতিকাব সম্বন্ধে অজ্ঞ ও আপন শক্তিতে আস্থাহীন, এ কথা নিশ্চয়ই সত্য। ভোটেব অধিকাব থাকলেও তাবা মতামতেব জন্য অপবেব উপব নির্ভব কবে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতেও জনমত গঠনেব প্রধান উপায় হচ্ছে সংবাদপত্র। যে-সমস্ত সস্তা চাকচিক্যময সংবাদপত্র প'ড়ে জনসাধাবণ কোনো ব্যাপাবে নিজেদেব মন স্থিব কবে, তাব পিছনে রয়েছে অজস্র মূলধন, সঙ্গে সঙ্গে ধনিকেব স্বার্থ জড়িত—সত্যগোপন তাদেব ব্যবসা। সমাজে ধনিক-কর্ত্তৃত্ব থাকাব জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিম্নস্তবেব শিক্ষা-পদ্ধতিবও উদ্দেশ্য হ'যে দাঁড়িযেছে এই যে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে কাবো মনে যেন প্রশ্ন না জাগে।

যেখানে কোন পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতাপ প্রবল সেখানেও ফল একই। ইহজগতের সমস্যা উপেক্ষা ক'রে পরলোকে আত্মার কল্যাণে মন নিবিষ্ট করা; দৈনন্দিন তুচ্ছতা থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি ফেরানো; পৃথিবীর সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার মৃত্যুর পরপারে নির্দ্দিষ্ট থাকে, এই বিশ্বাসের প্রচার—প্রায় সকল ধর্ম্মেরই এইগুলি সাধারণ লক্ষ্য। ধর্ম্মশিক্ষার ফলে লোকে সমাজে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা অন্যায় মনে করে। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও আবার সাধারণতঃ ধনিকদের উপর নির্ভর করতে হয়। সোশ্যালিষ্ট্‌দের ধারণা এই যে, দেশে ডিমোক্র্যাসি থাকলেও সংবাদপত্র, লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মমতের সম্মিলিত শক্তি জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। তা ছাড়া ভোটের অধিকার কয়েক বৎসর পর পর একবার কাজে লাগে—অজ্ঞতা ও সাময়িক উত্তেজনায় ভোটারের মন ঠিক সেই সময় আচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রতিদিন সাধারণ লোককে যে-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হচ্ছে তার মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নিদর্শন কোথায়? আর্থিক সমতা আন্‌তে হ'লে সেইজন্য গণতন্ত্র স্থাপনেই সন্তুষ্ট হ'লে চল্‌বে না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নূতন আদর্শ লোকসমাজে প্রচার করা প্রয়োজন। এই বিশ্বাসই সোশ্যালিষ্ট্‌ আন্দোলনের ভিত্তি।

৪

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, একথা বোঝা সহজ কিন্তু যে নূতন সমাজ গঠন তার আদর্শ সে সমাজের বৈশিষ্ট্য কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব আছে। সোশ্যালিষ্ট্‌রা নানা দলে বিভক্ত সুতরাং তাদের মধ্যে মতদ্বৈধ স্বাভাবিক। অনেকে আবার সোশ্যালিষ্ট্‌ নাম গ্রহণ ক'রেও সে আদর্শের সকল দিক পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করেন না। সোশ্যালিষ্ট্‌দের আচরণের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিশুদ্ধ মতবাদটির মূলসূত্রগুলির আলোচনা করতে হবে।

সকল দেশে ও সকল যুগে সমাজের মধ্যে একটা স্তরভেদ পাওয়া যায়—এই বিভিন্ন অংশগুলিকে শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীর স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে আমরা সাধারণতঃ জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের কথাই বিচার করি কিন্তু তার থেকেও বড় কথা-বোধ হয় এই শ্রেণীর সমস্যা কেননা সাধারণ লোকের স্বার্থ ও মঙ্গল এর সঙ্গে জড়িত। শ্রেণীভেদের অর্থই এই যে, বিভিন্ন স্তরের স্বার্থের মিল থাকে না; কাজেই শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ সমাজের চিরন্তন প্রথা। সেইজন্য সমাজকে স্থিতিশীল্‌

করতে হ'লে শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য আবশ্যক। অথচ যাদের উপর এই কর্তৃত্ব তাদের পক্ষে এ প্রভুত্ব মেনে চলা সহজ নয়। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর প্রধান কথা এই যে, সমাজ থেকে অত্যাচার, দ্বন্দ্ব ও অশান্তি নির্ব্বাসিত করতে হ'লে শ্রেণীভেদ নির্ম্মূল করতে হবে—ভবিষ্যতের মানব-সমাজ গঠিত হবে মাত্র একটি বিরাট শ্রমিক-সঙ্ঘকে নিয়ে। বার্ণার্ড্‌ শ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধনসাম্য চেয়েছেন কিন্তু উত্তরাধিকার প্রথা উঠে গেলে শ্রেণীগত বৈষম্যের উচ্ছেদই যথেষ্ট মনে হয়। এর প্রধান উপায় হচ্ছে এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন যে, ধনসৃষ্টির সকল উপাদান (ভূমি, মূলধন, যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ, শক্তির উৎস, যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদি) সাধারণের সম্পত্তি হবে। এগুলির ব্যবহার ও পরিচালন-পদ্ধতির সম্বন্ধে সোশ্যালিষ্ট্‌দের মধ্যে কোন স্থির মত পাওয়া যায় না কিন্তু এদের উপর যে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার অস্বীকার করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে অনৈক্যের লেশমাত্র নেই। পশ্চিমে রাষ্ট্রীকরণের যে-আন্দোলন চল্‌ছে তার উদ্ভব এই বিশ্বাসের থেকে। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত জিনিষগুলি কয়েকটি লোকের সম্পত্তি ব'লে তারা দেশের সমস্ত আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর আর একটি মূলসূত্র হচ্ছে দারিদ্র্যের অপসারণ। শ্রেণীবিভাগ উঠে গিয়ে যদি সকল মানুষের সমান অভাব হয় তবে আর যাই হোক্‌ তাকে নূতন সমাজ ও নবসভ্যতা বলা চলবে না। লেনিন্‌ অবশ্য বলেছিলেন যে, কোন লোকের বাহুল্য ভোগ করবার উপায় রাখার আগে প্রত্যেকের যা' অত্যাবশ্যকীয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সোশ্যালিষ্ট্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে এখনকার অপেক্ষাও কম সময়ে ও পরিশ্রমে সকলের আরামে থাকার মত ধন উৎপন্ন করা সম্ভব। দারিদ্র্যের কারণ মানুষের শক্তির অভাব নয়—আসলে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিগত অধিকার ও তাদের লাভের জন্য ইচ্ছামত ধনোৎপাদন ইত্যাদি সমাজের আর্থিক ব্যবস্থাগুলিই অভাব সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কথা স্মরণ রাখতে হবে। সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর আদর্শে উত্তরাধিকার প্রথার স্থান নেই কিন্তু তার পরিবর্ত্তে প্রত্যেকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থার জন্য সমাজের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে। আর্থিক সমতার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অবসরের অধিকার, শিক্ষার সমান সুযোগ ইত্যাদি কতকগুলি ধারণা এই মতবাদের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে। সোশ্যালিষ্ট্‌ সমাজ সম্পূর্ণভাবে গঠিত হবার পর ব্যক্তিবিশেষের অধিকার থাকবে না অথচ সুব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকের পক্ষেই আপনার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হ'য়ে উঠবে এই আশা করা হয়। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ

ও সুকুমার বৃত্তিগুলি হয়ত তখন আর অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না।

সোশ্যালিজ্‌ম্ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ববাদের পরিপন্থী নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মাত্র কতকগুলি লোকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর—নূতন ব্যবস্থাতেই জনসাধারণের পক্ষে সে পথ প্রথম উন্মুক্ত হবে।

সোশ্যালিষ্ট্ আদর্শের আর ছু'টি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি এই যে, সমাজের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার ভার থাকবে জনসাধারণের উপর—গণতন্ত্রের মূলসূত্র শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকবে না, প্রাত্যহিক কর্ম্মজীবনেও তাকে প্রচলিত করতে হবে। কি উপায়ে যে এই আদর্শ কার্য্যকরী হ'তে পারে সে সম্বন্ধে সোশ্যালিষ্ট্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই এক বিশ্বাস যে, অন্ততঃ নূতন সমাজ গ'ড়ে উঠবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। এক অশেষপরাক্রান্ত শাসকের ইঙ্গিতে শ্রেণীভেদ ও দারিদ্র্যের অবসান কল্পনায় সম্ভব হ'লেও তাকে পূর্ণ সোশ্যালিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, সোশ্যালিজ্‌ম্ এক দেশের ব্যাপার নয়। ধনতন্ত্রের কল্যাণে এখন সমস্ত পৃথিবী এক সূত্রে যুক্ত, একই আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। ভবিষ্যতে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য আর কোনো জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। একটি দেশে সোশ্যালিজ্‌ম্ গ'ড়ে উঠবার আগে সেইজন্য অন্ততঃ অন্য প্রধান দেশগুলিতে তার আবির্ভাব আবশ্যক। স্বাদেশিকতার মোহ কাটিয়ে ওঠা প্রকৃত সোশ্যালিষ্টের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সমস্ত বিশ্বকে স্বদেশ ভাবা ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

৫

সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্ভব কি অসম্ভব সে বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বিরোধী কয়েকটি যুক্তি ও সেগুলি খণ্ডনের চেষ্টার উল্লেখ না করলে তার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবশ্য এ তর্কের বিশদ আলোচনা সময়সাপেক্ষ।

অনেকে মনে করেন সোশ্যালিজ্‌ম্ সহৃদয় দুর্ব্বল লোকের দিবাস্বপ্ন মাত্র। এক সময়ে এ বর্ণনার মধ্যে কিছু সত্য ছিল কিন্তু এখন আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগ শেষ হ'য়ে গেছে। তাছাড়া মানুষের চিন্তারাজ্যে সাম্যভাব অতি প্রবল—যুগে যুগে তার প্রসার হ'য়ে এসেছে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা প্রথম ভগবানের কাছে ধনী নির্ধন উচ্চ নীচ সকল মানুষের সমভাবের কথা প্রচার করেন। ফরাসী-বিপ্লবের পর পোলিটিক্যাল্ সাম্যের

আদর্শ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক সমতা আনবাব চেষ্টা ক'বে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ সেই একই ভাবধাবাকে পূর্ণরূপ দিচ্ছে বলা যেতে পাবে।

সমাজে ধনিক-কর্তৃত্ব ও শ্রমিক-দাসত্ব অনেকেব কাছে সম্ভবতঃ অমূলক মনে হয়। এই বিশ্বাস সত্য হ'লে অবশ্য সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এব কোনো আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু প্রতিকাবেব উপায় যদি বা না থাকে তবু শ্রমিকদেব দুববস্থাব কথা তর্কে উডিযে দেওযা চলে না। শ্রমজীবীদেব অবস্থা যে বিশেষ উন্নত হয়েছে একথা বলাও শক্ত, হ'য়ে থাকলেও শ্রমিক আন্দোলনই তাব মুখ্য কাবণ। বাষ্ট্রশক্তিব নিবপেক্ষ বিচাবে অবিশ্বাসী সোশ্যালিষ্ট্‌দেব যুক্তি এই যে, শাসকসম্প্রদায় যে তাদেব শ্রেণীগত স্বার্থ পবিহাব কবতে পাববে তাব স্থিবতা কোথায়? অসন্তোষ থাকলে আন্দোলনও অবশ্যম্ভাবী।

এ অভিযোগও শুনতে পাওয়া যায় যে, সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ক্ষুদ্র স্বার্থ, ঈর্ষা ও সাংসাবিক বুদ্ধি দ্বাবা প্রণোদিত। কিন্তু ধনতন্ত্রেব ব্যবস্থাব মধ্যে নিঃস্বার্থতাব কোনো প্রমাণ পাওয়া দুর্লভ। শ্রেণীস্বার্থ যদি নিছক কল্পনাপ্রসূত না হয তবে এই সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ কবাই শ্রেয—মাযা ও মোহেব আববণ এক্ষেত্রে ধনতন্ত্রেব আত্মবক্ষাব উপায়মাত্র। ব্যক্তিবিশেষেব স্বার্থত্যাগেব উদাহবণ বিবল নয বটে কিন্তু সোশ্যালিষ্ট্‌দেব বিশ্বাস যে, একটি সমগ্র শ্রেণীব স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে স্বার্থ-বিসর্জ্জনেব দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওযা যায না।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিব নিয়মেব বিবোধী এই বিশ্বাস খুবই সাধাবণ। কিন্তু মানুষেব স্বভাব ব'লে একটা অপবিবর্ত্তনীয চিবন্তন পদার্থ আছে কিনা বিবেচ্য। যুগে যুগে মানব-চবিত্র ও লোকমত যে ঠিক অবিকৃত থেকে যায় এ কথা বলা চলে না। প্রচাব, শিক্ষা, নেতৃত্ব ইত্যাদিব সাহায্যে মানুষেব দৃষ্টিভঙ্গীব পবিবর্ত্তন সোশ্যালিষ্ট্‌দেব কাছে দুরূহ মনে হয না। তাঁবা বলেন যে, ইউবোপে মধ্যযুগ ও আধুনিককালেব মধ্যে মতামতেব বিপুল পার্থক্য তাঁদেব এই আশাব সমর্থন কবে।

সোশ্যালিষ্ট্‌ আন্দোলনেব বিরুদ্ধে শেষ আপত্তি এই যে, এতে এক অমঙ্গলেব বদলে আসবে আবেক অমঙ্গল। শেষ পর্য্যন্ত নূতন ব্যবস্থাতে মানুষেব কোন স্থাযী কল্যাণ হবে না। ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয; সুতবাং এ কথা প্রমাণ বা অপ্রমাণ কবা অসম্ভব। যাঁবা অনিশ্চিতেব ভয়ে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা শ্রেয মনে কবেন তাঁদেব পক্ষে এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তু দু' ধবণেব লোক এতে সন্তুষ্ট থাকতে পাবে না। এক, যাদেব, মার্ক্সেব ভাষায, পৃথিবীতে শৃঙ্খল ছাড়া হাবাবাব কিছু নেই; আব, যাদেব চিন্তা ববাববই দুঃসাহসিক।

৬

আধুনিক ইতিহাসে তিনটি মত পাওয়া যায় সোশ্যালিষ্ট্ নাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যাদের সোশ্যালিজ্‌ম্-এর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কেন চলে না সে কারণ নির্দ্দেশ করলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতর হ'তে পারে।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে ক্রীশ্চান্ সোশ্যালিজ্‌ম্-এর উৎপত্তি হয়। পরে অন্যান্য দেশেও অনুরূপ দলের সৃষ্টি হয়েছিল। ধনিক ও শ্রমিকের অবস্থার পার্থক্যে ব্যথিত হ'য়ে কিংস্লি, হিউস্ প্রমুখ নবীন লেখকেরা ধনিকদের সংশোধনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন—যিশুর উপদেশের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা ছিল তাঁদের প্রধান অস্ত্র। ক্রীশ্চান্ সোশ্যালিষ্ট্‌দের শতচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ধনতন্ত্রের বিরোধী হয় নি; ধনিকদের মন-পরিবর্ত্তনের চেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। শ্রমিক-আন্দোলনের ভিত্তি কোন ধর্ম্মমতে নয়, শ্রমিক-শ্রেণীর আত্মপ্রত্যয়ই তার মূল।—এর থেকে নিঃসন্দেহ এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

জার্ম্মাণীতে যখন সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাট্ দল বিশেষ ক্ষমতাশালী হ'য়ে ওঠে তখন দমন-নীতি ব্যর্থ হওয়াতে বিস্‌মার্ক্ অন্য পথ অবলম্বন করলেন। তিনি ষ্টেট্ থেকে শ্রমিকদের উপকারের জন্য নানারকম বীমার সৃষ্টি ক'রে সদয় ব্যবহারে শ্রমিক-আন্দোলনের উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্ভাবিত হিতসাধনপদ্ধতিকে তখন ষ্টেট্-সোশ্যালিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, অন্য দেশেও অল্পবিস্তর সে চেষ্টা হয়। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে, বিস্‌মার্কের পন্থাকে সোশ্যালিজ্‌ম্ বলা চলে না কারণ ধনতন্ত্র বজায় রেখে শ্রমিকদের ছোটখাট উপকার সাধনের চেয়ে সোশ্যালিজ্‌ম্-এর উদ্দেশ্য অনেক বেশী ব্যাপক।

সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে ফ্যাসিষ্ট্‌রা ন্যাশনাল্ সোশ্যালিষ্ট্ বা নাজি আখ্যা গ্রহণ ক'রে অতি দ্রুত গতিতে ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠ্‌ছে। আসল সোশ্যালিষ্ট্ ও কমিউনিষ্ট্‌দের সঙ্গে অবশ্য তাদের অহিনকুলের সম্পর্ক। মুসোলিনীর পন্থা অনুসরণ ক'রে এই ফ্যাসিষ্ট্‌রা কেন যে আজ পর্য্যন্ত সোশ্যালিষ্ট্ নাম বর্জ্জন করে নি বোঝা শক্ত। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এদের সোশ্যালিজ্‌ম্-এর পংক্তিতে ফেলা অনুচিত। শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ সোশ্যালিজ্‌ম্-এর মূলমন্ত্র, কিন্তু নাজিদের উদ্দেশ্য দেশের লুপ্তগৌরবোদ্ধার ও নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি-প্রতিষ্ঠা। জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট্‌দলের নামে জাতীয় ও সোশ্যালিষ্ট্ এই দুটি অংশ পরস্পর বিরোধী।

৭

আদর্শ-প্রতিষ্ঠার প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ, নানা দেশের আর্থিক অবস্থাগত পার্থক্য, জাতিগত বিশেষত্ব, ভিন্ন ভিন্ন নেতার প্রভাব—ইত্যাদি

নানা কারণে সোশ্যালিষ্ট্‌রা বহু দলে বিভক্ত। কিন্তু উপরে যে মূলসূত্রগুলি আলোচিত হয়েছে সকল দলই সে গুলির সম্বন্ধে একমত বলা যেতে পারে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর পাঁচটি প্রধান শাখা আছে—ইংরাজিতে তাদের নাম —Collectivism, Syndicalism, Guild Socialism, Communism, Anarchism. এদের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নেই। কাজ চালাবার জন্য কতকগুলি কথা ব্যবহার করা যেতে পারে—সমষ্টিবাদ, সমিতিতন্ত্র, সঙ্ঘতন্ত্র, সাম্যবাদ ও নৈরাজ্য।

সমষ্টিবাদে ভবিষ্যৎ সমাজের চালকরূপে কল্পিত হয়েছে বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক মতে গঠিত বিরাট রাষ্ট্রশক্তি। এই নূতন রাষ্ট্র জনসাধারণের সমষ্টি—তারই হাতে রাজনৈতিক ও আর্থিক সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। নূতন সমাজ গঠনের উপায় হচ্ছে অহিংসভাবে জনসাধারণের মধ্যে নূতন আদর্শের প্রচার ও ধীরে ধীরে আইনসঙ্গত উপায়ে সংস্কার। ইউরোপে সাধারণতঃ এই বিশেষ মতটিকে সোশ্যাল্‌ ডিমোক্র্যাসি আখ্যা দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় কোনো বিপুল শক্তি-স্থাপনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই সমিতিতন্ত্রের মূল কথা। ফরাসী syndicat কথাটি শ্রমিক-সমিতির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। সিণ্ডিক্যালিষ্ট্‌ মতবাদে ভবিষ্যৎ সমাজে প্রত্যেক ব্যবসায়ের পরিচালন সেই কাজে লিপ্ত শ্রমিকদের হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারই থেকে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ নামের উৎপত্তি। শ্রমিক ভিন্ন অন্য সকলের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ এবং দেশব্যাপী বিরাট ধর্ম্মঘটের সাহায্যে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের সঙ্কল্প সমিতিতন্ত্রের বিশেষত্ব।

সঙ্ঘবাদ উপরোক্ত মত দুটির সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগে ইউরোপে যে গিল্‌ড্‌ বা সঙ্ঘের কথা শোনা যায় তারই নামে এই মতটির নামকরণ হলেও আসলে আদর্শটি নূতন। সমাজের প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য পৃথক একটি শ্রমিক-সঙ্ঘের কল্পনা করা হয়েছে—ভবিষ্যৎ সমাজ এক অসীম পরাক্রান্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির পদানত থাকবে না, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ মালার মত একসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে নূতন সমাজের সৃষ্টি করবে। কিন্তু কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সুসম্পাদন ও সঙ্ঘগুলির মধ্যে বিরোধ নিবারকণের জন্য কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন সঙ্ঘবাদ স্বীকার করে। শ্রমিক সমিতিগুলিকে পূর্ণ সঙ্ঘে পরিণত করবার চেষ্টাই এই দলের কার্য্যপ্রণালী। ভবিষ্যৎ বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে গভীর মৌলিক চিন্তা ও অভিনব প্রস্তাব সঙ্ঘবাদের একটি বৈশিষ্ট্য।

সাম্যবাদ মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর মতের লেনিন্‌কৃত টীকার উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যেতে পারে। রুষ-বিপ্লবের পর এই মতবাদ সাফল্য-গর্ব্বে মণ্ডিত ও সুপরিচিত হ'য়ে পড়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কর্ম্মপদ্ধতিতে। সাম্যবাদ

অনুসাবে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ধনতন্ত্রেব ধ্বংস অসম্ভব এবং বিপ্লবেব পব শ্রমিক-শ্রেণীব একাধিপত্যেব ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এই কর্ত্তৃত্ব অবশ্য সাম্যবাদী দলেব হাতে ন্যস্ত থাকবে কিন্তু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রে পূর্ণ পবিণতি লাভ না কবা পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাব অবকাশ নেই। বাশিযাতে উদ্ভাবিত সোভিযেট্-সমিতি বর্ত্তমান সাম্যবাদেব অঙ্গীভূত হযেছে এ কথা বলা বাহুল্য।

নৈবাজ্যবাদকে সোশ্যালিজ্ম্-এব শাখা বলাতে আপত্তি হ'তে পাবে কেননা এই মতেব সঙ্গে অন্য দলগুলিব একটা প্রাচীন দ্বন্দ্ব আছে। কেন্দ্রীয় বা অন্য যে-কোনরূপ শাসক-শক্তিব প্রযোজন অস্বীকাব কবাই নৈবাজ্যেব প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রেণীভেদ না থাকলে ষ্টেটেব অস্ত্রবল ছাড়াও সমাজেব সকল কাজ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হ'তে পাবে এই বিশ্বাস নৈবাজ্যবাদীদেব মজ্জাগত। এঞ্জেল্স্-এব ভাষায় কিন্তু সোশ্যালিষ্ট্ বিপ্লবেব পব বাষ্ট্রশক্তি ক্রমশঃ আপনা হতেই লোপ পেতে বাধ্য। এই মত সত্য হ'লে স্বীকাব কবতে হয যে, সাম্যতন্ত্রেব পবিণতি নৈবাজ্যে।

সোশ্যালিজ্ম্ প্রতিষ্ঠাব উপায় সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যতেব সমাজ-পবিচালনেব জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিব স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থেকেই এই ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলিব উৎপত্তি। কিন্তু মূলসূত্রেব কথা আলোচনা কবলে দেখা যায় এই বিভিন্ন মতগুলিব ভিতব একটি গভীব ঐক্য আছে।

শ্রীসুশোভন সবকাব

আধুনিক নাট্য-প্রসঙ্গ

যুরোপের আধুনিক নাট্যসমালোচনার সঙ্গে যিনিই সুপরিচিত, তিনিই প্রায় শোনেন যে রঙ্গালয়ের এখন শনির দশা। আসলে যুরোপীয় নাটকের ইতিহাসে, সেনেকার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, কখনো এমন যুগ ছিলোনা, যখন এই সঙ্কট দেখা যায়নি। অবশ্য দুর্দ্দশার অবস্থাভেদ আছে। কখনো কখনো, যেমন ফরাসী রোমান্টিকদের বাহুল্যপ্রিয় যুগে, নাট্যশালা অতিভোজনের কুফল ভোগ করে; আবার মাঝে মাঝে, যেমন আজকে, সে দক্ষিণদুয়ারের অতিনিকটে এসে পড়ে। এরকম সময়ে যমদূতের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে হ'লে, চোখ বুজে মৃত্যুর ভান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। কয়েক বছর আগে তার অবস্থা আরো অপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো; সকলে ভয় পেয়েছিলো যে নির্ব্বাক ছবির আক্রমণে বুঝিবা তার চিহ্নমাত্র বাকি থাকবেনা। তখন কিউবার মতো দু-একটা দেশের নাম করা হতো, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে বসেছিলো। যুরোপের বড় বড় সহরে নাট্যমন্দিরগুলো তো সিনেমায় রূপান্তরিত হচ্ছিলোই, এমন-কি জায়গায় জায়গায় অতিকায় চিত্রপ্রাসাদগুলোকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে অনেক রঙ্গালয়ই ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। অবশেষে যখন মনে হলো, এই প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা তার সাধ্যে আর কুলাবেনা, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সবাক ছবির প্রাদুর্ভাব তাকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুললে।

সিনেমার প্রবেশমূল্য সস্তা এবং বাড়িগুলি শ্রান্তিবিনাশক; কিন্তু কেবল এই দুটি কারণেই সিনেমা দিগ্বিজয়ী হয়নি। তাছাড়া সিনেমাছবি-মাত্রকেই খুসিমতো ছাপা ও বিনাহাঙ্গামে চালান দেওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে যেটুকু শিক্ষা বা যেরকম আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হতে পারে, তা একটা সঙ্কীর্ণ পল্লীতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য, কিন্তু সিনেমার ব্যাপ্তি প্রায় অপরিসীম। ভাষার বাধা, এমন-কি নিরক্ষরতা অবধি, তার পথরোধে অক্ষম। আষ্টপ্রহরিক অভিনয়, নৈঃশব্দ্য, নবতন ইমারতের অপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিশেষত অন্ধকারে সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের সুযোগ এবং চিত্রবস্তুর নির্ভারতা, প্রধানত এই কটা বৈশিষ্ট্যই তার সাফল্যকে স্থায়ী ও সংহত ক'রে তুলেছে।

উপার্জ্জনের দিক দিয়ে রঙ্গালয় যদিচ সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনা, তবু এইটাই তার উপস্থিত দুরবস্থার একমাত্র কারণ নয়। একটা মজ্জাগত ত্রুটি তাকে চিরদিনই পীড়া দিয়ে এসেছে: তাঁর আকার আয়তন, ব্যবস্থাপক প্রযোজক, নট নটী, মিস্ত্রি মজুর, এ-সমস্তই স্থিতিস্থাপকতার

পবিপন্থী, এবং এদেবি জন্যে সে আজ রুচিপবিবর্ত্তনেব সঙ্গে পাল্লা দিতে অপারগ। অবশ্য দারুণ দুঃসময়ে ছাড়া নাট্যশালা কখনো সাধাবণ রুচিব পদানত হয়নি, কিন্তু তাহলেও তাব আর্থিক ইতিহাসে এই রুচিই মুখ্যপাত্র। সাহিত্যবিচাবে সাধাবণ পাঠকেব যতটা মূল্য, নাট্যানুষ্ঠানেব সার্থকতা-পবিমাপে সাধাবণ দর্শকও তদনুরূপ হতে পারে, তবু কোনো-না-কোনোখানে নাটক ও যথার্থ নাট্যামোদীব মধ্যে একটা রহস্যময় যোগসূত্র আছেই আছে। ফলে নাট্যামোদীব রুচি যেমন নাট্যশালাব প্রভাবে গ'ড়ে ওঠে, তেমনি নাট্যশালাও নাট্যামোদীব বশবর্ত্তী হযে পড়ে। আসলে নাটকের সঙ্গে সাহিত্যেব প্রভেদটা অন্য গোত্রেব। সাহিত্য বচিত হয় বাসগৃহেব নীবব নির্জ্জনতায, যে-নামহীন জনতাকে সে ডাক দেয়, তাব অস্তিত্ব হয়তো না-ও থাকতে পারে। কিন্তু নাটক ও দর্শকেব সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, এমন-কি ব্যক্তিগত; মানুষ আপনাব অজ্ঞাতসাবে শিল্পসৃজনে সমর্থ কি-না, তাব একটি চমৎকাব দৃষ্টান্ত মিলে এই নাটক-দর্শকেব ক্রিযা-প্রতিক্রিযায়।

উপবে নাট্যকলাব যে-সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কবলুম, তাব বযস আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসব। সেই সময়ে বের্লিনেব লেসিঙ্‌ থিয়েটাব মাইনিঙ্গাব-নামে দুই ভায়েব হাতে আসে। তাঁবা দুজনেই একনিষ্ঠ পবীক্ষাপন্থী ছিলেন; এবং উভয়েই সঙ্কল্প কবেছিলেন যে নাটুকেপনাব বাড়াবাড়ি ও বক্তৃতাব বাহুল্য থেকে ম্রিয়মাণ নাট্যকলাকে উদ্ধাব কববেন। ফলে তাঁবা একটি অভিনব নাট্যপ্রণালীব উদ্ভাবনে লেগে গেলেন, এটি হলো বাস্তবিকতাব পবিবেষ্টনে ফেলে নাট্যকাবেব অভিপ্রাযকে বাস্তব উপায়ে ব্যাখ্যা কবা। প্রতিবিম্বনশিল্পমাত্রেই তখন ওই দিকে ঝুঁকেছিলো। কিন্তু তাঁদেব সদুদ্দেশ্য সাময়িক এবং পদ্ধতি উপযুক্ত হ'লেও. মাইনিঙ্গাব-ভ্রাতাদেব প্রতিভা অতিমাত্রিক ছিলোনা। তাই তাঁদেব প্রভাব একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েই আবদ্ধ থেকে গেলো। এই ছোট দলটি তাঁদেব যথেষ্ট পবিমাণে শ্রদ্ধা কবতো বটে, কিন্তু অনুপ্রাণিত কবতে পাবেনি, কাবণ সেজন্যে প্রয়োজন সর্ব্বসাধাবণেব সমর্থন। সে যাই হোক, স্বদেশে উপযুক্ত সম্মানে বঞ্চিত হ'লেও, সৌভাগ্যক্রমে বিদেশে তাঁদেব প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়লো; এবং তখন সর্ব্বত্রই যেহেতু সুমনা নাট্যশিল্পীবা সামযিক অসঙ্গতিব প্রতিবাদে বদ্ধপবিকব হয়েছিলেন, তাই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁবা বহুসংখ্যক সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী পেতে লাগলেন। ফবাসীদেশে আঁতোয়ান-নামে একজন তরুণ নট ও নাট্যকাব তাঁব অভিনেতাদেব মাইনিঙ্গাব-প্রথায় দীক্ষিত কবলেন, এবং অচিবে যখন তেযাত্র্‌ লিব্র্‌-নামে একটি নতুন রঙ্গালয়েব প্রতিষ্ঠা হলো, তখন সেকালকাব সমস্ত সাহিত্যফৌজ সেই

অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্ম্মানি উভযত্রই কাজ চলতে লাগলো অবৈতনিক ভাবে, কেমন যেন একটা অনিশ্চিত পবীক্ষার আবহাওযায। বোঝা গেলো সে-অবস্থায় পেশাদাব অভিনেতা ও পবিচালকেব মৌবসী হাতযশেব সঙ্গে টক্কব দেওয়াব চেষ্টা দুবাশামাত্র। ঠিক এই মুহূর্ত্তে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি ও নেমিবোভিচ-দান্‌শেঙ্কো-নামে দুজন রুষ আসবে নামলেন। আধুনিক নাট্যজগতেব এই দুটি গ্রহপতিব নাম নাট্যকলাব ইতিহাসে চিবস্মবণীয।

ষ্টানিশ্লাভ্স্কিব জন্ম মস্কোব সেই সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠীদেব ঘবে যাবা তাদেব জন্মভূমিব শিল্পসৃষ্টিতে ও পবিশীলনবর্দ্ধনে বোমের অভিজাত প্যাট্রিশিযনদেব মতোই অগ্রগণ্য। ষ্টানিশ্লাভ্স্কি দেশভ্রমণকালে মাইনিঙ্গাব-ভ্রাতাদেব সংসর্গে আসেন, এবং তাঁদেব পদ্ধতিকে সাদবে গ্রহণ ক'বে, প্যাবিসে আঁতোযানেব সহায় হন। তাঁব উপজীবিকা ছিলো একটা প্রকাণ্ড তাঁতশালাব পবিচালনা, কিন্তু তাঁব সমস্ত অবসরটুকু মস্কোব 'ললিতকলা সমিতিব' নাট্যবসিক সভ্যদেব অভিনয়শিক্ষায উৎসর্গিত হতো। অল্প দিনেই তিনি উচ্চাঙ্গেব অভিনেতা ব'লে খ্যাত হয়ে পড়লেন; এমন-কি সবকারী নাট্যানুষ্ঠানগুলিব কর্ত্তৃপক্ষদেব বহু আমন্ত্রণও তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবতে হলো। শুধু নিজেব সম্প্রদাযেব প্রতি অত্যধিক আসক্তিই এ-প্রত্যাখ্যানেব একমাত্র কারণ ছিলোনা; উপবন্তু সেকালেব নাট্যজগৎ যে-আত্মম্ভবিতা, কুৎসা ও নীতিশৈথিল্যেব আশ্রয়স্থল ছিলো, সেখানে তাঁব মন স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ কবতো।

নেমিবোভিচ-দান্‌শেঙ্কোব উদ্ভব আবমিনিযাব এক রুষপবিবাবে। তিনি তিফ্‌লিস্ থেকে সদ্য এসেই একগুচ্ছ সামাজিক নাটকেব সাহায্যে আপনাব ব্যক্তিস্বরূপকে নাট্যকেন্দ্রগুলিতে সুপ্রকাশ ক'বে তুললেন, এবং অপবিসীম বৈদগ্ধ্যেব গুণে অচিবেই মস্কোব ইম্পিবিযাল্ লিট্‌ল্ থিযেটাবে সাহিত্যমন্ত্রীব পদে নিযুক্ত হলেন। তখনকাব দিনে এই অনুষ্ঠানটি গতানুগতিক শিল্পেব আদর্শস্থল তো ছিলো বটেই; এমন-কি সোভিয়েৎ কর্ত্তাদেব কাবো কাবো বৈবিভাব সত্বেও, আজ পর্য্যন্ত সে-সম্মান তারি প্রাপ্য। এই নাট্যমন্দিবটিব সর্ব্বাঙ্গীন উচ্চাদর্শেব ও ধ্রুপদী সুরুচিব তুলনা একমাত্র কোমেদি ফ্রঁসেজ্-এই পাওযা সম্ভব। সে যাই হোক, নেমিবোভিচ নাট্যকলাব ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পাবলেননা; তাঁব মনে হলো যে তাঁব নিজেব নাট্যমন্দিবেই সে-শিল্পেব অন্তঃকাল ঘনিয়ে আসছে; তিনি যেন দেখতে পেলেন যে এটি একটি সুসজ্জিত ঘোড়াব মতো—খাটো দড়িতে বাঁধা প'ড়ে তার চলচ্ছক্তি হারিযে গেছে; আহার্য্য-সংগ্রহেব ক্ষমতা নেই ব'লে, আজ নিজেব মবা মনই হয়ে উঠেছে তাব

একমাত্র উপজীব্য। ফলে নাট্যসংস্কাবেব ধ্রুব সঙ্কল্প তাঁকে পেয়ে বসলো ; তাঁব মনে হলো, এখনো সময আছে, চেষ্টা কবলে এখনো হয়তো নাট্যকলা প্রত্নতত্ত্ববিদেব আলোচ্যবস্তু না-ও হযে উঠতে পাবে।

আশ্চর্য্যেব বিষয এই যে, নেমিবোভিচ যদিও মস্কোব বাসিন্দা ছিলেন, তবু ষ্টানিশ্লাভ্স্কিব নাম তিনি শোনেননি ; ভদ্রপবিবাব থেকে অভিনেতা সংগ্রহ ক'বে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি যে অবৈতনিক নাট্যসমিতিব প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন, তাও তাঁব অবিদিত ছিলো। সে যাই হোক, মধ্যস্থ বন্ধুবা দুই পক্ষেব পবিচয় ঘটিযে দিলে, এবং ষ্টানিশ্লাভ্স্কি-সন্দর্শনে নেমিবোভিচ একদিন মস্কোব সহবতলীব এক প্রকাণ্ড আস্তাবোলে উপস্থিত হলেন, যেখানে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি তাঁব অভিনেতাদেব মহলা দেওযাচ্ছিলেন। সেবাবে আলাপ জমলোনা, কিন্তু বিদাযকালে পুনর্ম্মিলনেব ব্যবস্থা হলো। দ্বিতীয সাক্ষাৎ ঘটলো মস্কোব এক হোটেলকামরায। একসঙ্গে নৈশ ভোজন সেবে, তাঁবা এক দুর্গন্ধ ঘবে গিয়ে কথা সুরু কবলেন ; এবং সাবা বাত চ'লে, নাট্য-উজ্জীবনেব আলোচনা যখন শেষ হলো, তখন দুজনেই দেখে চমকে গেলেন যে ইতিমধ্যেই সূর্য্যোদয হযেছে। এই সুদীর্ঘ বিশ্রম্ভালাপেব ফলেই মস্কো আর্ট থিযেটাবেব সম্ভব।

উক্ত ঘটনাব বর্ণনায আমি ইচ্ছা ক'বেই এত সময অতিবাহিত কবলুম, কাবণ ওব কল্যাণে যে-মহান নাট্য-উদ্যোগেব সূত্রপাত, তাব সমকক্ষ কোনো যুগেই মিলবেনা। কথাটা যদিও হেঁয়ালিব মতো শোনায, তবু তাঁবা যে-নাট্যকলাব জন্মদাতা, সেই নাট্যকলাই, নানাবকম অবস্থান্তব ও উষ্ণমস্তিষ্ক তরুণদলেব বিরুদ্ধাচবণ সত্বেও, আজ পর্য্যন্ত একমাত্র আধুনিক, এমন-কি একমাত্র সম্প্রতিবিদ, অভিনয়শিল্প। তিনটি মূলসূত্রেব সাহায্যে তাঁবা নাট্যকলাব মুক্তিবিধান কবেন, এবং মর্য্যাদায এদেব প্রত্যেকটিই সমান। এই তিনটি সূত্র হচ্ছে অকৃত্রিম শিল্পসেবা, নাট্য-জগতেব নৈতিক সংস্কাব, এবং ব্যাবসাযিক সাফল্যেব সুব্যবস্থা। শেষোক্ত বিষযে সমবায-আদর্শ-অনুসাবে প্রত্যেক কর্ম্মীকেই মুনাফায় ভাগ দেওয়া হতো। অকৃত্রিম শিল্পসেবা বলতে তাঁবা বুঝতেন দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত সাধনা, যাব দ্বাবা অভিনেতা কেবল নাট্যকাবেব অভিপ্রাযকে নয, তাঁব প্রত্যাদেশকে সুদ্ধ মূর্ত্ত কবতে পাবে। এই উদ্দেশ্যে অভিনেয় যুগেব প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধে গভীব গবেষণা ক'বে, তবে দৃশ্যপট ও পবিচ্ছদাদি নির্ব্বাচিত হতো। ষ্টানিশ্লাভ্স্কি ধাবালো ভাষায বলতেন, শ্রেষ্ঠ শিল্পই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পণ্য, এবং এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে তাঁবা স্থিব কবেছিলেন যে তাঁদেব উদ্যোগে দৈবদুর্ঘটনাব কোনো অবকাশ বাখবেননা। সুতবাং কোনোখানে তাঁদেব ঔদাসিন্য ছিলোনা ; সাজসজ্জা থেকে আবম্ভ ক'বে প্রচ্ছদপবিচ্ছদ

অবধি সমস্ত খুঁটিনাটিকে, সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপাবকে তাঁবা সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁদেব প্রবর্ত্তিত নৈতিক সংস্কাব ছিলো ব্রহ্মচর্য্যেব মতো কঠোব; অভিনেতাদেব কর্ত্তব্যকর্ম্ম থেকে তাদেব পবস্পবেব সম্পর্ক পর্য্যন্ত সমস্তই সে-বিধানের অন্তর্গত। কিন্তু তাহ'লেও এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পবিণত কবতে বেশি কষ্ট লাগেনি, কারণ তাঁবা ছিলেন উৎসাহী কর্ম্মীব দ্বাবা পবিবৃত; এবা সকলে তো কৃতবিদ্য ছিলোই, এমন-কি অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়েব পূর্ব্বতন ছাত্র। নেমিবোভিচ নিজে অভিনেতা না-হ'লেও, অপূর্ব্ব শিল্পী ছিলেন। ষ্টানিশ্লাভ্স্কিব প্রতিভা ও ব্যক্তিস্বরূপ মহত্তব হওয়াতে মস্কো আর্ট থিয়েটাবেব উদ্যোক্তা-হিসেবে নেমিবোভিচেব খ্যাতি আজকে আওতায় প'ড়ে গেছে। কিন্তু এটা নিতান্তই অদৃষ্টেব পবিহাস, কারণ নেমিবোভিচ কেবল উক্ত অনুষ্ঠানেব ব্যাবসায়িক দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েই তুষ্ট হননি, উপবন্তু এই কাজে তাঁব যতটুকু ছুটি মিলতো, সে-সমস্তই তিনি অতিবাহিত করতেন শিল্পবিভাগে ষ্টানিশ্লাভ্স্কিব সাহচর্য্যে।

তাঁবা দুজনেই অন্তবে অন্তবে অনুভব কবেছিলেন যে অভিনয়শিক্ষায় একটা নূতন পন্থা আবিষ্কৃত না-হ'লে, নাটককে বঙ্গালয়েব বাঁধা কথা ও সাধা প্রথাব অত্যাচাব থেকে মুক্ত কবা অসম্ভব। এই সঙ্কল্পে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি যে-পদ্ধতিব উদ্ভাবন কবেন, রুষদেশে তা 'সিষ্টেমা'-নামে প্রসিদ্ধ। এই অদ্ভুত নাট্যবেদ মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাপনাবিধিব নূতন তথ্যগুলিকে ভিত্তি ক'বে গ'ড়ে ওঠে, এবং গত পঁয়ত্রিশ বৎসব যাবৎ বিজ্ঞানবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হয়ে, অবশেষে একটা অপূর্ব্ব অনুকম্পনেব আধাবে পবিণত হয়। এই সটীক অনুশাসনে জনৈক মনীষী দেখিয়ে দিয়েছেন শিল্পজীবনে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেব প্রয়োগ কোথায় ও কেমন ক'বে। ষ্টানিশ্লাভ্স্কিব পদ্ধতিই অভিনয়শিক্ষাব অনন্যপন্থা, তাব সংযম যোগাভ্যাসেব মতোই কঠোব। তিনি 'আমাব শিল্পজীবন'-নামে যে-বিস্ময়কব আত্মজীবনী ছ বছব আগে আমেবিকায় প্রকাশ কবেন, এবং যাব মূল সম্প্রতি রুষদেশে বাহিব হয়েছে, সে-গ্রন্থে উক্ত নটযোগেব আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিবন্ধখানি মস্কো আর্ট থিয়েটাবেব সম্পত্তি। অভিনেতামাত্রেই সেখানিব সঙ্গে সুপবিচিত বটে, কিন্তু নটসমাজেব ব্যূহবদ্ধ একাত্মবোধ বইখানিকে এখনো অনধিকাবীব কাছ থেকে গোপন বেখেছে।

উক্ত পদ্ধতিব সাব কথা হচ্ছে অভিনেতাব ব্যক্তিত্বকে ভূমিকায় সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিয়ে, নট ও নাটকেব মধ্যে প্রায় একটা মবমী সম্বন্ধ স্থাপন কবা। ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে একটা আধ্যাত্মিক উপমা ধাব ক'বে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি বলেছেন, যেমন অসমাপ্ত কর্ম্মেব মধ্যে মবলে আবাব সেই কর্ম্মেই পুনর্জ্জন্ম হয়, তেমনি ভূমিকাব সাযুজ্যে যে প্রাণবিসর্জ্জন কবতে

পাবে, কেবল সেই নটই সঞ্জীবিত হযে ওঠে নাটকেব চবিত্ররূপে। যে-অনুশীলনেব দ্বাবা ব্যক্তিত্ববন্ধন থেকে অভিনেতাব মুক্তি সম্ভব, তিনি তাব নাম দিয়েছেন "এতুদ্"—অর্থাৎ সাধনাভ্যাস। এই উপাযেই সে কালক্রমে নিজেকে ভুলে, নাট্যোল্লিখিত চবিত্রে অবতীর্ণ হয। দৃষ্টান্ত-হিসেবে বলা যেতে পাবে যে কোনো বমণী যদি তাব দেহসৌষ্ঠব ও গমনগবিমাব গুণে লেডি ম্যাকবেথ-ভূমিকার জন্যে নির্ব্বাচিত হয়, তবু প্রথমেই তাকে শেক্‌স্পীয়বেব পঙক্তিগুলি আবৃত্তি কবতে দেওয়া হযনা। স্থুকতে প্রযোজকসূচিত কতকগুলো দৃশ্যে সে নিজেব আচাবব্যবহাবকে আয়ত্ত ক'বে নেয। এই দৃশ্যগুলোব সঙ্গে মূলনাটকেব কোনো সম্পর্ক থাকেনা, কেবল কতকগুলো প্রাত্যহিক অবস্থাব মধ্যে দিয়ে সে দেখায, প্রকৃতপক্ষে লেডি ম্যাকবেথ হ'লে, সে কি ক'বে দবজা খুলতো, শুতে যেতো, জানলা দিযে মুখ বাড়াতো। শিক্ষক যদি এতে সন্তুষ্ট হন, তবেই সে আসল নাটকে প্রবেশাধিকাব লাভ কবে, এবং এই পবিবেষ্টনে স্ববচিত বাক্যব্যবহাবে আবো কিছু কাল অভিনয শেখে। ইতিমধ্যে বিশেষ যত্ন কবা হয় যাতে অতিপ্রযোগে শেক্‌স্পীয়বেব ভাষাব স্থকুমাব লাবণ্য নিষ্প্রভ না-হযে পড়ে।

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন নাট্যবিশাবদদেব সঙ্গে ষ্টানিশ্লাভ্‌স্কিব পার্থক্য এইখানে। তাঁদেব ধারণা ছিলো যে আগে থেকে কাগজে নক্সা ক'বে, নটমঞ্চকে ভিন্ন ভিন্ন নটগোষ্ঠীব মধ্যে ভাগ-বাটোযাবা ক'বে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ষ্টানিশ্লাভ্‌স্কি স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান ;—এই প্রযোজনা নটসমবায়েব একাত্মবোধ থেকে উৎপন্ন। মস্কো আর্ট থিয়েটাবেব সাহিত্যিক ও শিল্পবিষযক উচ্চাদর্শেব দিকে লক্ষ্য বেখে ব্যবস্থাপকমণ্ডলী যখন কোনো নাটক নির্ব্বাচন কবেন, তখন সে-নাটকে অভিনয়েব জন্যে কেবল এমন নট-নটী আহূত হয, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিব সঙ্গে যাদেব চাবিত্রিক ও দেহগত সাদৃশ্য আছে। তাব পর প্রযোজকেব সভাপতিত্বে এক গোলটেবিল বৈঠক বসে ; এবং সভাপতি দিনেব পব দিন বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবাব চেষ্টা কবেন নাটকখানিব ঐতিহাসিক ও সামাজিক পবিবেষ্টন কি এবং কোন মানসিক প্রশ্নেব উপবে সেটি প্রতিষ্ঠিত। যাতে ভাষ্যে গ্রন্থকাবেব অভিপ্রায যথাসাধ্য অবিকৃত থাকে, সেইজন্যে লেখক-বিশেষের সমগ্র বচনা সবিস্তাবে অধ্যয়ন ক'বে তবে প্রযোজক এই ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হন। তাব পবে স্থরু হয অভিনেতাদেব স্ব স্ব ভূমিকা-পাঠ। এই সময়ে পাঠ্য পুস্তক থেকে অন্যত্র দৃষ্টি ফেবানো, কোনো-বকমেব অঙ্গবিক্ষেপ কবা, অথবা মুখে কণ্ঠে অনুকবণেব আভাসমাত্র আনা একেবারে নিষিদ্ধ। জনবিবল নিঃশব্দ ঘবে এমনিতর গোটাকযেক বৈঠকেব পব হঠাৎ দেখা যায় যে অভিনেতাদেব আকাবে-ইঙ্গিতে, মুখে-

চোখে একটা অন্তর্দীপ্ত আবেগের প্রতিভাস ফুটে উঠতে সুরু করেছে। এই লক্ষণগুলো সুপ্রকাশ হতে হতে, ক্রমে এমন একদিন আসে যখন নটেরা স্বেচ্ছায় আসন ছেড়ে, আপনাদের ভবিষ্যৎ অনুষঙ্গ আপনারাই নির্দ্দেশ ক'রে দেয়। ইতিমধ্যে, পুষ্পবিলাসী যেরূপে কান পেতে ফুলের কেয়ারিতে প্রথম প্রাণসঞ্চারের সাড়া শোনে, ঠিক তেমনি ক'রেই প্রযোজক উদ্‌গ্রীব হয়ে এদের পরস্পরের ব্যবধান, পরম্পরার অঙ্গরেখা, হাবভাবের সঙ্কল্প, শ্রেণীবিভাগের স্বাভাবিকতা ইত্যাদির মধ্যে নাটকখানির পরিণত পরিকল্পনার উপাদান সংগ্রহ করেন। এই অবস্থা উপনীত হলে নটেদের পরস্পরের থেকে পৃথক ক'রে, পূর্ব্বোক্ত সাধনাভ্যাসে নিযুক্ত করা হয়। এই পৃথক্করণের দুটি উদ্দেশ্য: মহলায় স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রেণীবিন্যাস ও অঙ্গ-বিলাসকে সাধ্যমতো সহজ রাখা এবং স্বসমুত্থ বস্তুমাত্রার অনুগত থাকা। অভিনেতারা এসে যখন আবার একত্রে মেলে, তখন চিত্রশিল্পী তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রথম থেকেই চিত্রকর প্রযোজকের সংসর্গে থাকে; এইবার সে নিয়মিত ভাবে নটেদের বৈঠকে যোগ দেয়, তাদের বলা-চলার ভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে পোষাক বানায়, এবং নাটক সম্বন্ধে তাদের ধারণাকে অবলম্বন ক'রে, প্রচ্ছদপটে রঙ ফলায়। এই অঙ্গলীলা ও অনুষঙ্গের বিস্ময়কর উদ্ভবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য যার ঘটে, তারি মন শ্রদ্ধায় ভ'রে ওঠে; বোধ হয় যেন কোনো অধ্যাত্মনিষ্ঠ সাধুসম্প্রদায়ের সংস্রবে এসেছি, তাঁরা অন্তিম কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার প্রতীক্ষায় নীরব, নিশ্চল, ধ্যাননিরত।

পাঠকের বিরক্তিভাজন হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও উপরোক্ত ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে হলো। তার কারণ শুধু এ নয় যে উক্ত পদ্ধতিই নাট্যানুশীলনের একমাত্র প্রবেশিকা; উপরন্তু যে যাই বলুক, অভিনয়-শিল্পই আজ পর্য্যন্ত নাট্যপ্রযোগের প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া যুরোপের শিল্পপ্রাণ নাট্যমন্দিরমাত্রের অভিনয়শিক্ষাই এখনো ওই পথেই চলে। পূর্ব্ববর্ণিত অবহিত সাধনায় সিদ্ধি এতই সময়সাপেক্ষ যে প্রারম্ভে মস্কো আর্ট থিয়েটারের কোনো অভিনয়ই অন্তত ন মাসের কমে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতোনা। এই ঐকান্তিক চেষ্টা সদ্যস্তন অধীর নাট্যপ্রযোজনার সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকের দিনে যখন দুর্ভাগ্যক্রমে নগদ লাভই অধিকাংশ রঙ্গালয়ের একমাত্র লক্ষ্য, তখন আর ওধরণের প্রস্তুতির সময় থাকেনা। পাছে বহুঅভ্যাসের ফলে ভূমিকাগুলো নটেদের কাছে বাসি হয়ে দাঁড়ায়, তাই পাঠ মুখস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকখানিকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু মহলা চলে নেপথ্যে, কাজেই যে-অতিপ্রয়োজনীয় গুণের কথা প্রথমেই বলেছিলুম, অভিনেতাদের মধ্যে তার অভাব থেকে

যায়। অর্থাৎ বাক্যেব উচ্চাবণ ও ভাবেব অভিব্যক্তিব ক্রিয়া-প্রতিক্রিযায় নট ও দর্শকেব মধ্যে যে-সহযোগ স্থাপিত হওয়া উচিত, তাব চিহ্নও মিলেনা। জনশূন্য ও জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সমানভাবে অভিনয কবা কোনো সাত্ত্বিক নটেব পক্ষেই সম্ভব নয। যে-বহস্যময সৃষ্টিপ্রবাহ দর্শক ও অভিনেতাকে সংযুক্ত ক'বে দেয়, তাতে আতিশয্যের অবকাশ নেই। মনস্তত্ত্বেব বিচাবে কোনো বিশেষ স্ববকম্পন বা অঙ্গবিলাস যতই অকপট হোকনা কেন, নট-দর্শক-সংবাদ-ব্যতিবেকে তা কেবল শিল্পেব উপকবণমাত্র হযে থাকে, কখনো শিল্পে পবিণত হয়না। এই কথা মনে রেখে, প্রকাশ্য অভিনযে নাটকবিশেষকে ভাসিযে দেবাব পূর্ব্বে, মস্কো আর্ট থিযেটাব নটেদেব বন্ধুবান্ধবদেব জন্যে পোষাকপবিচ্ছদ, গীতবাদ্য, দৃশ্য-যবনিকা যোগে তিনটে ক'বে খোলা মহলাব আযোজন কবে।

স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যেব প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নাট্যকাবেব অভিপ্রাযকে দেহলীলাব মধ্যে মূর্ত্ত ক'বে তোলা, আধুনিক নাট্যকলায এই কটাই মস্কো আর্ট থিযেটাবেব চিবস্থাযী দান। অখণ্ড অভিনযশিল্পেব এই সজীব অবযবগুলি এতই অপবিহার্য্য যে মাঝে মাঝে যখন মিস্ত্রিবা প্রযোজককে জিজ্ঞাসা কবে সে-বাত্রে যবনিকা-বিশেষেব পালা আছে কিনা, তখন শ্রোতাব মনে কোনো বিস্ময় জাগেনা। নটশিল্পকে মনোবিজ্ঞানেব সুদৃঢ় আসনে বসানো ছাড়া, উক্ত থিয়েটাবেব অন্য কীর্ত্তি হচ্ছে অভিনেতাকে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধাবাব গণ্ডি থেকে মুক্ত কবা। সাবেকি নিয়মে অভিনেতাবিশেষ একটা বিশেষ ধবণেব ভূমিকায় আজীবন আবদ্ধ থাকতো। সেই নির্ব্বিকাব ভূমিকা-অনুসাবে নটেদেব মুদ্রাঙ্কিত ক'রে বাখাই সেকালেব প্রথা ছিলো। তখনকাব স্বল্পাঙ্গ নাটকগুলিতে কাউকে ববাবব তরুণ নাযক হযে থাকতে হতো, কেউ হতেন শঠ, কেউ বাচাল, কেউ বিদূষক, কেউ বা সরলা অবলা। যার কর্ম্মজীবন যে-ধাবাকে অবলম্বন ক'বে স্ফূর্ত্ত হতো, সে আমবণ অবরুদ্ধ থাকতো সেই আবহে।

আজকালকাব কৃতকর্ম্মা নাট্যবিশাবদেবা অভিনেতাব প্রাধান্য অস্বীকাব কবেন। তাঁদেব মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব অবাজকতা অখণ্ড শিল্প-সাধনার পরিপন্থী। গর্ডন্ ক্রেগ্-এব মতো অতিমেধাবী অকাবী সূত্রকারদেব অনুসবণ ক'বে তাবা বলেন যে মাবিওনেট্‌জাতীয় কলেব পুতুলই নটশিল্পেব আদর্শ। মানুষেব সহজ নাট্যবোধ এই যন্ত্রচালিত কুশীলবেব মধ্যেই প্রথম ৰূপ পায় ; এবং এদের মুখে মনুনেব চিহ্নমাত্র না-থাকায়, এবা বিশুদ্ধ প্রযোগশিল্পেব বসগ্রহণে অন্তবায হযে দাঁড়ায না। এদেব নিয়ন্ত্রিত অঙ্গবিক্ষেপের পুষ্পিত বেখায় যে-সুসঙ্গত ছবি গ'ড়ে ওঠে, তা বিবেচনা-সাপেক্ষ। এই দলেব সমালোচকেবা স্বমতেব সমর্থনে যবদ্বীপেব ছায়া-

বাজিকে সাক্ষী মানেন। সঙ্কটে পড়লে তাঁবা প্রাচ্যের প্রাচীন নাট্যকলার অনুদেশে নটেব মুখ মুখোশে ঢেকে তাব স্বয়ম্বশ অঙ্গচালনাকে সংযত কবতে চান সমগ্রতাব খাতিবে। লিখিত নাটকে পাত্রপাত্রীদেব উপবে যে-চবিত্র-বৈচিত্র্য আবোপ কবা হয়, তা তাঁদেব মনে ধবে না। তাই তাঁবা ভেনিসে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত কোমেদিয়া-দেল-আর্তে নামক যে-বিখ্যাত নাট্য-রীতিব প্রচলন ছিলো, তাব পুনরুত্থান কামনা কবেন। কাবণ তাব নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবা ছিলো ছাঁচে-ঢালাই-করা; তাতে অভিনেতাবা হার্লিকুইন, কলাম্বাইন, কবিবাজ, দুরাচাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত ভূমিকায় স্বকপোলকল্পিত অচিন্তিতপূর্ব্ব বাক্যেব আবৃত্তি কবতো। এখানে দ্রষ্টব্য এই, উপবোক্ত মতবাদটিব বিবৃতি অতি আধুনিক হ'লেও, ওব উৎপত্তি ঐতিহাসিক অতীতে। এই দলেব মতে, অভ্যাসদোষে মানুষ যদি সত্যই অপবিহার্য্য হয়, তবে তাব ব্যক্তিত্বেব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক; এবং তা অসম্ভব হ'লে, সকল ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জনাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিমানে আবদ্ধ কবা একান্ত কর্ত্তব্য। ভাববাব অবকাশ থাকলে এঁবা হয়তো বুঝতেন যে এ-বিবাদ অভিনেতাব সঙ্গে নয়, অভিনেয নাটকের সঙ্গে। যুক্তিব তাগিদ শুনতে হ'লে, নাট্যশালা ছেড়ে তাঁদেব বাজপথে বেরুনো উচিত, এবং প্রসিদ্ধতম সোভিয়ৎ প্রযোজক মায়াবহোল্ট্-এব প্রতিধ্বনি কবে বলা কর্ত্তব্য যে বাষ্ট্রনৈতিক শোভাযাত্রা অথবা বিদ্রোহবাহিনীব কুচকাওযাজই নাট্যকলাব শ্রেষ্ঠ উদাহবণ, কাবণ এ-ধবণেব অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ব্যক্তিব অঙ্গভঙ্গী একই তালে বাঁধা থাকে, প্রত্যেক নটেব মুখ একই সার্ব্বজনীন মুখোশে ঢাকা পড়ে।

আব একদল নাট্যকুশলী আছেন যাঁদেব মতামত আব একটু আধুনিক। তাঁদেব বিশ্বাস সমগ্র অভিনয়টা আসলে একটা সঙ্কলনবিশেষ। কাজেই তাঁবা নটেব স্বৈবাচাবেব প্রতিবাদ ক'বে বলেন যে সে সমগ্র সাজসজ্জাব অধীনে থাকতে বাধ্য, তাব মর্য্যাদা কোনোমতেই দীপাবলী বা পটবিন্যাসেব চেয়ে বেশি নয়; প্রযোজকেব মনীষা সম্পূর্ণ ছবিব যে-সীমাবেখা টেনে দিযেছে, সে-গণ্ডিব বাইবে যাওয়া তাব পক্ষে নিষিদ্ধ। সোভিযতের বর্ত্তমান চিন্তাধারা এই সম্প্রদাযেব মধ্যে যথাযথভাবে অনুবর্ত্তিত হযেছে; দেখা যাচ্ছে সমষ্টিবাদীবা মস্কো-আর্ট-থিযেটাব-প্রবর্ত্তিত সৃজনসমবায়েব গণতন্ত্রে আব সন্তুষ্ট নয়, উল্‌টে তাবা প্রযোজকেব অনন্যতন্ত্রে অত্যন্ত আস্থাবান। কিন্তু তাহলেও তাবা এই ব'লে আত্মবক্ষা কবে যে প্রযোজকেব একাধিপত্য নাট্যাদর্শেব অনুকূল, অর্থাৎ এতে ক'বে নট আপনাব ব্যক্তিত্ব হাবিয়ে অবশেষে একটা আদর্শে পবিণত হয়। তাদেব মতে এই আদর্শই ঐক্যসূচক সমষ্টি। ষ্টানিস্লাভ্‌স্কির

পদ্ধতিতে তারা দেখে একটা নাটকীয় চরিত্রের উদ্ভব, একটা অবাজক ব্যষ্টির জন্ম।

সে যাই হোক, এ-প্রসঙ্গে সাধারণ নাট্যামোদীর কিছু বক্তব্য থাকা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক; এবং সে-বক্তব্য হচ্ছে এই যে নটের ব্যক্তিস্বরূপই নাটককে সঞ্চারণশীল ক'রে তোলে, কারণ সে-ব্যক্তিস্বরূপের সারতত্ত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য এবং প্রয়োজনমতো বিস্তারণ-সঙ্কুচনের অনন্ত ক্ষমতা। সাধারণ নাট্যামোদী যে-নায়ক-নায়িকার গুণমুগ্ধ হয়, যে-নটনটীর সাধুবাদ করে, তারা তাদের অন্তরের সমবেদনাকে অঙ্গলীলায় প্রতিমূর্ত্ত ক'রে দর্শককে বিচলিত ও বিগলিত করতে পারে। এই যে-আবেগপ্রবাহ নটের হৃদয়ে উত্থিত হয়ে দর্শকের কল্পনায় গিয়ে ঠেকে, এইটাই একমাত্র নিকষ যার সাহায্যে অভিনেতাদের মূল্যনির্দ্ধারণ সম্ভব। এই আবেগের অভিব্যক্তি-প্রণালী কি?

স্বভাবের বশে এবং সময়ে সময়ে নাটকের গুণে নটমাত্রেরই শিল্প-সৃজনী শক্তি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু তাহলেও সকল সুসম্পাদিত অভিব্যক্তির মূলেই একটা অভিব্যাপ্ত ঐক্য থাকে,—এটা হচ্ছে শিল্পীচিত্তের রাগাতিশয্য। সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যার মতো অভিনয়কলাকেও দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—একটি বিচারপন্থী, অপরটি উপজ্ঞাপ্রধান। নাট্যশালায় আধুনিক অনুসন্ধিৎসার যুগ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে প্রথমটির খুব আদর ছিলো; এবং দিনকতক বিরাগভাজন হবার পরে আবার তাকে স্বাধিকারে ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে। নাট্যবিবেচকেরাও তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ ক'রে এসেছেন,—কাউকে হয়তো একদল মুগ্ধ করেছে, অপরে আকৃষ্ট হয়েছেন অন্যদলের প্রতি। সে যাই হোক্, অতিভক্তির অবশ্যম্ভাবী পক্ষপাত বাদ দিলে, একথা মানতেই হবে যে প্রকৃত গুণে কোনো পক্ষই বঞ্চিত নয়, প্রত্যেকের উপকারিতার অনেকখানিই নির্ভর করে নাট্যবস্তুর উপরে। উভয় পক্ষ থেকে একজন ক'রে প্রসিদ্ধ প্রতিনিধির দৃষ্টান্ত ধ'রে, প্রভেদটাকে সুস্পষ্ট করা যাক। এই প্রতিভূ-দুটিকে যারা কখনো অভিনয় করতে দেখেছে, তাদের কাছে এঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সারা বের্ণাড্, যিনি জীবদ্দশায় জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ব'লে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিচারপন্থী দলের অন্তর্গত। বাগ্মিতার ক্ষমতায় তিনি তো অসামান্য ছিলেনই, উপরন্তু সে-সাধনালব্ধ কণ্ঠস্বরের সুরসঙ্গতিতে দর্শকমাত্রেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতো; মনে হতো সে-গতিবিধির লাবণ্য, সে-অঙ্গলীলার ঔদার্য্য যেন একটা অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিস্বরূপের উদ্ভাসে উদ্দীপ্ত। বহু বর্ষের অভ্যাসে তিনি আত্মসমাহিত হতে পেরেছিলেন, এবং এতে

ক'বে তাঁব মধ্যে যে-ধ্রুপদী নিবাসক্তি দেখা দিয়েছিলো, তা কেবল সেই আযত্ত কবতে পারে যে নিজেব দেহেব প্রত্যেক বিভ্রমবিলাসকে একতালে, একলয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ কবতে শিখেছে। সাবাব অভিনয়বীতিব প্রধান সম্পদ ছিলো নাট্যোপযোগী পবিমার্জ্জিত উচ্চাবণপদ্ধতি আব ইচ্ছাধীন অঙ্গভঙ্গীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাৰুকার্য্য। অভিনেয যুগ বা বসেব দিক দিযে তাঁব সম্পাদন অত্যন্ত অবাস্তব ছিলো বটে, কিন্তু লেখকেব বেদনাব সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠ সহযোগ দেখা যেতো ; এবং সমস্ত ব্যাপাবটাব মধ্যে এমন অদ্ভুত সৌষ্ঠবেব পবিচয থাকতো যে সে-কুহক অবসান না-হওযা পর্য্যন্ত সমালোচক মুখ খোলাব সাহস পেতোনা। কিন্তু শুধু আদর্শনিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি যাদেব মনঃপূত হয়না, যাবা তাতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখতে চায, যবনিকাপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেব মনে হতো যে সাবা-সম্বন্ধে নিন্দকদেব মন্তব্যই বুঝি সত্য, বাস্তবিক পক্ষেই তিনি হযতো সেকালেব নিকৃষ্ট অভিনেত্রীদেব মধ্যে মহত্তম।

অন্য দলেব শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ইতালীয অভিনেত্রী এলিয়নোবা ডুজেব সঙ্গে সাবার তুলনা কবা অন্যায। বাশেলেব খ্যাতিকে কিম্বদন্তী যে-অলৌকিক অমবত্বে মণ্ডিত ক'বে বেখেছে, স্ববাজ্যে ডুজেও সেই অবিনশ্ববতায অধিকাবী। নাট্যকলাব ইতিহাসে এমন অন্য কোন নটীব নাম নিশ্চযই পাওয়া যাবে না, যে, ডুজেব মতো, ভূমিকাব মধ্যে আত্মনিমজ্জন ক'বেও নিজেব ৰূপকাবী ব্যক্তিস্বৰূপকে জাগিযে বাখতে পেবেছে, যে সমাধিস্থ হয়েও, অনুপম কৌশলে নাট্যেব প্রাণবস্তুকে সেই কল্পনাতীত লোকে উন্নীত কবেছে। দেহেব প্রত্যেক তন্তুকে এই বকম হৃদযসংবেদ্য ক'বে তোলা, ৰূপাযণেব এতখানি পবিপূর্ণতা আব কখনো দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। তাঁর সুকুমাব কণ্ঠস্বব, সেই অনুপম আস্বচ্ছ অথচ দীপ্তিঘন চোখ, সেই ভাস্কর্য্যনিন্দিত ললাটেব উপবে ঘনকুন্তলেব কিরীট ও বজতাভ সীমন্ত, সেই বিশ্ববিখ্যাত কবযুগ যাব উদ্দেশ্যে দানুন্‌ৎসিও তাব শ্রেষ্ঠ নাটক—জোকন্দা—উৎসর্গ কবেছিলো. এই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে, মনে হতো, যেন গযটে-বাঞ্ছিত চিবন্তনীব অমব নিঃসাব অতিমাত্রায় নিষ্যন্দিত হযে পড়ছে।

সাধনাব স্তবে উভযেবই তুল্যমূল্য হ'লেও, সাবা বের্ণাডেব মধ্যে যেটা ছিলো চাকচক্য, ডুজেব মধ্যে সেটা হয়ে উঠতো ভাস্বব অন্তর্দীপ্তি ; প্রথমাব মধ্যে যেটা অদ্ভুত ব'লে ঠেকতো, দ্বিতীযাব মধ্যে সেটা জাগাতো অবাক বিস্ময। ডুজেব আবেগেব ছন্দোবদ্ধ ধাবা যে-আত্মায় লীলায়িত হয়ে উঠতো, তাব প্রধান সম্বল ছিলো বেদনা ও অনুকম্পন। ফলে সাবা যেখানে অতিবঞ্জনেব বাহুল্যে দর্শককে চমৎকৃত ক'রে দিতেন,

সেখানে কেবল অনির্ব্বচনীয় বিভাবেব গুণে দুজে কবতেন তাব প্রাণস্পর্শ। রাসিনের অভিজাত ট্রাজিডিব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'ফ্রেদ্র্'-এব ভূমিকায় এঁদেব দুজনেব প্রভেদ অতি সহজেই ধবা দিতো। সপত্নিপুত্র ইপোলিতেব প্রতি আসক্ত হয়ে বাণী ক্রোধে অপমানে জর্জ্জবিত; মিথ্যা অভিযোগের সাহায্যে তাকে নির্ব্বাসনে পাঠিযে স্বীয় উচ্চণ্ড প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিব তর্পণে উদ্যত হযেছে; ট্রাজিডিব অবসান তাব প্রাণপাতে। সাবা বের্ণাডেব পবিকল্পনায় ফেদ্র্ একটি বিশালাঙ্গী চলচঞ্চলা রমণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ কবতো; তাব মধ্যে প্রত্যাখ্যাত প্রেম হিংসাব নৃশংস শিখায প্রজ্জ্বলিত হযেছে। প্রবঞ্চিত স্বামীকে ক্রোধান্ধ ক'বে তোলাব জন্যে তাব সুচিন্তিত ষডযন্ত্রে কোনো ফাঁক নেই। সাবাব আবেগমুখর বাক্চাতুর্য্যে ফেদ্র্ যেন জ্বালাময়ী রুদ্রাণীতে পবিণত হতো, মনে হতো কেবল রাজ্যশাসনেব সামর্থ্য নয়, নিজেব অদৃষ্টকে উদ্দাম হৃদযেব মর্জ্জিমতো চালানোর শক্তিও সে বাখে। সাবাব অভিনয যে-উৎকর্ষে গিযে পৌছতো, তা সফোক্লিসেব যোগ্য, তেমনি আবণ্যিক, তেমনি মহিমাময়, তেমনি নির্ম্মম। সে-ফেদ্র্ সংরক্ত সৌন্দর্য্যেব প্রতিমূর্ত্তি, বাণীব মতো বাণী।

এই দৃশ্যে দুজেকে দেখলে তৎক্ষণাৎ মনে হতো যেন জগতেব গভীরতম দুঃখেব সংস্পর্শে এসেছি, এ-দুঃখ প্রত্যাখ্যাত প্রেমেব দুঃখ, আত্মগ্লানিব দুঃখ। তাঁব সন্নিধি থেকে কিসেব একটা সুবভিশ্বাস নির্গত হতো, সে যেন ভবিতব্যপ্রপীড়িত নিবাশ নিঃসহায় নাবিত্বেব পরিমল। ইপো-লিৎকে নির্ব্বাসনে পাঠানোব চক্রান্ত প্রেমার্ত্তেব দুর্ব্বলতায অভিষিক্ত হযে উঠতো। মনে হতো সে-সর্ব্বনাশা প্রলযেব গ্রাস থেকে আত্মবক্ষাব একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দ্দযতাব ভান কবা। ফেদ্র্-এব অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রেমেব অভিশাপে ভাবানত হয়ে পড়তো, তাব আত্মাব সাধ্য থাকতো না যে সে-প্রেমেব পথবোধ কবে। তার দুঃস্থ মস্তিষ্কে শুধু এই সঙ্কল্পেব বিবর্ত্তন চলতো যে যাব জন্যে সে এত দুঃখ পেয়েছে, সেই প্রেমকে উচ্ছেদ কবা ছাড়া তাব গত্যন্তব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অনাথ ম্রিযমাণ নাবীব মধ্যে বাণীকে হাবানোব কোনো উপায় থাকতোনা; সঙ্গে সঙ্গে এটাও কোনোমতে ভোলা যেতোনা যে এই সর্ব্বনাশ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেব সর্ব্বনাশ, যে স্বয়ং রাসিনেব অনুপম নাটকেও এই উপনিপাতের তুলনা নেই। এতখানি শোভনতা, বিভ্রমবিলাসেব এ-রকম সুমিত প্রয়োগ আব কখনো দেখা যাযনি, কোনোস্থানে নামমাত্র আতিশয্য ঘটলে নাটকখানি একটা সামান্য পাবিবাবিক কলহে পরিণত হতে পাবতো। অভ্রান্ত সাধনাব প্রসাদে যাব দেহ ও মন এই অঘটন-সংঘটনে অধিকারী হযেছে, শুধু সে-ই দ্বিধাবিভক্ত অনন্তেব মধ্যে উক্ত তুলাসাম্য বাখতে

পারে। এই দহববিদ্যায় সিদ্ধিলাভ কবেছিলেন ব'লেই দুজে আপনাব আশুক্লান্ত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ বেখেও আমাদেব চৈতন্য ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে অমন নিবিড মিতালি স্থাপন কবতে পেবেছিলেন, এবং সেইজন্যেই আমাদের পূর্ব্বসংস্কারগুলোকে ওলটপালট ক'বে দিযে তিনি নাট্যকলার অলৌকিক সম্ভাব্যতাব অমন দৃষ্টান্ত বেখে গেছেন।

অভিনয়বীতিব উৎকর্ষ, স্ববসাধনায় সিদ্ধি, ভাব ও ভাবেব পবিপূর্ণ অভিব্যক্তি, এইগুলোই হচ্ছে নাট্যামোদেব মুখ্য সহায়। আমবা যাবা পাদদীপেব প্রভামণ্ডলেব বাইবে থাকতে বাধ্য, তাদেব কাছে নটেব সংবেদন ও অভিপ্রায় এসে পৌছয় উক্ত বীতিব মাবফতে। সাবা বের্ণাড, মুনে স্থলি, ফর্বস্-ববার্টসন, হেনবি অর্ভিঙ, আলবর্ট বাসাবমান, ভাসিলি কাচালফ, কজিযেবো, কজিযেবি ইত্যাদিব মতো বিচাবপন্থী অভিনেতাবা এই কলাকৌশলে দুজেব সম্প্রদাযকে ছাড়িযে গেছেন; কাবণ দুজেব দল আত্মাব প্রদোষান্ধকাবে যে-আবেগেব উদয হয়, তাকেই অধিক মূল্যবান মনে কবেন। কিন্তু পদ্ধতি-ব্যতিবেকে ব্যঞ্জনা যেহেতু অসম্ভব, তাই দুই সম্প্রদায়েব মধ্যে বাছাই কবা দবকাব হ'লে, বুদ্ধিমান প্রযোজকমাত্রেই প্রথম শ্রেণীকে ববণ কববে। নাট্যসৃষ্টিব পরম মুহূর্ত্ত হচ্ছে তখন, যখন ভিন্ন ভিন্ন আবেগ একটি জ্যোতির্ম্ময নাট্যপুরুষের মধ্যে মূর্ত্তি পবিগ্রহ কবে। এটা না-হ'লে নট খুব বেশি দূব এগুতে পাবে না, সে কেবল বুদ্ধিমান মনোবিদ হয়েই থেকে যায়। চাতুবী ও কৃত্রিমতাকে নাট্যশালা থেকে একেবাবে বিতাড়িত কবা অসাধ্য। কেবল কণ্ঠস্বব ও অঙ্গলীলাব সাহায্যেই যদি মনোবস্তুকে রূপ দিতে হয, তবে হাবভাবে একটা অবাস্তবতা অনিবার্য্য। এইজন্যেই ষ্টানিশ্লাভ্স্কিব অন্তর্দর্শনেব বিরুদ্ধে আধুনিকদেব অভিযোগ একান্ত অসঙ্গত নয়। তাঁব পদ্ধতিব ব্যাপকতা সার্ব্বত্রিক হ'লেও তিনি সেই সঙ্গে একটা ভ্রান্তি পোষণ ক'বে এসেছেন যে চেষ্টায় মানুষমাত্রেই নটে পবিণত হতে পাবে। ফলে তিনি মাঝে মাঝে এমন দু-একজন নট-নটী গ'ড়ে তুলেছেন যাবা আবেগে নিতান্ত অখল হ'লেও, উপবোক্ত ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিস্বরূপে একেবাবেই বঞ্চিত। যে-অলৌকিক মুহূর্ত্তে সকল অণুপবমাণু একটা পবম অখণ্ডতায সংগ্রথিত হয়ে ওঠে, সে-অমৃতযোগ তাদেব অভিনয়ে কখনো আসে না। এ-ক্ষেত্রে ষ্টানিশ্লাভ্স্কি যদি দুজেব প্রজ্ঞাঘন উপদেশ শুনতেন, তবে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অন্যবকমেব হতো। দুজে একবাব তাঁকে সহজ অথচ সপ্রতিভ ভাষায় বলেছিলেন,— নটশিল্পেব মূলমন্ত্র হচ্ছে একই সময়ে সমস্ত মনে বেখে সমস্ত ভুলে যাওয়া—tutto ricordare e tutto dimenticare। শুধু নাট্যকলা নয়, সমস্ত কলাশাস্ত্র-সম্বন্ধে এব চেয়ে সাবগর্ভ কথা কখনো উচ্চাবিত হযেছে কিনা সন্দেহ।

একটা ধারণার সঙ্গে ক্রমেই আমরা সুপরিচিত হচ্ছি,—এটা হচ্ছে নাট্যানুষ্ঠানে প্রযোজকের প্রাধান্য। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে এর নাম সুদ্ধ অজ্ঞাত ছিলো। কিন্তু প্রযোজক-শব্দটা তেমন সুষ্ঠু নয়, ওতে ক'রে মন নাট্যশালার আর্থিক দিকেই চালিত হয়। শিল্পনায়ক শব্দটা হয়তো শ্রেয়স্কর হবে। নটনটী, সাজসজ্জা, পটপ্রচ্ছদ, আলোবাতি ইত্যাদির জন্যে সেই দায়ী, নাট্যকারের অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করার ভার তারি উপরে, নাট্যানুষ্ঠানের ললিত দিকটা সম্পূর্ণ তারি তত্ত্বাবধানে। অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে পরিচালকের যে-সম্পর্ক নাটকে আর তাতেও সেই রকমের সম্বন্ধ। পাত্র-পাত্রীর যোগাযোগ, নাটকের কালমাত্রা নির্দ্ধারণ, অভিনয়ের আরোহণ-অবরোহণ ইত্যাদি যে-ব্যাপারগুলো রসোৎপাদনের জন্যে অভিনয় ও সাজসজ্জার মতোই অত্যাবশ্যক, সে-সকল ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। নাট্যকলার আধুনিক সংজ্ঞায় এই ব্যক্তিটি অপরিহার্য্য; তার অবর্ত্তমানে নাটকখানা অচিরে একটা নিষ্প্রাণ ঘটনাপুঞ্জে পরিণত হয়; এই খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলোকে সার্থক সমষ্টিতে সংহত ক'রে, নাটককে সেই সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। রুষ বা জার্ম্মান নাট্যমন্দিরে তাকে বাদ দিয়ে কিছুই হয়না। গোটাকয়েক ব্যতিরেক বাদে নাট্যকলা-সম্বন্ধে এই নূতন ধারণা ইংলণ্ডে এখনো বদ্ধমূল হয়নি। ইংরেজ আজো মনে করতে পারেনা যে রঙ্গালয় শুধু প্রমোদের স্থান নয়, একটা পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টির সাহায্যে মানুষের সৌন্দর্য্যপিপাসাও সেখানে মিটে থাকে। সেইজন্যে ওদেশে প্রযোজকের কাজ সাধারণ শিক্ষকের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। ইংলণ্ড ও ইতালি নটচূড়ামণিদের দেশ, কিন্তু সেখানে কখনো মহৎ অভিনয়শিল্প গ'ড়ে ওঠেনি। ও-দুই দেশে নাট্যকারের অভিপ্রায়টা মোটামুটি ব্যক্ত হ'লেই, অভিনয় উপভোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে এটা উপলব্ধি করা যায় যে প্রযোজক চিত্রকরের মতো, রঙ্গমঞ্চের বর্ণপাত্রে সে মানুষ আলো, সাজসজ্জা ইত্যাদিকে রঙের মতো ব্যবহার ক'রে একটা সুসঙ্গত ছবি আঁকতে চায়, অমনি সে অতিপ্রযোজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী দেশের তথাকথিত চরমপন্থী নাট্যমন্দিরগুলোতে প্রযোজকই অভিনয়ের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। তবে সেখানে তাকে এখনো 'মেতর্-আঁ-সেন্' বা দৃশ্যশিল্পী বলা হয়। এই নামটি সেই আমলের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যখন কারুকে ডেকে অভিনয়ের সময়ে নটমঞ্চের কোন অংশ কোন নটের অধিকারে থাকবে, তার একটা নক্সা করিয়ে নেওয়া হতো।

আজকের দিনে নটমঞ্চের পরিকল্পনা ও গঠন এবং বিশেষ ক'রে আলোকসম্পাত, এই তিনকে যে-মর্য্যাদা দেওয়া হয়, তার দিকে নজর

না-দিলে নাট্যকলাব কোনো বিবরণই সুম্পূর্ণ হবেনা। সেকালে মামুলি পটে-আঁকা বঙবেবঙেব ঘববাড়ি আব আজাব ক্ষেতপাহাডেব ছবি নটেব পিছনে পতপত ক'বে উড়তো। তখন আকাশেব নীল এতই নীল ছিলো যে সেদিকে চাইলে গায়ে জ্বব আসতো। এই সমস্ত ডাকেব গহনা বোমান্টিকদেব দায়ভাগ-হিসেবে পাওযা। অপেবাব অভিনয়ে আজো আমবা এই যবনিকাগুলোকে দেখি। এগুলোব হাস্যকব অসাবতা অপেবাগাযকদেব নাটকী ঢঙেব উপযুক্ত পটভূমি বটে, বুকে হাত বেখে, বঙ্গমঞ্চে আড়ষ্ট হয়ে উল্লম্ফন কবা এই আবেষ্টনেই শোভা পায়। বাস্তবিকতাব আবির্ভাবে এ-সমস্তই বদলে গেলো। এখন থেকে নটমঞ্চেব অলঙ্কবণ এমন হতে লাগলো যাতে ঐতিহাসিক সাত্ত্বিকতা সূচিত হয়। বঙ্গালযেব কুহক যথার্থ অভিজ্ঞতাব মুকুব, এ-বিশ্বাস বজায বইলো। কিন্তু বাস্তবিকতাও মাঝে মাঝে উপহাস্য হযে ওঠে। একটা দৃষ্টান্ত দেওযা যাক্। আন্দ্রেযেফ্-এব "লাইফ অফ ম্যান"-নামক নাটকেব উপক্রমণিকা একটি নবজাত শিশুব ক্রন্দনে। মস্কো আর্ট থিযেটাবে যখন এখানিব মহলা চলছিলো, তখন সবকাবী অনাথাশ্রম থেকে তেবোটি নবজাত শিশুব আমদানি ক'বে, তাদেব কাঁদানো হলো। উদ্দেশ্য ছিলো গ্রামোফোন-বেকর্ডে তাদেব ক্রন্দনধ্বনি মুদ্রিত ক'বে, যবনিকা-উত্থানেব সময়ে সেই বেকর্ড বাজানো। প্রযোজকদ্বয কিন্তু শিশুদেব কান্নায় প্রথমটা সন্তুষ্ট হতে পাবলেননা; অবশেষে একটি ছেলে অত্যন্ত আদর্শ-বকমেব জোর গলায় ককিযে উঠতে তবে তাঁরা আশ্বস্ত হয়ে পবস্পবেব দিকে সহাস্য নযনে চাইতে পাবলেন।

সেই প্রাচীন প্রকৃতিবাদেব পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রযোগ আজকে আব প্রচলিত নেই; ধবণ এখন বদলে গেছে। আজকালকাব ঝোঁক হচ্ছে অলঙ্কবণকে ভাবব্যঞ্জক ক'বে তোলা, তাতে ব্যযসঙ্কোচও সম্ভব। ফলে এখন একটা খিলেন বা ওই বকমেব কোনো ভগ্নাংশমাত্র সাবা অট্টালিকাব প্রতিভূ হযে ওঠে। আলেখ্যচিত্রণেব মতো মঞ্চনির্ম্মাণ ও বেশপবিকল্পনা চলে ফিউটুবিষ্ট, কিউবিষ্ট অথবা সুপ্রিমেটিষ্ট নিযমানুসাবে। কষদেশে এখন মাত্র গাছাকযেক দড়ি আব খানকযেক তক্তা দিযেই অভিনযেব কাঠামো তৈবি হচ্ছে। যুদ্ধবিগ্রহেব সমযে সজ্জাসামগ্রীব অনটনেই যদিও উক্ত প্রথাব সূত্রপাত, তবু জনগণেব উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হওযাতে ওই বাহুল্যবর্জ্জিত মঞ্চসজ্জাই সর্ব্বত্র পবিগৃহীত হয়েছে, এবং একেই মায়াব-হোল্ট্ ও তাঁব জার্ম্মান শিষ্য পিস্‌কাটব কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্‌ম্ নাম দিয়ে, তাঁদেব নাট্যানুষ্ঠানেব আদর্শ ক'বে তুলেছেন। ওতে ক'রে শুধু নির্ব্বোধ নাট্যা-মোদীদেব আধুনিকতাব আকাঙ্ক্ষা মিটে ব'লেই, উক্ত রীতি সফল হয়নি।

রসতত্ত্বে খালি জায়গা ও উপাদানের অনাবৃত সৌন্দর্য্যের একটা যথার্থ প্রয়োজন আছে ; আগে এই নগ্নতাকে রঙে ঢেকে রাখা হতো ; সে-ত্রুটি এতদিনে ঘুচলো। সেকালের চিত্রিত প্রচ্ছদের স্থানে নির্ম্মিত দৃশ্য কিম্বা গর্ডন্ ক্রেগ্-প্রবর্ত্তিত রঙীন পর্দ্দা আমল পেলো। মস্কো আর্ট থিয়েটারের যুগেই গর্ডন্ ক্রেগ্ মস্কোয় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর নির্দ্দেশে হ্যামলেটের যে-অভিনয় হয়, তার একটি দৃশ্যেই ক্রেগের নাট্যপ্রতিভার অদ্ভুত প্রমাণ মিলে। পর্দ্দায়-তৈরি সোনালি দেওয়ালের উপর হ্যামলেটের ছায়া আলোকসম্পাতের কৌশলে প্রতিফলিত হয়েছে, আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি "To be or not to be" ব'লে স্বগতোক্তি করছেন—এই ছবির হৃদয়গ্রাহিতা অবিস্মরণীয়।

এ ছাড়া নটমঞ্চের অবগুণ্ঠনমোচনের আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে দিনে দিনে আলোক রঙকে স্থানচ্যুত করছে। নটমঞ্চের ভিতরের জন্যে আলোকচ্ছুরণের উদ্ভাবনা, রীতিপ্রধান অভিনয়ের জন্যে সঞ্চারণশীল রশ্মিসম্পাতের আবিষ্কার, এবং ইচ্ছামতো উভয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যবস্থা, এই তিনের কল্যাণে নাট্যমন্দিরে যে-দ্যোতনাব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে, তা ইতিপূর্ব্বে অভাবনীয় ছিলো। আজকাল নট ও নাটকের প্রত্যেক ভাবান্তরের সঙ্গে চলে আলোর সঙ্গৎ। আলোর সাহায্যে প্লাষ্টার-রচিত আকাশে যে-চমৎকার রঙ ফুটে উঠে, আস্বচ্ছ পর্দ্দায় যে-বায়ুমণ্ডলের ইঙ্গিত জাগে, ছায়ার সমর্থনে মূর্ত্তিমাত্রেই যে-স্পষ্টতা পায়, এ-সমস্তই নাট্যকলায় যুগান্তর নিয়ে এসেছে। এখন প্রযোজকের দৃষ্টি মুখ্যত অলঙ্করণের উপরেই ন্যস্ত, এবং এই অলঙ্করণের ভবিষ্যৎ আলোকশিল্পের ভাবী সম্প্রসারণের সঙ্গে গ্রথিত।

নাট্যমন্দিরের নক্সায় সুদ্ধ অদলবদল চলছে। রাইনহার্টের মতো কয়েকজন প্রযোজকের আদর্শ হচ্ছে অভিনেতা ও প্রেক্ষণিকের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে এমন সমস্ত নূতন নাট্যশালার নির্ম্মাণ হচ্ছে, যাতে নটেরা প্রেক্ষাগৃহে নেমে দর্শকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। এই রকমের রঙ্গালয়গুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে বের্লিনের গ্রয়স্ শাউস্পিল্‌হাউস্। এই সার্কাসতুল্য প্রকাণ্ড ইমারতে নটমঞ্চটা অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং প্রেক্ষাগৃহের মাঝখানে অবস্থিত। রাইনহার্ট—ষ্টানিশ্লাভ্‌স্কির পরে এত বড় প্রযোজক আর হয়নি—রাইনহার্ট "অর্‌ফিউস্ ইন্ দি আণ্ডারওয়ার্লড্"-এর মতো অপেরার এবং "ডেথ্ অফ্ দাঁতন"-এর মতো চক্ষুচমৎকারী নাটকের অভিনয়ে উক্ত নাট্যমন্দিরটির সদ্ব্যবহার করেছেন ; কারণ শুধু এই ধরণের মঞ্চেই বিপুল জনসংখ্যাকে স্থান দেওয়া ও পরিচালিত করা সম্ভব। আজকালকার সকল নাট্যশালাতেই মঞ্চ একটা ঘূর্ণন্ত টেবিলের আকার

ধবছে। এতে ক'রে দৃশ্যগুলো আগে থেকে গুছিয়ে বাখা যায় এবং দৃশ্যপবিবর্ত্তনে কোনো বিলম্ব ঘটেনা। তাছাড়া ড্রেস্‌ডেনে আব একটা নূতন ধাবাব সূত্রপাত হযেছে, যাতে কযেকটা তযখানায দৃশ্যগুলো বড় বড মঞ্চে সাজানো থাকে, এবং প্রযোজনমতো সেগুলোকে যন্ত্রসাহায্যে উপবে তোলা হয়। এব চেয়েও অল্পব্যযেব ব্যবস্থা হচ্ছে গোটাকযেক চাকাওযালা তক্তাব উপবে দৃশ্য ও আসবাবগুলো চডিযে বাখা, এবং যবনিকা-পতনেব সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে সেগুলোকে মঞ্চেব সামনে আনা।

আধুনিক বঙ্গালযেব এই সংক্ষিপ্ত বিববণে এটা সুরু থেকেই লক্ষ্য ক'বে এসেছি যে নাট্যকলাব মধ্যে এমন একটা কোন বস্তু আছে, যা তাব স্থিতিস্থাপকতাব প্রতিবন্ধক। এতেই সে পবিবর্ত্তনশীল শিল্পধাবাব অনুসবণে অক্ষম। এই বাধা হচ্ছে সাহিত্য, এবং অবাধ্যতাব অপবাধে সাহিত্য আজ সম্প্রতিবিদেদেব চক্ষুশূল। তাদের প্রবর্ত্তনায কলাপদ্ধতিতে যে-সকল রূপান্তব ঘটছে, সেগুলো অবিলম্বে নাট্যশালায প্রযুক্ত হোক—এইটাই তাদেব স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু চিত্রবিদ্যাব মতো বিশুদ্ধ শিল্প হয়েও, মঞ্চ-স্থাপত্যই যখন কেবল কিউবিষ্ট কিম্বা ফিউটুবিষ্ট মতে কোনো সর্ব্বকর্ম্মা মঞ্চেব উদ্ভাবনে অক্ষম, তখন উক্ত ইচ্ছা বিড়ম্বনামাত্র। যদিও আজকালকাব বীতিপ্রধান শিল্পাদর্শেব সমর্থনে এমন অলঙ্কবণ সম্ভব যা শেক্‌স্‌পীযবেব নাটকে বা ধ্রুপদী অভিনযেব পক্ষে শোভন, তবু ইবসেন, বর্ণাড্‌ শ, গলসওয়ার্দি, জুডাবমান এবং গত যুগেব ফবাসী নাট্যকাবদেব বাস্তবগন্ধী বচনাব প্রযোজনায সে-আদর্শ অব্যবহার্য্য ; অন্তত তাব ভগ্নাংশমাত্র কাজে লাগতে পাবে।

সাহিত্যেব সঙ্গে নাট্যকলাব আত্মীয়তা সত্যই ঔৎসুক্যময়। সাহিত্যেব গুণাগুণ যেমন প্রযোজনশিল্পেব উপবে প্রভাব বিস্তাব কবে, তেমনি অভিনয়শিল্পেব সংস্পর্শ এসে পৌঁছয সাহিত্যে। এই জন্যেই, গোড়াকাব চক্ষুচমৎকাবী নাটকগুলো বাদে, মস্কো আর্ট থিযেটাবেব দৃশ্য-পরিকল্পনা, উচ্চাবণপ্রণালী, আবেগ-ব্যঞ্জনাব কডিকোমল ইত্যাদি সমগ্র অভিনযপদ্ধতি চেকোফেব বচনাব গুণে বদলে গিযেছিলো ; এবং আজ পর্য্যন্ত সেই পবিবর্ত্তিত অবস্থাতেই আছে। এমন-কি মনে হয যেন এই মৃদুস্বভাব বেখাশিল্পীদেব প্রায় সকলেই অন্তবেব আবেগকে বীবোচিত ব্যক্তিস্বরূপে মূর্ত্ত ক'বে তুলতে অপারগ হযে পড়েছে। এই কাবণেই বিকলনপন্থী পিবান্দেলোব অদ্ভুত নাটকগুলোব জন্যে রোমসহবে একটা নূতন নাট্যশালাব প্রয়োজন ঘটে ; এঁব নাটকেব জন্যে যে-অভিনব কলাকৌশলেব দবকাব, তা অন্যত্র দুর্লভ। বর্ণাড্‌ শ-ব 'ব্যাক টু মেথুসেলা'-নামক নাটকখানিকে মামুলি বাস্তবগন্ধী দৃশ্যপবিচ্ছদে অভিব্যক্ত কবা

সম্ভব হয়নি ব'লেই, আজকাল ইংলণ্ডেও কলাকৌশল-সম্বন্ধে কৌতূহল দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তবে রুষ ও জার্ম্মানদেব কল্যাণে মার্কিনি নাট্যশিল্পে অপূর্ব্ব উন্নতি সুরু হওয়াতে, ইউজিন ওনিল "এম্পাবাব জোন্‌স্" লিখতে সাহসী হন। এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখকদেব নাট্যরচনা উত্তব-সামবিক জার্ম্মান নাট্যশালাব অসিদ্ধ অন্বেষণপ্রবৃত্তিব প্রতিচ্ছবি মাত্র।

নানা ধবণেব নাটকে নানা বকমেব নাট্যশিল্পেব প্রযোজন হয়. কাজেই সম্প্রতিবিদ নাট্যশালাগুলোকে বাঁচতে হলে উপযোগী নাটকেব আবশ্যক। এক মতসর্ব্বস্ব লেখক ছাড়া নাট্যকাবমাত্রেই নানাশ্রেণীর নাটক লিখে থাকেন, তাব মধ্যে কোনোটা হয়তো আষাঢে, কোনোটা বীতিপ্রধান, কোনোটাব প্রসঙ্গ মনস্তাত্বিক, কোনোটাব বা ঐতিহাসিক, আবাব এক-একটা হয়তো বাস্তবপন্থী। ফলে আজকালকাব অতি আধুনিক বঙ্গালযে সাহিত্যেব আমদানী অত্যন্ত অল্প। কিন্তু উপযুক্ত উপাদান পেলে মাযাবহোল্টেব বিপ্লবপ্রচাবিণী নাট্যশালা সুদ্ধ কী বকম অপরূপ শিল্পসৃজনে সমর্থ হয়, তাব প্রমাণ মিলে "হার্ল ও চায়না"-নামক চৈনিক শ্রমিকসংঘর্ষেব নাটকখানিব অভিনযে। তবে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েৎ কাবখানাও বেশি নাটক তৈবি কবতে পাবছেনা। সুতবাং স্বযং মাযারহোল্টও এখন ধ্রুপদী রুষ নাটকগুলোব বৈহাসিক অনুকবণে আত্মনিযোগ কবেছেন। এব ফলে নাট্যসম্বন্ধে কতকগুলো চমৎকাব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হযে থাকলেও, তাঁব অবস্থা এখন মামুলি প্রযোজকদেব মতোই বৈচিত্র্যবিহীন। অতএব দেখা যাবে প্রবন্ধেব প্রস্তাবনায যে সঙ্কটেব উল্লেখ কবেছিলুম, তাব সমাধান এখনো সুদূবপবাহত। শুধু সেইদিন সে-দুর্দ্দশাব অবসান হবে যবে উপযোগী সাহিত্যেব বন্যা বঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ কববে। এযুগেব কারুকৌশলেব আবিষ্কাবগুলি নাট্যকলাব ভবিষ্যৎকে কী পরিমাণে প্রশস্ত ও সমৃদ্ধিশালী ক'বে তুলেছে, তা বোঝা যাবে শুধু সেই শুভদিনে।*

শাহেদ সুবহ্বর্দি

* অপ্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ

১

ছন্দবিতর্ক

ছন্দ নিয়ে তর্ক যতই বেড়ে চলেচে ততই ওটা দুর্ব্বোধ হয়ে উঠ্‌চে। অন্তত আমার কথাটা যে বোঝাতে পারিনি তার প্রমাণের অভাব রইল না। বোধহয় পারিভাষিকের ভিড়ের মধ্যে পড়ে আমার মাথার এবং কথার ঠিক ছিল না। ভেবেছিলেম হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকব, অভ্যাসদোষে পারলুম না। আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

আমার বলবার বিষয় প্রধানত এই ছিল যে সংস্কৃত বাংলা এবং প্রাকৃত বাংলার গতিভঙ্গীতে একটা লয়ের তফাৎ আছে। তার প্রকৃত কারণ, প্রাকৃত বাংলার দেহতত্ত্বটা হসন্তের ছাঁচে, সংস্কৃত বাংলার হলন্তের। অর্থাৎ উভয়ের ধ্বনিস্বভাবটা পরস্পরের উল্‌টো। প্রাকৃত বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে পদে পদে তার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে আঁট করে করে তোলে। সুতরাং তার ছন্দের বুনানি সমতল নয়, তা তরঙ্গিত। সোজা লাইনের সুতো ধরে বিশেষ কোনো প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে মাপ্‌লে হয়ত বিশেষ কোনো সংস্কৃত বাংলার ছন্দের সঙ্গে সে বহরে সমান হতে পারে কিন্তু সুতোর মাপকে কি আদর্শ বলে ধরা যায়?

মনে করা যাক্, রাজমিস্ত্রি দেয়াল বানাচ্চে, ওলন-দণ্ড ঝুলিয়ে দেখা গেল সেটা হোলো বারো ফিট। কিন্তু মোটের উপর দেয়াল খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও সেটার উপরিতল যদি ঢেউ-খেলানো হয়, তবে কারু-বিচারে সেই তরঙ্গিত ভঙ্গীটাই বিশেষ আখ্যা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক্।

বউ কথা কও, বউ কথা কও
যতই গায় সে পাখী
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি'।

খাড়া সুতোর মাপে দাঁড়ায় এই :—

১ ২ | ১ ২ | ১ ২ | ১ ২ |
বউ ক | থা কও | বউ ক | থা কও |

১ ২ | ১ ২ | ১ ২ |
য তই | গায় সে | পা খী |

১ ২ | ১ ২ | ১ ২ | ১ ২ |
নি জের | ক থাই | কুন্- জ | ব নের |

১ ২ | ১ ২ | ১ ২ |
সব ক | থা দেয় | ঢা কি |

সেই সুতোব মাপে এব সংস্কৃত সংস্কবণকে মাপা যাক্—

১ ২ | ১ ২ | ১ ২ | ১ ২
ক থা | ক হো | ক থা | ক হো |

১ ২ | ১ ২ | ১ ২
পা খী | য ত | ডা কে, |

১ ২ | ১ ২ | ১ ২ | ১ ২
নি জ | ক থা | কা ন | নে ব |

১ ২ | ১ ২ | ১ ২
স ব | ক থা | ঢা কে ||

সুতোর মাপে সমান। কিন্তু কান কি সেই মাপে আঙুল গুণে ছন্দের পবিচয নেয়? ছন্দ যে ভঙ্গী নিয়ে, বস্তুব পবিমাপ নিয়ে নয।

তোমাব সঙ্গে আমাব মিলন
বাধ্‌ল কাছেই এসে।
তাকিযে ছিলেম আসন মেলে,
অনেক দূব যে পেবিযে এলে,
আঙিনাতে বাড়িযে চবণ
ফিবলে কঠিন হেসে।
তীবেব হাওযাব তবী উধাও
পাবেব নিরুদ্দেশে॥

এরই সংস্কৃত রূপান্তব দেওয়া যাক্ ঃ—

তোমা সনে মোব প্রেম
বাধে কাছে এসে।
চেযেছিনু আঁখি মেলে,
বহুদূব হতে এলে,
আঙিনাতে পা বাড়িযে
ফিবে গেলে হেসে।
তীব-বাযে তবী গেল
ওপাবেব দেশে॥

মাপে মিল্‌ল কিন্তু লযে মিলেচে কি? সমুদ্র যখন স্থিব থাকে, আব সমুদ্র যখন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে তখন তাব দৈর্ঘ্যপ্রস্থ্য সমান থাকে কিন্তু তাব ভঙ্গীব বৈচিত্র্য ঘটে। এই ভঙ্গী নিয়েই ছন্দ। বিধাতা সেই ভঙ্গীব দিকে তাকিয়েই মৃদঙ্গ বাজান, বোল বদলিয়ে দেন, তাই মনেব মধ্যে ভিন্ন বকমেব আঘাত লাগে।

আমি অন্যত্র বলেচি, প্রাকৃত বাংলাব ছন্দে যতি-বিভাগ সকল সময় ঠিক কাটা কাটা সমান ভাগে নয। পাঠক এক জাযগায মাত্রা

হবণ করে আব এক জায়গায় ওজন রেখে তা পূবণ কবে দিলে নালিশ চলে না। এইজন্যে একই কবিতা পাঠক আপন রুচি-অনুসাবে কিছু পবিমাণে ভিন্ন বকম কবে পড়তে পাবেন।

রূপসাগবে ডুব দিযেছি
অরূপ বতন আশা কবি।
ঘাটে ঘাটে ফিবব না আব
ভাসিযে আমাব জীর্ণ তবী।

এই কবিতাটি আমি পডি, "রূপ" এবং "ডুব" এবং "অরূপ" শব্দেব ধ্বনিকে দীর্ঘ কবে। অর্থাৎ ঐ উকাবগুলোব ওজন হয় দুইমাত্রার কিছু বেশি। তখন তারই পূরণ স্বরূপে "ডুব দিয়েছি"-ব পরে যতিকে থামতে দেওয়া যায় না। অপব পক্ষে "ঘাটে ঘাটে" শব্দে মাত্রাহ্রাসেব ত্রুটি পূরণ কববাব ববাৎ দেওয়া যায "ফিবব না" শব্দেব উপব। নইলে লিখতে হোত "সাত-ঘাটে আব ফিবব না ভাই"।

সংস্কৃত বাংলা ও প্রাকৃত বাংলাব ছন্দে লয়েব যে ভেদ কানে লাগে তার কাবণ সংস্কৃত বাংলায় অনেক স্থলেই যে-শব্দেব মাপ দুইয়েব, তাব ওজনও দুইযের। যেমন—

১ ২ ১ ২
"তো মা স নে"

কিন্তু প্রাকৃত বাংলায প্রায়ই সে স্থলে মাপ দুইযেব হলেও ওজন তিনেব, যেমন—

১ ২ ১ ২
"তো মাব সঙ্- গে"।

এতে কবে তিন-ঘেঁষা ছন্দের প্রকৃতি বদলে যায়।

রূপসাগবে গানটিব পবিবর্তে লেখা যেতে পাবত,—

রূপ বসে ডুব দিনু অরূপেব আশা কবি,
ঘাটে ঘাটে ফিবিব না বেয়ে মোব ভাঙা তবী।

যদি কেউ বলেন দুটোব একই ছন্দ তাহলে এইটুকু বলে চুপ কবব যে, আমাব সঙ্গে মতে মিলল না। কেননা আমি ছন্দ গুণিনে আমি ছন্দ শুনি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এবাব আমাব ইচ্ছা, একটু শিকাব সম্বন্ধে পুবানো কথা ব'লব। আমাব প্রধান ভয় শিকাবীদেব, তাঁবা এই হাতুড়েব অনধিকাব চর্চ্চা কৃপা-চক্ষে দেখবেন কিনা। মোটেব উপব মনে হয তাঁবা এটা না পড়লেই ভাল। সাহিত্যামোদীদেব কাছেও অভয় চাইছি, কাবণ কিবাতেব প্রলাপ তাঁদেব কানে হয়ত নিতান্ত বেসুবো বাজবে। প্রলাপ ব'ললাম, কিন্তু বোধহয় বিলাপই বলা উচিত কাবণ আমাব নিজেব মৃগযাব ধাবা "কর্ম্মণ্যে-বাধিকাবস্তে মা ফলেষু কদাচন।" তবে একদিকে যেমন আমাব নিষ্কাম কর্ম্মেব কথা আছে, তেমনি অন্যদিকে বন্ধুবান্ধবেব সকাম সাধনাব কথাও ত আছে। সেগুলো ব'লতে আমাব বেশী গৌবব বোধ হয়। আর পাঠকেব কি এসে যায়, আমাব কথা কি আমাব বন্ধুব কথা?

শিকাব ব'লতে অনেক জিনিস বোঝায়, ধাঙ্গড়দেব ইঁদুব মাবা থেকে পাঠানদেব দুশমন মাবা পর্য্যন্ত। এমন কি বসিকজনেব সুন্দবী সন্ধানও এই ব্যাপাবেব অন্তর্গত। তবে আমাব অধিকাব জীবজন্তু অনু-ধাবন পর্য্যন্ত। সেই কথাই ব'লব। মৃগযা ব্যসনবিশেষ। কথাটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা থাকলেও আপ্তবাক্য ব'লে আমাব আত্মীয-স্বজন গ্রহণ কবেন নি। কাবণ বাড়ীতে যে দোনলা গাদা বন্দুক ছিল সেটা অল্প বযসেই ছুঁড়তে শিখি। প্রথমবাব আওয়াজ কবাব সময চোখ দুটো বুজে এসেছিল আব বন্দুকেব ধাক্কায় উল্টে পড়ে গিযেছিলাম। হযত সকলেবই এই হয। অর্থাৎ সাধাবণ লোকেব। একজনেব হযনি জানি। বহুকালেব কথা, অববিন্দ একদিন আমাব ঠাণার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে যাওযাব উপায নেই। আমবা একটা ছোট বাইফেল নিযে বাবান্দায আমোদ কবছিলাম। অববিন্দকে কেউ বললেন, "আসুন ঘোষ সাহেব, আপনিও মাকন।" তিনি প্রথমে কিছুতেই বাজী হচ্ছিলেন না, কখনও বন্দুক হাতে কবিনি ইত্যাদি নানা ওজব দেখাচ্ছিলেন। আমবাও নাছোড়বান্দা। শেষ বন্দুক ধ'বলেন। সামান্য একটু দেখিযে দিতে হ'ল কি ক'বে নিশানা ক'বতে হয। তাব পবে বাববাব লক্ষ্যভেদ ক'বতে লাগলেন। লক্ষ্য কি পাঠককে ব'লে দিই, দেশলাই কাঠিব ছোট্ট মাথাটা। ওবকম লোকেব যোগসিদ্ধি হবেনা ত কি তোমার আমাব হবে?

আমাব প্রথম শিকাব এক প্রকাণ্ড কুঁদো শেযাল। যখন প'ড়ল সে কি আনন্দ! আত্মহাবা হ'য়ে মাংসটা বেঁধে খাইনি এই আশ্চর্য্য।

একটা সাফাই গেয়ে বাখি। এ শেযালটা মেবেছিলাম মা'ব হুকুমে, অন্দব বাড়ীতে বড উপদ্রব ক'বত। লাটীনে এক কথা আছে নবকে নেমে যাওযাব পথ বড স্থগম। এই শেযাল থেকে আমাব অধঃপতন স্থরু। পবে ঝাঁকে ঝাঁকে যখন নিবীহ পাখী মেবেছি সে ত আব কর্ত্তৃপক্ষেব হুকুমে নয়। একটু কৈফিযৎ দিতে হয, কেন এ দুষ্কর্ম্মে লোকে প্রবৃত্ত হয। বন বাদাড়ে ঘুবে বেডাবাব উৎসাহে, বন্দুক মাবাব আনন্দে, বক্তপাতেব নেশায, আব কতকটা খাদ্য-লোভে। আমি কিন্তু পাখীব মাংস যা খেয়েছি তাব চেযে গালাগাল খেযেছি ঢেব বেশী। আব সে গালাগাল খুব জোবে দিযেছেন তাঁবাই যাঁবা সে মাংস আমাব চেয়েও তৃপ্তিপূর্ব্বক খেযেছেন। আমি কিন্তু গাল খেযেও স্বধর্ম্ম ছাড়িনি। শুধু তাই নয়। যখন যেখানে স্থবিধা পেয়েছি ছেলেপিলেদেব বন্দুক ধ'বতে শিখিয়ে আমাব গুরু-ঋণ পবিশোধ কবেছি। শাস্ত্র শিখলেই শেখাতে হয এই সনাতন বিধি, তা সে যজুর্ব্বেদই হোক বা ধনুর্ব্বেদই হোক। শত্রুপক্ষ হয়ত ধনুর্ব্বেদকে চৌর্য্যশাস্ত্রেব দলে ফেলবেন। তা ফেললেই বা, চুবি যদি ক'বতেই হয ত আনাড়ীব মত কবা কিছু নয। মানুষেব শত্রু বাঘ ভাল্লুক মাবতে দোষ নেই, সেপাই হ'তেও দোষ নেই, এ কথা এক যোগী ঋষি ছাড়া সবাই কবুল কবেন। কিন্তু এই দুই কাজেই সিদ্ধিব জন্য রীতিমত সাধনাব দবকাব। কেবল চাঁদমাবিতে নিশানা ক'বতে শিখে বাঘ শত্রু কি মানুষ শত্রুব সামনে গেলে অপঘাতেবই বেশী সম্ভাবনা। অপঘাত কবাই যদি উদ্দেশ্য হয, ত দুপযসাব সেঁকো খেলে সস্তাও হয কষ্টও কম। কিন্তু শত্রুনাশ ক'বতে হ'লে অব্যর্থ লক্ষ্য থাকা চাই আব শবীবটাও বীতিমত বোদজল-সহা হওয়া চাই। বনে পাহাড়ে নদীব চবে ঘুবে খাদ্য সংগ্রহ কবাই এব সোজা উপায। এই আমার গীতোক্ত অভ্যাসযোগ। এই ঈশোপনিষদেব অবিদ্যাব উপাসনা, যা নইলে অমৃতাশনেব কোনও আশা নেই। ছেলে বখানোব কৈফিয়ৎ যথাসাধ্য দিলুম। একটা কথা বলি, আমাব দুচাবজন কাক-শালিক-মাবা শিষ্য এখন বীতিমত শেব আফগান হয়েছেন।

শিকাব ক'বলে শুধু শবীব শক্ত হয তা নয় নানাবকমেব শিক্ষাও যথেষ্ট পাওযা যায। বক্ত দেখলে গা ছমছম কবা বন্ধ হ'যে যায়। দেশেব গবীব চাষী, কাঠুবে প্রভৃতিব সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশা হয। এই সমস্ত লোক, যাবা আমলামাত্রকেই ভয় কবে, ভদ্রলোককে দূবে ঠেলে বাখে, তাবা শিকাবীদেব সঙ্গে এত অসঙ্কোচে মেশে যে আশ্চর্য্য। আনাড়ীব মত নিশানা চুকলে সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয়, বিন্দুমাত্রও দ্বিধা কবেনা। এই সম্বন্ধে দুই-একটি মজাব গল্প বলি। একবাব গোববডাঙ্গাব জ্ঞানদাবাবু

তুই হাকীম সাহেবকে নিযে স্নাইপ (কাদাখোঁচা) মাবতে গেছলেন। স্নাইপ খুব জোবে ওড়ে, মাবা ভযানক কঠিন কাজ। সাহেব তুটি নিতান্ত green অর্থাৎ কাঁচা শিকাবী ছিলেন। তবু সাহেব ত, খুব কেতা ক'বে দডাম দডাম ক'বে টোটা ওডাতে লাগলেন। চিন্তা নেই, টাকা গৌবী সেনেব। প্রায় পনেব মিনিট পবে যখন পাখী একটাও পডল না জ্ঞানদাবাবুব বুড়ো শিকাবী ভযানক চ'টে চেঁচিযে উঠল, "বাবু, এগুলাকে ঘুঘু মাবতি নিয়া যান"। সাহেবদেব অর্থ-বোধ হ'ল, কাবণ বাঙ্গলায় Higher Standard পবীক্ষা পাশ কবেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ বকম বলা এক গান্ধীজী ব'লতে পাবেন, আমাদেব কর্ম্ম নয। আমাব অদৃষ্টে একবাব এই বকম স্তুতিবাদ হয়েছিল। এক প্রকাণ্ড বিলে হাঁস মাবতে গেছি। গাদা গাদা শব কেটে এক সঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈবী হযেছিল। তাইতে শিকাবী-সবদাবকে সঙ্গে নিযে বসেছি, আব গ্রামেব লোক চাবিদিকে ডিঙ্গীতে ঘুবেফিবে হাঁস ওডাচ্ছে। তাব আগেব হপ্তায একদল সাহেব শ'ছয়েক পাখী মেবে নিযে গেছলেন, তাই আমাব পাখীগুলো খুব উঁচুতে আব খুব জোবে উডছিল। আমি আন্দাজ পাচ্ছিলাম না। এক একবাব গুলি যেই ফসকে যায শিকাবীগুলো কোবাস গেযে ওঠে "বাম বাম ব'লে চলে-এ-এ গেল।" একে নিজেব যথেষ্ট বিবক্তি, তাব উপব এই কোবাস্ গান, মনেব অবস্থা কি হ'ল বুঝতেই পাবছেন। শেষকালে দৈব সদয হ'লেন, হঠাৎ আন্দাজ পেলাম। পবে পবে গোটা কযেক হাঁস পডাব পবে শিকাবীদেব কৃপা হ'ল সবদাব ব'লে উঠল, "হ্যাঁ, আজ পাখীগুলো বড বেয়াড়া বকম উডছে।" এই আশ্বাস পেযে আবও কযেকটা পাখী পাওযায় মান বাঁচল। আমি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট, শিকাব আমাব এলাকাব মধ্যেই হচ্ছিল, তবু এই ব্যাপাব।

আব একবাব এব চেযেও বিভ্রাট হযেছিল। কাবণ, নাযক স্বয়ং পুলিশ সাহেব। সে এক পাহাড়ে দেশ কিন্তু জঙ্গল বড কম, কাজেই জানোযাবও বেশী নেই। কোন কোন জাযগায় তু-চাবটে হবিণ মাত্র। নানা তোডজোড ক'বে শিকাব ক'বতে হ'ত। হযত একটা সমস্ত পাহাড হাঁকা ক'বে একটা হবিণ বেব হয। সেটা ফস্কালে সাবা সকাল বৌদ্রে হাঁটাই সাব। আমি তুই-একবাব কপালজোবে একটু কাবদানী দেখাতে পেবেছিলাম তাই আমায গাঁযেব লোকে খাতিব ক'বত। একদিন এই পুলিশ সাহেবটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম আব পাটিলকে বিশেষ ক'বে ব'লে দিলাম যে তাকে একটা হবিণ দেওয়াই চাই। সুতবাং জঙ্গল ভাঙ্গবাব সময় সবচেযে ভাল জাযগাটায তাকে বসালে। কিন্তু বেচাবাব সেদিন নসিব খাবাপ। তু-তুবাব হবিণ এল একেবাবে কাছে, সে আওয়াজও ক'বলে, কিন্তু গুলি লাগল না।

এতে সত্যি লজ্জাব কিছু নেই। আব একটা হবিণ বেব হ'লে হয়ত ঠিক পেত। কিন্তু বেলা বাবটা পর্য্যন্ত মানুষে কুকুবে সাবা বনটা তোলপাড ক'বলে, কিছুই দেখা গেল না। শ্রান্ত হ'যে এক গাছতলায সবাই ব'সে আছি এমন সময পাটিল বোধহয আশ্বাস দেবাব অভিপ্রাযে ব'ললে, "আসছে বাব সাহেব তোমাব কাছে হবিণ বেঁধে এনে দেব।" সবাই হো হো ক'বে হেসে উঠল। পাটিল আমাব দিকে তাকিযে ব'ললে, "তুমি বাবা অতদূবে কেন বসলে ? আমাদেব আজ মাংস খাওযা হ'লনা।" সাহেবটি বিমর্ষভাবে বললে, "I didn't know I was such a rotten shot." (এত বড আনাড়ি আমি তা জানতাম না।) হয়ত এই পাটিলই গ্রামে কি সহবে হ'লে পাঁচ মিনিট অন্তব সাহেবেব পাযেব ধূলো নিত। কিন্তু এ যে বন, এখানে সবাই সমান। বনেব এ শিক্ষাটা সকলেব হওযা ভাল।

অকাবণ নিষ্ঠুবতা যথার্থ শিকাবীব চোখে নিন্দাব জিনিস। যে শিকাবী পাখী কি জানোয়াব জখম ক'বে ছেডে দেয় তাব বড় দুর্নাম হয। বাঘ জখম ক'বে ছেডে আসা ত একটা গুরুতব অপবাধ। কাবণ চোট-খাওযা বাঘ দু-একদিনেব ভেতব বনে এক-আধটা কাঠুবে মাববেই। যে-বাঘ কখনও মানুষেব সংস্রবে আসেনি তাব প্রথম চেষ্টা পলাযনেব, কিন্তু যিনি গুলি খেযেছেন কি মানুষেব বক্ত আস্বাদন কবেছেন, তিনি সদাই মানুষেব পিছু ঘুবছেন। বাগ পেলেই ঘাড মটকে দেন। শিকাবেব তাই একটা কডা নিয়ম আছে যে, বাঘেব উপব একবাব গুলি ছুঁডলে তাকে নিকেশ ক'বে আসতে হবে। আমাব এক বাল্যবন্ধুব প্রথম বাঘ মাবাব গল্প বলি। তিনি উত্তববঙ্গে কোনও মহকুমায চাকবী ক'বতেন। তাঁব শিকাব প্রধানতঃ পদব্রজেই চ'লত। তবে কালেভদ্রে হাকিম মহাশযেব সওয়াবীব হাতীটা পেতেন। দু-চাবটে বনববা' ও চিতাবাঘ মাবাব পব বন্ধুবেব সাধ হ'ল এইবাব এক সত্যি গো-বাঘা মাববেন। একদিন খবব এল, এক দাড়ি-গোঁফওযালা প্রকাণ্ড বাঘ কাদেব মহিষ মেবে এক হোগলা বনে নিযে গেছে। আশে পাশে কোন বাঘমাবা সাহেবলোক ছিলেন না কাজেই বন্ধুব সুযোগ মিল্‌ল। হাকিমবাবুব হাতী নিযে বেবিয়ে প'ড়লেন। সঙ্গে মেচ-জাতীয শিকাবী। খুব ভোবে বনেব বাইবে উপস্থিত হ'লেন। শিকাবী নেমে দেখিযে দিলে কোনখান দিযে বাঘ মহিষটাকে টেনে নিযে গেছে। ধীবে ধীবে হাতী সেই পথে বনে ঢুকল। এবকম ক্ষেত্রে হাতীব পাযেব শব্দে বাঘ সচবাচব পালায না। বড জোব একটু এদিক ওদিক সবে গিযে দেখে যে আগন্তুক কে। এবাব কিন্তু তাও কবলে না। হাতী একেবাবে Kill (মবা মহিষটা)-এব সামনে বন্ধুববকে উপস্থিত ক'বলে।

তিনি দেখলেন যে বাঘটা আধ শোওয়া অবস্থায় মহিষের ওপর দুই থাবা রেখে দিব্যি একমনে ছোট হাজরী করছে। হাতীর পায়ের শব্দে প্রকাণ্ড চাকাপানা মুখটা তুললে। বন্ধুবরের সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুবই শক্ত। তবে বন্ধু আজন্ম বনচারী, সহজে ঘেবড়ে যাবার পাত্র ছিলেন না। নিমেষের মধ্যে বাঘের দুই জ্বলন্ত চোখের মাঝে তাক ক'রে লাগালেন গুলি। যেই না গুলি মারা, বাঘ ভীষণ গর্জ্জন ক'রে দিলে এক লাফ। হাতীটা শিকারী হাতী ছিল না। গৌড়জনসুলভ প্রকৃতি। চক্ষের পলকে মুখ ফিরিয়ে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হ'যে দৌড় দিলে। বন্ধু সতর্ক ছিলেন না, মাথায় একটা গাছের ডাল লেগে গড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে গেলেন। চোট লেগে বেহুঁস হ'যে প'ড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলেন যে হাত পা কিছু ভাঙ্গেনি কিন্তু বন্দুকটা দুখণ্ড হ'য়ে গেছে। সন্তর্পণে সরীসৃপ গতিতে বন থেকে বের হ'লেন। মহা সঙ্কট। জখম বাঘটাকে বনে ছেড়ে যেতেও পারেন না, অথচ ভাঙ্গা বন্দুক নিয়ে করবেনই বা কি ? সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, আস্তে আস্তে সদরের পানে হেঁটে চললেন নূতন বন্দুক সংগ্রহ ক'রে ফিরবেন ব'লে। তখন বেশ বেলা হয়েছে। হঠাৎ দেখলেন দূরে কে হাতী চড়ে যাচ্চে। জোরে ডাক ছাড়লেন। হাতী কাছে এলে দেখলেন এক পরিচিত গারো জমীদার। তাঁকে সব ঘটনা ব'লতেই তিনি তাঁর হাতী ও বন্দুক দিলেন। বন্ধু আবার বনে ঢুকলেন, এবার কিন্তু প্রাণ হাতে ক'রে। জানতেন বাঘ সহজে ছাড়বে না। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে হাতী যখন ভেতরে গেল, দেখলেন যে বাঘ মহিষের উপর শুয়ে আছে। একেবারে কাছে গেলেন তবুও ওঠে না। তখন হাতী শুঁড় দিয়ে বাঘকে নাড়া দিলে। দেখা গেল, বাঘ মধ্যললাটে বিধিলিপি নিয়ে ব্যাঘ্রের প্রেতলোকে চলে গেছে। হাতীর উপর শব তুলে নিয়ে বন্ধু সেই গারো রাজার সঙ্গে মহাধূম ক'রে নগর প্রবেশ ক'রলেন। পকেটে যে রুটি ও গুড় ছিল সেটা খাবার ফুরসৎ এতক্ষণে হ'ল।

একটা ভালুক শিকারের গল্প বলি। Bad shot অর্থাৎ বে-আন্দাজি গুলিমারা কতটা লজ্জার কথা পাঠক তা বুঝবেন। আমার পরিচিত এক সাহেব তাঁর দুই বন্ধু নিয়ে পশ্চিমে সুলেমান পর্ব্বতে ভালুক মারতে গেছলেন। তিনজনেই পাকা শিকারী, কিন্তু সারা সকাল পাহাড়ে পাহাড়ে মহুয়া ও বাদাম গাছের তলায় ঘুরে একটাও ভালুক দেখতে পেলেন না। তখন কতকটা শ্রান্ত ও বিরক্ত হ'যে টিফিন বাক্স নিয়ে ব'সে প'ড়লেন পাহাড়ের গায়ে এক সরু তাকের উপর। সাহেবদের একটু ক্ষিদে বেশী, রসদের গোলযোগ হ'লে কাজ পণ্ড হ'য়ে যায় একথা সবাই জানেন। আমার সাহেবরা যখন রুটি মাখন, নানারকম পশুপক্ষীর মাংস ও পানীয়ের বোতল

নিয়ে বেশ জমে বসেছেন, খুব গল্প চলছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের ফাটল থেকে এক বিশাল কালো ভালুক বেরিয়ে এল। যেই বেরোন, কি তিন সাহেবরই চক্ষের নিমেষে বন্দুক তুলে দুম দাম দুম ক'রে তার উপর তিন আওয়াজ। ঋক্ষরাজ তাক থেকে গড়িয়ে একেবারে খাদে পড়ে গেলেন। তখন তিনজনে মহা তর্ক জুড়ে দিলেন। এ বলে আমার গুলি লেগেছে ও বলে আমার গুলি। তিনজনের বন্দুকের ফাঁদল তিন মাপের, সুতরাং জানোয়ার দেখলেই বোঝা যাবে কার গুলি লেগেছে। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনজনেই খাদে নেমে গেলেন। গিয়ে দেখলেন ভালুকটা মরে পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার গায়ে কোথাও গুলির দাগ নেই, পুচ্ছাগ্রে মাত্র একটা জখম। তখন তিনজনে আবার তর্ক। এ বলে ও তোমার গুলির দাগ, ও বলে ও তোমার। কেউই সে চমৎকার লক্ষ্যবেধের জন্যে দায়ী হ'তে চায় না। শেষে মিটমাট হ'ল। স্থির হ'ল তিনজনেই নিশানা চুকেছেন, পড়বার সময়ে কোন কাঁটাগাছে লেগে ভালুকের ল্যাজের ডগা ছিঁড়ে গেছে।

আমি একবার বাঘের নাকে গুলি লাগিয়ে লজ্জা পেয়েছিলাম সে গল্পটাও করি। বাঘ শিকার অনেক রকমে হয়। এক রকম ত বলেছি, একটা হাতী নিয়ে কি পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে জঙ্গলে ঢুকে kill-এর উপর বাঘকে মারা। আর এক রকম হচ্চে বড়লোকের শিকার, অনেক হাতী নিয়ে। অধিকাংশ হাতী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সারবন্দী হ'য়ে জঙ্গল ভাঙ্গতে থাকে আর যেদিকটায় বাঘ বেরিয়ে পালাবার সম্ভাবনা সেই দিকে হাওদা-বাঁধা হাতীর উপর শিকারীরা বসেন। এই রকম শিকারে বাঘকে খুবই কাছে পাওয়া যায়। পেছনে তাড়া খেয়ে বাঘ বনের কিনারায় এসে মুখ তুলে একবার দেখে নেয় সামনে কি আছে। সেই সময়ে মারার খুব সুবিধা যদি মাথা ঠিক থাকে। এই অবস্থায় আমি একদিন বাঘের অপেক্ষায় রয়েছি। আমার দুদিকে দুজন পাকা শিকারী। সামনের কেশেবনের উপরটা যে রকম ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে বাঘ সোজা আমার কাছে আসছে। হঠাৎ শেষ মুহূর্ত্তে একটু বেঁকে গিয়ে আমার ডানদিকের শিকারীর সামনে মাথা বাড়াল। তিনি আমাকে একটা সুযোগ দেবার ইচ্ছাতে চেঁচিয়ে বল্লেন আপনি মারুন। আমার হাতীতে হাওদা ছিল না, pad-এর (গদীর) উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম, ঝট ক'রে ঘুরে বসতে সাহস হ'ল না। যদি হাতীটা হঠাৎ দৌড় মারে ত মুস্কিল। ডানদিকে নিশানা ক'রতে বাধ বাধ ঠেকল, ফলে গুলি লাগল না। বাঘ ফিরে জঙ্গলে ঢুকল কিন্তু বেশীদূর যেতে হ'ল না, কেননা হাতীর লাইন অনেক এগিয়ে এসেছিল। ভয় পেয়ে বাঘটা তিন লাফে আমার বাঁদিকের

শিকাবীব পাশ দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে বেব হ'ল। তিনি মাবলেন এক গুলি। বাঘ কিন্তু পড়ল না। আমবা তিনজনেই হাতী ফিবিয়ে তাব পিছু নিলাম। খানিক দূবে দেখি এক কুল ঝোপেব ভিতব ব'সে বাঘটা ভীষণ গর্জ্জাচ্ছে। আমি এক ঘা মাবতেই উল্টে প'ডল। আমি আনাড়ী শিকাবী, মনে মহা আনন্দ হ'ল বাঘ মেবেছি। কিন্তু হাতীগুলো যখন তাকে টেনে বেব কবলে, দেখা গেল যে আমি গুলি না মাবলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না, কাবণ আমাব বাঁদিকেব বন্ধু গোটা চাবেক Buck shot ছববা তাব বুকেব ভিতব চালিয়ে দিয়ে ছিলেন। শিকাবেব নিয়ম অনুসাবে বাঘ তাঁব আমাব নয়। হঠাৎ এক মাহুত বাঘেব নাকেব উপব এক জখম দেখিয়ে ব'ললে, "হুজুবই প্রথম গুলি লাগিযে ছিলেন।" আমি সবেগে ঘাড নেড়ে জানালাম যে, আমাব গুলি মোটে লাগেনি, ওটা ছববাব দাগ।

আমাব মৃগযাব প্রসঙ্গ নিয়ে এলেই হাস্যবসেব অবতাবণা হবে সুতবাং সে আব কাজ নেই। এইবাব একটা বড দুঃখেব গল্প বলি। পাঠক বুঝবেন শিকাবকাহিনীতে করুণ বসেব অভাব নেই। একদিন এক ডাক্তাববাবু আমাদেব বাড়ী এসেছিলেন বক্সা দুযাবেব এক চা বাগান থেকে। মস্তবড শিকাবী ব'লে তাঁব প্রতিপত্তি ছিল তাই আমি তাঁকে ব'ললাম, "আমায নিয়ে একদিন বাঘ মাবতে চলুন না।" তিনি ব'ললেন, "মহাশয! আমি নাকে কানে খৎ দিযে বন্দুকধবা ছেড়ে দিযেছি।" কি হযেছিল বাববাব জিজ্ঞেস কবায নিতান্ত অনিচ্ছায় এই গল্প ব'ললেন। তাঁদেব বাগান প্রায ৯০০ একাব জমী। তাব তিন ভাগেব একভাগ পবিষ্কাব ক'বে বাগান হযেছে, বাকী ৬০০ একাব এখনও ভীষণ জঙ্গল, তাব মধ্যে থাকেনা হেন বুনো জানোযাব নেই। সেই বনে পনেব বছব ঘুবে ঘুবে আমাদেব ডাক্তাববাবু অব্যর্থ লক্ষ্য ও অগাধ সাহস সঞ্চয কবেছিলেন। এ ত আসামেব বাগান নয যে ডাক্তাবকে নানা কাজে অকাজে ব্যস্ত থাকতে হয, আব এখানকাব কুলিবা পাহাড়ী, তাদেব অত বেশী ঔষধপত্রও দবকাব হযনা, তাই ডাক্তাবেব সমযেব অপ্রতুল হয়না। তিন বছব আগেব কথা। বিলেত হ'তে এক তাজা ছোট সাহেব এসেছেন। বড সাহেব কাজে বড ব্যস্ত তাই ডাক্তাববাবুকে ডেকে ব'ললেন, "ডাক্তাব, ছোট সাহেবকে একটু শিকাব কবিযে নিযে এস।" এক পুবানো ওস্তাদ শিকাবী হাতী ও মাহুত দিলেন। ছোট সাহেবেব কিন্তু এ বন্দোবস্ত ভাল লাগল না। ডাক্তাব একটা বাবু মাত্র, আব তাব হাতে কিনা বড সাহেব ছেড়ে দিলেন শিকাব শিখতে। বেচাবাব অদৃষ্ট, প্রথম থেকেই ডাক্তাবেব সঙ্গে খিটিমিটি আবম্ভ ক'বলে, ডাক্তাবকে জানিযে দিলে

যে, সে দেশে অনেক শিকার করেছে, তার নতুন শেখবার কিছু নেই। হাতী ক্রমে গভীর বনে এসে উপস্থিত হ'ল। সন্তর্পণে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। শিকারের কানুন অনুসারে মানুষ তিনটিই নিস্তব্ধ নির্ব্বাক। এমন সময় দূরে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড বারশিঙ্গা হরিণ চরছে। ডাক্তার সাহেবকে ব'ললেন, বেশ ক'রে তাক ক'রে একটা গুলি লাগাতে। ছোকরাটি বন্দুক তুললে বটে কিন্তু হাতীর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যতটা গা নড়ে তাতেই তার হাত কাঁপতে লাগল। সে নীচে নেমে মারতে চাইলে। ডাক্তার অনেক বারণ ক'রলেন, প্রবীণ মাহুত জোড়হাত করলে, কিন্তু সেখানে বেশী কথা ত কওয়ার জো নেই, তাকে বন্ধ করা গেলনা। হাতীর ল্যাজ বেয়ে নেমে পড়ল আর হরিণের উপর আওয়াজ করলে। হরিণ পালাল, কিন্তু এদিকে চক্ষের পলকে ভীষণ ব্যাপার হ'য়ে গেল। কাছের ঝোপ থেকে এক প্রকাণ্ড বাঘ এক লাফে ছোকরার ঘাড়ে এসে পড়ল। দেখতে না দেখতে বাঘে মানুষে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। ডাক্তার ইতিমধ্যে নেমে পড়েছেন কিন্তু প্রায় মিনিটখানেক ভরসা ক'রে গুলি মারতে পারলেন না, যদি ছোকরাটির গায়ে লাগে। যখন সুবিধে পেলেন মারলেন বটে, বাঘও গুলি খেয়ে চীৎ হ'য়ে প'ড়ল কিন্তু সাহেবটির মাথা তার আগেই দু থাবার মাঝে পিশে গুড়ো ক'রে দিয়েছিল। শব দুটো নিয়ে ডাক্তার বড় সাহেবের বাঙ্গলায় ফিরলেন। তিনি দেখামাত্র সব বুঝলেন, গম্ভীর স্বরে ব'ললেন, "তুমি চ'লে যাও ডাক্তার, আর আমাকে কখনও মুখ দেখিওনা।" ডাক্তার নীরবে মাথা হেঁট ক'রে চ'লে গেলেন। পরের দিন খুব ভোরে সাহেব ডাক্তারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। আসবাব পত্র প্যাক করা দেখে কাতরভাবে ব'ললেন, "ডাক্তারবাবু, তুমি আমি পনের বছরের বন্ধু, কুঠির বন্ধু নয় আফিসের বন্ধু নয় বন জঙ্গলের বন্ধু, আমার একটা কথায় রাগ ক'রে চলে যেওনা। কিন্তু ছোকরা মায়ের এক ছেলে ছিল, বিশ্বাস ক'রে তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আমরা রক্ষা ক'রতে পারলাম না, ডাক্তার।" ডাক্তার উঠে গিয়ে তাঁর সাধের বন্দুকটি নিয়ে এলেন, নলটা ধ'রে ভূঁয়ে আছাড় মেরে তিন টুকরো ক'রে ফেললেন। সাহেব নিঃশব্দে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই থেকে ডাক্তার আর বন্দুক ধরেন নি।

ইংরেজীতে যাকে sport বলে তাতে নীচতা বা বীরধর্ম্মের অবমাননা কিছু নেই। সাহেবরা বসা পাখী মারেন না। কেউ মারলে তাকে pot shot (হাঁড়ী ভরাবার জন্য শিকার) বলেন। হাতীর উপর থেকে বা মাচানের উপর থেকে বাঘ মারাতে শিকারীর বিপদের অন্ত নেই তাই সেটাও sport ব'লেই গণ্য। কিন্তু কোথাও কোথাও বাজোযাড়াতে

কোঠাবাড়ীব মধ্যে ব'সে যে বাঘ মাবা হয সেটা খুন-খাবাপিব সামিল। সেইবকম, মোটাবে ব'সে ভীষণ ঝকঝকে আলো ফেলে জানোযাবেব চোখ অন্ধ ক'বে দিযে তাকে গুলিমাবা এও আমাব মতে কসাইয়েব কাজ। সত্যি, স্বীকাব না ক'বে উপায নেই যে, যথার্থ মবদেব মত বাঘ মাবা পাযে হেঁটেই হ'যে থাকে। ইতিহাসেব শেব আফগান সম্মুখযুদ্ধেই শেব মেবেছিলেন। আমাদেব একালে যতীন মুখুয্যেও মল্লযুদ্ধে বাঘ মেবে 'বাঘমাবা যতীন' নাম পেযেছিলেন। অবশ্য, বাঘকে ভগবান যেমন নখদন্ত দিযেছেন তাতে শিকাবীব হাতে অস্ত্র থাকায পবাক্রমেব লাঘব হযনা। একবাব এক মস্ত জাঁদবেল ইন্দোবেব শিবাজীবাও হোলকাবেব দববাবে উপস্থিত হ'যে শেব মাবা সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব ক'বছিলেন। হোলকাব জিজ্ঞেস ক'বলেন, "সাহেব, তুমি কি বকম ক'বে শেব মাব ?" বেচাবা সেনানী জবাব দিলেন যে, মাচানই তাঁব মতে প্রশস্ত উপায। বাজা আশ্চর্য্য হ'যে ব'ললেন, "তুমি না জাঁদবেল, গাছেব উপব থেকে লুকিযে বাঘ শিকাব কব!" সাহেব জিজ্ঞেস ক'বলেন, "মহাবাজ, আপনি তবে কি ক'বে মাবেন ?" বাজা উত্তব ক'বলেন, "শেব কে সাথ শেব কী লডাই। চলিযে, সুবোকো মেবে সাথ বাতায়ঙ্গে।" সাহেব গিযেছিলেন কিনা আমি জানিনা। এই হোলকাব নাকি পাগল ছিলেন। সিংহাসন ছাডাব পব কিছুদিন মাথেবান সহবে থাকতেন। একদিন এক পাবসী ছোকবা খুব জোব সাহেবী কাপড প'বে মহা কাযদায তাঁব বাড়ীব সামনে দিযে ঘোড়ায় চ'ডে যাচ্ছিল। ঘোডাটা কিন্তু খোঁডাচ্ছিল। হোলকাব বাবাণ্ডায দাঁড়িযে এই দৃশ্য দেখে ডাক দিলেন, "পাবসী, এই পাবসী, ইধাব আও।" সে বেচাবা প্রাণপণ চেষ্টায তাব টুপীব মর্য্যাদা বক্ষা ক'বছিল, ঘোডা ছুটিযে দিলে। বাজাও ছাডবাব পাত্র নয, সেপাই পাঠিযে তাকে ঘোডা শুদ্ধ ধবিযে আনালেন। হিন্দীতে হুকুম ক'বলেন, "উতব যাও, ঘোড়ে কা পায়েব দেখো।" দেখা গেল এক পাযে ঘা, তাই ঘোডাটা খোঁডাচ্ছিল। বাজা চ'টে আগুন হ'যে গেলেন। চাব জন লোক সঙ্গে দিযে পাবসীটিকে ব'ললেন, "ঘোডাব মুখ ধবে আস্তে আস্তে আস্তাবল নিয়ে যাও। পথে যদি ঘোড়ায চডতে চেষ্টা কব ত আমাব সেপাইবা তোমায খাদে ফেলে দেবে। আব ফেব যদি কোন ঘোড়াকে কষ্ট দাও ত তোমাব ঠ্যাঙ্গ ভেঙ্গে দেব।" পাগল বই কি, নইলে বাঘেব জন্য ঘোডাব জন্য এত দবদ!

হবিণ শিকাবে বড আনন্দ পাওযা যায়, যদিও তাতে কোন বিপদেব আশঙ্কা নেই। পাঠক আমাকে হঠাৎ কাপুরুষ ব'লে ব'সবেন না যেন। হবিণগুলো যে বকম নির্ম্মমভাবে ক্ষেতেব শস্য ধ্বংস কবে তা দেখলে বুঝবেন যে, তাদেব মেবে ফেলা অস্ত্রধাবীব একটা কর্ত্তব্যেব মধ্যে। ববাহ

আর হরিণ কৃষকের এত বড় শত্রু বলেই তাদের মাংস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত খাদ্য ব'লে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। Sport-এর জন্য হরিণ শিকার পায়ে হেঁটেই হয়। দূর থেকে হরিণ নজর ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে কখনও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে, কখনও বুকে হেঁটে, সন্তর্পণে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো যে কত আনন্দ তা বর্ণনা ক'রে বোঝান সম্ভব নয়। তারপরে ঠিক জায়গাটিতে গুলি না লাগাতে পারলে হরিণ হস্তগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ, সে একছুটে ক্রোশখানেক বেরিয়ে যাবে। ক্ষেতের শস্য নষ্ট করাতে সবার সেরা হচ্চে গণ্ডার। একা একটা গণ্ডার এক রাত্তিরের ভেতর বেশ আট-দশখানা ক্ষেত বিধ্বস্ত ক'রে দিতে পারে। তাই উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা গণ্ডারমাংসকে অতি পবিত্র মনে করে। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় এই মাংস পেলে শ্রাদ্ধ নাকি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। আগে ঐ দেশে অজস্র গণ্ডার ছিল। ক্রমশঃ খুব কমে গেছে। শুনলাম সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার নাকি গণ্ডার বাঁচাবার জন্য আইন করছেন। এই দরদটা সময়ে হ'লে, আজ অতিকায় megalosaurus ও dinosaurus পথে পথে ঘুরে বেড়াত। বাড়ী বাড়ী টিয়া পাখীর বদলে লোকে pterodactyl পুষত। তারা ত সব গেল, এখন গণ্ডারটা বাঁচলেই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য কায়েম থাকবে। কি দয়ার শরীর মানুষের! পাখমারাদের কিন্তু দয়ামায়া নেই, তাদের মন্ত্র, "মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার।" কিন্তু সকলের অদৃষ্টে ত গণ্ডারের দেখা মেলেনা। আমার কপালক্রমে একবার মিলেছিল, পাঠককে সেই গল্পটা শোনাব। একদিন কুচবেহারে দুই খবরিয়া আমার কাছে এসে বললে যে, এগার মাইল দূরে এক গণ্ডার এসেছে আর গাঁয়ের লোকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাকে আটকে রেখেছে এক বাবলা বনে। তাদের ইচ্ছা আমি গিয়ে মারি। সে সময় সারারাজ্যে গোটা পাঁচ-সাত গণ্ডার মাত্র ছিল। তাদের সযত্নে সরকারী জঙ্গলে পূরে রাখা হ'ত, বংশ বৃদ্ধি হবে ব'লে। আমি স্থির বুঝলাম যে, এ তারি একটা, আর একে আমি মারলে রাজদণ্ড, অন্ততঃ রাজরোষ, অবশ্যম্ভাবী। মেজ রাজকুমার তখন কুচবেহারে ছিলেন। তিনি স্থির করলেন যে, গণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযান অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে শিখিয়ে-পড়িয়ে এই গল্প রচনা করা গেল যে, জানোয়ারটা এ-রাজ্যের নয়, রঙ্গপুর জেলা থেকে এসেছে। গাড়ী চেপে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। তিনটি হাতী সংগ্রহ ক'রে পাঠান হয়েছিল। একদল কলেজের ছাত্র গেঁড়ামারা দেখার জন্য জিদ ক'রে সঙ্গে এসেছিল। পৌঁছে দেখা গেল আট-দশ বিঘে এক বাবলা বন, তাই ঘেরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্ত্র কেরাসীনের টিন, ঢোলক ইত্যাদি। রাজকুমার একটা হাতী চ'ড়ে

দূবে বনেব উল্টো পিটে চ'লে গেলেন। সু— দ্বিতীয হাতী নিযে ডাইনেব দিকে গেলেন। বনেব সামনে যে খোলা মযদান তাব একদিকে কচুযা সাহেব তৃতীয় হাতীব উপব বইলেন, অন্যদিকে আমি ছেলেদেব নিযে ভুঁযে দাঁড়িযে বইলাম। বাজকুমাব আমাব হাতে একটা খুব জোবালো Cordite বন্দুক দিযেছিলেন কিন্তু আমাব মতলব ছিল যে, পাবতপক্ষে বন্দুক ছুঁড়বনা। ছেলেদেব আমাব পিছনে সূচীব্যূহ ক'বে দাঁড় কবিযেছিলাম। তাদেব তালিম দিযে বেখেছিলাম যে, গেঁডা যদি আমাদেব পানে তাডা কবে ত সকলে দিকবিদিকে দৌড দেবে, সোজা নয এঁকে বেঁকে। তাদেব বাঁচাবাব জন্যে দবকাব হয ত আমি বন্দুক ছুঁডব, নইলে নয়। সকলে আপন আপন ঘাটি নিলে পব একটা বাঁশী বাজল আব চাষাবা চাবিদিকে মহা উৎসাহে ঢাক-ঢোল বাজাতে আবম্ভ ক'বে দিলে। দেখা গেল যে, বনেব ভেতব একটা বাচ্চা হাতীব মত জন্তু দৌডাদৌডি কবছে, একবাব এদিক একবাব ওদিক, যেন ভয় পেযেছে। হঠাৎ দডাম ক'বে এক মোটা আওযাজ হ'ল, বোঝা গেল সু— তাব প্রকাণ্ড সেকেলে ten bore বাইফেলটা ছুঁডেছে। গেঁডা বনেব ভেতব ঢুকে প'ডল। সু— চেঁচিয়ে বললে, "সাবধান জিৎ, লেগেছে।" আবাব বন্দুকেব আওযাজ হ'ল, এবাব পিং গোছেব শব্দ, বুঝলাম বাজকুমাব মাবলেন। সোঁ ক'বে একটা গুলি ছেলেদেব মাথাব ওপব দিযে চ'লে গেল। ভীষণ দুর্ঘটনা হ'তে হ'তে বেঁচে গেল। কিন্তু বিধাতা পুরুষকে ডাকবাব আমাব সময হ'লনা কাবণ তখনই সেই প্রকাণ্ড গণ্ড-মৃগ জঙ্গল ভেঙ্গে মযদানে উপস্থিত হ'ল। কোন দিকে যায়, দেখতে দেখতে কচুযা সাহেবেব হাতীব দিকে মাথা নীচু ক'বে তেডে গেল। ভাগলো হাতী ল্যাজ তুলে। সাহেব দুবাব বন্দুক চালালেন, লাগলনা। গণ্ডাবটা যে কি ভয়ানক দেখাচ্ছিল কি বলব। সু—ব গুলিটা গলাব কাছে লেগে অনেকখানা মাংস বেবিযে পডেছে, ঝব ঝব ক'বে বক্ত পডছে, বাগে পাগল হ'যে প্রথমে হাতীটাকে তাডা ক'বলে তাবপব এক টাট্টু ঘোডা চবছিল সেটাকে প্রায খতম ক'বলে। আমবা কৃষ্ণনাম জপছিলাম কিংবা ওইবকম একটা কিছু কবছিলাম। কিন্তু ছেলেদেব দিকে ফিবলনা আমাব বিশ-পঁচিশ হাত দূব দিয়ে বেবিযে চ'লে গেল। কি বিকট শব্দ হচ্ছিল, মুখে কি বকম খক্ খক্ খক্ কবছিল, আব গাযেব ঢালগুলো খসখস কবছিল। আমাব বেযাবাটা ত ভযে আত্মহাবা হ'য়ে কুকবি হাতে গেঁডাব পিছু পিছু দৌড'ল। গেঁডা ত পালাল। পিছু পিছু উডে বেযাবা। কচুযা সাহেবকে নিযে তাঁব হাতী অন্তর্দ্ধান। দুই-এক মিনিটে বাজকুমাব ও সু— "কোথা গেল কোথা গেল" ক'বতে ক'বতে এসে পড়ল। আমি ব'লে দিলাম আমার বেয়াবাব পাগডী লক্ষ্য

ক'রে এগুতে। হাতী ছুটো ছুটল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটলুম। একটু পরে দেখি অনেক দূরে গেঁড়াটা কুকুরের মত ক'রে ব'সে রয়েছে। বোধ হ'ল আর দৌড়বার দম নেই। প্রায় তিনশ' গজ দূর থেকে রাজকুমার গুলি লাগাতেই উল্‌টে প'ড়ল। তারপর দুদিন ধ'রে সেই পবিত্র মাংস বিতরণ হ'ল। সেদিন বন্দুক না মেরে আমি বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলুম। রাজকুমার নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিলেন তাই মহারাজের রাগ হ'তে স্নু— বেঁচে গেল।

যদি পাঠকের মনে এ রকম কোনও কুসংস্কার থাকে যে জাতিবিশেষের শিকার বিষয়ে একটা জন্মগত অধিকার আছে তাহলে আমি মিনতি করি যে সেটা বর্জ্জন করুন। কি লক্ষ্যভেদে কি সাহস পরাক্রমে অমুক দেশের লোকের প্রাক্তন সংস্কার আছে তা বলা যায় না। সবটাই আবেষ্টনের কথা। মৃগয়া অর্থ-সাপেক্ষ আমোদ। অজস্র টোটা না ওড়ালে সিদ্ধিলাভ হয়না। তবে সিদ্ধি নানারকমের। রাজা-রাজড়াদের শিকারক্যাম্প কতকটা political (মংলবী) ব্যাপার। তাই অতিথি এলে তাকে তুষ্ট করবার রীতিমত বন্দোবস্ত রাজাবাহাদুরদের থাকে। খুব মহামান্য অতিথির খাতিরে মাংসে আফিঙ্গ মিশিয়ে বনে রেখে দেওয়া হয় এরকম নিন্দাবাদও শুনেছি। এটা বাড়াবাড়ি, হয়ত সত্যি নয়। কিন্তু আর একরকম ব্যবস্থার কথা অনেকেই জানেন। রাজা খুব হুঁসিয়ার দেখে বেছে একজন A D C-কে অতিথির হাওদায় বসিয়ে দেন আর খুব শক্ত তাগিদ দিয়ে রাখেন, "এঁকে আজকের বাঘটা দেওয়াই চাই, বুঝলি? ওঁর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ করবি আর বলবি যে তোর গুলি লাগেনি।" ফলে অতিথির ব্যাঘ্র হনন নির্ব্বিবাদে সমাধা হয়। আরও যে কতরকম ফন্দী আছে বলা শক্ত। পাঠক হয়ত জানেন আমাদের দেশে দাড়িওয়ালা সিংহ এখন আর নেই। কাঠিয়াবাড়ে গীর জঙ্গলে এক রকম নেড়া সিংহ আছে মাত্র। একবার এক রাজা কোনও মহাপুরুষকে খুসী ক'রবার জন্য লুকিয়ে বারটা দাড়িওয়ালা সিংহ আফ্রিকা থেকে আনিয়ে বনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হয়ত সে সময় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কিন্তু পরে সব কথাটা জানাজানি হ'য়ে যায়। হ'লেই বা কি? জানেনই ত, দুকানকাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যায়! এসব sport নয়, sport-এর নামে ধাপ্পাবাজী। তবু জানা ভাল। কুচবেহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কর্জ্জন লাটের একবার বড় মনকষাকষি হয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দেশময় ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল। মহারাজ লাটসাহেবকে এক রকম তুড়ি দিয়েই বাদশাহের হুকুম নিয়ে অভিষেক-উৎসবে বিলেত চ'লে গেলেন। মেজাজী লাটসাহেব এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। শেষ

ঝগড়াটা মিটল এই শিকারের সাহায্যে। এমন একটা সময় এল যখন ভূটান সংক্রান্ত কিছু কাজে কর্জ্জন সাহেবের মহারাজকে দরকার প'ড়ল। অন্য কেউ হ'লে হুচারবটে সেলামীর তোপ বাড়িয়ে দিলেই কার্য্যোদ্ধার হ'ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লাটসাহেব শিকারের চার ফেললেন। আসামে ধূম ক'রে ক্যাম্প ক'রলেন আর মহারাজকে অনুরোধ ক'রলেন তার ভার নিতে। বহুদিনের মনোমালিন্য দূর হ'ল। আসল কাজের কি হ'ল তা আমার জানা নেই। তবে শিকারের পর আমাদের মহারাজ ভূটানের রাজপ্রতিনিধি থাম্পু জাম্পেনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'রতে গেছলেন মনে আছে। এটাও মনে আছে যে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বিনা আয়াসে কিছু টাকা ধার পাওয়া গিয়েছিল ঐ সময়ে। কর্জ্জন সাহেব রাজকার্য্যও সম্পন্ন ক'রলেন, বাঘও মারলেন। শিকারের political aspect (রাজনৈতিক উপযোগ) দেখিয়ে এ পর্ব্ব শেষ করলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বৌদ্ধধর্ম্মের দান

(৩) হীনযান—

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক

পূর্ব্বেই এ কথা বলেছি যে বৌদ্ধধর্ম্মেব মূলসূত্রগুলিব বা বুদ্ধেব বাণীব তত্ত্বনির্দ্দেশ কবতে গিয়ে কালক্রমে নানা দার্শনিক মতেব সৃষ্টি হয়েছিল। সে সব মতাবলম্বী সম্প্রদায়েব ভিতব চাবটী নিজেদেব বিশিষ্ট অধ্যাত্মদৃষ্টি বা দর্শনেব জন্য বৌদ্ধসংঘে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ও বহুদিন ধবে তাদেব প্রভাব বিস্তাব কবেছিল। এই চাবটী সম্প্রদায়েব নাম হচ্ছে—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচাব। ব্যাবহাবিক সংজ্ঞা দিতে গেলে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিককে হীনযান ও মাধ্যমিক ও যোগাচাবকে মহাযান বল্‌তে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হীনযান-মহাযান এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ যে একটীকে বাদ দিয়ে অন্যটীব পৃথক বিচাব সম্ভবপব নয়। উভয়েব সম্বন্ধ অতিনিকট ও প্রভেদ অতিসূক্ষ্ম। বিশেষ কোন যুগে বৌদ্ধসংঘেব ভিতব যে পবস্পববিবোধী দুটী দলেব সৃষ্টি হয়েছিল তা' মনে কবা অসঙ্গত হবে। হীনযান-সম্প্রদায়েব ভিক্ষুও যে মহাযানপন্থী হ'তে পাবতেন তাব বহু প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু প্রথমে ছিলেন বৈভাষিক এবং জীবনেব প্রথম ভাগে তিনি অভিধর্ম্মকোষ-নামক যে গ্রন্থ রচনা কবেন তা' বৈভাষিকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। পবে এই বসুবন্ধুই যোগাচাব-বাদ অবলম্বন ক'রে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা-নামক বিশিষ্ট দার্শনিক মত স্থাপনা কবেন। সেই সময়ে তিনি যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন সেগুলিই হচ্ছে বিজ্ঞানবাদেব প্রামাণিক গ্রন্থ।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়েব উদ্ভব সর্ব্বাস্তিবাদে এবং উভয়েব প্রাচীন নাম সর্ব্বাস্তিবাদ ছিল একথা বলাও চলে। বস্তুতঃ সর্ব্বাস্তিবাদেব সাতখানি অভিধর্ম্ম বা দার্শনিক গ্রন্থই বৈভাষিকদেব শাস্ত্র। এই সাতখানি গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞানপ্রস্থান, ধর্ম্মস্কন্ধ, সংগীতিপর্য্যায়, বিজ্ঞানকায, প্রজ্ঞপ্তিপাদ, প্রকবণপাদ ও ধাতুকায়পাদশাস্ত্র। জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র কাত্যাযণীপুত্রেব বচিত। তিনি ছিলেন কুশাণবংশীয় বাজা কণিষ্কেব সমসাময়িক, সর্ব্বাস্তিবাদেব প্রধান আচার্য্যও খৃষ্টীয় প্রথম শতকেব লোক। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বসুবন্ধু অভিধর্ম্মকোষশাস্ত্র-নামক যে গ্রন্থ বচনা কবেন তা' জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রেবই টীকা। সর্ব্বাস্তিবাদের অভিধর্ম্মগ্রন্থগুলি অবলম্বন ক'বে যে সব প্রাচীন টীকা প্রণযন কবা হয়েছিল তাকে বিভাষা বলা হ'ত। সেই থেকেই বৈভাষিক নামেব উৎপত্তি। সুতবাং বৈভাষিক মতেব সৃষ্টি যে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকেই হয়েছিল এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

সৌত্রান্তিক-মতের উৎপত্তি হয় আরও কিছু পরে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে সর্ব্বাস্তিবাদের আচার্য্য কুমাররাত বা কুমারলাত ও তাঁর শিষ্য হরিবর্ম্মণ এই নূতন মতবাদ স্থাপন করেন। অভিধর্ম্ম ও বিভাষা গ্রন্থগুলিকে প্রামাণিক ব'লে স্বীকার না ক'রে তাঁরা বল্লেন যে বুদ্ধের বাণী সম্যক্ উপলব্ধি করতে হ'লে সূত্রগ্রন্থগুলির শরণ নিতে হবে। কারণ তা'তেই শুধু বুদ্ধের নিজের মুখনিঃসৃত বাণী রয়েছে। কুমাররাতের প্রণীত কোন মৌলিক গ্রন্থের খোঁজ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে হরিবর্ম্মণের প্রণীত সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র-নামক গ্রন্থের মূল বিলুপ্ত হ'লেও চীনা অনুবাদ রয়েছে। এ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমে।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক এই উভয় দার্শনিক মতেরই মূল হচ্ছে সর্ব্বাস্তিবাদ। বৈভাষিকেরা সর্ব্বাস্তিবাদের অভিধর্ম্ম ও সৌত্রান্তিকেরা সূত্রগ্রন্থ অবলম্বন ক'রে নিজেদের মত গ'ড়ে তোলেন ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবার আমরা তাই বিচার করব।

বৈভাষিকেরা ছিলেন অস্তিবাদী বা realists। তাঁদের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক নাম 'সর্ব্বাস্তিবাদে' সেই দার্শনিক মতই সূচিত হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে তাঁদের 'অস্তি'বাদ যে জড়বাদীর realism সে কথা বলা চলে না। আত্মা অথবা পুদ্গলের (individuality) অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না সত্য—কিন্তু নির্ব্বাণ যে সম্পূর্ণ আনন্দময় সে বিশ্বাস তাঁদের অটল ছিল। সে বিশ্বাসে তাঁরা প্রাচীন বৌদ্ধমতই অনুসরণ করতেন। শুধু পঞ্চস্কন্ধ ও ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের আপেক্ষিক (relative) অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব স্বীকার করতে গিয়েই তাঁরা মূল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রদর্শিত পন্থা থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

বৈভাষিকেরা 'ধর্ম্ম' শব্দের যে অর্থনির্দ্দেশ করলেন তা' পাশ্চাত্য দর্শনের phenomenon-এর সহগামী বলা চলে। যা' স্বলক্ষণ বা নিজের বিশিষ্ট লক্ষণ ধারণ করে তাই হ'ল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়—ইন্দ্রিয়ের সেই গ্রহণ ব্যাপারেই ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ ধরা পড়ে। আর ধর্ম্মের প্রকৃত স্বভাব-সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন না হ'লে মুক্তি লাভ হয় না। বসুবন্ধুর নিজের কথায় বল্তে হ'লে—

ধর্ম্মাণাম্ প্রবিচয়ম্ অন্তরেণ নাস্তি।
ক্লেশানাম্ যত উপশান্তয়েঽভ্যুপায়ঃ।

অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহের স্বভাবসম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান ব্যতিরেকে ক্লেশ উপশান্তির উপায় লাভ হয় না। আর ক্লেশ বা দুঃখের নিরোধ না হ'লে যে নির্ব্বাণের

পথ মুক্ত হয় না তা' বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম আলোচনাতেই দেখতে পেয়েছি। ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের স্বভাব-পরিচ্ছেদ করতে গিয়ে বৈভাষিকেরা ৭৫টী ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্থাপন করেছেন। এই ধর্ম্মসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—সাস্রব বা মলযুক্ত এবং অনাস্রব বা মলহীন।

সাস্রব ধর্ম্মকে 'সংস্কৃত'ধর্ম্ম নামেও অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত ধর্ম্মের অর্থ করা হয়েছে "সংস্কৃতা ধর্ম্মা রূপাদিস্কন্ধপঞ্চকম্" অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ বা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্ম্মসমূহকেই সংস্কৃত বলা হয়। সংস্কৃত ধর্ম্ম হচ্ছে সেই ধর্ম্ম যা' একীভূত ও সম্ভূত বা সমীকৃত (সমেত্য, সম্ভূয) হেতুসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়। প্রতি ধর্ম্মের উৎপত্তির পেছনে নানা হেতুর সমাবেশ রয়েছে—প্রতি ধর্ম্মই অন্যান্য ধর্ম্মের সংযোগে উদ্ভূত হয়। এই জন্যই একটি সংস্কৃত শ্লোক পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্রভাবে গৃহীত হয়েছিল—

> যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতঃ।
> হ্যবদত্তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ।

অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ হেতুপ্রভব। তথাগত বা বুদ্ধ তাঁ'দের হেতু ও নিরোধোপায় নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অবলম্বন ক'রেই সংস্কৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। আর ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা যা' গ্রহণ করা অসম্ভব হয় ও যা' অহেতুকী তা'কেই 'অসংস্কৃত' বা অনাস্রব ধর্ম্ম বলা হয়। এইজন্য ইউরোপীয় ভাষায় এ দুই শব্দের অনুবাদ হয়েছে conditioned (সংস্কৃত) ও unconditioned (অসংস্কৃত)। সংস্কৃত ধর্ম্মের সংখ্যা ৭২ আর অসংস্কৃতের সংখ্যা ৩। এই ৭২টী সংস্কৃত ধর্ম্মকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—রূপ, চিত্ত, চৈত্ত ও চিত্তবিপ্রযুক্ত। পঞ্চস্কন্ধ থেকেই এদের উদ্ভব। পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ ও চিত্তধর্ম্ম, রূপ ও বিজ্ঞান এই উভয় স্কন্ধকে অবলম্বন ক'রে উদ্ভূত হয়। আর চৈত্ত ও চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্মসমূহের উদ্ভব হয় বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন স্কন্ধকে আশ্রয় ক'রে।

রূপ হচ্ছে একাদশ প্রকারের—পঞ্চেন্দ্রিয় বা গ্রাহক আর তাঁ'দের প্রত্যেকের গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ চক্ষু, শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় আর তাঁ'দের গ্রাহ্যধর্ম্ম, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই শ্রেণীর আর একটী ধর্ম্ম হচ্ছে অবিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞান-বহির্ভূত ধর্ম্ম। পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তির জাগ্রত অবস্থায় সে ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়শক্তির শুধু

বিকল অবস্থাতেই তা'ব প্রভাব পবিলক্ষিত হয। অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্মেব ব্যাখ্যা কবতে গিযে বসুবন্ধু বলেছেন—

বিক্ষিপ্তচিত্তকস্যাপি যোঽনুবন্ধঃ শুভাশুভঃ।
মহাভূতান্যুপাদায সা হ্যবিজ্ঞপ্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ চিত্তেব বিক্ষিপ্ত অবস্থাতেও মহাভূতগুলিকে অবলম্বন ক'বে যে শুভাশুভ ধর্ম্মেব অনুবন্ধ বা প্রবাহ (serial continuity) ঘটে তা'কেই অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্ম বলা হয। মহাভূত চাবটী—পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু—এবং তা'বাই হচ্ছে অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্মেব উৎপাদ—হেতু। সমাধির কোন কোন অবস্থায চিত্ত যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখনও অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম্মেব আবির্ভাব হ'তে পাবে।

দ্বিতীয শ্রেণীব সংস্কৃত ধর্ম্ম হচ্ছে চিত্ত। চিত্ত মন ও বিজ্ঞান একার্থক। চিত্ত ধর্ম্ম ৬টী—চক্ষু শোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা ও কাযাত্মক পঞ্চবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। বস্তুতঃ বিজ্ঞানেব কোনটীই চিত্তেব বহির্ভূত নয। বিজ্ঞান-পঞ্চক ও মনোবিজ্ঞান চিত্তেব অঙ্গ ও চিত্ত হচ্ছে সর্ব্বসাধাবণ বিজ্ঞান বা sensorium commune। সেইজন্য বসুবন্ধু বলেছেন "ষণ্ণাম্ অনন্তবাতীম্ বিজ্ঞানম্ যদ্ধি তন্মনঃ"—মন হচ্ছে ষট্ বিজ্ঞানেব অন্তর্ভূত বিজ্ঞান। মন বা চিত্তকে কখনো কখনো বাজা বলা হয়েছে কখনো বা তা'কে বৃক্ষেব কাণ্ডেব সহিত তুলনা কবা হযেছে। সেখানে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলিকে বলা হযেছে—পাতা, ফুল ও শাখা। ধর্ম্মপদেব প্রথম শ্লোকে মনেব ঐ অর্থই গ্রহণ কবা চলে—

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেট্ঠা মনোমযা।

অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ মনোপূর্ব্বগামী, মনোশ্রেষ্ঠ ও মনোময। সকল ধর্ম্মই হচ্ছে মনেব বশবর্ত্তী।

তৃতীয শ্রেণীব সংস্কৃত ধর্ম্ম হচ্ছে চৈত্তধর্ম্ম বা চিত্তেব বিষযীভূত ধর্ম্ম। চৈত্ত ধর্ম্মেব সংখ্যা ৪২ ও সেগুলি ছয ভাগে বিভক্ত—

(১) চিত্ত-মহাভূমিক ধর্ম্ম—১০

বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ, ছন্দ, মতি, স্মৃতি, মনস্কাব, অধিমুক্তি ও সমাধি।

(২) কুশল-মহাভূমিক ধর্ম্ম—১০

শ্রদ্ধা, অপ্রমাদ, প্রশব্ধি, উপেক্ষা, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, অহিংসা, বীর্য্য।

(৩) ক্লেশ-মহাভূমিক ধর্ম্ম—৬

মোহ, প্রমাদ, কৌসীদ্য, অশ্রাদ্ধ্য, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য।

(৪) অকুশল-মহাভূমিক ধর্ম্ম—২

অহ্রীকতা, অনপত্রপা।

(৫) উপক্লেশভূমিক ধর্ম্ম—১০

ক্রোধ, ম্রক্ষ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, প্রদাশ, বিহিংসা, উপনাহ, মায়া, শাঠ্য, মদ।

(৬) অনিয়তভূমিক ধর্ম্ম—৮

বিতর্ক, বিচার, কৌকৃত্য, রাগ, মান, বিচিকিৎসা প্রভৃতি।

পূর্ব্বেই বলেছি চৈত্ত ও চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্ম বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন স্কন্ধকে আশ্রয় ক'রে উদ্ভূত হয়। বেদনা ও অনুভব বা অনুভূতি একার্থক। এই অনুভূতি সুখদুঃখময় হ'তে পারে ও সুখদুঃখহীনও হ'তে পারে। আর বস্তুর স্বভাবগ্রহণেই সংজ্ঞার উৎপত্তি।—"সংজ্ঞা নিমিত্তোদ্‌গ্রহণাত্মিকা"। বস্তুর অবস্থা বিশেষকেই নিমিত্ত বলা হয়েছে—আর তা'র উদ্‌গ্রহণ বা পরিচ্ছেদই (determination) হচ্ছে সংজ্ঞা। আর সংস্কার-স্কন্ধের উৎপত্তি হয় প্রকৃতপক্ষে অন্য চার স্কন্ধকে আশ্রয় ক'রে—'সংস্কারস্কন্ধশ্চতুর্ভ্যোঽন্যে সংস্কারাঃ'। সুতরাং এই যদি তিনটী স্কন্ধের স্বভাব হয় তাহ'লে প্রথম পাঁচ প্রকারের চৈত্ত ধর্ম্ম যে তা'দের থেকেই উৎপন্ন তা' সহজেই বোঝা যায়। তা'দের 'মহাভূমিক' বলা হয়েছে তা'র কারণ তা'রা চিত্ত থেকেই উদ্ভূত। ভূমির বিশেষ অর্থ হচ্ছে উৎপত্তিবিষয় অর্থাৎ যে স্থান থেকে উৎপত্তি হয়। চিত্ত থেকে সব ধর্ম্মের উৎপত্তি বলেই মহাভূমি হচ্ছে চিত্ত।

যে সব ধর্ম্ম চিত্তের সমস্ত ক্রিয়াকেই আশ্রয় করে তা'দের মহাভূমিক ধর্ম্ম বলা হয়েছে। বেদনা বা নানা প্রকারের অনুভব, চেতনা বা চিত্তপ্রস্যন্দ (that which conditions the thought), সংজ্ঞা ('বিষয়-নিমিত্ত গ্রহণ'), ছন্দ ('অভিপ্রেতে বস্তুনি অভিলাষঃ'), স্পর্শ ('ইন্দ্রিয়-সন্নিপাত'), মতি বা প্রজ্ঞা ('বস্তুনি প্রবিচয়'), স্মৃতি, মনস্কার ('আলম্বনে চেতস আবর্জ্জনম্ অবধারণং') ও সমাধি (চিত্তৈকাগ্রতা) চিত্তের সমস্ত ক্রিয়াতেই বিদ্যমান। সেই জন্যই এগুলিকে চৈত্ত ধর্ম্ম বলা হয়েছে।

চিত্তের কুশলী অবস্থাতে যে সব ধর্ম্মের উদ্ভব হয় তা'দের কুশল-মহাভূমিক-ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা ('চেতসঃ প্রসাদঃ'), অপ্রমাদ বা কুশলধর্ম্মের অবহিততা, প্রশ্রব্ধি বা চিত্তলাঘব ('চিত্ত-কর্ম্মণ্যতা'), উপেক্ষা বা চিত্তসমতা, হ্রী (গৌরবতা), অপত্রপা ('অবদ্যে ভয়দর্শিত্বম্,) অলোভ, অদ্বেষ (মৈত্রী), বিহিংসা ও বীর্য্য ('চেতসোঽভ্যুৎসাহঃ')।

ক্লেশমহাভূমিক ও অকুশলমহাভূমিক :ধর্ম্মসমূহ প্রকৃতপক্ষে কুশল-মহাভূমিক-ধর্ম্মসমূহের বিরুদ্ধাচারী ধর্ম্ম। শ্রদ্ধার অভাবে মোহ বা অবিদ্যা,

অপ্রমাদেব অভাবে প্রমাদ, বীর্য্যেব অভাবে কৌসীদ্য, প্রশ্রদ্ধি বা চিত্ত-লঘুতাব অভাবে স্ত্যান বা অকর্ম্মণ্যতা, ঔদ্ধত্য, হ্রীব অভাবে অহ্রীকতা ও অপত্রপাব অভাবে অনপত্রপা প্রভৃতি ধর্ম্মেব উৎপত্তি হয়।

উপক্লেশ-মহাভূমিক ধর্ম্মগুলিও অকুশল বা কুশল-ধর্ম্মেব বিরুদ্ধাচাবী। ক্রোধ, ম্রক্ষ বা শত্রুতা, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি ধর্ম্মও চিত্তেব অকুশল অবস্থায উৎপন্ন হয়। আব অনিয়তভূমিকধর্ম্ম চিত্তেব কুশল ও অকুশল দুই অবস্থাতেই উদ্ভূত হ'তে পাবে।

আব এক শ্রেণীব সংস্কৃত ধর্ম্মকে বলা হয় চিত্তবিপ্রযুক্ত সংস্কাব অর্থাৎ যে ধর্ম্মেব চিত্ত ও রূপেব কোনটীব সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। পূর্ব্বেই দেখেছি যে চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্ম সংস্কাব-স্কন্ধকে আশ্রয় ক'বে উদ্ভূত হয়—ও তা'দেব সংখ্যা ১৪—প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, সভাগতা, আসঙ্গিক, সমাপত্তি, জীবিত, লক্ষণ ও নামকায ইত্যাদি। এ সব ধর্ম্মেব বস্তুত্ব নেই, তা'বা চৈত্ত ধর্ম্মও নয়, তবে চৈত্তেব সহিত তা'দেব ভাবসাদৃশ্য আছে। প্রাপ্তি দুই প্রকাবেব—লাভ ও সমন্বয় (acquisition and possession)। ধর্ম্ম, আশ্রয়, স্কন্ধ, আযতন, প্রভৃতিব লাভ ও সমন্বয় কার্য্যকে 'প্রাপ্তি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্তিসংস্কাব স্ব স্ব ধর্ম্ম-প্রবাহকেই অপেক্ষা কবে, অন্যেব কর্ম্মকে আশ্রয কবে না। সভাগতা বা নিকায-সভাগতাও এক-প্রকাবেব ধর্ম্ম। সাধাবণতঃ নানা বস্তু বা সত্ত্বসমূহের ভিতব যে সাম্যেব বা সাদৃশ্যেব অনুভূতি হয তা'ব হেতু হচ্ছে সভাগতা সংস্কাব। আসঙ্গিক সংস্কাব চিত্ত ও চৈত্তধর্ম্মপ্রবাহের নিবোধ উৎপন্ন কবে। সেইজন্য এই ধর্ম্মকে নদীস্রোত-নিবোধেব সঙ্গে তুলনা কবা হয় (নদীতোয-নিবোধবৎ)। সমাপত্তি হচ্ছে মহাভূতেব সমতা উৎপাদন (মহাভূত-সমতাপাদনম্)। চিত্ত প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবাহ নিরুদ্ধ হ'লে চিত্তেব যে সমতা উৎপাদিত হয় তা'কেই সমাপত্তি বলা হয। ধ্যান সমাধি প্রভৃতি সমাপত্তিবই নামান্তব। সেইজন্যই সমাপত্তি দুই প্রকাবেব অসংজ্ঞি ও নিবোধ সমাপত্তি, অর্থাৎ আসংজ্ঞিক ও নিবোধ-সংস্কাবেব সংগ্রহ। মোক্ষকামীব পক্ষেই এ দুই ধর্ম্ম উৎপাদন সম্ভবপব। 'জীবিত'ও একপ্রকাব ধর্ম্ম, 'জীবিত' ও আযুস্ উভয়েই একার্থক। এ সংস্কাবেব দ্বাবা বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রবাহেব স্থিতি নিরূপিত হয। সুতবাং এই ধর্ম্মই হ'ল বসুবন্ধুব মতে "আধাব উষ্ণবিজ্ঞানযোঃ"—অর্থাৎ আযুঃই হচ্ছে উষ্ণতা ও বিজ্ঞানেব আধাব বা আশ্রযস্থান। আযুব এই অর্থ নির্দ্ধাবণে বসুবন্ধু বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করেছেন—

আযুব উষ্মাথ বিজ্ঞানম্ যদা কাযম্ জহত্যমী।
অপবিদ্ধ তদা শেতে যথা কাষ্ঠমচেতনঃ॥

অর্থাৎ যখন আয়ু, উষ্ণা ও বিজ্ঞান কাযকে পবিত্যাগ কবে তখন তা'ব অচেতন কাষ্ঠখণ্ডেব ন্যায অবস্থা উৎপন্ন হয।

লক্ষণ হচ্ছে জাতি, জবা, স্থিতি ও অনিত্যতা এই চাবটী। এ চাবটীব প্রত্যেকেই এক-একটী ধর্ম্ম।

আব তিনটী চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্ম হচ্ছে—নামকায, পদকায ও ব্যঞ্জনকায। সংজ্ঞা, বাক্য ও অক্ষব থেকে এই তিন সংস্কাবেব উৎপত্তি। নামেব সাহায্যে সংজ্ঞাকবণ, ও পদেব সাহায্যে অর্থ পবিসমাপ্তি হয, আব ব্যঞ্জন বা অক্ষব হচ্ছে লিপিব হেতু। সুতবাং এই তিনটীও ধর্ম্মবিশেষ।

এইবাব অনাস্রব বা অসংস্কৃত ধর্ম্ম কোনগুলি তাব বিচাব কবা যাক। পূর্ব্বেই বলেছি যে—যে ধর্ম্ম ইন্দ্রিযগ্রাহ্য নয তাই হচ্ছে অসংস্কৃত (unconditioned) ধর্ম্ম। অসংস্কৃত ধর্ম্ম তিনটী—"আকাশম্ দ্বৌ নিবোধৌ চ" অর্থাৎ আকাশও দুই প্রকাবেব নিবোধ—প্রতিসংখ্যা নিবোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিবোধ।

আকাশেব অর্থ হচ্ছে অনাবৃতি, অর্থাৎ যা' রূপ বা বস্তু (matter) দ্বাবা আবৃত হয না ও রূপ বা বস্তুকে আবৃত কবে না তা'ই হচ্ছে আকাশ। আব প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিবোধ নির্ব্বাণেবই অঙ্গ। প্রতিসংখ্যা নিবোধ হচ্ছে সাস্রব ধর্ম্মসমূহেব প্রত্যেকেব পৃথক্‌ভাবে নিবোধ বা বিসংযোগ —"বিসংযোগঃ পৃথক্ পৃথক্"। এই বিসংযোগ বা নিবোধেব ধর্ম্মত্ব বা দ্রব্যত্ব (entity) আছে, এবং সে ধর্ম্মত্ব অন্য ধর্ম্মেব আশ্রয়ে প্রত্যুৎপন্ন নয—নিত্য। সেই জন্যই নিবোধ আর্য্যসত্য হিসাবে গণ্য হয। প্রতিসংখ্যা হচ্ছে প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাব সাহায্যে সাস্রব ধর্ম্ম-সমূহেব স্বভাবসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ কবাই হচ্ছে প্রতিসংখ্যা নিবোধ। আব যে নিবোধ ধর্ম্মোৎপত্তিব আত্যন্তিক বিঘ্ন ঘটায তাই হচ্ছে অপ্রতিসংখ্যা নিবোধ ('উৎপাদাত্যন্তবিঘ্নঃ')। প্রজ্ঞাব সাহায্যে পৃথক পৃথক্ সাস্রব ধর্ম্মেব প্রকৃত স্বভাব—অবগতিতে এ নিবোধ নয,—যখন ধর্ম্মোৎপত্তিব হেতুসমূহ বিনষ্ট হয ('প্রত্যয বৈকল্যাৎ') তখনই এই নিবোধ ঘটে। সুতবাং এই নিবোধই হচ্ছে বৈভাষিকদেব মতে বৌদ্ধসাধকেব কাম্য। কাবণ এতেই আত্যন্তিক নির্ব্বাণ লাভ হয। বস্তুতঃ যখন সাস্রব ধর্ম্মসমূহেব উৎপাদ বিনষ্ট হয তখনই তিনটী অসংস্কৃত ধর্ম্মেব উৎপত্তি হয। ধর্ম্মশূন্যতাই হচ্ছে অসংস্কৃতত্রযেব লক্ষণ।

বৈভাষিকদেব এই ধর্ম্মপবিচ্ছেদেব পেছনে বযেছে অস্তিবাদ। কিন্তু এই অস্তিবাদে সাংখ্যেব প্রকৃতি পুরুষ কিম্বা আত্মাব কোন স্থান নেই। রূপেব (form or matter) বস্তুত্ব এবং পবমাণুবও বস্তুত্ব আছে বটে কিন্তু সে পবমাণুব কোন স্বাধীন সত্তা নেই। এইখানেই

বৈশেষিকেব সঙ্গে বৈভাষিকেব বিবোধ। বৈভাষিকেব পবমাণু দ্রব্য-পবমাণু (atom, monad) নয, তা'ব কোন দ্রব্যত্ব (substantiality) নেই। সে পবমাণু হচ্ছে সংঘাত-পবমাণু, অর্থাৎ সংঘাত বা রূপ-সংঘাতেব (aggregate of matter) সূক্ষ্মতম অবস্থা। রূপসংঘাতেব সেই সূক্ষ্মতম অবস্থাও স্বলক্ষণবিশিষ্ট—তা'ব লক্ষণ হচ্ছে আটটী—চতুর্মহাভূত বা ক্ষিতি, অপ্, বাযু ও তেজ ও চতুর্ভৌতিক বস্তু—রূপ, বস, গন্ধ ও স্পর্শ। সুতবাং এই পবমাণুব কোন আত্যন্তিক সূক্ষ্মতা (ultimate simplicity) নেই। বৈশেষিকেব পবমাণুব নাশ নেই—কিন্তু বৈভাষিকেব সংঘাত-পবমাণু স্বল্পস্থায়ী, তাব বিনাশ হ'লে তৎসদৃশ অন্য পবমাণু তাব স্থান গ্রহণ কবে। প্রতি সংঘাত-পবমাণুব উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হেতু-পবম্পবাব দ্বাবা নির্দ্ধাবিত হয়।

চিত্ত ও চৈত্ত ধর্ম্মেব (mind ও mental phenomena) সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। চিত্ত বা মনেবও কোন স্বাধীন সত্তা নেই। বিজ্ঞানেব উৎপত্তিতেই মনেব অস্তিত্ব। বিজ্ঞানও স্বল্পস্থাযী, এক বিজ্ঞানেব লয হ'লে নূতন বিজ্ঞান তা'ব স্থান গ্রহণ কবছে। তা'দেব উৎপত্তি ও স্থিতি হেতু-পবম্পবাব দ্বাবা নির্দ্দিষ্ট। ভূতপূর্ব্ব বিনষ্ট বিজ্ঞানই পববর্ত্তী মুহূর্ত্তে জাত বিজ্ঞানেব আশ্রয় হিসাবে গৃহীত হয ও সেই জন্যই তা'কে মন আখ্যা দেওযা হয়। সুতবাং চিত্ত চৈত্তধর্ম্ম 'সংস্কৃত' লক্ষণ নিযেই উৎপন্ন হয।

কোন ধর্ম্মই একটীমাত্র হেতু থেকে উদ্ভূত (একহেতু-সম্ভূত) নহে। প্রতি ধর্ম্মই অন্য কোন ধর্ম্মেব কাবণ-হেতু। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের (causality) পৌর্ব্বাপর্য্য ও সহভাবিত্ব (coexistence) দুইই আছে। প্রদীপ আলোক ও বৃক্ষছাযাব কাবণহেতু—তা'দেব যেরূপ প্রতীত্য-সমুৎপন্নত্ব আছে তেমনি সহভাবিত্বও আছে। এইখানে বৈভাষিকদেব সৌত্রান্তিক-মতেব সঙ্গে বিবোধ—সৌত্রান্তিকেবা ধর্ম্মসমূহেব সহভাবিত্ব স্বীকাব কবেন না। তাঁদেব মতে এক ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'য়ে অন্য ধর্ম্মেব উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বেই দেখেছি যে বৈভাষিকেবা অসংস্কৃত ধর্ম্মত্রয়কেও ভাবস্বভাব (positive) ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ কবেন। এখানেও সৌত্রান্তিকেব সঙ্গে তাঁদেব বিবোধ। সৌত্রান্তিক-মতে অসংস্কৃতত্রয অভাবস্বভাব (negative)—তাঁ'বা স্প্রষ্টব্য বা স্পর্শ কবুবাব বস্তুব অভাবকেই আকাশ ও জাতি বা অনুৎপাদেব অভাবকেই নির্ব্বাণ বলেন। সুতবাং সৌত্রান্তিকেব নির্ব্বাণ হচ্ছে অবস্তুক (unreal) আব বৈভাষিকেব নির্ব্বাণ বাস্তব, অনাস্রব ও আনন্দময় অবস্থা।

প্রথমেই বলেছি যে বৈভাষিকমতে আত্মা বা পুদ্গলের কোন অস্তিত্ব নেই। রূপী ও অরূপীধর্ম্মের অর্থাৎ স্কন্ধ ও মহাভূতের সংযোগে জীবের উৎপত্তি। আর তা'র আত্মা বা বৈশিষ্ট্য বল্‌তে বুঝতে হবে শুধু ধর্ম্মসমূহের সমাবেশ। সৈন্য, পিপীলিকাশ্রেণী, স্রোতস্বিনী প্রভৃতির সঙ্গে এই জীববৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হয়। নানা সৈনিকের একত্র সমাবেশে সৈন্য ও নানা পিপীলিকার সমাবেশে পিপীলিকা-শ্রেণী গঠিত। তা'দের পরস্পরের ভিতর কোন নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ নেই। স্রোতস্বিনীও তেমনি হচ্ছে জলের পূর্ব্বাপর অনুস্মৃতি ও সে অনুস্মৃতিও নিত্য নয়—অনিত্য। সুতরাং আত্মা বা পুদ্গলের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই—আছে শুধু হেতুসম্ভূত ধর্ম্ম, স্কন্ধ আয়তন (বিজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়) ও ধাতু বা ভূত (elements)। গভীরভাবে প্রণিধান করলে উপলব্ধি হয় যে আত্মা নেই—সেখানে আছে শুধু শূন্য। বৈভাষিকেরা এখানে প্রায় শূন্যবাদীদের সমধর্ম্মী হ'য়ে পড়েছেন—কিন্তু সে কথা পরে বিচার করবো। এইবার সৌত্রান্তিক-মতের পরিচয় দিয়েই এ অধ্যায় সমাপ্ত করব।

বৈভাষিকমতে আত্মা নেই বটে কিন্তু ধর্ম্মের অস্তিত্ব, আপেক্ষিক হ'লেও আছে। সে ধর্ম্মের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস আছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান ধর্ম্মের পেছনে রয়েছে একটা হেতু ও সে হেতুও হচ্ছে ধর্ম্মসংঘাত। বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মসংঘাতও ভবিষ্যৎ ধর্ম্মসমূহের কারণ-হেতু। কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা এর কিছুই স্বীকার করেননি, আত্ম বা পুদ্গলশূন্যতা ও ধর্ম্মশূন্যতাই হচ্ছে তাঁদের মতের দুটী মূলসূত্র। শূন্য ঘটের ভিতর যেমন কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই, স্কন্ধ ও ভূতাত্মক দেহের ভিতরেও তেমনি কোন আত্মা নেই। ঘটের অস্তিত্ব ব্যাবহারিক সত্যমাত্র—পরমার্থতঃ তারও কোন সত্তা নেই। ঘট হচ্ছে সংজ্ঞা মাত্র। এ কথা আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যাক্। সৌত্রান্তিকমতে সত্য দুই প্রকারের—সংবৃতি ও পরমার্থ অর্থাৎ relative ও absolute। কোন ধর্ম্ম বা বস্তুকে যখন পরিচ্ছিন্ন করা যায় তখন পরমার্থতঃ তার আর অস্তিত্ব থাকে না। তখন তা'র অস্তিত্ব আছে এ কথা বলা শুধু সংবৃত্তি সত্য মাত্র—relative truth। উদাহরণ—জল। যখন জলকে পরিচ্ছিন্ন ক'রে তার রং, স্বাদ, শৈত্য প্রভৃতি ধর্ম্মকে পৃথক ক'রে বিচার করি তখন সে জলের কোন পৃথক সত্তা থাকে না। তখন শুধু ব্যাবহারিক হিসাবেই তার 'জল' আখ্যা দেই। জলের অস্তিত্ব একটা সংবৃত্তি সত্যমাত্র। তেমনি পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্ম্মেরও কোন অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই—ধর্ম্মও হচ্ছে শূন্যস্বভাব। ধর্ম্ম শূন্যস্বভাব কারণ তা' ক্ষণিক। তা'র কোনও অতীত বা ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই—আছে শুধু ক্ষণিক স্থায়ীত্ব। তা'র প্রধান কারণ এই যে—ধর্ম্মের প্রকৃত স্বভাব প্রতি মুহূর্ত্তেই

বিনষ্ট হচ্ছে ও তাব নূতন স্বভাবেব উৎপত্তি হচ্ছে। এ'তে শুধু ধর্ম্মেব প্রবাহই সৃষ্টি হচ্ছে—সে প্রবাহেব প্রতিধর্ম্মই অনিত্য বা ক্ষণিক। এই সত্য প্রাচীন শাস্ত্রকাবেবা একটী উদাহবণ দিয়ে বুঝিয়েছেন—কোনও সূত্রখণ্ডেব একধাবে যদি অগ্নিসংযোগ ক'বে তা'কে ঘুবানো যায তাহ'লে যে অগ্নিময বৃত্ত দেখা যায় ধর্ম্মপ্রবাহেব লক্ষণও অনেকটা সেইৰূপ। অগ্নিময বৃত্ত বস্তুতঃ বহু ক্ষুদ্র জ্যোতিকণাব সমষ্টিতে তৈবী। সে জ্যেতিকণাসমূহ এক বৃত্ত হিসাবে অনুমিত হ'লেও তাদেব মধ্যে বস্তুতঃ কোন যোগসূত্র নেই। ধর্ম্মপ্রবাহ বা ধর্ম্মসন্তান তেমনি continuous phenomena মাত্র। সে ধর্ম্মসন্তানেব পেছনে কোন সন্তানীন্ নেই—অর্থাৎ যে সমস্ত ধর্ম্ম নিযে সন্তান বা প্রবাহ তৈবী হচ্ছে তাদেব মধ্যে কোন বন্ধন নেই। উদাহবণ দিলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। গতিশীল পিপীলিকাব পংক্তিতে বহু পিপীলিকা চলেছে। কিন্তু তা'দেব মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই।

এই ধর্ম্মসন্তানেব যে বন্ধন বা ঐক্য তা'ব পেছনেব যে সন্তানীন্ আছে বলে আমবা মনে কবি তা' সম্পূর্ণ অলীক—তা' মাযামাত্র। আমাদেব মনেন্দ্রিয বা বিজ্ঞান, ধর্ম্মসমূহেব মধ্যে যে কার্য্যকাবণ সম্বন্ধ স্থাপন কবে তা'তেই শুধু তা'দেব বন্ধনেব অস্তিত্ব। সুতবাং এই ধর্ম্মসমূহকে বলা যায শুধু প্রতিবিম্ব-প্রবাহ যা প্রত্যক্ষ নয, অনুমেয় (a series of images not directly perceptible)। এইখানেও বৈভাষিকেব সঙ্গে সৌত্রান্তিকেব প্রভেদ। বৈভাষিকেবা ধর্ম্মসমূহেব প্রত্যক্ষীকবণে (direct perception) বিশ্বাস কবেন।

সৌত্রান্তিকেবা বলেন যে ধর্ম্মসমূহেব আব একটী লক্ষণ হচ্ছে অনিত্যতা। যে মুহূর্ত্তে তা'দেব উৎপত্তি সেই মুহূর্ত্তেই তা'দেব বিনাশ হয। বৈভাষিকেবা ধর্ম্মকে ক্ষণিক বলেন বটে, তবে 'ক্ষণিকেব' অর্থ হচ্ছে 'অল্পক্ষণ-স্থাযী'। প্রতিধর্ম্মেবই তাঁ'দেব মতে উৎপত্তি, স্থায়ীত্ব, বৈনাশিক-অবস্থা ও বিনাশ আছে। ধর্ম্মেব উৎপত্তি ও বিনাশ সমকালীন নয—পূর্ব্বাপব।

সুতবাং দেখা যাচ্ছে যে বৈভাষিকেবা ধর্ম্মসমূহেব অস্তিত্বে ও বস্তুত্বে বিশ্বাস কবতেন, তাঁদেব মতে ধর্ম্মেব প্রত্যক্ষীকবণ (direct perception) সম্ভবপব। আব সৌত্রান্তিকেবা ধর্ম্মসমূহকে শূন্যস্বভাব বা অলীক মনে কবতেন। তাঁ'দেব মতে আমাদেব বিজ্ঞান প্রবাহেই শুধু ধর্ম্মেব অস্তিত্ব। সে ধর্ম্মেব জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয—অনুমেয় (deductive)। বৈভাষিকেব নির্ব্বাণ বাস্তব, অনাস্রব আনন্দময অবস্থা, ভাবস্বভাব বা positive, আব সৌত্রান্তিকেব নির্ব্বাণ অবস্তুক, ও অভাব-স্বভাব বা unreal ও negative।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদ

মৃত্যুর পরে ?

কবি খেদোক্তি করিয়াছেন—'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে!' ঠিক্ কথা। মৃত্যু জন্মের যমজ ভাই—আজ হউক্ আর শত বর্ষ পরে হউক্, মানুষকে মরিতে হইবেই হইবে।

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর। দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥—ভাগবত

সেই জন্য মানুষের সনাতন প্রশ্ন—'বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে?' মৃত্যুর সঙ্গেই কি সব ফুরাইয়া যায়? না, চিতাভস্মের পরও কিছু থাকে? অর্থাৎ 'Survival of man' কি সত্য কথা? না, 'The grave is but his goal'? অতি প্রাচীন যুগে আমাদের এই ভারতবর্ষে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

যেযং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে—কঠ, ১।২০

'মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়? কেহ বলে অস্তি, কেহ বলে নাস্তি। এ সন্দেহের মীমাংসা কি?'

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে, আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি?

'মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়?'—এ প্রশ্নের উত্তরে জড়বাদী বলেন—'আর কি হবে? 'নাস্তিত্ব' হয় (annihilation)।' 'যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদে'র আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি—যাজ্ঞবল্ক্য জীববাদী; জড়বাদীর ঐ উত্তরে তিনি তুষ্ট নন। জীববাদীর মতে—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—জীববিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।

যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের কথা এই—

তদ্ যথা অহি-নির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবম্ এব ইদং শরীরং শেতে অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ—বৃহ, ৪।৪।৭

'যেমন সাপের খোলস মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া বল্মীকে পড়িয়া থাকে, তেমনি এই শরীর জীববিক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু জীব? জীব অ-শরীর, অ-মৃত, প্রাণ।'

মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম

যাজ্ঞবল্ক্য বৃক্ষের সহিত জীবের উপমা দিয়াছেন :—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষোঽমৃষা—বৃহ, ৩।৯।২৮

'যেমন বৃক্ষ অক্ষয়, তেমনি জীব অব্যয় (অমৃষা)।'

বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়, বিটপিত হয়, পুষ্পিত হয়, ফলিত হয়—তার পর? মাটিতে তিরোহিত হয়। কিন্তু তথাপি বৃক্ষ একেবারে বিনষ্ট হয় না—সে বীজরূপে রহিয়া যায়। সেই বীজ হইতে প্ররোহ হয়, আবার পল্লব, আবার বিটপ, আবার পুষ্প, আবার ফল উদ্ভূত হয়—বীজগর্ভ ফল। বৃক্ষ—বীজ, বীজ—বৃক্ষ, অনাদি হইতে অনন্ত কাল এই পর্য্যায়-ধারায় আবির্ভাব ও তিরোভাব চলে—তিরোভাবের পর পুনশ্চ আবির্ভাব; আবার আবির্ভাবের পর পুনশ্চ তিরোভাব।*

যদ্ বৃক্ষো বৃক্নো রোহতি মূলাৎ নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্ত্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি॥—বৃহ, ৩।৯।২৮।৪

বৃক্ষের এই যে বারংবার 'প্রেত্য-সম্ভব' (পুনরুৎপত্তি), তাহার নিদান ঐ বীজ (ধান)—

ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ।

জীবের যে পুনরুৎপত্তি, বারংবার তিরোভাব ও আবির্ভাব হয় (ন্যায়দর্শনে যাহাকে 'প্রেত্যভাব' বলা হইয়াছে), তাহার নিদান কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—'তাহার নিদান কর্ম্ম—জন্মে জন্মে অনুষ্ঠিত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা (Thoughts, Desires and Actions)।' উহাই জন্মান্তরের বীজ।

কর্ম্ম হৈব তৎ * * পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন :—

অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদ্ অভিসংপদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

'এই পুরুষকে কামময় বলা যায়। সে যে-প্রকার কামনাযুক্ত হয়, সেই প্রকার ভাবনা করে; যে-প্রকার ভাবনাযুক্ত হয়, তদনুরূপ কর্ম্ম করে, যে-প্রকার কর্ম্ম করে, তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয়।'

---

*Mankind is like a plant Like this it springs up, develops, and returns finally to the earth Not entirely, however But as the seed of the plant survives, so also at death the works (*Karma*) of a man remain as a seed, which, sown afresh in the realm of ignorance (*Avidya*) gives rise to a new existence in exact correspondence with his character —Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp 313-4.

অতএব কামই মূলাধার। এই কামকে গীতায় 'সঙ্গ' বলা হইয়াছে (সঙ্গং ত্যক্ত্বা, মুক্তসঙ্গঃ ইত্যাদি)। বুদ্ধদেব ইহাকে 'তন্‌হা' বলিয়াছেন। (তন্‌হা 'তৃষ্ণা'-শব্দের পালি অপভ্রংশ)। অবিদ্যাজনিত এই তন্‌হা হইতেই জন্ম-জন্মান্তর এবং তন্‌হা-ক্ষয়েই জন্ম-নিবৃত্তি।*

কোন বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎখাত কবা যায়, তবে যেমন তাহা হইতে আর বৃক্ষান্তব উৎপন্ন হয না—সেইরূপ কোন জীবেব কর্ম্মমূল অর্থাৎ 'কাম' বা বুদ্ধদেবেব কথিত 'তন্‌হা' যদি নিঃশেষে উৎসাবিত হয়, তবে তাহার 'প্রেত্যভাব' হইবে কিরূপে? কাবণ,

সতিমূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র, ২।১৩। 'মূল থাকিলে তবে ত তাহাব বিপাক—জন্ম আয়ুঃ ভোগ।'

যদি মূলই বিনষ্ট হয়, তবে প্রবোহ কখনই সম্ভব নহে।† যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলিয়াছেন ঃ—

> যৎ সমূলম্ আবৃহেযুর্বৃক্ষং ন পুনঃ আভবেৎ।
> মর্ত্ত্যঃস্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্রবোহতি।
> জাত এব ন জাযতে কোন্বেনং জনযেৎ পুনঃ ॥—বৃহ, ৩।৯।২৮।৬-৭

'বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎপাটিত কবা যায়, তবে তাহা হইতে আব বীজ জন্মে না। মানুষ যদি মৃত্যু কর্ত্তৃক বৃক্ন হয়, ‡ তবে কোন্ মূল হইতে আবাব অঙ্কুব জন্মিবে? এইবাব জন্ম হইয়াছিল—আব সে জন্মিবে না। কে আব ইহাকে জন্মাইতে পাবিবে?'

অর্থাৎ ইহাই তাহাব শেষ জন্ম ও শেষ মৃত্যু—সে অতঃপব জন্ম মৃত্যুব অতীত হইযা মোক্ষলাভ কবিল। সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যেব মোক্ষবাদেব ইহাই মুখ্য কথা। এখন আমবা ইহাব বিস্তার কবিব।

জীবের পরলোকগতি

নাস্তিত্ববাদীব জড়বাদ যদি ছাড়িয়া দিই, তবে জীববাদীব কাছে প্রশ্ন উঠে—ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি?—'মৃত্যুব পব আত্মাব অস্তিত্ব

---

*Verily it is this thirst (*Tanha*) or craving *causing the renewal of existence,* accompanied by sensual delights, seeking satisfaction now here now there—the craving for the gratification of the passions, for continued existence in the worlds of sense —Buddhist Suttas, S B E Vol XI, p 148

†Hence it is this (Tanha or thirst), which must be completely eradicated, root and branch, during our present life-time—if at death we want to get out of the cycle of rebirth —The Doctrine of the Buddha, p 312

‡ বলা বাহুল্য, এ মৃত্যু Death নহে। অগ্নি র্বৈ মৃত্যুঃ (বৃহ, ৩।২।১০)—এ মৃত্যু জ্ঞানাগ্নি, যাহার স্পর্শে সমস্ত কর্ম্মপাশ ভস্মসাৎ হইযা যায।

স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার কি গতি হয় ?' ইহার দ্বিবিধ উত্তর—প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা নরক,—দ্বিতীয় উত্তর জন্মান্তর।* প্রথম উত্তর প্রচলিত খৃষ্ট-মতাবলম্বীদের উত্তর—যাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ অনন্ত স্বর্গ-নরকে (Eternal retribution in heaven or hell-এ) বিশ্বাসবান্। এ বিশ্বাস কি বিচারসহ ? মানুষের আয়ুঃ শত বর্ষের অধিক নহে।—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ—বাইবেলের মতে আরও কম—Three score years and ten—মাত্র সপ্ততি বর্ষ। এই স্বল্প কয়েক বৎসরে মানুষ কি এমন সুবৃহৎ পুণ্য-পাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, যাহার ফলে তাহার অন্তহীন স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা হইবে ? কার্য্য ও কারণের ত অন্ততঃ কতকটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এত ছোট কারণে এত বড় কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে কি ? সেই জন্য অনেক খৃষ্টান 'the unparalleled disproportion in which cause and effect here stand to one another'—কার্য্য কারণের ঐ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া eternal reward or punishment (অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার)-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন ন্যায়পর বিধাতা, তখন তিনি লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড, অল্প পুণ্যে এত বিপুল ঋদ্ধির বিধান করিবেন কেন ? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য জীবের পরলোকগতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ নরক স্বীকার করেন না। তাঁহার কথা এই, 'যথাকর্ম্ম যথা-শ্রুতং'—কর্ম্মানুসারে ফলের তারতম্য—As you sow, so shall you reap—যেমন কর্ষণ, তেমনি ফলন—আর ঐ ফলন কোনমতে অন্তহীন নয়।

পরলোকে 'তরতম'

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যে-প্রকার কার্য্য করে, আচরণ করে, সে সেইপ্রকার হয়; সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়, পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যলোকে এবং পাপকর্ম্মের ফলে পাপলোকে গতি হয়।'

---

*If the fact of death not being our end is established for a man, then the second question for him is: Of what kind is his continued existence after death? Here two chief doctrines are opposed to each other,—first, the immortality of the individual in an eternal heaven or in an eternal hell and secondly, the doctrine of palingenesis (জন্মান্তর)—George Grimm's The Doctrine of the Buddha, p. 104

লোকান্তবে এই তাবতম্যেব বিষয়, আমবা জীববাদেব প্রসঙ্গে আলোচনা কবিয়াছি। আমবা দেখিয়াছি যে, যাজ্ঞবল্ক্যেব মতে, জীব দেহান্তে পবলোকে গমন কবিযা, সেই সেই 'আবসথে'ব (environment-এর) অনুযাযী নবতব ৰূপ গ্রহণ কবে। পবলোকে ঐ তাবতম্যেব হেতু ইহলোকে অনুষ্ঠিত 'বিদ্যা-কর্ম্মণী'।

যাজ্ঞবল্ক্যেব উক্তি এই :—

তদ্ যথা তৃণজলাযুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহবতি, এবমেবাযম্ আত্মা ইদং শবীবং নিহত্য অবিদ্যাং গমযিত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহবতি।

তদ্ যথা পেশস্কাবী পেশসো মাত্রাম্ উপাদায অন্যৎ নবতবং কল্যাণতবং ৰূপং তনুতে, এবমেব অযম্ আত্মা ইদং শবীবং নিহত্য অবিদ্যাং গমযিত্বা অন্যৎ নবতবং কল্যাণতবং ৰূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ 'যেমন জোঁক একটি তৃণেব আশ্রয ছাড়িযা অন্য তৃণেব আশ্রয গ্রহণ কবতঃ আপনাকে সংহৃত কবে, সেইমত ঐ আত্মা এই দেহকে ত্যাগ কবিয়া অচেতন কবাইযা, অন্য দেহ গ্রহণ কবতঃ আপনাকে সংহৃত কবেন। যেমন স্বর্ণকাব সুবর্ণখণ্ড লইযা তদ্দ্বাবা নবতব কল্যাণতব ৰূপ বচনা কবে, সেই মত ঐ আত্মা এই শবীব ত্যাগ কবিযা নবতব কল্যাণতব শবীব বচনা কবেন—পিতৃলোকেব উপযোগী, গন্ধর্ব্বলোকেব উপযোগী, দেবলোকেব উপযোগী, প্রজাপতিলোকেব উপযোগী, ব্রহ্মলোকেব উপযোগী কিম্বা অন্য লোকেব উপযোগী শবীব।'

বৈদিক সাহিত্যে পরলোক

পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে, 'সুকৃতাং লোকে' জীবেব যে পবলোকগতিব বর্ণনা আছে, যাজ্ঞবল্ক্যেব এ বর্ণনা তাহাব অনুৰূপ। সেখানে দেখি, সুকৃতকাবীবা সেই লোকে 'সর্ব্বতনু, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু' হইয়া উত্থিত হন। ইহাই সম্ভবতঃ যাজ্ঞবল্ক্যেব 'নবতরং কল্যাণতবং ৰূপম্'।

এষ বা ওদনঃ সর্ব্বাঙ্গঃ সর্ব্বপরুঃ সর্ব্বতনূঃ। সর্ব্বাঙ্গ এব সর্ব্বপরুঃ সর্ব্বতনুঃ সংভবতি য এবং বেদ।—অথর্ব্ববেদ, ১১।৩।৩২

'ঐ (মন্ত্রপূত) ওদন (Rice-dish) সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু (পরু=joint), সর্ব্বতনু। যিনি এবংবিৎ (এ বিষয জানেন), তিনি সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপরু, সর্ব্বতনু হইয়া উদ্ভূত হন।'

স হ সর্ব্বতনূবেব যজমানঃ অমুষ্মিন্ লোকে সম্ভবতি—শতপথ, ৪।৬।১।১ ও ১১।১।৮।৬

'সেই যজমান সর্ব্বতনু হইযা ঐ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।'

যঃ সৌত্রামণ্যা অভিষিচ্যতে * * তথা কৃৎস্ন এব সর্ব্বতনুঃ সাঙ্গঃ সম্ভবতি—শতপথ, ১২।৮।৩।৩১

'যিনি সৌত্রামণী যাগে অভিষিক্ত হন, তিনি সম্পূর্ণ সর্ব্বতনু, সাঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হন।'

বেদে সুকৃতকাবীব পবলোকেব সাধারণ নাম 'স্বর্গ'। আব দুষ্কৃতকাবীব পবলোকেব নাম বব্রঃ (pit) (ঋগ্বেদ, ৭।১০৪।৩), পদং গভীবং (ঋগ্বেদ, ৪।৫।৫), অন্ধং তমঃ—অনাবম্ভণং তমঃ (ঋগ্বেদ, ১০।৮৯।১৫, ১০।১০৩।১২)। প্রত্যেককেই স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত লোকে বসতি কবিতে হয়।

তস্মাদ্ আহুঃ কৃতং লোকং পুরুষঃ অভিজাযতে ইতি—শতপথ, ৬।২।২।২৭

অন্যত্র শতপথ রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন—

স যদ্ধ বা অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ অন্নম্ অত্তি, তদ্ এনং অমুষ্মিন্ লোকে প্রত্যত্তি —১২।৯।১।১

'ইহলোকে জীব যে অন্ন ভক্ষণ কবে, পবলোকে সে সেই অন্নেব দ্বাবা ভক্ষিত হয।'

ইহাকেই বলে কর্ম্মেব বিপাক (Retribution)। কারণ, পবলোকে নিক্তিব তৌলে সূক্ষ্ম বিচাব হয়।

তুলাযাং হ বা অমুষ্মিন্ লোকে আদধতি, যতবদ্ যংস্যতি তদ্ অন্বেষ্যতি, যদি সাধু বা অসাধু বা—শতপথ ১১।২।৭।৩৩ 'পবলোকে তুলাদণ্ডে জীব নিহিত হয; দুই দিকেব যে দিক্ উত্তোলিত হয, সে তাহাব অনুসবণ কবে। সে সাধুই হউক আব অসাধুই হউক।'

মোট কথা, দুষ্কৃতকাবীবা স্বর্গলোকে প্রবেশ কবিতে পাবে না—

কশ্চিদ্ হ বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য * * কশ্চিৎ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি—অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি—তৈত্তিবীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।১

'কেহ কেহ ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইযা স্ব লোক খুঁজিয়া পায না—অগ্নিমুগ্ধ হইযা, (চিতা-) ধূমাকুলিত হইযা স্ব লোক খুঁজিযা পায না।'

কাবণ, তাহাদেব দুষ্কৃত স্বর্গেব পথ অববোধ কবিযা দণ্ডায়মান হয়।

বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গেব অনেক মনোমদ বর্ণনা আছে।

ঐ বর্ণনাব সাব-সঙ্কলন কবিয়া কঠ-উপনিষদে নচিকেতাঃ বলিযাছেন—

স্বর্গে লোকে ন ভযং কিং চ নাস্তি
ন তত্র ত্বং, ন জবযা বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনাযা-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে—কঠ, ১।১২

'স্বর্গলোকে ভয়েব প্রচাব নাই, জবাব প্রসাব নাই, যমেব অধিকাব নাই। স্বর্গলোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম কবিযা, শোকেব অতীত হইযা, (জীব) আমোদে বিহবণ কবে।'

স্বর্গ দেবস্থান (তিব্বতীর দেবচান—Devachan)

নাকস্য পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো।
য প্রিণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৬।৫

সুকৃতকারীরা স্বর্গবাসী জ্যোতির্ম্ময় পিতৃ ও দেবগণের সহিত 'স্বধা-মাদং মদন্তি'—

অথা পিতৄন্ সুবিদত্রা উপেহি
উপেহি যমেন যে স্বধামাদং মদংতি—ঋগবেদ, ১০।১৪।১০
যূয়ম অগ্নে। শন্তমাভি স্তনূভিরীজানমভি লোক স্বর্গম্।
অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ, যত্র দেবৈঃ স্বধ মাদং মদন্তি॥
—অথর্ব্ববেদ, ১৮।৪।১০

ত্বং সোম। প্রচিকিতো মনীষা, ত্বং রজিষ্ঠম্ অনুনেষি পংথাং।
তব প্রণীতী পিতরো ন ইংদো। দেবেষু রত্নম্ অভজংত ধীরাঃ॥
—ঋগ্‌বেদ, ১।৯১।১

'হে সোম। তুমি মনীষা দ্বারা বিদিত হইয়া আমাদিগকে ঋজুতম পথে চালনা কর। হে ইন্দু। তোমার চালনে আমাদের ধীর পিতৃগণ দেবতাদিগের মধ্যে রত্ন (সমৃদ্ধি) লাভ করিয়াছেন।'

এই যে যজমান যজ্ঞজনিত 'অপূর্ব্ব' দ্বারা স্বর্গলোকে নীত হইয়া, দেবতাদিগের সহিত স্বর্গের সমৃদ্ধি ভোগ করেন (দেবেষু রত্নম্ অভজন্ত ধীরাঃ), ইহাকে দেবতাদিগের সহিত 'স-লোকতা' বলা যাইতে পারে। স-লোকতা অর্থে সমান লোক প্রাপ্তি। কিন্তু ইহাই স্বর্গের চরম নহে। সলোকতার উপরে দেবতার সহিত সরূপতা, তাহারও উপর দেবতার সহিত সাযুজ্য।

অসৌ বাব আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমম্—আদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি
—কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৫।১।৮।৬

'ঐ আদিত্যই উত্তম জ্যোতিঃ—আদিত্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।'

অমৃতোহৈব ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ এতি, আদিত্যস্য সাযুজ্যম্
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১।১১

স হ হংসো হিরণ্ময়ো ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ ইয়ায়—আদিত্যস্য সাযুজ্যম্
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।৯।১১

'সেই জীব হিরণ্ময় হইয়া স্বর্গলোকে আসিল—সূর্য্যের 'সাযুজ্য' লাভ করিল।'

স যদ্ বৈশ্বদেবেন যজতে, অগ্নিরেব তর্হি ভবতি, অগ্নেরেব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। অথ যদ্ বরুণপ্রঘাসৈর্যজতে বরুণ এব তর্হি ভবতি বরুণস্যৈব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি। অথ যৎ সাকমেধৈর্যজতে ইন্দ্র এব তর্হি ভবতি ইন্দ্রস্যৈব সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি—শতপথ, ২।৬।৪।৮

'তিনি যদি বৈশ্বদেব অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি অগ্নি হন এবং অগ্নির সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি বরুণ-প্রঘাস অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি বরুণ হন এবং বরুণের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি সাকমেধ

অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি ইন্দ্র হন এবং ইন্দ্রের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।'

অতএব স্বর্গভোগেরও ইতরবিশেষ, তারতম্য আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যও একস্থলে কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন—(ইহাই দেব-সরূপতা)—

যে কর্ম্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অন্যত্র বৃহদারণ্যক যে বলিয়াছেন—দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহ, ৪।১।২—ইহা দেবসরূপতা নহে, দেবসাযুজ্য।

ঐ যে 'অপ্যয়', দেবতার সহিত একীভূত হওয়া—উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইহাকেই 'সাযুজ্য' বলা হইয়াছে। ইহার ফলে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দেব-লোকে স্থিতি ও দেবতার মহনীয় ঐশ্বর্য্যভোগ ঘটিতে পারে। বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি * * * তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে। স লোকমাগচ্ছতি অশোকম্ অহিমম্। তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ—৫।১০।১

'(সুকৃতকারী) পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করতঃ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন। তিনি সেই লোকে উপনীত হন—যে লোক অশোক-অহিম (শীত-উষ্ণের অতীত)। সে লোকে শাশ্বতী সমা (সুদীর্ঘ কাল) বসতি করেন।' (অভিজ্ঞ পাঠকের এ প্রসঙ্গে গীতার বাক্য স্মরণ হইবে—প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।)

পরলোক ও পুনঃমৃত্যু

কিন্তু এ বসতি ত চিরস্থায়ী নহে। সুকৃতের ফলে স্বর্গে স্থিতি কত দিন ঘটে ? শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ, অযুত বর্ষ, লক্ষ বর্ষ, কোটি বর্ষ,—আর কত ? কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় এ স্থিতি অত্যল্প নহে কি ?

ঋষিদিগের শিক্ষা এই যে, পরলোকে কাল আমাদের সুকৃতের আয়ুঃ হরণ করে—

স্বর্গং লোকম্ অভিবহতি, অহোরাত্রৈর্বা ইদং সযুগ্ ভিঃ ক্রিযতে
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।২

'(পুণ্য দ্বারা) জীব স্বর্গলোকে বাহিত হয় বটে—কিন্তু অহোরাত্রি তাহার সুকৃত ভক্ষণ করে।'

এরূপে অর্জ্জিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসীর পতন হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।—গীতা, ৯।২১

মুণ্ডক-উপনিষদেরও ঐ কথা—

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে—১।২।৯

এই চ্যুতি বা স্বর্গ হইতে পতন, পুণ্যক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতে হনুভূয
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।—মুণ্ডক ১।২।১০

'স্বর্গলোকে ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে, জীব ইহলোকে বা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে।'

ইহাই লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা * * পুনর্নিবর্ত্তন্তে'—৫।১০

'সম্পাত (পতন পর্য্যন্ত), স্বর্গে বসতি করিয়া (জীব) আবার ফিরিয়া আইসে।'

এই কারণেই নচিকেতাঃ যমের নিকট বর চাহিয়াছিলেন—'ইষ্টাপূর্ত্তযোঃ অক্ষিতিঃ' (imperishableness) (তৈত্তিরীয ব্রাহ্মণ, ১।১১।৮)। কিন্তু এ বর ত দিবার নয়—এ যে অসম্ভব প্রার্থনা! তাই কঠ-উপনিষদে যমের উত্তর শুনিতে পাই—

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং যৎ—কঠ, ২।১০

'শেবধি' (পুণ্যফল) কখন নিত্য হয না—অধ্রুব (অনিত্য) দ্বারা ধ্রুব (নিত্য) ফল পাওযার সম্ভাবনা কোথায় ?'

নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—নশ্বর দ্বারা অনশ্বরের অর্জ্জন অসম্ভব। যাজ্ঞবল্ক্য জীবের পরলোকগতি বর্ণন করিযা এবং তাহার নবতর কল্যাণতর রূপের উল্লেখ করিয়া ঐ কথাই বলিযাছেন—

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যযম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায কর্ম্মণে ॥—বৃহ, ৪।৪।৬

'ইহলোকে-কৃত কর্ম্মের ভোগ দ্বারা অন্ত বা অবসান হইলে, জীব পরলোক হইতে ইহলোকে ফিরিযা আইসে—কর্ম্মণে—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য।'

এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিযাছেন—

এবমেবাযং পুরুষঃ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যাযং প্রতিযোনি আদ্রবতি প্রাণায—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'জীব এই দেহ হইতে প্রচ্যুত হইযা (পরলোকে কর্ম্মভোগান্তে) বিলোম গতিতে ফিরিযা আইসে 'প্রাণায'—নূতন প্রাণলাভ করিবার জন্য।'

এইরূপে আবার প্রাণ, আবার পরলোক—পুনর্ব্বার প্রাণ, পুনর্ব্বার পরলোক—এইরূপে 'গতাগতি পুনঃপুনঃ'—ইতি নু কামযমানঃ (বৃহ, ৪।৪।৬), যত দিন না কামনার নিঃশেষে নিবৃত্তি হয, তন্হার নির্ব্বাণ হয।

পরলোক হইতে এই অবশ্যম্ভাবী পতনকে বৈদিক ঋষিরা 'পুনর্মৃত্যু' বলিতেন। ইহলোকে মৃত্যুর পর পরলোক—আবার পরলোক হইতে চ্যুতির পর ইহলোক—অতএব ঐ চ্যুতির সার্থক নাম 'পুনর্মৃত্যু (Death over

again)। আর এই মৃত্যু একবার নয়, দুইবার নয়—পুনঃপুনঃ। সেইজন্য ইহাকে 'আবৃত্তি' (Repetition) বলে।

তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫
ইমং মানবম্ আবর্ত্তম্ ন আবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য, ৪।১৫

অমৃতের পুত্রের অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা

ঋগ্বেদে মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলা হইয়াছে—শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আমরা প্রত্যেক নরনারী সেই 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষে'র সন্তান। সেইজন্য মর্ত্ত্য মানুষ হইলেও আমাদের প্রাণে প্রতিক্ষণ ব্রহ্মক্ষুধা (পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Hunger for the Absolute বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন) সন্ধুক্ষিত হইতেছে। এবং যেহেতু আমরা অমৃতের পুত্র (Heirs of Immortality), সেইজন্য 'অমৃতত্ব'ই আমাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষার বস্তু।* চাতক যেমন ফটিক জল ভিন্ন অন্য বারিতে তৃপ্ত হয় না, জীব তেমনি 'অমৃতত্ব' ভিন্ন অন্য কিছুতে স্বস্তি বোধ করে না। সেই জন্য তাহার চিরন্তন প্রার্থনা—মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়—বৃহ, ১।৩।২৮

তাই যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী মানবের প্রতিভূ হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্—বৃহ, ৪।৫।৪

মানবের এই অতৃপ্য আকাঙ্ক্ষাকে ঋগ্বেদের ঋষি সেই অতীত যুগে স্থায়ী আকার দান করিয়াছেন ঃ—

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান। অমৃতে লোকে অক্ষিত॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥
যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদ্রঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥—ঋগ্‌বেদ, ৯।১১৩।৭-১১

---

*' To conquer death '—this question has been the great question of mankind from its first beginnings, and will remain so, as long as there are men —The Doctrine of the Buddha, p 4

হে সোম! যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ—যে জ্যোতিতে সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্—সেই অমৃত অক্ষিত লোকে আমাকে উন্নীত কর!

যে লোকে বৈবস্বত রাজা, যে লোক স্বর্গের পুণ্যতম সীমা, যে লোকে অমৃত বারি ক্ষরিত হয়, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর।

যে লোকে যথাকাম (অবাধ) গতি, যে তৃতীয় স্বর্গে ত্রিধাম বিস্তীর্ণ, যেখানকার ভুবন জ্যোতিষ্মন্ত, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর!

যে লোকে কাম নিকাম, যে লোক সূর্য্যের পরপারে, যেখানে স্বধা ও তৃপ্তি, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর!

যে লোকে আনন্দ ও মোদ, প্রমোদ ও আমোদের স্থিতি, যেখানে কামনার কামও স্তিমিত, সেই লোকে আমাকে অমৃত কর!'

অতএব পুনর্ম্মৃত্যুময় স্বর্গস্থিতিকে অমৃতের পুত্র বরণ করিবে কিরূপে? যে চায় অমৃতত্ব (Not-dying-anymore-ness)—এই পুনর্ম্মৃত্যুতে (এই Dying-over-again-এ) সে তুষ্ট হইবে কেন? সেই জন্য দেখা যায় উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ব্রাহ্মণ'যুগেও পুনর্ম্মৃত্যু-বারণের বিবিধ বিধান আলোচিত হইয়াছিল—উদ্দেশ্য ছিল 'আপ্নোতি অমৃতত্বম্ অক্ষিতিং স্বর্গে লোকে' (কৌষী, ৩।২)—স্বর্গলোকে 'অক্ষিতি,' ক্ষয়রহিত অমৃতত্ব অর্জ্জন করা।

অপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি যোগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনম্ এবং বেদ
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১১।৮।৬

'যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং যিনি ইহাকে ঐরূপ জানেন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যুকে জয় করেন।'

অতি হবৈ পুনর্ম্মৃত্যুং মুচ্যতে, য এবম্ এতাম্ অগ্নিহোত্রে মৃত্যোরতিমুক্তিং বেদ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৩।৩।৯

'যিনি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিমুক্তিকে অবগত হন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যু হইতে অতিমুক্ত হন।'

অন্তরেণো হবা এতং অশনায়া চ পুনর্ম্মৃত্যুশ্চ। অপ অশনায়াং চ পুনর্ম্মৃত্যুং চ জয়ন্তি যে বৈষুবতম্ অহঃ উপয়ন্তি—শাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ, ২৫।১

'যিনি বিষুবৎ দিন (the day of the equinox) চরণ করেন তিনি ক্ষুধাকে জয় করেন, পুনর্ম্মৃত্যুকে জয় করেন। তাঁহাকে ক্ষুধা ও পুনর্ম্মৃত্যু স্পর্শ করে না।'

অপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি, সর্ব্বম্ আয়ুরেতি, য এবং বিদ্বান্ এতয়া ইষ্ট্যা যজতে
—শতপথ, ১১।৪।৩।২০

'যিনি এইরূপ জানিয়া ঐ ইষ্টি দ্বারা যজন করেন, তিনি পুনর্ম্মৃত্যু জয় করেন, সর্ব্ব আয়ুঃ লাভ করেন।'

তস্মাৎ বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ। অপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ—বৃহ, ৩।৩।২

'যিনি বায়ুই ব্যষ্টি, বায়ুই সমষ্টি—এইরূপ জানেন তিনি পুনর্ম্মৃত্যুকে জয় করেন।'

আপেক্ষিক অমৃতত্ব

কেহ কেহ আশা কবিতেন, দেবতাদিগেব অনুগ্রহে বা মধ্যস্থতায় অমৃতত্বের অধিকাবী হইবেন।

দক্ষিণাবংতো অমৃতং ভজংতে
দক্ষিণাবংতঃ প্রতিবংত আয়ুঃ—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৫।৬

'দক্ষিণাবন্তেব অমৃতত্ব লাভ হয, দক্ষিণাবন্ত আয়ুঃ উত্তবণ কবেন।'

ত্বং তম্‌ অগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্ত্যং দধাসি—ঋগ্‌বেদ, ১।৩১।৭

'হে অগ্নি। তুমি মর্ত্ত্য মানুষকে উত্তম অমৃতত্বে স্থাপন কব।'

আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং * *
উতো অস্মান্‌ অমৃতত্বে দধাতন।—ঋগ্‌বেদ, ৫।৫৫।৪

'হে মরুদ্‌গণ! তোমাদেব মহনীয মহিমা। আমাদিগকে অমৃতত্বে নিধান কব।'

'হে মিত্রাবরুণ।—বৃষ্টিং বাং বাধো অমৃতত্বম্‌ ঈমহে (ঋগ্‌বেদ, ৫।৬৩।২)—তোমাদেব ধন বর্ষণ কব—যেন আমবা অমৃতত্বেব ভাগী হইতে পাবি।'

অপবে মনে কবিতেন সোম-যাগ প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বাবা অমৃতত্ব অর্জ্জন কবিবেন। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে—কঠ, ১।১৩। তাঁহাবা বলিতেন—

অপাম সোমম্‌ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্‌।

'সোম পান কবিযাছি, জ্যোতিঃ দর্শন কবিযাছি, দেবতাদিগকে জানিযাছি—আব ভয কি? আমবা অমব হইলাম।'

বৃথা আশা! এ অমৃতত্ব আপেক্ষিক (relative) মাত্র। ইহাব বযঃক্রম বড জোব একশত (দেব-) বৎসব!

সোমযাজী শতে শতে সংবৎসবেষু, অগ্নিচিৎ কামম্‌ অশ্নাতি, কামং ন। তদ্‌ হৈতৎ যাবৎ শতং সংবৎসবাঃ তাবদ্‌ অমৃতম্‌ অনন্তম্‌ অপর্য্যন্তম্‌—শতপথ, ১০।১।৫।৪

'সোমযাজী শত বৎসবে একবাব, অগ্নিচয়নকাবী ইচ্ছামত ভোজন কবেন কিংবা না কবেন। এই যে শত সংবৎসব, ইহাই অমৃত—অনন্ত ও অনবধি (unending and everlasting)।

গীতা এই সোমযাজীব স্বর্গভোগ লক্ষ্য কবিয়া বলিয়াছেন ঃ—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈবিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থযন্তে—গীতা, ৯।২০

'সোমপান দ্বাবা পূতপাপ হইযা সোমযাজী, বৈদিক বিধিমার্গে স্বর্গেব আকাঙ্ক্ষা কবে'।

স্বর্গে যায়ও বটে এবং প্রচুব স্বর্গভোগও কবে বটে—

তে পুণ্য মাসাদ্য সুবেন্দ্রলোকম্‌
অশ্নন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌।—গীতা, ৯।২০

কিন্তু—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি—গীতা, ৯।২১

'সেই বিশাল স্বর্গভোগের পর, ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্বর্গবাসীর স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।'

অপরে দেবতার সহিত সারূপ্য ও সাযুজ্য দ্বারা অমরতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন।

য এবং বিদ্বান্ অগ্নিং চিনুতে, ভূয়ান্ এব ভবতি, অভীমান্ লোকান্ জয়তি। বিদুরেনং দেবাঃ। অথো এতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—কৃষ্ণ যজুর্বেদ ৫।৭।৫।৭

'যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নি চয়ন করেন, তিনি ভূয়ান্ হয়েন, অভীম লোক জয় করেন। দেবতারা তাঁহাকে জানেন। তিনি ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন।'

ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাম্ আপ্নোতি। এতাসাম্ এব দেবতানাং সাযুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমানলোকতাম্ আপ্নোতি য এতম্ অগ্নিং চিনুতে—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৫।১২

'ব্রহ্মার সাযুজ্য, সালোক্য প্রাপ্ত হন। এই সকল দেবতার সাযুজ্য, সার্ষ্টিতা (সমান ঐশ্বর্য্য), সালোক্য প্রাপ্ত হন—যিনি এই অগ্নি চয়ন করেন।'

ছান্দোগ্য-উপনিষদেও ইঁহাদিগের উল্লেখ আছে—

এতাসাম্ এব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—২।২০।২

বৃহদারণ্যকও ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি, নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি, মৃত্যুরস্য আত্মা ভবতি, এতাসাং দেবতানাম্ একো ভবতি—বৃহ, ১।২।৭

'যিনি এইরূপে অশ্বমেধের প্রতীক ভাবনা করেন, তিনি দেবতাদিগের অন্যতম হন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, মৃত্যু তাঁহার আত্মা হয়।'

এই যে মৃত্যুজয়—ইহাও আপেক্ষিক—এ অমৃতত্বও প্রকৃত অমৃতত্ব নহে। ধরুন, সাধক বিবিধ বিচিত্র সাধন দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোকেরও উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিলেন—এইবার কি আকাঙ্ক্ষার নিধি অমৃতত্ব তাঁহার করতলগত হইল? আর কি তাঁহাকে কোনো কালে পুনর্মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইবে না? এইখানে গীতা ঐ উচ্চ দুরাশার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন—গীতা বলিলেন—

আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।—৮।১৬

'ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন হয়—নিম্নতর লোকের কা কথা?'* কঠ-উপনিষদে নচিকেতাও এই কথাই বলিয়াছেন—'যম!' তুমি আমাকে 'চিরজীবিকা' (অমৃতত্ব) দিবে বলিলে।

---

* বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—Up to the highest world of the gods, every existence becomes annihilated.

কিন্তু তোমাব সহিত সাযুজ্যে—জীবিষ্যামি, যাবদ্ ঈশিষ্যসি ত্বম্—১।২৭। তুমি নিজেই যখন চিবজীবী নহ—আমাকে চিবজীবিকা দিবে কিরূপে ?'

নচিকেতাঃ যমেব উদ্দেশ্যে যাহা বলিলেন, সমস্ত দেবতাকে—ইন্দ্র চন্দ্র বাযু বরুণ, এমন কি যিনি, ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব (মুণ্ডক ১।১।১) দেবতাদিগের যিনি প্রথম ও প্রধান,—সেই ব্রহ্মাকেও ঐ কথা বলা যায়।

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম পুবন্দব দিনকব রুদ্রাঃ

—অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ইন্দ্র দিবাকব রুদ্র ব্রহ্মা—কেহই ত চিবস্থায়ী নহেন। কালেব কবাল গতিতে শীঘ্র বা বিলম্বে সকলকেই ধ্বংস-মুখে পড়িতে হইবে !

সত্য বটে, দেবতাদিগকে সাধাবণতঃ 'অমব' বলা হয—'অমবা নির্জ্জবা দেবাঃ'—সত্য বটে, ঋগ্বেদেব ঋষি সূর্য্যদেবের আকাশগতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

আ সত্যেন বজসা বর্ত্তমানো
নিবেশযন্ অমৃতং মর্ত্ত্যং চ—

'সূর্য্য অমৃতকে ও মর্ত্ত্যকে (দেবতাকে ও মনুষ্যকে) যথোচিত নিবেশিত কবিযা আকাশে বিবর্ত্তিত হইতেছেন'

—কিন্তু এ 'অমৃতত্ব' আপেক্ষিক মাত্র। মনুষ্যেব তুলনায় দেবতাবা দীর্ঘজীবী বটেন কিন্তু তাঁহাবা চিবজীবী নহেন। যেহেতু,

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালোহি দুবতিক্রমঃ॥

'কত সহস্র ইন্দ্রেব, কত লক্ষ দেবতাব কালেব গতিতে পতন হইযাছে। কালেব গতি কে অতিক্রম কবিবে ?' কালোস্মি লোকক্ষযকৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।

সেইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকাবীব পিতৃলোকেব উপযোগী, দেব-লোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকেব উপযোগী, ব্রহ্মলোকেব উপযোগী নবতব কল্যাণতব রূপেব প্রসঙ্গ কবিযা—অবসানে 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য' (বৃহ, ৪।৪।৬) ভোগ দ্বারা কর্ম্মেব অন্ত হইলে ঐ সুকৃতকাবীব পতন বা চ্যুতিব কথা শুনাইয়াছেন। অতএব অমৃতত্বে উপনীত হইবাব পন্থা দেবতা ধরিয়া নয়, দেবতা হইয়াও নয়—ঐ সারূপ্য ও সাযুজ্য অমৃতত্বেব পথ নহে, বিপথ—অমৃতত্বকামীব পক্ষে এ পথে বিচবণ পণ্ডশ্রম মাত্র।

অমৃতত্বের অনন্য পন্থা—ব্রহ্ম-সাযুজ্য

আচ্ছা, বিনশ্বব দেবতাব ভবসা ভাসাইয়া দিয়া,—যিনি অবিনশ্বব, যিনি অজব অমব অক্ষর, যিনি অব্যয অক্ষয অদ্বয়, যদি সেই অজিত অক্ষিত

অমিত ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য করা যায় ? যদি জীব কোন মতে সেই চিরন্তন সনাতন পুরাতনে প্রবেশ করিতে পারে, যদি সে কোনো দিন ব্রহ্ম-সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত করিতে পারে—এক কথায় যদি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইতে পারে (সাযুজ্য-শব্দের অর্থই তাই)—তবেই ত সে শাশ্বত স্থায়ী সনাতন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে—সেই অমৃতত্ব, যে অমৃতত্বে ক্ষয়-ব্যয় নাই, উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই—যে অমৃতত্বের অন্তিকে পুনর্জ্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু কোনদিনই অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব অমৃতত্ব-অর্জ্জনের, পুনর্মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম বারণের ইহাই আর্য্য পন্থা—অদ্বিতীয় অমোঘ পথ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।১

যাজ্ঞবল্ক্য এই পন্থারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

অথ অকাময়মানো যঃ অকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

'যিনি কামনারহিত, যিনি অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া 'ব্রহ্মাপ্যয়' প্রাপ্ত হন।'

এই যে ব্রহ্মে অপ্যয় (একীভাব), ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য। যাঁহার কাম (তন্হা) নিঃশেষে নির্ধূত হইয়াছে, তাঁহার আর উৎক্রান্তি (পরলোক ও পুনর্মৃত্যু) ঘটিবে কেন ? সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ঃ—

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥—বৃহ, ৪।৪।১২

'যিনি ব্রহ্মের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাবে সুস্থিত হইয়াছেন, কিসের ইচ্ছায়, কোন্ কামনায় তিনি আবার শরীরে সন্তপ্ত হইবেন ?'

অন্যত্রও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'-এইভাবে জীবকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই জীব অমৃতত্ব লাভ করিবে।

তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্।—বৃহ, ৪।৪।১৭

'তাঁহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিলে, সেই অ-মৃত ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে, অমৃত হইতে পারিব।'

এই জ্ঞান ইহলোকে, শরীর-ধারণেই হইতে পারে। যাঁহার হয়, তিনিই অ-মৃত হন।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্ম স্তদ্ বয়ং ন চেদ্ অবেদী র্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥—বৃহ,৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই পরমাত্মাকে জানিতে পারি। যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃত হন। আর অপরে—যাহারা অ-জ্ঞ, তাহাদের মহতী বিনষ্টি (মৃত্যু ও পুনর্মৃত্যু) এবং (জন্মে জন্মে) দুঃখভোগ হয়।'

এই যে-অমৃতত্ব (শপেন্‌হয়ব যাহাকে Indestructibility *without* continued existence বলিয়াছেন, জর্জ্জ গ্রিম যাহাব নাম দিয়াছেন—the great riddle of deathless and tranquil Eternity)* নিখিল উপনিষৎ-সাহিত্য, এই অমৃতত্বেব গম্ভীব ঝঙ্কাবে মুখবিত।

স যো হবৈ তৎ পবমং ব্রহ্ম বেদ * * * গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি
—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পবব্রহ্মকে জানিতে পাবেন, তিনি গুহাগ্রন্থি হইতে মুক্ত হইযা অমৃত হন।'

যে পূর্ব্বং দেবা ঋষযশ্চ তদ্ বিদুঃ
তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ—শ্বেত, ৫।৬

'দেবতা বা ঋষি—পূর্ব্বতন যাঁহাবাই তাঁহাকে জানিযাছিলেন, তাঁহাবা তন্ময (ব্রহ্মময) হইযা অমৃত হইযাছিলেন।'

য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—কঠ, ২।৬ 'যাঁহাবা তাঁহাকেজানেন, তাঁহাবা অমৃত হন।'

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীবাঃ
প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

'যিনি 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', ভূতে ভূতে তাঁহাব অনুধ্যান কবিযা ধীব ব্যক্তি অমৃত হন।'

কাবণ, তিনি 'প্রতিবোধ-বিদিত' (অগ্র্যা বুদ্ধিব গম্য)—তাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব।

প্রতিবোধবিদিতং মতন্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪

তে ব্রহ্মলোকেষু পবান্তকালে
পবামৃতাঃ পবিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।—মুণ্ডক, ৩।২।৬

'ব্রহ্মলোকে উন্নীত জীব পবান্তকালে (কল্পেব অবসানে) পবম-অমৃতত্ব লাভ কবিযা পবিমুক্ত হয।'

শুধু পবলোকে কেন, ইহলোকেও যেই তাঁহাকে জানিবে, সেই অমৃতত্ব লাভ কবিবে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—কঠ, ২।৬

'যে কেহ মর্ত্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম কবিতে পাবে, সেই অমৃত হয—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয।'

তাহাব দেহান্ত সময়ে সে মূর্দ্ধণ্য সুষম্না মার্গে উৎক্রান্ত হইযা অমৃতত্ব লাভ কবে।

তযোর্দ্ধম্ আযন্ অমৃতত্বমেতি—কঠ, ২।১৬

লক্ষ্য কবিবাব বিষয় এই যে, ঐ অমৃতত্ব ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই হয় না—হইতে পাবে না।

---

*The Doctrine of the Buddha, p 502

স এষঃ অকামঃ সর্ব্বকামো ন হ্যেতং কস্যচন কামঃ। তদেষ শ্লোকো ভবতি—

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিন ইতি ॥

ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভিঃ ন তপসা অনেবংবিদ্ অশ্নুতে,
এবংবিদাং হৈব স লোকঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫-৬

'যিনি অকাম সর্ব্বকাম, তাঁহাকে কোনও কামনা স্পর্শ করে না। এ সম্পর্কে এই শ্লোক আছে—'যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়, তখন বিদ্যা-দ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবন্ত যাইতে পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না। যে 'এবংবিৎ' নহে, (যে অবিদ্বান্)—দক্ষিণা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা সে ঐ লোক (position) প্রাপ্ত হয় না—কারণ, সেই লোক এবংবিদেরই লোক।'

তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায।—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮

'তাঁহাকে জানিলে, তবে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায—মুক্তির গত্যন্তর নাই—নাই।'

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুম্ অত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে—কৈবল্য, ৯

'তাঁহাকে জানিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়—বিমুক্তির অন্য পন্থা নাই।'

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্ব পাশৈঃ—শ্বেত, ১।৮

'ব্রহ্মবিজ্ঞানই পাশমুক্তির অদ্বিতীয় হেতু।'

সেই জন্য এ বিজ্ঞানকেই ঋষিরা বিদ্যা বলিতেন—আর সমস্ত জ্ঞান অবিদ্যা।

ক্ষরং ত্ববিদ্যা অমৃতং হি বিদ্যা—শ্বেত, ৫।১

কারণ, তাহাই বিদ্যা—যাহা-দ্বারা অমৃতত্ব অর্জ্জন করা যায়—বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে (ঈশ, ১১)।* সেইজন্য তাঁহারা বলিতেন—

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥—মুণ্ড, ২।২।৫

'সেই পরমাত্মা (ব্রহ্মবস্তুকেই) একমাত্র জানিবার চেষ্টা কর—তিনিই অমৃতের সেতু। তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ কর।' কারণ, উহা বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ (is mere verbiage)।

---

* পাশ্চাত্যদেশেও কোন কোন মনীষী Head-learning ও Soul-wisdom-এর প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ Wisdom-ই প্রকৃত প্রজ্ঞা—ইহাই অমৃতত্বের দ্বার—'The wisdom that is life eternal'

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পব ?

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানেব অনন্তব কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি (বৃহ, ৪।৪।৬)—'ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মে অপ্যয—অর্থাৎ ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ'। সমস্ত উপনিষদ্ এ কথাব প্রতিধ্বনিতে মুখবিত।*

অথ যো হ বৈ তৎ পবমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯
'যিনি সেই পবব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন।'
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি—কৌষীতকী, ১।৪
'ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।'
বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পবেঽব্যযে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৮
'তখন বিজ্ঞানময আত্মা সেই অব্যয পবমাত্মায একীভূত হয।'

এই যে একীভাব, ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মী-'ভবন'—ব্রহ্মেব সহিত কেবল মিলন নয়, মিশ্রণ।

অশব্দে নিধনম্ এতি—অথ হৈষাগতিঃ এতদ্ অমৃতম্ এতৎ সাযুজ্যত্বং নির্বৃতত্বম্—মৈত্রাযণী, ৬।২২

'সেই অশব্দে (পবব্রহ্মে) নিধন (লয) প্রাপ্ত হন—নদ্য ইব সমুদ্রে লযম্ এতি—ইহাই পবমাগতি, ইহাই অমৃতত্ব,সাযুজ্যত্ব, নির্বৃতত্ব (Summum bonum)।'

যস্ত বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪
'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহাব আত্মা ব্রহ্মপদে প্রবেশ কবে।'

পবেণ নাকং নিহিতং গুহাযাং
বিভ্রাজতে যদ্ যতযো বিশন্তি—কৈবল্য, ৩

'সেই গুহাহিত ব্রহ্ম, যিনি পবব্যোমে জ্যোতিষ্মান্, যতিবা তাঁহাতে প্রবেশ কবেন।'

সেই গীতাব কথা—ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তবম্ (১৮।৫৫)—ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ বিজ্ঞাত হইযা অনন্তব ব্রহ্মে প্রবেশ বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ।

দেহধাবণে যিনি এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ কবেন, তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলা হয।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—বৃহ, ৪।৪।৭

---

* যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার ক্ষীণ পূর্ব্বাভাস দৃষ্ট হয—সে আভাস মাত্র। ষড্ বৈ ব্রহ্মণো দ্বারঃ—অগ্নির্বাযুরাপঃ চন্দ্রমা বিদ্যুৎ আদিত্যঃ। (ছযটি ব্রহ্ম-প্রাপ্তির দ্বার—অগ্নি, বাযু, অপ্, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ ও আদিত্য)। স য উপদগ্ধেন হবিষা যজতে : * সোগ্নিনা ব্রহ্মণো দ্বারেণ প্রতিপদ্য ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জযতি। * = অথ যো বিপতিতেন হবিষা যজতে * * স বাযুনা ব্রহ্মণো দ্বারেণ প্রতিপদ্য ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জযতি ইত্যাদি—শতপথ, ১১।৪।৪।১-৭। যিনি উপদগ্ধ হবিঃ দ্বারা যজন করেন, তিনি অগ্নিরূপ ব্রহ্মের দ্বাব দ্বারা উপসন্ন হইযা ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য জয করেন। যিনি বিপতিত হবিঃ দ্বারা যজন করেন, তিনি বাযুরূপ ব্রহ্মের দ্বার দ্বারা উপসন্ন হইযা ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য জয করেন। (এইরূপ অপ্, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ ও আদিত্যরূপ ব্রহ্ম-দ্বার দ্বারা ব্রহ্মের সাযুজ্য ও সালোক্য জযের কথা বলা হইযাছে।)

অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই চরিতার্থ পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত' বলিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩)। তাঁহার মতে তিনিই 'ব্রাহ্মণ' (বৃহ, ৪।৪।২৩)। গীতা ঐ জীবন্মুক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥—গীতা, ৫।১৯

'যাঁহাদের মন সমত্বে সুস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসৃতি জয় করিয়াছেন—কারণ, নির্দোষ-সম যে ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি-লাভ হইয়াছে।'

প্রারব্ধের সংস্কার (momentum)-বশে কতকদিন তাঁহাদের দেহ-ব্যাপার সচল থাকিতে পারে—চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ—তার পর দেহান্তে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য বা একীভাব।*

এই যে ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মের সহিত একীভাব—মুক্ত পুরুষের পক্ষে যখন ইহার উপলব্ধি হয়—তখন তিনি বিশ্ব যে কেবল ব্রহ্মময় দেখেন, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম (ছা, ৩।১৪।১)—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (গীতা ৭।১৯)—তাহা নহে, তাঁহার নিকট নানাত্ব নিঃশেষে নিবৃত্ত হয় (Plurality is wholly negated) ; তখন শুধু সুস্থিত থাকেন, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ
—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্ম
—মুণ্ডক, ২।২।১১

'ব্রহ্মই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই নানাত্ব-নিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মনসৈবানু দ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—বৃহ, ৪।৪।১৯

'ঐ অবস্থায় নানাত্ব নিষিদ্ধ হয়—(মুক্ত পুরুষ) মনঃ দ্বারা তাঁহাকেই দর্শন করেন'।

কিরূপ দর্শন করেন ?

যদেবেহ তদ্ অমুত্র, যদ্ অমুত্র তদ্ অন্বিহ—কঠ, ৪।১০

'দেখেন যিনিই সেখানে, তিনিই এখানে'—তিনি সর্ব্বময, তিনিই সর্ব্ব—তিনি ভিন্ন কিছু নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—তিনি প্রপঞ্চোপশম (effacing the entire universe)—তিনি শান্ত শিব অদ্বৈত।

অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্—মাণ্ডুক্য, ৭।

---

*Until this six-senses-machine has broken up at the death of the saint, in the same way that the potter's wheel still for a time keeps on turning, after the force that had set it in motion has ceased to operate —Grimm's Doctrine of the Buddha, p 377

যতদিন তিনি নানাত্ব দেখিতেন—Plurality-র আযত্তে ছিলেন, ততদিন তাঁহাব শোক মোহ ছিল, তাঁহাব ভয ভাবনা ছিল—ততদিন তিনি মৃত্যুব অধীন ছিলেন,

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।১৯

এখন ? একধৈবানু দ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ (বৃহ, ৪।৪।২০)—এখন তিনি একত্বেব উপলব্ধি কবিয়াছেন, বুঝিয়াছেন—'All plurality is *mere* appearance'; জানিয়াছেন যে স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু বিবর্ত্তিত হইযা যেমন অলাতচক্র (fiery circle) বচনা কবে (অলাতচক্রম্ ইব স্ফুবন্তম্ আদিত্যবর্ণম্—মৈত্রায়ণী, ৬।২৪), এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব সেইরূপই মায়াব বিবর্ত্ত।—এখন তিনি সেই অমেয় অজ্ঞেয় অজেয, সেই অব্যয অক্ষয় অদ্বয়কে আত্মস্থ কবিযাছেন—এখনও তাঁহাব শোক-মোহ ?

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ—ঈশ, ৭

এখন তিনি অতি-মৃত্যু জয কবিযাছেন—তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি—এখন তিনি অমৃতত্বেব অধিকাবী হইযাছেন—ব্রহ্মণি স আত্মা অমৃতত্বায় (মহানার, ১৫।১০)—এখন ব্রহ্মে সুস্থিত হইয়া তাঁহার আত্মা অমৃতত্ব লাভ কবিযাছে।

এইরূপে ব্রহ্মে সুস্থিত হওয়াই 'ব্রাহ্মী স্থিতি'।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭২

'ইহাবই নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। এ স্থিতিতে স্থিত হইলে মোহেব অপগম হয। যিনি অন্তবেলায (দেহান্তকালে) ঐ স্থিতিতে সুস্থিত হযেন, তিনি 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ' প্রাপ্ত হন।'

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য উহাব উপদেশ কবিযা জনককে বলিলেন—

অভয়ং বৈ প্রাপ্তোসি জনক ! ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—বৃহ, ৪।২।৪

'হে জনক ! আপনি 'অভয়' প্রাপ্ত হইলেন।'

ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যেব মোক্ষবাদ। কেন ইহাকে 'মোক্ষ' বলা হয ? মোক্ষেব স্বরূপ কি ? মোক্ষ-দশাই বা কিরূপ ? মোক্ষেব সহিত বুদ্ধদেব যাহাকে 'নির্ব্বাণ' বলিতেন—তাহাবই বা সম্বন্ধ কি—বাবান্তবে ঐ সকল কথাব আলোচনা কবিব।

শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত

।

নাই বা হোল চেরীফুল

(বোমানফ হইতে)

(১)

বসন্তেব এমন ঘটা আব কখনো দেখা যায় নি। কিন্তু ভাক্রচা, বোন আমাব, আমাব মনে তবু শান্তি নেই। আমি নিবানন্দ, অবসন্ন, যেন কোন মাঝাবিগোছেব কাজ কোবে ফেলেছি।

আমাব হষ্টেলেব জানলায একটা বোতল বযেছে। তাব গলাটা ভাঙা, আব সেখানে বসানো একটা ছেঁড়া শুকনো বুনো চেবী-ব ছোট ডাল। কাল বাত্রে ওটাকে এনেছি।

ঐ বোতলটাব দিকে চাইলেই কি জানি কেন আমাব কান্না আসে।

না, সাহস কোবে তোকে আজ সব বল্‌ব। সম্প্রতি অন্য বিভাগেব একটি ছেলেব সঙ্গে আমাব আলাপ হযেছিল। তাব ভাষায বল্‌তে গেলে, কোন বকম ভাবালুতাব বালাই আমাব নেই। ভ্রষ্ট কৌমার্য্যেব অনুশোচনা আমাব কাজ নয; প্রথম "পতন" নিয়ে বিবেক-দংশন আমাব কাছে ঘেঁষতে পাবে না। কিন্তু কালকেব ব্যাপাবটাব মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা অস্বস্তিকব; সেটা স্পষ্ট নয়, গোলমেলে, তবু সর্ব্বদাই লেগে আছে।

কেমন কোবে কি ঘট্‌ল তোকে বল্‌ছি পবে, একেবাবে "বেহায়াব" মত। তাব আগে তোকে গোটাকযেক কথা জিজ্ঞাসা কোবতে চাই।

পল্‌-এব সঙ্গে তোর যখন প্রথম মিলন হোলো তোব কি তখন মনে হয় নি যে তোদেব প্রথম প্রণযেব দিনটি উৎসবেব দিন হোয়ে উঠুক, কোন-না-কোন বকমে সকল দিনেব থেকে আলাদা ?

ধব, তোব জীবনের সেই মধু-উৎসবেব দিনে কাদামাখা জুতো প'বে বাইরে বেরুতে, কিংবা ছেঁড়া বা ময়লা ব্লাউজ গায়ে দিতে তোব কি অপমান বোধ হোত ?

একথা জিজ্ঞাসা কবাব কাবণ আমাব সমবয়সী আলাপীবা ব্যাপাবটাকে অন্য চোখে দেখে। দেখ্‌ছি আমি যা অনুভব কবি, সেইমত ভাবাব ও কাজ কবাব সাহস আমাব নেই।

যাদেব সঙ্গে থাক্‌তে হয তাদেব প্রচলিত মতেব বিরুদ্ধে যেতে যেন খানিকটা জোব লাগে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যৌবনসুলভ তাচ্ছিল্যই আমাদের মধ্যে প্রচলিত মনোভাব। একটু সৌখীনতা, পোষাকেব সামান্য

বাহাব বা ঘবে পরিচ্ছন্নতা—সব বিষযেই তাই। আমাদেব হষ্টেলটা ময়লা,, নোংবা, বিশৃঙ্খল। বিছানাগুলো লণ্ড-ভণ্ড। জানলাব খাঁজে খাঁজে পোডা সিগবেট; কামবাব হালকা পার্টিশনগুলো ছেঁড়া প্ল্যাকার্ড ও বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাওয়া। এমন একজনও নেই যে ঘবটাকে একটু সাজাতে চায়। একটা গুজব বটেছে আমবা শীঘ্রই অন্য বাড়ীতে বদ্‌লি হব। তাতে মেয়েদেব অগোছ আবো বেডে গেছে। অনেকে ইচ্ছে কোবেই জাযগাটাকে নষ্ট কোবছে।

ঠিক মনে হয়, আমবা লজ্জিত হোয়ে পড়ব যদি কাবো কাছে ধবা পড়ে যাই যে পবিষ্কাব ও সুন্দব ঘব, তাতে খোলা স্বাস্থ্যকব হাওয়া, এই সব তুচ্ছ ব্যাপাব নিয়ে আমবা মাথা ঘামাই। একথা সত্য নয় যে আমাদেব হাতে ভযানক কাজ ও সময়েব অত্যন্ত অভাব। আসল কথা হচ্ছে এই যে আমাদেব ধাবণা, রূপ-সাধনা-সম্পর্কিত সমস্ত কিছুকেই ঘৃণা কোবতে আমবা বাধ্য।

এ-তে আরো আশ্চর্য্য হোতে হয। কাবণ আমবা সবাই জানি আমাদেব নতুন শাসনকর্ত্তাবা,—আমাদেব দারিদ্র্য-পীডিত শ্রমজীবি শাসনতন্ত্র—কত অর্থ ও শক্তি খবচ কবে সুধু সব জিনিসকে সুন্দব কবাব জন্যই। সহবময ফুলের বাগান লাগিযেছে, ধনিক ও ভদ্রলোকেব পুবানো শাসনতন্ত্রে যার জুড়ি মেলে না, যদিও শোভন সুন্দব জীবন সম্বন্ধে তাদেব দম্ভেব অন্ত ছিল না। আজ সমস্ত মস্কো সহব ষ্টাকোব ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল; আব আমাদেব ইউনিভাবসিটি—যেটা একশো বছব ধ'বে ঠিক ধসে-পড়া পুলিশেব থানাব মত দেখতে ছিল—সেটা এখন মস্কো-ব সুন্দবতম অট্টালিকায় পবিণত হোযেছে।

এটা যে এত সুন্দব, তাতে আমবা অজ্ঞাতসাবে গর্ব্ব অনুভব কবি। তা সত্ত্বেও, আমাদেব নতুন শাসনতন্ত্রেব তদাবকে পবিষ্কাব কবা এই দেযাল-গুলিব ভিতবে আমাদেব জীবন কদর্য্যতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিশাসিত। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এমনভাবে চলে যেন সে ভীত, পাছে কেউ তাকে ভদ্রতা বা সৌজন্যেব দোষ দেয়। তাবা ইচ্ছে কোবে অসভ্য ও অভব্য কথাব ধরণ অভ্যাস কবে ও পবস্পবেব পিঠে চাপড় মেবে আলাপ কবে। যৌন সম্বন্ধের কথা কইতে গেলেই তাবা সব চেযে অশ্লীল ভাষা, সব চেয়ে ইতব বুলি লাগায়। বাছাবাছা জঘন্য অভিধাগুলিও আমাদের ভাষায পূর্ণ অধিকাব লাভ কবেছে। এতে যখন কোন কোন মেয়ে—সব নয অল্প কয়েকজন—ব্যথা পায় তখন অবস্থা হয় আবো খাবাপ। বাকী সকলে চেষ্টা কবে তাকে "মাতৃভাষায়" অভ্যস্ত কোবতে।

বিশ্ব-তাচ্ছিল্য, স্থূল লাম্পট্য, সৌকুমার্য্যেব পদদলন, এইগুলোই সুধু

টিঁকে থাকৃতে পাবে। এব কাবণ হয়ত এই যে আমবা সবাই গরীবেব দল, পোষাকেব খবচা না জোটায পবিচ্ছদমাত্রকেই ঘৃণা কবি, অন্ততঃ তাই ভান কবি। কিংবা হযত আমরা নিজেদেব ভাবি বিদ্রোহেব সৈন্যদল যাদেব কাছে ভাববিলাসিতা ও খুঁতখুঁতে-পনা স্বভাবতঃই কোন স্থান পেতে পাবে না। কিন্তু আমবা যদি সত্যিই বিদ্রোহেব সৈন্যদল হই, তাহলে ত আমাদেব উচিত আমাদেব প্রতিষ্ঠিত শক্তিব কাছ থেকে শিক্ষা নেওযা ও জীবনে সৌন্দর্য্য সাধনা কবা,—সুধু সৌন্দর্য্যেব খাতিবে নয, পবিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যেব খাতিবেও। এইজন্য আমাব মনে হয় এই সব অতিবঞ্জিত, বাডাবাডি, ব্যাব্যাকী ব্যবহাব পবিহাবেব সঙ্কল্প কবাব সময এসেছে।

কিন্তু জানিস, বেশীব ভাগই এ সব পছন্দ কবে। সুধু ছেলেদেব কথা নয, মেয়েবাও কবে। এতে তাবা বেশী স্বাধীনতা পায ও তাদেব ইচ্ছাশক্তিব প্রযোগের কোন দবকাবই হয না।

কিন্তু সুন্দব, পবিত্র ও স্বাস্থ্যকবেব প্রতি এই অনাস্থা আমাদের অন্তবঙ্গ ব্যবহাবে বেশী স্থূলতা এনে দিয়েছে। এব ফলে এসেছে জববদস্তি, সদাচাবেব ও সূক্ষ্মভাবের অভাব, এবং বান্ধবী বা অন্য কোন মেয়েব প্রতি সামান্য যত্ন দেখানোয় ভয।

এ সবেব মূল হচ্ছে অলিখিত নীতিশাস্ত্র লঙ্ঘনেব আশঙ্কা! তোদেব ওখানে—তুই যেখানে পডছিস্—হালচাল আলাদা। আমাব মাঝে মাঝে দুঃখ হয কেন ইউনিভাবসিটিতে এলাম। আমাব মা ত গাঁযেব ধাই; সে আমাব কথা ভাবে সশ্রদ্ধ সম্মানেব সঙ্গে, যেন আমি একটা উচ্চস্তবেব লোক। আমি প্রাযই নিজেকে এই প্রশ্ন কবি যে, মা কি ভাববে যদি সে টেব পায় আমবা কি কদর্য্যভাবে থাকি ও কি কুৎসিত ভাষা অভ্যাসবশে সর্ব্বদা ব্যবহাব কবি।

আমাদেব কাছে প্রেমেব কোন অস্তিত্ব নেই; আছে সুধু দৈহিক সঙ্গম। কাজেই প্রেমকে আমবা ঘৃণাভবে মনস্তত্বেব বাজ্যে হাঁকিয়ে দিযেছি। বেঁচে থাকাব অধিকাব আমবা কেবল দেহতত্ত্বেব দিক দিযেই বুঝি।

মেযেবা তাদেব পুরুষ-বন্ধুদেব সঙ্গে বাস করে। তাদের সঙ্গে সপ্তাহখানেক কি মাসখানেকেব মতন বেবিযে যাওয়া এমন কিছু গুরুতব কাণ্ড নয,—অনেক সময এলোমেলোভাবে এক আধ বাত্রেব জন্যও। কেউ যদি প্রেমেব মধ্যে দেহতত্ত্বেব বাইবে কিছু খোঁজাব চেষ্টা কবে তবে তাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে হেসে উডিয়ে দেওয়া হয।

(২)

কে জানে ছেলেটা নিজেকে কি ভাবে? এমনি মামুলি ছেলে, উঁচু বুট পরা, গায়ে নীল জামা, গলায় বোতাম নেই। উস্‌কো-খুস্‌কো চুলের গোছা কপাল থেকে কেবলই হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া তার অভ্যাস।

তার চোখ দুটি আমাকে টানে। একা একা সে যখন করিডোর দিয়ে চলে, লক্ষ্য করা যায় তার চোখে কি গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্তি।

কিন্তু যেম্‌নি দলের কোন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়, আমার মনে হয়, অমনি সে যেন অতিরিক্ত রকম হট্টগোলপ্রিয়, অসংযত ও অশিষ্ট হোয়ে ওঠে। মেয়েরা তার আত্ম-প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছে, সে সুন্দর বলে; ছেলেরা, সে চালাক বলে। এই ধরণের নেতৃত্বটুকু হারাবার ভয়ে সে কুণ্ঠিত।

তার মধ্যে আমি দুটি মানুষ দেখতে পেতাম। একটির ছিল অন্তরের প্রচুর শক্তি ও চিন্তার গভীরতা; অপরটি ছিল যেন চ্যাংড়া ছোকরা; যে প্রকৃতপক্ষে যতটা রস্‌রসিক তার চেয়ে ঢের বেশী ভান কোরে ও চালবাজী দেখিয়ে লোককে বিরক্ত কোরে তোলে।

কাল সূর্য্যাস্তকালে আমরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, প্রথমবার। সহরের ওপর সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ছড়ানো; পথের গোলমাল কমে এসেছে। বাতাস ছিল তাজা, আর বাগান থেকে আস্‌ছিল ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।

—চল না আমার ঘরে, এখান থেকে বেশী দূর নয়,—সে বললে।

—না, আমি যাবো না।

—কেন? শিষ্টাচার?

—না, তা নয়, মোটেই সেজন্য নয়। আপাততঃ ঘরের বাইরে বেশ লাগ্‌ছে।

জেটির ধার দিয়ে হেঁটে একটা পুলের ওপর আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালুম। একটি মেয়ে এল চেরীফুল বেচ্‌তে। আমি একটা ডাল কিনলুম। ভাঙানির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরতে হোল। একপাশে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে সে অল্প একটু ভ্রুভঙ্গি কোরলে।

—চেরীফুল নইলে কি চলে না?

—চলে, তবে না থাকার চাইতে থাকাই ভালো।

—আমি ত সর্ব্বদা চেরীফুল ছাড়াই চালাই; দেখেছি ত, শেষ পর্য্যন্ত মন্দ চলে না—এই বলে সে বিশ্রী রকমের হাস্‌তে লাগল।

পথে দুটি মেয়ে আমাদের এগিয়ে ছিল। একদল ছেলে তাদের

জ্বালাতন কোরছিল। যখন তারা নিজেদের ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ছেলেগুলো সশব্দে হেসে উঠ্‌ল, তাদের দিকে চেয়ে চীৎকার কোরে যা তা বল্‌তে লাগ্‌ল।

—মেয়ে দুটোকে চটিয়ে দিয়েছে দেখছি। চেরীফুল না নিয়ে কাছে গিয়েছিল কিনা, তাই ওরা ভয় পেয়েছে—আমার সঙ্গীটি বললে।

—চেরীফুলের ওপর আপনি চটা কেন?—আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম।

—কি জান, চেরীফুল নাও বা না নাও, শেষ পর্য্যন্ত একই দাঁড়ায়······সত্য গোপন কোরে লাভ কি?

—এভাবে কথা কইছেন কখনও ভালোবাসেন নি বলে।

—তার কি প্রয়োজন?

—তাহলে মেয়েদের কাছে আপনি কি চান?

—আঃ, ছাড় তোমার ওই চীনে শিষ্টাচার। আমায় 'তুমি' বল, আপনি বোলোনা। মেয়েদের কাছে কি চাই? হ্যাঁ, মেয়েদের কাছে কিছু চাই বৈ কি, আর জোর কোরে বল্‌তে পারি সেটা বড় কম জিনিষ নয়।

—আমি আপনাকে তুমি বলব না। সকলেই তুমি বললে কোন আনন্দ পাওয়া যায় না।

কতকগুলো লাইলাক-এর ঝোপ পেরিয়ে গেলাম। চেরী ফুলটা আমার জামায় পিন দিয়ে আট্‌কাবার জন্য আমায় একটু থাম্‌তে হোল। সে হঠাৎ এসে, আমার মাথা ঠেলে দিয়ে আমাকে চুম্বনের চেষ্টা কোরলে।

আমি তাকে ঠেলে পেছিয়ে দিলাম।

—চাওনা; বেশ, চেয়ো না—সে ধীরভাবে বল্‌লে।

—না, আমি চাই নে তুমি ত কাউকে ভালোবাস না, তাই তোমার এসে যায় না তুমি কাকে চুমো দিচ্ছ। আমি না হোয়ে আর কেউ হোলেও তুমি এমনি কোরেই তাকে চুমো খেতে চাইতে।

—ঠিক কথা। মেয়েরাও যাকে খুসী তাকে চুমো খায়, একজনেই আবদ্ধ থাকে না। সম্প্রতি আমাদের একটা ভোজ হোয়েছিল। সেখানে আমার এক বন্ধুর বাগ্‌দত্তা তাকে যত জোরে চুমো খেয়েছিল, আমাকেও ঠিক ততজোরেই চুমো দিয়েছিল। আমি না হোয়ে আর কেউ কাছে থাক্‌লে, তাকেও ঠিক এই রকমই কোরত। অথচ এরা দুজনে প্রেমে প'ড়ে বিয়ে কোরতে যাচ্ছে রেজেষ্ট্রী অফিসে। এই রকমই হয়।

তার এই ধরণের কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা জ্বলে উঠল। আমি ভেবেছিলাম সে আমার প্রতি উদাসীন নয়। কতবার সে আমার দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে ফিরেছে, এমন কি যখন আমি অন্য মেয়েদের ভীড়ের মধ্যে

থেকেছি। আজ এই বসন্তের সুন্দব সন্ধ্যায় প্রাণ যখন স্নিগ্ধ শান্ত আলাপ চায়, তখন কেন সে তাব স্থূল কামাতুব কথা দিযে তা' নষ্ট কোবে দিচ্ছে।

সে মুহূর্তে আমি তাকে ঘৃণা কোবে ফেল্‌লাম। আমবা একটা বেঞ্চিব পাশ দিযে যাচ্ছিলাম। একজন মহিলা তাতে বসেছিলেন, এক পাযেব ওপব আব এক পা চাপিয়ে। তাঁব পবনে সিল্কের মোজা। নিকট দিয়ে কেউ গেলেই তিনি চোখ তুলে চাইছিলেন।

আমাব সঙ্গীটি তাঁব দিকে স্থিব দৃষ্টিতে তাকাল। আব কযেক পা এগিযে গিযে আবার ফিবে চাইল। মনে হোল যেন আমাব গাযে হুল বিঁধছে। ঠিক পবেব বেঞ্চিটায় গিযে সে বল্‌লে—এখানটায বসা যাক। উদ্দেশ্য সেখান থেকে তাঁব দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে পাববে।

হঠাৎ এত বিচলিত হোযে পডলাম যে ভয হোল কেঁদে ফেলব। পাছে ভেঙ্গে পডি তাই বিদায নিলাম এই বলে যে তাব সঙ্গে আব আমি থাক্‌তে চাই না।

স্পষ্ট বোঝা গেল সে বিস্মিত হোযেছে। জিজ্ঞাসা কোবল—আচ্ছা তুমি কি চাওনা যে আমি অকপট হই? সাজিয়ে গুজিয়ে মিথ্যে বল্‌লেই কি ভাল হোত?

—না সাজালে চলে এমন কিছুই তোমাব নেই দেখে আমি দুঃখিত।

যেন প্রথমটা আমাব কথা কিছু বুঝতে পাবে নি এই ভাব দেখিয়ে সে বল্‌লে—"বেশ, এখন তুমি কি কোবতে চাও? আচ্ছা, আমিও তবে চল্‌লুম; গুড্ বাই।" সে আমাব হাত ধবলে এক মুহূর্তেব জন্যে। "কিন্তু এটা বোকামি, নিছক বোকামি"—এই বলে আমাব হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে তাব বাডীব দিকে চলে গেল।

আমিও অবাক হোয়ে গেলাম। আমি ভাবিনি সে চলে যাবে।

বুলভাব-এব একটা কোণে থেমে আমি চাবিদিকে চেযে দেখলুম। তেমনই মে মাসেব এক বাত যখন মনে হয় চাবপাশে জীবনেব স্রোত, সুধু সেই বাত্রিটিবই জন্য, আর কখনও ফিবে আসাব নয়। টুক্‌বো মেঘেব মধ্যে চাঁদ আকাশেব গাযে স্থির হযে আছে, উষ্ণ মেঘময হলুদ-বঙেব কুযাশায় মণ্ডিত হোযে। সুদূব সূর্য্যাস্তেব শেষ আভাস অনেক বাডীব ছাদ ও ক্রেমলিন-এব চূডাব আড়ালে মিলিযে আসছে। পথেব দূব-দূব আলোগুলো চাঁদেব কিবণে ম্লান।

ক্যাথীড্রালেব সামনে উজ্জ্বল-আলোকিত বাগানে তরুণতরুণীব প্রফুল্ল জনতা। আব নুয়ে-পড়া, পাতা-ছাঁটা গাছ ও লাইলাক-ঝোপের মধ্যে আসনগুলিতে প্রেমিক-যুগল।

হালকা কথা ও হাসিব মৃদু মর্ম্মব। জ্বলন্ত সিগবেটেব প্রান্ত চোখে পড়ে। বাত্রিব এই জাগিযে-তোলা উষ্ণতায় সকলেই তপ্ত, উন্মত্ত, কেউ একটি নিমেষও হাবাতে চায না।

কিন্তু এমন বাতও যখন কাবো হৃদয-তন্ত্রীতে আঘাত কবে না, যখন সে সঙ্গীহীন, বিষণ্ণ, একা,—তখন সে ভাবি দুঃখী, তাব দুঃখেব তুলনা নেই।

একটু আগে সে আমাব কাছে বইল কিনা তাতে আমাব কোন লাভ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সেই বেঞ্চিতে-বসা মেযেটিব দিকে তাব তাকিয়ে থাকাব স্মৃতি আমাব মনে আঘাত কোবতে লাগল। উদ্বেগে কাঁদ-কাঁদ হোযে পড়লুম। চিত্তেব দুর্ব্বলতা এমনই বেড়ে গেল যে সে আমাব কাছে থাকুক এ ছাড়া দুনিযায কোন কিছুই চাইবাব বইল না।

এক কথায—আমাব দোষ দিস নি—আমার সহ্য হোল না যে আমি এই বসন্তের উৎসব-বাত্রে আনন্দিত সঙ্গ থেকে, সঙ্গীদের দল থেকে, প্রক্ষিপ্ত বিতাড়িত হোয়ে থাকি।

তারপব কিসে কি হোতে পাবে না ভেবে আমি ফিবলুম, আব চল্‌লুম, দ্রুতগতিতে, তাব বাড়ীব দিকে।

(৩)

আমাব মাথায তখন একটিমাত্র চিন্তা; হযত সে বেরিয়ে গেছে, হয়ত আমাব দেবী হোয়ে গেছে; হয়ত বা আমায একা থাক্‌তে হবে। তখন আমি নিজেকেই বকতে লাগলুম তাব স্বভাবেব ভালো দিকটা ফোটাবাব একটুও চেষ্টা না কোবে এ বকম হাস্যকব ভাবে তাকে ছেড়ে চলে আসাব জন্যে।

ভাবলুম আমি ত ঠিক তাদেবই মত ব্যবহাব করছি যাবা কোন অবস্থা দেখলে ভালো কবাব চেষ্টাব বদলে শুধু ঘাড় দুলিযে নিশ্চেষ্টতাব অঙ্গভঙ্গি কবে। মানে নিজে কোন শক্তি প্রযোগ না কোবেই প্রেযতব কিছু পেতে চেযেছিলাম।

পুরানো পাথবের বাড়ীটার গেট পাব হোযে গেলুম। বুঝতে পাবলুম বাইবেব মে-বজনীব তপ্ত বাযুব সঙ্গে পাথবেব শীতল প্রাচীবের ভিতবকাব ঠাণ্ডা দুর্গন্ধ হাওযাব কত তফাৎ।

মস্কোব অনেক বাড়ীতে এ বকম ঢোকবাব পথ এখনও যথেষ্ট আছে যাব দবজা ধোয়া হয় না; পুবানো বিজ্ঞাপনেব টুক্‌বো ঝুল্‌ছে, বাইবের সিঁড়ি ময়লা, হিজিবিজি কাটা ও জঙ্গলে ভবা।

আমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়াব আশা সে মোটেই করে নি।

ভাবে বোধ হোল সে কাজে বস্‌তে যাচ্ছিল। দেয়ালের গায়ে ঠেসান-দেওয়া একটা ছোট্ট টেবিল। ঘরের ভিতরকার ছাদ থেকে একটা ইলেক্‌ট্রিকের 'বাল্‌ব' দড়ি দিয়ে ঝোলানো, সেটাকে টেবিলের ওপর টেনে নিয়ে পেরেক দিয়ে আট্‌কানো হয়েছে।

—তাহলে বীররমণী ফিরে এলেন,—চেঁচিয়ে সে বল্‌লে। নিশ্চয়ই ভেবে দেখে ভুল শুধ্‌রেছেন। ভালোই হোয়েছে।

হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দিকে এসে সে আমার হাত ধরলে। হয়ত সে আমায় চুমো খেতে বা আদর কোর্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই কোর্‌লে না।

আমি বল্লুম—ঝগড়া কোরেছিলুম ব'লে আমি দুঃখিত; তাই মিটোতে এসেছি।

—মিটোবার আবার কি আছে? দাঁড়াও একটু, দরজায় একটা নোটিস টাঙিয়ে দিই যে আমি বাড়ী নেই। নইলে কেউ এসে পড়তে পারে।

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সে নোটিসটা লিখলে। তারপর সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একলা আমি চারদিক চেয়ে দেখে নিলাম। ঘরটার চেহারা ঐ সিঁড়িটার মতই। দেয়ালের গায়ে টেলি-ফোনের নম্বর আঁচড় কাটা, ঝাঁট-না-দেওয়া মেঝেয় সিগরেটের গোড়া আর কাগজের টুক্‌রো ছড়ানো; একটা গোটানো বিছানা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে জড় করা, ঠিক আমাদের মত; জানলার কুলুঙ্গিতে ময়লা ডিশ, খালি বোতল, মাখন-মোড়া কাগজ, ডিমের খোলা, ঘটিবাটি ইত্যাদি।

যেন কি রকম বিব্রত বোধ হোতে লাগল, ভেবেই পেলাম না সে ফিরে এলে কি বলব। চুপ কোরে থাকাটাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ তার একেবারে বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব।

তখন আমার নিজেকে জিজ্ঞাসা করার কথা মনে হোল কেন সে ঐ নোটিসটা দরজায় লাগাতে গেল। না হয় কেউ আসতই?

হঠাৎ সমস্তটা স্পষ্ট হোয়ে গেল। আমার মাথাটা ঘুরে উঠল, নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে গেল। দুরু-দুরু বুকে আমি জানালার ধারে গেলুম, বোতল ও সিগরেটের বাক্সগুলো সরিয়ে একটু বসার জায়গা কোরে নেবার জন্যে। দেখতে পেলুম আমার হাত কাঁপছে। তা সত্ত্বেও সেখানটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়লুম। পিঠের আড়ালে কি ঘট্‌ছে তাই শোনবার জন্য কান খাড়া কোরতেই মনে হোল প্রতীক্ষার এমন চঞ্চল উদ্বেগ আমি আগে কখনও উপলব্ধি করি নি।

আমার একমাত্র দুঃখ ছিল এই যে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত্তগুলি, আমার প্রেমের প্রথম দিনটি কাটাতে হবে এই অপরিচ্ছন্ন ময়লা ঘরটায়, এই বাসি এঁটো কাঁটার মধ্যে।

তাই সে ঘরে ফিরে এলে আমি বল্‌লাম—চল, একটু খোলা হাওয়ায় যাওয়া যাক।

চমক ও বিরক্তির আভাস তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল।

—কেন, তুমি কি এইমাত্র সেখান থেকে এলে না?

তারপর তার গলার স্বর বদলে গেল। সে হুড়হুড় কোরে বোলতে লাগল—নোটিসটাকে এমন কোরে এঁটে দিয়ে এসেছি যে কেউ আর আমাদের বিরক্ত কোরতে আসবে না। বাজে বোকো না। আমি এখন তোমায় কোথাও যেতে দিচ্ছি না।

—এখানে থাক্‌তে আমার ভালো লাগ্‌ছে না।

সে চ'টে বল্‌লে—আবার সেই পুরোনো কথা! হয়েছে কি? কোথায় যেতে চাও?

তার কথাগুলো দম-আট্‌কানো অথচ দ্রুতগতি। আমাকে আট্‌কে রাখার কথা ভেবে তার হাত কাঁপতে লাগল।

আমার হাতও কাঁপছিল, আর বুকের স্পন্দনের এমন জোর যে চোখে আঁধার দেখতে লাগলুম। আমার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছিল। একদিকে আত্মসমর্পণের ভাব. কেউ এসে বিরক্ত কোরবে না এই অনুভূতি; অন্যদিকে প্রতিবাদের ইচ্ছা,—তার চোরের মত দ্রুত চুপি-চুপি কথা, তার পেটুকের মত তাড়া, তার অসংযম—এইগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বোধ হোল, তার মনে তখন একটিমাত্র ইচ্ছা, বন্ধুদের কেউ এসে পড়ার আগেই কাজ সেরে ফেলা। আমার সামান্যটুকু বাধাতেও অধীর ও ক্রুদ্ধ হোয়ে পড়ছিল।

মুক্তপ্রেমের ক্ষেত্রেও আমরা মেয়েরা আসল ব্যাপারটিকে সোজাসুজি দেখতে পারি না। আমাদের কাছে এই ব্যাপারটি সর্ব্বদাই একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের শেষ অংশ। প্রথম আমরা মুগ্ধ হই মানুষটিকে দেখে, তার বুদ্ধিতে তার আত্মায় তার কোমলতায়। দৈহিক সঙ্গম ছাড়া অন্য কিছু কামনা কোরে আমরা সুরু করি। এই কামনা যখন চরিতার্থ হয় না, যখন কোন মেয়ে ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক আবেগের বশীভূত হোয়ে পড়ে, তখন তৃপ্ত না হোয়ে সে নিজের ওপরেই চটে ওঠে। পুরুষটিকে সে মনে করে, যেন তার শত্রু, তার পতনের সহচর, যেন জোর কোরে তাকে অত্যন্ত অপ্রিয় ও পরিহার্য্য অনুভূতি উপভোগ করিয়েছে।

সেই গোটানো বিছানা, ডিমের খোলা, ময়লা, তার চোরা চাহনি, আর ব্যাপারটা যে ঠিকমত চল্‌ছে না এই বোধ, এ-সব মিলে আমায় ইতিমধ্যেই অপ্রস্তুত কোরে ফেলেছিল। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—আমি এখানে থাকতে পারছি নে।

—কি হোল আবাব ? আসবাব-পত্র পছন্দ হচ্ছে না ? যথেষ্ট কবিত্ব নেই এতে। কিন্তু আমি ত কোন ব্যাবণ নই—সে বিবক্তি না চেপে চেঁচিয়ে বল্‌লে।

খুব সম্ভব তাব এই চীৎকাবে আমাব মুখেব ভাব বদ্‌লে গিয়েছিল। কেননা, তাব এই কথাগুলোব ছাপ মুছে ফেলাব জন্যে ব্যস্ত হোয়ে সে তাড়াতাড়ি নীচু গলায় আমায শান্ত কবাব চেষ্টা কোবতে লাগল।

—ও কিছু নয, লক্ষ্মীটি, থাম · সত্যিই কেউ এসে পডতে পাবে।

নিশ্চযই আমাব উচিত ছিল তখনই চলে আসা। কিন্তু তাব কাছে একা থাকাব দরুণ আমাব মনও বাসনায় উদ্দীপ্ত হোযে উঠেছিল, যেমন হযেছিল তাবও মন। নিজেকে ঠকানোই স্থিব কবলুম, এবং এই মিথ্যে আশায থেকে গেলুম যে কিছু-না-কিছু এসে বাধা দেবেই।

—দাঁড়াও, তোমার জন্যে কিছু কবিত্বেব ব্যবস্থা কবা যাক—এই বলে সে আলোটা নিবিযে দিলে।

সত্যিই ভালো হোল। কাবণ, মযলা বিছানাটা, বোতলগুলো, সিগবেটেব গোডা আব চোখে পডে না।

তাব দিকে পিঠ ফিবিযে জানলায গিযে দাঁড়ালুম। সে আমাব পিছনে এসে একটা হাত দিযে আমাব কাঁধ জড়িয়ে ধবলে। আমি বাইবেব দিকেই তাকিযেছিলুম। তাব মুখেব ভাব দেখ্‌তে পাই নি, কিন্তু এই আলিঙ্গনটির জন্যে তাব কাছে কৃতজ্ঞ বোধ হোল। ইচ্ছে কবছিল, অনেকক্ষণ, অনেক অনেকক্ষণ সেখানটায় দাঁডিযে থাকি।

কিন্তু তাব আব ত্বব সইল না। কেবলই তাব মনে হচ্ছিল কখন কে এসে পডে। আমায় ধোবে জানলা থেকে সবিয়ে নিযে যেতে যেতে "আব কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িযে থাক্‌বে ?"—সে জিজ্ঞাসা কোবলে।

*　　*　　*　　*　　*

উঠে দাঁডাতেই সে চট্‌ কোবে আলোটা জ্বালিযে দিলে। ভযে আতঙ্কে আমি চেঁচিযে উঠ্‌লাম—আলো চাইনে আমাব। সে আমাব দিকে অবাক্ হয়ে চেযে, কাঁধ নেড়ে, আলোটা আবাব নেবালে। তাবপব বিছানাব কাছে গিযে সেটাকে ঠিকঠাক কোবতে লাগল।

সে বল্‌লে—রুম-মেটেব বিছানাটা ঠিক কোবে বাখ্‌তে হবে, নইলে 'ভান্যা' এসে নিশ্চয ধবে ফেলবে যে ঘবে মেযে এনেছিলাম।

বিছানার চারপাশে সে হাঁতড়াতে লাগল, হামাগুড়ি দিযে মেঝের ওপর ঘুরতে লাগল, যেন কি একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি একা রইলাম। একটু পরে সে আমার কাছে এল। প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমি ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে চাইলাম। আমার সমস্ত শক্তি দিযে মনের ভাব চেপে রাখার জন্যে যুদ্ধ করছিলাম। সে হাত বাড়াল।

"নাও," সে বল্লে, "ধরো তোমার চুলের কাঁটা। মেঝের ওপর কী হামাটাই দিতে হোল! আলোয় তোমার এত আপত্তি কেন বল ত? এখন তুমি তাড়াতাড়ি সরে পড়ো, নইলে কেউ হযত এসে পড়বে। তোমায় খিড়কির দরজা দিযে বার কোরে দিই চল। সামনের দরজা এখন বন্ধ থাকার কথা।"

দুজনে একটি কথাও বললাম না। মনে হোল পরস্পরের চোখ এড়িয়ে চলেছি।

পথে বেরিয়ে এসে খানিকটা যেন কলের মত চল্‌তে লাগলাম, কিছু না ভেবে চিন্তে। পরে হঠাৎ হাতে শক্ত কি একটা ঠেক্‌ল; আমি চমকে উঠলাম, মনে পড়ল সেই কাঁটাগুলো, যা সে আমার হাতে গুঁজে দিযেছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে সেগুলোর দিকে তাকিযে রইলাম। সেগুলো চুলের কাঁটাই বটে, অন্য কিছুই নয।

সেগুলো হাতে কোরে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী এলাম। তখনও আমার জামায় আঁটা সেই চট্‌কান ফুলের ডালটা, ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার মতো ঝুলছে।

আর সমস্ত সহরের আকাশ ছেযে সেই চমৎকার রাত। রাশি রাশি বাড়ীর মাথার ওপরে সেই চাঁদ দাঁড়িযে আছে, খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি যেন কুঞ্চিত ধূম্রপুঞ্জ। সেই অস্পষ্ট, কুযাশাবৃত দিক্‌চক্রবাল সহর থেকে সুদূরে প্রসারিত।

আর আপেল ফুলের, বুনো চেরীর ও দুর্ব্বাদলের সেই অপূর্ব্ব সুরভি ..

শ্রীস্বযম্ভু চক্রবর্ত্তী

কবিতাগুচ্ছ

অব্যক্ত

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু
যে-কথা আমি বলিনি আর কারে।
সেদিন বনে মাধবী-শাখা নীচু
ফুলের ভারে ভারে।
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
বিরহব্যথা-বৃন্ত হতে ভাঙা,
গোপন রাতে উঠেছে তারা দুলি'
সুরের রঙে রাঙা।
শিরীষবন নতুন পাতা-ছাওয়া
মর্ম্মরিয়া কহিল, গাহো, গাহো।
মধুমালতী-গন্ধে ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে,
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
ঘাসের পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
কোথাও কিছু ছিলনা কৃপণতা,
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে
যত মনের কথা।
মনে হোলো যে নীরবে কৃপা যাচে
যা-কিছু আছে তোমার চারিদিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে
চাহিনু অনিমিখে।
সহসা মন উঠিল চমকিয়া
বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিয়া
হেরিনু মুখখানি॥

সাগরশেষে দেখেছি একদিন
মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা,
ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন
অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধ সম কাঁপিছে থর থরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
বাঁধিব মোর তরী।
তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি
নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি।
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
তোমারে নাহি বুঝি।
মুখেতে তব শ্রান্ত একি আশা,
শান্তি একি, গোপন একি প্রীতি,
বাণী-বিহীন একি ধ্যানের ভাষা
একি সুদূর স্মৃতি।
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে
স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা
রহিনু বসি লতা-বিতান-কোণে,
কহিনি কোনো কথা॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অর্কেষ্ট্রা

নিবে গেলো দীপাবলী। অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
স্তব্ধ হলো প্রেক্ষাগৃহে। অপনীত প্রচ্ছদেব তলে
বাদ্যসমবায় হতে আবস্তিলো নিঃসঙ্গ বাঁশবী
নম্র কণ্ঠে মবমী আহ্বান ; অচিবাৎ কম্র সুবে
কম্পিত বেহালা তাবে দানিলো উত্তব। মোর পাশে
সমাবিষ্ট নাগব-নাগরী দ্বিধা হলো মুহূর্ত্তেক
ছিন্নগুণ ধনুকের মতো ; গাঢ-হাস্য-মুখবিত
প্রণয়েব উৎসুক প্রলাপ থেমে গেলো আচম্বিতে।
চিত্রতনু প্রতিবেশিনীব পিঙ্গল কুন্তল হতে
নামহীন বতিপবিমল পবদেশী সঙ্গীতেব
মুগ্ধ সমর্থনে মোব চিত্তে সহসা জাগাযে দিলো
অতিক্রান্ত উৎসবেব নিবাধার সম্মোহ আবাব ॥

* * * * *

অস্তাচলে চন্দ্র দিশাহারা ;
দিগম্ববী শ্যামলী ম্রিযমাণ ;
বিদায় মাগে মলিনা শুকতাবা ;
স্বপনলীলা হযেছে অবসান।
ত্রিযামা রাতি চাহিযা বৃথা যাবে
জাগিলো ধবা বিজন ফুলশেজে,
ছিন্ন ফুল, শুষ্ক সহকাবে
উঠে কি তাবি চবণধ্বনি বেজে ?
সে আসে ওই, সে আসে ওই দূবে,
উতল বাযু অধীরে কহে কানে।
স্তম্ভসম তরুব চূড়ে চূড়ে
প্রহবী পাখী মুখব হলো গানে ॥

* * * * *

রাত্রিশেষেব দ্বিধাদুর্ব্বল আলো
উঁকি মাবে ওই খোলা জানালাব ধাবে ;
নির্ব্বাণদীপে ধূমকজ্জল কালো
মূর্ত্ত কবেছে ব্যর্থ প্রতীক্ষাবে।

বিশ্বজগৎ হিমকুয়াসায় ঘেবা,
দীর্ঘশ্বাসে বিষাযিত মোব গেহ ;
ববি শশী তাবা—সর্ব্ববল্লভেরা,
সকলে উধাও, দূবে কাছে নেই কেহ।
কে জানে কোথায় আজিকে সে পলাতকা,
সে-মায়ামৃগীবে কে ধবেছে ফাঁদ পাতি !
মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
বেদনা, শুধুই বেদনা সুচিব সাথী।
চিন্তাও আব আগুয়ান হতে নারে ;
গতাসু হতাশ ; বিলাপ চেতনাহত।
সহসা বিমুখ-বাতাসে-বন্ধ দ্বারে
কাব কবাঘাত বাজে স্বপনেব মতো !

ফুকাবিলো রণতূর্য্য ; সমস্ববে গম্ভীব দুন্দুভি
উঠিলো বাঙ্ময় হয়ে ; চমৎকৃত সুষিরে সুষিবে
ভবিলো বিপুল মন্দ্র ; তন্ত্রে তন্ত্রে হলো বিনিময
গমক মূর্চ্ছনা মীড ; লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীব আগ্রহভবে বিতবিলো দিকে দিগন্তবে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝঙ্কাব। তরুণীব বভ্রু কেশে
সঞ্চাবিলো শিহবণ বিচঞ্চল করতাল হতে ॥

*　*　*　*　*

উদযশৈল 'পবি আগত সবিতা কম্প্র-দীপ্ত-তনু বভসে,
শাপবিমোচিত সন্নত ধবণী তাবক তাপক পরশে।
উতল কমলবন গন্ধে,
মন্দ্রে মধুকব ছন্দে,
বৃক্ষ বিনতি কবি বন্দে,
সাগব উচ্ছল হবষে।
উদয়শৈল 'পবি আগত সবিতা কম্প্র-দীপ্ত-তনু রভসে।

আগত আগত উদাব সবিতা, প্রাচী রঞ্জিত বাগে ;
উত্তব-দক্ষিণ-অস্তদিগন্তে লাগে আশিস লাগে।

চিরপরিচিত গৃহশিখরে
কুহকী অথবা ঠিকরে ;
ধূলিমলিন পুরশিকড়ে
জাগে শিহরণ জাগে।
আগত আগত উদার সবিতা, প্রাচী রঞ্জিত রাগে ॥

* * * * *

ললাট তোমার দিনের আশিসে দীপ্র,
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য,
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র,
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিতহাস্য।
কুন্তলে তব শরৎসাঁঝের ঋদ্ধি,
পাকা দ্রাক্ষার মদির কান্তি অঙ্গে,
উরসে তোমার মর সাধনার সিদ্ধি,
ধরা রূপবতী, সে তোমারি অনুষঙ্গে।
কত জনমের বঞ্চনা ব্যথা মত্ত
পেয়েছে তোমার তিনটি কথায় ক্ষান্তি।
অলীক স্বপন—তুমিই নিপট সত্য ;
চলচঞ্চলা—তুমিই পরম শান্তি ॥

নীরব সকল যন্ত্র। ক্লান্তিহীন বেহালা কেবল
ফিরিলো সপ্তকরথে সমধর্ম্মী সুহৃদ্‌সন্ধানে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। টুটিলো হঠাৎ সনির্ব্বন্ধ
অনুনয়ে তার সরমের সঙ্কোচন নির্ব্বচন
পিয়ানোর বুকে ; সঞ্চালিত কড়ি ও কোমলে দ্রব
সুর উদ্বেল উচ্ছল হলো ; অতিমর্ত্ত্য অনুনাদে
ভ'রে গেলো সঙ্গীতের শূন্য অবকাশ। মোর পাশে
মৌন বিদেশিনী অহৈতুক সোহাগের আকস্মিক
গূঢ় প্রবর্ত্তনে স্থাপিলো অধীর পাণি দয়িতের
চমৎকৃত ভুজে, চিত্রল নখের মূলে শশীকলা
করি বিকিরণ। পরশিলো আমারে উত্তরী তার

* * * * *

দখিন-বায়ু আসি নির্ঝরিণীকানে
ভনিলো কোন কথা, তা শুধু সেই জানে !
সহসা সে-সুমনা　　হয়েছে বিবসনা ;
অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে ।
কহিলো সমীরণ কী কথা কানে কানে ?

অচল শিলাবুকে উন্মাদিনী নাচে ।
স্ফুরিত তনুলতা কে জানে কারে যাচে !
মেখলা কটিতটে　　চমকে ছায়ানটে,
রসনা জাহ্নু বটে, কবরী উড়ে পাছে ।
স্তব্ধ মেঘে যেন সৌদামিনী নাচে !

সে যেন মায়ামৃগী বিতরি কস্তুরি
পাগল বায়ুসনে খেলিছে লুকাচুরি ।
কখনো বনছায়া　　ঢাকে সে-বরকায়া ;
কভু সে-পীত মায়া আলোরি কারিকুরি ।
অপ্সরীতে প্যানে খেলে কী লুকাচুরি ॥

*　　*　　*　　*

বনবীথি ছায়া ঢাকা,
সোনাখচা পথখানি,
ফুলে অবনত শাখা
গুঞ্জরে বনবাণী ।
সে-বিজন ছায়াপথে
ছুটি বিহ্বল প্রাণে ;
বুঝিনা যে কোনোমতে
লুকায়েছো কোনখানে ।
ধ্বনে তব হাসি ধ্বনে
কাছে আবডালে কোথা !
তব কঙ্কণ ভনে
অদূরে আবছা কথা ।
হে তপতী, তোমা চুমি
বায়ু আজ হিমজয়ী !
দিবেনা কি ধরা তুমি,
ওগো কৌতুকময়ী ?

ক্ষণপরে দাও ধরা।
তুলি লাইলাক্‌রাশি,
হাসিতে উন্মুখবা
দাঁড়াও যে পাশে আসি।
অবশেষে ছল ভুলি
মুখে চাও অকাবণে।
ফেলে এসো ফুলগুলি
কবে কোথা অযতনে?
সহসা না-জানি কেন
ধৈৰজ ভেঙে পড়ে,
গাঢ় চুম্বনে যেন
মাতোযাবা করো মোবে!
তার পরে শ্লথ বেশে
সরম ভরম টুটে,
দিশাহাবা কী আবেশে
মোবে নিয়ে চলো ছুটে!
ডাকে বন সমুখে যে,
ঘনতব হয ছাযা।
সেখানে কি ফুলশেজে
এক হবে দুটি কাযা?

আবার সকল তূরী, সমস্ত বিষাণ আবম্ভিলো
সমস্বরে কাংস্য-কোলাহল; অভ্রভেদী রুদ্রবীণা
ঝঙ্কারিলো সমুচ্চ সপ্তমে; মহিযান আর্গানেব
পবিপূর্ণ সাগবসঙ্গীতে পিয়ানোর স্নিগ্ধ কণ্ঠ
অচিরাৎ হয়ে গেলো লীন। ত্রিভুবন পবিপ্লুত
হলো তানে, তালে, সুবসমন্বয়ে; রহিলোনা কোনো
ছিদ্র, নিবৃত্তি, বিবাম। রঙ্গমঞ্চ হতে পলাতক
আলোকেব স্পন্দিত অণিমা বিচ্ছুরিলো অকস্মাৎ
পার্শ্ববর্ত্তী যুবতীব নীলাঞ্জন নযনের কোণে॥

* * * * *

অগাধ গগন হতে দ্বিপ্রহরে
আলোর সোনালি সুরা অঝোরে ঝরে।
সে-মাতনে বাহু তুলে　অটবী দোদুল দুলে,
তারি কণা ফুলে ফুলে উঠেছে ভ'রে।
ঝরে আলোকের সুরা দ্বিপ্রহরে!

অসীম নীলিমা হাসে উদার নভে,
পুলকিত শ্যামলিমা অখিল ভবে।
ছায়াতে কি প্রয়োজন?　সঙ্কোচ অশোভন
মিলনের বিবসন মহোৎসবে।
ধরণীতে শ্যামলিমা, নীলিমা নভে।

কখন হয়েছে মূক পাখীর গীতা;
অকপট সমারোহে বচন বৃথা!
শোনো মৌনের তলে　বিধাতা অবাধে চলে
আঁকিয়া অলখ হলে প্রাণের সীতা।
অকপট সমারোহে বচন বৃথা॥

*　*　*　*　*

হিরণ নদীর বিজন উপকূলে
হঠাৎ হলো পথের অবসান।
তৃণাসনে ফুল্ল তরুর মূলে
শুনছি মোরা স্রোতস্বিনীর গান।
পরপারে নাম-না-জানা গ্রাম
রৌদ্রে অসার মরীচিকার প্রায়;
পশ্চাতে মাঠ উধাও ঘনশ্যাম
লুটায় গিয়ে স্বর্গলোকের পায়।
সপ্ত সাগর পেরিয়ে চারণ-বায়ু
অচিন ভাষায় করছে কথকতা;
ঝঙ্কারে তার মুখর মোদের স্নায়ু,
জিহ্বা অবাক, নয়ন বলে কথা।

থামলো প্রলাপ হঠাৎ নদীর মুখে,
স্তব্ধ হলো হাওয়ার কোলাহল;
শুনতে পেলেম সেই নীরবের বুকে
প্রাণদেবতার অজর হোমানল।

পড়লো তোমাব ব্যাকুল বসন টুটে
বিশ্বন্তর চবণপ্রান্ত চুমি ।
ফিবলো পুলক বিক্তাকাশে ছুটে ।
কল্পলোকেব উর্ব্বশী কি তুমি ?
শূন্যে হঠাৎ লুপ্ত হলো ধরা,
ত্রিভুবনে কেবল তুমি আমি ঃ
সৃজনপ্রাতেব প্রথম যমক মোরা,
প্রলযবাতেব শেষ বনিতা স্বামী ॥

সহসা ডম্বরু, ডঙ্কা বজ্রকণ্ঠে উঠিলো হুঙ্কাবি ;
ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ ঝঞ্ঝনা ঝঙ্কাবিলো করতালে
বিপরীত সুবে ; রহি বহি নিবদ্ধ তন্ত্রেব পবে
খেলে গেলো অসঙ্গত সুবের ঝলক ; তীব্র বাঁশি
অরুন্তুদ হাহাকাবে প্রচাবিলো প্রলয়ের ক্ষতি
বিদীর্ণ কীচকসম , অর্গানেব সান্তব গর্জ্জনে
ঘোষিলো যন্ত্রণাক্ষিপ্ত বাসুকিব নাভিশ্বাস বুঝি ;
উদ্‌ভ্রান্ত পিয়ানো যেন আছাড়ি বিছাড়ি মূর্ত্তি দিলো
উচ্চণ্ড মৃত্যুবে । সে-বিক্ষুব্ধ উতবোলে কিশোবীব
উদ্দীপ্ত নয়ন নিবে গেলো আচম্বিতে, নিরুৎসুক
শ্লথ স্তব্ধ তনুলতা তাব অকস্মাৎ মোব বিক্ত
বুকে করিলো সঞ্চাব বিষাদেব উদাস বেদনা ॥

*   *   *   *   *

আজি ফাগুনবেলাব পবসাদ
যায হাবাযে অকালে বাদলে ,
ভাঙে সুখশ্রান্তির অবসাদ
ওই মত্ত মেঘেব মাদলে ।
ফুঁকে কালবৈশাখী তূর্য্য,
কাঁপে দেওদাব বট ভূর্জ্জ ;
ডুবে মধ্যদিনেব সূর্য্য
ভীমা অমাবস্যাব আদলে ।
টুটে সিদ্ধকামেব পবমাদ
আজি সহসা অকাল বাদলে ।

ঘোর　ঈশানে সঘনে গরজায়
　ওই　প্রলয়পাগল অশনি ;
ভাঙা　কুঞ্জবনের দরজায়
　নাচে　রুদ্রাণী দিগ্‌বসনী
তারি　লেলিহান অসি খরধার
লিখে　আকাশে আকাশে সংহার
যত　ত্রিকালতিষ্ঠ মূলাধার
　পাড়ে　ঝঞ্ঝা বরাহদশনী।
ধরা　আঘাতে আঘাতে মূরছায়,
　ক্রোধে　গরজে গগনে অশনি

আজ　মহেশ মেলেছে বিলোচন,
　তার　পায়ে তাণ্ডব জেগেছে ;
হলো　বিন্ধ্যের শাপ বিমোচন,
　নভে　পক্ষ প্রসারি ভেগেছে
আজ　উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের ;
যত　তৃষিত পিশাচ মড়কের,
তারা　মেতেছে গাজনে চড়কের;
　সারা　বিশ্বে ঘূর্ণি লেগেছে।
ওই　ছারখার হলো ত্রিভুবন,
　ওকি　প্রমথেশ আজ জেগেছে ॥

*　*　*　*　*

খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম, "তোমার প্রেমে
　নই কি আমি প্রথম আগন্তুক ?"
এলো হতাশ হঠাৎ তোমার চক্ষে নেমে ;
　পাণ্ডু হলো প্রণয়রক্ত মুখ ;
কাঁপলো তোমার মলিন অধর থর থর
　কথা বলার পরম প্রচেষ্টাতে,
আর বছরের শুকনো গোলাপ যেমনতর
　শিউরে ওঠে এই ফাগুনের বাতে ;
লাজে হঠাৎ ঝলসে গেলো তনুলতা।
　নগ্ন বক্ষে জড়িয়ে ব্যাকুল বাহু,
সঙ্কালি শিব, করলে জ্ঞাপন দুর্ব্বলতা।
　গর্ব্বেরে মোর গিললো ভীষণ রাহু ;

লুপ্ত হলো আধাববিন্দু বিশ্ব হতে,
নাস্তিতে খিল বইলোনাকো আর ;
ভাগ্যরবি চললো ছুটে পাতালপথে,
চতুর্দ্দিকে আদিম অন্ধকাব।
একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালেব পবে,
সামনে মরু অস্থিসমাকুল ;
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মবিলো আজকে মোবে,
অস্তমিত বিধিব আমি ভুল ॥

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ সকলি। তাব পব আববাব
মোহন মুবলী কী অপূর্ব্ব পুববীব মোহময়
সুবেব আবেশে তুলিলো বণিত কবি সীমাশূন্য
শূন্যতাব হিয়া! সাবেঙ্গীব বলবোল বিলম্বিত
তালে সমাহত পিয়ানোব মুখে সিঞ্চিলো পরম
যত্নে সঞ্জীবনী সুধা। অলক্ষ্য কিঙ্কিণী ঝঙ্কাবিলো
শান্ত সুবে বিবামে বিবামে। কান্তেব বিহ্বল স্পর্শ
ফিরে দিলো উৎসুক কম্পন যুবতীব স্তব্ধ দেহে ॥

* * * * *

সন্ধ্যাব বাগ ছিন্ন মেঘেব অন্তবে
অঙ্গাবমসি প্রেমালোকে কবে পুণ্য ;
পূর্ব্বগগনে মধুনিশা আসে মন্থবে ;
প্রতিচ্ছায়ায় বঙীন উদাস শূন্য।
পরপাবে কোথা অনামা গ্রামের কির্ম্মীবে
দেউলে ঘণ্টা ঘোষে দেবতাব ক্লিপ্তি ;
এ পাবে সুচিব ধ্রুবতাবকাব মির্ম্মিবে
স্নাত কিসলয় প্রচাবে কী পবিতৃপ্তি !
দূব দিগন্তে নিবাত ধূমেব ডম্বরে
বাজে পলাতক ঝড়েব মুবজমন্দ্র।
গত দুর্য্যোগ।—সে যেন ঊষাব অম্বরে
বিরহবাতেব দুঃস্বপনেব চন্দ্র।
অমৃতলোকেব কৌতুকে কাঁপে ক্রন্দসী ;
পবিমণ্ডলে বাহিত অলকনন্দা ;
ঝিল্লিব ডাকে মবধামে নামে উর্ব্বশী ;
তিমিরতোবণে ফুটেছে বজনীগন্ধা॥

অভয় নিশার দক্ষিণ হাতে উদ্ধত,
সপ্তপ্রদীপ ম্রিয়মাণ বাম হস্তে ,
যদিও দিনের ভাস্বর আঁখি মুদ্রিত,
মর্ত্ত্যমহিমা যায় নাই তবু অস্তে ॥

* * * * *

স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম উরুতে ,
নিবিড় নীল নয়নকোণে অশ্রুস্মৃতি অঙ্কিত ;
অতীত ব্যথা—কেবল তার ত্রিবলি তব ভুরুতে ;
হরিণীসম কম্প্র তনু অহেতু ভয়ে শঙ্কিত ।
কণ্ঠে মম জড়ায়ে আছে তোমার ভুজমালিকা ;
বচনাতীত প্রলাপ তব শ্রবণে মম গুঞ্জরে ।
কী মায়াবলে ঊর্ণাজালে বেঁধেছো, সুরবালিকা,
গহনচারী মদস্রাবী আমার স্ফীত কুঞ্জরে ?
স্পর্দ্ধা মোর পড়েছে টুটে, ভ্রান্তি মোর গিয়েছে ;
দৃপ্ত শির পঙ্কে লুটে তোমার চরণাম্বুজে ।
নিঃস্ব আমি, বিশ্ব তাই আজিকে কোল দিয়েছে ।
অরূপ প্রেমকাহিনী হলো ব্যক্ত ভাঙা গম্বুজে !
চিনেছি চির মানবী তুমি ; পাবন তব করুণা,
অযোগ্যের মুক্তিস্নানে হয়না ম্লান লাঞ্ছিত ;
প্রথম ঠাঁই পাইনি তাই তোমার প্রেমে, অরুণা,
প্রত্যাগত মাধবে আমি হয়তো তাই বাঞ্ছিত ॥

উদাত্ত বিষাণ উৎসবিলো ঊর্দ্ধগ আহ্বান ; মুগ্ধ
বেণু দীর্ঘায়িত মিনতির সুরসূত্র টানি বেঁধে
দিলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংযোগের রাখী; আবিষ্ট মূর্চ্ছনা
সহসা উদ্বেল হলো বেহালার অগম অন্তরে ;
ত্রিপথগা সুরধুনী অর্গানের শঙ্খনাদে জেগে
চরাচরে আঁকিলো মুক্তির মার্গ শ্রাবণ-প্লাবনে ।
সে-বিপুল সঙ্গীতের আড়ে প্রণয়ীর বাহুপাশ
ঘেরিলো তন্বীর তনু স্নেহ-আবেষ্টনে ; চারি চোখে
হয়ে গেলো দেওয়া নেওয়া কী বেদনা অনির্ব্বচনীয় ॥

* * * * *

স্বর্গেব মর্ত্ত্যেব সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন বাত্রে ;
মৌনেব নির্ঝব মেদুব সুবাসাব সঞ্চে গগনেব পাত্রে ;
জন্মস্মব কার প্রণব সাবিগান স্বপ্নাবেশে পিক গুঞ্জে ;
প্রাক্তন পুষ্পেব অমব অবদান স্ফূর্ত্ত গোলাপেব পুঞ্জে ;
চন্দ্রের কৌস্তুভ উবসে প্রকৃতিব, মুগ্ধ নিদ্রায় স্তব্ধ ;
মৃত্যুব মঞ্জীব নীববে শোনা যায়, শূন্যে মিশে যায় অব্দ ;
সিদ্ধিব নির্ব্বাণ প্লাবিলো মরধাম। কাজ কি অমরায় অন্য ?
সুপ্তির সন্ধান দিয়েছে ভগবান, ধন্য ধরা আজ ধন্য ॥

* * * *

পূর্ণচন্দ্র খোলা বাতায়নে পশিছে ঘবে,—
তব তনুলতা সুপ্ত কুসুমশয়নপবে।
জ্যোৎস্না তোমাব পীড়িত উবোজে
বিথাবে প্রলেপ সিত মলযজে ;
স্তিমিত অঙ্গে মন্দাবসাব বপন কবে।
নিদ্রিত সুখশ্রান্তিতে তুমি শযনপবে।

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমাব গেহে,—
আমাব অমবা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
স্খলিতবসন উরুতে তোমার
অনাদি নিশাব শান্তি উদাব ;
নবদূর্ব্বাব চিকণ পুলক ও-ববদেহে।
বিশ্বেব প্রাণ বিকচ আজিকে আমাব গেহে।

মবণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে ;
জন্মান্তব নিমেষে ফুবায় ও-চুম্বনে ;
তোমাব নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
কবে হিমায়িত শবেবে শতায়ু ;
সন্নিধি তব সৃজন-আকুতি পবাণে ভনে।
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে।

খোলা বাতায়নে চন্দ্রমা চুমে তোমাব মাথা ;
দূব নীহারিকা গুঞ্জে শ্রবণে সুপ্তিগাথা।

তব স্বপনের শমিত লহরী
দেয় মোর বুকে হিন্দোলা ভরি ;
নিবিড় আবেশে নিমীলিয়া আসে চোখের পাতা।
বিধির আশিস মুকুটিত করে যুগল মাথা॥

অকস্মাৎ স্বপ্ন গেলো টুটে। দেখিনু সবয়ে চাহি
জনশূন্য রঙ্গালয়ে নিবে গেছে সমস্ত দেউটি,
নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র, মঞ্চপরে যবনিকা ঢাকা।
অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হতে প্রেমিক প্রেমিকা চলে
গেছে অমৃতসঙ্কেতে। শান্তি—শান্তি—শান্তি চারিধারে!
কেবল অন্তর মোর দীর্ণ হয় ক্ষুব্ধ হাহাকারে॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

অপরাজিত—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায। রঞ্জন প্রকাশালয, মূল্য ২॥০ ও ২৲ টাকা।

বিভূতিবাবুর মত সৌভাগ্যশালী লেখক বাংলাদেশে কখনও জন্মিযাছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাব প্রথম পুস্তক "পথেব পাচালী" প্রকাশিত হইতে না হইতে তিনি যে খ্যাতি ও স্তুতি লাভ কবিযাছেন, তাহা বোধহয বঙ্কিমচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ বা শবৎচন্দ্রেব প্রথম বচনাব ভাগ্যে জোটে নাই। একথা আব বলা চলে না যে বাঙালী পাঠক গুণেব মর্য্যাদা কবিতে জানে না।

সাহিত্যেব ইতিহাসে দেখা যায সমসামযিক প্রতিষ্ঠাব ভিত্তি অনেক স্থলেই কতকগুলি সাময়িক কাবণেব সমাবেশ। 'পথেব পাঁচালী'ব ক্ষেত্রে তাহাব বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিযাছে বলিযা মনে হয না। কলিকাতাব নিযত-প্রবর্দ্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও একথা এখনও নির্ব্বিবাদে বলা যায়, বাংলাব সামাজিক জীবন প্রধানতঃ পল্লী-কেন্দ্রিত। এমন শিক্ষিত পবিবাব খুবই কম, দুই তিন পুরুষেব মধ্যে যাহাবা বাংলাব জমিব সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত ছিল না। এমন বাঙালী ক'জন পাওযা যায যাহাবা ছাত্রবযসে সহবে বাস কবিযাও সহুবে জীবনকে তীব্র ভাষায নিন্দাব পব পল্লীজীবনেব সহজ সবল অনাডম্ববতাব গুণগানে স্কুল বা কলেজগৃহ মুখবিত কবিযা তোলে নাই? চলন্ত বেলগাডীব জানালা দিযা কোন্ বাঙালী ছায়া-সুনিবিড শান্তিব নীড ছোট ছোট গ্রামগুলিব দিকে সতৃষ্ণনযনে তাকায না? প্রাচীন সাহিত্যেব কথা ধবিবাব প্রযোজন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রেব সমস্ত সামাজিক উপন্যাস ও ববীন্দ্রনাথেব অধিকাংশ ছোট গল্প পল্লীজীবনকে অবলম্বন কবিযাই গডিযা উঠিযাছে। ফলে এই সব ওস্তাদ শিল্পীব কবিপ্রতিভাব জ্যোতিঃতে বাংলাব পল্লীশ্রী আমাদেব কল্পনানেত্রে ধবাধামে সুখস্বর্গেব শোভায বিবাজিত ছিল।

কিন্তু চমক ভাঙিল, স্বপ্ন-জডিমা পলকে ভাগিল যেদিন শবৎচন্দ্রেব সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি রূঢ দীপেব আলোক লইযা বাংলাব পল্লীজীবনেব বাস্তব চিত্রটি উদ্ঘাটিত কবিযা দিল, তাঁহাব "পল্লী সমাজে"। সে চিত্র এমনই নিষ্করুণ অথচ এতই অবিতর্কিত যে পল্লীসম্বন্ধে আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইযা গেল; যাহা ছিল সুখেব খনি, সৌন্দর্য্যেব আকব, তাহাই হইযা উঠিল দলাদলিব আড্ডা, ম্যালেবিযাব ডিপো, সঙ্কীর্ণতাব দৃঢ দুর্গ ও পুঞ্জীভূত কলঙ্কেব বিস্তীর্ণ পসবা। সাহিত্যেও, নদীব মতো, একদিকে ভাঙন ধবিলে অন্যদিক গডিযা ওঠে। বাংলা সাহিত্যেব টান অতিমাত্রায সহবমুখী হইযা পডিল। এমন-কি যে-লেখকেব নিকট পল্লীগ্রাম শ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত, হযত যাঁহাব নিজেব বাডী শ্যামবাজাব ও মামাব বাডী বাগবাজাব হওযায পল্লীগ্রামেব সহিত চাক্ষুষ পবিচযও ঘটে নাই, তিনিও সুযোগ পাইযা পূবামাত্রায ওযাকিবহাল হইবাব জন্য পল্লীজীবনকে দুটো খোঁটা না দিযা ছাডিলেন না। তদুপবি আবাব একদল পশ্চিমানুবক্ত লেখক বাংলা সাহিত্যকে যুবোপীয সাহিত্যেব আধুনিকতাব কোঠায তুলিবাব প্রাণপণ চেষ্টায অনেকস্থলে মূলহীন ভাব ও অবাস্তব চবিত্রেব প্রবর্ত্তনে সাহিত্যক্ষেত্রে সমুদ্র-মন্থনেব কোলাহল সৃষ্টি কবিলেন, যাহা হইতে কেহ বলিলেন অমৃত উঠিতেছে, কেহ বলিলেন

গবল। এই বিপর্য্যযে আত্মহাবা হইযা পল্লীগ্রামে নাভী-বাঁধা বাঙালী পাঠকেব সাহিত্যিক শ্বাসবোধ হইবাব উপক্রম ঘটিল।

এহেন সঙ্কটে ত্রাণেব বার্ত্তা আনিলেন বিভূতিভূষণ নিশ্চিন্দিপুবেব বৃদ্ধা বালবিধবা ইন্দিব ঠাকরুণ ও তাঁহাব স্নেহেব ধন দুর্গা ও অপু-ব বাল্যজীবনেব কাহিনীব ভিতব দিযা। পল্লীমাতা আবাব যেন কথা কহিযা উঠিলেন। স্বদেশপ্রাণ বাঙালী পাঠক তাহাব একান্ত প্রিয স্বদেশী বস্তু পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। বিভূতিভূষণেব বর্ত্তমান সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা এই সুযোগেব সদ্ব্যবহাবেব ফল, সুনিপুণ বিষযনির্ব্বাচনেব পুবস্কাব।

কিন্তু "পথেব পাঁচালী"-তে বিভূতিবাবু বাংলা সাহিত্যকে স্থাযী এমন কিছু দিযাছেন যাহাব মূল্য সমসাময়িক রুচি-অরুচিব মানদণ্ড দিযা নিরূপিত হইবাব নহে। লক্ষ্য কবিলে দেখা যাইবে কিরূপ সতর্কতাব সহিত তিনি শবৎচন্দ্রেব এলেকাব পাশ কাটাইযা গিযাছেন। তাঁহাব পল্লীচিত্র শবৎচন্দ্রেব পল্লীচিত্রকে সমর্থনও কবে না, প্রতিবাদও কবে না, পাশাপাশি দাঁড়াইযা থাকে। যেখানে শবৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন পল্লী-সমাজ, বিভূতিভূষণ আঁকিযাছেন একটী পল্লী-গৃহ, তাহাও সম্পূর্ণ নহে, কাবণ সর্ব্বজযা-ইন্দিবঠাকরুণেব সংসাবে হবিহব বাযেব অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। আব ইন্দিবঠাকরুণেব শোচনীয মৃত্যুব যে করুণ চিত্র গ্রন্থকাব আঁকিযাছেন তাহা কোন প্রকৃত পল্লীগ্রামে ঘটা সম্ভব বলিযা আমাদেব ধাবণা নাই। বাংলাব পল্লীসমাজ যতই পাপদুষ্ট কলঙ্ক-জর্জ্জবিত হউক, এটুকু হিতবুদ্ধি ও ক্ষমতা তাহাব এখনও আছে যে ওরূপ অবস্থায গৃহস্থকে বাধ্য কবে অসহায মুমূর্ষুব সেবা-যত্ন কবিতে। লোকালয হইতে সামান্য দূবে গ্রামেব একপাশে ফেলিলেই কোন পল্লী-পবিবাব যে সমাজ-নিবপেক্ষ হইযা ওঠে তাহা আমাদেব সহজে বিশ্বাস হয না।

তবে একথা মনে বাখিতে হইবে, কোন প্রকৃত পল্লীব অবিকৃত চিত্রাঙ্কন বিভূতিবাবুব মূল উদ্দেশ্য নহে, তিনি চাহিযাছেন, বাংলাব বাঁশবনে-ঘেবা ঘন-শ্যামল পল্লীগ্রাম ঢুটি সদ্যজাগ্রত, গ্রহণশীল উপভোগসমর্থ শিশুচিত্তেব উপব কি ছাপ ফেলে, কোন্ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন কবে, তাহাই আঁকিযা দেখাইতে। তাঁহাব নিশ্চিন্দিপুবকে সাধাবণ পবিণতমন মানুষেব চোখ দিযা দেখিলে চলিবে না, তাহাকে দেখিতে হইবে দুর্গা-অপু-ব বিস্ময-বিমুগ্ধ চোখ দিযা। বিস্ময়বোধ কাব্যানুভূতিব উৎস ও বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধেব কবি। শিশুচিত্ত বিস্ময়বোধেব প্রথম ও প্রধান আধাব; তাই 'পথেব পাঁচালী'ব সুবৃহৎ আযতন তিনি শিশুচিত্তেব বিকাশেব ইতিহাসে ভবাইয়া তুলিযাছেন। এই দিকে তাঁহাব শক্তি অনন্যসাধাবণ, ও তাঁহাব কীর্ত্তি বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয। বিস্ময-বোধেব ফলে, বস্তু-বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁহাব চোখ নাক কান আশ্চর্য্য বকমে খোলা ও সজাগ হইযা উঠিযাছে। পল্লীগ্রামেব তুচ্ছতম গাছ-গাছালিব পাখ-পাখালিব খুঁটিনাটিও তাঁহাব লক্ষ্য এড়াইযা যায নাই। ইংবেজী সাহিত্যে দেখা যায, গাছ লতা ফুল ফল পশু পাখীদেব স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যেব সহিত সাহিত্যসেবীগণেব কি অন্তবঙ্গ সহমর্ম্মিতা ও নিগূঢ় পবিচয। তুলনায বঙ্গ-সাহিত্যে এই অভাব অতি সহজেই চোখে পড়ে। কোন দৃশ্য বর্ণনা কবিতে গিযা বাঙালী কবিবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট জ্ঞানেব অভাবে কযেকটি অতিপবিচিত নামেব পবই 'কত-কি ফুল' 'নাম-না-জানা পাখী' ইত্যাদি অস্পষ্ট কথাব আড়ালে আশ্রয লইতে বাধ্য হন। কিন্তু 'পথেব পাঁচালী'-তে এরূপ ফাঁকি কোথাযও নাই বলিলে চলে। বর্ণে গন্ধে স্বাদে শব্দে পল্লীলক্ষ্মীব ভাণ্ডাবও যেরূপ প্রচুব, বিভূতি-

বাবুব বর্ণনাও সেইরূপ সমৃদ্ধ। বহিঃপ্রকৃতিব সানুবাগ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিতে তাঁহাব আসন সুবিখ্যাত ডব্লিউ, এইচ্ হাড্‌সন্-এব শ্রেণীতে অকুণ্ঠ-অধিকাব বলে বসানো যাইতে পাবে। ইহাব অতিবিক্ত প্রশংসা ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া বোধ হয়।

বাল্যকালে পল্লীগ্রাম যত বিভিন্ন উপাযে আনন্দ দিতে পাবে, 'পথেব পাঁচালী'তে গ্রন্থকাব তাহাদেব সবিস্তাব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দব বর্ণনা কবিযাছেন। আমকুড়ানো, নোনা-পাড়া, পানফলতোলা হইতে কড়িখেলা, নৌকাবাওযা, বাবোযাবি দেখা ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে নাই। কিন্তু পল্লীশিশুব প্রধানতম সুখেব একটি উপলক্ষ সাঁতাব দেওযা। কি মনে কবিযা যে বিভূতিবাবু দুর্গা ও অপূকে ইহা হইতে বঞ্চিত কবিলেন তাহা তিনিই জানেন। ইছামতীতে না হয় কুমীবেব ভয, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুবে কি কোন পুকুব ছিল না ?

'অপবাজিত'-ব পবিচয-প্রসঙ্গে 'পথেব পাঁচালী'-ব এই পর্য্যালোচনা অপবিহার্য্য, কেননা, 'অপবাজিত' স্বতন্ত্র উপন্যাস নহে, শেষোক্ত গ্রন্থেবই সম্প্রসাবণ। 'পথেব পাঁচালী'-ব শেষভাগে দেখিতে পাওযা যায় দশ-এগাবো বৎসবেব পিতৃহীন শিশু অপূ মফঃস্বলেব কোন সহবে পাচিকা মাযেব মনিব জমিদাব বাড়ীতে থাকিযা স্কুলে যাইতেছে ও বিনাদোষে মাব খাইযা নিশ্চিন্দিপুবে ফেবাব জন্য উন্মুখ হইযা উঠিযাছে। তাহাব সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হইল বছব চব্বিশ পবে। এই চব্বিশ বৎসবেব বঙ্কিম ইতিহাস 'অপবাজিত'-ব দুইখণ্ডে প্রায ছযশত পৃষ্ঠায লিপিবদ্ধ। সে ইতিহাসেব সংক্ষিপ্তসাব অসম্ভব—কাবণ অপূ-ব ঘটনাবহুল জীবনকাহিনীটি ঠিক দশগজী মসলিন্-এব মতো নয, যাহাকে নাকি একটি আংটিব আযতনে আঁটা যাইত। মোটামুটি এটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, অপূ মাইনব পবীক্ষায বৃত্তি পাইযা হাইস্কুলে পড়িল ; প্রবেশিকা পাশ কবিযা কলিকাতাব বিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইল। দাবিদ্র্যেব সহিত লড়াই কবিয়া আই, এ, পবীক্ষা দিবাব সঙ্গে সঙ্গে মা সর্ব্বজয়াকে হাবাইল। খববেব কাগজে কাজ কবিতে কবিতে বন্ধুব মামাব বাড়ী বেড়াইতে গিযা তাহাব প্রায দোপড়া মামাতো বোন অপর্ণাকে বিবাহ কবিতে বাধ্য হইল। পবে একদিকে ক্লান্তিকব কেবাণীগিবি, অন্যদিকে শান্তিময পাবিবাবিক জীবন। পুত্রেব জন্ম দিযাই স্ত্রীব মৃত্যু, ও অপূব কলিকাতা ত্যাগ কবিযা কিছু দেশভ্রমণেব পব সুদূব মধ্যপ্রদেশে অবণ্যবাস। পাঁচ-ছয বৎসব পবে বাংলাদেশে ফিবিযা পুত্র কাজলকে নিজেব কাছে আনিযা বাখিল ও ক্রমে গল্প ও উপন্যাস লেখক হিসাবে তাহাব প্রতিপত্তি ও অর্থাগম হইতে লাগিল। এক বিদেশী বন্ধুব প্রস্তাবে সে ভাবতবর্ষেব বাহিবে পর্য্যটনেব সুবিধা পাইল, ও নিশ্চিন্দিপুবে ফিবিযা তাহাব বাল্যসঙ্গী বর্ত্তমানে নিঃসন্তান বিধবা বাণু-দিব অভিভাবকতায পুত্রকে বাখিয়া সুদূবেব পিযাসা মিটাইবাব জন্য ভাসিযা পড়িল। অপূব জীবন-কাহিনীব বর্ত্তমান পবিসমাপ্তি এই চৌত্রিশ-পঁযত্রিশ বছবেবই। বঙ্গ-সাহিত্যে তাহাব পুনরুদয দেখাব সৌভাগ্য আমাদেব ঘটিবে কিনা তাহা বিভূতিবাবুই বলিতে পাবেন।

দেখা যাইতেছে সেই একই অপূ-ব জীবনকাহিনী হইলেও 'অপবাজিত' ঠিক 'পথেব পাঁচালী'ব সমধর্ম্মী বচনা নহে। যে ক্ষুদ্র পল্লী-বিশ্বেব গণ্ডীব ভিতব অপূ-ব বাল্যজীবন কাটিযাছে, বযস বাড়াব সঙ্গে তাহাকে চিবদিন সেখানে আবদ্ধ বাখা সম্ভব হইল না। বলা যাইতে পাবে, 'পথেব পাঁচালী'ব প্রধান চবিত্রই হইযাছে নিশ্চিন্দিপুব। 'অপবাজিত'-য নিশ্চিন্দিপুব দূবে মিলাইযা গিয়াছে, চোখেব উপব হইতে মনেব আড়ালে স্থান পাইযাছে। যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, তাহা হইযা উঠিযাছে স্মৃতি। গ্রীক পুবাণে

বলে মিউজ্-রা নিমোজিনী-র কন্যা, অর্থাৎ স্মৃতিই কবিতার জননী। বিভূতিভূষণ যে কবি, ও তাঁহার কবিত্ব যে স্মৃতিমূলক, তাহার প্রভূত নিদর্শন 'অপরাজিত'-য় পাওয়া যায়। যখন-তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের কথা অপুর মনে পড়িয়া যায়, ও কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলির পরিচালনায় স্মৃতির জলতরঙ্গ টুং-টাং করিয়া বাজিয়া ওঠে। সামান্য কয়টি কথার ভাবগর্ভ প্রয়োগে বাংলার পল্লী-শোভা রূপ পরিগ্রহ করে। সুধু বাংলাদেশ কেন, প্রকৃতির অন্য দৃশ্যও যে বিভূতিভূষণের কবিত্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মধ্য-প্রদেশে বিন্ধ্যারণ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা। ভাষার লালিত্যে, ভাবের ঘনত্বে, পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় তাহার তুলনা বাংলা ভাষায় দুর্লভ।

স্মৃতির আর এক কাজ সময়ের গতিকে স্তম্ভিত করিয়া, কালপ্রবাহকে বিপরীত মুখে চালানো। প্রখর স্মৃতির সাহায্যে বর্ত্তমানের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অতীত বর্ত্তমান অপেক্ষাও সজীব হইয়া উঠে। এই স্মৃতিলীলার ফলে বিভূতিবাবুর উপন্যাসে বর্ত্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্ত্তমানে নিয়ত যাতায়াত চলে। হঠাৎ প্রুস্ত্-এর "হারানো কালের অনুধাবনের" কথা মনে পড়িয়া যায়। পরক্ষণেই ধরা পড়ে এ তুলনা কপট তুলনা। কথাশিল্পে কাল-বোধের প্রয়োগে বিভূতিবাবু সনাতনপন্থী, অপুর জীবনকাহিনীতে সময়ের ক্রম সহজেই অনুসরণ করা যায়, ঘটনার পারম্পর্য্যের শৃঙ্খল অটুট থাকে বলিয়া। প্রুস্ত্ একেবারে বিপ্লবপন্থী। তাঁহার কালক্রম বৈজ্ঞানিকের ক্রনোমিটারে ধরা পড়িবার নয়। তাহা একেবারে স্বসিদ্ধ, স্বেতর কোন শাসনের বশীভূত নয়।

Le temps proustien a une élasticité, une relativité qui échappe à toute mensuration du dehors Chacun aura pu constater que Proust ne donne jamais de dates ni indications précises d'époques Nons ne comptons pas dans son roman par mois et années mais d'après le changement des saisons de l'âme Elles ne permettent ancune analyse chronologique Le temps s'écoule suivant une courbe si irrégulière qui'elle échappe au calcul Un changement de l'atmosphère suffit a recréer le monde et nous-mêmes Le temps et l'espace sont de simples modes du souvenir et réaction mutuelle

[প্রুস্ত্-বর্ণিত কাল স্থিতিস্থাপকশীল, তাহার আপেক্ষিকতা বহির্বর্ত্তী মানদণ্ডের অতীত। এ-কথায় সকলেই সায় দিবেন যে প্রুস্তের মধ্যে তারিখ বা যুগ-সম্বন্ধে কখনো কোন সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ থাকেনা। তাঁহার উপন্যাসে কালগণনা মাস বা বৎসরের অনুপাতে হয়না, হয় কেবল আত্মার ঋতুপরিবর্ত্তন অনুসারে। কালের সেই বঙ্কিম প্রবাহ এতই অনিয়ন্ত্রিত যে তাহাকে অঙ্কে বাঁধা অসাধ্য। সেখানে পরিবেষ্টনের সামান্য বিকারই বিশ্বসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেই বিবর্ত্তনেই পাঠক সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, সেখানে দেশ ও কাল স্মরণের উপকরণ মাত্র, আসলে উহাদের পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতই অভীষ্ট বস্তু।]

কিন্তু মানবমনের কারবার ত সুধু বস্তু-বিশ্বকে লইয়া নহে. বুদ্ধির জন্য, তৃপ্তির জন্য, আনন্দের জন্য তাহাকে মানবজগতেও চলাফেরা করিতে হয়। মানবজগতের বৈচিত্র্যের অবধি নাই, মানুষের সংস্পর্শে আমাদের অন্তর-লোক যে-বিকাশ লাভ করে তাহার রহস্যের আদি অন্ত নাই। বিভূতিবাবু তাঁহার রচনায় এই মানবজগতকেও প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গতির পথে অগ্রসর হইতে গিয়া অপু যে কত বিভিন্ন ধরণের নরনারীর জীবন-বৃত্তকে ছেদ করিয়া গেল, বিভূতিবাবু সযত্নে তাহাদের

ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখিতে চাহিয়াছেন—মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন মতামতের পরকলার ভিতর দিয়া নহে। অনেক তুচ্ছ ঘটনা ও অবহেলিত প্রাণী তাই তাঁহার অনুকম্পালাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার চিত্রপট বিস্তৃতপরিসর ও চিত্রশালিকা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। তবুও মনে হয়, মানবচরিত্র অঙ্কনে তাঁহার দৃষ্টি অগভীর, অভিজ্ঞতা স্বল্প, শক্তি ক্ষীণ, ও সাফল্য সঙ্কীর্ণসীমাবদ্ধ। ইহার কারণ, প্রাকৃতিক জগতে সামান্য তৃণগুচ্ছ হইতে বিরাট নীহারিকাপুঞ্জ ও নাক্ষত্রিক আকাশের নিকট তিনি নিজেকে যেমন ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন, মানবজগতে তাহা পারেন নাই।

Le sujet du romancier, la vision du poète se présetent à leurs esprits tyranniquement, et comme du dehors. L'artiste ne choisit pas sa matière, il est choisi par elle Il est contraint de l'exprimer, et de l'exprimer dans toute sa pureté et son intégrité Pour l'artiste, comme pour le penseur et pour le savant, le plus haut devoir est de se soumettre à la realité qu'il a contemplée Comme toute connaissance, l'activité de l'artiste consist à reproduire ûne réalité objective L'artiste n'invente pas, il découvre. L'art n'est pas une invention, mais une exploration [ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু, কবির স্বপ্ন বহির্জগৎ হইতে অন্তরে প্রবেশ করে যেন অত্যাচারীর মতো। প্রসঙ্গ-নির্ব্বাচনে শিল্পীর কোন হাত নাই, প্রসঙ্গই তাহাকে মনোনীত করিয়া লয়। তখন প্রকাশ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর তো থাকেই না, উপরন্তু ব্যঞ্জনাকে অকৃত্রিম ও অবিকল করিতেও সে বাধ্য হয়। ভাবুক ও বিদ্বজ্জনের মতো ধ্যেয় সত্যের নিকটে আত্মসমর্পন করাই শিল্পীর পরম কর্ত্তব্য। যেমন বহিরঙ্গ বস্তুর প্রত্যুৎপাদনই জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র লক্ষ্য, রূপকারের সাধনাও তদনুরূপ। সে উদ্ভাবক নহে, আবিষ্কারক, কপোলকল্পনা তাহার ব্রত নহে, তাহার ব্রত কেবল জিজ্ঞাসা।]

মানবজীবন-সম্বন্ধে এই exploration-এর, অনুসন্ধানের আভাস বিভূতিবাবুর রচনায় পাওয়া যায় না। আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, সাদামাটা মামুলি স্তরের। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলি ধরণে ভাল, না হয় মামুলি ধরণে মন্দ, না হয় মামুলি ধরণেই প্রাণহীন জড় পদার্থ—এতই মামুলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সম্বন্ধে আরো জানিতে কোন কৌতূহল হয় না। তিনি নিজে লিখিয়াছেন বটে সকল বড় সাহিত্যের মূলে আছে মানব-বেদনা, কিন্তু বোধহয় উপলব্ধি করেন নাই যে বেদনার অনন্তরূপ, সুধু দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষই তো তাহার একমাত্র প্রকাশ নয়। দারিদ্র্যের সহিত অপূ-র বিরোধও অত্যন্ত মামুলি ধরণের—কখনও খাইয়া কখনও না খাইয়া, কখনও চাকরি করিয়া কখনও না করিয়া অপূ দারিদ্র্যকে বহিয়া চলিয়াছে মাত্র। একটা সহজ জীবনানন্দ ও রোমান্স-প্রিয়তার দোহাই দিয়া গ্রন্থকার অপূ-কে সর্ব্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব—প্রলোভন, প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব, আদর্শবিভ্রাট ইত্যাদি হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। অথচ এই সব অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারাই বালক মানুষ হইয়া ওঠে, মানুষ অতি-মানুষ হইবার আশা রাখে। জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত? তাহার সারা জীবনই ত অপরিণত। এই অতিকায় উপন্যাসখানির কোথায়ও জীবনের কোন জটিলতার সম্মুখীন হইবার প্রয়াস দেখা যায় না। ইহারই মধ্যে সবচেয়ে জটিল চরিত্র "লীলা"; সেও অত্যন্ত

মামুলিভাবে জটিল। বড়ঘরের রূপসী বিদুষী তরুণী এক বিলাতফেরৎ বদ্‌-মেজাজ চরিত্রহীন বড়লোক স্বামীর অত্যাচারে কুলত্যাগ করিয়া অন্য এক তরুণ ব্যারিষ্টারের হাতে গিয়া পড়িল যে তাহার সঞ্চিত অর্থ নির্ব্বিকারে ফাঁকি দিয়া ফুঁকিয়া দিল। পরে সে থাইসিস্‌-এ আক্রান্ত হইয়া একদিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া বসিল—এ-কাহিনী কি সর্ব্বজন পরিচিত নহে ? অপূ-র সহিত লীলা-র স্বল্পব্যক্ত প্রণয়-সম্বন্ধের প্রকৃতি এমনই অবাস্তব, ভিত্তি এতই শিথিল যে তাহার গভীরত্বে বিশ্বাস করা রমণীমন-অনভিজ্ঞ অপরিণত বয়সের বাহিরে সম্ভব বলিয়া বোধহয় না। গভীরতার ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্ব্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া এই বিমুখীনতার তথ্যবহুল বিবরণ পড়া ক্লান্তিদায়ক হইয়া উঠে। ছদ্মবেশী আত্মচরিতের বিপদই বোধ হয় এই যে যে-ছোটো ঘটনা গ্রন্থকারের নিকট দ্যোতনাপূর্ণ, তাহা পাঠকসাধারণের নিকট ব্যর্থ হইতে পারে, এ-চেতনা সহজেই লোপ পায়। খুঁটিনাটির বিবরণেও মাঝে মাঝে ত্রুটি ঘটিয়াছে। ইতুপূজা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-মাসে না হইয়া পৌষ-মাসের পিছনে চলিয়া গিয়াছে, সরস্বতী পূজা কোনকালেই মাঘমাসের কয়েক মাস পরে হইতে পারে না; পূজার ছুটির ঠিক পূর্ব্বেই কলিকাতায় হকি খেলিবার সীজ্‌ন্ নয়; ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নলজির ঠিকানা বোধহয় কেম্‌ব্রিজে নয়, লণ্ডনে। কিন্তু ক্লান্তি না আসার আসল কারণ বিভূতিবাবুর ভাষা। মাঝে মাঝে শব্দবিন্যাস-বিপর্য্যয় আছে। তথাপি তাহা স্বচ্ছ ও অনায়াস। মনে পড়ে মিড্‌ল্টন্ মারি-র উক্তি—Try to be precise and you are bound to be metaphorical। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনীতে বিভূতিবাবু যে সুপঠিত তাহার অনেক ইঙ্গিত যেখানে সেখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু কোথায়ও অবান্তর কোটেশন বা এলিউশন-এর সাহায্যে বিদ্যা জাহির করিবার সহজ পন্থায় পাঠকের চমক উৎপাদন করিবার চেষ্টা নাই। তাঁহার পরিশীলন মেঘান্তরিত সূর্য্যরশ্মির মতো সহনক্ষম দীপ্তিতে তাঁহার রচনাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। রচনায় এই দুর্ল্লভ প্রসাদগুণ ও কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় উপন্যাসকার হিসাবে, মানবচরিত্রের বিবৃতিকার হিসাবে বিভূতিভূষণ বড় বই লিখিলেও বড় লেখক নহেন। কারণ Le grand écrivain est celui qui a la vision de nouveaux aspects de la rélatité, vision si impérieuse et exigeante qu'elle les remplit pour lui de quelque chose d'éternel Son œuvre est une fenêtre qui nous donne vue sur une nouvelle perspective,, c'est une échappée sur une paysage jusqu'alors inconnue [বড় লেখক তিনিই যাঁহার চোখে বস্তুবিশ্বের নবতর বিভাস প্রতিভাত হয়। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির এমনি অনিবার্য্য মহিমা যে তিনি এই বিভাসেই চিরন্তনের পরিপূর্ণতার সন্ধান পান। বাতায়নের মতো তাঁহার সৃষ্টি আমাদের সামনে নূতন পরিপ্রেক্ষিত আনিয়া দেয়: অদ্যাবধি-অজানা জগতে নিষ্ক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।]

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়-

On Forsyte 'Change—JOHN GALSWORTHY, (Heinemann).
A Maid in Waiting—JOHN GALSWORTHY, (Heinemann)

"পবিচযেব" সম্পাদক তথা পাঠকপাঠিকাব কাছে একটু ভূমিকাব অবতাবণা ক'বে উপবি-লিখিত বইদুখানিব সমালোচনা কবব। ভূমিকাটিব যে প্রয়োজন আছে আশা কবি স্বীকৃত হবে।

সমস্যাটি এই, সমালোচনাব কোনো স্থাযী সার্থকতা আছে কি না। পবে এ নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখাব ইচ্ছা আছে, তাতে দেখাবাব চেষ্টা পাব যে, এ-সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ কবাব যথেষ্ট ও গুরুতব কাবণ আছে। এখানে কযেকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিই। শেলি বাইবণেব "ডনজুয়ান" প'ড়ে তাঁকে প্রায় মহাকবি ব'লে সোচ্ছ্বাস-দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। বিচার্ডসনেব তৃতীয় শ্রেণীব উপন্যাস "পামেলা" প'ড়ে গেটেব মতন গভীবদর্শী কবি ও সমালোচকও মুগ্ধ হ'যে বলেছিলেন, অপূর্ব্ব বই। রুসোব উপন্যাস "এমিল" ফ্রান্সেব সুধীবৃন্দ পড়তে পডতে প্রায় কেঁদে ভাসিযে দিতেন বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। উলটো দিকে ঠিকে-ভুলও আছে। বাস্কিনেব মতন সমালোচকও হুইস্‌লাবেব মতন চিত্রীব ছবিকে কশাঘাত কবেছিলেন। টলষ্টযেব মতন স্রষ্টা মনস্বীও শেক্সপীযবেব নাটককে বলেছিলেন চতুর্থ শ্রেণীব। বঙ্কিমচন্দ্র বমেশচন্দ্রেব উপন্যাসে প্রতিভাব লক্ষণ দেখেছিলেন ও তাঁকে পুনঃপুনঃ উৎসাহ দিতেন উপন্যাস লিখ্‌তে। বাংলাব মনস্বীবৃন্দ এক সময়ে নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রকে অম্লানবদনে "কবি" আখ্যা দিয়েছিলেন, (এখনো কেউ কেউ দেন)। তীক্ষ্ণধী লিটন ষ্ট্রেচি মহাশব তাঁব Books and Characters-এ আবও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিযেছেন: যথা, ব্লেককে এক সমযে বলা হ'ত পাগল, আজ বলা হয় প্রফেট,—দুদিন বাদে হযত ফেব বলা হবে উচ্ছ্বাসী-ভাববিলাসী; ভলটেয়াবেব নাটক প'ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র যুবোপে সাড়া প'ডে গিযেছিল—অথচ শেক্সপীয়বেব নাটকেব জন্যে একটি ঢেউও ওঠে নি: বাসিনকে শ্যেনদৃষ্টি ইংবাজ ক্রিটিকবা (যেমন বেলি) বলেন দুঃসহ, অথচ সুকুমাব ফবাসীবা (যেমন ভালেবি, লমেত্র্‌) বলেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দব ইত্যাদি। ষ্ট্রেচি বাসিন সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত—কিন্তু ইংবাজ জাতি বাসিনকে এখনো মেনে নেন নি। ওদিকে কন্টিনেণ্টে আজও শেলিব চেয়ে বাইবনেব বেশি আদব, গলস্‌ওয়ার্দ্দিব চেয়ে বার্ণার্ড শ'ব।

এসব দেখে শুনে মনে হয না কি যে, সমালোচনা জিনিষটি পণ্ডশ্রম? মনে প্রশ্ন উদয় হয় না কি—জ্ঞানেব সঙ্গে মানুষে মানুষে ঐক্যই জাগে, না অনৈক্য?

অন্ততঃ অনেকেব হয়—এ নিশ্চয। যাঁদেব হয় না—যাঁবা "চিবন্তন, বিশ্বজনীন, সত্য"—প্রভৃতি কযেকটি কথাব উপবে একান্ত আস্থা ও অনন্ত নির্ভবেব বোঝা চাপিয়ে নিজেদেবকে হাল্‌কা মনে কবতে পাবেন তাঁবা সৌভাগ্যবান্‌। কিন্তু যাঁবা (ষ্ট্রেচি, আলডুস হাক্‌সলি প্রভৃতিব মতন) তা না পাবেন? যাঁবা বাস্তব জীবনে এসব 'ডগ্‌মা'-ব স্বপক্ষে প্রবর্দ্ধমান ও অবিসংবাদিত সাক্ষ্য চান—তাঁবা বোধ হয় একটু ভডকে না গিয়েই পাবেন না। সশঙ্কে স্বীকাব কবছি আমি এই ভডকে-যাওযা দলেব। সলজ্জে স্বীকাব কবছি জীবনে approximations towards truth খোঁজাকে আমি কাম্য মনে কবি। সদুঃখে স্বীকাব কবছি "ভিন্নরুচির্হি"—কথায় আমাব মন সান্ত্বনা পায না—যদি দেখি হৃদয়েব সৌন্দর্য্যবোধ, সূক্ষ্মদৃষ্টি, আনন্দানুভূতি প্রভৃতি সুকুমাব বৃত্তিগুলিব বিকাশেব সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদবোধই বাডে—সত্যদৃষ্টিব মিল কমে।

অথচ অকরুণ বাস্তব হৃদয়ের এই মিলনের কামনাকে, দরদের তৃষ্ণাকে তো দেখি পদে পদেই দলিত বিধ্বস্ত ক'রে চ'লে যায়। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন এখানকার একটি পার্শী সাধক কবিকে (নাম সি ডি শেঠ্না বা অমল কিরণ) লেখেন: "If you send your poems to five different poets, you are likely to get five absolutely disparate and discordant estimates of them."* কথাটা যে সত্য—তা বার বার দেখেছি,—শুধু গত যুগের ইতিহাসেই নয়, আধুনিক নানা কবি সম্বন্ধে নানা মনীষীর রায়েও বটে। কিন্তু দেখে গোলই বেড়েছে, কিছুই পরিষ্কার হয় নি। চিন্তাশীল মনস্বী আলডুসও এতে বিমর্ষই হ'য়ে লিখেছেন যে হায় রে—"The machinery for creating values universal" হ'লে হবে কি—যখন "the values must be manufactured ?" এ থেকে কোনো সাধারণ ব্যাপক দার্শনিক সিদ্ধান্তে তিনি (বা ষ্ট্রেচি) পৌছতে পারেন নি, শুধু এই হতাশ সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে "The process has not yet been rationalized ; value-making is still a village industry"। স্বতঃই নিরাশ সত্যসন্ধানী হৃদয় প্রশ্ন ক'রে বসে: "ততঃ কিম্?" কোনো দিশা কি কেউ পাবেই না কোনোদিন?—মানুষ চিরদিন রসবোধের ক্ষেত্রে থেকে যাবে স্বৈরাচারী, ভেদপন্থী? একজনের আকাশ আর একজনের কাছে আকাশকুসুমই থেকে যাবে—চিরদিন? এই কি সমালোচনার শেষ কথা?

জানি না। ইতিহাসে কোনো orientation বা দিক্-নির্ণয়ের প্রমাণও পাই না। সুতরাং কী করা? না, রসবিচারে একান্ত ক'রে ব্যক্তিগত মতামতের দায়িত্ব নিয়েই রায় দেওয়া—যদি রায় প্রকাশ্যে দিতেই হয়।—এই ব'লে সমালোচনা করা যে অমুক অমুক জিনিষ "আমার" ভালো লাগে, অমুক অমুক জিনিষ "আমার" ভালো লাগে না। আর কেন ভালো লাগে বা লাগে না সে-বিষয়েও কারণ দর্শানোর সময়ে একটুখানি চেতনা রাখা ভালো যে এসব কারণ বা যুক্তি শুধু সমপ্রকৃতি, সমরুচি দু'চারজনের কাছেই দরদ পেতে পারে—অন্যের কাছে নৈব নৈব চ। সাধে কি ভবভূতি "বিপুলা পৃথ্বী" ও সমানধর্ম্মা-র কাছে প্রসাদ যাচ্ঞা করেছিলেন? বস্তুতঃ রসবিচারে বোধহয় একমাত্র সান্ত্বনাই এই, কতিপয়ের সাড়া—কতিপয় সমমর্মীর প্রীতি।

"মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা,
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।"

তাই শুধু এই রকম দু'চারজন সমদরদীর জন্যেই গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির এ-দুটি বইয়ের একটু "পরিচয়" দেব। "সমালোচনা" কথাটি ব্যবহার না ক'রে "পরিচয়" কথাটি ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার করলাম, কারণ objective criticism ব'লে যদি কোনো বস্তু না-ই থাকে তবে তাকে সমালোচনা বলা হবে অসঙ্গত। আমি শুধু বই দু'খানি প'ড়ে আমার subjective তথা personal reaction সম্বন্ধে দু-একটি কথা লিখ্‌ব। এর বেশি দাবী আমার নেই।

*শেঠ্নার কবিতা নিন্দা করেন আমার এক অভিজ্ঞ পণ্ডিত ভারতীয় বন্ধু;—আমি বিখ্যাত কবি A E-কে শেঠ্নার চারটিমাত্র কবিতা পাঠাই, তাতে A E সুখী হ'যে শেঠ্নার কবিতার খুব সুখ্যাতি ক'রে আমার নিকট একটি চিঠি লেখেন।

ইংলণ্ডে একদল লোক আছেন, যেমন ফর্ষ্টার, যাঁরা ডি এইচ লরেন্সকে বলেন আধুনিক ইংলণ্ডের greatest imaginative novelist, আর একদল আছেন, যেমন স্যাঙ্কি বা জুলিয়ান হাক্স্লি, যাঁরা এইচ জি ওয়েল্স্‌কে এ পদ দেন; আর একদল—জন গল্স্‌ওয়র্দ্দিকে। আমি এই শেষ দলের লোক। এবং যাঁরা মনে করেন যে গল্স্‌ওয়র্দ্দির সব চেয়ে বড় বই হচ্ছে তাঁর "ফরসাইট সাগা"—তাঁদের রুচি ও উৎসাহের সঙ্গে আমার মেলে। "অন ফরসাইট চেঞ্জ" বইটি "সাগা"-র সর্ব্বশেষ পুস্তক, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত।

মনে আছে ১৯২৭ সালে ইংলণ্ডে যখন "সাগা" প্রথম পড়ি তখন আমার একটি স্কচ চিত্রী বান্ধবী বলেছিলেন যে এ বইখানির প্রতি চরিত্র যেন চোখের ওপর ভাস্‌তে থাকে—এদের যেন পথে ঘাটে দেখা মেলে। আর একটি ইংরাজ ব্যাঙ্কার চিন্তাশীল বন্ধু আমাকে বল্‌তেন যে অনেক চিন্তাশীল ইংরাজই সানন্দে স্বীকার করেন যে "সাগা"-য় এ-যুগের ইংরাজ জাতি তার সুসম্পূর্ণ রূপ নিয়ে যেরকম সুসমঞ্জসভাবে ফুটে উঠেছে—"convincingly,"—সেরকম ছবি অন্য কোনো আধুনিক ইংরাজ লেখকের লেখায়ই ফোটেনি। এ দলের লোকের মতেও আমি পূর্ণভাবে সায় দিই। "সাগা"র নানা চরিত্রই ইংলণ্ডে চোখে পড়ে। বিশেষ ক'রে "সাগা" পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ'তে হয় তার নিপুণ চরিত্র-চিত্রণে। তাছাড়া আরও অনেক গুণে এ বইটি দীপ্তিমান্‌ঃ সুবৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে, দৃষ্টির ব্যাপকতায়, অনুভবের পেলবতায়, ভাষার প্রাঞ্জল সৌন্দর্য্যে ও সর্ব্বোপরি পরিপূর্ণ সত্যতায়, সুষমায়। শুধু একটি বনস্পতি ফুটিয়ে তোলা নয়,—তার প্রতি পাতাটির দিকে শিল্পীর সজাগ দরদ, নিবিড় স্নেহ।

"সাগা"-র খণ্ড-পর্য্যায় বোধ হয় এইঃ The Man of Property, In Chancery, To Let, The White Monkey; The Silver Spoon ও শেষ খণ্ড The Swan Song।

কিন্তু শেষেরও শেষ আছে—অথচ সে শেষও নয়। এই রকম একটি—সংজ্ঞা দেওয়া যায় না এমন বই হচ্ছে "অন ফরসাইট চেঞ্জ"। এর ভূমিকায় এর আকস্মিক জন্মলাভের ইতিবৃত্তান্তে গল্স্‌ওয়র্দ্দি বল্‌ছেনঃ "Before a long-suffering public I lay this volume of apocryphal Forsyte tales, pleading two excuses. That it is hard to part suddenly and finally from those with whom one has lived so long; and that these footnotes do really, I think, help to fill in and round out the chronicles of the Forsyte family"।

যাঁরা এ-কথায় সাড়া দেন তাঁদের মধ্যে আমি একজন। আমরা বলি—"বিদায় নেওয়ার দরকার কি করি? যার সাথে মিলন এত সুন্দর তাকে বিদায় দেবার এত তাড়াই বা কেন?" বাস্তবিক গল্স্‌ওয়র্দ্দির "সাগা"-কে বিদায় দিতে আমাদের মন যে কত অনিচ্ছুক তা যেন তাঁর এ অপ্রত্যাশিত বইখানি পড়বার সময়ে নতুন ক'রেই উপলব্ধি করলাম। মনে আছে ঠিক্ একথা মনে হ'ত শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত তৃতীয় খণ্ড হঠাৎ পেয়ে।—তিনখণ্ড প'ড়ে মনে হ'ত আরও তিনখণ্ড হ'লে ক্ষতি কী ছিল? মনে হ'ত "জন ক্রিস্‌টফার" পড়ার সময়ঃ—দশখণ্ড প'ড়ে মনে হ'ত আরও দশখণ্ড হ'লে তবেই বুঝি মনটা খুসিতে ভরত। মনে হ'ত ডষ্টয়েভস্কির "ব্রাদার্স কারামাজফ" পড়বার

সময়ঃ—হাজার পাতা পড়া শেষ হ'লে প্রাণ চাইত আরো হাজার পাতা কেন লেখা হ'ল না? অবশ্য একদল লোক আছেন জানি—যাঁরা উপন্যাসে চান শুধু চিত্তবিনোদন, যাঁরা তারস্বরে বলেন "সময় যে নাই—ছোট করো কবি, গল্প এমন ছোটই করো যাতে ট্রেণে ট্রামে ব্যস্ত ভাবে প'ড়ে ক্লান্ত শরীরে চোখ বুলিয়ে গিয়েও রস পাওয়া চলে—সমাজের একটা bird's-eye-view পাওয়া চলে।" তাঁদের সঙ্গে একটুও বিবাদ নেই আমাদের। কেবল ব'লে রাখা যে অন্ততঃ আমরা দীর্ঘ-উপন্যাসের যুগ গত ব'লে মনে করি না। আমরা এ ব্যস্ততাধূমল যুগেও গল্‌স্‌ওয়র্দির চিরসবুজ "সাগা"-কে মনেপ্রাণে অভিনন্দন করি—ও তাঁর "সাগা"-র এ নব-পরিশিষ্ট পেলে "long-suffering public"-এর দুঃখের দরদী হ'তে একদম চাই না। আমরা চাই কৃতজ্ঞ হ'তে "অন ফরসাইট চেঞ্জের" মধ্যে বহু পুরোনো আলাপীর হঠাৎ দেখা পেয়ে। আমরা চাই সেই যুগের নানা সুকুমার সৌরভ গল্‌স্‌ওয়র্দির লেখায় পেতে যে-যুগ অস্তমিত হয়-হয়। এবং সর্ব্বোপরি আমরা চাই তার পরিচয় পেতে যা এ-যুগের লেখকদের মধ্যে খুব কমই পাই—"লেখার-পিছনকার-মানুষটি"-র (এমার্সনের কথা "Talent alone does not make a writer, there must be a man behind the book")। বর্ত্তমান যুগের একটা অবিসংবাদিত প্রবণতা বোধহয় এই যে, পুস্তকের সংখ্যা যতই বাড়ছে লেখকের সংখ্যা ততই কমছে। ইংলণ্ডে গল্‌স্‌ওয়র্দি, লরেন্স, আলডুস, ওয়েল্‌স্‌ প্রমুখ জনকয়েক শিল্পীর সম্বন্ধেই কেবল জোর ক'রে বল্‌তে পারি there is a man behind the book। "অন ফরসাইট চেঞ্জ" পড়তে পড়তে কি জানি কেন বার বার মনে হচ্ছিল যে এই mass-production-এর যুগে, state-worship-এর যুগে, standardization-এর যুগে এরকম লেখককে বোধ হয় অঙ্কুরেই নিষ্পিষ্ট ক'রে মারা হবে—বই-ই বেরুবে, মানুষ যাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। এজন্যেও বইখানি ভালো লেগে থাক্‌বে। একটা বই তো একটা কারণে ভালো লাগে না, লাগে অনেক কারণে।

এ-বইখানির আর একটি মহৎ গুণ—এর একান্ত অভিনবত্ব।—মানে, বইটির কোনো নাম দেওয়া কঠিন, এই গুণটি। এইজন্যেই বোধ হয় গ্রন্থকার এর নাম দিয়েছেন—পাদটীকা—"footnotes"; সত্যিই এ অনামী। অন্ততঃ কোনো উপন্যাসের এরকম পাদটীকা তো আমার চোখে পড়েনি। এর অধ্যায়গুলির মধ্যে না আছে unity, না selectiveness, না গল্পের কোনো চল্‌তি কোড মানার নিদর্শন। আছে কেবল এক অপূর্ব্ব রস।

অথচ এ-ও আমি জানি যে একদল লোক ঠিক এই জন্যেই এতে রস পাবেন না। তাঁরা বল্‌বেন গল্পের মধ্যে যদি গল্পত্বই না রইল, ঐক্যই না রইল, নির্ব্বাচনের নীতির মর্য্যাদাই না রক্ষিত হ'ল তবে আর্টের যে ভরাডুবি হবেই। এ-রকম স্থলে তর্ক নিষ্ফল। যেহেতু স্বয়ম্বরার মতন রসবিচারেও অজ্ঞাতকুলশীলকে যদি রুচিদেবীর মনে না ধর্‌ল তবে তার ওপর আর না চলে আপীল, না কাকুতিমিনতি।

তাই আমরা সে-চেষ্টা কর্‌ব না। আমরা শুধু বল্‌ব যে আমরা সেই দলের লোকের সমরুচি (যেমন ওয়েল্‌স্‌, লরেন্স, আলডুস) যাঁরা এসব বিধান মানেন না; সেই সব লোকের সমপ্রত্যয়ী যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে উপন্যাসের টেকনিক আজ একরকম হ'লে কাল সম্পূর্ণ উল্‌টো রকম হ'তে পাবে না; সেই সব লোকের সমমনা যাঁরা মনে করেন-না যে গল্পের রসপ্রবাহের কোনো চিরন্তন ধারা আছে।

এবং এই রকম যাঁদের রুচি তাঁদের মন "সাগা"-র টেকনিকের নিত্য নব পরিবর্ত্তনে ব্যাহত হবে না। তাঁরা তেম্‌নি ক'রেই "সাগা"কে অভিনন্দন করবেন যেমন ক'রে করেন একটি সুন্দর গভীর নদীকে। তার স্রোত এঁকা বেঁকা, সরল জটিল, নানা সময়ে নানা খাতেই বয়। বইবেই তো। সে যে জীবন্ত—কোনো অনড় প্রিন্সিপ্‌লের নিষেধ-তটকে মেনে চল্‌বে কেন? ইচ্ছে হ'লেই কূল ছাপিয়ে যায়—না মানে unity, না মানে selectiveness, না মানে action। "অন ফরসাইট চেঞ্জ" প'ড়ে মুগ্ধ হবার সময় একথা বারবারই মনে হয়। মনে হয় এ যেন একটা মহাভারতের পরে "প্রক্ষিপ্ত" রচনা। তফাৎ এই যে "প্রক্ষিপ্ত" অপরে রচে, এ সব পাদটীকা রচেছেন গ্রন্থকার নিজে।

এ বইখানি পড়ার সময়ে মনকে খানিকটা এভাবে উদার, মুক্ত ও নির্ব্বন্ধন ক'রে নিতে পারলে এর ভিতরকার রসটিতে মন বোধহয় সাড়া না দিয়ে পারে না। ধরা যাক্ বইটির "Cry of Peacock" অধ্যায়ে সোম্‌সের আইরিনির প্রতি পূর্ব্বরাগের তীব্র আবেগের চিত্রটি। কিংবা চিরকুমারী আণ্ট জুলির ব্যর্থ ভালোবাসার নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসের ছবিটি। কিংবা রোজারের গৃহে তাদের বাট্‌লার স্মিথকে ছাড়িয়ে দেবার দরুণ তাঁর শিশুপুত্র ইউষ্টেস ও কন্যা ফ্রান্সির বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার কোমল হাস্যকর দৃশ্যটি। কিংবা টিমথির ওখানে একটা বাস্তার কুকুর নিয়ে সেই তুমুল কাণ্ডটি। কত বল্‌ব? এ-সবের কোনোটাই গল্প নয়। অথচ এর চিত্রগুলি এমন এক নতুন ঢঙে লেখা, এমন এক নতুন ভঙ্গীতে দেখা, এমন সুন্দর ভাষায় আঁকা ও এমন স্নিগ্ধ রসিকতায় আদ্যন্তমধুর, যে গম্ভীরানন শ্মশ্রুবহুল সমালোচককেও করজোড়ে বল্‌তে ইচ্ছা হয়: "ম'শায়, কোনো কোডে বিচার না ক'রে একে দেখ্‌বার ঠিক্ ভঙ্গীটি অর্জ্জন করুন—শ্রম সার্থক হবেই। যে-পুরস্কার পাবেন তাতে মন ভরবেই।"

কিন্তু তবু মুস্কিল হয় একটু। এদের কী নাম দেব? এরা কী জাত?—এদের কোন্ angle থেকে দেখ্‌লে দেখাটা ঠিক্‌মতন হবে?—এই ধরণের প্রশ্ন জাগেই প্রথমটা। অন্ততঃ বইটির প্রথম কয়েকটি অধ্যায় প'ড়ে আমার তো জেগেছিল। কিন্তু সে দোষ লেখকের নয়—পাঠকেরই। কারণ স্রষ্টা যে, দাতা যে, তার কাছ থেকে দান গ্রহণ করার দায়িত্ব গ্রহীতারই। বারবার অনেক ভালো জিনিষ প'ড়েই একথা আমার মনে হ'য়েছে, যেমন আলডুসের সুন্দর নক্সা Crome Yellow বা বড় গল্প Two or Three Graces, ওয়েল্‌সের Undying Fire বা World of William Clissold, বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" বা "অপরাজিত"; বুদ্ধদেবের "নিরঞ্জন রায় ও উমা" বা "সাবিত্রী বোস ও অতনু মিত্র"; আনাতোল ফ্রাঁসের Dieux ont Soif বা Revolte des Anges; শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" বা "শেষ প্রশ্ন"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা নতুন টেকনিক আছে। অতীত যুগের কোডকে এরা মানে নি। হয়ত তাতে ক'রে এরা কোনো কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানও লঙ্ঘন ক'রে থাক্‌বে। কিন্তু তাতে কী? আমার মনে হয় না যে তাতে কোনো লেখার মূল্য এক তিলও কমে, যদি তার মূলে একটা সত্য প্রেরণা—urge থাকে। গল্পের নানা মামুলি দাবীর বিরুদ্ধে চিন্তাশীল মনস্বী ওয়েল্‌সের বিদ্রোহে আমি পূর্ণভাবে সাড়া দিই *:

---

* Boon বইটিতে ওয়েল্‌সের কথাগুলি আদ্যন্ত পড়তে "পরিচয়ের" পাঠক পাঠিকাকে অনুরোধ করছি, স্থানাভাব না হ'লে সবটুকু উদ্ধৃত করতাম। আক্রমণটি Henry James-এর উদ্দেশে।

" He wants unity . homogeneity Why *should* a book have that? His 'Notes and Novelists' is one sustained demand for picture effect, which is the denial of the sweet complexity of life, of the pointing this way and that, of the spider on the throne . Life is diversity and entertainment, not completeness and satisfaction All actions are half-hearted, shot delightfully with wandering thoughts—about something else. All true stories are full of irrelevancies James sets himself to pick the straws out of the hair of life before he paints her But without the straws she is no longer the mad woman we love "

জানি একদল লোক আছেন যাঁরা এ কথায় সায় দেবেন না—যাঁদের কাছে "অন ফরসাইট চেঞ্জ" ভালো লাগ্‌তেই পারে না, এ নিয়ে তর্কও তাঁরা করবেন, এবং করাও কঠিন নয়—কোন্ তর্ককে না টেনে লম্বা করা যায় ? কিন্তু আমি তর্ক করবার জন্যে এ-নজীরের অবতারণা করি নি। মনে হচ্ছে যেন কোথায় প'ড়েছিলাম যে, রসের সমালোচনা হচ্ছে পাদ্রীর চার্চ্চে বক্তৃতার মতন—যারা সে মতে দীক্ষিত কেবল তারাই সাড়া দিতে পারে। কথাটা আর্টের বিশ্বজনীনতা-র নীতির বিরুদ্ধে, কিন্তু বাস্তবের সাক্ষ্যের স্বপক্ষে। তাই ফের পুনরুক্তি ক'রে বলি (ক্লাইভ বেল সাহেবের নজীর দিয়ে যে because I wish to be understood I shall repeat myself) যে এ-প্রশস্তি কিছু প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা নয়, এ লেখা শুধু তাঁদেরই জন্যে যাঁরা খানিকটা আমাদের সমধর্ম্মী।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির অনুরাগী তথা ভক্তদের নিবেদন করছি যে তাঁর শেষ উপন্যাস Maid in Waiting আমাকে নিরাশ ক'রেছে। বইটির কোথাও যে একেবারেই ভালো লাগে নি তা বল্‌ছি না অবশ্য, কিন্তু গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির কাছে বড় দাবী রাখি ব'লেই বাজে—আশা না পূরলে। কেন আশা পূর্ণ হয় নি বল্‌ছি। সংক্ষেপেই বল্‌ব—কারণ যা ভালো লাগে নি তার সমালোচনা করতে বা কেন লাগে নি প্রকাশ্যে বল্‌তে আমার একটা প্রকৃতিগত অনিচ্ছা আছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই : একটি ইংরাজ যুবক হিউবার্ট, এক আমেরিকান প্রফেসর হালরসেনের সঙ্গে যান বলিভিয়ায় এক নৃতাত্ত্বিক অভিযানে। সেখানে হিউবার্ট কয়েকটি বলিভিয়ান বর্ব্বরকে প্রহার করেন, ও একজনকে করেন গুলি। প্রফেসর তাঁর নামে তাঁর বইয়ে লেখেন—অত্যাচারী ব'লে। তাতে হিউবার্টের কমিশন যায় যায়—পার্লিমেণ্টে প্রশ্ন ওঠে। ধীরে ধীরে সে বেচারী নিরন্ন বে-আব্রু হয় আর কি। তার বোন ডিনি—ইনিই নায়িকা—নানান লর্ড, অফিশিয়াল প্রভৃতির সঙ্গে চুপি চুপি দেখা ক'রে হিউবার্টকে বাঁচাতে চা'ন। (এই wire-pulling নিয়ে কবি নানা স্থলে ভারি উপভোগ্য ব্যঙ্গ ক'রেছেন—অতি উপাদেয় সিনিসিজ্‌ম্) ডিনির হঠাৎ খেয়াল চাপে প্রফেসর হালরসেনের সঙ্গেও দেখা করবার। হালরসেনের তাঁর প্রতি ' দরশনে উপজিল প্রেম' আর কি। পরিণাম —তিনিই হিউবার্টের সমর্থক হ'য়ে দাঁড়ালেন—প্রকাশ্যে কাগজে ভুল স্বীকার করলেন। (এই সূত্রে আমেরিকান সভ্যতার উপরে গ্রন্থকার কয়েকটি সস্তা উদারনৈতিক সার্টিফিকেট দিয়েছেন—যে-ধরণের প্রশংসার মধ্যে আছে হিন্দুমুসলমান-মিলনপন্থী propagandist-এর ভাব যা শিল্পপ্রাণ গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির কোনোদিন ছিল না।)

এর পরের অংশটি গল্‌স্‌ওয়র্দ্দি বেশ সুন্দর ফুটিয়েছেন। দেখিয়েছেন,

যে চাকা একবাব গডিয়েছে—অফিশিযাল চাকা—সে আব থামতে চায় না—প্রায় নিউটনেব Law of Inertia অনুসাবে গড গড ক'বে চলে আব কি। কত বকম বেড টেপ, প্রেস্টিজ, ভ্রূকুটি—সে কত কী। খুব উপভোগ্য। শেষটায হিউবার্ট মুক্তি পেল অবশ্য—কিন্তু নানা গণ্ডগোলেব পব। সে চিত্রটিও মন্দ না—যদিও কখনো একবাবও মনে হয় না যে হিউবার্ট সত্যিই ডুব্তে পাবে অর্থাৎ বিপদেব ছায়া গ্রন্থকাব তেমন নিপুণভাবে ঘনিয়ে তুলতে পাবেননি এডগাব আলেন পো বা কনান ডয়েলেব মতন।

এব মধ্যে নানা সাব-প্লট আছে। যথা হিউবার্টেব কাকা অ্যাড্রিযানেব ডাযানা ব'লে একটি মধ্যবযস্কা সুন্দবীব প্রতি অনুবক্তি, তাব স্বামী Captain Ferse-এব সুস্থ থাকাব চেষ্টা সত্ত্বেও ধীবে ধীবে পাগল হ'য়ে আত্মহত্যা কবা; হিউবার্টকে একটি মেযেব এক বকম জোব ক'বে চডাও হ'যেই বিবাহ কবা ও এয়াবোপ্লেন চডা শেখা (যদি হিউবার্টকে শাস্তি দেওযা হয় তবে সে তাকে নিয়ে সাত সমুদ্র তেবো নদী পাবে তুর্কীতে পালাবে—এই উদ্ভট মৎলবে) পাণিপ্রার্থী হালবসেনকে ডিনিব ভালো লাগা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান কবা—(নইলে সে উদাসিনী হ'তে পাবে না ব'লেই বোধ হয়।) ইত্যাদি ইত্যাদি। সবেব মধ্যে নানা স্থলেই verisimilitude বা probability-ব আশ্চর্য্য অভাব।

একদল লোক আবও আপত্তি তুল্বেন এই ধবণেব সাব-প্লটেব বিরুদ্ধে। ঐ unity-ব অভাবেব আপত্তি, অবান্তবতাব আপত্তি। কিন্তু তাতে আমাব আপত্তি নেই, কাবণ ব'লেছি গল্পে অবান্তব নানা প্রসঙ্গ থাকা আমি বাঞ্ছনীয়ই মনে কবি। (এবিষযে আলডুসেব Tragedy and the Whole Truth-নামক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধেব সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।) আমাব আপত্তি —এ সব অবাস্তব বিষয গল্পেব মধ্যে উঁকি দিযেছে ব'লে না—আমাব আপত্তি এসব অবান্তব বিষয়বস্তু তেমন সবস হ'য়ে ফুটে ওঠেনি ব'লে। কয়েকটি মাত্র কাবণ দিই কেন ওঠেনি আমাব কাছে ঃ প্রথমতঃ, গল্স্ওযর্দ্দিব ভাষাব বিস্ময়জনক অবনতি; তিনি এত বেশি slang ব্যবহাব কবেছেন যে আক্ষেপই হয়, মডার্ণ হ'তে হ'লে এ চাই বল্লে শুন্ব না, কাবণ আলডুস, বা লবেন্স বা ওযেল্স্ তাঁব চেয়ে কম মডার্ণ নন কিন্তু এঁদেব ভাষা আত্মসম্মানী। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নানা স্থলে যে সব কারুণ্য ফোটাতে চেযেছেন তাতে অকৃতকার্য্য হওয়া —যেমন ডায়ানাব স্বামীব পাগল হ'যে যাওযা; তৃতীয়তঃ, অ্যাড্রিয়ানেব সঙ্গে ডাযানাব প্রেম জমিয়ে তুলে হঠাৎ মাঝবাস্তায় তাদেব নিষ্করুণ হ'য়ে ছেডে দেওযা, এবং শেষতঃ (এবং এইটেই সব চেয়ে বড ক্রটি) গল্পেব নাযিকা ডিনিব কিছু "হ'যে উঠ্তে না পাবা।" সকলেই যে 'জীবনে' কিছু হয় তা বলি না—কিন্তু 'বসসাহিত্যে' প্রতি চবিত্রেব কিছু-একটা হওযা চাই-ই—যে কথা গতবাবে শ্রীগিবিজাপতি ভট্টাচার্য্য বলেছেন। তাব জীবন ব্যর্থ হোক্ কি সার্থক হোক্ তাতে কিছু যায আসে না (মানে আমাদেব রুচি-মতে অবশ্য) কিন্তু ব্যর্থতা বা সার্থকতাও যদি ভালো ক'বে না ফুটে ওঠে তবে বিলক্ষণ যায আসে। Maid in Waiting-এ গল্স্ওযর্দ্দিব এ লিপিদৌর্ব্বল্য দেখে বিস্ময় লাগে। মনে হয় কোনো সত্যিকাব প্রেবণা—urge—নিযে এ বইটি লেখা নয়, লেখ্বাব জন্যেই লেখা। নইলে গল্স্ওয়র্দ্দি যে কারুণ্য ফুটিয়ে তুল্তে পাবলেন না এব চেযে বিস্ময়জনক বস্তু কি হ'তে পাবে? অবশ্য বইটিব মধ্যে মাঝে

মাঝে দীপ্তি সুন্দর, ব্যঙ্গ উপভোগ্য, রেখাপাত হৃদয়স্পর্শী। কিন্তু মনে সন্দেহ জাগে—এ শক্তিমানের শক্তিও কি পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল? তবে ফের বলি এ আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত মতামত। কেন-না এ-ও সম্ভব যে খুব একজন গভীর দৃষ্টি, তীক্ষ্ণধী, স্রষ্টা শিল্পী ও সমালোচক বল্‌বেন "গল্‌স্‌ওয়র্দ্দির Maid in Waiting-এ তাঁর প্রতিভার যে সুসমঞ্জস বিকাশ, যে অভিনব ভঙ্গী, যে লিপিচাতুর্য্য একটা নতুন পথ কেটে নিয়েছে তাতে" ইত্যাদি—এবং একথা যদি কেউ বলেন, স্বীকার করতে হবে যে তাঁর সে মত ভুল মনে করার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই দেওয়া যায় না।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পত্রাবলী—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান (শ্রীদিলীপকুমার রায়, বীরবল ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত) মূল্য ১৲ টাকা।

Science and Human Experience—HERBERT DINGLE, (Williams & Norgate)

The Scientific Outlook—BERTRAND RUSSELL, (George Allen & Unwin Ltd)

Brave New World—ALDOUS HUXLEY, (Chatto & Windus)

য়ুরোপ ও আমেরিকায় গত কয়েক বৎসর ধ'রে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সীমানা নিয়ে যে-তর্ক উঠেছে, প্রথম বইখানি তারই জের টেনেছে বাংলা দেশে। বইখানিতে যে-কয়েকটি প্রবন্ধ (প্রবন্ধ ছাড়া এদেরকে চিঠি বলা যায় না) ছাপা হয়েছে, সেগুলি ইতিপূর্ব্বে নানা মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকদের মনকে সর্ব্বপ্রথম সজাগ করে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকেই এই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ও সমন্বয় নিয়ে বিদেশী ভাষায় লেখা অনেক বই পড়েছিলেন। কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী ভাষায় চিন্তা করার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে বিশ্বাস করি, সেইজন্য 'পরিচয়ে'র মারফৎ সমগ্র বাঙ্গালী পাঠকদের এই বইখানি পড়তে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধের কথা শুনলেই পরশুরামের চিকিৎসা-সঙ্কটের কথা মনে হয়। বৈদ্য-হাকিমের টোট্‌কা, এলোপ্যাথের কড়া দাওয়াই, এবং হোমিওপ্যাথের জল-পড়া খেয়ে রোগী বাঁচুক আর নাই বাঁচুক, তার আর্থিক অবনতি ও মানসিক অবসাদ যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। যখন লক্ষ্য করি, আমাদের দেশের মনকে কুসংস্কার কি ভীষণভাবে ঘিরে রয়েছে, যখন দেখি ধর্ম্মের নামে যত রকম ফাঁকি সম্ভব ততরকম ফাঁকি আমাদের শিক্ষিত সমাজের অগ্রণীরা নিজেদের মনকে দিতে ত্রুটি করছেন না, তখন মনে হয় বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক মনোভাব এমন-কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-তন্ত্রের যতটা প্রসার হয় ততটাই মঙ্গল। পরে কি হবে, বিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজের গোটাকয়েক মূল্যবান জিনিষ নষ্ট হবে কি না, ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একটা অমানুষিক গড়পড়তার চাপে নষ্ট হবে কি না, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সমীকরণে বৈচিত্র্য তার রং খোয়াবে কিনা—এ সব ভাবতেও ইচ্ছা করে না।

হয়ত লোকে আবার একটা নতুন রকমের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হবে—প্রমথবাবুর কথা অনুসারে, সমাজ হয়ত বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাবিধি ও তাদের স্বার্থজড়িত মত প্রচারের তাড়নায় একটা নিষ্ঠুর ও শক্তিশালী সঙ্ঘের অধীনে গিয়ে পড়বে—হাক্সলী ও রাসেলের কথামতো, তবুও ভারতবর্ষের অনেক উপকার হবে ভেবে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বহুল প্রচার সম্বন্ধে ভীত হই না। মনে হয়, এ দেশে বিজ্ঞান ছাড়া কোন উপায় নেই। আশুফললাভের আশায় আমি অনেকটা ছাড়তে রাজী। একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা জগদীশ, একটা রামণে আমি নিশ্চিন্ত নই। আমাদের aveiage নেহাইৎ নীচু, তাকে তুলতে হলে বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিতে হবে, ধর্ম্মের নয়। রাসেল সাহেব যে average-এর ভয় দেখিয়েছেন তাতে কাবু হই না, কারণ, average death-rate যত বেশী হোক না কেন, সে মৃত্যুহারের জোরেই কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু অবধারিত নয়—নচেৎ হিন্দুসমাজের রক্ষক বৃদ্ধের দল এখনও বেঁচে রয়েছেন কেন? Average মানে বড়র মাথা কেটে বেঁটের মাথায় জুড়ে দেওয়া নয়—এই কথাটি জানলে বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের সর্ব্বনাশ হবে ভেবে অ-সাধারণ ব্যক্তির খেদ করবার ততটা প্রয়োজন থাকে না।

আমার মনের কথা লিখলাম। তবুও ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধটুকু থেকেই গেল। বিরোধটার প্রকৃতি জানতে হ'লে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রসম্বন্ধে ভৌগলিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। Dingle সাহেব বোধ হয় হগ্‌বেনের ভাষা গ্রহণ ক'রেই বলছেন—বিজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে the recording, argumentation and rational correlation of those elements of our experience which are actually or potentially common to all normal people। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই সাধারণ অভিজ্ঞতা, যা নিয়ে আলোচনা করা যায়, যাকে প্রকাশ করা যায় অন্যের কাছে। ধর্ম্মের সংজ্ঞা তিনি দেন নি—শুধু বলছেন যে, এর ক্ষেত্র হচ্ছে private, এবং বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ক্ষেত্র যেকালে আলাদা তখন প্রত্যেকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন, এই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু গোল বাধে এইখানে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস যদি এই সাধারণ অভিজ্ঞতার কোন একটি অংশ নিয়ে তৈরী হয়, কিংবা কোন মানুষ যদি তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যেভাবে সত্য ঠিক্ সেই ভাবে সত্য বিবেচনা করেন, তাহ'লে বিরোধ অনিবার্য্য। এই যেমন, পৃথিবী ছয় দিনে তৈরী হয়েছিল, ভগবান সকল মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছেন। এ সব স্থলে বিজ্ঞানের দাবী ধর্ম্মের চেয়ে বেশী। এই রকম একাধিক প্রকার বিরোধের বিষয় উঠতে পারে। প্রত্যেক বিষয়ে বিজ্ঞানের attitude আলাদা।

"In considering the relation of science to religious creeds, then, we must recognise three attitudes which science can take, according to the character of the creed in question: it can make a final pronouncement, it can reserve judgment, or it can influence the probability with which a particular dogma is invested"

অতএব সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-বাক্য গ্রাহ্য নয়। অন্য দিক থেকে, ধর্ম্মও বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ধর্ম্ম এই সাধারণ অভিজ্ঞতা

সম্বন্ধে কোন মতামত জাহির করছে, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা ধর্ম্মের পক্ষে খুবই সাজে। ভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে Dingle-এর এই মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য।

"The individual man may correlate his own experiences, whether of common or individual nature in a single whole with complete validity, and if in so doing he finds the assumption of God necessary, his position in adopting it is impregnable"

তাই ব'লে ভগবানকে potentially common experience-এর বিষয় মনে করতে পারার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই; তা করতে হ'লে তাকে দাঁড়াতে হবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অন্যান্য অভিজ্ঞতারই মতন কোন অভিজ্ঞতার ওপর। God of Reason ব'লেও কিছু একটা থাকতে পারে। বিজ্ঞানের কাজ শুধু correlation নয়, augmentation of experience-ও বটে, এবং এই সূত্রে বিজ্ঞান এমন অনেক hypothesis ব্যবহার করে, যেগুলি সত্য ব'লে প্রমাণিত হওয়ার পরে সাধারণ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এই হিসাবে hypothesis of God হয়ত পরে আবশ্যক হবে, পদার্থবিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় যদিও তার কোন সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। যদিও হয়, তাহ'লে সে ভগবান না হবেন কেষ্ট ঠাকুর, না হবেন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। জীন্‌সের ভগবান তাঁর নিজের দার্শনিক সংস্কারের দ্বারা তৈরী, তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং সাধারণ পাঠকের তর্কবুদ্ধি দ্বারা সে ভগবান প্রতিষ্ঠিত হন নি। এডিংটনের mind-stuff-ও ঐ ধরণের ব্যক্তিগত সংস্কার মাত্র। রাসেল ঠাট্টা ক'রে ঠিকই লিখেছেন—

"It is, I suppose, natural that every man should fill the vacuum left by the disappearance of belief in physical laws as best as he may, and that he should use for this purpose any odds and ends of unfounded belief which had previously no room to expand When the robustness of Catholic faith decayed at the time of the Renaissance, it tended to be replaced by astrology and necromancy, and in like manner we must expect the decay of the scientific faith to lead to a recrudescence of pre-scientific superstitions"

এ ভয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নচেৎ এডিংটন্ ধর্ম্মের ধ্বজা তুললেন অণুর পাগলামি দেখে, আর জীনস্ এক আজব ভগবান খাড়া করলেন সেই একই অণুর ভদ্র ব্যবহারের ওপর। নচেৎ কোন্ এক বিশেষ বিশ্বাসের দ্বারা জীবনটা সমগ্র ও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল তারই পরিচয় না দিয়ে দিলীপকুমার আশ্রয় খুঁজতে যান এই সব দার্শনিকদের কাছে। এ সব বিষয়ে নিজের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাই হল একমাত্র আশ্রয়। অন্যের কাছে তার মূল্য ভিন্ন হতে বাধ্য, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া চলে না। সেই জন্য মনে হয়, critical mysticism ব'লে একটা মত তৈরী হওয়া অসম্ভব নয়।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে আর-একটি বিরোধের বিষয় রয়েছে। অনেকে সন্দেহ করছেন, বিজ্ঞান যে ভাবে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বেঁধে দিয়েছে তাতে ব্যক্তির পক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের কোন স্বাধীনতাই থাকছে না। এডিংটনের Physics has gone off the gold standard প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বাণী সত্ত্বেও, বিজ্ঞান এখনও একটা ব্যক্তিসম্পর্কবহিত কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা পরিচালিত হবে মনে করার

যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 'পরিচয়'-এর পূর্ব্বের সংখ্যায় Planck-এর The Universe in the Light of Modern Physics বইখানির মূল বক্তব্য সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। Planck-এর বক্তব্য এতই মূল্যবান যে, তাঁর বই থেকে কয়েক লাইন তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা।

"In my opinion, therefore, it is essential for the healthy development of Physics that among the postulates of this Science, we reckon, not merely the existence of law in general, but also the strictly causal character of this law . . . . Further, I consider it necessary to hold that the goal of investigation has not been reached until each instance of statistical law has been analysed into one or more dynamic laws"

এটা determinism-এর কথা। আমি ভাল করেই জানি যে, দার্শনিকের determinism আর বৈজ্ঞানিকের determinism ঠিক্ এক বস্তু নয়, যে-অর্থে দার্শনিক determine কথাটি ব্যবহার করেন, বৈজ্ঞানিক সে-অর্থে ব্যবহার করেন না। কিন্তু সাধারণে এই পার্থক্যকে শ্রদ্ধা করেন না ; অর্থশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ববিদেরাও করছেন না। তাঁরা হয়ত ঠিক্ কথাই বলেন, কিন্তু তাঁরা যে কারণ দেখান সেটা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। তাঁরা বিজ্ঞানের ভুল দেখান, মানুষকে যে বৈজ্ঞানিক এবং সংখ্যাশাস্ত্রের নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না, কখনও যাবেনা, কেন না তার পুরুষকার প্রবল, এই সব দোহাই পেড়ে। 'But the question of free-will is not concerned with the question whether there is such a definite connection, but whether the person in question is aware of this question !' এই জ্ঞানটুকু ব্যক্তিগত, অর্থাৎ মানুষের গোপন কথা—কিন্তু fact। সেইজন্য এডিংটনের, জীন্‌সের ঝুটা ধর্ম্মবুদ্ধির চেয়ে প্ল্যাঙ্কের ethical law-এর প্রতি আস্থা আমার কাছে বেশী যুক্তিগত ব'লে মনে হয়। Ethical law-এ বিশ্বাস করলেই বিজ্ঞানের বাঁধাধরা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হবার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা মানতে হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠছে—বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধগুলি রয়েছে তাদের সমন্বয় হবে কিসে ? সভ্যতা কিছু চিরকাল বিরোধের মধ্যে অবস্থান করতে পারেনা। যাঁরা সভ্যতা বলতে মানুষেরই সভ্যতা বোঝেন তাঁরা বলেন যে, একমাত্র ব্যক্তিই এই সমন্বয় সাধিত করবে। আমার মনে হয় যে, অলড্যুস্ হাক্সলি ও রাসেল এই ব্যক্তিগত মানবধর্ম্মে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানব-সমাজের যে যে দোষ বর্ত্তাতে পারে তাই দেখাতে গিয়ে, বিশেষ ক'রে শেষ অধ্যায়গুলিতে রাসেল যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাই দেখে মনে হয় যে, তিনি মুখ্যত বিজ্ঞানের নৈয়ায়িক হ'লেও বাস্তবিকপক্ষে নীতিবিদ্ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সমাজে থাকতে হ'লে যে সব values-এর ওপর জোর দিতে হয় তার এত চমৎকার বিবরণ ইংরেজী সাহিত্যে আর কোথাও পড়েছি ব'লে স্মরণ হয় না। একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তির জীবনের মধ্যেই বিজ্ঞান তার স্বরচিত নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে,' এবং সেই মুক্তির সাহায্যে মানুষ এক নতুন সমাজ-ধর্ম্ম সৃষ্টি করতে পারে—এইটাই হ'ল রাসেলের সমন্বয়। হাক্সলিও রাসেলের সমধর্ম্মী। বিজ্ঞানের standardisation, যার প্রতীক হচ্ছেন হেনরী ফোর্ড, মানুষের ওপর বৈজ্ঞানিক সমীকরণের চাপ, যার প্রতীক হ'ল ওয়াট্‌সন, বৈজ্ঞানিকের

অত্যাচাব যাব প্রতীক হ'ল Controller—এ সবেব বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে Barnard ও Savage, পুরুষ ও স্ত্রীব ভালবাসা, আত্মবলিদান, দুঃসাহস, মানুষেব খামখেযাল, শেক্সপীযব, অর্থাৎ সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি গোটাকয়েক মামুলী জিনিষ। বিজ্ঞানেব অত্যাচাবেব বিপক্ষে মানুষ যদি এখন থেকে সাবধান না হয, তাহ'লে তাব কি দুর্দ্দশা হবে যদি কেউ ভাবতে চান তবে তিনি যেন হাক্সলিব বইখানি পডেন। আজ পর্য্যন্ত হাক্সলি যত বই লিখেছেন তাব মধ্যে এইটাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ বকম নিষ্ঠুব বই সচবাচব চোখে পডে না। এত পাণ্ডিত্যেব সঙ্গে আমবা খানিকটা সহৃগুণ প্রত্যাশা কবি। হাক্সলিব কিন্তু সহৃগুণ নেই। কিন্তু সব দোষ সহ্য হয যখন Savage-এব 'I come to bring you freedom' মহাবাক্যটি মনে পডে। হাক্সলিব বইখানিব সাহিত্যিক দোষগুণ দেখাবাব স্থান অন্যত্র, তাই শুধু ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানেব বিবোধ সম্পর্কে তাঁব মত যতটুকু আলোচনা কবা যায তাবই আভাস দিলাম। ২৮৩ পৃষ্ঠায Savage বলছে, 'But I like the inconveniences'। Controller বল্লেন, 'We don't, we prefer to do things comfortably'। Savage তাব উত্তব দিলেন, I want God. I want poetry; I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin! 'In fact,' said Mustapha Mond, 'you're claiming the right to be unhappy!' 'All right, then,' said Savage defiantly, 'I am claiming the right to be unhappy!' মোস্তাফা মণ্ড অসুখী হবাব অর্থ বোঝাবাব পবও যখন Savage বল্লে 'I claim them all,' তখন 'You're welcome' ছাডা মণ্ডেব মুখে কোন উত্তব জোগাল না। বৈজ্ঞানিক-ব্যবস্থাপত্রে অন্য কোন উত্তব লেখা আছে কিনা জানি না।

যে উপাযে সমালোচনা শেষ কবলাম তাতে অনেকে সন্দেহ কববেন যে হযত বা আমি হাক্সলিব মতো 'Truth is a menace, science a public danger' বলছি। আমাব মত তা নয। আমাব মত এই যে, নির্ম্মমভাবে তর্কবুদ্ধি খাটালে যে অবস্থাতেই আসা যাক্ না কেন সেই অবস্থাতেই দাঁডাবাব সাহস থাকা চাই, তবেই মানুষ সৎ হয। সৎ হ'লেই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানেব বিবোধ মিটে যায।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায

The Hero—ALFRED NEUMANN (Martin Secker)
The Hidden Child—FRANZ WERFEL (Jarrolds)

আলফ্রেড নয়মান্ হচ্ছেন ম্যাক্স ব্রড, ভিক্টব মাযাব-একহার্ট, ইনা জাইডেল প্রভৃতি জার্ম্মানীব নব-বোমাণ্টিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদেব দলেব। ওযাল্টাব স্কট বা বিকার্ডা হুকেব মত এঁবা নিছক পুবাতন দিনেব গল্প ব'লে, বিগত কোন যুগেব সাজসজ্জাব বর্ণনা কবে, জীবনপ্রণালীব চিত্র এঁকে পাঠকদেব মনোবঞ্জন কবতে চাননি, বর্ত্তমান সমযেব বাস্তবতাব গুরুভাব এডিযে কোন বিগত কল্পলোকে পালাতে পাবেননি। আজিকাব দিনেব নানা সমস্যায প্রপীডিত অন্তবে তাঁবা যখনই কোন গত কালেব গল্প বলতে গেছেন, মানব ইতিহাসে কালে কালে যে সব চিবন্তন সমস্যা

এসেছে, তাঁদেব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে সেইগুলিই মূর্ত্ত হয়েছে; আধুনিক কালেব দ্বন্দ্বাকুল দৃষ্টিতে তাঁবা প্রাচীন যুগেব জীবনধাবা দেখেছেন।

বিশেষতঃ আলফ্রেড নযমান; ঐতিহাসিক জীবনধাবাব কথক বা চিত্রকব তিনি নন, তিনি হচ্ছেন নাট্যকাব। পুবাতন কোন দিনে যেখানে ঘটনাব সংঘাতে, বিরুদ্ধ শক্তিব দ্বন্দ্বে ইতিহাস সমস্যাকুল হযেছে, তাঁব নাট্যপ্রবণ শিল্পীমন সেই সব বিবোধ-ক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীব মধ্যে উপন্যাসেব মালমসলা খুঁজেছে। The Patriot উপন্যাসখানি যাঁবা পড়েছেন অথবা The Patriot অবলম্বনে লিখিত এ্যাসলি ডিউকেব "Such Men are Dangerous" নাটকখানি যাঁবা পড়েছেন বা এমিল জেনিংস অভিনীত Patriot ফিল্ম যাঁবা দেখেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পাববেন পুবাতন ইতিহাসকে নযমান কি নব দৃষ্টিতে দেখে নবভঙ্গীতে এঁকেছেন।

The Hero বইখানিতে আমবা কিন্তু The Patriot বা The Devil-ব নযমানকে পাইনা; সেজন্য বইখানি আবম্ভ ক'বে কিছু হতাশ হ'তে হয। বিরুদ্ধ ঐতিহাসিক শক্তিগুলিব প্রতীকরূপে নানা ব্যক্তিত্বেব বিবোধে, ঘটনা ও চবিত্রেব সংঘাতে যে অপূর্ব্ব নাট্যকলাব সৃষ্টি নযমানেব ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে পেয়েছি, The Hero বইখানিতে তা পাইনা, এখানে দ্বন্দ্ব বাহিবেব নয অন্তবেব, এখানে নযমান ঐতিহাসিক নাট্যকাব নন, যুদ্ধাগ্নিদগ্ধ বিপ্লবী মনেব অশান্ত বিবোধেব বিশ্লেষক, যদিও নযমান এ বিশ্লেষণ শক্তিব সহিত ক'বেছেন, তবু এ পড়ে মন ভবে না, মনে হয় এ মনস্তত্ত্ববিদেব কাজ তাঁব নয, সে কাজ কববাব ত অন্য লেখক আছে। বস্তুতঃ, এই মানসিক সংঘাতেব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কবতে গিযে ব্যক্তিত্বেব প্রতি সমবেদনা কমে এসেছে; যে Hero, সে সত্যি বীব নয, লেখকেব কাছে নয, পাঠকেব কাছে নয, এমন-কি তাব নিজেব কাছেও নয, তাব সত্তাব যে স্থিব ভিত্তি ছিল, বিশ্লেষণে তা ভেঙে গেছে, নিজেব আদর্শেব প্রতি তাব শ্রদ্ধা নেই, নিজেব জীবনেব ওপব বিশ্বাস নেই, সেজন্য হিবোব-চবিত্রেব ভাঙনেব বর্ণনা পড়তে পড়তে আমাদেব অন্তবে করুণা জাগে বটে কিন্তু সমবেদনা অনুভব কবিনা অথবা ট্রাজেডিব ভীতি বা বিস্ময়ে মন দোলে না।

গল্পটি হচ্ছে বর্ত্তমান জার্ম্মানীব, বিগত মহাযুদ্ধেব আগুনে পোড়া, ঝড়েতে নোযা নব জার্ম্মানীব। প্রাক্-সৈনিক হুবার্ট হোফ্ জীবিকাব জন্যে ইম্পিবিযাল কাফেতে বাতেব বেলা নৃত্য কবত, সেখানে সে অশ্বাবোহী সৈন্যদেব অফিসাব নয, সে নৃত্যেব প্রফেসাব। কিন্তু হুবার্ট হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী গভর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকাবী ন্যাসানাল লীগেব কমিটিব সভ্য; এই নব সোসিযালিষ্ট গভর্ণমেণ্টেব প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা কবাব ভাব সে গ্রহণ কবে। হত্যাব কযেকদিন পূর্ব্বেব ও পবেব হুবার্টেব মানসিক দ্বন্দ্বেব ইতিহাস হচ্ছে বইখানি।

গুপ্ত সৈনিক-সমাজেব পক্ষ হ'তে প্রধানমন্ত্রীকে গুলি ক'বে মাবাব মধ্যে হুবার্টেব অন্তবেব কোন প্রেবণা নেই, Patriot-এ প্রধানমন্ত্রী যে অত্যাচাবী উন্মাদ জাবেব বিরুদ্ধে চক্রান্ত কবেছিল, তাতে তাব অন্তবেব বেদনা ও কর্ত্তব্যেব অনুপ্রেবণা ছিল, কিন্তু এখানে হুবার্টেব এই বিপ্লব, এই গুপ্তহত্যা যেন কোন অদম্য চঞ্চলতাব, কোন অনিযন্ত্রিত শক্তিব, মানসিক বিকাবেব প্রকাশ। এ হত্যাকে সে বীবত্বেব বা দেশভক্তিব কাজ ব'লে বিবেচনা কবেনি। কেন যে হত্যা কবতে চায, তাব জবাবদিহিতে হুবার্ট বলেছিল, চাববৎসবব্যাপী যুদ্ধ ।

যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ জার্ম্মানীর জীবনকে ওলটপালট ক'রে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার কালো ছায়া সমগ্র জাতির ওপর, সমস্ত সাহিত্যের ওপর। রেমার্কের "রোড ব্যাক্" বইখানিতে দেখেছি, তরুণ যুবকদের মন কেমন বিকল বিকৃত হয়ে গেছে, ট্রেঞ্চের সৈনিকবৃত্তিতে। The Hero-তে নয়মান্ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

যুদ্ধের আগে যে সহজ স্বাভাবিক হুবার্ট হোফ্ ছিল সে ভেঙে পড়েছে চারবৎসর-ব্যাপী যুদ্ধের অভিজ্ঞতায়; তার স্নায়ু অসুস্থ, রাত্রি বিনিদ্র, অন্তর ভাবাক্রান্ত কত প্রমত্ত চিন্তায়, কোথাও সে শান্তি, সুস্থতা পায়না, সে সত্যিকার নৃত্যকার বা বিপ্লবী নয়; মহাযুদ্ধের দীর্ঘ অস্বাভাবিক নৃশংস জীবনে ক্রূর মৃত্যুর লীলার মধ্যে, তাণ্ডবনৃত্যের অগ্নি-উৎসবে তার ব্যক্তিত্বের ভূমি কম্পিত, দগ্ধ, দীর্ণবিদীর্ণ। রাতের বেলা যখন ঘুম হয় না, তার প্রাণে বাজে, খুন্, খুন্। অস্টেণ্ড হ'তে বাজেল, কনষ্টান্টিনোপল্ হ'তে বেভেল, ইয়োরোপের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত, মাইলের পর মাইল মানুষ-খুনের অগ্নিঅস্ত্র অহর্নিশি গর্জ্জন করছে, যে যত মানুষ খুন করতে পারবে সে তত বড় বীর। হত্যা শুধু সহজ নয়, হত্যা স্বাভাবিক।

বইটির মধ্যে দু'তিনটি দৃশ্য ভোলা যায় না, ভূতের মত মনকে অভিভূত করে। একটি হচ্ছে, হত্যা করার পূর্ব্বের রাতে গ্রন্থপরিকীর্ণ লাইব্রেরীর নিস্তব্ধতায় হুবার্ট হোফের সহিত ডেভিড্ হেয়র্ত্সের চিন্তাভারাক্রান্ত স্তব্ধতাখণ্ডিত কথাবার্ত্তা। একজন তার স্ত্রীকে হ্রদের জলে ডুবিয়ে মেরেছে, প্রেমের প্রতিহিংসায়; আর একজন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে যাবে, আপনাকে বিপ্লবী ভেবে। অন্ধকার রাত্রি, জনহীন হ্রদের তট, স্তব্ধ হ্রদের গভীর কালো জল, তার মধ্যে ছোট নৌকায় স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে, সে স্ত্রী তার ভাইকে ভালবাসে, এ জ্বালা বুকে জ্বলছে; সেই বেদনার আঘাতে বুঝি নৌকা উল্টে গেল, চারিদিক ঘন অন্ধকার ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল, তারপর সব চুপচাপ—ডেভিড্ হেয়র্ত্স্ এ দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারছে না; এ দৃশ্যের জ্বালাময়ী স্মৃতি তার দিনকে অশান্ত, রাত্রিকে নিদ্রাহীন করেছে। এই বেদনাক্ষুব্ধ স্ত্রী-হত্যাকারীর কাছে আর একজন শান্তিহারা নরহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে এসে বসল, তাদের সম্মিলিত অন্তরের সংঘাত ও বেদনা যেমন নিবিড় তেমনি করুণ। তাদের আত্মা স্পর্শ করল ভাষার আদানপ্রদানে নয়, কোন অতলস্পর্শ ভাষাতীত ব্যথার রহস্যময় রাজ্যে।

প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার পর আবার যখন হুবার্টের সঙ্গে ডেভিডের দেখা হ'ল, তখন দু'জনেই হত্যাকারী, দু'জনের আর বেশী কথা হ'ল না; হুবার্টের হত্যার পাপভার যেন ডেভিড্কেও বহন করতে হচ্ছে, তার ভার আরও বেড়ে গেছে, দু'জনের মানসিক বিপ্লব হয়ে গেল; এতদিন ডেভিড্ যে ভার বহন ক'রে এসেছে, এখন তা অসহনীয় হয়ে উঠল, এ ভার আর বহন করা যায় না। না, তারা বীর নয়, তারা দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ, মানুষের মত সুস্থচিত্তে এ পাপ গোপনে বহন করতে পারবে না। তাই হুবার্ট বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পুলিসে গিয়ে ধরা দিল আর ডেভিড্ আত্মহত্যা করল; পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করবার মত মানসিক বল তার নেই। কিন্তু হুবার্ট হচ্ছে সৈনিক, সে যেমন প্রাণকে বিনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না, প্রাণবিসর্জ্জন করতেও তেমনি ভয় পায় না। বস্তুতঃ বইখানির নাম 'বীর' না হয়ে 'সৈনিক' হ'লে ঠিক হ'ত।

The Hidden Child গ্রন্থখানি, ফ্রান্স ভের্ফেলের লিখিত "Barbara

Oder die Frommigkeit" উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ। বইখানির নাম ইংরাজীতে কেন Hidden Child দেওয়া হল তা বোঝা যায় না, অনুবাদক তার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নি; বোধ হয় কোন চমকপ্রদ নাম দিলে কাটতির সুবিধে হবে ব'লেই এমন নাম দেওয়া। কিন্তু কোন চটকদার নাম না দিয়ে সহজ "বাপ্‌বাবা" নাম দিয়ে অনুবাদ করলেও বইখানির বিক্রি কিছু কম হ'ত বলে মনে হয় না। কারণ, উপন্যাসখানি ভেযর্ফেলের শিল্পী-প্রতিভার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, কেবলমাত্র ভেযর্ফেলের নয়, বর্ত্তমান জার্ম্মান সাহিত্যের একখানি প্রধান গ্রন্থরূপে বিবেচিত হবে।

ভেযর্ফেল্ কবিরূপে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সুরু করেন; "Der Weltfreund," "Einander" প্রভৃতি তাঁর প্রথমবয়সের লেখা কবিতা-গ্রন্থগুলিতে যে অশান্তি, বিদ্রোহ, নবজীবনের তৃষ্ণা, এ পুরাতন পৃথিবী ভেঙে নতুন স্বপ্নের পৃথিবী গড়বার আশা জেগেছে, এই বইখানি ভ'রে তারি সুর বাজে। ভেযর্ফেলের কবিতাতে বিদ্রোহের সুর ছাড়া আর একটি করুণক্লান্ত সুর আছে; সেটি হচ্ছে, কোন শান্তিহারা গৃহহারা পথিকের একটি প্রেমের নীড়ের জন্য, একটি আনন্দের স্নিগ্ধ আশ্রয়ের জন্য আত্মার ক্রন্দন। Hidden Child-তে যার গল্প বলা হয়েছে সেই শৈশবে পিতৃমাতৃহীন যৌবনে দুঃখদারিদ্র্যে সহায়হীন ফ্রেড্‌রিকের অন্তরের ভালবাসাঘেরা একটি ঘরের তৃষ্ণায়, বেদনার দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বইখানি করুণসুন্দর।

ভেয়র্ফেল্ হচ্ছেন বর্ত্তমান জার্ম্মান এক্সপ্রেশনিষ্টদের দলের। কিন্তু তাঁর লিরিক কবিতাতে তিনি যে এক্সপ্রেশনিষ্ট লিখনরীতি অনুসরণ করেছেন, এ উপন্যাসে তা সম্পূর্ণরূপে করেন নি। বরং, স্মৃতির ধারা বেয়ে নিজ জীবনের কথা বলার যে অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গী প্রুস্ত্ প্রবর্ত্তন করেছেন, সেই নবরীতির প্রভাব ভেযর্ফেলের এ গ্রন্থে দেখতে পাই। সে প্রভাবকে আত্মস্থ ক'রে ভেযর্ফেল্ এক্সপ্রেশনিষ্ট লিখনরীতির সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য করেছেন। স্মৃতি এখানে শিল্পী, স্মৃতি এখানে কথক; গতজীবনের কত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত, কত সুখদুঃখের সংঘাত-কথা স্মৃতি তার বিজন ঘরে বসে বসে লিখেছে, কত ছবি এঁকেছে; স্মৃতির সেই পুরাতন জীবনের চিত্রশালায় কোন ঘটনার ছবি ম্লান, কোন ঘটনার ছবি বেদনার রঙে জ্বল্‌জ্বল্ করছে; সেই চিত্রশালা থেকে জীবনের উপন্যাসে বলবার মত, রসসৃষ্টি করবার মত ছবিগুলি বেছে, কথায় তাদের বর্ণনা করা, চিরপ্রবহমান সময়ের সূত্রে বেঁধে তাদের অখণ্ডরূপ দেওয়া, তাদের মধ্যে জীবনের মর্ম্মগত বেদনা, প্রাণের গভীর আশাকে রূপ দেওয়া—প্রুস্ত্-পন্থী কথাশিল্পীদের এই নব লিখনরীতিকে ভেযর্ফেল্ তাঁর এই বৃহৎ উপন্যাসে বড় সুন্দরভাবে পরম শক্তির সহিত ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু বইখানি যদি কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতি হ'ত, তার লিখনরীতি অত্যাশ্চর্য্যকর হ'লেও, আমাদের চিত্তকে বইখানি এমনভাবে আন্দোলিত করতে পারত না। বইখানির শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে, ফ্রেড্‌রিকের ব্যথিত করুণ শৈশব, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছাত্রজীবন, রুদ্র যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা, যুদ্ধশেষের ভিয়েনার দিশাহারা দিনগুলির কথা। এ দীর্ঘকাহিনীতে শুধু ফ্রেড্‌রিকের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা শুনতে পাই না, তার চারিদিকে রাষ্ট্র ও সমাজের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, জাতির উত্থান-পতনের ছন্দ শুনতে পাই। ফ্রেড্‌রিকের সরল কোমল অন্তরের আশা-বেদনার স্পন্দনের তালে তালে সমস্ত দেশের হৃৎপিণ্ডের কম্পনের স্পর্শ পাই। এইখানে বইখানির সার্থকতা। ইহা কেবল জীবনেতিহাস

নয়, ইহা সামাজিক ইতিহাস ; ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও বেদনা, ব্যক্তির বিদ্রোহ ও সমাজের শাসন ও পেষণ, ব্যক্তি ও সমাজের অসামঞ্জস্যে রাষ্ট্রের ভাঙন—ব্যক্তিত্বের এ ট্রাজেডির কথা এমন করুণ-সুন্দর সুরে খুব কম লেখকই লিখেছেন।

কয়েকটি ছবি আমাদের চোখের ওপর জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে ফুটে ওঠে ; ঘটনার বর্ণনার সহিত চরিত্র ফুটিয়ে তোলবার দক্ষতা, কথা-চিত্র আঁকবার কুশলতা আশ্চর্য্যকর। Advance Post Ferdinandowka III-তে মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে যুদ্ধাগ্নির মধ্যে যোঝার যে বর্ণনা আছে, যুদ্ধের এরূপ অমানুষিক নৃশংস রুদ্ররূপের কথা রেমার্কের All Quiet ছাড়া আর কোথাও পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

কিন্তু যুদ্ধের শেষের ভিয়েনার কথা, বিশেষতঃ Piller Hall-র দলের কথা পড়তে সবচেয়ে ভাল লাগে, এই বিচিত্র বিদ্রোহীদল যুদ্ধক্লিষ্ট সমাজের ভাঙনের প্রতীক, এরূপ অপূর্ব্ব দলের পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না। Piller Hall-তে দু'টি চক্র ; একটির চক্রপতি হচ্ছে তরুণ জেরার্ট, Relationship মতবাদের প্রচারক ; তার মতে মানুষের যৌন-সম্বন্ধ অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্ত হয়েছে ব'লেই, মানুষের সামাজিক সম্বন্ধও বিকৃত, দুঃখময় ; এই যৌন-সম্বন্ধকে সহজ স্বাভাবিক করতে না পারলে মানবজাতির আনন্দ-কল্যাণের কোন আশা নেই। কথা বলার অফুরন্ত শক্তি, ভাব রচনার অদ্ভুত যাদু দিয়ে সে তার মতবাদ প্রচার করে ; তরুণ মনগুলি আকৃষ্ট করে। অপর দলের নেতা হচ্ছে বেসিল্‌, বয়সে প্রবীন হ'লেও সে আপনাকে চিরযুবা ভাবে, সমস্ত যুব-আন্দোলনের নেতা হবার যোগ্যতা একমাত্র তারই ; "Revolution in God" পত্রিকার সৌখীন ভাবুক সম্পাদক রোম ও রুশিয়ার মতবাদের সামঞ্জস্য ক'রে ক্যাথলিক চার্চ্চ ও কমুনিজমের মিলন সাধন করবার প্রয়াসী, কিন্তু তার পূর্ব্বপ্রেমিকা হেভার একটুকু অবহেলায় সে অধীর হয়ে ওঠে। কথা-বিলাসী সৌখীন আদর্শবাদী অপূর্ব্ব এ দলটির সহিত পরিচিত হবার আনন্দলাভে বইখানি পড়া সার্থক হয়।

এ দলটির ক্ষুদ্রতা, অহমিকা, ভীরুতাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন এংলেন্‌ডার, তার বিদ্রোহ যেমন আন্তরিক, তার বেদনা তেমন গভীর, তার জ্বালা তার মনকে বিকল ক'রে দিল। তার চরিত্রের সহিত ফ্রেডরিকের চরিত্রের মিল আছে, কিন্তু এংলেন্‌ডার যেখানে আপন স্বপ্ন-আদর্শ সার্থক করতে না পেরে জীবন ব্যর্থ ভেবে উন্মাদ হয়ে গেল, ফ্রেডরিক সেখানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার নবজীবনের কাজে যোগ দিলে, অন্তরে সে উদাস, তবু আত্মায় শান্তি অনুভব করলে ; তার কারণ হচ্ছে ফ্রেডরিকের সমস্ত জীবন ঘিরে রক্ষাকবচের মত রয়েছে তার শৈশবধাত্রী বাবরাবার নিবিড় স্নেহ ও সেবা। ছোটবেলায় এক সন্ধ্যায় একলা ঘরে অন্ধকারে অজানা ভয়ে সে যখন কেঁপেছিল, বাব্‌বাবার স্নেহময় আনন্দময় মুখখানি সে অন্ধকারে জেগে তার সব ভয় দূর ক'রে দিয়েছিল, জীবনের দীর্ঘপথে দুঃখ-হতাশের অন্ধকারে সকল ঝঞ্ঝার মধ্যে বাব্‌বাবার স্নেহদীপ্ত আনন, তার কল্যাণহস্তের স্পর্শ তাকে অভয় দিয়েছে, রক্ষা করেছে। প্রেমের এই সত্যভূমিতে তার জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লে বাহিরের সকল অবিচার, দারিদ্র্য, যুদ্ধ বিপ্লবে সে ভেঙে পড়েনি।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Song and Its Fountains—By A. E (Macmillan)

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ-ই-নামে সুপরিচিত আইরিশ-কবি জর্জ্জ উইলিয়ম রাসেল তাঁর ১৯১৮ সালে প্রকাশিত The Candle of Vision-এর চিন্তাসূত্র ধ'রে এই বইখানি লিখেছেন। সেবার রূপ ও স্ব-রূপের কথা বলেছিলেন, এবার কবিতার সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন-মানসে অন্তর্লোক ও বহির্লোকের নিগূঢ়-সংস্পর্শ-সচকিত চিৎ জীবাত্মার (psyche) সত্তা নিরূপণ করেছেন।

কবিতাকে ওয়ার্ডস্বার্থ্ বলেছেন "Emotion recollected in tranquility"—অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা, তৎপরে অনুভূতি, তা'তে কল্পনার ও কবির ব্যক্তিত্বের রং ফলিয়ে অতঃপর অভিব্যক্তি। আমাদের কবিও তিনটি পর্য্যায়ের উল্লেখ করেছেন। কাব্যস্রষ্টা সাইকির সৃষ্টি-ব্যাপারটা দৈব হ'লেও তা'র প্রথম পর্ব্বে উপলব্ধি, তারপর রূপদান, অবশেষে অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির সময় সাইকির নিখুঁৎ সৃষ্টির খানিকটা নষ্ট হয়, অভিব্যক্তি কখনও বিশুদ্ধ থাকে না। কবির বাণী অমোঘ নয়, কেবল সত্যসন্ধানী। ওয়ার্ডস্বার্থ্‌ও তাঁর Prefaces-এ মোটা রকমের গদ্যে এই কথাই ব'লে কবিকে "প্রফেট"-আখ্যা দিয়েছিলেন, অতএব নূতন কিছুই বলা হ'ল না। কিন্তু সাইকির কথাটা যে একটু অভিনব তা স্বীকার করতেই হবে।

এ-ই সাইকি-বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে তাতে দুইটি ব্যক্তি আছে, একজন জগৎকে উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক, একজন বিরাগী; একজন নায়ক, একজন দর্শক; একজন রসিক, একজন রস। প্রথম ব্যক্তি সমাধিস্থ থাকলেও, দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্লিপ্ত ভাবে সৃষ্টি সমাধান করে।

এ সবই অপ্রত্যাশিত হ'লেও, বোধগম্য। তারপর সৃষ্টি রহস্যের আরও ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এখানে যেন কীট্‌সের প্রতিধ্বনি শুনি। সৃষ্টিকার্য্য গোপনে সাধ্য। কবিতাসৃষ্টিও কবির অগোচরে, অজ্ঞাতসারে সাধিত হওয়া স্বাভাবিক; সেইজন্য কবিতা নৈর্ব্যক্তিক। নিয়ত কর্ম্মশীল সাইকি কেবলমাত্র তা'র দেবদত্ত জ্ঞান,—"pre-natal wisdom", ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। আমাদের কবির প্রথম বয়সের কবিতা এইভাবে উদ্ভূত, পরবর্ত্তী কবিতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। তাঁর অবস্থা অনেকটা ওয়ার্ডস্বার্থের Immortality Ode-এর হতভাগ্য নায়কের মতন। কিন্তু নৈরাশ্যের কারণ নেই, কেননা দেহের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হ'লে সেই সকল দৈবস্বপ্নগুলি সার্থক হ'বে। কবি যেন আশ্বস্ত হ'ন।

প্রথম বয়সে কাব্যরচনার কোনো সজ্ঞান পদ্ধতি তিনি উপলব্ধি করেন নি, গানের পদগুলি যেন আর কেউ রচনা ক'রে তাঁর রসনাগ্রে এনে দিতো। প্রথমবার শ্রোতা, নিজেও একটু চমৎকৃতি অনুভব করেছিলেন। এ যেন ব্রাউনিং-এর Abt Vogler-এর সুরের প্রাসাদের মতো কোন সুগভীর বাজ্যে তৈরী।

রাসেল অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু এই অনুপ্রেরণা কোন ঘটনাজাত নয়, এ যেন প্রকৃতির নীরব নিরীক্ষণে জেগে ওঠার সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি। কীট্‌সের হাইপেরিয়নের নেমসিনির মতন। অ্যাপোলোর কণ্ঠনিঃসৃত কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

"   . What divinity
Makes this alarum in the elements,
While I here idle listen on the shores
In fearless yet in aching ignorance?"

এখনও চেতনা সম্পূর্ণ হয় নি, কাজেই এই অজ্ঞানতা কিন্তু আত্ম-পরিচয় সুরু হয়েছে, সেইজন্যেই ওই বেদনা।

"   .   I can read
A wondrous lesson in thy silent face
Knowledge enormous makes a God of me"

এই অবগতিই হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত প্রাক্তন জ্ঞান।

"Creations and destroyings all at once
Pour into the wide hollows of my brain
And deify me"

আমাদের কবির নিকটেও ঠিক এমনি ক'রে মূক পৃথিবী বাণীময় হ'য়েছে, যা' অজ্ঞাত ছিল তা'কে তিনি জেনেছেন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে এই যে কবির সহসা-দৃষ্ট নির্জ্জনতার সঙ্গিনী, এই অজ্ঞাত সুন্দরী, যা'র কথা কীট্‌স্ এবং রাসেল উভয়েই বল্‌ছেন এ কি কবি-কল্পনার সৃষ্টি, না তা'র উদ্দীপক, অন্তর্লোকের না বহির্লোকের? রাসেল অনুপ্রেরণার স্থান চেতনার অন্তরালে নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে খালাস হয়েছেন। কীট্‌সের নেমসিনি যেন অ্যাপলোর ধাত্রীস্বরূপা, বহির্লোকের নয়, শৈশবকাল থেকে অ্যাপলোর সহবাসিনী, কিন্তু তা'র কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিতা, মাঝে মাঝে সুঘন বিপিনে হেমন্তের শুষ্কপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনিতে অ্যাপলো তা'র আভাসটুকু হয়তো পেয়েছে, কিন্তু সাধারণতঃ সে তা'র স্বপ্ন-লোকের নিত্যসহচরী। শুভ-মুহূর্ত্তে তা'র সঙ্গে কবির পরিচয় হ'ল, অন্তর্লোকবাসিনী সহসা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে এসে দাঁড়াল, কোন নিদারুণ সংঘাতে নয়, স্বভাবগুণে। এখানে কীট্‌স্ ও রাসেল একমত।

রাসেল দার্শনিক ন'ন, তিনি কবি। তাঁ'র ভাষাও তদনুরূপ, স্থানে স্থানে একটু গোলমেলে, কোথায় রূপক শেষ ক'রে গল্প ধরেছেন বলা কঠিন। মূল কথা, যা'কে রূপক বল্‌লাম সেও তাঁর কাছে নিছক সত্য। স্বপ্নকে তিনি অনেকটা প্রাধান্য দিয়েছেন; কবিতাকে বলেছেন স্বপ্নের প্রক্ষেপণ। একস্থানে কোন দার্শনিকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তা'তে তাঁ'র নিজের বক্তব্যটাও সুস্পষ্ট হ'য়ে গেছে—

"We must remember that the mind of man is made in the image of God and therefore even in its wildest speculations it follows an image of truth"

এর থেকে যদি বুঝ্‌তে হয়, যে সকল আকাশকুসুমের মধ্যেই একটা যাথার্থ্য আছে যেহেতু মানবকে ভগবান নিজ মূর্ত্তিতে গঠিত করেছেন, এবং ভগবান সত্যস্বরূপ, তবে আর তর্ক খাটে না, কারণ জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্‌ও তর্ক ক'রে ভগবানকে ঠেকাতে পারেন নি। আমাদের আদ্য পিতা ভগবানই হোন আর বানরই হোন, আপাততঃ উভয়ের কাউকেই আমাদের প্রয়োজন নেই, নইলে তর্কশাস্ত্রবিদ্‌রা আমাদের Petitio Principii-এর অভিযোগে ফেল্‌বেন।

নিদ্রিত অবস্থাব স্বপ্নকে অনেক সুপণ্ডিত বৈদেহ আত্মাব আচবণ ব'লে নির্দ্দেশ কবেছেন, তা'ব মধ্যে নূতন কোন তথ্য নেই। বাসেল আবেকটু অগ্রসব হ'য়ে সিদ্ধান্ত কবেছেন দিবা-স্বপ্নও অতিমাত্রায সত্য। তিনি নিজে স্ফটিক প্রাসাদে পৌবাণিক বাজবাজ্ডাব সাক্ষাৎ পেযে থাকেন, তা'দেব নাম ধামও তাঁব কানে আসে, কিন্তু এব সূত্রপাত ব্যক্তিগত জাগ্রত অভিজ্ঞতায কি না তা তিনি উল্লেখ কবেন নি; এ সকলকেও দৈব ব'লে গ্রহণ কবেছেন, এবং বলেছেন যে, যে কেউ symbolic স্বপ্ন দেখে থাকেন তিনিই গভীব ভাবে চিন্তা কবলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন। দুঃখেব বিষয "symbolic" স্বপ্নেব সংজ্ঞানির্দ্দেশ তিনি কবেন নি।

কোলবিজ্ও স্বপ্ন দেখে কবিতা লিখ্তেন, তাঁব Kubla Khan ও কিয়দংশে The Ancient Mariner স্বপ্ন লব্ধ ব'লে শুনা যায। ডি কুইন্সিব স্বপ্ন-দেখাব কথাও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ সকল কবিদেব স্বপ্ন দেখাব একটা অতি স্থূল কাবণ ছিল। বাসেল অহিফেন-সেবীব কথা বল্ছেন না, তিনি নিজেব অভিজ্ঞতাটাকেই ধ'রে নিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে যাই বলুন, ব্যাপকভাবে তাঁব কথা গ্রাহ্য হ'তে পাবে না।

ওয়ার্ডস্বার্থ্ ব্যাপারটাকে তলিযে দেখে, কেটে ছেঁটে স্পষ্ট গদ্যে কবিতাকে বল্লেন "Emotion recollected in tranquillity"। আবেগ অনুপ্রেবণার উপব নির্ভব কবে, কিন্তু সৃষ্টিব্যাপাবটি কবি ভেবে চিন্তে, বিচাববুদ্ধি খাটিযে, অনেক যাচাই ক'বে তবে সাধন কবেন। বহুকাল পূর্ব্বে একজন সুপ্রসিদ্ধ ক্ল্যাসিক্ সাহিত্যিকও বলেছিলেন কাব্যবচনা শেষ হ'লে পব নয় বৎসব কাল সংশোধনেব নিমিত্ত কাছে বেখে অতঃপর তা প্রকাশ কবা যেতে পাবে। অর্থাৎ সজ্ঞান প্রচেষ্টাব অনেকখানিব প্রযোজন আছে। এ সকল ক্ষেত্রে ঐ স্বপ্ন দেখাব কথাটা টিঁকে না। কিন্তু এ-ই কি সকল প্রকাব কবিতা ও সকল শ্রেণীব কবিব কথা লিখেছেন? এ বিষয় শেষ পর্য্যন্ত একটু গোলযোগ থেকে যায়।

সমালোচনা কবতে গিযে ভুলে গেলে চল্বে না, এ-ই-ব বইখানা দার্শনিক গবেষণাব বইও নয, মনস্তত্ত্বেব বইও নয়; কবি তাঁব নিজেব মিষ্টিক অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধাবণা নিয়েই মুখ্যভাবে আলোচনা কবেছেন, মতপ্রকাশ উদ্দেশ্য নয়। মোটেব উপব বইখানি সুখপাঠ্য, ভাষা সকল স্থানে অতি প্রাঞ্জল না হ'লেও সব সমযেই সুললিত। সাহিত্য-জগতেব কল্যাণার্থে কোন নিগূঢ় নূতন তত্ত্ব আবিষ্কাব তিনি কবেন নি, ঊনবিংশ শতাব্দীব কবিবা যে কথা ব'লে গেছেন, সেই কথাই এই যুগেব ভাষায আবেকবাব ব'লেছেন। নূতন যেটুকু বলেছেন সে তাঁব ব্যক্তিগত কথা, ব্যাপকভাবে প্রযোগ না হ'লে তর্ক কববাব কিছু থাকে না। আগাগোড়া সমস্ত বইখানি সুচিন্তাব পবিচাযক।

শ্রীলীলা বায

From Punishment to Prevention by PRASANTO KUMAR SEN, (Oxford University Press) 10 s net

অনেকে মনে কবেন, এবং যাঁহাবা শুধু যুবোপীয দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আলোচনা কবিযাছেন তাঁহাদেব ত কথাই নাই, যে প্রাচীনকালেব দণ্ডনীতি ও বর্ত্তমানেব দণ্ডবিজ্ঞানেব মধ্যে মূলগত বৈষম্য পবিলক্ষিত হয। আমি এই মতেব প্রতিবাদ কবি। আমাব প্রতিবাদেব

প্রথম কারণ এই যে কার্য্যতঃ দণ্ডবিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তই বর্ত্তমানে গৃহীত হয় নাই, এখনও তাহা অনিশ্চিতের পর্য্যায়ে আছে। যেগুলি গৃহীত হইয়াছে প্রাচীন দণ্ডনীতির সহিত তাহার পার্থক্য কেবলমাত্র আকার ও প্রকার ভেদে। দ্বিতীয় কারণ এই যে কেবল পাশ্চাত্য ইতিহাসেই classical ও positivist বাদের বৈষম্য পাওয়া যায়, প্রাচ্যসভ্যতার প্রাচীন চিত্রে তাহার কোনও ছায়া পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যদেশের classical ও positivist বাদের বৈষম্য এই যে সেখানে প্রাচীনপন্থীরা মানুষের ব্যষ্টিগত শক্তিকে ন্যায়-অন্যায়ের আধার মনে করিতেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে সেই শক্তির পরিচালক বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং অপরাধের মাত্রাই দণ্ডের পরিমাণ স্থির করিত, তদ্ভিন্ন অপর কোনও পক্ষপাত ছিল না; অপর পক্ষে নবপন্থীরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করেন, তাহার জন্মগত বিশেষত্ব ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা অপরাধের মাত্রা বিচার করিতে চান, এবং অপরাধের জন্য শাস্তিদান অপেক্ষা সেই অপরাধ ঘটিবার কারণ কি তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিধেয় মনে করিয়া দণ্ডনীতির মূল উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করিতে চান। এই দুই মতবাদ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাবে করিতে পারিলাম না। ব্যবহারশাস্ত্রাভিজ্ঞ, ময়ূরভঞ্জের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় সম্প্রতি একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে এই দুই মতবাদের সম্পর্ক বিশদভাবে নির্ণীত হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে সমধিক উৎসুক তাঁহাদের এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

বলিতেছিলাম যে প্রাচীনকালের দণ্ডনীতির সহিত বর্ত্তমান দণ্ডবিজ্ঞানের বৈষম্য বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য ইতিহাসেই পাওয়া যায়, প্রাচ্যে তাহার কোনও পরিচয় নাই। এই বিষয়ে প্রশান্তবাবু আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন, এবং বইখানির মধ্যে ইহাই আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করিয়াছে। আজ কেবল দণ্ডনীতির এই দিকটিই আলোচনা করিব, কারণ অন্যান্য অধ্যায়ে প্রশান্তবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয় positivist বাদের অনুকূল সমালোচনা মাত্র, পরিষ্কারভাবে এবং সুন্দর ভাষায় সে-মতের বিভিন্ন নীতির বিশ্লেষণ। প্রথম অধ্যায়টিই এস্থলে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, কিন্তু অন্যান্য অধ্যায়ের বিষয়-বস্তুও লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং জ্ঞানলিপ্সার উদ্রেক করে। সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে প্রথমটি "প্রাচীন দণ্ডনীতির ভাবধারা", দ্বিতীয় "দণ্ডদানের মূল নীতি," তৃতীয় "ব্যবহারশাস্ত্রে দণ্ডনীতি বা উদ্দেশ্যের প্রয়োগ," চতুর্থ "অতীত ও বর্ত্তমানের সম্পর্ক নির্ণয়," পঞ্চম "সংরক্ষণ বনাম দণ্ড," ষষ্ঠ ও সপ্তম "সংরক্ষণ বা দণ্ডনীতির বিধেয়"। গ্রন্থের মুখপত্র লিখিয়াছেন, স্বনামধন্য পণ্ডিত সার্ এভ্লিন্ রাগল্স্-ব্রাইস্।

গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগুলি বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ববিদ্গণের মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। অপরাধীও মানুষ, কেবল মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে সে স্খলিত হইয়াছে, সৎপথে আসিবার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে, এবং সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত সেই শক্তিকে জাগরিত করিতে হইবে, তাহার মনস্তত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং তাহার প্রয়োজনায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিলে আসল গলদের প্রতিকার হইবে না, সমাজ সংরক্ষণের সম্যক্ ব্যবস্থা হইবে না। ইহাই হইল সামাজিক আত্মরক্ষার নূতন নীতি—social defence অথবা ফরাসীভাষায় La defense sociale। এখানে সমাজকে খুব ব্যাপকভাবে ধরা

হইযাছে। অপবাধ ও তাহাব দণ্ড—ইহাব কার্য্যকাবণ নির্ণযে দণ্ডবিজ্ঞানে যে ভাষা ব্যবহাব কবা হয তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রেব ভাষা, অর্থাৎ অপবাধীকে বোগী বলিয়া কল্পনা কবা হয এবং সেই বোগেব নানারূপ চিহ্ন পবিলক্ষণ কবিযা মূল ব্যাধি নির্ণয (diagnosis) কবা হয।* মানুষ সমাজেব অঙ্গ এবং অপবাধী সমাজেব রুগ্ন বা দূষিত অঙ্গ। বোগেব চিকিৎসা প্রযোজন, চিকিৎসায জ্ঞান ও সহানুভূতি চাই। কাবাদণ্ডে দণ্ডিত কবিলে অনেকস্থলেই দেখা যায কৃতকর্ম্মেব জন্য অনুশোচনা কবা দূবে থাকুক, অপবাধীব মন আবও দূষিত হইযা পড়ে, বিশেষ কবিযা যাহাবা অপবিণতবযস্ক তাহাদেব। দণ্ডবিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য, অপবাধেব মূল আহবণ কবিযা তাহাব উচ্ছেদ সাধন কবা। তাহাব জন্য হযত একটা বংশ-উচ্ছেদ পর্য্যন্তও প্রযোজন হইতে পাবে, অবশ্য কালনেমীব পবামর্শ-অনুযাযী নহে, পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি-উচ্ছেদেব প্রণালী-অনুযাযী। দূষিত ব্যক্তিকে সন্তান উৎপাদন কবিতে না দেওযাই এস্থলে বিধেয। ইহাব দ্বাবাই সমাজেব সংবক্ষণ হয।

এইখানেই classical মতেব সহিত পার্থক্য। অপবাধ কবিলে শাস্তি দিব, ইহাই ছিল সে যুগেব মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বেব অনেকগুলি উপাদান ছিল। প্রথমতঃ ছিল শাস্তিব সহিত ভয সংযোজনা। অপবাধীব শাস্তি হইল যাহাতে সে আব সে অপবাধ না কবে এবং অপবেও সে অপবাধ কবিতে প্রযাসী না হয। অপবাধী যাহাতে নিজেব কৃতকর্ম্মেব জন্য অনুতপ্ত হয তাহাও দণ্ডদানেব একটা উদ্দেশ্য ছিল। আব ছিল, প্রতিহিংসাব ভাব। মোসেস্ বিধান দিয়াছিলেন, চোখেব জন্য চোখ, দন্তেব জন্য দন্ত। একজন যদি আব একজনেব চক্ষু অথবা দন্ত উৎপাটন কবিত তখন সেই অপবাধেব শাস্তিস্বরূপ অপবাধীব্যক্তিব চক্ষু বা দন্ত-উৎপাটনেব ব্যবস্থা ছিল। আমবা এখন অতটা যাইনা, কিন্তু প্রাণেব বদলে প্রাণ লই, এবং চক্ষু বা দন্ত (অথবা আব কিছু) হাবাইলে অর্থেব দ্বাবা তাহাব ক্ষতিপূবণ কবি। ইহাই হইল প্রাচীন lex talionis। কেবল প্রাণদণ্ডেব ক্ষেত্রেই যখন নির্জ্জলা lex talionis-এব ব্যবস্থা হইল, তখন মধ্যযুগেব (ঐতিহাসিক হিসাবে) মানুষ যতটা পাবিল প্রাণদণ্ডটাকে বিস্তৃত কবিযা দিল। এই বিস্তৃতি যুবোপেও পাওযা যায়, প্রাচীন ভাবতেও পাওয়া যায়, যদিও উভযেব মধ্যে প্রকাবভেদ আছে। এ বিস্তৃতিকে মোসেস্এব আইনেব বিকৃতি বলিতে পাবি বোধ হয়। অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিকে ভীতিময কবিযা ভবিষ্যৎ অপবাধীকে নিবস্ত কবা। একসময় ছিল যখন ইংলণ্ডে দুইশত অপবাধেব শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। বাজা অষ্টম হেনবিব সমযে কয়েক সহস্র লোক সাধাবণ বিচাবে অনাযাসে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিযাছিল। কিঞ্চিদূর্দ্ধ একশত বৎসব পূর্ব্বে,

---

* প্রশান্তবাবু তাঁহার গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায বলিযাছেন ঃ—

"The defence of society is regarded as the one objective to which criminal legislation and criminal therapy are directed—such defence involving not only the reform or rehabilitation of the members infected by the anti-social germ, but the introduction into society of preventive and hygienic measures to make it secure from the germ's ravages These measures are necessarily negative or destructive as well as positive or constructive"

দোকান হইতে চারি টাকার (পাঁচ শিলিং) দ্রব্য অপহরণ করিলে প্রাণদণ্ড হইত। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে একটি চামচ চুরি করার অপরাধে দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালককে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এখন মাত্র দুইটি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে পারে। অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বাদশটি প্রদেশে, নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক ইতালী প্রমুখ দেশে প্রাণদণ্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অথচ সে সমস্ত দেশের লোকেরা এখনও বাঁচিয়া আছে। বস্তুতঃ শুধু যদি আমরা য়ুরোপকে আলোচনার ক্ষেত্র করি তাহা হইলে সমাজে দুর্নীতি সম্বন্ধে মতবাদের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিব। কিন্তু সমস্ত পরিবর্ত্তনই শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করিয়াছিল, ধীরে ধীরে সজ্যের মন তাহাদের গ্রহণ করিয়াছে। অথচ, ভারতের পৌরাণিক যুগের সহিত যদি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নীতির তুলনা করি তাহা হইলে দেখিব মানবজাতি সমাজনীতির ক্ষেত্রে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপরে classical ও positivist বাদের যে অতিশয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা কেবলমাত্র আমাদের আলোচ্যবিষয়টিকে লঘুবোধ্য করিবার জন্য। ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে, উক্ত দুই মতবাদের কোনও বিভিন্ন অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাই না। অথচ positivist বা neo-classical-দের ভাবধারা যে পাশ্চাত্য দণ্ডনীতির প্রয়োগ ও ব্যবহারে নূতন যুগ আনিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ এই পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মনে করেন ভারতবর্ষেও এই ভাবধারা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে নূতন যুগের প্রতীক হইবে। অবশ্য সংস্কারকার্য্যের সূচনা হইতেছে মাত্র। কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ, কিশোর আসামীদের জন্য বিভিন্ন বিচারপ্রণালী ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ, কারা-পরিচালনার উন্নতিসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন-রূপের সংস্কারকার্য্যের চেষ্টা চলিতেছে। এ কথা বলিলে ভুল হইবে না যে এই সংস্কারের মূলমন্ত্র পাশ্চাত্য আদর্শ। এখনও এদেশে যে দণ্ডনীতি অনুসরণ করা হয় তাহাও পাশ্চাত্যনীতি অবলম্বনে গৃহীত হইয়াছে, প্রধানতঃ classical মতবাদ অনুযায়ী। যাহা সংস্কার হইতেছে তাহা অতি-আধুনিক।

কিন্তু বক্তব্য এই যে যাহাকে আমরা নূতন যুগ বলিয়া আবাহন করিতেছি ভারতের অতি প্রাচীন যুগেই তাহার পরিকল্পনা পাই। প্রতীচ্য যখন মোসেস্-এর নীতির দ্বারা প্রভাবিত, কি তাহারও পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারেরা আধুনিক দণ্ডবিজ্ঞান ও অপরাধতত্ত্বের (criminology ও criminal anthropology) অনেকগুলি সিদ্ধান্তই প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন তাঁহার গ্রন্থে ইহার যথাযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য অথবা কৌটিল্যের যুগেরও পূর্ব্বে মনুসংহিতায় আমরা দণ্ডপ্রয়োগের যে বিধান পাই তাহাতে আধুনিক দণ্ড বিজ্ঞানের পরিকল্পনার আভাস আছে। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্লোকের পর শ্লোক পাওয়া যায় যাহাতে কৃত অপরাধের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে বিশেষ অবধানের সহিত বিচার করা হইয়াছে। বিচার করিতে হইবে "তত্ত্বতঃ" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে। প্রশান্তবাবু মনুর সপ্তম অধ্যায়ের ১২৭ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত শ্লোকের ভাষা ও অর্থ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক

ব্ল্যাকষ্টোনের টীকার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়।* অপরাধের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ করা হইয়াছিল ইহা বলিলেই অপরাধের আপেক্ষিকতা সপ্রমাণ হইবে।

শুধু আপেক্ষিকতা-বিচারে নয়, আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও অতি-আধুনিক দণ্ডবিজ্ঞান বা অপরাধতত্ত্বকে লজ্জা দিয়াছেন। প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে আজকাল অনেক তর্কবিতর্ক শোনা যায়। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ করিলে মনে হয় যেন আমরা পুরাতন শাস্ত্রবচনেরই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মনুর সময়ে বহু অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারিত, কিন্তু তথাপি য়ুরোপের মধ্যযুগের তুলনায় সে সমস্ত অপরাধের তালিকা স্বল্পসংখ্যক ছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের "প্রাচীন ভারতে অপরাধ ও তাহার দণ্ড"† সম্বন্ধে পুস্তকে পাই যে যাজ্ঞবল্ক্য ও কৌটিল্যের যুগে অনধিক পঁচিশটি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারিত, অথচ ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, এমন-কি উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপ অপরাধের সংখ্যা দুইশতেরও অধিক ছিল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পাঁচ শিলিং মূল্যের দ্রব্য অপহরণের নিমিত্ত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নিরাকরণের প্রস্তাব হয়, তখন ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি এলেনবরা খেদোক্তি করিয়াছিলেন যে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে ইংলণ্ডের লোকেরা মাথার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে কি পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা থাকিবে না, সুতরাং ঐরূপ বিপজ্জনক প্রস্তাব কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না।‡ অপরপক্ষে শুক্রনীতিতে আমরা দণ্ডদানে অহিংসানীতির পরিচয় পাই।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আমরা দণ্ডনীতির যে বিশদ ব্যাখ্যা পাই আজিও তাহা বিস্ময়কর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রাণবধ সম্বন্ধে রাজা দ্যুমৎসেন ও পুত্র সত্যবানের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহার চুম্বক না দিয়া থাকিতে পারিলাম না— প্রশান্তবাবু তাঁহার গ্রন্থের একাদশ পৃষ্ঠায় শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। মানুষের প্রাণবধ কখনও ধর্ম্ম হইতে পারেনা—সত্যবানের এই উক্তির উত্তরে যখন দ্যুমৎসেন বলিলেন যে যাহাদের প্রাণবধ করা উচিত তাহাদের যদি উচ্ছেদ না করা যায়, যাহারা অসৎ ও দস্যু তাহাদের যদি হনন না করা হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সকল প্রভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন সত্যবান্ বলিলেন, বধ না করিয়া তত্ত্ব ও শাস্ত্রানুযায়ী

---

* মনুসংহিতায় আছে—

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥

Blackstone বলেন,— "The age, education, and character of the offender, the repetition (or otherwise) of the offence, the time, the place, the company wherein it was committed, all these, and a thousand other incidents may aggravate or extenuate the crime" *Commentaries*, Vol iv, pp 15-16

†Rama Prasad Das Gupta *Crime and Punishment in Ancient India*, pp 168, published by the Book Company, 1930, Rs 5

‡ এলেনবরা বলেন,—

"Your lordships will pause before you assent to a measure pregnant with danger to the security of property My Lords, if we suffer this Bill to pass, we shall not know where we stand, whether we stand upon our heads or upon our feet"

যথাবিধি দণ্ডজ্ঞান হৌক। নীতিজ্ঞান ও অপরাধের প্রকৃতির বিষয়ে সমধিক চিন্তা না করিয়া দণ্ডদান করা উচিত নহে। অসতের প্রাণবধ করিয়া রাজা বহু নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণনাশের পাপলিপ্ত হন। একজন দস্যুকে নিহত করিলে তাহার ভার্য্যা, মাতা, পিতা, পুত্র সকলেই নিহত হয়। এরূপ দেখা যায়, সাধুসমাগমে দুর্জ্জনের ধর্ম্মভাব হয়। অনেক সময়ে অসাধু ব্যক্তি হইতে সৎপুত্রের জন্ম হয়। অতএব অসাধু ব্যক্তির সমূল বিনাশ সনাতন ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য নহে। সত্যবানের এই উক্তি হইতে আমরা তিনটি নীতির পরিচয় পাই—প্রথমতঃ, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলে নিরপরাধ পরিবারবর্গকে শাস্তি দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডিত ব্যক্তির কোনও উদ্ধারের আশা থাকেনা। তৃতীয়তঃ, তাহার সৎপুত্র জন্মের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা হয়। এই যে তিনটি নীতি, ইহাতে আছে পরম সত্যের উপলব্ধি এবং অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য। সুতরাং বলিতে পারি যে, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান প্রাচীন ভারতীয় নীতির ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র, কিন্তু মৌলিক কিছু সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অপরাধী নরের মনস্তত্ব বিশ্লেষণেই হউক অথবা তাহার বংশ নির্ণয়েই হউক, বিজ্ঞান জগৎকে সম্পূর্ণ নূতন সিদ্ধান্ত দিতে পারে নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন শাস্ত্রকারের বর্ণনা হইতে তদানীন্তন সমাজের যে চিত্র পাই তাহা হইতে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শাসন-নীতির যে মূলগত কোনও পার্থক্য আছে তাহা মনে হয় না।

পরিশেষে একটিমাত্র বক্তব্য বলিয়াই শেষ করিব। Social Defence-এর কথা বলিয়াছি। সামাজিক সংরক্ষণ বর্ত্তমান দণ্ডবিজ্ঞান ও দণ্ডনীতির মূলনীতি। এইজন্য সমাজসংস্কারকগণ, অপরাধ হইতে অপরাধীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিধেয় মনে করেন। মানুষ অপরাধ করে কেন, কোনও বিশেষ অপরাধী কেন অপরাধ করিল, তাহাতে সমাজের কোনখান দিয়া ক্ষতি হইল, ইহাই হইল আধুনিক সমাজ-সংস্কারের জিজ্ঞাস্য। ইহারই উত্তরস্বরূপ, অনির্দ্দিষ্ট দণ্ডদান (indeterminate sentence) সর্ত্তবদ্ধ করিয়া দণ্ডমুক্তি (conditional release), সৎপথে থাকিবার শিক্ষানবীশী (probation), দণ্ডমুক্ত কিশোর অপরাধীর জন্য অভিভাবক নিয়োগ (parole), অধঃপতিত নরনারীর জন্য সাধারণ আসামী হইতে বিভিন্ন ব্যবহার (delinquents and degenerates) ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থা-সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্বুদ্ধ হয়। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে এই প্রশ্নটি করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেন। সেই প্রশ্ন ও উত্তর আজ এইখানে আলোচনা করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রশ্নটি এই, social defence নীতি অবলম্বন করায় কি সত্যসত্যই সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতেছে বা হইবার আশা আছে? অতি-আধুনিক বলিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতি আছে। দণ্ডনীতির নূতন প্রণালী, কারা-পরিচালনার নূতন পদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রে যতটা প্রসার লাভ করিয়াছে, অন্যদেশে ততটা হয় নাই। অথচ উক্ত দেশে যেরূপ প্রকাশ্যভাবে আইন অমান্য হয়, এবং দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ আইনভঙ্গকারীদের উপদ্রব যেরূপভাবে প্রতিকারবিহীন হইয়া সহ্য করিতে হয় তাহাতে কি বর্ত্তমান দণ্ডবিজ্ঞান সাফল্যলাভ করিয়াছে বলা যায়? কথাটি উঠিয়াছিল, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের অপহৃত অসহায় শিশুর নৃশংস হত্যার খবর পাওয়া গেল যেদিন সেইদিন। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পুলিশ ও রাজশক্তি আজও পর্য্যন্ত আততায়ীদের সন্ধান পাইল না। শুনিলাম,

যুক্তবাষ্ট্রে বৎসবে দুই সহস্র শিশুপুত্র অর্থেব জন্য অপহৃত হয়। বৎসবেব পব বৎসব এই যে বাজশক্তিব অবমাননা, দেশেব জনসাধাবণেব উপব তাহাব কি বিষময প্রভাব তাহা বলাই বাহুল্য। শিশু অপহবণেব কথা ছাড়িয়া দিলাম, সভ্যতাব শিখবারূঢ প্রত্যেক দেশেই দেশেব গণ্যমান্য যশস্বী লোক যেরূপভাবে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কবিয়া বাজদণ্ডেব হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আসিতেছেন, তাহাতে শুধু মানবপ্রকৃতি নহে সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হইযা পড়িতে হয়। ক্রুগজাব আত্মহত্যা কবিযা বাঁচিলেন, কিন্তু জীবনেব যে কয বৎসব তিনি জনসাধাবণেব অর্থ লইযা ছিনিমিনি খেলিযাছিলেন, বাজদণ্ড তাঁহাব নাগাল পায নাই। এইরূপ কত লোক, ব্যাঙ্ক-ডাইবেক্টব, কোম্পানীব পবিচালক, বাজকর্ম্মচাবী নির্ব্বিবাদে সকৌশলে আইনেব চক্ষে ধূলি দিযা আসিতেছে বর্ত্তমান কালে তাহাব ইযত্তা নাই। অতএব জনসাধাবণ যদি আইনেব প্রতি শ্রদ্ধা হাবায় এবং শ্রদ্ধা হাবাইযা দুর্জ্জনেব সংসর্গকে নিবাপদ ও লাভজনক মনে কবে, অর্থাৎ সমাজেব প্রতিষ্ঠাই যদি হয অবিচাব, অন্যায ও পক্ষপাতিত্বেব উপব, তাহা হইলে দণ্ডবিজ্ঞানেব বড বড নীতিব সার্থকতা কোথায় বহিল ?

বন্ধু বলিলেন, এইখানেই বর্ত্তমান সভ্যতাব বিবাট নিষ্ফলতা। আমাকে মনে মনে যুক্তিব সাববত্তা মানিতেই হইল। প্রশান্তকুমাব সেন মহাশয় ইহাব উত্তব দেন নাই। কিন্তু তাঁহাব বই খুলিযা প্রথম অধ্যাযেই পাইলাম—

দণ্ডো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্যজ্ঞো নাবাযণঃ প্রভুঃ।
শাশ্বদ্রূপং মহদ্বিভ্রন্মহান্ পুরুষ উচ্যতে॥
তথোক্তা ব্রহ্মকন্যেতি লক্ষ্মীর্নীতিঃ সরস্বতী।
দণ্ডনীতির্জগদ্ধাত্রী দণ্ডো হি বহুবিগ্রহঃ॥

—শুক্রনীতি, চতুর্থ অধ্যায।

উত্তব দেন নাই বটে, কিন্তু চক্ষু ফুটিল। দণ্ডেব এই যে বিবাট রূপকল্পনা, যজ্ঞ, বিষ্ণু ও নাবাযণেব সহিত ঐক্যস্থাপনা, প্রাচীন সমাজে ইহাব কি কোনও মূল্য ছিল না ? এইরূপ কল্পনা সামাজিক কল্যাণেব যে কি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কবিযাছিল তাহা সহজেই অনুমেয। আমাদেব পুবাণে তাহাব ছাযা পাই। বন্ধু বলিলেন, কালীযদমন, পবীক্ষীতেব উপাখ্যান, বলী বাজাব উপাখ্যান ন্যাযদণ্ডেব মহিমা কীর্ত্তন কবে। প্রত্যেক স্থলেই দণ্ডিত ব্যক্তি নতমস্তকে দণ্ডগ্রহণ কবিতেছে, নাবাযণ দণ্ড দিতেছেন। এই যে নতমস্তকে দণ্ডিতেব দণ্ডস্বীকাব ইহাব মূলে ছিল জনসাধাবণেব চিত্তেব উপব ন্যাযেব অমোঘ প্রতিষ্ঠা, বাজধর্ম্মেব নিবপেক্ষ বিচাব, সত্যেব ও কল্যাণেব প্রতিষ্ঠা, দণ্ডনীতিব মূল ধাবা। এই ধাবা আজ আমবা হাবাইযাছি। আমাদেব প্রাচীন শাস্ত্রকাবেবা social defence কথাটি ব্যবহাব কবিতেন না বটে কিন্তু ন্যাযেব যে রূপ কল্পনা কবিযাছিলেন, সে কল্পনা যেদিন আবাব ফিবিয়া আসিবে, সেদিন সত্যই কল্যাণেব প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ সেই সত্যভ্রষ্ট হইযা মাযামৃগেব পশ্চাতে ছুটিতেছি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

Rhymes of Darby to Joan—BY H W FOWLER,
(J M Dent & Sons, Ltd)

Selected Poems—BY L A G STRONG, (Hamish Hamilton)

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভেই য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমান্সের যুগ আরম্ভ হয়েছিল। শেলী কীট্সের অরূপ ও অপরূপের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের ব্রাউনিং টেনিসন একটা রূপ জুড়ে দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর নিজস্ব সাহিত্য ও দর্শনকে সম্পূর্ণ করেছিলেন। যুক্তি ও রহস্য এই দুই-এর মধ্যে ব্রাউনিং যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে দিলেন, তা'র একটা সাময়িক ফল হ'ল everyday poetry—যা'কে সোজা বাংলায় আটপৌরে কবিতা বলা যেতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন-রহস্য থেকে কাব্যের উপকরণ আহরণ চল্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কালে নিত্যটুকু বাদ পড়ে নৈমিত্তিকটুকুই রইল বাকি। একশ্রেণীর কবির পরিচয় পাওয়া গেল যা'রা কোন মহাবাণী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি। পোপের তীব্র ভাষা ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার ধার দিয়েও তা'রা যায় না, তা'রা অবসরের কবি, নিছক আনন্দের কবি।

Rhymes of Darby to Joan এই শ্রেণীর বই। কবি তাঁর সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে নানা উপলক্ষ্যে ও অপলক্ষ্যে কাব্যরচনা করেছেন। বিবাহ, জন্মদিন, গৃহ-পরিবর্ত্তন, বাড়ির মালিকের খেদানি, রোগ শোক কোন কিছুই বাদ যায় নি। কবিতার ভাণ্ডার অফুরন্ত, এমন সরস হাস্যরসে আনন্দিত, তারিফ না ক'রে উপায় নেই।

কবিতাগুলির অধিকাংশই মাঝারি শ্রেণীর, নানা উপলক্ষ্যে রচিত হওয়া সত্ত্বেও ভাব-বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। আসল কথা, গোড়াতেই একটু গলদ্ আছে। বিবাহ-রূপ বিভীষিকাটাকে পঞ্চাশ বৎসর কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখে, অবশেষে সহসা এক "লীপ ইয়ারে" এবং তদুপরি ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, সাতচল্লিশ বৎসরের এক সরলা কুমারী লাভ ক'রে তিনি যে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ক'রে ফেল্লেন, তা'র রহস্যটা তাঁকে এমনি চমৎকৃত ক'রে দিয়েছে যে, তিনি জনসাধারণকে সম্বোধন ক'রে বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ দিবসেই তিনি প্রথম বিবাহপ্রস্তাব করেছিলেন, একদিন পূর্ব্বে অথবা পশ্চাতে নয়। পাছে এ বিষয় কোন অসতর্ক অভাজনের মনে ভ্রম থেকে যায় তাই পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা ক'রে দিচ্ছেন যে ২৯শে ফেব্রুয়ারী চার বৎসরে একবারই আসে, এবং ঠিক সেই দিনেই ইত্যাদি।

পুরাতন কথা নূতন ক'রে বলবার কৌশল তাঁর অবিদিত নয়, কিন্তু বারম্বার পুনরুক্তির দরুণ ঐ নূতন ক'রে বলাটার রসের অনেকটা হানি হয়েছে। অবশ্য এ কথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে কবিতাগুলির একটিও সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নি, একটিমাত্র ব্যক্তির কাছে নিবেদিত হয়েছে, সেইজন্য কবি পাঠককে তাঁর confidence-এ নেন নি, স্থানে স্থানে হতভাগ্য পাঠক নিতান্তই তৃতীয় ব্যক্তি হ'য়ে পড়ে। লীপ ইয়ারে লব্ধ গৃহিনীকে ঘন ঘন প্রেমসম্বোধন বৃদ্ধের পক্ষে নিষিদ্ধ ক'রে দিলে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা হবে, তথাপি বেচারা পাব্‌লিকের কথা চিন্তা ক'রে, কাব্য-প্রকাশের পূর্ব্বে প্রত্যেক কবির মনে রাখা উচিত—No private jokes in public।

পরিণত বয়সের বিবাহিত প্রেমের কথা বল্‌তে গেলেই মনে পড়ে ব্রাউনিং দম্পতির কথা, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের কবির তুলনা করা চলে না, তাঁরা হ'লেন

কাব্যজগতেব বনেদী ঘবেব মানুষ, আব ইনি খেলাঘবেব ছড়াবাঁধা কবি। তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁব স্বাভাবিক লঘুতাব পবিবর্ত্তে একটা গাম্ভীর্য্যেব পবিচয পাওয়া যায়। এক স্থানে বিবাহিত জীবনেব কল্পনাতীত মাধুর্য্যেব কথা বলছেন

> "Friends I had had, but never guessed
> With how diverse a spell the wife
> Whose lips so rarely mine had pressed
> Should weave herself into my life"

অতি-আধুনিক কবিদেব চলতি চাকচিক্য ফাউলাবেব বচনাব মধ্যে বর্ত্তমান না থাকলেও, মামুলী কথাব বাঁধা গতে তিনি কদাপি পাঠকেব ধৈর্য্য পবীক্ষা কবেন না। নূতন ক'বে পুবাতন কথা বলতে যে তাঁর বিশেষ প্রযাস কববাব প্রয়োজন হয় না, বিবাহেব সপ্তম সাম্বৎসবিকে লিখিত কবিতাটি তা'র সুন্দব প্রমাণ। তিনি বলছেন প্রেমেব গৃহে তাঁব সাত বৎসবেব লীজ্ ফুবিযেছে, ভাড়া বাড়ালে তাঁব আব দেবাব সামর্থ্য নেই, এবাব বাড়িব মালিক তাঁব হৃদয় শোষণ ক'রে ছাড়বে। বইখানিতে এই কবিতাটিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য। Criss Cross উপাধি-ধাবী কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। দাম্পত্য জীবনেব অষ্টাদশ বৎসব নিববচ্ছিন্ন শান্তিতে কেটেছে, কিন্তু এখন cross-word নিযে দাম্পত্য কলহ। Cross-word শব্দটি নিয়ে একটু কথাব খেলা আছে যা'ব তর্জ্জমা চলে না। এই ধবণেব আরও বহু কবিতা আছে। বইখানি প'ড়ে আনন্দলাভ হয়, এবং সেইখানেই সকল কবিব চবম সার্থকতা, তিনি মহাকাব্যই লিখুন, আব ছড়াই কাটুন।

এ ত গেল আটপৌবে কবিদেব কথা। Celtic Revival-এব কবিবা বিপরীত জাতীয়। তাবা ম্যাক্‌ফার্সনেব অলীক কাব্যেব ধাবা বেয়ে অতিবিক্ত মিষ্টিসিজ্‌ম্-এব দিকে চলে গেলেন, কিন্তু সে মিষ্টিসিজ্‌ম্ অদর্শনকে নিযে নয, অরূপকে নিয়ে। L. A. G. Strong-এব কবিতার সঙ্কলনখানি পড়ে এই অরূপবিলাসীদেব কথা মনে পড়ে। এঁদেব দৃষ্টিব মতন তাঁব দৃষ্টিতেও একটা নেশা লেগেছে; আটপৌবে কবিদেব মতন মানুষেব দৈনন্দিন জীবন নিত্যকার সুপবিচিত সংসাবেব দৃশ্য থেকে তাঁব উপকবণ জুগিয়েছে, কিন্তু তিনি তা'ব থেকে অত্যাশ্চর্য্যেব গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কাব কবেছেন। এবং অত্যাশ্চর্য্যেব নিত্য অনুচব ভীতিবও একটা আভাস দিযেছেন।

কবিতাগুলিব অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্রকায; নানান্ বকম মানুষেব বর্ণনা, কোন মানুষই সাধাবণ মানুষ নয, অথচ তেমন মানুষ সকলেই নিত্য দেখ্‌ছে। আধুনিক ছোট গল্পেব মতন সাধাবণেব অসাধাবণত্বটুকু সুপবিস্ফুট হয়েছে। ব্যক্তিগুলি যেন তা'দেব genus-কে অতিক্রম ক'বে গেছে। অথচ সামান্য বিষয় নিয়ে কবিতা, পশ্চিমেব ডুবন্ত মেঘ, পাহাড়েব গাত্রবাহী অনাবৃত পথ, বক্রদেহ ওক্ গাছ, পথের ধাবে উন্মাদিনী, চৌমাথায বুড়ো ঝাড়ুদাব, আগুনেব ধাবে মাতাপুত্রীব কথোপকথন। সবই পবিচিত কিন্তু সবই অপরূপ। বিববণে খুঁটিনাটি বাদ পড়ে নি, অথচ কবিতাগুলি বাহুল্যবিবর্জ্জিত। বলপূর্ব্বক সুন্দবেব মোহ ভাঙ্গবাব কোন চেষ্টা হয় নি, ববং সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্ একটু বেশিই।

প্রশংসা কববাব অনেক আছে, তথাপি বইখানিকে একেবাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দব বলা চলে না। ইয়েট্‌স্ অথবা ব্রীজেস্-এব সঙ্গে তুলনা কবলেই অত্যুক্তি কববাব

প্রবৃত্তি অপসারিত হয়। কোন বিষম ত্রুটি চোখে পড়ে না, কিন্তু কবির যে কোন এক স্থানে একটা দুর্ব্বলতা আছে সেটা আর গোপন থাকে না। ব্রীজেস্ যে-জিনিষটাকে রক্তমাংসে গ'ড়ে তুলতে পারতেন, এঁর লেখনী থেকে সেটা জোলো হ'য়ে নিঃসৃত হয়। তবু স্থানে স্থানে সেই যাদুর একটু আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য By the Fireside-শীর্ষক কবিতাটি, উদাহরণার্থে কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম।

> " Mother when my baby stirred
> Deep within me
> Fluttered like a bird ,
> Then although I dearly love him
> I felt far above George,
> Far above him "

স্বল্প কয়েকটি কথায় নারীর জীবনের সৃষ্টির গরিমা সুস্পষ্টভাবে ও সহজে ব্যক্ত হ'য়ে গেল। "The Green-grocer's Daughter"-এ এই শক্তি নেই, কিন্তু সুপাঠ্য।

বইখানির কতকগুলি বিভাগ করা হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে বোধগম্য হ'ল না। একটু cross-division-ও হয়েছে। নহিলে বেশ সুবিন্যস্ত সংস্করণ।

শ্রীলীলা রায়

Essays in Persuasion—JOHN MAYNARD KEYNES,
(Macmillan & Co , Ltd), 10s 6d

কেন্‌স্ সাহেব তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন যে, তাঁর এই বইখানার নাম Essays in Persuasion না হ'য়ে Essays in Prophecy and Persuasion হ'লেই মানাত; কারণ অনুনয়ে বিশেষ কাজ হয়নি, গণনাটা কিন্তু হাড়ে হাড়ে ফলেছে। অবশ্য সব গণনা ফলবার সময় এখনও আসে নি। "ততঃ কিম্" নাম দিয়ে তিনি যে শেষ অধ্যায়টা লিখেছেন, তাতে আমাদের নাতিদের জীবনযাত্রার কথা আছে। সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী একশ বছর পরে মেলানো যাবে। কিন্তু (The Treaty of Peace) সন্ধির সর্ত্ত, (Inflation and Deflation) টাকার হ্রাস বৃদ্ধি এবং (The Return to the Gold Standard) স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন, প্রথম এই তিন খণ্ডে তিনি যে সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন তার অনেকগুলিই আশ্চর্য্য ভাবে ফলছে। অবশ্য না মিল্‌লেই ছিল ভালো, কারণ তিনি Cassandra-র মত (এ তাঁর নিজেরই কথা) কেবল অশুভই বলেছিলেন আর অশুভই ঘটেছে।

আর একটা বিষয়েও বইখানা আমাদের কম বিস্মিত করে না। গত দশ-বারো বৎসর ধ'রে অর্থনৈতিক জগতে একটা প্রচণ্ড ওলটপালট চলেছে। দুঃসহ ব্যথার ভারে পৃথিবী আজ ম্রিয়মাণ। কেউ বলছেন যে স্থবির ধরিত্রী বাতে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে। আবার কেউবা বলছেন এই ব্যথার ফলেই সে নূতন প্রাণ লাভ করবে। এর একটাই মিথ্যা হোক আর দুটোই মিথ্যা হোক, তবু এটা মানতেই হ'বে যে পুরোনো জগৎ ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। এই রকম প্রচণ্ড

পরিবর্ত্তনের যুগে এই রকম প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের বিষয়ে লেখা সহজ নয়। আবার সেই যুগের নানা সময়ে নানা অবস্থার মধ্যে লেখাগুলোকে কিছুমাত্র না বদলিয়ে একসঙ্গে ক'রে পাঠকদের কাছে ধরাও কম সাহসের,—কম যোগ্যতার কথা নয়। কেন্‌স্ (Keynes) ছাড়া এই অসাধ্য সাধনের সাহস আর কার থাকতে পারে?

১৯১৯ সালে সন্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল (the Economic Consequences of Peace) ব'লে বইখানি যখন তিনি লেখেন তখনকার অবস্থা আর আজকার অবস্থা এক নয়। "কাইজারকে ঝুলিয়ে দাও, জার্ম্মানীর কাছে কড়ায় গণ্ডায় আদায় কর"—এই সব চীৎকারে জগৎ তখন মুখরিত। আর আজ?—কিন্তু সেইকালেই কেন্‌স্ সাহেবের কলমে সন্ধির সময়কার প্যারিসের যে ছবিটা ফুটেছে সেটা পাঠকদের উপহার না দিয়ে থাকতে পারছি না।

Paris was a nightmare, and everyone there was morbid A sense of impending catastrophe overhung the frivolous scene, the futility and smallness of man before the great events, confronting him, the mingled significance and unreality of the decisions, levity, blindness, insolence, confused cries from without,—all the elements of ancient tragedy were there (pp 5—6)

যুদ্ধের ঋণের কথা বলতে গিয়ে কেন্‌স্ এক জায়গায় দেখিয়েছেন যে, জার্ম্মানীর কাছ থেকে ফ্রান্স যা আদায় করতে পারবে তা'তে যুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রদেশটারও ক্ষতিপূরণ হ'বে না। কিন্তু অন্য দেশের যে ঋণ ফ্রান্সকে শোধ দিতে হ'বে সে ঋণ ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের চারগুণেরও বেশী।

The hand of Bismarck was light compared with that of an Ally or of an Associate (p 35)

এই রকম আরও কত কি অদ্ভুত ব্যাপারের বিশ্লেষণ ক'রে তিনি বুঝিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক ঋণ মুছে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

A general bonfire is so great a necessity that unless we make of it an orderly and good-tempered affair in which no serious injustice is done to any one, it will, when it comes at last, grow into a conflagration that destroy much as well

কি আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি। কিন্তু তবু বলি বইটার নাম Essays in Persuation-ই হওয়া উচিত, কারণ কেন্‌স্ সাহেবের মতে—

The events of the coming year [1920] will not be shaped by the deliberate acts of statesmen, but by the hidden currents, flowing continually beneath the surface of political history, of which no one can predict the outcome In one way only can we influence those hidden currents, by setting in motion those forces of instruction and imagination which change opinion (p 45)

জনমত সম্বন্ধে কেন্‌স্ একটা মজার কথা বলেছেন—

It is the method of modern statesmen to talk as much folly as the public demand and to practise no more of it than is compatible with what they have said, trusting that such folly in action as must wait on folly in word will soon disclose itself as such, and furnish an opportunity for slipping back into wisdom,—the Montessori system for the child, the public (p 46)

এর ফল এই দাঁড়ায় যে, রাজনৈতিকদের গর্জ্জন যত বর্ষণ তত নয়। সন্ধির সর্ত্তের বহ্বারম্ভের লঘুক্রিয়া হচ্ছে।—এই যা রক্ষা।

তার পর টাকার হ্রাসবৃদ্ধির কথা। "টাকা" কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে,—যাতে কেনা-বেচা চলছে তাই টাকা, অর্থাৎ টাকা টাকা, নোট টাকা, পাউণ্ড টাকা, ডলার টাকা, মার্ক টাকা ইত্যাদি। টাকা দিয়ে সব সময়ে সমান জিনিষ পাওয়া যায় না—এই হচ্ছে অর্থনীতির একটা মস্ত বড় সমস্যা। আমি তিন বছর আগে একশ টাকা ধার করেছিলাম এবং তা দিয়ে ত্রিশ মণ ধান কিনে খেয়েছিলাম। ঐ ঋণ আজ যদি আমার ক্ষেতের ধান থেকে শোধ দিতে হয় তবে আশি মণ ধান না বেচ্‌লে আসলই শোধ হবে না,—সুদের ত কথাই নেই। তিনবছর আগের একশ টাকায় যত জিনিষ পাওয়া যেত এখনকার একশ টাকায় তার ডবলেরও বেশী জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে। এমন অবস্থায় মহাজনের পৌষমাস, খাতকের সর্ব্বনাশ,—অবশ্য যদি খাতক তার ঋণ শোধ করে। যুদ্ধের পরে যখন জিনিষ-পত্রের দাম বেড়েছিল অর্থাৎ সমান টাকা দিয়ে কম জিনিষ পাওয়া যাচ্ছিল তখন এর ঠিক উল্টোটা হয়েছিল। কেবল মহাজন খাতকের কথা কেন, টাকার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অনেকেরই অবস্থার বিপর্য্যয় হয়। জিনিষ-পত্রের দাম বাড়্‌লে পূর্ব্বের সস্তা দামের কেনা জিনিষ চড়া দামে বিক্রী ক'রে ব্যবসায়ীরা লাভ ক'রে থাকে এটা ত সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তারা যে ঋণ ক'রে ব্যবসা চালাচ্ছে সেই ঋণের বোঝা হালকা হ'য়ে গিয়ে লাভে দাঁড়ায়, এটা হয়ত এত সহজে বোঝা যায় না। তেমনি যারা উৎপাদক—তা কৃষকই হোক বা শ্রমশিল্পীই হোক—তাদের খরচা প্রায় আগের মতই থাকে অথচ তারা জিনিষ বেচে বেশী টাকা পায়, এবং তাদের ঋণের ভারও লাঘব হয়, এবং খাজনা প্রভৃতি নামে সমান থাকলেও বাস্তবিক কমে যায়—অর্থাৎ কম জিনিষ বেচেই এখন আগেকার সমান খাজনা দেওয়া চলে। এই রকম আরও অনেক উদাহরণ কেন্‌স্ সাহেব্ দিয়াছেন।

টাকার দাম বাড়ে কমে কেন? এ বিষয়ে কেন্‌স্ সাহেব এক নতুন মতবাদ করেছেন। ঠিক নতুন বলা যায় না, কারণ ইউরোপে এই রকমের কথাবার্ত্তা অনেক দিন আগে থেকেই চলছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে নতুন বটে। সব রকম গোলমালের কথা বাদ দিয়ে সোজাসুজি এই ভাবে কেন্‌স্ সাহেবের মত বলা চলে। যদি সমস্ত পৃথিবীটাকে একসঙ্গে ভাবা যায়, কিংবা যদি এমন কোনও দেশের কথা ভাবা যায়, যে দেশের সঙ্গে অন্য দেশের টাকার বা জিনিষের লেন-দেন নাই, তাহ'লে বলা যায়, সে দেশের লোকেদের মোট আয় যা', সেই দেশের উৎপন্ন জিনিষের খরচাও তাই। কারণ একজনের খরচা অন্য লোকের আয়। মোট আয় আর মোট উৎপাদন-খরচা দুইই সমান। অবশ্য "জিনিষ" কথাটা এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। দিনমজুরী, অধ্যাপনা, ডাক্তারি,—এ সকলই "জিনিষ", কারণ এদেরও কেনা-বেচা চলে। যে আয় হয়েছে তার অনেকটাই গেল খরচ হ'য়ে—তেল, নুন, লকড়ির দাম দিতে, আর বাকিটা জমানো হলো। এখন যদি জিনিষের উৎপাদন আগেকার সমানই থাকে, কিন্তু জমানো বেশী হয়, অর্থাৎ জিনিষের উৎপাদনের খরচা সমানই থাকে কিন্তু সেগুলি কেনার জন্য কম টাকা দেওয়া হয় তবে জিনিষ-পত্রের দাম কমে উৎপাদকের লোক্‌সান আরম্ভ হয়। এবং উৎপাদন কমে গিয়ে—শুধু

উৎপাদন কেন—বেচা-কেনা, ধারকর্জ্জ, কাজকর্ম্ম সবেতেই মন্দা পড়ে। কিন্তু যদি জমান টাকা খাটানো যায়, অর্থাৎ টাকা মাটির নীচে বা ব্যাঙ্কে না ফেলে রেখে তাই দিয়ে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কেনা যায়, তবে তেল নুন লকড়ি কেনার জন্যে কম খরচ হ'বে বটে কিন্তু নতুন নতুন কলকারখানা, রাস্তাঘাট, পুল, রেললাইন প্রভৃতি কেনা হ'বে, এবং ব্যবহারের জিনিষের বদলে মূলধনের জিনিষ তৈরী হ'বে। তাহ'লে অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়্‌বে না। এইজন্যেই কেন্‌স্ সাহেব বার বার বলছেন শুধু জমানোতে কল্যাণ নেই। জমানো টাকা যখন খাটান যায় তখন দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

"স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন" খণ্ডে ১৯২৩ হ'তে ১৯৩০ পর্য্যন্ত নানা সময়ের কথা আছে। প্রথম অধ্যায়টির নাম "Aura sacra fames" "সোনাতে সর্ব্বনেশে প্রীতি"। কেন্‌স্ সাহেব দেখিয়েছেন যে, এক তোলা সোনা দিয়ে কোনও সময়ে বেশী জিনিষ কোনও সময়ে কম জিনিষ পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে আরও বেশী তারতম্য হ'ত যদি না সোনার ঘাট্‌তির সময়ে রূপো চালান হ'ত এবং নতুন স্বর্ণখনির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ না করত। যোগানের সঙ্গে চাহিদার সামঞ্জস্য করবার এত চেষ্টা সত্ত্বেও এখন স্বর্ণমান অনেক দেশেই অচল। পৃথিবীর সব দেশের (Central Bank) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের নোট ও আমানতি টাকার পরিশোধের জন্য কি পরিমাণ সোনা জমা রাখ্‌তে হ'বে এইটী পরস্পরে আলোচনা ক'রে ঠিক ক'রে যদি সোনার চাহিদার পরিমাণ জোগানের চেয়ে কম না রাখে তবে স্বর্ণমান চলতে পারেনা।

> Thus gold, originally stationed in heaven with his consort silver as Sun and Moon, having first doffed his sacred attributes and come to earth as an autocrat, may next descend to the sober status of a constitutional king with a Cabinet o Banks, and it may never be necessary to proclaim a Republic. But this is not yet—the evolution may be quite otherwise The friends of gold will have to be extremely wise and moderate if they are to avoid a Revolution (p 185)

এটী নিছক সত্য কথা। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতায় হবে না। হয় আন্তর্জাতিক ঋণের বিলোপ চাই, নতুবা জিনিষ দিয়ে ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত চাই। শুল্ক বসিয়ে খাতক দেশে জিনিষের আমদানী বন্ধ ক'রে কেবল সোনা আনিয়ে আনিয়ে জমা করলে চল্‌বে না। মোট কথা, এই বিদেশের সঙ্গে স্বদেশের সমস্ত লেন-দেনের ফলে বিদেশের যা' পাওনা (বা দেনা হবে) সেই পরিমাণ বিদেশকে ধার দিতে (কিংবা বিদেশের কাছ থেকে ধার নিতে) হ'বে। অর্থাৎ কিনা সোনার চলাচল যথাসম্ভব কম করতে হ'বে। নতুবা স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হ'বে না। এত কথা অবশ্য কেন্‌স্ সাহেব এখানে বলেন নি। কতক কতক অন্যত্র বলেছেন। কিন্তু এখানে না ব'লে ভালোই করেছেন, কারণ এই খণ্ডটীতে এবং আগের খণ্ডটীতে যথেষ্ট কঠিন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু লেখকের প্রসাদগুণ এমনি অনন্যসাধারণ এবং তাঁর শব্দবিন্যাস এমনই মনোহর যে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করবেই।

চতুর্থ খণ্ডের বিষয় রাজনীতি। প্রথমেই রাশিয়ার কথা। কেন্‌স্ সাহেবের মতে Lenin is a Mahomet, not a Bismarck (p. 298)। ধর্ম্ম Communism-এর মুখোশ মাত্র নয়, ধর্ম্ম Communism-এর প্রাণ। এই কথাটী

মনে রাখ্‌লে Communism-এর ভালোমন্দ দুইই বোঝা যাবে। কেন্‌স্‌ সাহেবের মতে—

Here—one feels at moments—in spite of poverty, stupidity and oppression, is the Laboratory of life Here the chemicals are being mixed in new combinations, and stink and explode (p 311)

আবার বলেছেন—

"Russia will never matter seriously to the rest of us unless it be as a moral force" (p 311)

এটা ১৯২৫ সালের, Five Year Plan-এর আগেকার কথা। কিন্তু কথাটা এখনও সত্যি।

কেন্‌স্‌ সাহেব Liberal। উদারপন্থী এই দলের প্রোগ্রাম fighting programme নয়। কিন্তু এতে অনেক বিষয়ের অবতারণা আছে; যেগুলি সাধারণত কোনো প্রোগ্রামেই ঠাঁই পায় না, যেমন যৌনসমস্যা। কেন্‌স্‌ সাহেবের মতে—

The very crude beginnings represented by the Suffrage Movement were only symptoms of deeper and more important issues below the surface Birth Control and the use of Contraceptives, Marriage Laws, the treatment of sexual offences and abnormalities, the economic position of women, the economic position of the family,—in all these matters the existing state of the Law and of orthodoxy is still mediæval (p 332)

Economic Questions সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেন্‌স্‌ দেখিয়েছেন যে, মানবের ইতিহাসে তিনটী পর্য্যায় আছে। প্রথম যুগ অভাবের যুগ; তখন মানুষের মনুষ্যত্ব অস্বীকার ক'রে তাকে ক্রীতদাস ক'রে অভাব মেটাবার চেষ্টা চলেছে। পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগের সঙ্গে সঙ্গেই এর অবসান হয়েছিল, আমাদের দেশে সে মনোভাব এখনো বর্ত্তমান। এর পরের যুগ প্রাচুর্য্যের যুগ, এ সময়ে Laissez Faire-এর অব্যাহত গতি, গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কিছু তখন মানুষের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না। এটাও অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের সম্বন্ধেই খাটে। সেখানে আরও এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে Stabilisation-এর যুগ। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে জবাই করতে কারুরই আপত্তি নাই, তা সে ফাসিজ্‌মই হোক আর বল্‌শেভিজ্‌মই হোক। গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের ও পার্লামেণ্টের হাতে আর সমস্ত ব্যবস্থা ফেলে রাখ্‌লে চলবে না। অনেক কাজ হস্তান্তরিত করতে হবে।

Our task must be to decentralise and devolve wherever we can, and in particular to establish semi-independent corporations and organs of government, new and old, without, however, impairing the democratic principle or the ultimate sovereignty of Parliament (p 331)

শেষ অধ্যায় (The Future) 'ততঃ কিম্‌'-এর কথা গোড়াতেই বলেছি। প্রথমটা H. G. Wells-এর The World of William Clissold-এর সমালোচনা। এই বইখানার তিন খণ্ডের তিনবার সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও কেন্‌স্‌ সাহেব আর একবার সমালোচনা করেছেন। তার কারণ আর কিছুই নয়, এই বইটাতে বর্ত্তমান যুগের সব চেয়ে বড় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। Clissold-এর কথাতেই বলি ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

" Before the creative Brahma can get to work Siva, in other words, the passionate destructiveness of Labour awakening to its now needless limitations and privations may make Brahma's task impossible " (p 355)

অবশ্য H. G. Wells-এর এই বিরাট উপন্যাস প'ড়ে হয়ত কাব্য-রসিকেরা বলবেন এটা কি জ্যামিতির উপপাদ্য প্রমাণ করা হচ্ছে? এতে Art কই? কেন্সের নীচের কথাগুলি তাঁদের ভেবে দেখ্‌তে অনুরোধ করি—

Though we talk about pure art as never before, this is not a good age for pure artists, nor is it a good one for classical perfections Our most pregnant writers to-day are full of imperfections, they expose themselves to judgment, they do not look to be immortal For these reasons, perhaps, we, their contemporaries, we do them and the debt we owe them less than justice " (p. 357)

শেষের অধ্যায়টীর নাম Economic possibilities for our grand children। এতে কেন্‌স্‌ সাহেব দেখিয়েছেন যে, জগতের সত্যিকারের আবিষ্কারগুলি যেমন ভাষা, আগুন, কৃষি, পশু পালন, ও ধাতুর ব্যবহার—এমন কি রাজনীতি, ব্যাঙ্কিং, গণিত, জ্যোতিষ-বিদ্যা, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ- থেকেই চ'লে আসছে। তবু বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা মধ্যযুগের জীবনযাত্রা হ'তে কত বিভিন্ন,—যদিও আমাদের দেশ এখনও মধ্যযুগেই আছে ধরতে হ'বে। এর দুটী কারণ,—প্রথমতঃ technical inventions এবং দ্বিতীয়তঃ accumulation of Capital।

বর্ত্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, এ দুটীর ক্রিয়া চলছে এবং চলবে। একশত বৎসরের মধ্যেই জগতের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটবে। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড়ের চেষ্টাতেই মানুষের সব শক্তি সব সময় নিযোজিত হয়েছে। তখন সে সবের ভাবনা থাকবে না, এটা কল্পনা করাও মুস্কিল, অন্ততঃ আমাদের দেশের পক্ষে। এর ফল ভাল হ'বে, না মন্দ হ'বে? সোজাসুজি উত্তর দেওয়া শক্ত। সভ্যদেশের ধনী-গৃহিণীদের স্নায়ুর ব্যারামের কথা এ সময়ে মনে করা দরকার। তবে এটা বলা যায় ইকনমিক্‌স্‌-এর চেয়ে আর্টের চর্চ্চাই তখন বেশী কাজের হ'বে। তখনই হয়ত ধর্ম্ম তার সত্যিকার স্থান পাবে। আমাদের নিজেদের দেশের কথা ভাবলে মন কিন্তু নৈরাশ্যে ভ'রে ওঠে। কেবলই মনে পড়ে "দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ।"

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

কাব্যপরিমিতি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন (রসচক্র)।

অদ্ভুত বই, অদ্ভুত লেখকের রচনা। যতীনবাবুর মধ্যে দুটী বিরুদ্ধ বস্তুর সমাবেশ আছে—কবিত্ব আর ইঞ্জিনিয়ারি, কিন্তু বিরোধ দোষ না হ'যে, 'বিরোধাভাস' অলঙ্কার হ'যেই আছে। 'কাব্যপরিমিতি'র উদ্দেশ্য কাব্যের জাতিভেদ তথা রস-বিচার; কিন্তু তা'র পথনির্দ্দেশ হয়েছে পরিমিতির রেখাঙ্কনে।

বইখানির পাঁচটী অধ্যায় এবং অধ্যায়গুলির নামকরণ 'পরিমিতি'রই পরিভাষায়—(১) সূত্র, (২) অঙ্কন, (৩) সিদ্ধান্ত, (৪) দৃষ্টান্ত আর (৫) অনুশীলনী।

একখানি ellipse-জাতীয় চিত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার যা' বোঝাতে চেয়েছেন, তা'র মর্ম্ম হচ্ছে এই—

কবি আর পাঠক দু'জনেরি চিত্তধারা যাত্রা সুরু করে বস্তুজগৎ থেকে। এই বস্তুজগতের পরের ষ্টেশন্ ভাবলোক। ভাবলোকের ছ'টী Sub-লোক—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় আর শম। [এরা A Priori—Kant-এর ভাষায় এদের Forms বলা যেতে পারে।] বস্তুজগৎ থেকে Sense-Perception-রূপে যা'রা মনের ভিতর ঢোকে, ভাবের ছাঁচে প'ড়ে তা'রাই স্মৃতিতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। এই ভাবস্মৃতির জগৎখানির নাম বাসনালোক। বাসনা-লোক থেকে কবি পৌছোন কল্পনালোকে আর পাঠক কাব্যে। কল্পনামায়াবিনী জাদু-মন্ত্রে রসলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়, অমনি কবিচিত্ত ওই লোকে প্রবেশ ক'রে রসায়িত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ওইখানেই তার শেষ নয়। রসোত্তীর্ণ কবিচিত্ত ঝ'রে পড়ে কাব্যে, মানুষের উপভোগ্য হওয়ার জন্য—কাব্যের সার্থকতাই এইখানে। পাঠক কাব্য থেকে উত্তীর্ণ হন রসলোকে। আর Critic যিনি, তিনি রসলোক থেকে কবিচিত্তধারার উজানপথে কল্পনা-বাসনা-ভাবলোকের ভিতর দিয়ে ফিরে আসেন আপন ক্ষেত্রে অর্থাৎ বস্তুজগতে, কবিচিত্তধারার অখণ্ড পরিচয় পে'তে। বলা-বাহুল্য দুই চিত্তধারা বিপরীতমুখী—মিলন সম্ভব হয়, পথ বৃত্তাভাস ব'লে। কবি কাব্যরচনা করেন প্রতিভার প্রেরণায়, যে-শক্তিতে ধরিত্রী তার মাটির রসকে গোলাপে গন্ধায়িত করে তেম্‌নি একটা অচিন্ত্য শক্তির বলে। অরূপ-রসায়িত চিত্তখানি যখন কাব্যে রূপপরিগ্রহ করতে চায়, তখনি আসে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি। কাব্যে শব্দ হচ্ছে কঙ্কাল, ছন্দ অবয়ব, অলঙ্কার ভূষণ, বাচ্যার্থ মন, ব্যঞ্জনা বুদ্ধি আর রস আত্মা।

কিন্তু, এ হ'ল শ্রেষ্ঠ কাব্যের কথা। নীচের থাকের পাঠক নীচুদরের কাব্য থেকে আনন্দ পান; যতীনবাবু এ জাতীয় আনন্দের নাম দিয়েছেন 'বিলাস'। কবিচিত্ত তথা পাঠকচিত্তের মিলনে চারটী 'অয়নচক্র' হয়; সেগুলিকে সাজানো হয়েছে এইভাবে—

১। ভাবসমুথকাব্য + ভাবমুখী চিত্ত = ভাববিলাস }
২। বাসনাসমুথকাব্য + বাসনামুখী চিত্ত = বাসনাবিলাস } —বিলাসচক্র (২)।
৩। কল্পনাসমুথকাব্য + কল্পনামুখী চিত্ত = কল্পনানন্দ—আনন্দচক্র।
৪। রসোত্তীর্ণকাব্য + রসোন্মুখী চিত্ত = রস—রসচক্র।

এদের ভিতরে-ভিতরে, বিশেষ ক'রে আনন্দচক্র আর রসচক্রের মধ্যে, অনেক মিশ্র চক্র আছে। এ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কবি নিম্নশ্রেণীর কাব্য কেন লেখেন, উচ্চ শ্রেণীর পাঠক নিম্নশ্রেণীর কবিতা থেকেও আনন্দ পান কেন, mystic কাব্যের স্বরূপ কি, কাব্যে তত্ত্বের স্থান আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। মোটের ওপর এই হ'ল বইখানির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু।

'কাব্যপরিমিতি'র আবির্ভাব এদেশেরই কাব্যবিচারপন্থার অনুসরণ-সূত্রে; পাশ্চাত্য মতবাদের ছায়াও এতে আছে ব'লে মনে করি না। দেশী হ'লেও 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব' যতীনবাবুর গতি নয়। তিনি নিজে কবি এবং রসগ্রাহী; পূর্ব্বসূরির ইঙ্গিত তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং উপলব্ধির রসায়নে অভিনব রূপে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

•

'ভাব'—বা নিখুঁত পাবিভাষিক ভাষায 'স্থাযিভাব'—'বিভাব', 'অনুভাব' ইত্যাদিব বলে, একেবাবে বসে উত্তীর্ণ হচ্ছে, সে-কালেব বসবিদ্‌দেব প্রায সকলেবি এই মত। "সংস্কাবাত্মনা চিবকালস্থাযিত্বাৎ যাবৎ বসপ্রতীতিকালম্ অনুসন্ধানাচ্চ স্থায়িত্বম্," "বাসনারূপতযা স্থিতান্ বত্যাদীন্ স্থাযিনো বিভাবয়ন্তি বসাস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতাং নয়ন্তি ইতি বিভাবাঃ"—এই হ'ল 'প্রভা' আব 'কাব্যপ্রদীপ'-এব মত। 'সাহিত্যদর্পণে'ও তাই,—"আলম্বনং নাযকাদিস্তমালম্ব্য বসোদ্‌গমাৎ।·· ···উদ্দীপনবিভাবাস্তে বসমুদ্দী-পযন্তিযে।·· " 'দশরূপ'-এও দেখ্‌ছি—"বিভাবৈবনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচাবিভিঃ। অনীযমানঃ স্বাদ্যত্বং স্থায়ী ভাবো বসঃ স্মৃতঃ।" এমন-কি নাট্যশাস্ত্রকাব ভবতমুনিও বলেছেন,—"বিভাবানুভাবব্যভিচাবিসংযোগাদ্ বসনিষ্পত্তিঃ।" প্রাচীনদেব মতে তাহ'লে পাচ্ছি যে "বতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা। জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেব · "—এই আটটী স্থাযিভাব, বিভাব, অনুভাব ইত্যাদিব যোগে, যথাক্রমে "শৃঙ্গাবো হাস্যকরুণাবৌদ্রবীবভযানকাঃ। বীভৎসমদ্ভুত "—এই আটটী বসে পবিণতি লাভ কবে। মতান্তবে 'নির্ব্বেদ' ব'লে একটী স্থাযিভাব আছে; তাব থেকে ওই একই বীতিতে 'শান্ত'-বসেব জন্ম হয়। মোটেব ওপব বস ছাডা কাব্য হয না—"বাক্যং-বসাত্মকং কাব্যম্" এবং কাব্যে বিচাব হবে শব্দ, অর্থ বা বসেব ভালো মন্দ নিয়ে।

এইখানে প্রাচীনদেব সঙ্গে যতীনবাবুব মতভেদ। তিনি বল্‌তে চান কাব্যমাত্রেই বস থাকে না, থাক্‌তে পাবে না। কল্পনা, বাসনা, এমনকি ভাবলোক থেকেও সবাসবি কাব্যে পৌছোনো যায। রসোত্তীর্ণ কাব্য শ্রেষ্ঠ, এবা নানান্ বকমে নিকৃষ্ট। "সদাশিবং নৌমি পিনাকপাণিম্"—প্রাচীনদেব মতে বসোত্তীর্ণ কাব্য; তবে শ্রেষ্ঠ কাব্যেব নমুনা এ নয, কাবণ বসেব বিরুদ্ধতা বযেছে—'পিনাকপাণি'-তে বয়েছে বৌদ্রবস আব 'সদাশিবে' শান্ত। যতীনবাবুব মতে বিচাব কবতে গেলে বসেব গন্ধও নাই এতে, শিব এখানে ভাবলোকে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যে-বসকে প্রাচীনবা "ব্রহ্মানন্দ-সহোদবঃ" ব'লেছেন, তা'ব নমুনা যদি এই হয তাহ'লে, "নমামি বিলাতী অগ্নি দেশালাইরূপী। দেহখানি চাঁচাছোলা, শিবে বাঁধা টুপী।" কেন শ্রেষ্ঠকাব্য হবে না? এব ভিতব শব্দদোষ, অর্থদোষ, বস (?) দোষ কিছুই নাই; ববঞ্চ চমৎকাব হাস্যবস (?) রযেছে। এব থেকে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাচ্ছি প্রাচীনবা 'বস'-কে অখণ্ডরূপে বুঝে ব্যবহাবে তা'কে খণ্ড খণ্ড কবেছেন। যতীনবাবু বসেব আভিজাত্য বজায বেখেছেন, ব্রহ্মলোক থেকে টেনে এনে তা'কে বাজাবে কবেন নাই। কাব্যেব জাতিভেদে আমবা যতীনবাবুব সঙ্গে একমত।

কিন্তু কোথাও কোথাও কবিতা-বিচাবে একটু ব্যক্তিগত স্পর্শ আছে ব'লে মনে হয়। সত্যেন্দ্রদত্তেব 'চম্পা' কবিতাকে তিনি বসোত্তীর্ণ বলেছেন; আমাদেব মনে হয়েছে 'বসাভাসী'—যে-চম্পা 'সূর্য্যেব সৌবভ', 'সূর্য্যেব বিভূতি' যাব 'লাবণ্যে দিতেছে তনু ভবি', কেন তা'ব 'মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন'? যদি আনন্দে হয, বল্‌বার কিছু নাই। কিন্তু 'খবতাপে আমি কভু ঝবিয়া না মবি', 'উগ্রমত্তসম বৌদ্র · বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা' সহজে পান কবি'—এই যা'ব স্থিব বিশ্বাস, সে কেন 'আধত্রাসে', 'বিশ্বাসেব বৃন্তে বেপমান' হ'যে 'সাহসিকা অপ্সরাব মত' আবির্ভূত হয? ববীন্দ্রনাথেব 'শিশুকাব্যে'-ব আলোচনা-প্রসঙ্গে যতীনবাবু বলেছেন, "এখানে শিশু শিশু নয়, মা মা নয এবং কাব্য শিশুকাব্য নহে"। কিন্তু এটী যে কি,

সে-সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তর। শিশু যে-কাব্যে শ্রোতা, শিশুই বক্তা (অবশ্য শিশুর পিতামাতাও আছেন, তবে শিশুকেই আশ্রয় ক'রে) সে-কাব্য সম্বন্ধে যতীনবাবুর এই ইচ্ছাকৃত উদাসীনতায় আমরা সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌লাম না। 'রূপক' বল্‌লেই সব গোল মিটে যেতো। মনে পড়ে অনেকদিন আগের একটা কথা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লিখেছিলেন তাঁর 'বাঙলার গীতিকবিতা'-য়। শিশুচিত্ত সাধারণতঃ ভাবমুখী, কদাচিৎ বাসনামুখী; কাজেই সত্যকার শিশুকাব্য রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে না—এ কথা যতীনবাবুর সঙ্গে আমরাও বলি।

এইবার mystic কবিতা। যতীনবাবুর মতে 'অতিলব্ধ বাসনা' এই জাতীয় কবিতার মূলে। রসোত্তীর্ণ কবিতার মাথার মুকুট বলা যেতে পারে mystic কবিতাকে। 'অতিলব্ধবাসনা' বল্‌তে যতীনবাবু বুঝেছেন জন্মজন্মান্তরের ভাবস্মৃতি—কালিদাস এই বস্তুটীকেই বোধহয় "ভাবস্থির" বলেছেন, (Deepest layer of subconsciousness retained in the mind from lives long past)। উদাহরণ তোলা হয়েছে রবীন্দ্রকাব্য হ'তে। যতীনবাবুর সংজ্ঞার মাপকাঠিতে ওগুলি mystic হ'তে পারে। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর mysticism-এর জন্ম উপলব্ধি থেকে, অনুভূতি থেকে নয়। সত্যদ্রষ্টা সাধকদের (যেমন উপনিষদের ঋষিরা) mysticism-কে আমরা উপলব্ধিজাত প্রথমশ্রেণীর mysticism ব'লে মনে করি। Telephone-এ যখন কথা বলি, আমার receiver আমার কাছে 'সত্য'; কিন্তু তখন আমার পাশে যদি কেউ থাকেন, তাঁর কাছে নয়। কাজেই আমি আমার পার্শ্ববর্ত্তীর কাছে mystic হ'যে উঠি। তবু এ mysticism প্রথমশ্রেণীর নয়—উপলব্ধির চেয়ে ছোট, অনুভূতির চেয়ে বড়। রবীন্দ্রকাব্যের mysticism-কে পাশ্চাত্য মতে Theoretical Mysticism বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের mysticism 'অতিলব্ধ' বাসনার ওপর কল্পনার লীলাবিলাস; রস আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ নয—রসাভাস, রসশবলতালক্ষণও যথেষ্ট। তবু শ্রেষ্ঠকাব্য বল্‌তে হবে, কারণ, এ জাতীয় কাব্যের আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে খুবই কম দেখা যায়।

কাব্যে 'তত্ত্বে'র স্থান-সম্বন্ধে যতীনবাবু বলেছেন, এ জাতীয় প্রশ্ন সঙ্গত মনে হয় না; সকল বস্তু এবং বিষয়ের স্থান যখন কাব্যে আছে, তখন তত্ত্বেরও আছে। তত্ত্বও রসায়িত হ'য়ে প্রথমশ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি করতে পারে। সত্য কথা, তত্ত্ব তখন হয় গৌণ আর কাব্য মুখ্য। Richards-এর মতন "Ulterior ends—essential to some forms of poems" যতীনবাবু বলতে পারেন নাই। তত্ত্ব যেখানে essential, শ্রেষ্ঠকাব্যের সেখানে স্থান নাই। কিন্তু তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও যে চমৎকার রসোত্তীর্ণ কাব্য হ'তে পারে তা'র নিদর্শন তত্ত্বমূলক আমাদের বৈষ্ণবকাব্য, বিশেষ ক'রে বহুতত্ত্বমূলক রবীন্দ্রকাব্য;—তত্ত্ব এখানে রসে লীন হ'যে গিয়েছে।

পাঠকচিত্তধারার গতি তথা পরিণতি নির্দ্দেশ, অধিকারভেদে পাঠকের জাতিভেদ-বিচার এবং Critic চিত্তধারার বৈশিষ্ট্য-নিরূপণ—এইসব বিষয়ে যতীনবাবুর মৌলিকতার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। নিজে কবি এবং রসিক পাঠক হ'য়েও 'পরিমিতি'কার উপনিষদের 'উদাসীন' পুরুষের মতনই নিরাসক্ত—তাঁর ইঞ্জিনিয়ারি গজকাঠি অয়নচক্রের সূক্ষ্ম এবং চমৎকার বর্গফল দিয়েছে। Critic-এর যে-সংজ্ঞা তিনি নির্দ্দেশ করেছেন, নিজেই তার দৃষ্টান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

•

কাব্যেব স্বরূপ-সম্বন্ধে Richards বলেছেন, "It (the world of poetry) is made up of experiences of exactly the same kinds as those that come to us in other ways" এবং এইটুকুমাত্র এব বিশেষত্ব যে, "It is fragile"। কিন্তু বসোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠকাব্য, বিশেষতঃ mystic কাব্যও কি এই ছাঁচে গড়া? Shelley-ব 'Epipsychidion', Bridges-এব 'Testament of Beauty', কি ববীন্দ্রনাথেব 'বলাকা', 'চঞ্চলা', 'সাবিত্রী' এই পর্য্যায়ভুক্ত? Bradley-ব যে-মত খণ্ডন ক'বে Richards নিজেব মত প্রতিষ্ঠিত কবতে চেয়েছেন, সেই ". A world by itself, independent, complete, autonomous"-কেও অবশ্য কাব্যেব ব্যাপক স্বরূপ ব'লে মনে কবতে পাবি না। দুনিয়াব বেশীব ভাগ কবিতাই এই স্বাধীন, সম্পূর্ণ, স্ব-তন্ত্র জগতেব বাইবে। যতীনবাবুব মধ্যে এই দুটী মতের সমন্বয় দেখ্‌ছি। আমবা পাঠকচিত্তধাবাব বিচার কবতে হঠাৎ কাব্য-স্বরূপেব অবতাবণা ক'বে ফেল্‌লাম এইজন্যে, যে ওদেব মতে এই পন্থাতেই কাব্যেব বসভোগ তথা বসবিচাব দুই-ই কবতে হবে। পাঠকসম্বন্ধে Bradley বলেছেন,

" To possess it (the poetry-world) fully, you must enter that world, conform to its laws, and ignore, for the time being, the beliefs, aims and particular conditions, which belong to you in the other world of reality "

Richards বলেছেন " When we experience it (the world of poetry), or attempt to, we must preserve it from contamination, from the interruption of personal particularities "

ভাষা ভিন্ন হ'লেও দুজনেব বক্তব্য প্রায় এক। 'কাব্যপবিমিতি'তেও এবি অনুরূপ যুক্তি দেখতে পাচ্ছি। Critic-সম্পর্কে Richards-এব মতই সমীচীন ব'লে বোধহয। Bradley-ব " it is to be judged entirely from within"-কে Richards বলেছেন, "misleading"। তাঁব মতে "In most cases we do not judge it from within"। "Entirely from within" ববীন্দ্রনাথেব Synthesis-পন্থায বসবিচাবেব মতন। কিন্তু আমাদেব বিশ্বাস Synthesis পন্থায় বস-সম্ভোগ চলতে পাবে, বিচাব (criticism) সম্ভব নয়। যতীনবাবুব Critic বসলোক পর্য্যন্ত যান Synthesis-পন্থায পাঠকেব মতন, তাবপব Analysis পন্থায় কবিচিত্তেব উজানপথে চলেন। Richards-এব চেয়ে যতীনবাবুব মত বেশী পরিস্ফুট।

এইবাব দুই একটা অবান্তব কথা। 'ছন্দ'কে যতীনবাবু কাব্যেব 'অবযব' বলেছেন কেন বুঝ্‌লাম না। ছন্দকে অনেক সময ব্যঞ্জনাবও কাজ কব্‌তে দেখা যায। ববীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্বন্ধে বলেছেন—"অর্থেব বন্ধন হ'তে নিযে তাবে যাবে কিছু দূব ভাবেব স্বাধীনলোকে, পক্ষবান্ অশ্ববাজসম উদ্দাম সুন্দব গতি " একথা শ্রেষ্ঠ কবিতাসম্পর্কে অতিসত্য (বলা বাহুল্য এ-'ভাব' যতীনবাবুব 'ভাব' নয)। নীচু-দবেব কবিতাতেও ছন্দ অনেক সময় গুরুতব কাজ কবে।

যতীনবাবু একজাযগায় তাঁব চিত্রটীকে অশ্বডিম্ব ব'লে বিদ্রূপ কবেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা কবি এ-ডিম্ব কি স্বয়ম্ভু? না, গ্রন্থকাবেব ভেবেচিন্তে প্রসবকবা? এমনি ellipse-জাতীয় চিত্র না হ'লে পাঠকচিত্ত আব কবিচিত্ত ঘোবাফেবা কবতো কেমন ক'বে? দুটী কেন্দ্রের কি দরকাব ছিল না?

•

কাব্যরসিকদের দরবারে 'কাব্যপরিমিতি' যে শ্রদ্ধার আসন পাবে সে কথা নিঃসংশয়েই বল্‌তে পারি।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

The Loosening and other Poems—RONALD BOTTRAL,
(The Minority Press)

যদিও এই নবীন কবি প্রথম কবিতাতেই বলেছেন—

Why take the odds of mental strife
When being mute rounds off the life?

তবুও যে বট্রালের কাব্যপ্রেরণা রুদ্ধ হয় নি, তার কারণ তিনি নিজেই দেখিয়েছেন,—

Yet, can the skeleton command?
Can flesh revoke its reflexed act?

বট্রালের কবিতায় খুসি হওয়া যায়। এলিয়টের পরে যাঁরা আসছেন—হর্বার্ট রীড্, রয়্ ক্যাম্পবেল্ আদি—বট্রাল্‌ও যে তাঁদের সঙ্গে বস্‌তে পারেন তাঁর এই প্রথম বই পড়েই তা মনে হয়। এমন কি রায়বনীয় বাক্যবহুল ক্যাম্পবেলের চেয়ে অন্তত এই বুদ্ধিজীবী কবিটির সম্বন্ধে বেশি আস্থা হয়।

এই বইটি তিন ভাগে সাজানো। ৩০ সালে লেখা Arion Anadyomenos-নামে একটি কবিতাগুচ্ছ, Poems; ও ৩১ সালে লেখা The Loosening। একথা বলাই বাহুল্য, যে তিন খণ্ডেই বট্রাল্ আধুনিক—বট্রাল্ জানেন যে

All sap has gone out of tradition
And the new limbs destined for full-leaved strewments
Are withered, marrowless, natally thwarted

এই সভ্যতাচূর্ণের সঙ্গে আশ্বাসও গেছে—বট্রালের ভাষায়—নবজীবনের চাবিও হারিয়েছে। কাজে কাজেই শালবীথিতে, চাঁদের আলোয়, দখিন হাওয়ায়, কোকিলের গানে মুগ্ধ হ'য়ে, বা শোপ্যাঁর সুর শুনে শান্তি কোথায়? অথচ সিটওয়েলের কাকাতুয়াকাব্যে ভীত হ'য়েই বোধহয় বট্রাল্ কাব্যশক্তিতে আস্থা স্থাপন করতে ইতস্তত করছেন—

Microscopic anatomy of ephermerides,
Powerhouse-stacks, girder-ribs, provide a crude base,
But man is what he eats, and they are not bred
Flesh of our flesh, being unrelated
Experientially, fused in no emotive furnace

কিন্তু Leavis তাঁর New Bearings in English Poetry-নামক সমালোচনা-গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন, বট্রালের কবিতার উপমা, ভাষাবন্ধ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে কবির চেতনায় বাইবেল, সমুদ্র ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনও স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, ছন্দব্যবহারে (মিটার নয়, রিদ্‌ম্) তিনি যে এন্‌জিনের শব্দ সহ্য করেছেন, তা বোঝা যায়। এবং নিতান্তই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক অথবা ব্যাবহারিক শব্দ ব্যবহার ও বাক্যরচনা করা সত্ত্বেও যে তাঁর কবিতা প্রবন্ধ বা প্রলাপ হয় নি,

তাতেই প্রমাণ হয় যে বট্রাল্ চেষ্টা ক'রে নূতন ন'ন—তিনি স্বভাবতই স্বকীয়। The Loosening-এর শেষ কটি ছত্র বট্রালের কবিতা সম্বন্ধেও লাগিয়ে দেওয়া যায়—

We hail with contumely or
Introverted joy the rain
Of irrigating dailiness, which leaves
The fields gleaming with hundred-fold grain.

বট্রাল্ এসেছেন মরুভূমিতে বটে, কিন্তু তিনি বলেন না যে

This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper

Arion Anadyomenos-এর শেষটুকু উদ্ধৃত করলেই তাঁর অন্তরের আশার আভাস পাওয়া যাবে—

" Is it worthwhile to make lips smile again,
To transmit that uneasiness in us which craves
A moment's mouthing, craves to bully the pain
The pain and pity of it into staves
Of crabbed pothooks, filling the breadth
Of tiltepage to colophon?
Is it worth while to debate upon
The automatic sense which forces us
To circumvent our quietus
And put instead on record
Reactions to the vibrations of a vocal chord?"

The waters are lifting at length, and stand revealed
The shoddy roofs steeled,
Even silvered, by reflected light, quite rent
From their cadaverous cerement,
While the final passacaglia of Brahms
Weaves itself point by point
Into the shuddering waves of rain,
Assertive, affirmative, triumphant . .
Perchance, after all, living within
And for ourselves, exhaling our entity
In our perceptions, yet not altogether bent
With our breaths to petrify and eternize
Some stony replica, we have tracked
What song the sirens sang. So may the disjoint
Time resolve itself and raise up dolphins backed
Like whales to waft us where a confident sea
Is ever breaking, never spent

এই আত্মস্থ আশ্বাসের সুর যে এইখানেই শুধু পাওয়া যায় তা নয়। অন্যত্রও মেলে, যথা,—Salute to Them That Know। বট্রাল্ মরুভূমিতে সরোবরের আভাস পেয়েছেন। কিন্তু আমি এই আশার উৎস বা ভিত্তি ধরতে পারিনি। বট্রাল্ স্বপ্নলোকে পালান্ নি, তা দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এই আশার মূলধন শুধু সুস্থ সচ্ছল যৌবন কিনা, তা জানি না। এলিয়টের মুক্তির ইসারা তাঁর কাব্যে প্রচুর পেয়েছি—

বট্রাল্ সে ভাগবৎ করুণা বা শান্তিব আশ্বাস পান্ নি। অথচ কিছু মূলধন যে তাঁব আছে, তা তাঁব শক্তিশালী কবিতা বিশ্বাস কবায়। হয়ত ভবিষ্যতে তাঁব কবিতায এই অবৈকল্য পবিপূর্ণ মূর্ত্তি পাবে ও তাব উৎস আমবা খুঁজে পাব। আজ পর্য্যন্ত মানছি যে তাঁব অবস্থা—

. . . Hades
Whisks me into the upper air—to leave me poised.

কিন্তু এই সঙ্গতি সত্ত্বেও তাঁব যাত্রাব বিবাম হয় নি। এখনও বট্রাল্ ভুলছেন, 'জয়স্ ও ভালেবিব ব্যর্থ অন্তর্দর্শনে' ও সুস্থদেহ অবিকৃত শুচি ফার্ম্-গর্লেব স্মৃতিতে। তিনি জানেন যে—

The wielder of dialectic is ensloughed

এবং তিনি বলেন,

I have chopped logic
Since then and laid out the subject in
My brain's mortuary, held my mind
A clearing-house for moral commonplaces
Which gutter and are gone, yet I am sick
With excess of memory, how a farm girl, ইত্যাদি।

যাই হোক্, এ সব বাহ্য। তাঁব বচনা কবিতা হিসাবেও উপভোগ্য—বিশেষ ৩০ সালেব অনেকগুলি। ছন্দ, উপমাব প্রাচুর্য্য ও বিস্ময়কর সার্থকতার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিব মিল মুগ্ধ কবে। এলিয়ট্ ও পাউন্ডেব পবেব কবি যে তিনি ও তিনি যে হপ্‌কিন্‌সেব কাছে ছেলেবেলায় কিছু সমাসবচনা ও ধ্বনিশিল্প শিখেছেন তাব প্রমাণও পেযেছি। কিন্তু তাতে এ কবিব স্বকীযতাই প্রকাশ পেয়েছে—যেমন পেয়েছে ওযালাবেব অনুসবণে ড্রাইডেনেব প্রতিভা। এবং মনে হয়েছে যে এ স্বকীযতা ইংবেজি কাব্যেব ধাতে সয, সুতবাং এলিয়টেব কথায়, এ খাঁটি জিনিস।

শ্রীবিষ্ণু দে

A Letter from India—EDWARD THOMPSON, (Faber & Faber) 5s

Hindoo Holiday—J R ACKERLEY, (Chatto & Windus) 8s 6d

ভাবতবর্ষ-সংক্রান্ত কোনো বই বেবিয়েছে শুনলেই আমাদেব আতঙ্ক জাগে। ভয়েব কাবণও যথেষ্ট আছে। এই হতভাগ্য দেশসম্বন্ধে সম্প্রতি কোনো প্রথম শ্রেণীব বই প্রকাশ হয়নি ব'লেই আমাব বিশ্বাস। পাশেই যখন অর্দ্ধসভ্য আববে ডাউটিব অবিনশ্বব দৃষ্টান্ত আজও মরুযাত্রীদেব অনুপ্রাণিত কবে, তখন ইযেট্‌স্-ব্রাউনেব নিবামিষ যোগানুবাগে সন্তুষ্ট হওযা শক্ত। অবশ্য এই সম্পর্কে ই-এম্-ফর্ষ্টাবেব নাম অবিস্মবণীয। তিনি অন্ততঃ বিদেশকে স্বদেশী দূববীক্ষণেব সাহায্যে দেখতে চাননি, ভাবতকে দেখেছেন ব্যক্তিব স্বকীয় দৃষ্টি দিযে। কিন্তু "এ প্যাসেজ্ টু ইণ্ডিযা"-ব উপসংহাব সত্যই ভযাবহ; ফর্ষ্টাবেব সিদ্ধান্ত কিপ্‌লিঙেব প্রসিদ্ধ শ্লোকেব চেযেও নৈবাশ্যময। কিপ্‌লিঙ শেষ পর্য্যন্ত এইটুকু স্বীকাব কবেছিলেন যে পূর্ব্বপশ্চিমেব বিবোধ চিবন্তন হ'লেও, ও-দুই অঞ্চলেব বীবসম্প্রদায়েব মধ্যে জাতিভেদ অভাবনীয়। ফর্ষ্টাব কিন্তু সে-তুচ্ছাতিতুচ্ছ আশ্বাসেব পথটিও খোলা বাখেননি; তাঁব মতে আজকেব দিনে শ্বেত-

কৃষ্ণেব ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব শুদ্ধ অসাধ্য। বিসংবাদেব পাহাড় তাঁদেব সহযাত্রাব পবিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, অভিমানেব নির্ঝ'ব তাদেব অনুষঙ্গকে দ্বিধাবিভক্ত ক'বে দেয়, বাষ্ট্রনৈতিক কুয়াসায় তাদেব সম্মিলিত গন্তব্যেব চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়না। ফলে মনে হয় স্পেঙ্গলাবেব অনুমানই হযতো সত্য, বিশ্বমৈত্রী বুঝি আসলে কবিদেব ভাববিলাসমাত্র, শুচিবায়ুগ্রস্ত জাতীযতাব ছুৎমার্গ ভেদ ক'বে একদেশেব সঙ্গে অন্যদেশেব আদানপ্রদান একেবাবেই অসম্ভব।

গৌবচন্দ্রিকাব বহব দেখে অনেকেই ভাববেন যে, আলোচ্য বই-দুখানিও বুঝি মিস্ মেয়োব মহাকীর্তিব সমতুল্য। কিন্তু এমন ধাবণা অমূলক। সত্য বলতে গেলে উক্ত গ্রন্থ দুটিব সম্বন্ধে আমাব উপক্রমণিকা অবান্তব। লেখকদ্বয়কেই আমি নিঃস্বার্থ ও অনুকম্পাযী হিসেবে দেখি এবং তাঁদেব নিবন্ধ পড়াব পবে আর্য্যাবর্ত্তকে বহস্যাচ্ছন্ন মনে কবাব কোনো কাবণ থাকেনা। কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতা বাড়াবাড়িব কোলঘেঁষা হ'লেও, এ-কথা না-মেনে উপায় নেই যে এঁদের নিবাসক্ত সত্যনিষ্ঠাতেও কিসেব একটা ফাঁক আছে। এঁবা যথার্থ ভাবতকে পাননি, তা বলা চলেনা, কিন্তু এঁদেব লেখায় একটা কোন অপবিহার্য্য লক্ষণেব অভাব শেষ পর্য্যন্ত মনকে স্বস্তি পেতে দেয়না। এই অতৃপ্তিবোধ থেকেই উপবেব মুখবন্ধটাব সৃষ্টি।

"এ লেটাব ফ্রম্ ইণ্ডিযা"ব প্রসঙ্গ হচ্ছে বর্ত্তমান বাষ্ট্রনীতি, এবং বাষ্ট্রনৈতিক জগৎটা অপেক্ষিক। এই লোকে কোনো সুনিশ্চিত মধ্যপন্থা নেই; যে-পথ কেন্দ্রেব যত কাছে আসে, উক্ত সম্মানে তাব অধিকাব হয তত বেশি। এমন-কি এখানে মধ্যস্থেব সংখ্যা একাধিক হ'লেও স্বত্বহবণ বা স্থান-সংকুলনেব সূত্রপাত হয়না। কাজেই টম্সন্-সাহেবকে নিবপেক্ষ বলাব সঙ্গে সঙ্গে আমি একথা ভালো ক'বেই অনুভব কবছি যে লেখক ভাবতবাসী হ'লে বিববণেব চেহাবা অতি অবশ্যই বদলে যেতো। নিবাসক্তেব লক্ষ্য কেন্দ্রাভিমুখী বটে, কিন্তু স্বার্থেব অন্তিম আকর্ষণ তাকেও অল্পবিস্তব বিচলিত কবে। এবং টম্সন্-সাহেব যেহেতু ইংবেজ, তাই ইংবেজেব অভিযোগটা তিনি যত স্পষ্ট ক'বে দেখেছেন, আমাদেব নালিশটা তত সবল ক'বে বোঝেননি। নিষ্কাম হয়েও যদি কোনো হিন্দুস্থানী জালিযানবালা, চট্টগ্রাম, হিজলি ইত্যাদিব প্রতিবাদ করতো, তাহলে তাব বাক্য যে টম্সন্-সাহেবেব চেয়ে খবতব হতো তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু একখানা দেড়শ পাতাব বইয়ে তিনটিমাত্র স্থানে উত্তেজনাব অপ্রাচুর্য্য কোনোমতেই মাবাত্মক ব'লে গণ্য হতে পাবেনা। যদিই স্বীকাব কবা যায যে উক্ত অনুগ্রতা স্বেচ্ছাকৃত, তবু টম্সন্-সাহেবের সত্যানুবক্তিকে অনাদব কবাব উপায় নেই।

গত ছমাসেব শোচনীয সংঘটনগুলোব এমন সুসম্বদ্ধ বর্ণনা অন্যত্র শুনেছি ব'লে মনে তো পড়েই না, উপবন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটেব সমাধানকল্পে তিনি যে-পদ্ধতি নির্দ্দেশ কবেছেন, তাতে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই খুব সম্ভব সাব দেবেন। মহাত্মাসম্বন্ধে টম্সন্-সাহেবেব মতামত জনপ্রিয হবেনা নিশ্চয, কিন্তু এ-প্রসঙ্গেও যিনি টম্সন্-সাহেবকে উদ্‌ভ্রান্ত-উপাধি দিতে চাইবেন, তাঁব গুরুভক্তিকে অবশ্যই শ্রদ্ধা কববো, কিন্তু তাঁর সুবিবেচনাব বিষযে আমি নীবব থাকতে বাধ্য। সে যাই হোক, টম্সন্-সাহেবেব সিদ্ধান্ত আমাদেব মনে না-ধরলেও, "এ লেটাব্ ফ্রম্ ইণ্ডিযা" ভাবতবাসীমাত্রেবই অবশ্যপাঠ্য। বাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচাব হয়তো দুষ্কব, কিন্তু তাই ব'লেই অবিচাব মার্জ্জনীয নয়; এবং অবিচাব যদি অনিবার্য্যই হয, তবু তাব পবিমাণ সাধ্যমতো সংক্ষিপ্ত হওযাই বাঞ্ছনীয। এইখানেই

অন্যপক্ষকে কাজে লাগে। সত্য শুধু স্বদলের সম্পত্তি নয়, এই প্রবচনটা স্মরণে রাখলে, শুধু অবিচার কেন, অত্যাচারকেও আবশ্যিকতার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করা সহজ হবে।

হিন্দুস্থানসম্পর্কে টম্‌সন্‌-সাহেব অনেক দিন থেকে অনেক বই লিখছেন। তার মধ্যে কোনোখানাই বর্জ্জনীয় নয় এবং অন্তত দুখানা শিল্পের পাদপীঠে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু "কৃষ্ণকুমারী"-র মতো নিখুঁত নাটক ও "এন্ ইণ্ডিয়ান্ ডে"-র মতো উৎকৃষ্ট উপাখ্যান যাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে, তাঁর অপরাপর রচনায় একটা অসহ্য পৃষ্ঠপোষণের ভাব যে কেন ফুটে বেরোয়, তা বোঝা শক্ত। এটা ক্রমশ একটা মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং এইজন্যেই বোধহয় তিনি এখানে তার প্রাপ্যসম্মানে সুদ্ধ বঞ্চিত। অবশ্য এ-অভিযোগটা একা আমারি মনগড়া হ'তে পারে। অথবা উত্তরে টম্‌সন্‌-সাহেব বলতে পারেন যে শিল্পসৃষ্টির রীতি আর প্যাম্‌ফ্লেট্ লেখার দস্তুর, এ-দুয়ের মধ্যে আসমান-জমির তফাৎ থাকাই উচিত। উপরন্তু তিনি দু-একবার আমার দেশকে ঔপন্যাসিকের পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন ব'লেই, বরাবর সেই অনুগ্রহ চাওয়া অসঙ্গত। ভারতের স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলোও এত মৌলিক, এমন মৌরসী যে সে-প্রসঙ্গে সমালোচক-মাত্রেই ন্যায়ত নিজেকে সদাচারী ও ধর্ম্মিষ্ঠ মনে করতে পারেন। কিন্তু তাহলেও এটা ভুললে অন্যায় হবে যে উচ্ছ্রায়ব্যতিরেকেও হিতোপদেশ সম্ভব। শৈশব স্মৃতি এখনো যাঁর মনে জাগরূক আছে, তিনিই মানবেন যে গুরুমহাশয়ের তর্জ্জনগর্জ্জনের চেয়ে বয়স্যের পরামর্শই বেশি গ্রাহ্য, বেশি সক্রিয়। কল্পিত জ্যেষ্ঠতার প্রাগ্‌ভাব বাদ দিয়েও নীতিকথা কওয়া যায় কিনা, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে একার্লি-সাহেবের "হিন্দু হলিডে"-নামক গ্রন্থে। বইখানি, "এ লেটার ফ্রম্ ইণ্ডিয়া"-র মতোই, পল্লবগ্রহিতায় ভরা, ব্যঙ্গকৌতুকে লঘু, তার চরিত্রগুলিকে যে-কোনো নির্ভার প্রহসনের পাত্রপাত্রী ব'লে অনায়াসেই চালানো যায়। তবু এই দরদী বিদূষকের বাচালতা তথাকথিত স্মৃতিরত্ন-মহাশয়দের আপ্তবাক্যের চেয়ে কত গভীর, কত সম্ভ্রান্ত, কত মর্ম্মস্পর্শী।

উপরে নিরপেক্ষতার যে-সংজ্ঞা দিয়েছি, তার পরে বলা বাহুল্য যে একার্লি-সাহেবও পক্ষপাত বর্জ্জিত নন। হিন্দুসমাজকে তিনি মুসলমানসমাজের চেয়ে শ্রেয়স্কর মনে করেন, এবং স্থানীয় শ্বেতাঙ্গসমাজ তাঁর শ্রদ্ধায় বঞ্চিত। সত্য বলতে বইখানির প্রত্যেক চরিত্রই মুখ্যত ব্যাজোক্তির সাহায্যে আঁকা, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার মৌলভী আব্দুল ও বান্ধবী মিসেস্ ব্রিষ্টোর ছবিতে শুধু ব্যাজস্তুতিই নেই, বিদ্বেষের বিদ্যুদ্বিলাসও খুব স্পষ্ট। অবশ্য একার্লি-সাহেবের কাছে শ্লেষ অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি সাহিত্য-জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নাট্যকাররূপে, এবং সেই অভ্যাসের গুণে তিনি এখনো হয়তো বিশ্বাস করেন যে শিল্পের সংমিশ্রণে সত্যের অমর্য্যাদা হয় না, অলঙ্করণের সমর্থনে বরং তার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। কারণ যাই হোক, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার খাতায় প্রয়োজনমতো যোগবিয়োগ করতে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা নেই; এবং একথা মানতেই হবে যে এই অকৃপণ অতিরঞ্জনের কল্যাণে তিনি যে-নক্সা পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, তা হয়তো ছোকরাপুর সামন্তরাজ্যের অবিকল ছবি না-হ'তে পারে, কিন্তু সেটা সমগ্র ভারতভূমির যথাযথ প্রতিলিপি।

এর থেকে এমন ভাবার কোনোই কারণ নেই যে তিনি অখণ্ডতার খোঁজেই ব্যস্ত, ছোটোখাটো খুঁটিনাটি তাঁর নজরে পড়ে না। কিন্তু যদিই বা তাই হতো, তবু

কোনো ক্ষতি ছিলোনা, কাবণ তাঁব বিববণেব সম্ভাব্যতা এত বেশি যে তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্যাসত্যেব কোনো অবকাশ নেই। ছোকবাপুবেব মহাবাজ যখন প্রথম সাক্ষাতেই গ্রন্থকর্ত্তাব কাছে পাপেব সবিস্তব পবিচয় চেযে জবাব পাবাব আগেই একনিঃশ্বাসে ডাকুইন, মাবি কোবেলি ও প্র্যাগ্ম্যাটিস্ম্-এব নামোচ্চাবণে তাঁব বাকবোধ ক'বে দেন, তখন পাঠকেব হাস্যশিথিল মনে অবিশ্বাসেব প্রবৃত্তিও থাকেনা, ঘুণাক্ষরেও প্রশ্ন ওঠেনা, এ-ধবণেব আচবণ কোনো নবপতিব পক্ষে সম্ভব কিনা। তখন কেবল জাগ্রত স্মৃতি সঞ্চিত অভিজ্ঞতাব উন্মথন ক'বে অনুরূপ প্রলাপেব শতসহস্র নিদর্শন মানসলোকে ভাসিযে তোলে। তখন আত্মীযস্বজনেব মধ্যেই দেওযান-সাহেবেব চার্ব্বাকপনাব নজিব মিলে, অনুগতদেব মধ্যেই নাবাযণেব হাসিব প্রতিধ্বনি বাজে, বন্ধুবান্ধবেব আচাবব্যবহাবেই বাবাজিবাওযেব "আলোকপ্রাপ্তি"ব প্রতিভাস ফোটে। আব পাতা উল্‌টানোব ত্বব সযনা, পবিচ্ছেদেব পব পবিচ্ছেদ ঊর্দ্ধশ্বাসে উবে যায, এবং শেষে যখন লুব্ধ চক্ষু সীমান্তে এসে ধাক্কা খায়, তখন মন বলে—এবি মধ্যে?

বোধ হচ্ছে উচ্ছ্বাসটা সম্ভবত অসংযত ও অসঙ্গত হলো। তাই অবিলম্বে ব'লে বাখা ভালো যে বইখানি বাহ্যত অত্যন্ত সুখপাঠ্য হ'লেও, তাব মর্ম্ম যথার্থই ভযাবহ। লেখক ভাবতীয কোমলতা ও সাবল্যেব অনেক গুণ গেযেছে, সত্য; কিন্তু যে-সহৃদযতা বালবিধবা ভগ্নীব দুঃখ সাশ্রুলোচনে বর্ণনা ক'বে, তাব কষ্টলাঘবেব প্রস্তাবে শিহবিত হয়, সে-সহৃদযতা একার্লি-সাহেবকে যতই মুগ্ধ করুক আমাকে সান্ত্বনা দেয না। এল্‌ব্‌মেনেব লোভে গরুব চোনা খাওয়া উচিত, এ ধবণেব উক্তিই যে প্রহসনেব প্রধান সম্বল তাতে বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ নেই; কিন্তু চোনাব মাহাত্ম্যে যখন হাঁসপাতাল-পবিচালক সুদ্ধ বাত্মষ হ'য়ে ওঠেন, তখন হাসির চেযে কান্নাই শোভন। সূচ্যগ্রভূমিব চক্রবর্ত্তীব সঙ্গে নীবোব প্রতিযোগিতা খুবই উপভোগ্য বটে, কিন্তু বামে শব শৃগাল দেখবাব জন্যে হাক্সলি স্পেন্সাব্ আলোচনা কবতে কবতে বিশত্রিশ ক্রোশ মোটার-ভ্রমণ বাজাপ্রজা কারুব পক্ষেই স্বাস্থ্যপ্রদ নয। কিন্তু বই থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধাব কবা নিষ্প্রয়োজন; আমাদেব প্রত্যেকেব অভিজ্ঞতাই তো একার্লি-সাহেবেব অনুরূপ। তবে তাঁর সঙ্গে আমাদেব প্রভেদ এইখানে যে তাঁব দেশেব লোক অমঙ্গলেব সংসর্গে এলে, হঠাৎ অন্যমনস্ক হযে আকাশে তাকায না, আব আমবা মৃত্যুকে শিযবস্থ জেনে বাবা তাবকনাথেব কাছে আড়াই পযসাব পূজা মানি। কিন্তু থাক সে-কথা; হতাশেব সুবে প্রবন্ধ শেষ কববো না। "হিন্দু হলিডে"-ব সাহিত্যিক উৎকর্ষ এ-দেশেব ধ্বংসোন্মুখ সমাজতন্ত্রেব উপবে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও, তাবি মধ্যে একটা নবযুগেব আশ্বাস আছে। এই হিংস্র জাতিযতাব দিনে একজন ভাবতপ্রবাসী ইংবেজও যদি বর্ণভেদেব অপাব সাগবে সেতুবন্ধ ক'বে থাকতে পাবে, তবে হযতো বিবেক-জিনিষটা সাবেকী উপসর্গ মাত্র নয। যে-সনির্ব্বন্ধ সুবুদ্ধিব সামনে বাষ্ট্রনৈতিক কুসংস্কাব পর্য্যন্ত নতমস্তক হলো, তাব সংক্রমণে কেবল বিবর্ত্তনভীরুব অসাড়তাই কি শুধু অটল থাকবে? খুব সম্ভব থাকবে, কিন্তু শুভসমাপ্তিব খাতিবে আত্মপ্রসাদেব নটেগাছটি না-মুড়িযেই আমাব কথা আজ ফুবোক।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথমা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, (গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং) দাম দেড় টাকা।

"প্রথমা" সুপরিচিত গল্পলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতাপুস্তক, কিন্তু প্রথম ব'লে কবিতাগুলির প্রথমাবস্থার বালাই নেই, যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। কবিতাগুলির কোন শিরোনাম দেওয়া হয়নি, বোধহয় সবগুলির ভেতর দিয়ে একটা প্রধান সুর জাগিয়ে তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। সত্যিই একটা প্রধান সুর বেজেছে,—তা' বিলাপের। বিলাপের কারণটি খুব স্বতন্ত্র ও অভিনব। কে কবে পৃথিবীকে সূর্য্যের দিকে ছুড়ে ফেলেছিল আর তাতেই লক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—সেই থেকে ব্যর্থতা সর্ব্বময়;—এই হ'ল প্রথমার নিদারুণ বিলাপের প্রধান কারণ। এই ব্যর্থতার ক্ষোভে কবি লিখেছেন, "জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল; সে মিথ্যায় মগ্ন হ'য়ে সত্য তোর ভোল", "নিখিল ভুবন ভরি খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা অনাদি অতীত কাল ধরি"; "বিশ্বজোড়া হাহাকারে অভিনব স্তুতি" ইত্যাদি। কবির এ সব উক্তি ঠিক দুঃখবাদ নয়,—একটা অপ্রত্যাশিত ক্রন্দনবাদ। কিন্তু হাসানো যেমন সোজা কাঁদানো তেমন নয়, কেননা কাঁদাতে হ'লে মানুষের অন্তঃস্থলে পৌছাতে হয়। প্রথমার কবিতা সেই অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যায় নি, বরং অধিকাংশ জায়গাতেই কান্নার পরিবর্ত্তে কষ্টকল্পনাই সার হয়। অর্থাৎ প্রথমায় কান্নার অনুশাসন আছে কিন্তু বাস্তবিক দুঃখ বা ক্ষতির বারতা নেই। প্রথমা পড়ে এক একবার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মনে পড়ে, কিন্তু তুলনা চলে না, প্রধানত এই কারণে—তাঁর কবিতায় ক্রন্দন নেই, আছে নির্ম্মম চাবুক।

কান্না-হাসির শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কবিতা আলোচনা বাস্তবিক একটু অবান্তর। কবিতার আসল সম্পদ কবিতার সৌষ্ঠব। এবিষয়ে প্রথমা আপন দাবী পেশ করেছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কয়েকটি কবিতা আমার বড় ভাল লেগেছে, সেগুলির এখানে নাম করা গেল; যথা—"মাটির ঢেলা," "জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল", "আজি এই প্রভাতের আশীর্ব্বাদখানি," "হাঁকে ফিরিওয়ালা—কাগজ বিক্রি"। এ ছাড়া অন্যগুলিতেও কবির কাব্যস্ফুরণের দক্ষতার পরিচয় মিলে। একটি চমৎকার মিল কারুর চোখ এড়িয়ে যাবে না, "হরিৎ-ধান্য-ব্যাকুল গ্রামের সীমা, কানন-কণ্ঠ-লগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা"। বেশীর ভাগ ছন্দই কিন্তু মুক্তছন্দ অথচ বৈশিষ্ট্যময়। তবে স্থানে স্থানে বৈশিষ্ট্য যেন একটু অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে, যেমন,—

কূলহীন যত কালাপানি মথি
　লোণা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
　ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হায়রাণ লবেজান তরী
　　　বরখাস্ত্ হল ভাই—

আর এক কথা "অমৃত" চার সংখ্যক নয়, তা এখানে অক্ষর, মাত্রা বা স্বর যে-কোনো হিসেবেই সংখ্যাবিচার করা হোক না কেন। এই সব ত্রুটিতে স্থানে স্থানে ছন্দ কটু হয়েছে। তেম্নি ধাঁধাঁর দিকে একটা ঝোঁকও কাব্যরসকে পঙ্গু করেছে। "ঘাঘ্রী বিনা কাজরী নাহি",—কাব্য নয়, একটা ধাঁধাঁ। যে কবিতাটি থেকে এটা নেওয়া তার নাম "সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে"—এটির বেশীর ভাগই ধাঁধাঁ; একটু যা' সুর

আছে তা' ছেলে-ভোলানো সুব। সর্ব্বসমেত একটা প্রশ্ন জাগে যে,—যে লেখক গল্প লেখায় ওস্তাদ সে কি—সুতরাং—কবিতা লেখায়ও ওস্তাদ হ'তে বাধ্য? নিশ্চয়ই এব উত্তব হবে, না। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব বেলা উত্তব কি হবে বলতে পাবি না; কিন্তু প্রথমাব কবিতাগুলি যে মুখ্যত একজন গদ্যলেখকের বচনা তাব প্রমাণ এই লাইনটি—

মেঘলা দিন আজ দাঁড় ফেলে যায়
আঁধারে ঝুপ ঝুপ

শ্রীগিবিজাপতি ভট্টাচার্য্য

বেদুইন। শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায (বান্ধব পুস্তকালয়, শিবপুব বোড, হাওড়া) এক টাকা।

ইহা নৃতত্ত্ব-বিষযক পুস্তক নহে, ভ্রমণ-কাহিনীও নহে, আববদেশেব মরুচাবী বেদুইনেব কোনো উল্লেখই এই পুস্তকে নাই। "বেদুইন" কাব্য এবং যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র তথাপি উৎকর্ষে—'স্নেহেব পীযূষ'-কে লিখিত 'তোমাব বাবীনদা'ব পত্র (যাহা মলাটেব উপব সগৌববে মুদ্রিত হইযাছে) এবং শ্রীযুক্ত প্রভাকব মুখোপাধ্যায লিখিত 'পবিচয়' পড়িয়া ধাবণা হয়—বোধহয মহাকাব্য। স্থূলদৃষ্টি পাঠকেব ধাবণা কিন্তু খুব সম্ভবত উক্ত দুই বকমেব সমঝদাবেব ধাবণাব সহিত মিলিবেনা, তাঁহাব হয়তো মনে হইবে কবি 'বেদুইন'-কাব্যকে যে পোনেরোটি অংশে (না সর্গে) বিভক্ত কবিয়াছেন, তাহা পোনেবোটি খণ্ড কবিতামাত্র এবং তাহাতে মহাকাব্যেব কোনো লক্ষণই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি কবিতাগুলি সম্পূর্ণ পবস্পব বিচ্ছিন্ন, তাহাদেব মধ্যে কোনো ঐক্য নাই? অবশ্য আছে; তাহাব প্রমাণ কবিতাগুলিব সুব ও ছন্দ—ববাবর এক সুব ও এক ছন্দ। বিলাপ ও প্রলাপেব নিপুণ সংমিশ্রণে এই কবিতাগুলিব সুব বচিত হইযাছে এবং ছন্দ গঠিত হইযাছে মাত্রাব বন্ধনমুক্ত ধ্বনিতবঙ্গেব সমাবেশেব উপব। বেশি নয়, দুটি কি তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্থূলবুদ্ধি জনসাধাবণেব কাছে বেদুইন-কাব্যেব ছন্দেব ও ভাবেব অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাত হইবে; যথা:—

(১) আমাব বিগত বন্ধুবা সব আসিও আজিকে স্বপনে
তোমাদেব কিছু প্রাণেব কথা শুনায়ো আমাবে গোপনে।

(২) বছব হিসাবে বাইশ বটে মন ক্ষত বিক্ষত।

(৩) স্রষ্টাবে যদি পাই সম্মুখে দুনখে তাহাবে চিবি।

শ্রীহিবণকুমাব সান্যাল

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোযার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৩৯

নবছন্দ

ছন্দের আলোচনাটা প্রথম যেদিন যাত্রা ক'রে বেরল সেদিন কোন্ গ্রহ তার উপর দৃষ্টি দিয়েছিল জানিনে, আজো তার ছুটি মিলল না। ভেবেছিলেম কথাটা চল্‌চে তো চলুক আমি ওর থেকে স'রে পড়ব। কেননা ছন্দজ্ঞান যদি বা কমবেশি পরিমাণে আমার থাকে ছন্দ-বিজ্ঞান আমার মগজে নেই এই কথাটা ধরা পড়বার আশঙ্কা ক্রমে বেড়ে উঠচে। অতএব ছন্দ নিয়ে যদি বা দুই একটা কথা সাহস ক'রে আজো বলি বৈজ্ঞানিক ফাঁদে পা দেব না, বিশ্লেষণের রাস্তা এড়িয়ে চলব। তা ছাড়া তর্কের কথাটাকে যথাসাধ্য ছোটো ক'রে বলব। লাঠিয়াল যখন একা, আর তার প্রতিপক্ষ যখন অনেক, তখন সে গুটিসুটি হ'য়ে ব'সে ব'সে লাঠি চালায়—কেননা দেহটাকে সংক্ষিপ্ত করলে মারটা কম লাগবার কথা।

দেখ্‌লুম হতভাগ্য ৎ-এর মামলা সম্পূর্ণ চোকেনি। যে কথাটা উঠেচে মাপকাঠি দিয়ে তার বিচার করব না তাহলে বৈজ্ঞানিক হ'য়ে উঠবে, কানের দোহাই দেব। বুদ্ধিতে না কুলোতে পারে কিন্তু বোধের উপর আমার ভরসা আছে।

তব চিত্ত গগনের দূর দিক্-সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

এখানে দিক্ শব্দের ক হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে একমাত্রার পদবী দেওয়া গেল। নিশ্চিত জানি পাঠক সেই পদবীর সম্মান স্বতই রক্ষা ক'রে চলবেন।

মনের আকাশে তার দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগী স্বপন পাখী চলিয়াছে ধেয়ে।

অথবা

দিগ্-বলয়ে নব শশি লেখা
টুক্‌রো যেন মাণিকের রেখা।

এতেও কানেব সম্মতি আছে।

দিক্‌প্রান্তে ওই চাঁদ বুঝি
দিক্‌-ভ্রান্ত মবে পথ খুঁজি।

আপত্তিব বিশেষ কাবণ নেই।

দিক্‌-প্রান্তেব ধূমকেতু উন্মত্তেব প্রলাপেব মত
নক্ষত্রেব আঙিনায় টলিযা পড়িল অসঙ্গত।

এও চলে। একেব নজিবে অন্যেব প্রামাণ্য ঘোচে না।

কিন্তু যাঁবা এ নিযে আলোচনা কবচেন তাঁবা একটা কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ মনে বাখচেন না যে, সব দৃষ্টান্তগুলিই পয়াব জাতীয় ছন্দেব। আব এ কথা বলাই বাহুল্য যে এই ছন্দ যুক্তধ্বনি ও অযুক্তধ্বনি উভযকেই বিনা পক্ষপাতে একমাত্রাৰূপে ব্যবহাব কববাব সনাতন অধিকাব পেয়েচে। আবাব যুক্তধ্বনিকে দুইভাগে বিশ্লিষ্ট ক'বে তাকে দুই মাত্রায় ব্যবহাব কবাব স্বাধীনতা সে যে দাবী কবতে পাবে না তাও নয।

যাকে আমি অসম বা বিষমমাত্রাব ছন্দ বলি যুক্তধ্বনিব বাছবিচাব তাদেবই এলেকায়।

হৃৎ-ঘটে সুধাবস ভবি

কিম্বা

হৃৎ-ঘটে অমৃতবস ভবি
তৃষা মোব হবিলে সুন্দবী।

এ ছন্দে দুইই চলবে।—কিন্তু

অমৃত নির্ঝবে হৃৎপাত্রটি ভবি
কাবে সমর্পণ কবিলে সুন্দবী—

অগ্রাহ্য—অন্তত আধুনিক কালেব কানে। অসম মাত্রাব ছন্দে এবকম যুক্তধ্বনিব বন্ধুবতা আবাব একদিন ফিবে আসতেও পাবে কিন্তু আজ এটাব চল নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা ব'লে বাখি, সেটা আইনেব কথা নয় কানেব অভিকচিব কথা।

হৃৎ-পটে আঁকা ছবিখানি

ব্যবহাব কবা আমাব পক্ষে সহজ, কিন্তু—

হৃৎ-পত্রে আঁকা ছবিখানি—

অল্প একটু বাধে। তাব কাবণ, খণ্ড "ত"কে পূর্ণ ত-এব জাতে তুল্‌তে হ'লে তাব পূর্ব্ববর্ত্তী স্ববর্ণকে দীর্ঘ কবতে হয—এই চুবিটুকুতে পীড়া বোধ

হয় না, যদি পরবর্ত্তী স্বরটা হ্রস্ব থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী স্বরটাও যদি দীর্ঘ হয় তাহলে শব্দটার পাল্লা ভারি হয়ে পড়ে।

হৃৎ-পত্রে এঁকেছি ছবিখানি,

আমি সহজে মঞ্জুর করি, কারণ এখানে হৃৎ শব্দের স্বরটি ছোটো ও পত্র শব্দের স্বরটি বড়ো। রসনা হৃৎ শব্দ দ্রুত পেরিয়ে পত্র শব্দে পুরো ঝোঁক দিতে পারে। এই কারণেই "দিক্-সীমা" শব্দকে চারমাত্রার আসন দিতে কুণ্ঠিত হইনে, কিন্তু 'দিক্-প্রান্ত' শব্দের বেলা ঈষৎ একটু দ্বিধা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়,—"দিক্-সীমা" কথাটি দরিদ্র, "দিক্‌প্রান্ত" কথাটি পরিপুষ্ট।

এ অসীম গগনের তীরে
মৃৎ-কণা জানি ধরণীরে।

মৃৎ-কণা না ব'লে যদি মৃৎপিণ্ড বলা যায় তবে তাকে চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু একটু যেন ঠেলতে হয় তবেই চলে।

মৃৎ-ভবনে এ কি সুধা
রাখিয়াছ হে বসুধা

কানে বাধে না। কিন্তু

মৃৎভাণ্ডেতে একি সুধা
ভরিয়াছ হে বসুধা—

কিছু পীড়া দেয় না যে তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু অক্ষর গণতি ক'রে যদি বলো ওটা ইন্‌ভীডিয়স্ ডিসটিঙ্ক্‌শন, তাহলে চুপ ক'রে যাব। কারণ কান বেচারা প্রিমিটিভ্ ইন্দ্রিয়, তর্কবিদ্যায় অপটু।

এ তর্কটি এখানেই শেষ ক'রে দেওয়া যাক্। দেখলেম এ তর্কের প্রসঙ্গে বিচিত্রায় কোনো লেখক আভাস দিয়েছেন নয়মাত্রার ছন্দ বাংলাভাষায় অভূতপূর্ব্ব, এবং এই উপলক্ষ্যে তিনিই এই অভাব সদ্য পূরণ করলেন।

এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসে সবুজপত্রে "সঙ্গীতের মুক্তি" এবং ঐ সালের চৈত্র মাসে "ছন্দ" নাম দিয়ে আমি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেম, যিনি নয়মাত্রার ছন্দে বিচিত্রায় শ্লোক পাঠিয়েছেন তিনি বোধ হয় সে দুটো লেখা পড়েন নি কিম্বা ভুলে গিয়েছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে একটি গান রচনা করেছিলেম সবুজপত্রে সেটি উদ্ধৃত হয়েছিল।

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পূরিল পুলকে,

বিমল প্রভাত কিবণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

তা ছাড়া এই ছন্দে পববর্ত্তী কালে দুই একটি-শ্লোক লিখেছিলুম, যথা—

গোড়াতেই ঢাক বাজনা
কাজ কবা তাব কাজ না।

আব একটি—

শকতিহীনেব দাপনি
আপনাবে মাবে আপনি।

বলা বাহুল্য এগুলি ৯-মাত্রায।

সবুজপত্রেব প্রবন্ধে তাব পবে দেখিযেছিলুম ধ্বনি সংখ্যাব কতবকম হেবফেব ক'বে এই ছন্দেব বৈচিত্র্য ঘটতে পাবে। তাতে যে-দৃষ্টান্ত বচনা কবেছিলেম তাব পুনরুক্তি না ক'বে নতুন বাণী প্রযোগ কবা যাক্।

উপবেব ছন্দে ৩+৩+৩-এব লয়। নীচেব ছন্দে ৩+২+৪-এব লয়।

আসন দিলে অনাহূতে
ভাষণ দিলে বীণা-তানে,
বুঝি গো তুমি মেঘদূতে
পাঠাযেছিলে মোব পানে।
বাদল বাতি এলো যবে
বসিযাছিনু একা একা,
গভীব গুরু গুরু ববে
কী ছবি মনে দিল দেখা।
পথেব কথা পূবে হাওযা
কহিল মোবে থেকে থেকে ;—
উদাস হ'যে চ'লে যাওযা,
ক্ষ্যাপামি সেই বোধিবে কে।
আমাব তুমি অচেনা যে
সে কথা নাহি মানে হিযা,
তোমাবে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিযা।
ফুলেব ডালি কোলে দিনু,
বসিয়াছিলে একাকিনী,
তখনি ডেকে বলেছিনু,
তোমাবে চিনি, ওগো চিনি॥

তাব পবে ৪+৩+২ ঃ—

বলেছিনু বসিতে কাছে,
দেবে কিছু ছিল না আশা।

দেবো ব'লে যেজন যাচে
　　বুঝিলে না তাহারো ভাষা।
শুকতারা চাঁদের সাথী
　　বলে, "প্রভু, বেসেছি ভালো,
নিয়ে যেয়ো আমার বাতি
　　যেথা যাবে তোমার আলো।"
ফুল বলে, "দখিন হাওয়া,
　　বাঁধিব না বাহুর ডোরে,
ক্ষণতরে তোমারে পাওয়া
　　চিরতরে দেওয়া যে মোরে॥"

তার পরে ৩+৬ ঃ—

বিজুলী　কোথা হতে এলে,
　　তোমারে　কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের　বুক চিরি গেলে
　　অভাগা　মরে কেঁদে কেঁদে।
আগুনে　গাঁথা মণিহারে
ক্ষণেক　সাজায়েছ যারে
প্রভাতে　মরে হাহাকারে
　　বিফল　রজনীর খেদে।

দেখা যাক্ ৬+৩ ঃ—

মোর বনে ওগো　গরবী,
　　এলে যদি পথ　ভুলিয়া।
তবে মোর রাঙা　করবী
　　নিজ হাতে নিয়ো　তুলিয়া॥

তার পরে ৪+৪+১—ব'লে রাখা ভালো, এই ছন্দটি পড়বার সময় সবশেষ ধ্বনিটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বারে বারে যায় চলি-যা,
　　ভাসায় নয়ননীরে সে,
বিরহের ছলে ছলি-যা
　　মিলনের লাগি ফিরে সে।
যায় নয়নের আড়া-লে,
　　আসে হৃদয়ের মাঝে গো।
বাঁশিটিরে পায়ে মাড়া-লে
　　বুকে তার সুর বাজে গো।

ফুলমালা গেল শুকা-য়ে,
দীপ নিবে গেল বাতা-সে,
মোর ব্যথাখানি লুকা-য়ে
মনে তার বহে গাঁথা সে।
যাবার বেলায়, দুয়া-রে
তালা ভেঙে নেয় ছিনি-যে,
ফিরিবার পথ উহা-রে
ভাঙা দ্বার দেয় চিনি-যে॥

এই ৮+১-কে উল্টিয়ে ১+৮ অক্ষরে সাজানো যায় কিন্তু পড়তে গেলে সেই প্রথম ১-এর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। চরণের শেষে যেখানে দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই যতির মধ্যে তাকে আসন দেওয়া যায়। কিন্তু আরম্ভ ধ্বনিটির পরে যতি না থাকাতে সে থামতে পারে না, অনুবর্ত্তী ধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়। যেমন—

হে ভয়ঙ্কর শঙ্কর,
হে রুদ্র প্রলয়ঙ্কর,
এ বসুন্ধরা ক্রন্দিতা,
ও পিণাক তব টঙ্কর॥

৩+২+৪-এর লয় পূর্ব্বে দেখানো হয়েছে, ২+৩+৪-এর লয় এখানে দেওয়া গেল ঃ—

আলো এল যে দ্বারে তব
ওগো মাধবী বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া নব নব
তৃণে বিছায়ে গাঁথো মায়া॥
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে,
আজি ফাগুনে একসাথে
দোলা লাগিয়ো নাচে নাচে॥
বধূ, তোমার দেহলিতে
বর আসিছে দেখিছ কি।
আজি তাহার বাঁশরিতে
হিয়া মিলায়ে দিয়ো সখি॥

৪+২+৩-এর ঠাটেও নয় মাত্রাকে সাজানো চলে, যেমন—

সেতারের তারে ধানশী
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়া।
গোধূলির রাগে মানসী
সুরে যেন এলো সাজিয়া॥

আর একটা ঃ—

তৃতীয়ার চাঁদ বাঁকা সে,
আপনারে দেখে ফাঁকা সে।
　　তারাদের পানে তাকিয়ে
　　কার নাম যায় ডাকিয়ে
সাথী নাহি পায় আকাশে॥

একটা ৪+৫ লয়ের ছন্দ দেখা যাক্—

জলে ভরা　নয়ন-পাতে
　　বাজিতেছে　মেঘ-রাগিণী।
কি লাগিয়া　বিজনরাতে
　　উড়ে হিয়া,　হে বিরাগিনী।
ম্লান মুখে　মিলালো হাসি
　　গলে দোলে　নব মালিকা।
ধরাতলে　কী ভুলে আসি
　　সুর ভোলে　সুরবালিকা॥

এতক্ষণ এই যে নয় মাত্রার ছন্দটাকে নিয়ে নয় ছয় করছিলুম সেটা বাহাদুরি করবার জন্যে নয়, প্রমাণ করবার জন্যে যে এতে বিশেষ বাহাদুরি নেই। ইংরেজি ছন্দে এক্‌সেণ্টের প্রভাব, সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ-হ্রস্বের সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবী রক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই। জল পড়ে পাতা নড়ে থেকে আরম্ভ ক'রে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মাত্রা পর্য্যন্ত বাংলা ছন্দে আমরা দেখি। এই সুযোগে কেউ বল্‌তে পারেন এগারো মাত্রায় ছন্দ বানিয়ে নতুন কীর্ত্তি স্থাপন করব। আমি বলি তা করো কিন্তু পুলকিত হোয়োনা, কেননা, কাজটা নিতান্তই সহজ। দশ মাত্রার পরে আর একটা মাত্রা যোগ করা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। যেমন—

চামেলির ঘন-ছায়া-বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা মালিনী
কুসুমমালায় গাঁথা শিথানে॥

অন্যরকমের মাত্রা ভাগ করতে চাও সেও কঠিন নয়, যেমন—

মিলন-সুলগনে কেন বল্
নয়ন করে তোর ছলছল্।
বিদায়-দিনে যবে ফাটে বুক,
সেদিনো দেখেছি তো হাসিমুখ॥

তার পরে তেরো মাত্রার প্রস্তাবটা শুন্‌তে লাগে খাপছাড়া এবং নতুন, কিন্তু পয়ার থেকে একমাত্রা হরণ করতে দুঃসাহসের দরকার হয় না, সে কাজ

অনেকবার করেচি, তা নিয়ে নালিশ ওঠে নি। যথা, "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।" এক মাত্রা যোগ ক'রে পয়ারের জ্ঞাতিবৃদ্ধি করাও খুবই সহজ— যথা,

হে বীর জীবন দিয়ে মরণেরে জিনিলে,
নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে।

ষোলো মাত্রার ছন্দ দুর্লভ নয়,—অতএব দেখা যাক্ ১৭ মাত্রা ঃ—

ভরা নদী, তুই কূলে কূলে
কাশবন দুলিছে।
পূর্ণিমা তারি ফুলে ফুলে
আপনারে ভুলিছে॥

আঠারো মাত্রার ছন্দ সুপরিচিত, তার পরে উনিশ—

ঘন মেঘভার গগনতলে,
বনে বনে ছায়া তারি,
একাকিনী বসি নয়নজলে
কোন্ বিরহিনী নারী॥

তার পরে, কুড়ি মাত্রার ছন্দ সুপ্রচলিত। ২১ মাত্রা, যথা,

বিচলিত কেন মাধবী শাখা,
মঞ্জরী কাঁপে থরথর,
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপি চুপি করে মরমর॥

তার পরে,—আর কাজ নেই। বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ করতে পেরেচি যে, বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করেনা।

সংস্কৃত ভাষায় নতুন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের পর্য্যায় বেঁধে তার সঙ্গীত। বাংলায় সেই দীর্ঘধ্বনিগুলিকে দুই মাত্রায় বিশ্লিষ্ট ক'রে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্য্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।—

যক্ষ সে কোনো জনা আছিল আনমনা, সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত, বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি-শিখরে মরে ফিরি একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা
যেথায় শীতল ছায় ঝরণা বহি যায় সীতার স্নানপূত জলধারা।
মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস প্রেয়সী বিচ্ছেদে বিমলিন,
কনক বলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা, বিরহ-দুখে হোলো বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে, যক্ষ নিরখিল গিরিপর
ঘন ঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে, দন্ত হানে যেন করিবর॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যে বাস্তবতা

বাংলা সাহিত্যের ধারা নিয়ে আজ অনেক আলোচনা চলেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কিছুদিন হল সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হ'লেও যে সে আলোচনায় যোগ দিতে সাহস পেয়েছি, তার একমাত্র কারণ জাতির মনের স্বভাব সহজে বদলায় না। এবং চার বছরেই যে বাংলা সাহিত্যের ধারার কোন বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা আমার মনে হয় না। তাই বহুদিন ধ'রে যে চিন্তার ধারা, যে সাহিত্যের ট্র্যাডিশন ও আবহাওয়া গ'ড়ে উঠেছে, তারি সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা আমি বলতে চাই। সাহিত্যের প্রাত্যহিক প্রকাশের সঙ্গে অপরিচয় সকল সময়ে আমাদের সাহিত্যবিচারের হানি করে না—অনেক সময়ে এ অপরিচয়ে লাভই আছে। সাহিত্যের খুঁটিনাটির সংবাদ সংগ্রহে হয়তো তাতে বাধা পড়ে, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই সাহিত্যের সমগ্ররূপ দেখবার সম্ভাবনা তাতে সহজতর হয়ে আসে। কেবল দূরত্বই বাধার সৃষ্টি করে না—কাছের বাধাও খুবই কঠিন হতে পারে। পাহাড়ের একান্ত কাছে দাঁড়ালে তাকে সমগ্রভাবে দেখা যায় না,—সামনের গাছপালা, ছোট ছোট বাড়ী ঘর, পাথর ঝর্ণার প্রাচুর্য্যে পর্ব্বতের রূপরেখা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তেমনি সাহিত্যের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার বিভিন্ন প্রকাশ-কেই আমরা স্বতন্ত্র ক'রে দেখি, তার সমগ্রতার বিশিষ্ট মূর্ত্তি আমাদের চোখে ধরা দেয় না। তাছাড়াও, যে সাহিত্যের ধারার মধ্যে আমরা বাস করি, তার আবহাওয়া এমনি ক'রে আমাদের মানসগঠনে মিশে যায় যে তাকে বস্তুগতভাবে দেখবার আমাদের ক্ষমতা থাকে না; তাকে আমরা বিনা প্রশ্নেই স্বীকার ক'রে নিই, তার রীতি, তার ধারাকে স্বভাবের ধারা ব'লে মেনে নিই। সেখানেও যে সমস্যা থাকতে পারে, তার ধারা নিয়েও যে তর্ক চলতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হয় না। তাই নিজেদের সাহিত্যকে সে ভাবে অবজেকটিভ্‌লি দেখতে চাইলে তার প্রভাবের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, অন্য দেশের সাহিত্যের ধারার সঙ্গে তার ধারার তুলনামূলক বিচার চাই।

সে তুলনামূলক বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ধারার আলোচনায় একদিকে যেমন বিভিন্ন সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনার স্থান নাই, তেমনি অন্যদিকে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ লেখকের লেখার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। কাজেই যদি কোন লেখক সাধারণ ধারাকে এড়িয়ে থাকতে পারেন, তবে তাঁর প্রতি আমার কথা প্রযোজ্য নয়—তাঁর নূতনত্বের সাধনা জয়যুক্ত হোক।

বাংলা সাহিত্যে আজ কথায় কথায় কল্পনাবাদ বস্তুবাদ, রিয়ালিজম আইডিয়ালিজম নিয়ে তর্ক ওঠে—নানা লেখককে শ্রেণীবিভাগ ক'রে ফেলবার চেষ্টা হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধে সে বাদানুবাদে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নাই। সে তর্কের অনেকখানিই অর্থহীন, যদিও নির্জ্জীব প্রাণহীনতায় নিষ্প্রশ্ন স্বীকার ক'রে নেওয়ার চেয়ে এ রকম কেবলমাত্র কথা-কাটাকাটিও অনেক বেশী মূল্যবান। (আমি শুধু বলতে চাই যে সাহিত্যে যদি জীবনের ছায়াই না পড়ে, তবে সে সাহিত্যের মূল্যই বা কী—জীবনে তার স্থানই বা কোথায়? 'সাহিত্যের জন্য সাহিত্য', 'আর্টের জন্য আর্ট' এ সব কথা অর্থহীন।) যারা সে সব কথা বলে, তারা নিজের মন নিজেই স্পষ্ট ক'রে জানে না, কী যে তারা বলতে চায় অন্যকে কেমন ক'রে বোঝাবে? আর যেখানে সত্যি সত্যি বোঝাবার কিছুই নাই, সেখানে সে নির্ব্বুদ্ধিদের ব্যর্থপ্রয়াসে আশ্চর্য্য হওয়া নিষ্প্রয়োজন। (আর্ট বা সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের প্রেরণা, মানুষের সাধনা দিয়েই গ'ড়ে ওঠে—মানুষের আবেগ ও ভাবরাজ্য মানুষের চিন্তাধারাকে অবলম্বন ক'রেই তার স্থিতি। কাজেই মানুষের জীবনেই যদি তার স্থান না হয়, তবে সে সাহিত্যে আমাদের প্রয়োজন কী? জীবনের সঙ্গে যার সম্বন্ধ রয়েছে, জীবনে তারই স্থান জুটবে। মানুষের সুখদুঃখ আশাভরসাকে সুন্দর ক'রে, চিরন্তন ক'রে জীবনে তার স্থান দেওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম।)

(তাই জীবনের সঙ্গে যার সম্বন্ধ নাই, কেবলি স্বপন আকাশে রপন ক'রে আকাশেই যার বৃদ্ধি, সে অলস হৃদয়ের বিলাস আর যাই হোক, তা সাহিত্য নয়। জীবনের বিপুল বিস্তারের মধ্যে তারও স্থান আছে, স্বপ্ন দেখবার প্রবৃত্তি আমাদের সকলেরই রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন যে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিরাত্রেই স্বপ্ন দেখি; বেশীর ভাগ স্বপ্নই ভুলে যাই, মাঝে মাঝে যেগুলি মনকে বেশী নাড়া দিয়ে যায়, সেগুলি জাগ্রতক্ষণেও মনে থাকে। (কিন্তু তাই ব'লে সেই স্বপ্নকেই যদি কেউ জীবনের চেয়ে বড় ক'রে তুলতে চায়, তার স্থান হয় পাগলা-গারদে, সাহিত্যের মহলে নয়।)

বাংলা সাহিত্যের দরবারে আজ এ কথা বিচারের প্রয়োজন হয়েছে। পরাধীন জাতির মনের লক্ষণই এই যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা সারাক্ষণই ব্যাকুল। মনে ভয় রয়েছে যে যদি তারা নিজেদের অধিকার সর্ব্বক্ষণই দাবী না করে, তবে পৃথিবী পাছে বা সে দাবী অস্বীকার ক'রে বসে। তাই বাইরের পৃথিবী যাই বলুক বা না বলুক, বাইরের পৃথিবী আমাদের ডাকুক বা না ডাকুক, আমরা পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে সর্ব্বক্ষণই ব্যগ্র। পৃথিবী আমাদের সম্মান

করেছে, পৃথিবী আমাদের সবার সেরা ব'লে মেনে নিয়েছে—এ কথা জোর গলায় প্রচার ক'রে আমরা নিজেদের হাস্যাস্পদই করি—আত্মগৌরবে সত্যকার গৌরব কোনদিনই বৃদ্ধি পায় না। সমালোচনায় আমরা যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তার কারণ মনে ভয় থাকে যে, সে সমালোচনা হয়তো সত্য। যার আত্মপ্রত্যয় আছে, নিজের দোষগুণ দুই নিজেই জানে, সে কেন অন্যের সমালোচনায়—তা সে সমালোচনা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক—চঞ্চল হয়ে উঠবে? দোষ বা ত্রুটি সংস্কারের জন্য নিজেরই তাকে দোষ ব'লে জানা দরকার, আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতার গোপন কারণও তাই আমাদের নিজেদেরকেই উপলব্ধি করতে হবে।

বাস্তবজগতে আমরা পরাধীন—সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে আমরা হেয়। আমাদের দেশে লোকের ক্ষুধায় অন্ন জোটে না, আমাদের দেশে নারীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্রেরও অভাব। আমাদের দেশের শিশুর জীবনেও আনন্দ নাই—রুগ্ন দেহে, নিরানন্দ গৃহে জীর্ণ মন নিয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপনই আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনের ইতিহাস। কিন্তু স্বপ্নজগতে সে দৈন্য, সে দারিদ্র্য, সে পরাধীনতার লজ্জা আমাদের স্পর্শ করে না। আমরা অতীতের স্বপ্ন দেখি, ভবিষ্যতের স্বপ্নরচনা করি, কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানকে ভোলবার উপায় কোথায়? তবু সে বর্ত্তমানকে অস্বীকার ক'রেই আমরা চলি—স্বপ্ন দিয়ে তার সত্যের কঠিনতাকে যতদূর পারি কোমল ক'রে তুলতে চেষ্টা করি।

এই স্বপ্নবিলাস একান্তভাবে পরাধীন জাতিরই মনের লক্ষণ। যেখানে সম্মান জোটে নাই, সেখানেও নিজেদের কল্পনায় আমরা সম্মান সৃষ্টি ক'রে তুলি। সাহিত্যেও এই অবাস্তবতা আমাদের মজ্জায় ঢুকেছে। তাই জীবনের সঙ্গে তার যোগ অনেকখানেই নাই—জীবনের কঠিন রূঢ় সত্যকে অস্বীকার ক'রেই সে সাহিত্যের বিকাশ। তিনিই সাহিত্যিক বা শিল্পী যাঁর অনুভূতি তীক্ষ্ণ, যাঁর কল্পনা ও আবেগ দুই-ই সূক্ষ্মতমভাবে জীবনের বিভিন্ন প্রকাশে সাড়া দেয়, জীবনের বহুমুখী স্রোতধারাকে নিজের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত ক'রে সত্য ও সুন্দর ক'রে তোলে। তাই সংসারের গীতশূন্য অবসাদপুর আশার সঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে ওঠে, কর্ম্মহীন জীবনের বিপুল বিস্তার তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, দুঃখ তার ভাষা খুঁজে পায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ কোথায়? দেশের দৈন্য, দেশের দারিদ্র্য, দেশের ক্ষুধা, দেশের হাহা-কারের প্রতিধ্বনি তার মধ্যে মেলে কই? রাজনৈতিক আন্দোলনের রাজনীতির সঙ্গে হয়তো সাহিত্যের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু জাতির অন্তরের গভীরতম কেন্দ্র হতে যে সাড়া জাগে, বহুযুগের সঞ্চিত

যে গ্লানি, যে পাপেব বোঝা ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে জাতিব জীবনে জোয়াব আসে, সাহিত্যিকেব মনে কি তাব সাড়া জাগে না? তখনই যদি তাব মন দোলা না দিয়ে ওঠে, তবে তাব অনুভূতিব সূক্ষ্মতা কই? তাব কল্পনাব, তাব হৃদযাবেগেব প্রবলতাব পবিচয় কোথায়?

সকল সাহিত্যই যে প্রপাগ্যাণ্ডা বা কেবলমাত্র মতামত প্রকাশ-মূলক হবে এমন কথা কেহই বলে না। কিন্তু কোন কথা বলতে গেলেই তাতে কোন-না-কোন মত প্রকাশ পায, এবং সেভাবে সাহিত্যে যদি মতামত প্রকাশ না থাকে তবে সে সাহিত্যেব জীবনেব সঙ্গে যোগ শিথিল হয়ে আসে। এ স্বপ্নবিলাস কেবলমাত্র কেতকীছায়ায চন্দ্রালোকে মেঘ-আলোতে হাসিকান্নাব লীলা দিযেই প্রকাশ পায না—তথাকথিত অতি আধুনিক সাহিত্যেব সঙ্গে আমাব যতটুকু পবিচয, তাব উগ্র জোবকবা বাস্তবতাব মধ্যেও এব লক্ষণ দেখেছি ব'লে মনে হয। জীবনে যে সেক্সেব স্থান আছে সে কথা অস্বীকাব কবা যেমন বাতুলতা, জীবনে সেক্স ছাড়া আব কিছুবই স্থান নাই সে কথা বলাও ঠিক সমানই বাতুলতা। পুরুষ নাবীসঙ্গ ভালবাসে, নবনাবীব দৈহিক মিলন সে ভালবাসাব একটা অঙ্গ, কিন্তু দেহেব মিলনই যেমন ভালবাসাব সমস্তখানি নয, ঠিক তেমনি ভাল-বাসাও জীবনেব সমস্ত প্রাঙ্গণকে জুড়ে নাই। এখানেও দেশেব দাবিদ্র্য, দেশেব ক্ষুধা, দেশেব জনসাধাবণেব অন্নচিন্তাব কথা ওঠে। জীবনেব ভিত্তিতে ক্ষুধা এবং সেক্সেব মধ্যে কোনটী যে গভীবতব, সে বিষযে হযতো তর্ক চললেও চলতে পাবে, কিন্তু দুটীই যে জীবনেব একান্ত মূলে, সে কথা অস্বীকাব কববাব তো উপায নাই। আব দেশেব জীবনে আজ যে বান ডেকেছে, দেশেব বাজনৈতিক আন্দোলন যাব কেবল একটী মাত্র দিক, সেই জোয়াবেব স্রোতে কি এই তরুণ সাহিত্যিকদেব মনেও সাড়া জাগে নাই? তাঁবা কি কেবল তাঁদেব স্বপ্নজগতে নিজেব মনেব কাবাগাবেই বন্ধ থাকবেন—জীবনেব বিপুল প্রসাবকে হৃদয়েব প্রসাব দিযে প্রতিফলিত ক'বে তুলবেন না?

বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক—সকল বকম দাসত্বই মনকে সঙ্কীর্ণ ক'বে তোলে। তাই ছুৎমার্গ একান্তভাবে দাসমনোভাবেবই লক্ষণ। জীবনেব প্রবাহ যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধাবন্ধনকে আপনাব স্রোতে ভাসিযে নিযে যায। তাব চলাব পথে তাই আবর্জ্জনা জমতে পাবে না—সকল মযলা ধুযে মুছে যায। স্রোতেব জল তাই সকল সমযেই পান কবা চলে, কিন্তু সেই নদীই যখন ম'বে যায, তখন কেবলমাত্র তাব জলই দূষিত হযে ওঠে না—তাব প্রবাহেব প্রসাবও ক'মে যায়। জাতিব জীবন যখন মন্দীভূত হযে আসে, তখন সংসাবেব বিপুল

বিস্তার উপলব্ধি করবার তার আর ক্ষমতা থাকে না। তাই তার সাহিত্য একমুখী হয়ে ওঠে, বাস্তব জগতের কঠিনতার সাধনা ভুলে যায়, বাস্তব জগতের রূপবৈচিত্র্য আর তার মনকে স্পর্শ করে না—সে সাহিত্যের জীবনের সঙ্গে যোগ নাই।

সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কোন স্বভাবগত বিরোধ নাই, তাই কঠিনতার মধ্যেও আমরা সৌন্দর্য্য খুঁজে পাই। মানুষের সুখদুঃখের চিরন্তন রূপ তাই সুন্দর—সমগ্রতার মধ্যে তার বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যও তাই আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আমরা রূপ বা সৌন্দর্য্যের কোমলতাই দেখেছি, শক্তির চেয়ে মাধুর্য্যের কারুণ্যেই আমাদের মন বেশী সাড়া দিয়েছে। কোমলতা বা মাধুর্য্যের মূল্য অস্বীকার করতে কেহই পারে না; কিন্তু জীবন তো একরঙা ছবি নয়, তার পর্দ্দায় পর্দ্দায় বহু রঙের যে বিকাশ তাকে কেবল একটী ধারার মধ্যে ফেলবার চেষ্টায় আমরা তার ঐশ্বর্য্যের হানিই করি। সত্যের অপলাপে তার সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ থাকে না, কারণ বৈচিত্র্যের সমন্বয় সৌন্দর্য্যের প্রাণমন্ত্র।

বাংলা সাহিত্যে অবাস্তবতা যে কত বেশী তার কেবল আর একটীমাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে এ প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। সে কথা হয় তো অনেকের কাছেই অপ্রিয় হবে। কিন্তু অপ্রিয় হ'লেও যে কথা সত্য, সে কথা বলবার প্রয়োজন আছে। মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়মের কাপুরুষতা দেশের অনেক আবর্জ্জনার জন্যই দায়ী—সে কাপুরুষতা আজ বর্জ্জন করতে হবে।

এদেশে আজ প্রায় সাতশো বছর হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি ঘর করেছে। দুঃখে সুখে, শান্তি অশান্তিতে, কলহকোন্দলে, বন্ধুত্বমিলনে তাদের সম্বন্ধ কি কখনো রাঙিয়ে ওঠে নাই? বন্ধুত্ব শত্রুতা জাতিধর্ম্ম মেনে চলে না। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কাউকে আমরা ভালবাসি, কাউকে হিংসা করি, কাউকে ঘৃণা করি। কারু সঙ্গে শৈশবের পরিচয় যৌবনের বন্ধুত্ব গ'ড়ে তোলে। কারু সঙ্গে জাতিধর্ম্মভেদের পার্থক্যের সঙ্গে স্বার্থ-বৈভিন্ন্য মিলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু সন্ধির পথেই হোক আর দ্বন্দ্বের পথেই হোক, জীবনে কেবলমাত্র হিন্দু বা কেবলমাত্র মুসলমানের ছায়া পড়েছে এমন লোক বাংলাদেশে বেশী নাই। যেখানে বাতাস এক, আবহাওয়া এক, নদনদী খালবিল এক, একই মাঠে পাশাপাশি কাজ করতে হয়, একই গাঁয়ে ঘর বেঁধে থাকতে হয়, সেখানে হিন্দুমুসলমান পরস্পরের গায়ের বাতাস বাঁচিয়ে চলবে কেমন ক'রে? কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোথাও কি তার ছায়াটুকুও পড়েছে? সমস্ত বাংলা সাহিত্য প'ড়েও কি কেউ ভাবতে পারে যে সাতশো বছর এত বড় দুটো জাতি এমনি ক'রে পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছে? হিন্দু লেখকদের কথাই আমি বলব, কারণ বাংলা সাহিত্য

প্রধানতঃ তাঁদেবই সৃষ্টি, বাংলা সাহিত্য বললে এখন প্রাযই কেবলমাত্র তাঁদেব সাহিত্যই বোঝায। কিন্তু তাঁদেব কাব্যে উপন্যাসে গল্পে কি এই যুক্তজীবনেব কোন সাক্ষ্য মেলে? হয়তো দুযেকজন কখনো কোন জায়গায় মুসলমানেব নামোল্লেখ কবেছেন, কিন্তু মাঝি খানসামা ছাড়া কি বাংলাদেশে মুসলমান নাই? আব সে কথা ছেড়ে দিলেও যেখানে তাঁবা মুসলমানকে টেনেছেন সেখানে কি সত্যি তাদেব স্থান আছে? সাহিত্যের সৃষ্টিতে সে চবিত্রগুলি কি জন্মলাভ কবেছে, না কেবলমাত্র ঘটনা-পবম্পবায় নেহাৎ আলগোছা ভাবে তাদেব এক্সটার্ণালি যুক্ত কবা হযেছে? তাবা কি সত্যি বক্তমাংসেব মানুষ, না কেবলমাত্র বিদেশী ভাষায কয়েকটা নাম? তাদেব নাম বদলিযে কোন হিন্দু বা অন্য নাম সেখানে বসালে কি গল্পেব কোন হানি হয, না পবিবর্ত্তন লোকেব চোখে একেবাবে ধবাই পডে না? বাংলাব সাহিত্য বাংলাব জাতীয় জীবনেব এ বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পাবে নাই, তাই জীবনেব পবিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে বাংলা সাহিত্য আজো সমৃদ্ধ হযে ওঠে নাই।

এই যে সতর্ক সন্তর্পণে ছোঁযাছুঁয়ি বাঁচিযে সাহিত্য গ'ডে তোলবাব চেষ্টা এতদিন ধ'বে আমবা ক'বে এসেছি, সেও আমাদেব মানসগঠনেব অবাস্তবতাবই একদিকেব প্রকাশ। আমবা বাইবেব পৃথিবীব সঙ্গে সম্পর্ক বাখতে পাবিনি, তাই চাঁদেব স্বপ্নই হোক আব সেক্সেব স্বপ্নই হোক,—স্বপ্ন-জগৎ অতিক্রম ক'বে নবনাবীব আনন্দ-বেদনাময় এই মাটিব পৃথিবীতে আমাদেব সাহিত্য পৌঁছায় নাই। এই পবিচিত পৃথিবীব দ্বন্দ্বকলহ পার্থক্য-মিলনেব ছাযা তাই সে সাহিত্যে নাই, জীবনেব বিচিত্র প্রকাশেব ঐশ্বর্য্য সেখানে সৌন্দর্য্যে সত্য হয়ে ওঠে নাই। তাই সে সাহিত্য কেবলমাত্র খেলাই বযে গেছে, জীবনেব বাস্তবতা লাভ করে নাই। দেশেব সামাজিক ও বাজনৈতিক সমস্যাব ছাযা তাতে পড়েনি। দ্বন্দ্ব স্বার্থেব ক্ষেত্রে যে বাবে বাবে কটু হয়ে ওঠে, কল্পনা দিযে, সহানুভূতি দিয়ে সাহিত্যেব জগতে তাকে সুন্দব ক'বে তুলতে পাবিনি ব'লে পদে পদে আমাদেব তাই পবাজয় হয়েছে। আজ যিনি বাংলা সাহিত্যেব সে স্বপ্ন ভাঙতে পাববেন, ঘুমন্তপুবীব বাজ-কন্যাকে জাগিযে সংসাবেব ঘবকবণায় নামাতে পাববেন তিনি যে কেবলমাত্র ব্যাবহাবিক জীবনেই আমাদেব সুখস্বাচ্ছন্দ্যেব মাত্রা বাড়িযে দেবেন, তা নয়—নতুন জাগবণেব বুদ্ধিব আলোকে সাহিত্য-লক্ষ্মীব রূপশ্রীও তাঁব স্পর্শে নতুন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

হুমাযুন কবিব

মোক্ষ ও নির্ব্বাণ

গতবাবেব ‘পবিচযে’ আমবা যাজ্ঞবল্ক্যেব মোক্ষবাদেব আলোচনা কবিতে গিযা দেখিযাছিলাম যে, অমৃতেব পুত্র জীব চিবদিন অমৃতত্ব-পিপাসু—তাহাব চিবন্তন প্রার্থনা—‘মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়’। অতএব বেদেব কর্ম্মকাণ্ডেব উদ্দিষ্ট পুন-র্মৃত্যুময় স্বর্গস্থিতিকে জীব কোন মতে ববণ কবিতে পাবে না। ‘স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত’—এই বিধিব বিরুদ্ধে সে বলে—

পবীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদম্ আযান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—মুণ্ডক, ১।২।১২

‘কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি (অস্থাযী)-লোকেব পবীক্ষান্তে নির্বেদ-প্রাপ্ত হইযা বুঝিয়াছি—কৃতেব দ্বাবা কখনও অকৃতকে, অনিত্যেব দ্বাবা কখনও নিত্যকে অর্জ্জন কবা যায় না’। তখন জীব অমৃতত্বেব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় (আবৃত্ত-চক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্—কঠ, ২।১।১)—এবং বেদেব জ্ঞানকাণ্ডের উপদিষ্ট মোক্ষমার্গে প্রবেশ কবিযা ‘ব্রহ্মসাযুজ্য’ সাধন কবে এবং ঐ সাধনাব ফলে,—যিনি অজব অমব অক্ষব, যিনি অব্যয় অক্ষয় অদ্বয, যিনি চিবন্তন সনাতন পুবাতন—সেই ব্রহ্মেব সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত কবিয়া, ব্রহ্মেব সহিত একীভূত হইয়া, পুনর্মৃত্যুব পবপাবে অমৃতধামে উপনীত হয়। এই যে অমৃতত্ব-সিদ্ধি, ইহাবই প্রাচীন নাম মোক্ষ বা মুক্তি।

সংসাব-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেত, ৬।১৬
অমৃতোভূত্বা মোক্ষী ভবতি—জাবাল ১

যদ্ ইদং সর্ব্বং মৃত্যুনা আপ্তং সর্ব্বং মৃত্যুনা অভিপন্নং, কেন যজমানো মৃত্যোঃ আপ্তিম্ অতি মুচ্যত ইতি × × × স মুক্তিঃ সা অতি মুক্তিঃ—বৃহ, ৩।১।৩

কেহ কেহ আবাব সে যুগে ‘বি’ বা ‘প্র’ উপসর্গ যোগ কবিয়া এই মোক্ষকে বিশেষিত করিতেন।

অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায এব ব্রূহি—বৃহ, ৪।৩।৩৩
ইত ঊর্দ্ধং বি-মুক্তাঃ—বৃহ, ৪।৪।৮
তস্য তাবদেব চিবং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বি-প্র-মোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদেও ঐ ‘বিমোক্ষ’ শব্দেব প্রযোগ আছে—

বিমোক্খো যস্স গোচবো—অবহন্তবগ্গো ৩
সম্যদঞ্ঞা বিমুত্তানং (বিমুক্তানাং)—পুপ্ফবগ্গো ২৪

নির্ব্বাণ কি মোক্ষ ?

এই মোক্ষকেই বুদ্ধদেব 'নির্ব্বাণ' বলিয়াছেন—উহাই তাঁহার উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গের লক্ষ্যস্থল। কোন প্রাচীন উপনিষদে কিন্তু এই 'নির্ব্বাণ' শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে, তখনও 'নির্ব্বাণ' শব্দের মোক্ষ অর্থ হয় নাই। এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম কি অষ্টম শতকে সঙ্কলিত পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-ব্যাকরণেও 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ মোক্ষ নহে—নির্ব্বাণঃ অবাতে—৮।২।৫০।* বুদ্ধের পরবর্ত্তী 'চাণক্যসূত্রে' মোক্ষের প্রতিশব্দরূপে নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—দুঃখানাম্ ঔষধং নির্ব্বাণম্। ইহা বিচিত্র নহে, কারণ, চাণক্যযুগের পূর্ব্বেই বুদ্ধদেবের দেশনার ফলে 'নির্ব্বাণ' শব্দ ভারতাকাশ মুখরিত করিতেছিল। কোন কোন অর্ব্বাচীন উপনিষদে মোক্ষ-অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী।

এবং নির্ব্বাণানুশাসনং বেদানুশাসনম্—আরুণেয়, ৫

একমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি নির্ব্বাণম্—ব্রহ্ম, ২

গীতাতেও কয়েকবার নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি—৬।১৪

স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি—২।৭২

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি—৫।২৪

গীতা এখন আমরা যে আকারে পাই, খুব সম্ভবতঃ তাহা বুদ্ধদেবের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন।† সেই জন্য গীতাতে নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে, দীপনির্ব্বাণ বলিলে যাহা বুঝায়, ঐ যুগে বোধ হয় 'নির্ব্বাণ' শব্দ ঐ extinction-অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইজন্য গীতাকার 'ব্রহ্ম' শব্দ উপসর্গরূপে যোগ করিয়া নির্ব্বাণ যে নাস্তিত্ব নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ—গীতা, ৫।২৫

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্—গীতা ৫।২৬

---

* নির্-পূর্ব্বক 'বা' ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয় হইলে 'নির্বাত' স্থলে 'নির্বাণ' পদ সিদ্ধ হইবে—অবাতে অর্থাৎ বায়ুর সংস্পর্শ না বুঝাইলে (ন চেদ্ বাতাধিকরণো বাত্যর্থো ভবতি—কাশিকা)—যেমন নির্ব্বাণঃ অগ্নিঃ কিন্তু নির্বাতং বাতেন।

† আমার ধারণা, গীতা প্রাচীনতর আকারে এক সময় প্রচলিত ছিল—মহাভারতের 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে' উহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং উহা সম্ভবতঃ অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনে শেষ হইত।

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

সে যাহা হ'ক্, 'প্রকৃতম্ অনুসবামঃ'—আমাদেব বক্তব্যে ফিরিযা আসি।

ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষের পন্থা

আমবা দেখিয়াছি, ব্রহ্মবিজ্ঞানই ব্রহ্মেব সহিত সাযুজ্য-লাভেব অনন্য পন্থা—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি—কৌষী, ১।৪
অথ যো হবৈ তৎপবমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পবব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম হন।' সেইজন্য শ্বেতাশ্বতব বড গলা কবিযা বলিযাছেন—

যদা চর্ম্মবদ্ আকাশং বেষ্টযিষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবম্ অবিজ্ঞায সংসাবান্তো ভবিষ্যতি॥—শ্বেত, ৬।২০

'যেদিন মানুষ বাহুদ্বাবা ক্ষুদ্র চর্ম্মখণ্ডেব মত আকাশকে বেষ্টন কবিতে পাবিবে, সেইদিন ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হইবে।'

কেবল উপনিষদেব কেন, প্রাচীনতব সংহিতাব ও ব্রাহ্মণেবও ঐ কথা।

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পবস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুম্ এতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽযনায়॥
—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮

'আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্য-বর্ণ, যিনি তমসেব পবপাব। তাঁহাকে জানিলে, তবে মৃত্যু অতিক্রম কবা যায—অযনেব ইহাই অনন্য পন্থা।'

অকামো ধীবো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ
বসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ
আত্মানং ধীবম্ অজবং যুবানম্॥
—অথর্ব্ববেদ, ১০।৪।৮।৪৪

'যিনি সেই চিব-তরুণ, অজব; ধীব (বিপশ্চিৎ) পবমাত্মাকে জানেন, মৃত্যু হইতে তাঁহাব ভয হয় না।'

তস্যৈব আত্মা পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন।—তৈত্তিবীয ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯।৮

'তাঁহাকে যিনি জানিতে পাবেন, তাঁহাব আত্মা পদবিৎ (path-finder) হয় —তিনি কর্ম্মরূপ পাপ দ্বাবা লিপ্ত হন না।'

বিদ্যযা তদাবোহন্তি যত্র কামাঃ পবাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিন ইতি॥
—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫

'যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়, তখন বিদ্যা দ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবন্ত যাইতে পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না।'

আমরা দেখিয়াছি, এই ব্রহ্মসাযুজ্যই মোক্ষ।

ব্রহ্মবিজ্ঞান কারণ না কারক ?

এই প্রসঙ্গে আমাদের চিন্তাকে একটু সতর্ক করিতে চাই। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় বটে কিন্তু ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মোক্ষের জনক নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নহে। মোক্ষ সিদ্ধ বস্তু, সাধ্য নহে—মোক্ষ অজাত, অকৃত—জাত বা কৃত নহে—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 'It is un-caused and is not the consequence or effect of any cause।' দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে—'It is Being and not Becoming—সম্ভূতি নয়, অসম্ভূতি (ঈশ-উপনিষৎ, ১২-১৪*)।' যাহারই উৎপত্তি আছে, তাহাই বিনাশশীল—মোক্ষ যদি নৈমিত্তিক হইত, তবে উহা নিত্য হইতে পারিত না। গৌড়পাদাচার্য্য ঠিক্ই বলিয়াছেন—

অনাদেরন্তবত্ত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥

—মাণ্ডূক্যকারিকা, ৪।৩০

'অনাদি সংসারের অন্ত কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। মোক্ষের যদি উৎপত্তি থাকিত, তবে তাহা অনন্ত হইতে পারিত না।'

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—'What has in any way become, what is compounded—that is changeable and must perish.'—

যং খো পন কিঞ্চি অভিসংখতং অভিসংচেতযিতং,
তং অনিচ্চং নিরোধধম্মা তি পজানতি

(মজ্ঝিমনিকায, ১ম বিভাগ)

---

* ঈশ-উপনিষদের অসম্ভূতি বা অসম্ভবের সহিত ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকের 'অসম্ভব' তুলনীয়।

নমো ভূযঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতাম্
অসম্ভবাযাখিল সত্ত্বমূর্ত্তযে।

সেই জন্য ধর্ম্মপদে নির্ব্বাণকে অকৃত, অনিমিত্ত (Un-become) বলা হইযাছে।

সুঞ্ঞতো অনিমিত্তোচ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো—অরহন্ত বগ্‌গো, ৩

সঙ্খারানং খযংঞত্বা অকতঞ্ঞূ সিব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১

(সংস্কারাণাং ক্ষযং জ্ঞাত্বা অকৃত-জ্ঞোঽসি ব্রাহ্মণ।)

The highest liberty, ' holy liberty ' consists in being liberated × × from being ever and again entangled in this unwholesome becoming —The Doctrine of the Buddha, p 309

In the sphere of metaphysical phenomenon, to which emancipation belongs, there is in general no becoming but only a being (as all metaphysical thinkers not only in India but in the West also, from Parmenides and Plato down to Kant and Schopenhauer, have recognised) —Deussen's The Philosophy of the Upanishads, p 344

যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সব্বং তং নিবোধধম্মং—মজ্ঝিমনিকায, ১৪৭ সূত্ত

তাই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'নিবোধ' বলিয়াছেন—(নিবোধ অর্থে dissolution of Causality)।

উপনিষদেও ঐ অর্থে 'নিবোধ' শব্দ প্রযুক্ত হইযাছে—

ন নিবোধো ন চোৎপত্তি র্নবন্ধো ন চ শাসনম্।—ব্রহ্মবিন্দু ১০

এই অর্থেই মোক্ষকে 'নিরুপাধি' বলা হয়। দেশ, কাল ও নিমিত্ত (Time, Space and Causality)—এই তিন উপাধি—মোক্ষ ঐ ত্রিবিধ উপাধিব অতীত। যাহা Beyond causation, তাহা Becoming হইবে কিরূপে ?

সোপেনহযব যে, নির্ব্বাণ বা অমৃতত্বকে 'Indestructibility *without* continued existence' বলিযাছেন, তাহাবও তাৎপর্য্য ঐ। কাবণ, 'in the Redeemed One, all change, and therewith also, time has been done away × × Because of the ceasing of time, the very expression "to persist" has no more meaning × × The fact itself can only be correctly characterised by negative expresssions, such as "changeless," "deathless"*—Grimm's Doctrine of the Buddha, p 179

আবও দেখুন—আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব।

নিত্যঃ শুদ্ধঃ বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ
সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সংবিভু শ্চাদ্বিতীযঃ—মৈত্রেয়ী, ১।১১

গৌড়পাদ ইহাব প্রতিধ্বনি কবিয়াছেন—

অলব্ধাববণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধা স্তথা মুক্তা বুদ্ধন্ত ইতি নাযকাঃ॥—কাবিকা, ৪।৯৮

'আত্মা স্বভাবতই নির্ম্মল, নিবঞ্জন (আববণহীন)—পূর্ব্বাপবই বুদ্ধ ও মুক্ত—তিনি জাগবিত হন মাত্র—ইহাই তত্ত্বজ্ঞেব বাণী।'

অতএব আত্মা যখন নিত্য-মুক্ত, তখন তাহাব মুক্তিব কথা বস্তুতঃ উঠিতেই পাবে না।

নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে? (সর্ব্বসাব)। 'আমি (অর্থাৎ আমাব metaphysical I) যখন অ-কর্ত্তা, তখন আমাব বন্ধমোক্ষ হইবে কিরূপে ?

ব্রহ্মবিন্দু-উপনিষৎ আব এক গ্রাম চড়িয়া বলিযাছেন—

ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্তিঃ ইত্যেষা পবমার্থতা।—১০

'পবমার্থদৃষ্টিতে (from the absolute standpoint) মুমুক্ষা ও মুক্তিব কথাই উঠিতে পাবে না।'

---

* Immortality also as prolonged existence after death is a part of the great illusion, the hollowness of which he (Yajnavalkya) has proved × × Yajnavalkya has therefore entirely anticipated Schopenhauer's defini- of immortality as an "indestructibility without continued existence" —Deussen, p 350

সেই জন্য পঞ্চদশীকার বলিলেন—

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতি র্ন সহতেতরাম্।

'বন্ধ-মোক্ষকে যদি 'বাস্তব' বলিতে চাও, তবে তাহা শ্রুতির অসহ্য'—কারণ 'We are all emancipated already (how could we otherwise bocome so ?')

যাজ্ঞবল্ক্য যে আত্মাকে বারংবার 'অসঙ্গ' বলিয়াছেন (অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬), ঐ বলারও তাৎপর্য্য এই। অসঙ্গ অর্থে নির্লেপ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ—উহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মার অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্ (বৃহ, ৪।৩।২১)। *

ছান্দোগ্যও অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। অনৃতেন হি প্রত্যূঢাঃ—৮।৩।২। 'যেমন ক্ষেত্রে নিহিত হিরণ্যনিধির (hidden treasure) উপর প্রতিদিন সঞ্চরণ করিলেও অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান পায় না, তেমনি এই সমস্ত প্রজা (creatures) প্রতিদিন ব্রহ্ম-রূপ লোকে প্রবেশ করিলেও তাঁহার সন্ধান পায় না। কারণ, তাহারা অনৃত-প্রত্যূঢ (অবিদ্যা-মোহিত।)'

এই অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। †

তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্ম-বিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নহে।

For deliverance is not effected by the knowledge of the Atman (ব্রহ্ম-বিজ্ঞান) but it consists in this knowledge, it is not a consequence of the knowledge of the Atman but this knowledge is already deliverance (মোক্ষ) in all its fulness. (Deussen, p 346) ‡

---

* বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন—'এই পুরুষ (আত্মা) পুরিশয় (দেহধারী) বটে কিন্তু অসংবৃত—

স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ
নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্—২।৫।১৮

† Emancipation therefore is not properly a new beginning but only the perception of that which has existed from eternity but has hitherto been concealed from us —Deussen, p 345

As soon as this state of *ignorance* (অবিদ্যা) is removed by the rise of knowledge in consciousness and the cloud of ignorance thereby dispersed for ever, the motion of willing (তৃষ্ণা) *cannot* rise any more (তৃষ্ণা বারিত হইলেই নির্ব্বাণ) —The Doctrine of the Buddha, p 303

‡ There is no real question of *becoming* perfect or being *made* perfect but of realising the perfection that ever is within × × × It is realisation rather than becoming, that will help × × Don't struggle and endeavour to *become,* by great effort, that which you are essentially all the time —Bosman

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান যবে যাঁহাব যেখানেই হইবে—তিনিই মুক্ত—তা সে আজই হ'ক বা কল্পান্তেই হ'ক, ইহলোকেই হ'ক বা ব্রহ্মলোকেই হ'ক—শবীব থাকিতেই হ'ক আব শবীর না থাকিতেই হ'ক—তাহাতে যায় আসে না।

ইহ চেদ্ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেদ্ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন, ২।১৩

'ইহলোকে যদি ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হয, তবেই মুক্তি—না হয তবে বিনষ্টি (মৃত্যুময) সংসাব গতি।'

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্‌বযং
ন চেদ্ অবেদী মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুবমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতবে দুঃখমেবাপি যন্তি॥—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিযাই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পাবে—যদি না হয, তবে মহতী বিনষ্টি। যাঁহাবা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদেব অমৃতত্ব—অন্যথায দুঃখময সংসাব।'

ইহ চেদ্ অশকৎ বোদ্ধুং প্রাক্ শবীবস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শবীবত্বায কল্পতে॥—কঠ, ৬।৪

'শবীব ভ্রংশেব পূর্ব্বে যদি বিজ্ঞানেব উদয় না হয, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে শবীব-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।'

কিন্তু যদি জীবিতমানে মর্ত্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম কবিযা ঐ বিজ্ঞানেব অধিকাবী হইতে পাবে, তবে অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—বৃহ, ৪।৪।৭

শবীব ধাবণে, যাঁহাবা ব্রহ্মসাযুজ্য অনুভব কবেন, তাঁহাবা জীবন্মুক্ত। বুদ্ধদেব এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

I have in this life entered Nirvana while the life of Gautama has been extinguished. Self (অর্থাৎ personal self) has disappeared and Truth has taken its abode in me (এই Truth = 'অথ সত্যম্ অস্তি—কেন, ২।১৩)

তাঁহাব পূর্ব্বতন বৈদিক ঋষি বামদেব আব একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ। তাঁহাব সম্বন্ধে উপনিষদে উক্ত হইযাছে ঃ—

তদুক্তম্ ঋষিণা—'গর্ভে নু সন্ অন্বেষাম্ অবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা'। গর্ভ এব এতৎ শযানো বামদেব এবম্ উবাচ—ঐতবেয, ২।৪

'গর্ভবাস কালেই ঋষি বামদেব এই কথা বলিয়াছিলেন—'গর্ভে থাকিযাই আমি এই সমস্ত দেবতাগণেব উৎপত্তি জানিয়াছি।' জীবন্মুক্ত ভিন্ন কে তাহা জানিতে পাবে ?

বৃহদারণ্যকেও এই বামদেব ঋষির প্রসঙ্গ আছে। তদ্ধ এতদ্ অপশ্যন্ ঋষি বামদেবঃ প্রতিপেদে—'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি—বৃহ, ১।৪।১০

'ঋষি বামদেব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ জানিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম।'

জীবন্মুক্তি ব্যতীত সম্বিতের এরূপ সম্প্রসারণ সম্ভবে না—কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ যাঁহার অনুভূতি হয়, তিনিই এই সমুদয় হন—অন্যে হয় না।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি,' স ইদং সর্ব্বং ভবতি
—বৃহ, ১।৪।১০

জনক যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবিষয়ক উপদেশ আত্মস্থ করিয়া ব্রহ্মভাবে সুস্থিত হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

অভয়ং বৈ জনক। প্রাপ্তোসি—বৃহ, ৪।২।৪

এই অভয় আর কে? এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য ৮।১১।১

ব্রহ্মই অভয়—অভয়ং বৈ ব্রহ্ম। অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ—বৃহ, ৪।৪।২৫

এইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীকে যাজ্ঞবল্ক্য 'শ্রোত্রিয় (শ্রুতির পারগামী), অবৃজিন, অকামহত' বলিয়াছেন এবং বৃহ ৪।৩।৩২-৩ মন্ত্রে তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে কথার আমরা পরে আলোচনা করিব। এখন আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এ ভাবে দেখিলে 'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি—এখান হইতে বিমুক্ত হইয়া কোথায় গমন করিবে?'—এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ, সাধারণ জীবের মত, জীবন্মুক্ত পুরুষের—ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি (বৃহ, ৪।৪।৬)—উৎক্রান্তি হয় না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলে ব্রহ্মসাযুজ্য হয়।

The soul after death goes nowhere where it has not been from the very beginning, nor does it become other than that which it has always been, the one eternal omnipresent 'Atman' (Deussen, p 348) —(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়), পূর্ব্ব দিক্ যাঁহার পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, সর্ব্ব দিক্ সর্ব্ব প্রাণ—যিনি নেতি নেতি আত্মা।

তস্য প্রাচীদিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণাদিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচীদিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বাদিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ—স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

কিন্তু তথাপি আমরা দেখি, বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মবিজ্ঞানীর পক্ষেও দেহ-বিগমের পর তবে ব্রহ্মসাযুজ্যের কথা বলিয়াছেন।

এষ মে আত্মা—এতম্ ইত আত্মানং প্রেত্য অভিসম্ভবিষ্যতি—শতপথ, ১০।৬।৩।২

'সেই আমার আত্মা (যিনি জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ আকাশাৎ)—এখান হইতে 'প্রেত' হইয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন।'

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে, এতদ্ ব্রহ্ম। এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি।

—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

অতিমুচ্য ধীরাঃ। প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

'অতিমুক্ত ধীরগণ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।—কঠ, ৫।১

অর্থাৎ মোক্ষলাভের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না দেহের বিলয় ঘটে। এমন কি ঋষি বামদেব সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি শরীর ভেদের পর ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন।

স এবং বিদ্বান্ অস্মাৎ শরীরভেদাদ্ ঊর্দ্ধম্ উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐতরেয়, ২।৪

এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, সমাধি-অবস্থায় জীবন্মুক্তের ব্রহ্মসাযুজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যুত্থান-দশায়, শরীরধর্ম্মে প্রারব্ধবশে আবার সংসারের ভাণ হয়। কিন্তু শরীরের বিলয় ঘটিলে সে সম্ভাবনা আর থাকে না—তখন নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা হয়। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণের যে ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ ভেদও ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞার পরিপাকে অর্হতের সম্বোধি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন এখানেই দেহসত্ত্বেও তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন কিন্তু সে নির্ব্বাণ 'সোপাধিশেষ' নির্ব্বাণ। দেহান্তে ঐ অর্হতের যখন পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়, সে নির্ব্বাণ 'অনুপাধিশেষ'-নির্ব্বাণ অর্থাৎ নির্ব্বাণ 'without any remnant of accessories'।*

এই পরিনির্ব্বাণই বেদান্তের 'বিদেহ'-মুক্তি—যে মুক্তিতে মুক্তের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন দেহই থাকে না—এমন কি বৈদান্তিকেরা যাহাকে 'দহর-কোশ' বলেন—সেই হৃদ্যাকাশময়ং কোশং যদ্দ্বারা চিন্মাত্র বা Monadএর চিদাকাশ হইতে ঔপাধিক ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই চরম উপাধিরও

* The perfected Holy Ones having rid themselves of all *upadihs* are 'submerged in the Deathless (অমৃত)'—সুত্তনিপাত—V

ইহা পরিনির্ব্বাণের অবস্থা। কারণ, দেহসত্ত্বে (নির্ব্বাণের অবস্থায়) 'sensations are still felt × × We are not indeed yet free *from* them but stand towards them as *free* men'—(The Doctrine of the Buddha, p 325)

বিলয় ঘটে। সেই জন্য ইহার নাম 'বিদেহ'-মুক্তি। ইহাই অদ্বৈত-সিদ্ধি—ব্রহ্মের সহিত নিরবচ্ছিন্ন একীভাব—কেবল মিলন নয়, মিশ্রণ—নদী যেমন করিয়া নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয় সেইরূপ। তখন নদী আর নদী থাকে না, সমুদ্র হইয়া যায়—অবিভাগো বচনাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬)। বিদেহ-মুক্তিতে জীবও সেইরূপ হয়—জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়।

যথা ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি, ভেদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্রম্ ইত্যেব প্রোচ্যতে—প্রশ্ন ৬।৫

জলস্তম্ভে জলদ ও জলধি যেমন মিলিত হয়, কিন্তু মিশ্রিত হয় না—এ সেরূপ মিলন নহে—এ মিশ্রণ—নদী যেরূপ নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয়—সেইরূপ মিশ্রণ। যাজ্ঞবল্ক্য এ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩২

এই সলিলের সহিত উপমা সার্থক—'the dew-drop slips into the shoreless sea'—জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ আসিক্তং তাদৃগেব ভবতি—কঠ, ৪।১৫

—যেমন শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু, জীবেরও তখন সেই দশা হয়।

উৎক্রান্তি ও ক্রমমুক্তি

এই প্রসঙ্গে বৈদান্তিকেরা যাহাকে 'ক্রম-মুক্তি' বলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। বেদে সাধনার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া, সাধকের পিতৃযান ও দেবযান গতির ইঙ্গিত আছে।

দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণাম্ অহং দেবানাম্ উত মর্ত্ত্যানাম্—ঋগ্বেদ, ১০।৮৩।১৫ *

পরবর্ত্তী উপনিষদে এই দুই 'সৃতি' বা মার্গের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। † পিতৃযান দক্ষিণ মার্গ, ধূমযান গতি; দেবযান উত্তর মার্গ, অর্চ্চিঃযান গতি। যাঁহারা কর্ম্মী—ইহলোকে 'ইষ্টাপূর্ত্তে'র অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পিতৃযানে যাত্রা করিয়া স্বর্গলোকে উপনীত হন। সেখানে 'যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা' পুণ্যক্ষয়ের পর তাঁহাদিগকে আবার মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। ইহার নাম 'আবৃত্তি'। আর যাঁহারা ধ্যানী—

---

* বৃহদারণ্যকের ৬।৬।২ মন্ত্রে এই ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে।

† কৌতূহলী পাঠক বৃহদারণ্যক ৬।২, ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫, ৫।৩।১০, ৫।১০।১-৬, কৌষীতকী ১।২, প্রশ্ন ১।৯-১০, কঠ ৬।১৪-৬ ও মুণ্ডক ১।২।১০-১, ৩।১।৬ দৃষ্টি করিবেন।

ইহলোকে 'শ্রদ্ধাতপে'ব অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুব পব উৎক্রান্ত হইয়া দেবযানে যাত্রা কবিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। সেখান হইতে তাঁহাদেব আব ফিরিতে হয না। সেই জন্য ইহাব নাম 'অনাবৃত্তি'।

তেষু ব্রহ্মলোকেষু পবাঃ পবাবতো বসন্তি; তেষাং ন পুনবাবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫
এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫

গীতায এই পিতৃযান ও দেবযানকে কৃষ্ণা গতি ও শুক্লা গতি বলা হইযাছে—কৃষ্ণা গতিতে আবৃত্তি, শুক্লা গতিতে অনাবৃত্তি।

শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একযা যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যযা বর্ত্ততে পুনঃ ॥—৮।২৬

ব্রহ্মলোকে ধ্যানী সাধক (যাঁহাব Evolution সাধাবণ নহে—অ-সাধাবণ Supernormal), যতদিন ব্রহ্মাব আযুঃ ততদিন অর্থাৎ এক কল্প-কাল অবস্থিতি কবেন। পুনবায় আবর্ত্তন কবেন না।

স খলু এবং বর্ত্তযন্ যাবদাযুষং ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে, ন পুনবাবর্ত্ততে
—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১

ব্রহ্মলোকে তাঁহাব কি দশা হয়?

তে ব্রহ্মলোকেষু পবান্তকালে
পবামৃতাঃ পবিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।—মুণ্ডক, ৩।৬।২, কৈবল্য, ৪

'তিনি সেই ব্রহ্মলোকে পবান্তকালে (অর্থাৎ কল্পান্তে='at the end of time') পব-অমৃত হইযা মোক্ষলাভ কবেন।'

ইহাবই নাম ক্রমমুক্তি। ইহলোকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বাবা যে মুক্তি, সে জীবন্মুক্তি—ব্রহ্মলোকে পবামৃত হইয়া কল্পান্তে যে মুক্তি, সে ক্রমমুক্তি। এই ক্রমমুক্তি লক্ষ্য কবিযা বাদবায়ণ সূত্র করিযাছেন—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পবম্ অভিধ্যানাৎ—
ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০

'ব্রহ্মাণ্ডেব অবসানে, তদধ্যক্ষ ব্রহ্মাব সহিত পবতত্ত্ব প্রাপ্তি হয।'

এই পবতত্ত্ব ব্রহ্ম—পবতত্ত্বপ্রাপ্তিব অর্থ ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মেব সহিত একীভাব, বিদেহমুক্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চবে।
পবস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পবং পদম্ ॥

'কল্পান্তে যখন প্রলয ঘটে, তখন তাঁহাবা ব্রহ্মাব সহিত ব্রহ্মাব আযুব অবসানে কৃতার্থ ('পবামৃত') হইযা পবম পদ (ব্রহ্ম-সাযুজ্য) লাভ কবেন।' *

---

* এ স্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকেরও (কল্পান্তে) আবৃত্তি হয—(কারণ, ব্রহ্মলোকও বিনশ্বর—আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।—গীতা, ৮।১৬)—যদি না ইতিমধ্যে ঐ সাধক পূর্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীধরস্বামী এ বিষয বেশ লক্ষ্য করিযাছেন:—

মোক্ষের স্বরূপ—অচিন্ত্য

আমরা মোক্ষবাদের আলোচনা করিতেছি—বার বার মুক্তি-মোক্ষ-নির্ব্বাণের নাম উচ্চারণ করিয়াছি। এই মোক্ষের স্বরূপ কি ?

মোক্ষের স্বরূপ মননের, বচনের অতীত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্যমন হঠিয়া আসে।'

যে হেতু, যিনি মুক্ত তিনি—

এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে —তৈত্তি, ২।৭

'সেই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (unconscious) অবাচ্য, (unutterable), অনিলয়ন (অগাধ=unfathomable) ব্রহ্ম-পদার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।'

তাঁহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ? সেইজন্য বুদ্ধদেব বলিতেন—

অত্থং গতস্‌স, (নির্ব্বাণ-প্রাপ্তের) পমাণং (ইয়ত্তা) নত্থি। †

কারণ—নির্ব্বাণ 'অনাখ্যাত' বস্তু (ধর্ম্মপদ, পিয়বগ্‌গো ১০)।

অতএব Measure not with words
The Immeasurable, nor sink the plumb of thought
Into the Fathomless! Who asks doth err,
Who answers errs Say naught —LIGHT OF ASIA

কারণ, 'Nirvana is the land of silence and non-being (The Voice of the Silence)

অতএব এ ক্ষেত্রে, তুষ্ণীমেব বরং—silence is golden।

ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্ অবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো, নান্যেষাম্।

অর্থাৎ, ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোক-গত জীবেরও অবশ্য পুনর্জ্জন্ম হইবে, যদি না তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এইরূপে ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে) ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভ করেন, নতুবা করিতে পারেন না। বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার সমর্থন পাই:—

They having entered the stream, × × after death they will no more return to this world but in one of the highest worlds of light, attain Nibbana —Grimm's Doctrine of the Buddha, p 415

† অত্থং গতস্‌স ন পমাণং অত্থি, যেন নং বজ্জু তং তস্‌স নত্থি—সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু, সমূহতা বাদপথাপি সব্বে—সুত্তনিপাত, ৫ম অধ্যায়।

For the vanished One (অস্তং গতস্য), there is no measure (প্রমাণং নাস্তি)—that whereby he might be designated no longer exists

অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণ-দশা 'অস্তি-নাস্তি'র অতীত অবস্থা।* সংযুক্ত-নিকায়ে দেখি, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল—হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত আছেন কি? উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহা প্রকাশ করেন নাই।' তবে কি ন হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত নাই? উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহাও প্রকাশ করেন নাই।' কেন করেন নাই? কারণ, 'তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয়্যো দুপ্পরিযোগাহো সেয্যথাপি মহাসমুদ্দো'—'যিনি তথাগত (পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত), তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্প্রতিগ্রহ—যেমন মহাসমুদ্র—He is indefinable inscrutable immeasurable like the great ocean'। সেই প্রাচীন উপমা—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'যেমন নদী বহমান হইয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, তাহার আর নামরূপ থাকে না—তেমনি।'

সেইজন্য গ্রিম্ বলিয়াছেন—The totally-extinguished Delivered One is nowhere and everywhere (page 359).

নির্ব্বাণ বা মোক্ষ যখন 'অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা, তখন তৎসম্বন্ধে কোন মত বা view প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নয় কি? বুদ্ধদেব আনন্দকে এই কথাই বলিয়াছেন—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো আনন্দ। ভিক্খুং যো এবং বদেয্য 'হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকল্লং। 'ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকল্লং। নেব হোতি ন ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠিতি তদ্ অকল্লং—দীঘনিকায়, ১৫

'হে আনন্দ! বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন'—উহা দৃষ্টি (view) মাত্র—অকথ্য (unbecoming), যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য, পুনশ্চ যদি কেহ বলে—'দেহান্তে তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য।'

---

* কারণ, নির্ব্বাণ is 'a kind of existence, that in *our* sense is no longer existence—(it is) at the portals of the unrecognisable, the transcendental ××× Therefore no conception and consequently no word fits it—The Doctrine of the Buddha, p 178

Nothing whatsoever, absolutely nothing can be told about it, the rest is—silence!—Ibid, p 502

ব্যক্তিত্বেব বিলোপ

সত্য বটে, আমবা যাহাকে জীবভাব বলি, মোক্ষদশায় তাহাব অভাব হয়—আমাদেব ব্যক্তিত্বেব (Individuality বা Personality-র) বিলোপ ঘটে, আমাদেব পৃথক্-বাহিনী চিত্তনদী নামরূপ হাবাইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে মিশ্রিত হয়, আমাদেব স্বতন্ত্র জীব-বিন্দু অমৃত-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা, পবেঽব্যযে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৭
'বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অক্ষব পব (ব্রহ্মে) একীভূত হয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই একীভাব লক্ষ্য কবিয়াই বলিয়াছেন—সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি (বৃহ, ৪।৩।৩২)। ইহারই নাম একত্ব—অদ্বৈত, কাবণ, তখন যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি (ঈশ, ১৬)

তিব্বতীয় মোক্ষশাস্ত্র হইতে সংকলিত 'অনাদ নাদ' (Voice of the Silence) গ্রন্থে এই অবস্থাব সুন্দব বর্ণনা আছে ঃ—

And now the self is lost in the Self, thyself unto Thyself, merged in that Self, from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality, Lanoo!* where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the Ocean, the ever present ray become the All and the Eternal Radiance

বাস্তবিক, ব্যক্তিত্বেব বিলোপ অতি অকিঞ্চিৎকব। আমবা যাহাকে ব্যক্তিত্ব (Individuality) বলি, সেটা অনন্ত ব্রহ্মবাবিধিব তবঙ্গ নয়, বীচি নয়, লহবীও নয়—নগণ্য বুদ্বুদ মাত্র—mere soap-bubble। এই বুদ্বুদ ভঙ্গে এত ভয়! আব আমাদেব Personality—যাহা চিদাভাসেব ছায়া, সে ত আরও তুচ্ছ! Persona শব্দেব অর্থ মুখস (mask)—যে মুখস পবিযা প্রাচীন বোমে অভিনেতাবা অভিনয় কবিত—এখনও তিব্বতে নর্ত্তকেবা নৃত্য কবে। বস্তুতঃ এই personality জীবেব মুখ নহে, মুখস—ঐ মুখস পবিযা জীব ভব-বঙ্গালযে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকাব অভিনয় কবে। এই মুখসেব তিবোধানে এত সঙ্কোচ কেন? দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সোপেন্‌হযব যথার্থই বলিযাছেন—

Everybody knows himself only as an individual × × × If he were able to be conscious of what he is besides and apart of this, he will willingly let go his individuality and smile at the tenacity of his adherence to it

---

* His individuality, the basis of all works, he has seen to be an illusion —Deussen, p 346 Personality, in its elements, is something alien to our true essence From this alien thing, we only need to free ourselves Grimm, p 196

সোপেন্‌হয়র তত্ত্বদর্শী ছিলেন। আর একজন তত্ত্বদর্শীর কথা শুনাইব—ইনি রাজকবি টেনিসন।

And thro' loss of self
The gain of such large life, as matched with ours,
Were sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow world.

—THE ANCIENT SAGE *

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ববিদ্যাসভার অধিনেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট কয়েকটি মনোজ্ঞ কথা বলিয়াছেন, যাহার প্রতি প্রণিধান করা উচিত।

The Nirvanic consciousness is the antithesis of 'annihilation', it is existence raised to a vividness and intensity, inconceivable to those who know only the life of the senses and the mind As the farthing rushlight to the splendour of the sun at noon, so is the earth-bound consciousness to the Nirvanic, and to regard it as annihilation, because the limits of the earthly consciousness have vanished, is as though a man, knowing only the rushlight, should say that light could not exist without a wick immersed in tallow

—The Ancient Wisdom, pp 221-22

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ কৃষ্ণমূর্ত্তি মোক্ষের আস্বাদন পাইয়া, তাহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তৎ প্রতি অবধান দেওয়া কর্ত্তব্য।

Liberation is not annihilation, × × Liberation is not negative On the contrary it is positive It is not entering into a mere void and there losing yourself × × × It is true that there is no separate self but there is the Self of all —By What Authority, p 37

এই আমিত্বের সম্প্রসারণই মুক্তি। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

---

* টেনিসন্ একান্তে বসিয়া একাগ্রভাবে নিজের নাম উচ্চারণ করিলে একরূপ সমাধিদশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার loss of personality (ব্যক্তিত্বের বিলোপ) ঘটিত। ঐ অবস্থার বর্ণন করিয়া টেনিসন্ তাঁহার বন্ধু টিন্‌ডেলকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক উহা হইতে দেখিবেন loss of personality বস্তুতঃ কিছুই নহে।

"I have never had any revelations through anæsthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life I am ashamed of my feeble description Have I not said the state is utterly beyond words?"

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্ব্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ ৪।৩।২০

মুক্ত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করেন, 'আমিই এই বিশ্ব'। ইহাই তাঁহার পরম অবস্থা। অর্থাৎ

'It is the condition, in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently **without individual consciousness.** (DEUSSEN)

যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বর্ণনার সহিত বৌদ্ধের দিক্ হইতে স্যার এডুইন আর্ণল্ডের নির্ব্বাণের বর্ণনা তুলনা করুন।

Until greater than Kings, than Gods more glad,
The aching craze to live ends, and life glides
Lifeless, to nameless quiet, nameless joy,
Blessed Nirvana—sinless, stirless rest—
That change which never changes!

—THE LIGHT OF ASIA, Book VI

He goes
Unto Nirvana He is one with Life*
Yet lives not He is blest, ceasing to be
× ×·× Seeking nothing he gains all,
Foregoing self, the Universe grows 'I'

—IBID, Book VIII

এখন যদি আমরা বলি, বেদান্তের মোক্ষ এবং বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ অভিন্ন—তবে পাঠক কি তাহার প্রতিবাদ করিবেন ?

নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নয়

আর এক কথা। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ অতর্ক্য, অবর্ণ্য, অকথ্য, অচিন্ত্য হইলেও—নির্ব্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, জীবভাবের অভাব ঘটিলেও—ইহা নিঃসংশয় যে, নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব পাশ্চাত্যেরা যাহাকে abyss of absolute annihilation বলিয়াছেন নিশ্চয়ই তাহা নহে। কারণ—'Our dew-drop slips into the shoreless sea বটে কিন্তু is not lost therein'। † বুদ্ধদেবের প্রচারিত নির্ব্বাণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের কেহ কেহ তাঁহাকে নাস্তিত্ব-বাদী বলিত। তিনি নিজে স্পষ্ট বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—

* অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি—কৌষীতকী, ৩।৩। ঐ প্রাণ মহাপ্রাণ (Life)—life নহে।

† C W Leadbeater's How Theosophy came to me, p 161

সেই জন্য জর্জ্জ গ্রিম এই নাস্তিত্ব-বাদকে the non-sense of absolute Nihilism' বলিয়াছেন (Doctrine of the Buddha, p 162)

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্খবে! ভিক্খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণং তি। তং কিস্স হেতু? দিট্ঠে বাহং ভিক্খবে। ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি। এবং বাদিনং খো মং ভিক্খবে। এবং অভ্যাখিং একে সমণব্রাহ্মণা—অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্‌ভাচিক্খন্তি (impeach)—'বেনসিকো সমণো গোতমো সতো সত্তন উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং (nullification) পঞ্ঞাপেতি তি'। যথা বাহং ভিক্খবে ন, যথা চাবং ন বদামি, তথা মং তে ভান্তো সমণব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্ভাচিক্খন্তি।—মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সূত্ত

'হে ভিক্ষুগণ। যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত—ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি বা অন্য দেবতা—কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনিই (Here and Now) অননুবেদ্য (untraceable)। ভিক্ষুগণ। এইরূপ বলার জন্য, এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসত্যভাবে, তুচ্ছভাবে, মিথ্যাভাবে, অভূতভাবে (wrongly, erroneously, falsely, untruly) আমার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করেন যে, 'এই শ্রমণ গৌতম বৈনাশিক, ইনি সৎ বস্তুর উচ্ছেদ বিনাশ বিভব প্রচার করেন।' আমি যাহা নই, আমি যাহা বলি না—হে ভিক্ষুগণ। এই সকল ভ্রান্ত (good) শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা অসত্যভাবে তুচ্ছভাবে মিথ্যাভাবে অভূতভাবে আমাকে সেইরূপ অভিযোগ করেন।'

ইহার পরও কি বুদ্ধদেবকে বৈনাশিক (নাস্তিত্ববাদী) বলিব?

কিন্তু অসাধুবাদের অন্ত নাই— .

যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ—ভবভূতি

বুদ্ধদেবের মরণান্তেও তাঁহার ঐ বৈনাশিক-অপবাদ ঘুচে নাই। সঞ্‌যুত্ত-নিকায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য যমকের মনেও ঐ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, বুদ্ধদেবের মতে ক্ষীণাসব (মৃদিত-কষায়) ভিক্ষু দেহান্তে উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট হন, মরণের পর নির্ব্বাণীর নাস্তিত্ব (annihilation) হয়—

এবং খো হং আবুসো ভগবতা ধর্ম্মং দেসিতং আজানামি। যথা খীনাসবো ভিক্খু কাযস্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরং মরণা তি।

ইহার প্রতিবাদ করিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা বলিলেন—

মা আবুসো যমক। এবং অবচ, মা ভগবন্তং অব্ভাচিক্খি (traduce)। ন হি সাধু ভগবতো অব্ভাক্খানং। ন হি ভগবতা এবং বদেয্য খীণাসবো ভিক্খু কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরং মরণা তি। × ×

হে আবুস (মান্য) যমক। এরূপ বলিও না। ভগবান্ (বুদ্ধদেবের) অভ্যাখ্যান (traduce) করিও না। ভগবানের অভ্যাখ্যান শোভন নহে। ভগবান্ কখনও বলেন নাই যে, 'ক্ষীণাসব ভিক্ষু দেহান্তে উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট হন, মরণের পর তাঁহার নাস্তিত্ব হয়'।

ইহাতে যখন যমকের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না, তখন ভিক্ষুরা তাঁহাকে ভিক্ষু-প্রধান সারিপুত্রের কাছে লইয়া গেলেন। সারিপুত্র অমোঘ বাক্যে বুদ্ধদেবের উপদেশের ব্যাখান করিলেন। তখন যমকের সংশয় ছিন্ন হইল। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে বলিলেন—

অহু খো মে তং আবুসো সারিপুত্ত। পুবে অবিদ্দাসুনো পাপকং দিট্‌ঠিগতং; ইদং চ পঞ্‌ঞাসমতো সারিপুত্তস্স ধম্মদেসনং সুত্বা তং চেব পাপকং দিট্‌ঠিগতং পতুনং ধম্মো চ মে অভিসমেতো তি

'মান্যবর সারিপুত্র! অজ্ঞতানিবন্ধন আমি পূর্ব্বে ঐ ভ্রান্ত মত (পাপক দৃষ্টি) পোষণ করিতাম। কিন্তু অদ্য আপনার প্রজ্ঞাসম্মত ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া আমার সে ভ্রান্ত মত তিরোহিত হইয়াছে এবং প্রকৃত ধর্ম্ম (Doctrine) কি তাহা জ্ঞাত হইয়াছি।'

যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে অমৃতপদ বলিয়াছেন (ধর্ম্মপদ, সহস্সবগ্‌গো ১৫)—যাঁহার মতে পরমার্থসারো নিব্বাণং (Nirvana is the highest reality)—যিনি মুক্ত পুরুষের 'পীতিসুখং অঞ্‌ঞং চা ততো সন্ততারং (Happiness and something higher) অর্থাৎ (বেদান্তের ভাষায়) ভূমানন্দ এবং 'Blissful tranquility and stainless bliss' (মজ্ঝিম নিকায) লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাণীর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্‌য লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা (সুত্তনিপাত, ৫)

In this realm of reality, as in the Deathless (অমৃত), the Delivered Ones are submerged। *

—তাঁহাকে নাস্তিত্ববাদী বলা খুব অসঙ্গত নহে কি? তাঁহার নিজের মুখের আর একটি বাণী উদ্ধৃত করিতে চাই—

Just as of the fire which flames up under the strokes of the smith's hammer, it cannot be said as to whither it has gone after it is extinguished, so just as little can be discovered the abode of the truly-delivered Ones, who have crossed over the stream of the bounds of the senses, have reached the unshakable bliss

(অভিজ্ঞ পাঠক এই উপমার মধ্যে ছান্দোগ্যের ৮।১২।২ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি পাইবেন—অশরীরো বায়ুঃ অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুঃ—অশরীরাণি এতানি ইত্যাদি)।

---

* বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, নির্ব্বাণকে এই সকল বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে—

'The unshakable,' 'the immovable,' 'eternal stillness,' 'the true,' 'the other shore,' 'the subtle,' 'the invisible,' 'the free from illness,' 'the eternal,' 'the incognisable,' 'the peaceful,' 'the deathless,' 'the sublime,' 'the joyful,' 'the secure,' 'the wonderful,' 'the free from affliction,' '*dhamma* free from oppression,' 'the free from suffering,' 'the free from incitement,' 'the pure,' 'the free from wishes,' 'the island,' 'the refuge,' 'the shelter'—Grimm's Doctrine of the Buddha, p 519

এই প্রসঙ্গে স্যার এড্‌ইন্ আর্নল্ডের উদাত্ত শ্লোকগুলি আমাদের স্মর্ত্তব্য।

If any teach, Nirvana is to cease
    Say unto such they lie
If any teach, Nirvana is to live
    Say unto such they err , not knowing this
Nor what light shines beyond their broken lamps
Nor lifeless, limitless bliss

—LIGHT OF ASIA, Book viii

ঠিক্ কথা। নির্ব্বাণ যে অস্তি-নাস্তির পরাৎপর অবস্থা—আমরা বদ্ধ মানুষ এই সংকীর্ণ বুদ্ধি মন লইয়া মোক্ষের বিষয়ে কি জল্পনা করিব? এ যেন—'as though a sparrow with his limited wing-power and restricted eye-reach should chitter of the eagle from his umbrageous cover'—এ যেন তিত্তিরির সমুদ্র-তরণ, সফরীর সাগর-শোষণ—তেমনি ব্যর্থ, তেমনি বিফল, তেমনিই হাস্যকর।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

হাওয়া-বদল

অমবনাথ গবীবেব ছেলে। বাপ নেই। ভবানীপুব চাউলপটী রোডে একখানি ছোট বাড়ী বেখে তিনি পাঁচ বছব হল মাবা গেছেন। সেই বাড়ীব নীচেব তলাব দুটী ঘবে অমর ও তাব মা থাকেন। মাব কিছু গহনা ছিল। তাই বেচে, আব উপব তলা ভাড়া দিযে, মা এই কবছর কষ্টে সংসাব চালাচ্ছেন ও ছেলেকে কলেজে পড়াচ্ছেন। অমব মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। চাব বছব হযে গেছে। আব বছব দুই হলেই পূবোপূবি ডাক্তাব হযে বেবোবে। তাহলেই মাব সকল দুঃখ ঘুচবে। পাস-টাস এ পর্য্যন্ত অমব মাঝামাঝি বকম কবেছে। তবে তার বুদ্ধি নানাদিকে খেলে। কষ্টেব সংসাবে মানুষ হয়ে সে একবকম স্থির কবেছে যে বড়লোক একদিন হবেই। শুধু বিদ্যায় সেটা হওয়া যায না তা সে জানে। বড়লোক হতে হলে কিসে সবাইকে খুসী কবা যায় সেটা জানা চাই, সব কথায় সায় দিতে পাবা চাই, সকল সময সকল অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই; এটা অমব বেশ বুঝত। কলেজে সব বকম ছেলেদেব সঙ্গেই বেশ বনিয়ে চলত, তবে যারা গবীব, যাদেব কাছ থেকে কিছু পাওয়াব আশা নেই, তাদেব সঙ্গে ভাব কবত না। বড ঘবেব ছেলেদেব সঙ্গেই বেশী মেলা-মেশা ছিল। টেনিস খেলতে চেষ্টা ক'বে শিখেছিল, কারণ এ বিদ্যা আধুনিক সমাজে খুব কাজে লাগে। মাষ্টাব প্রফেসবদেব খুসী বাখতেও তাব চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সুবিধা পেলেই তাঁদেব বাড়ী যেত। তাঁদেব মন যোগাবাব জন্যই ক্লাসে সদাসর্ব্বদা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবত। বুঝত এ সব একদিন কাজে লাগবে। ভবানীপুব Y. M. C. A.-তে অমবেব খুব যাতাযাত ছিল, কেননা সেখানে অনেক পদস্থ ব্যক্তিব সমাগম। তার বড় সাধ বিলেত গিয়ে একটা তকমা নিয়ে আসে, কিন্তু দবিদ্রেব মনোবথ, উত্থায় প্রবিলীয়ন্তে, ওঠে আবাব মিলিয়ে যায়, জলে বুদ্‌বুদেব মত। কে জানে, হযত আসবে একদিন, কোন গণ্ডমূর্খ বাজা নবাবকে আশ্রয ক'বে পাড়ি জমাবে।

আপাততঃ কলেজেব ছুটি হযে গেছে, গবমও বেজায় পডেছে, একবার পাহাড়ে কি সমুদ্রের ধারে দিন কযেক কি ক'বে বেড়িযে আসা যায় তাই ভাবছে। তাব কয়েকজন বন্ধু দার্জ্জিলিং গেছে। তাবা ক্রমাগত আসতে লিখছে, কিন্তু ওবকম শুকনো নিমন্ত্রণে ত আব অমরেব চলবে না। শেষ হবেনেব এক চিঠি এল, সে যাওযা-আসাব বেল ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। অমব মাকে বললে, "তুমি কিছু দাও ত একবাব বেড়িয়ে আসি। এই গবমে লেখাপড়া ক'বে ক'বে মাথা খাবাপ হযে গেল যে।" মা পঁচিশ

টাকা দিলেন। নগদ সাত টাকায় এক ছাই রঙের ফ্লানেল পেন্টুলেন আর দশ টাকায় পিতলের বোতাম লাগানো নীল এক কোট কিনে নিলে। গেল বছর সাড়ে তিন টাকা দিয়ে এক সৌখীন কুমীরের চামড়ার স্যুটকেস কিনেছিল, সেইটে বেশ ক'রে ঝেড়ে-মুছে তাইতে জিনিস ভরলে। বিছানা বাঁধার কেম্বিসের থলি ছিল না, তাই বিছানার উপর এক লালিম্‌লী কম্বল জড়িয়ে চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে নিলে। মোটের উপর তাকে বেশ Smart দেখাচ্ছিল ষ্টেশনে, বিশেষ যখন টেনিস র‍্যাটটা হাতে ক'রে পৌছল। শুভক্ষণে (?) রওয়ানা হল। চলল ত, কিন্তু গিয়ে থাকবে কোথায়? তার এক দূর সম্পর্কের মামা চাঁদমারীতে থাকেন। কিন্তু সেখানে উঠলে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখানো দুষ্কর হবে।

দুপুরে দার্জ্জিলিং পৌছল। পাঁচ রকম ভেবে-চিন্তে জিনিসপত্র ধর্ম্মশালায় রেখে সোজা Amherst Villa বাড়ীতে চ'লে গেল। সেখানে হরেনরা থাকে। গিয়ে দেখে এলাহী কারখানা। যেমন আসবাবপত্র তেমনি চাকর-বাকরের বহর। অমরকে দেখে চারিদিকে রোল উঠল "হ্যালো, এই যে" ইত্যাদি। স্নান ভোজনাদি বেশ হল। কিন্তু এখানে আশ্রয় জোগাড় করতে কিছুতেই পারলে না। স্থান নেই, পাঁচজন এই বাড়ীতে থাকে। এদের দল সবশুদ্ধ দশজন। অন্য পাঁচজন আরও দু-তিন বাড়ীতে থাকে। আলাদা আলাদা জায়গায় থাকলে কি হয়, রোজ সকালে বিকেলে এরা খুব সুন্দর মনোহারী প্রসাধন ক'রে একত্রে বেড়াতে বের হয়। চৌরাস্তায় গোটাতিনেক বেঞ্চ জুড়ে ব'সে খুব হাসি-গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। অপেক্ষাকৃত দুর্গত লোকের এদের মাঝে স্থান পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাস্তায় যেতে যেতে সবাই এই চাঁদের হাট চেয়ে চেয়ে দেখত। নিন্দুকেরা নাম দিয়েছিল, House of Lords। সারা বিকেলটা এদের সঙ্গে কাটিয়ে, সন্ধ্যাবেলা হরেনের বাড়ী আবার সাড়ে বত্রিশ রকমের মাংস খেয়ে, ধর্ম্মশালায় ফিরে যেতে অমরের কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু উপায় কি, নিজের মান ত রাখতে হবে। তাই খাবার পর চেঁচিয়ে ব'লে গেল, "যাই ভাই হরেন, মামী কত ভাবছেন। সকালে উঠেই পালিয়ে আসব। এক পেয়ালা চা রেখো।" সকাল পর্য্যন্ত থাকতে পারবে কেন, ছটার সময় Amherst Villa-তে এসে হাজির। এদের তখনও রাত পোহায় নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ। অমর এক নরমগোছের সোফা বেছে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন আটটা বেজে গেছে, পাঁচ বন্ধুই জামা জোড়া এঁটে ব'সে চা-পানি করছেন। "Good morning all" ব'লেই এক লাফে উঠে সেও ব'সে গেল আর একমনে নানা প্রকার ভোজ্য

পানীয় সাবাড় করতে লাগল। ন'টার সময় সব বন্ধু চৌরাস্তায় সমবেত হলেন। আজ এগারজন। দেড় টাকা ক'রে চারটে ঘোড়া ভাড়া হ'ল। হরেন ও তিনজন ম্যাল চক্কর দিতে গেল। যেই তারা ফিরেছে, অমর একেবারে হরেনের কাছে গিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বললে "একবার আমায় চড়তে দাও ভাই।" হরেন ভাল মানুষ কিছু বললে না, অমর ঘোড়ায় চ'ড়ে বসল। খুব কেতা ক'রে রাশ চাবুক ধ'রে যেই বের হবে কি পাহাড়ী সহিসটা দৌড়ে এসে রাস্তা আটক ক'রে চেঁচাতে লাগল, "তুম্ উতর যাও বাবু, তুম্‌কো ঘোড়া নেই দিয়া।" ব্যাপার বেশী দূর গড়াল না, কেননা অমর একটু ভয় পেয়ে মানে মানে নেমে পড়ল। কিন্তু বাইরের লোক চোখ টেপাটেপি করতে লাগল ব'লে Upper House নূতন বন্ধুর উপর একটু বিরক্ত হ'ল। দুপুর বেলা পা ব্যথা ইত্যাদি পাঁচ রকম ওজর দেখিয়ে অমর বন্ধুদের বাড়ীতেই খেতে ব'সে গেল। মনে করলে, এ বেলা ত ভাল ক'রে খেয়ে নিই, ও বেলা বাজার থেকে দু-চার আনার জল খাবার কিনে খেলেই হবে। সন্ধ্যা নাগাদ একটু সুবিধাও হয়ে গেল। হরেন অমরকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ওহে, আমাদের সুরেশের তার এসেছে, তাকে কালই নেমে যেতে হবে। তোমার মামীমা যদি মত করেন ত কাল থেকে এখানেই এস না।" এই ত চাই। পরদিন সকাল হতে না হতে অমরনাথ তার তোরঙ্গ বিছানা নিয়ে উপস্থিত হ'ল। হরেনকে বললে, "যদি একটা আলাদা ছোট্ট ঘর দাও ত খুব ভাল হয় ভাই। আমার বড় নাক ডাকে।" হরেন বন্ধুকে একটু ভালবাসত। বাক্স-পেঁটরা সরিয়ে একটা ঘর খালি ক'রে দিলে। অমর বাঁচল। তার বড় ভয় যে এই সব বাবুলোক এরা তার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে ফেলবে। আর একদিন কাটল। হেসে, বেড়িয়ে, তাস খেলে, ভালমন্দ পাঁচ রকম খেয়ে অমর বেশ আছে। এরই মধ্যে মুখে একটু বেগুনী আভা দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে হরেন বেড়াতে বেড়াতে তাকে বললে, "তোমার কি ভাই আর কাপড়-চোপড় নেই? রোজ এই নীল কোট আর ছাই রঙের পেণ্টুলুন পরা নিয়ে এরা হাসাহাসি করছিল।" অমর কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর দিলে, "জানত হরেন আমার অবস্থা।" মনে মনে স্থির করলে, একবার জুৎ পেলে হয়, দেখে নেব এই সব ফোতো বাবুদের। শেষে ঠিক হল যে হরেনের এক plus four suit (খাটো পেণ্টুলুন সুট) আছে সেটা এরা কেউ দেখে নেই, সেইটে কেটে-কুটে অমর ঠিক ক'রে নেবে। অমরের পুঁজির কথা ত পাঠক জানেন। যত সস্তায় পারে নীচে বাজারে কাটা-কুটো ক'রে নিলে। তা ছাড়া আড়াই টাকায় এক রঙীন চিত্র-বিচিত্র সোয়েটার, আর এক

টাকায় এক গরম ফুল মোজা কিনে আনলে। চমৎকার জিনিস, দেখে বোঝবার জো নেই যে পাটের তৈরী। পরদিন নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে যখন অমর বের হ'ল, পাঁচ বন্ধুই সমস্বরে হুররে ব'লে উঠল। অমরও প্রসন্নমুখে গুড্ মর্ণিং ব'লে সম্ভাষণ করলে। আর তার বিশেষ কোন ভাবনা সঙ্কোচ ছিল না। দু-দুটো সুট, একটা রঙ্গচঙ্গে সোয়েটার এতেই কদিন বেশ কেটে যাবে। তবে মুস্কিল হবে যদি মেয়ে মহলে মিশতে হয়। আপাততঃ তার কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ তার দলের সবাই বড়লোকের ছেলে হলেও কোন রকম সামাজিক পাশে আবদ্ধ হতে একেবারে নারাজ। কজনই এক মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত, সাধ মিটিয়ে হৈ হৈ করবে। তবে তাদের হৈ হৈ কুরসীনশীন গদীনশীন হয়ে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষাকৃত কোমল কি না, কাজেই পাহাড়ে পাহাড়ে লম্বা পাড়ি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্যায়াম করা দার্জ্জিলিং-এর একটা কুরীতি, তাই তারা রোজ দুবেলা চৌরাস্তায় আসত আর কখনও কখনও ঘোড়া ভাড়া ক'রে Mall-টা মন্থরগতিতে চক্কর দিত। অমর ত ঠিক এই দরের লোক নয়। তার দু-চার দিনেই House of Lords-এর জীবন নিতান্ত একঘেয়ে মনে হতে লাগল। ব্যাট্ কাপড় সঙ্গে এনেছে, তার বড় ইচ্ছা কোথাও মাঝে মাঝে টেনিস খেলে আসে। রোজ সাজগোজ ক'রে চৌরাস্তায় ব'সে থাকায় তার মন উঠবে কেন? তার উপর গরীবের পেট, হরেনের বাড়ীর গুরুভোজন বিনা ব্যায়ামে আর সহ্য হচ্ছিল না। বেঞ্চে ব'সে ব'সে দেখত, কত বঙ্গ-বেরঙ্গের ছোকরা সাহেব ব্যাট্ হাতে হেলতে দুলতে ক্লাবের দিকে চলেছে। লুব্ধ নয়নে দেখত, আর দেখে বড় হিংসা হত। কিন্তু সহায় ছাড়া সে কি ক'রে ক্লাবে যাবে? একদিন হরেনকে কথাটা বলাতে সে হেসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে, অমরের আমাদের ক্লাবে গিয়ে সাহেবদের পা না চাটলে পেট ভরছে না। কেন, যাও না বাবু স্যানিটেরিয়মে, টেনিস খেলার যদি এত সখ।" অমর ভয়ানক চটে গেল মনে মনে। কথার ভঙ্গী দেখনা, চাঁদমারীতে ব'লে মামার বাড়ী পর্য্যন্ত একবার গেলাম না, ধর্ম্মশালা ছেড়ে জলাপাহাড়ে থাকতে এলাম, আবার টেনিসের জন্য ধুতি প'রে কার্ট রোডে নেমে যাব? যাবই আমি জিমখানাতে, যেমন ক'রে পারি। সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিন্তু বন্ধুদের চটাতেও ত পারে না, তাহলে থাকবে কোথা!

একদিন চৌরাস্তায় ব'সে রয়েছে, দেখে যে তাদের কলেজের প্রফেসার মেজর রে ব্যাট হাতে ক্লাবের দিকে যাচ্ছেন। সাহেবদের ভাষায় বলতে গেলে, অমর ঠিক বুঝত তার রুটির কোন দিকটায় মাখন

মাখানো। তৎক্ষণাৎ স্থির করলে মেজর সাহেবকে কাণ্ডারী ক'রে ক্লাবে পাড়ি দেবে। দৌড়ে গিয়ে খুব ভক্তিভরে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "স্যার, আপনি এসেছেন জানতাম না। অনুমতি করেন ত কাল একবার গিয়ে প্রণাম ক'রে আসব।" মেজর রে খুব অমায়িক হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। সকাল ৯-টার আগে এসো। আমি Mrs. Monk-এর হোটেলে থাকি, সাত নম্বর ঘর। তুমি যে মস্ত সাহেব হয়েছ হে! আমি ত জানতাম না যে তুমি এরকম smart কাপড়-চোপড় পর। টেনিস খেলছ? তুমি ত বেশ ভাল খেলতে পার।" সেদিন plus fours-টা পরা ছিল। অমর একটু সলজ্জ হেসে বললে, "না স্যার। টেনিস খেলার সুবিধা হয়ে ওঠে নেই।" Right O! So long! ব'লে রে সাহেব চলে গেলেন। অমর বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, "কি বাবা, এই ছুটির সময়েও তোমার প্রোফেসার নইলে চলছে না?" অমর একটু কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিলে, "ওঁর একটু কাজ আছে ব'লে সকালে আমায় ডেকেছেন।" রে সাহেবটী একটু খোসামোদপ্রিয় ছিলেন। অমর কলিকাতাতেও তাঁর বাড়ীতে দু-চার বার গেছল, এখানে রীতিমত তোয়াজ আরম্ভ ক'রে দিলে। রোজ ছোট-হাজরী খেয়েই তাঁর কাছে উপস্থিত হত, চিঠিপত্র টাইপ ক'রে দিত, নোট নকল ক'রে দিত। আবার ৯-টার পর বন্ধুদের সঙ্গে জুটে পড়ত। সব দিক বজায় রাখতে হবে ত! হরেন কিন্তু একদিন একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি রে সাহেবকে অত আমড়াগাছী করছ কেন হে? রোজ কি করতে যাও ওখানে?" অমর জানালে যে সাহেবের কতকগুলো দরকারী নোট নকল ক'রে নিচ্ছে। দিন চার-পাঁচ পরে মেজর রে অমরকে বললেন, "ওহে চ্যাটার্জী, তুমি ঐ ছোকরাদের ওখানে বেশ সুবিধামত থাকবার জায়গা পেয়েছ ত? নইলে আমার এখানে আসতে পার। একটা ছোট কুটরী খালি পড়ে রয়েছে।" কুটরীটা দেখলে। নিতান্ত ছোট, একটু অন্ধকারও বটে। তবু এই সাহেবী হোটেলে থাকতে আসা অমরের কাছে সবরকমে বাঞ্ছনীয়। হরেনদের উপর টেক্কা দেওয়াও হবে। আর স্যারের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে খাতিরও অনেক বাড়বে। রাজী হল। স্বর্গের সিঁড়িতে আর এক ধাপ চড়া হল। বন্ধুদের অশেষ ঠাট্টা-তামাসা সহ্য ক'রেও সেই দিনই অমর হোটেলে জিনিসপত্র নিয়ে এসে বসল।

বিকেলে গুরুমহাশয়ের সঙ্গে গিয়ে ক্লাবটা দেখে এল। নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগল। বহুকাল আগে একবার ঢাকা ক্লাব দেখেছিল। তার কাকা সেখানে সরকার ছিলেন। কাকার দপ্তরে ব'সে লুব্ধনয়নে

সাহেব-মেমদেব খেলা-ধূলো আমোদ-প্রমোদ অনেকক্ষণ ধ'বে দেখেছিল। মনে হয়েছিল যেন অমবাপুবী। সেই ক্লাবই ত। আজ সেও সাহেব হযে এসেছে, লেমন স্কোয়াশেব গেলাস হাতে ধ'বে একটু বেঁকে ব'সে ইংবেজীতে কথা কইছে! তবে গলদ এই যে সাহেব-মেম এখানে বড় কম। বাহুব তাডনে শশীপ্রায় অন্তর্হিত, সাদা মুখ যে কটা এসেছে তাবা এক পাসে ব'সে আছে। বেশীব ভাগই স্যাবেব মত সাহেব, বেঁকিযে ইংবেজী বলে মাৎ ক'রে দিচ্ছেন। তা সে যাই হোক্, আমাদেব স্বদেশী মেম-সাহেবদেব কিন্তু বড সুন্দব দেখাচ্ছে। যদি বা একটু বঙ্গেব গোলযোগ থাকে তা প্রসাধনেব চোটে অমবেব চোখে পডছে না। সব চেযে তাব ভাল লেগেছে ঐ ছোট মেয়েটীকে, ফিবোজা বঙ্গেব সাড়ী পবা, মাব কাছ ঘেঁসে ব'সে বয়েছে। কি লাগে ওব কাছে কটাচুল, নীলচোখ। অমব স্থিব কবলে, যা থাকে কপালে, ওদেব সঙ্গে আলাপ কববেই, সুবিধা পেলে। ফেববাব পথে বন্ধুদেব দেখলে চৌবাস্তায়। মন তখন নানাবকমে মশগুল্। একটু পাস কাটিযে পালাতে চেষ্টা কবছিল। কিন্তু যাবে কোথায? সবাই চেঁচাতে আবম্ভ কবলে, "মযূব, মযূবপুচ্ছ, দাঁডকাক, সাহেববাবু, আবে শোনই না।" কি কবে, গেল তাদেব কাছে। নবেশ উপহাস ক'রে জিজ্ঞাসা কবলে, "কোথায গেছলে বাবা, চেযেই দেখনা যে। এখনও ত হবেনের কাট্‌লেট্ পেটে গজগজ কবছে।" অমব শান্তভাবে উত্তব দিলে, "কোথাও যাই নেই, বে সাহেবের সঙ্গে ওদিকটায় বেডাচ্ছিলাম। আজ চমৎকাব বরফ বেবিযেছে।" নবেশ মুখ বেঁকিযে বললে, "তুমি ববফ নিযে কি কববে বাবা, তৈল জোগাড কব। কোথাও না কোথাও মোসাহেবী নইলে তোমাব ত চলবে না।" অমব চালাক ছেলে, কথা হজম কবতে জানে। সে হবেন নবেশকে চটাবে কেন, চুপ ক'বে বইল।

আবও দুদিন কেটে গেল। মেজর সাহেব ছাত্রকে নিযে দুবার টেনিস খেলে এসেছেন। কিন্তু দুপুব বেলায় নিযে গেছলেন যখন সাহেব-সুবোব ভিড কম। একটু একটু ক'বে অমবেব ক্লাব ও হোটেল জীবনটা অভ্যাস হ'য়ে আসছে। বড সুখে আছে। তৃতীয় দিনে সেই মেযেটীকে বাস্তায় দেখলে। নীল ফ্রেঞ্চ বেশমেব সাডী খাটো ক'বে পবা, খোলাচুল হাওয়ায় একটু একটু উডছে, হাতে সবুজ বঙ্গেব চিত্রবিচিত্র ছাতা। অমবেব মনে হল যেন সুন্দব একটী প্রজাপতি ফুলেব মাঝে উডে বেডাচ্ছে। তাব প্রাণেব ভেতব যেন কি মোচড দিতে লাগল। মেযেটীব মার মুখও বড় ভাল লাগল; কিন্তু সঙ্গে একটী দাদা যাচ্ছিল, সে যেন একটা আস্ত লেবঙ্গেব গোরা। প্রায সেই রকম লাল বঙ্গ, আব ঘুষো যেন উঁচিযেই

আছে। তবু অমর আমাদের কি ছাড়বার পাত্র! সবুরে মেওয়া ফলে। বিশেষ তার নসীব এখন খুব জোর যাচ্ছে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা খানার পর মেজর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে ছোকরা, তুমি একটা কালো-গোছের সুট সঙ্গে এনেছ কি? পরশু আমার সঙ্গে লেডী বি'র পার্টিতে যাবে।" অমর একটু যেন লজ্জিত হয়ে বললে, "আজ্ঞা না, আমি সেরকম কাপড় ত কিছু আনি নেই।" সাহেব "বোয়, বোয়" ক'রে হুঙ্কার ছাড়লেন। বোয় আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার আর বছরের সেই নীল কাপড়া এনেছিস্ কি?" "হাঁ হুজুর।" "সেটা এই সাহেবের ঘরে রেখে দে। কাল সকালে দর্জীটাকে ডাকিয়ে সাহেবের গায়ে ফিট্ ক'রে নিতে হবে।" "জো হুকুম হুজুর।" পরদিন সকালে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই সেই নীল সার্জের সুট ঠিক হয়ে গেল। বড় সাধ ক'রে অমর নূতন কাপড় প'রে বেড়াতে বের হল। কিন্তু নরেশটা এমনি অসভ্য বর্ব্বর যে ব'লে উঠল, "নূতন পুচ্ছ কোথায় জোগাড় করলে হে বায়সপ্রবর?" ভ্যাগ্যিস্ এরা ক্লাবে যায় না। তাহলে প্রাণটা অতিষ্ঠ হত। কাল সকালে ক্লাবে ladies-দের সঙ্গে টেনিস খেলতে হবে মাষ্টার মহাশয় হুকুম করেছেন। সেই সময় নরেশের মত বখা ছেলে দর্শক থাকলে হয়েছে আর কি! নরেশটা দিন দিন অমরের জুজু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে যে বড় জুজু গোকুলে বাড়চে তা ত আর বেচারা তখন জানে না।

পরদিন সকালবেলা যখন দশটার সময় অমর টেনিস বেশে সজ্জিত হয়ে ব্যাট্ হাতে ডাঃ রে-র সঙ্গে চৌরাস্তার উপর দিয়ে গশ্ গশ্ ক'রে চ'লে গেল, নরেশ হরেনকে বললে, "ছেলে বটে, ঠিক বাগিয়েছে।" টেনিস কোর্টে গিয়ে দেখে সেদিনকার সেই মেয়েটী তার ভাইয়ের সঙ্গে ব'সে আছে। আজও নীল সাড়ী। অমরের বুক দুড় দুড় ক'রে উঠল। ভাইটীর সেই মানোয়ারী গোরার মত মুখ, লাল টক্‌টক্ করছে, হাসির লেশ নেই। যে হাতে ব্যাট ধ'রে রয়েছে সেটা যেন একটা বাঘের থাবা। ভগবান্ এমন বোনের এমন ভাই কি ক'রে সৃষ্টি করলেন! অমরদের দেখে ভাই বোনকে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, "Why is that fellow looking at you like a sick cow, Nellie (তোর দিকে অমন রুগ্ন গরুর মত ক'রে চেয়ে রয়েছে কেন রে, নেলী।)" মেজর রে ছাত্রকে এদের সঙ্গে যথারীতি আলাপ ক'রে দিলেন, "মিষ্টার ওমর চাটার্জী, মিষ্টার রোপেন রুডার, মিস্ নীলিমা রুডার।" নীলিমা ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে, বোধহয় বয়সের দোষ। কিন্তু ভূপেন অমরের মুখের দিকে একটু কৃপা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "হাডুডু?" অমর নত হয়ে দুজনকেই নমস্কার করলে। ভূপেনের ব্যবহারটার ঠিক অর্থ বোঝবার তার শক্তি ছিল না। আর বুঝলেও

গায়ে মাখবাব পাত্র সে নয। কিন্তু সে যে আজ নেটিভ নয তা প্রমাণ কববার একটা সুযোগ মিলল সেইখানেই। তাবা যে কোর্টে খেলবে ব'লে স্থিব ছিল, সেখানে তুজন আহেলেবেলাযৎ সাহেব-লোগ খেলছিলেন। তাঁদেব সেট্ শেষ হতে তাঁবা খেলা বন্ধ না ক'বে আবাব নূতন সেট্ আবম্ভ ক'বে দিলেন। এ কিছু একটা নূতন ব্যাপাব নয়। এ বকম হয়েই থাকে, আব আমাদেবও বংশগত প্রকৃতি এ সময একটা বৈদান্তিক নিষ্ক্রিয ভাব দেখান। অমব কিন্তু বসভঙ্গ কবলে। একেবাবে কোর্টেব মাঝখানে লাফিযে পড়ে চেঁচিযে উঠল, "এ আমাদেব কোর্ট, আপনাবা অন্যত্র খেলুন গিযে।" একজন সাহেব মৃত্বু হেসে উত্তব দিলে, "Must we, Baboo ? তাই নাকি বাবু ?" অমব আব কিছু বললে না বটে, কিন্তু কোর্টও ছাড়লে না। সাহেবলোগবা তাকে নাছোড়বান্দা দেখে শেষ নিজেদেব কোট হ্যাট নিযে স'বে পড়লেন। অমবেব জয হল। সে একটু বুক ফুলিযে এসে নেলীকে বললে, "আসুন এইবাব খেলা যাক।" ভুপেন, কি জানি কেন, খুসী হল না। ভুরু কুঁচকে অমবকে জিজ্ঞাসা কবলে, "ওবা কি জানে যে আপনি মেম্বব নন ?" এ সব সামান্য জিনিস হজম কবতে আমাদেব অমবনাথ খুব জানে। ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটাব ঘা সইতেই হয। তাব সামনে এত বড় পুবস্কাব, নেলীব সঙ্গে টেনিস খেলা। সে নেলীব ভাইযেব তুটো কথা ববদাস্ত কববে না ? টেনিস সুরু হল ভাই বোন একদিকে, আব মেজব সাহেব ও ছাত্র অন্য দিকে। অমব প্রথম সেট্‌টা খুব জোব খেললে। মেজব বে একদিকে বৃদ্ধ সাহেব হলেও খেলাধূলোয় সুবিধা ক'বে উঠতে পাবেন না। ছাত্র তাঁকে এক বকম কোণ ঠাসা কবেই বাখলে, সে একাই সর্ব্বত্র বল্ নিতে লাগল। অন্যদিকে ভূপেন মন্দ খেললে না, কিন্তু তাব মেজাজ ভাল ছিল না খানিকটে চেষ্টা ক'বেই হাল ছেড়ে দিলে। ফলে অমব জিতিল, ৬—৩। আবার খেলা আবম্ভ হল। এবাব অমব মাষ্টাব মহাশয়কে সব ছেড়ে দিতে লাগল। যখন নিজে কোনও বল্ মাবে ত সে খুব আস্তে নেলীব দিকে। ফলে দ্বিতীয সেট্ ভাই বোন জিতল, ৭—৫। নেলী আনন্দে হাততালি দিতে লাগল, কিন্তু তাব দাদা গম্ভীবভাবে মাথা নাড়লে, "ও ত তোকে ইচ্ছা ক'বে জিতিয়ে দিলে। একে আবাব টেনিস্ বলে ?" খেলা হয়ে গেলে ডাঃ বেব ইশাবা পেয়ে অমর দৌড়ে নেলীব কোট এনে পবিযে দিলে, বসবাব জন্য একটা বেশ নীচু দেখে চেয়াব এগিযে দিলে। বোপেন নীবস ভাবে ইংবেজীতে বললে, "ইস্কুলেব মেয়ে, অত শিভাল্‌বী (সম্মান) ওব অভ্যাস নেই, কেন ওব মাথা বিগড়ে দিচ্ছেন. চাটার্জী ?" ফিবে যাওয়ার পথে মেজব সাহেব ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কবলেন, "কেমন লাগল

ওদের ? দিব্যি মেয়েটা না নীলিমা ?” অমর অকারণ লাল হয়ে উত্তর দিলে, “আজ্ঞে হ্যাঁ বেশ, ওঁরা কোথায় থাকেন ?” “ওদের বাবার নিজের বাড়ী আছে। জালা পাহাড়ে ‘বেলা ভিষ্টা’ দেখ নেই ? ব্যারিষ্টার সতীশ রুডারকে চেন ত ? তাঁরই ছেলে মেয়ে ওরা। একদিন নিয়ে যাব এখন তোমায়।” অমরের বুকের ভেতরটায় যেন কে হাতুড়ী মারতে আরম্ভ করলে।

ভাই বোনের বাড়ীর পথে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ভাই বললে, “চাটার্জীটা একটা boor (বর্ব্বর), দেখলেই বোঝা যায় কখনও ভদ্রসমাজে মেশে নেই।” বোন চ’টে উঠল, “দাদা, তোমার ঐ কেমন দড়াম ক’রে কথা বলা অভ্যাস। টেনিসে একবার হেরেছ তাই এত রাগ।” “একবার কেন দুবারই হেরেছি। শেষ সেট্‌টা ত তোকে ইচ্ছা ক’রে জিতিয়ে দিলে। আমি ও সব ন্যাকামি দেখতে পারি না। ও আবার টেনিস।” “কিন্তু ভদ্রলোকের manners (আদব কায়দা) আমার বড় ভাল লাগল।” “তোর খোসামোদ করছে, তাই চমৎকার ভদ্রলোক। ইস্কুলে পড়িস, সবাই কান মলে দেয় কিনা, তাই খোসামোদ বড় মিষ্টি লাগে। দেখ্‌ না, এই কাল পরশু একদিন ওর সঙ্গে singles খেলে দেব ঠুকে love set, ৬—০।” বাড়ী গিয়েই নেলী মাকে চেঁচিয়ে বললে, “মা, একজন নতুন টেনিস খেলোয়াড় এসেছে। কি সুন্দর তার ষ্টাইল, কি ভীষণ জোরে মারে ! তার কাছে দাদা হেরে গিয়ে ভয়ানক চটে গেছে।” মিসেস্ রুডার উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কেরে ভূপেন ? কেউ নূতন সিবিলিয়ান এসেছে না কি ? এখানে নিয়ে আসিস্।” ভূপেন খুব হেনস্তা ক’রে উত্তর দিলে, “না মা, মোটেই নয়, ডাঃ রে তাঁর কলেজের এক ছাত্রকে খেলতে এনেছিলেন। Funny fellow (তাকে দেখলে আমার হাসি পায়), কখনও আমাদের সেট্‌এ মিশেছে ব’লে বোধ হয় না।” মা মনে করলেন, নাই হল সিবিলিয়ান, জমীদার বড়লোকের ছেলেও হতে পারে, দেখাই যাক না। প্রকাশ্যে বললেন, “তা হোক গে, তোদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, রে-কে বলব তাকে একদিন এখানে খেলতে নিয়ে আসতে।” ছেলে বললে, “তা নিমন্ত্রণ কর, কিন্তু নেলী বাঁদরীকে ব’লে দাও যেন তার সঙ্গে অত গায়ে পড়ে ভাব করতে না যায়।” নেলী মুখ লাল ক’রে জবাব দিলে, “বেশ করব, খুব করব, তোমার কি ? মা, দাদা খেলায় হেরে গেলে মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়।”

তার পর দিন লেডী রি’র পার্টি। অমর নীল স্যুট প’রে বুকে এক লাল টুকটুকে কার্ণেশন ফুল গুঁজে গুরুজীর সঙ্গে North Crag কুটীতে

গেল। পাহাড়ের উপব সুন্দব প্রকাণ্ড বাড়ী, চাবিদিকে বাগান। পরিষ্কার আকাশ, ঠাণ্ডাও বেশী নেই তাই খোলা বাগানেই পার্টিব বন্দোবস্ত হয়েছিল। গাছে গাছে লাল নীল আলো, বঙ্গ বেবঙ্গেব নিশান টাঙ্গানো। বাগানময় ছোট ছোট চাযেব টেবিল। খানসামাবা ঘুবে ফিবে পবিবেশন কবছে। ডাঃ বে অমবকে লেডী সাহেবেব সঙ্গে আলাপ ক'বে দিলেন, "আমার ছাত্র ওমব চাটার্জী, খুব ওস্তাদ টেনিস খেলোযাড।" লেডী সাহেব বললেন, "একদিন খেলতে আসবেন এখানে।" অমব নমস্কাব ক'বে স'বে পডল। দূবে এক টেবিলে গিযে বসল। মাষ্টাব মহাশয সাদা বঙ্গেব সাহেব মেমদেব পবিচর্য্যায় মেতে গেলেন। তাঁব বিশ্বাস যে এই বিশাল বঙ্গদেশে তাঁব সঙ্গে সাহেবদেব যেমন একটা understanding (বোঝাপডা) আছে তেমনটী আব কাবও সঙ্গে নেই। সে যাক, কিন্তু অমব বেচাবাব একা একা হংসমধ্যে বকো যথা অবস্থা হল। এ সব ব্যাপাব ত তাব সত্যি বপ্ত হয় নেই। তা নইলে পাঁচ জনেব সঙ্গে জমিয়ে নিত। সে বিবলে বসে চা খাচ্ছে, এমন সময, "এই যে আপনি, একলাটী কি কবছেন?" ব'লে, একগাল হেসে নীলবসনা নীলিমা লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত হ'ল। অমব, "আমি ত কাউকে চিনি না, বসুন আপনি," বলতে বলতে একটা চৌকী এগিয়ে দিলে। তুজনে বসলে পব অমব জিজ্ঞাসা কবলে, "আচ্ছা, আপনি কি নীল বঙ্গ ছাডা অন্য কোনও বঙ্গেব শাড়ী পবেন না? কি ক'বে জানলেন নীলবঙ্গ আপনাকে এমন মানায়?" নেলী হাসতে হাসতে বললে, "নীল আমি ববাববই ভালবাসি তবে সাড়ী এই কযেক বছব পবছি। নীলিমা নাম কিনা তাই বোধ হয় মা নীল ফ্রক পবাতেন।" ব'লে আবাব হাসতে লাগল। কেন যে এবা দিবাবাত্র হাসে কে জানে? অমব বেচাবা হাসিব তবঙ্গে যেন খাবি খেতে লাগল। এমন সময হঠাৎ, "কাঁপাইযা বণস্থল, কাঁপাইযা গঙ্গাজল, উঠিল সে ধ্বনি", অর্থাৎ কিনা বোপেন সাহেব এসে উপস্থিত হল, দেখলে কাব উপব বোনটী এত হাসিব ফোযাবা ছুটিযেছে, বললে, "নেলী, মা তোকে খুঁজছেন, পালা। গুড্ ইভনিং চাটার্জী।" নেলী চট্ ক'বে কথা শোনবাব পাত্র কি না প্রায়, সে অমবেব হাত ধ'বে টানাটানি আবম্ভ কবলে, "আপনিও আসুন না মাব টেবিলে।" অমব মবমে ম'বে গেল। নইলে দেখতে পেত বোপেনেব তু চোখ কি বকম জ্বলছিল, যেন বনবেবাল। নেলী মা বাবাব সঙ্গে অমবেব আলাপ ক'বে দিল এই ব'লে, "মা, ইনিই আমার বন্ধু, মিষ্টাব চাটার্জী। তোমায ত বলেছি এঁব কথা।" মিসেস্ কুডাব খুব মিহিসুবে ইংবেজীতে বল্লেন, "আপনাব সঙ্গে আলাপ

ক'রে বড় আনন্দ হল। আপনি নাকি টেনিসে মস্ত ওস্তাদ। ছেলেরা রোজ বিকেলে বাড়ীতে খেলে। একদিন আসবেন।" অমর কৃতার্থ হল, কিন্তু হঠাৎ দেখে পশ্চাতে রোপেন। সে বুঝতে পারে না কেন রোপেনটা এই রকম পুলিশের দারোগার মত তার পেছনে পেছনে ঘুরছে। কিন্তু রোপেন বাঙ্গলা কলেজে বরাবর প'ড়ে আসছে, অমরের type চেনে খুব ভাল ক'রেই। ও-চীজ বাড়ী থেকে একটু দূরে রাখাই ভাল, এই তার বিশ্বাস। সে যাই হোক, রোপেনকে দেখে অমর ব্যস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, "কাজ আছে মাপ করবেন গুড্ বাই," ব'লে স'রে পড়ল। রে সাহেবকে চারিদিকে খুঁজতে লাগল। শেষে দেখে তিনি জনা তিন চার হোমরা চোমরা ইংরেজ জুটিয়েছেন, তাদের সঙ্গে ব'সে তাস খেলছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে অমর বাড়ী রওয়ানা হল। নীল সাড়ী কাল চোখের ধ্যান করতে করতে কত যে ঠোক্কর খেলে তার ঠিকানা নেই। বাড়ী পৌঁছে এক আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির বর্ণনা আপনার মনে আওড়াতে লাগল। আচ্ছা, বিদ্যাপতি ঠাকুর যেন ঠিক তার জন্যই সে বর্ণনা লিখেছেন,—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
* * *
প্রকট হাস অব গোপন ভেল
* * *
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥

বেচারা অমর, নিজের খেয়ালেই আছে। সাহেবরা ত বলে যে প্রেমের দেবতা অন্ধ। নীলিমার হাসি যে অধর ও দুপাটি দন্ত ছেড়ে কোথাও গোপন হয় নেই, তা দেখবার চোখ কি অমরের আছে? আর চলন, তা মরালের চেয়ে মর্কটের সঙ্গেই বেশী মেলে। কথাবার্ত্তা হাসির এমনই তোড় যে বাড়ীর ছাদ কাঁপে। তা এসব কে বলবে অমরকে? অনুমতি পেলে আমাদের রোপেন বলত, বেশ রগড়েই বলত। হয়ত বলবেও একদিন। আপাততঃ অমর চেয়ারে ব'সে চোখ বুজে কিশোরীর রূপ ধ্যান করতে লাগল। মেজর কখন ফিরে এলেন জানতেও পারে নেই। হঠাৎ পিঠে এক প্রচণ্ড চাপড় পড়ায় লাফিয়ে উঠল। শুনলে সাহেব বলছেন, "Lucky Devil!" খুব কপাল তোমার! কোথায় আজ গেছলে জান? North Crag আর লাট-কুঠীতে তফাৎ কি? ওখানে কি যে সে নিমন্ত্রণ পায়? By the way, পরশু রুডারদের বাড়ী টেনিস

ও চায়েব নিমন্ত্রণ। মিসেস্ রুডাব তোমাব উপব ভারী খুসী। And that little monkey Nellie, she's clean gone on you (আব নেলী বাঁদবী, সে ত তোমাব প্রেমে হাবুডুবু।) She will be an awf'lly pretty gal some day (একদিন বড সুন্দবী মেযে হবে হে।) অমব ভাবলে, "Will be, হবে! এব অর্থ কি? মেজব সাহেবেব চোখে চালশে ধবেছে তাই নীলিমাব অপরূপ সৌন্দর্য্য আজও চোখে পডছে না।"

এই সব ভাবতে ভাবতে ডাক্তাব সাহেবকে গুড্ নাইট্ ব'লে সে শুতে গেল। কিন্তু চিবদিনেব বন্ধু ঘুম আজ আব কিছুতেই ধবা দেয না। ছোকরাটী যে স্বভাবতঃ প্রেমপ্রবণ তা নয়। ববং, এত বযস হল, এব আগে কোনদিন কোনও স্ত্রীলোকেব দিকে ভাল ক'বে চেয়েও দেখে নেই। আজ কিন্তু হাডে হাডে বুঝছে যে তাব দফা বফা। তবে অমবেব সব দিক ভেবে কাজ কবাটা জন্মগত অভ্যাস। তাই সে নিজেব মনোভাবটাকে পাকা ডাক্তাবেব মত dissect কবছে (চিবে দেখছে।) নেলীকে ভালবেসেছে; বেশ ত, নেলীকে বিয়ে কববে; রুদ্র কিন্তু জাতে কাযেত; তা হলেই বা? ব্রাহ্ম-সমাজ আছে; মা মত কববেন না; তা কি হবে? পালিয়ে বিয়ে কববে। একটা জিনিস সে ধ'বে নিচ্ছে, যে রুদ্র-বাডীতে কোনও গোল হবে না। এই ত বিকেলবেলা নেলী তাকে জোব ক'বে নিয়ে গিয়ে মাব কাছে বন্ধু ব'লে আলাপ ক'বে দিলে। আবাব বে সাহেব বললেন নেলী তাব প্রেমে হাবুডুবু। এব মানে ত সে আমারই মত মশগুল্ হয়েছে। আদুবে মেয়ে, সে জেদ কবলে রুদ্র কি আব রুদ্রমূর্ত্তি ধবতে পাববেন? আব বিয়ে হলেই ত তাব বিলেত যাওয়াব পথ সুগম হল। তাব চিব-দিনের সাধ পূবল। কাবও খোসামোদের দবকার নেই। কি শুভ মূহুর্ত্তেই দার্জ্জিলিং এসেছিল! এই সব জল্পনা কবতে কবতে ঘুমিয়ে পডল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপন দেখলে যে বোপেন রুডাব এক নীলাম্ববী সাডী প'বে তাকে খ্যাংরা নিয়ে তাডা কবেছে। বেচাবা অমব! এই বকমে ঘুমে, স্বপনে, ভয়ে, ভালবাসায তাব বাত কাটল। ভোব হতেই মাথায এক মতলব এল। সে তাড়াতাডি কাপড-চোপড প'বে বেবিয়ে পডল। বাস্তা জনশূন্য। হন্‌হন্ ক'বে একেবাবে মহাকাল বাবাব পাহাডেব মাথায় উপস্থিত হ'ল। আজ মেঘ মোটে নেই, উঠন্ত সূর্য্যেব সোনালী আলো প'ডে কাঞ্চনজঙ্গা কি সুন্দবই দেখাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য বঙ্গেব খেলা। কিন্তু আমাদেব নাযকেব মন তখন ভবপূব, তাব ববফ দেখাব অবকাশ কোথায়? সে কবলে কি, যেখানটায় নিশান, ছেঁডা ন্যাকডা ইত্যাদি টাঙ্গানো আছে সেইখানে ঢুকে প'ডে লামাকে নমস্কাব ক'বে

নগদ চাব আনা তাঁব সামনে বেখে দিলে। লামাজী দুর্ব্বোধ্য ভাষায তাকে আশীর্ব্বাদ কবলেন। তখন অমব ঈষৎ হেসে, জোডহাতে, বড সন্তর্পণে তাব প্রার্থনা নিবেদন কবলে, "লামা মহাবাজ, আমাকে আপনি বলুন, আমাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে কি না।" লামা কি বুঝলেন তা ভগবান তথাগতই জানেন, কিন্তু এক কথায় জবাব দিলেন, "বেশক।" অমব খুব খুসী হল, কিন্তু সে ত লামাদেব হিন্দুস্থানীব দৌড কতটা তা জানত না। কে জানে হয ত ভাষাটা গুলিযে গেল, "আহাম্মক" বলতে গিয়ে লামাজী "বেশক" বললেন। অমব আবও খানিকক্ষণ পাহাড়েব চূড়ায ব'সে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'বে নিয়ে নেমে এল। Amherst Villa-তে একবাব ঢুঁ মেবে গেল। হবেনরা সবাই রযেছে, চা খাচ্ছে। তাকে দেখে নবেশ হৈচৈ ক'বে উঠল, "কোথায থাক বাবা, একেবাবে ডুমুব-ফুল হযেছ যে। কিছু একটা মতলব বাগাচ্ছ, বন্ধু। তোমায আমি খুব চিনি।" অমব একটু আমতা আমতা ক'রে এক পেযালা চা খেযে গুড্-বাই ব'লে পালাল।

টিফিন পর্য্যন্ত বাডীতে ব'সেই জাবব কাটতে লাগল। কাঁটায কাঁটায তিনটেব সময় বেলা ভিস্টায় উপস্থিত হল। নীলিমা বাবান্দাতেই দাঁডিযেছিল, লাফিযে নেমে এল। কাছে এসেই চীৎকাব কবতে লাগল, "মিষ্টাব চাটার্জী, কি হয়েছে জানেন? দাদা পাঁচ টাকা বাজী বেখেছে যে আপনাকে Singles খেলে হারাবে। খববদাব হাবাতে দেবেন না। আমার টাকাব বড দবকাব। একটা এমন সুন্দব ভুটিয়া কুকুব আজ বেচতে এসেছিল!" অমব মনস্থিব ক'বে এসেছিল যে বোপেনেব কাছে আজ হাববে। স্বপনে দেখা ঝাঁটাধাবী সেই চেহাবাটা এখনও যেন চোখেব সামনে জ্বলজ্বল কবছে। কিন্তু উপায় নেই, প্রণয়িণীব হুকুম। প্রথম থেকে প্রাণপণ চেষ্টায খেলে ৬-২-তে হাবিযে দিলে বোপনকে। সে মুখখানাকে ভীমরুলের চাকেব মত ক'বে মাব কাছে গিযে বসল। "ওকে আবাব ভদ্রলোকেব টেনিস বলে নাকি? হতভাগা জেতবাব জন্য যতবকম ফন্দী জানে সব চালিয়েছে।" নেলী পর্য্যন্ত তাব উপব একটু দবদ দেখালে না, উল্টো তখনই পাঁচ টাকা চেযে বসল। ইতিমধ্যে মেজব বে এসে পৌছলেন, রুডাব সাহেবও আপিস কামবা থেকে বেবিয়ে এলেন। তখন চাব জন পুরুষ মানুষে দু সেট্ খেলা হল, কিন্তু বোপেন এমন হাঁডিব মত মুখ ক'বে বইল যে খেলাটা মোটে জমল না। রুডাব গিন্নী অতশত বোঝেন না ডাঃ বে-কে ও অমবকে খেয়ে যেতে বললেন। বোপেন কিছু বললে না, কিন্তু "একটু বেডিযে আসি," বলে ঝড়েব মত বেবিযে গেল। আজ সকালে সে নবেশেব কাছ থেকে অমব সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছে আব মনে স্থিব কবেছে যে যত শীঘ্র পাবে ও Humbug (জোচ্চোব)-

টার এ বাড়ী আসা বন্ধ করবে। সন্ধ্যার আলো জ্বললেই রুডার আর রে দাবা খেলতে বসলেন। মিসেস্ রুডার ভেতরে চলে গেলেন বোধ হয় ঘরকন্নার কাজে। নীলিমা অমরকে ধরলে "একটা গল্প বলুন। খেতে এখনও অনেক দেরী।" তুজনে বারান্দায় এক বেতের সোফায় বসল। অমরের গল্পে লাল পরী, সবুজ পরী, নীল পরী এই রকম কত কি ছিল। নেলী তন্ময় হ'য়ে গল্প শুনছে এমন সময় অমর তার মুখ নেলীর কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "নীলপরী, ঘুমিয়ে পড়লে ?" পরী হো হো ক'রে হেসে উঠল। ঠিক সেই সময় রোপেন বেড়িয়ে ফিরে এল। অমরের মুখ শুকিয়ে গেল। গল্প হঠাৎ বন্ধ হল। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "এই নেলী, মা কোথা রে ?" নেলী বললে, "তুমি নিজে দেখনা। আমি গল্প শুনছি, বিরক্ত করনা বলছি।" রোপেন রাগে গরগর করতে করতে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে ঢং ঢং ক'রে খানার ঘণ্টা পড়ল। সবাই ভেতরে গেলেন। অমরের জায়গা টেবিলের এক কোণে, নীলিমার জায়গা আর এক কোণে। এটা রোপেনের কারসাজী। সচরাচর বাইরের লোক থাকলে নীলিমা টেবিলে স্থান পায় না। আজ বোধ হয় নিজেই মাকে বলেছিল। খানা আরম্ভ হল। অমর একটু নিরাশ হয়েছে ত, তাই ভাল ক'রে খাচ্ছে না। এমন কি টাটকা পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজা পর্য্যন্ত ফিরিয়ে দিলে। নেলী চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। আমি ভয়ানক রাগ করব।" রে হেসে উঠলেন, "Sweet heart, তুমি আমায় ছেড়ে দিলে নাকি ? আমি খাচ্ছি কি না খাচ্ছি তা ত একবারও ফিরেও দেখছ না। Lucky dog চাটার্জী।" নেলী রাগের ভাণ ক'রে বললে, "আপনাকে আমি করে বললাম, আপনি আমার Sweet heart।" রোপেনের রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, "নেলী, এই রকম চেঁচামেচি করবি ত কাল থেকে কখনও টেবিলে আসতে পাবি না।" মা ছেলের অকারণ রাগ দেখে বললেন, "কেন ছেলেমানুষকে খেপাচ্ছিস্ ভুপেন ! তুই নিজে খা ত।" রোপেন মনে মনে বললে, "বেশ, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করব।"

খাওয়ার পর অমর নীলপরীর গল্পটা শেষ করতে বসল। রে চুরুট ধরিয়ে বিদায় নিলে, "আমি যাচ্ছি, তুমি শীঘ্র এসো অমর।" রোপেন সেই বারান্দায় চুপ করে বসে রইল এক কোণে। খানিক পরে অমর উঠল, সবাইকে গুড্‌নাইট্ বলে বের হল। নেলী বললে, সুন্দর চাঁদের আলো, চলুন আপনাকে ফটক পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসি।" পাঁচ মিনিট হয়ে গেল তবু নেলী ফেরেনা। রোপেন এক লাফে উঠে বেরিয়ে গেল। দেখে, বোনটী অমরের সঙ্গে ফটকের বাইরে পায়চারি করছে, তুজনেই

হাসছে। গম্ভীর গলায় ডাকলে, "নেলী ভেতরে আয়, মা ডাকছেন।" নেলী উত্তর দিলে, "দাঁড়াও না বাপু, এই এলাম ব'লে এক মিনিটে।" রোপেন রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "না, এখনই চলে আয়। চালাকী চলবে না।" নেলী মুখ ভার ক'রে ভেতরে চ'লে গেল। তারপর রোপেন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে অমরের কাঁধে হাত রাখলে। অমরের মনে হল যেন কাঁধটা জাঁতি কলে পড়েছে। ফিরে দেখলে চাঁদের আলোতে রোপেনের চোক দুটো যেন জ্বলছে। রোপেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "অমরনাথ বাবু আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি. এ বাড়ীতে ফের কখনও আসবেন না। বুঝলেন আমার কথাটা? আর যেন বলতে না হয়।" অমরের মুখে একটীও কথা সরল না। আস্তে আস্তে চ'লে গেল। Amherst Villa-য় গিয়ে ভাঙ্গা গলায় "হরেন, হরেন" ব'লে ডাকলে। হরেন বেরিয়ে এল। বন্ধুর মুখ দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, অমর?" অমর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "তুমি ভূপেন রুদ্রকে চেন?" "খুব চিনি সে যে আমার ক্লাসে পড়ে।" "সে আমায় আজ বড় অপমান ক'রে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছে।" "তোমাকে অপমান করেছে? তা ভাই, আমার কথা যদি শোন ত ওর পথ আর মাড়িও না। অত্যন্ত গোঁয়ার। আর বলাই চাটুজ্যের কাছে যা ঘুষো খেলা শিখেছে সে অতি ভয়ানক।" অমর শুকনো গলায় বললে, "তাহলে ভাই যদি আশ্রয় দাও ত আজ তোমার এখানেই থাকি। কাল ডাঃ রে-র ওখানে থেকে জিনিসপত্র আনিয়ে নেব।" সে রাত্রি অমর Amherst Villa-তেই রইল। পরদিন হরেন মেজর রে-কে চিঠি লিখলে যে অমর তার বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আজই নেমে যাবে, যদি ডাক্তার সাহেব অনুগ্রহ ক'রে মালপত্রগুলো পাঠিয়ে দেন। সেই দিনই অমর কলকাতা চ'লে গেল। ভবানীপুরে পৌঁছলে তাকে দেখে তার মা ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন, "হ্যাঁ রে, এ কি চেহারা হয়েছে! সমস্ত মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে। এর নাম তোদের পাহাড়ে হাওয়া-বদল করতে যাওয়া?" অমর বোঝালে যে পেটে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছিল। হৃদয়ের ব্যাধির কথাটা কাউকেই বললে না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রীতি-বিচার

(প্রসাদ)

১

ভাষাব প্রথম কাজ সামাজিক মানুষেব লৌকিক প্রযোজন সিদ্ধি, তাব চবম পবিণতি লোকোত্তব বস-সৃষ্টিতে। জীবনযাত্রাব নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্যাপাবে পবস্পবেব সঙ্গে যে যোগস্থাপনেব প্রয়োজন হয সে যোগ হচ্ছে কর্ম্মযোগ। এবং তাব উপায় যে ভাষা সে হচ্ছে কাজেব কথাব ভাষা। কর্ম্ম-নিবপেক্ষ জ্ঞান বা কর্ম্মেব উদ্দেশ্য-শূন্য অনুভূতিব প্রকাশ তাব কাজ নয। অর্থাৎ সে ভাষা 'গরু আন, দুধ দোও' জাতীয, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' শ্রেণীব নয়। এ ভাষা কিছু কবতে বলে, নয কিছু থেকে বিবত থাকতে বলে। সে ইঙ্গিত মাত্র, তাব নিজেব কোনও স্বতন্ত্র মূল্য নেই। যত সংক্ষেপে ও যত দ্বিধাশূন্য পবিষ্কাব বকমে ইঙ্গিতেব বিষযটি সে বোঝাতে পাববে কাজেব কথাব ভাষাব ততই সার্থকতা। যদি তাব মধ্যে এমন কিছু থাকে যাতে আঙ্গুল দিযে সে যা দেখাচ্ছে চোখ সোজাসুজি কেবল সে দিকে না গিযে আঙ্গুলেব দিকেও যায়, তবে সেটা ও ভাষাব দোষ। কাবণ তাতে প্রযোজন সিদ্ধিব ব্যাঘাত ঘটে। কাজের কথাব ভাষাব আদর্শ হলো কথাকে গোপন ক'বে সুধু কাজকে ব্যক্ত কবা। কথাব যে স্বাতন্ত্র্য থাকবে না কেবল তাই নয, তাব বং-এব ছোপ্‌ও কাজেব গাযে লাগ্‌বে না।

এ কথা মনে কবাব কাবণ নেই যে মানুষ কোনও দিন বিশুদ্ধ কাজেব মানুষ ছিল। জীবনযাত্রাব প্রযোজনে মনেব যা ব্যয হয তাব অতিবিক্ত মন মানুষেব চিবকাল আছে। এই বাহুল্য মনেব অনুভূতি মানুষ চিবদিন প্রকাশেব চেষ্টা ক'বে আস্‌ছে। কিন্তু আদিতে মানুষ এ চেষ্টা কবেছে নিশ্চয় ভাষা দিয়ে নয, কবেছে সুবে, অঙ্গেব গতি ও ভঙ্গীতে, ছবিব বেখায় ও বং-এ। মানুষেব ইতিহাসে সাহিত্য ও কাব্যেব সৃষ্টি হযেছে সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রেব অনেক পবে। ঘবকন্নাব এ দাসী যে বাজবাণীও হ'তে পাবে মানুষেব এ আবিষ্কাব খুব বেশী দিনেব নয়।

বলা বাহুল্য, কাজেব ভাষাব আদর্শ গুণ হ'লো শোন্‌বা মাত্রই তাব অর্থ বোধগম্য হওয়া। আলঙ্কাবিকেবা বচনাব 'প্রসাদ'গুণেব যে সব লক্ষণ দিয়েছেন তাব প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, "অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ" (১)।

---

(১) সাহিত্য দর্পণ, ৮।১২।

কিন্তু কাজেব ভাষাব ঐ আদর্শ-গুণ আলঙ্কাবিকদেব 'প্রসাদ'গুণ নয়। আদর্শ কাজেব ভাষা যে সবল, এবং শ্রুতিমাত্র অর্থবোধক তাব কাবণ ও ভাষা হচ্ছে শুধু চিহ্ন। চিহ্ন বস্তুটি কাটা-ছাঁটা, মাপাযোকা জিনিষ। ওব মধ্যে কোনও অনিশ্চযতা নেই। ওব মূল্য ও ওজন একবাবে ঠিক কবা আছে, এবং সর্ব্বত্রই ওব সেই দাম ও ওজন। যে ভাষায় ক্রিযা-কর্ম্ম ও আইন-কানুনেব বিধি-বিধান দেওযা হয, সুতবাং, কাজেব ভাষা, মীমাংসকদেব কথায় তাব একটা সর্ব্বজনসম্মত লক্ষণ হচ্ছে, "সকৃদুচ্চবিতঃ শব্দঃ সকৃদেব অর্থং গমযতি",—একবাব মাত্র যে শব্দ প্রয়োগ হয়েছে তাব একটিমাত্র স্থিব অর্থ নিতে হবে, তা থেকে অতিবিক্ত কিছু আদায়েব চেষ্টা চল্‌বে না। চিহ্নধর্ম্মী এই ভাষা দিয়ে যে কাজেব কথা বলা চলে, এবং ঐ ভাষাই যে তাব উপযোগী ভাষা, তাব কাবণ কাজেব কথা হচ্ছে সবল ও সহজ কথা। জীবনেব বক্ষা ও স্ফূর্ত্তিব জন্য "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ",—মানুষকে জন্ম থেকে মৃতুপর্য্যন্ত কাজ ক'বে যেতে হয। আমাদেব অঙ্গ ও ইন্দ্রিয এই কাজেব কল কবেই মূখ্যত তৈবী। এবং মনেব বড অংশ ও আদিম অংশ এই কলেবই মালিক ও চালকমাত্র। সুতবাং কাজেব কথা মানুষেব কাছে অভ্যস্ত বিষযেব কথা। আব সে বিষয কেবল জীবনেব নিত্য দেনা-পাওনাব নিকট পবিচযে পবিচিত নয, তাতে সেই সুনির্দ্দিষ্ট জ্যামিতিক জগতেব সহজ সবলতা বযেছে—যে বস্তু-জগতকে আমবা কর্ম্মেন্দ্রিয দিয়ে নেডেচেড়ে দেখ্‌তে পাবি।

সাহিত্য দিযে মানুষ যা বল্‌তে চায তা এ জাতীয কথা নয়, এবং সে জগতেব কথা নয যে জগৎ কেবলমাত্র আমাদেব কর্ম্মেব উপাদান ও লক্ষ্য। যে কথা শব্দবহা নাডী বেযে উঠে কর্ম্মেব নাডী দিযে নেমে মাংসপেশীব পবিমিত বা ব্যাপক আকুঞ্চন-সম্প্রসাবণে নিঃশেষ হয সাহিত্য সে কথা বলে না। ৰূপ-বস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দেব যে জগৎ আমাদেব ঘিবে আছে, সে সামাজিক জগৎ মিলন ও সংঘর্ষেব অসংখ্য সূতোব জালে মানুষকে বেঁধে বেখেছে, মানুষেব জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও তাব ইতিহাস—এবা মানুষেব মনে যে বিচিত্র অনুভূতিব জন্ম দেয় সাহিত্য ভাষাব ৰূপ দিয়ে তাব প্রকাশেব চেষ্টা। এই প্রকাশেব প্রেবণা মানুষেব জৈব ব্যাপাবেব অতিবিক্ত ধর্ম্ম। মানুষ যেখানে জীবমাত্র সেখানে অনুভূতি তাকে কর্ম্মেব প্রেবণা দেয। অনুভূতিকে গডন দিযে প্রকাশেব প্রেবণা বিশেষ ক'বে মনুষ্য-ধর্ম্ম। যে ভাষা অনুভূতিকে এই প্রকাশেব গডন দিতে চায়, অর্থাৎ সাহিত্যেব ভাষা, যে ভাষা শুধু চিহ্ন হ'লে চলে না, কাবণ এ ভাষাব লক্ষ্য নয আকাব-ইঙ্গিতে বিষয বস্তুব সেইটুকু মাত্র পবিচয়

•

দেওয়া অভীষ্ট কাজের জন্য যেটুকু প্রয়োজন। সাহিত্য বস্তুর বিবরণ নয়, বস্তুর অনুভূতির প্রকাশ। এই অমূর্ত্ত অনুভূতির সাহিত্যিক মূর্ত্তির দেহ হচ্ছে ভাষা, এবং মূর্ত্তি থেকে তার দেহকে তফাৎ করা যায় না। সুতরাং কাজের কথার ভাষার লক্ষ্য থেকে চিহ্নের যে স্বাতন্ত্র্য, সাহিত্যের ভাষায় বাচ্য ও বচনের সে দ্বৈত নেই। বচনের রঙে বাচ্যকে রাঙানো যায় বলেই সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে।

On the 9th Nelson sent Collingwood what he called in his diary the "Nelson-touch" * * * The order of sailing was to be the order of battle—the fleet in two lines, with an advanced squadron of eight of the fastest sailing two-deckers The second in command, having the entire direction of his line, was to break through the enemy, about the twelfth ship from their rear, he would lead through the centre, and the advanced squadron was to cut off three or four ahead of the centre This plan to be adopted to the strength of the enemy, so that they should always be one-fourth superior to those whom they cut off * * * * *

Soon afterwards he asked him if he did not think there was a signal wanting Captain Blackwood made answer that he thought the whole fleet seemed clearly to understand what they were about These words were scarcely spoken before that signal was made which will be remembered as long as the language or even the memory of England shall endure—Nelson's last signal "England expects that every man will do his duty" (২)

এই 'নেল্‌সন্ টাচ্' স্পষ্টই কথায় আঁকা একটি 'প্ল্যান্'। কাগজে দাগ কেটেও ওকে আঁকা যেতো। এবং ঐ কথার 'প্ল্যান' কাগজের 'প্ল্যানের' অনেকটা কাছাকাছি এসেছে বলেই কথাগুলি শোন্‌বা মাত্র প্ল্যানটি চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। নেল্‌সনের শেষ 'সিগ্‌নাল্', যাবৎ ইংরেজি ভাষা বা ইংলণ্ডের স্মৃতি বেঁচে থাকুক আর না থাকুক, কাগজে এঁকে কখনও দেখান যেতো না। কারণ যদিও ওর নাম 'সিগ্‌নাল্' ওটি কোনও বিশেষ কাজের ইঙ্গিত নয়। ওটি নেল্‌সনের সে সময়কার একটি অনুভূতির প্রকাশ, যে অনুভূতি তিনি তাঁর নৌ-বাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ নেল্‌সনের 'টাচ্' হচ্ছে 'সিগ্‌নাল্', আর 'সিগ্‌নাল' হচ্ছে 'টাচ্'। সেইজন্য যে ভাষায় এই অনুভূতি প্রকাশ হয়েছে কেবল চিহ্নধর্ম্মী শব্দ দিয়ে তাকে গড়া সম্ভব হয়নি। "England expects that every man will do his duty."—এর 'ইংলণ্ড' কথাটি ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের একটি দ্বীপের নির্দ্দেশকমাত্র নয়। ঐ ভৌগলিক ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ইংরেজ জাতির স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ, শৌর্য্য ও বিজয়ের গৌরবময় দীর্ঘ

(২) সাদের 'নেল্‌সন-চরিত', ৯ম অধ্যায়।

ইতিহাস ওর ব্যঞ্জনা। 'ডিউটি' শব্দটির অর্থ নয় হাতে-হাতিয়ারে কি করতে হবে না হবে। যুগে যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা কর্তব্যের কাছে যে আত্মবলি দিয়েছে সেই কথা স্মরণ করানো ওর উদ্দেশ্য। 'এভ্‌রি ম্যান্'ও ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের মাথাগুন্তি নয়; প্রতি লোকের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ ওর লক্ষ্য। এদের সঙ্গে তুলনা করা যাক্ 'নেল্‌সন্ টাচ্' অর্থাৎ প্ল্যানের 'enemy' কথাটি। "This plan to be adapted to the strength of the enemy," অথবা, "The second in command was to break through the enemy",—এই 'এনিমি' শব্দটিতে বিরাগ-বিদ্বেষের উগ্র রং-এর স্পর্শ নেই; ওর অর্থ কেবলমাত্র যুদ্ধের অপর পক্ষ, এবং যুদ্ধের প্ল্যান্ বল্‌তে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শব্দকে চিহ্নমাত্র ক'রেই এখানে কাজ চলে, এবং ভাল চলে।

(২)

কাজের ভাষার যে সরলতা সাহিত্যের ভাষায় যে সে জাতির সরলতা সম্ভব নয় তার মূলকারণ কিন্তু এই চিহ্নধর্ম্মী আর ব্যঞ্জনাধর্ম্মী শব্দপ্রয়োগের প্রভেদ নয়। মূলকারণ অবশ্য এই যে, মানুষের কাছে সাহিত্যের কথা কাজের কথার মত সরল কথা নয়। অনুভূতি মানুষের অন্তরের বস্তু, এবং সেইজন্যই ভাষায় তাকে ঠিক প্রকাশ করা কঠিন কাজ। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের মত আমাদের ভাষাও মূলে বহির্ম্মুখী। সেইজন্য বস্তু ও কাজের কথায় ভাষার যে জন্মগত সহজ পটুত্ব, অন্তরের অনুভূতির প্রকাশে তার সে অনায়াসলব্ধ নৈপুণ্য নেই। এবং শব্দের চিহ্ন দিয়ে যে অত্যন্ত সরল উপায়ে ভাষা কাজের কথা বলে, মনের অনুভূতির প্রকাশে সে কৌশল অচল। সাহিত্যের ভাষাকে তাই ভিন্ন পথ ধর্‌তে হয়। শব্দের আদিম চিহ্ন-মূর্ত্তির চারপাশে যুগ যুগ ধ'রে নানা পথে ও কারণে ভাব ও চিন্তা, ছবি ও রং-এর বহু এবং বিচিত্র যে সব ইঙ্গিত জমা হ'য়ে ওঠে সাহিত্যকে তার ভাষা গড়্‌তে হয় সেই মাল-মশলার অজস্র ব্যবহার ক'রে। বস্তুজগতের সুনির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছিন্নতা অনুভূতির নেই; সেইজন্য তাকে সোজাসুজি নির্দ্দেশ করা যায় না, এই সব ইঙ্গিতের বক্রোক্তি দিয়ে তাকে প্রকাশ কর্‌তে হয়। এ কাজ সহজ নয়, এবং এতে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। শব্দকে ঘিরে ইঙ্গিতের গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু ও উল্কার যে মণ্ডল তার সবগুলিকে টেনে আন্‌লে প্রকাশের কাজ হয় না, এবং ভুলগুলিকে টান্‌লে কাজ পণ্ড হয়। সুতরাং সাহিত্যের শব্দবিন্যাস হ'তে হয় সেই যাদুমন্ত্র যার উচ্চারণে অভীষ্ট যত ইঙ্গিত তারাই আকৃষ্ট হয়, যারা অপ্রয়োজনীয় ও বিরোধী তারা দূরে যায়। অর্থাৎ সাহিত্য যে কথা

বল্‌তে চায় তার প্রকাশের দুরূহতা যেমন রয়েছে কথার প্রকৃতির মধ্যে, তেমনি রয়েছে প্রকাশের উপায়ের মধ্যে। অনুভূতিকে ভাষার রূপ দিয়ে প্রকাশের কাজটিই দুরূহ, আর যে ভাষা তার উপাদান তার সার্থক প্রয়োগের কৌশলও দুরূহ। যাকে রচনার প্রসাদগুণ বলে তার মূল এই দুরূহতা। কারণ 'প্রসাদ' হচ্ছে এই দুরূহতার বাধাকে অতিক্রমের ক্ষমতা। যে কথার প্রকাশ মনে হয় হবে নিতান্ত জটিল, টানাছেঁড়ার ব্যাপার—যখন দেখা যায় স্বচ্ছন্দ অবলীলায় তার পরিপূর্ণরূপ ভাষায় এঁকে উঠ্‌লো তখন মনে যে বিস্ময়ের চমক লাগে তার আনন্দই হলো প্রসাদগুণের গুণত্ব। এ সেই আনন্দ কষ্টসাধ্য গতি ও ভঙ্গীকে নৃত্যের আনায়াস লীলায় পরিণত দেখ্‌লে যে আনন্দ হয়। 'প্রসাদ' হচ্ছে রচনার সেই গুণ প্রকাশের পায়ের শিকলকে যে তার নাচের নূপুর ক'রে তোলে। 'শ্রুতিমাত্র অর্থবোধ' যে সাহিত্যের "ষ্টাইলের" একটা গুণ তার মূলে রয়েছে এই বোধ যে এ এমন কথার শ্রুতি যে বহুবার শুনেও অর্থের বোধ না হ'লে কিছু আশ্চর্য্য ছিল না।

"অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ"—শোন্‌রামাত্রই এ কথার অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু কোনও আলঙ্কারিক একে প্রসাদগুণের দৃষ্টান্ত বলেন নি। বিশ্বনাথ প্রসাদগুণের উদাহরণে এই শ্লোকটি তুলেছেন,—

> সূচীমুখেন সকৃদেব কৃতব্রণস্ত্বং
> মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ।
> বাণৈঃ স্মরস্য শতশো বিনিকৃত্তমর্ম্মা
> স্বপ্নেঽপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি॥

'তুমি মুক্তাহার, একবার মাত্র সূচীর সূক্ষ্মমুখে ক্ষত হ'য়ে প্রিয়ার অঙ্গের নিবিড় স্পর্শলাভ করছ। আমার মর্ম্ম মদনের বহু বাণে শতদিকে বিদীর্ণ, তবু কেন স্বপ্নেও আমি তার দেখাও পাই নে!' আলঙ্কারিকেরা যে উদাহরণ দিয়েছেন, এবং যে উদাহরণ দেন নি তাতেই বোঝা যায় যে 'প্রসাদ' অর্থ সরলতা নয়। রচনার সরলতার কারণ হ'তে পারে যে তার বক্তব্য বিষয় অতি সহজ।

"আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা বহু রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি পত্রান্তরে দেখাইয়াছি। আজ যে দ্রব্যটির কথা লিখিতেছি তাহা একটি উৎকৃষ্ট 'খাদ্যৌষধি'। ইহার নাম কুষ্মাণ্ড। প্রকারভেদে ইহা দুই প্রকার—চাল-কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। চালকুমড়াই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার গুণ লিখিত হইল।" (৩)

(৩) 'কুষ্মাণ্ড'—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন, এল্‌-এম্‌-এস্‌। ভারতবর্ষ—১৩৩৯, শ্রাবণ, ২৮২ পৃঃ।

এ লেখা যে সবল তাতে সন্দেহ থাক্‌তে পাবে না। যা খেলে ক্ষিদে যায তাতেই বোগ সাবে—এ বকম বস্তু যে আছে, এবং দুপ্রকাব কুষ্মাণ্ডেব একপ্রকাব যে এই বকম জিনিষ, এ খবব লেখাটি পডলেই বিনা আয়াসে জানা যায। অবশ্য 'খাদ্যৌষধি' ব্যাপাবটি, এবং কুষ্মাণ্ডেব শ্রেণীবিভাগ কিছু জটিল কথা নয়। কিন্তু সহজ কথাও সবল ক'রে সকলে বল্‌তে পাবে না। সুতবাং এ লেখাব সবলতা নিশ্চয় এব একটা গুণ; কিন্তু সে গুণ প্রসাদগুণ নয। কাবণ এ সবলতা মনকে যেমন পীড়া দেয না, তেমনি তাকে নাড়াও দেয না। একটা কথাব মত কথা অতি সহজে সম্পূর্ণ ক'বে বল্‌তে শুন্‌লে মন যে খুসিতে ভ'বে ওঠে, শুদ্ধ সবলতাব মধ্যে সে বিস্ময়েব আনন্দ নেই।

কুষ্মাণ্ডেব চেয়ে উদ্ভিদসমাজে ঢেব নীচু জিনিষ 'ঘাসেব' কথা একটু শোনা যাক্।

"সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনাব স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না কবে—সে যেন স্মবণ কবে যে, পৃথিবীব শুষ্ক ধূলীকে সে শ্যামলতাব দ্বাবা আচ্ছন্ন কবিতেছে, বৌদ্রতাপকে সে চিবপ্রসন্ন স্নিগ্ধতাব দ্বাবা কোমল কবিয়া লইতেছে। বোধ কবি, ঘাসজাতিব মধ্যে কুশতৃণ গাযেব জোবে ধান্য হইবাব চেষ্টা কবিযাছিল—বোধ কবি, সামান্য ঘাস হইযা না থাকিবাব জন্য, পবেব প্রতি একান্ত মনোনিবেশ কবিযা জীবনকে সার্থক কবিবাব জন্য তাহাব মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্ব্বদা পবেব প্রতি তাহাব তীক্ষ্ণলক্ষ্য নিবিষ্ট কবিবাব একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পবই বুঝিতেছে। মোটেব উপব একথা বলা যাইতে পাবে যে, এরূপ উগ্রপবপবাযণতা বিধাতাব অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধাবণ তৃণেব খ্যাতিহীন, স্নিগ্ধসুন্দব, বিনম্র-কোমল নিষ্ফলতা ভাল।" (৪)

ঘাস মানুষেব খাদ্য নয, এবং সম্ভব কোনও নামকবা বোগেব ঔষধও নয। কিন্তু এই 'ঘাসেব কথা' মনেব বসাযণ। কাবণ এ লেখা পডবামাত্র শুধু যে এব অর্থ বোধ হয তা নয়, সে অর্থ তখনি সমস্ত মনে ব্যাপ্ত হ'য়ে তাকে আবিষ্ট কবে। 'শ্রুতিমাত্র অর্থবোধকে' যে আলঙ্কাবিকেবা প্রসাদ বলেছেন (৫), সেটা তাঁদেব প্রসাদগুণেব সংজ্ঞা কি স্বরূপ-বর্ণনা নয। ওটি প্রসাদগুণেব অপবিহার্য্য উপায মাত্র। তাঁদেব মতে 'প্রসাদ' হচ্ছে বচনাব সেই ধর্ম্ম যাতে তাব বাচ্য ও বস মুহূর্ত্তে চিত্তে ব্যাপ্ত হয, আগুন যেমন শুক্‌নো কাঠে চকিতেব মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

---

(৪) 'পনেবো-আনা'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৫) 'শ্রুতিমাত্রেণ শব্দাত্তু যেনার্থপ্রত্যযো ভবেৎ।
সাধারণঃ সমগ্রাণাং স প্রসাদো গুণো মতঃ॥' (কাব্যপ্রকাশ, ৮।১১।)

'চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ॥' (৬)

কিন্তু বাচ্য ও রসের এই ক্ষিপ্রগতি সম্ভব হয় না যদি না শব্দগুলির শ্রুতিমাত্রই রচনার অর্থ-প্রত্যয় হয়। সেইজন্যই প্রয়োজন

'শব্দাস্তদ্ব্যঞ্জকা অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ।' (৭)

'শ্রুতিমাত্র অর্থবোধ' যেখানে অর্থবোধেই পরিসমাপ্ত হয় সে রচনা শুধু সরল। প্রসাদগুণের সরলতা ফল-লাভের একটা কৌশল মাত্র, তার চরম লক্ষ্য নয়।

(৩)

গোবিন্দদাসের 'করচায়' সমুদ্রের বালুতটের বর্ণনায় আছে,—"দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন"। সমুদ্রের তটভূমি সম্বন্ধে এ কথা হয় ত ঠিক। কিন্তু কোনও রচনা সম্বন্ধে এ কথা সত্য হ'তে পারে না যে,—'বলিবার কিছু নাই তথাপি প্রসাদ'। রকম বিশেষের কথাকে বিশেষ রকম ক'রে বলার মধ্যেই প্রসাদগুণ। কথার বিশেষত্ব ও বলার বিশেষত্ব এই দুয়ে মিলে প্রসাদ। ওর কোনটির অভাব হ'লে রচনায় প্রসাদগুণ থাকে না। অনেক শূন্যগর্ভ কথা, বলার বিশেষ কিছু নেই তবুও খানিকটা বলা, অনেক সময় লেখার গুণে বেশ ঝর্‌ঝরে, নিখিচ্‌, সুখপাঠ্য হয়। কিন্তু এ সব clever রচনায় প্রকৃত প্রসাদগুণ থাকে না। কথার মধ্যে কিছু অভিনব, কিছু চমৎকার, কিছু গভীর না থাক্‌লে, শুধু বলার কৌশলে কোনও রচনা প্রসাদ-যুক্ত হয় না। প্রসাদগুণ মনের পথে কথার গতিকে ক্ষিপ্র করে। সুতরাং তার শক্তির পরিমাণ কেবল গতির বেগ মেপে পাওয়া যায় না, যে কথার গতি তার ওজনটাও দেখ্‌তে হয়। Momentum শুধু velocity-তে হয় না, mass চাই। তবে নাকি নবীন বিজ্ঞানে বলে যে mass-ও গতি-নিরপেক্ষ নয়, সেইজন্য গতির ক্ষিপ্রতায় হাল্‌কা জিনিষকেও ভারী মনে হ'তে পারে; বলার বিশেষ কৌশলে ফাঁকা কথাকেও একটা বিশেষ কিছু ব'লে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।

গণিতের পরিভাষায় 'প্রসাদ' প্রকাশের দুরূহতার function। কথার প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশের বাধা যত বেশী, যে রচনা 'শুষ্কেন্ধনাগ্নিবৎ' তাকে চিত্তে ব্যাপ্ত করে তার প্রসাদগুণও তত বেশী। সুতরাং দুটি লেখার

---

(৬) সাহিত্য দর্পণ, ৮।১১। 'কাব্য-প্রকাশে' মম্মটভট্ট ঐ এক কথাই বলেছেন,—
'শুষ্কেন্ধাগ্নিবৎ স্বচ্ছজলবৎ সহসৈব যঃ।
ব্যাপ্নোত্যন্যৎ প্রসাদোঽসৌ সর্ব্বত্র বিহিতস্থিতিঃ।' (৮।৫।)

(৭) সাহিত্য দর্পণ, ৮।১২।

প্রসাদগুণ তুলনা করতে কেবল তাদের প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছতার তুলনা করলে চলে না, যে কথা তারা প্রকাশ করছে তার প্রকৃতিও যাচাই ক'রে দেখতে হয়। দুটি নিঃসন্দেহ প্রসাদগুণযুক্ত লেখার তুলনা করা যাক্। লিটন্ স্ট্রেচি রাণী ভিক্টোরিয়ার উপর ডিস্‌রেলীর প্রভাব বিস্তারের যে বর্ণনা করেছেন তার আরম্ভটা এই—

The amazing being, who now at last, at the age of seventy, after a life-time of extraordinary struggles, had turned into reality the absurdest of his boyhood's dreams, knew well enough how to make his own, with absolute completeness, the heart of the Sovereign Lady whose servant, and whose master, he had so miraculously become In women's hearts he had always read as in an open book His whole career had turned upon those curious entities, and the more curious they were, the more intimately at home with them he seemed to be But Lady Beaconsfield, with her cracked idolatry, and Mrs Brydges-Williams, with her clogs, her corpulence, and her legacy, were gone an even more remarkable phenomenon stood in their place He surveyed what was before him with the eye of a past-master, and he was not for a moment at a loss He realised every-thing—the interacting complexities of circumstance and character, the pride of place mingled so inextricably with personal arrogance, the superabundant emotionalism, the ingenuousness of outlook, the solid, the laborious respectability, shot through so incongruously by tem-peramental cravings for the coloured and the strange, the singular intellectual limitations, and the mysteriously essential female element impregnating every particle of the whole A smile hovered over his impassive features, and he dubbed Victoria 'the Faery' (৮)

ডিস্‌রেলীর অদ্ভুত চরিত্র,—প্রবল সাংসারিক ও প্রবুদ্ধ 'কমিডিয়ান্', এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার লঘু-গুরু ও ধূসর-রঙীন নানা উপাদানে গড়া শেষ পর্য্যন্ত নাতিগভীর ও অনতিজটিল মন, স্ট্রেচি অতি চমৎকার এঁকে তুলেছেন। লেখক যা বলতে চেয়েছেন এ লেখায় তার কোনও কথা পাঠকের মনে অস্পষ্ট থাকে না। এ লেখা যেমন স্বচ্ছ, তেমনি নিটোল। এর পাশে রাখা যাক্ উইলিয়াম জেম্‌সের বার্গস'র দার্শনিক মতের আলো-চনা থেকে একটা ছোট প্যারাগ্রাফ্—

When you have broken the reality into concepts you never can reconstruct it in its wholeness Out of no amount of discreteness can you manufacture the concrete But place yourself at a bound, or d'emblée, as M Bergson says, inside of the living, moving, active thickness of the real, and all the abstractions and distinctions are given into your hand you can now make the intellectualist substi-tutions to your heart's content Install yourself in phenomenal move-ment, for example, and velocity, succession, dates, positions, and innumerable other things are given you in the bargain But with only an abstract succession of dates and positions you can never

(৮) লিটন্ স্ট্রেচি—'কুইন্ ভিক্টোরিয়া', ৮ম অধ্যায়।

patch up movement itself It slips through their intervals and is lost

ষ্ট্রেচিব লেখাব বর্ণচ্ছটা জেম্‌সেব লেখায় নেই। কাবণ জেম্‌সেব যা বিষয-বস্তু তাতে বং ফলাবাব অবকাশ নেই। কিন্তু বঙীন তুলিতে ষ্ট্রেচি যা এঁকেছেন তা অনেকটাই বক্ত-মাংসেব জিনিষ, তাকে ধবা-ছোঁযা যায। জেম্‌সেব কলমেব মুখে অশবীবী দার্শনিক তত্ত্ব মূর্ত্তি পেযে বেঁচে উঠেছে। বক্তব্যেব মধ্যে পবিপূর্ণ ও পবিষ্কাব প্রকাশেব যে বাধা ষ্ট্রেচি অতিক্রম কবেছেন, তাব চেযে অনেক বড বাধা জেম্‌সকে জয কব্‌তে হযেছে। তবুও ষ্ট্রেচিব 'ওযাটাব কলাব'-এব চেযে জেম্‌সেব 'পেন্‌সিল্‌ ড্রয়িং'-এব প্রকাশেব শক্তি কিছুমাত্র কম নয়। ববং পবীক্ষা কব্‌লে দেখা যাবে যে জেম্‌সেব এ লেখাব তুলনায ষ্ট্রেচিব বচনাটিব 'প্রসাদ' অনেকটা 'মেক্যানিকাল্‌'। যত্নে কাটা ও সযত্নে পালিশ কবা বাক্য-খণ্ডেব পব বাক্য-খণ্ড সাজিযে ওটি নিপুণ ক'বে তৈবী কবা ইমাবত। জেম্‌সেব কথা ফুটে উঠেছে ভিতব থেকে,—ফুল যেমন ক'বে ফোটে। পাপ্‌ডিব সঙ্গে পাপ্‌ডি জুড়ে ওকে কখনও বানানো যেতো না।

(৪)

প্রাচীন আলঙ্কাবিকেবা 'প্রসাদ' ছাডাও 'অর্থব্যক্তি' ব'লে বচনা-বীতিব আব একটি গুণ স্বীকাব কবেছেন ; কিন্তু কাজেব বেলায 'প্রসাদ' থেকে তাকে বড একটা তফাৎ বাখ্‌তে পাবেন নি। বামন 'অর্থব্যক্তিকে' বলেছেন অতি শীঘ্র অর্থ-প্রতিপত্তিব হেতু (১০)। দণ্ডীব মতে 'অর্থব্যক্তি' হচ্ছে অর্থেব অনেযত্ব (১১), অর্থাৎ যে সব শব্দ প্রয়োগ কবা হযেছে তা দিয়েই উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়, আব অন্য কিছু কল্পনা ক'বে নিতে হয় না। নবীন আলঙ্কাবিকেবা বলেন, 'অর্থব্যক্তি' একটা স্বতন্ত্র গুণ নয়, ওটি প্রসাদগুণেবই অন্তর্গত। "প্রসাদেন অর্থব্যক্তির্গৃহীতা" (১২)। নবীনদেব এই মত বিনা দ্বিধায মেনে নেওয়া যায। কাবণ প্রাচীনেবা 'প্রসাদ' ও 'অর্থব্যক্তি' এই দুই নামে যে সব গুণ-দোষেব অলোচনা কবেছেন তা প্রকৃতপক্ষে 'ষ্টাইলেব' এক-ই গুণ ও তাব অভাবেব ভিন্ন ভিন্ন দিক ও কাবণ মাত্র। এক 'প্রসাদ' নামে তাদেব আলোচনায কিছুমাত্র দোষ হয় না। ববং অনাবশ্যক চুলচেবা বিভাগেব ব্যর্থ চেষ্টা থেকে আলোচনা বক্ষা পায়।

(৯) উইলিযাম জেম্‌স্‌—'এ প্লুরালিষ্টিক্‌ ইউনিভার্স'। ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(১০) "যত্র ঝটিত্যর্থ প্রতিপত্তিহেতুত্বং স গুণোঽর্থব্যক্তিরিতি"। 'কাব্যালংকারসূত্র', ৩।১।২৪।

(১১) "অর্থব্যক্তিরনেযত্বমর্থস্য"। 'কাব্যাদর্শ', ১।৭৩।

(১২) 'কাব্যপ্রকাশ', ৮।৭।

(৫)

প্রাচীন আলঙ্কাবিকেবা শব্দ-প্রযোগেব গুটিকযেক গুণ নির্দ্দেশ কবেছেন যাব অভাবে, তাঁদেব মতে বচনা প্রসাদগুণ থেকে ভ্রষ্ট হয়।

বামন 'প্রসাদকে' বলেছেন 'অর্থেব বিমলতা',—"অর্থবৈমল্যং প্রসাদঃ" (১৩)। 'ময়লা' বস্তুটি হচ্ছে যেখানে যাব প্রযোজন নেই সেই অস্থানে আবির্ভূত জিনিষ। পানীয় জলে বং মিশালে জলকে মযলা কবা হয়, হোবি খেলাব বঙীন জল মযলা জল নয়। সুতবাং 'অর্থেব বিমলতাব' মানে,—অর্থকে প্রকাশেব জন্য যে কথাগুলি বলা প্রযোজন কেবলমাত্র সেই কথাগুলি বলা, বাহুল্য কোনও কথা না বলা। "অর্থস্য বৈমল্যং প্রযোজকমাত্রপবিগ্রহঃ প্রসাদঃ" (১৪)। বামন এব বিপর্য্যযেব একটা দৃষ্টান্ত দিযেছেন,—"উপাস্তাং হস্তো মে বিমল-মণিকাঞ্চীপদমিদম্"। শবীবেব সে অঙ্গ লক্ষ্য 'কাঞ্চীপদম্' বল্‌লেই তা প্রাকাশ হয, 'বিমল-মণি' বিশেষণটি বাক্যেব অর্থে কিছুই যোগ কবে না। সুতবাং ওটি প্রযোজনেব অতিবিক্ত এবং প্রসাদগুণেব বিঘ্ন। "কাঞ্চীপদমিত্যনেনৈব নিতম্বস্য লক্ষিত্বাদ্বিশেষণস্যাপ্রযোজকত্বমিতি" (১৫)। অনাবশ্যক পদেব বোঝায় বাক্যেব অর্থকে ভাবাক্রান্ত কবাব দৃষ্টান্ত বড লেখকদেব লেখায় দেখা যায না। আমাদেব মত স্বল্প-ক্ষম লেখকেবা যখন অসাবধান হয়, বিশেষ যখম উচ্ছ্বাস কি কবিত্ব প্রকাশ কব্‌তে যায়, তখনি এ দোষ প্রায় দেখা দেয়।

"সেই বেগ প্রাচীন হিন্দু সমাজেব বন্ধন ছিন্ন কবিযাই পর্য্যবসিত হইল না, ভাবত সাগবেব উর্ম্মিসঙ্কুল নীলজলবাশি তাহাব গতিবোধ কবিতে পাবিল না, হিমালয়েব তুষাবাবৃত শুভ্র শিখবশ্রেণী সেই বেগেব প্রতিবন্ধক হইতে পাবিল না" (১৬)।

'বেগটি' হচ্ছে ভগবান বুদ্ধেব ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-সমাজকে আঘাতেব বেগ। কিন্তু জলবাশিব 'নীলত্বেব' ও তুষাবাবৃত পর্ব্বতশিখবেব 'শুভ্রত্বেব' কোনও কিছুব গতিকে কিছুমাত্র বাধা দানেব ক্ষমতা না থাকায় ও ছুটি বিশেষণ নিবর্থক কবিত্ব, বামনাচার্য্যেব ভাষায় 'বিশেষণদ্বয়স্যাপ্রযোজকত্ব-মিতি'।

বাক্যেব মধ্যে অনাবশ্যক পদ যে দোষ, সমস্ত বচনাব মধ্যে অনাবশ্যক বাক্য ও অংশ ঠিক সেই শ্রেণীব দোষ। প্রথমটি বাক্যেব প্রসাদ নষ্ট কবে, অন্যটি সন্দর্ভেব যথার্থ রূপটিকে পবিচ্ছিন্ন হ'য়ে পাঠকেব

---

(১৩) 'কাব্যালংকারসূত্র', ৩।২।৩।
(১৪) ঐ।
(১৫) ঐ।
(১৬) 'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯—'উদ্দীপনা'।

মনে ফুটে উঠ্‌তে বাধা দেয়, অর্থাৎ তার প্রসাদগুণের লাঘব ঘটায়। 'উত্তরচরিত' সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নাটক সম্বন্ধে যা বলেছেন, সমস্ত রকম রচনা সম্বন্ধেই সে কথা ঠিক। "যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত"। তা না হ'লে রচনাটি দৃঢ়সংবদ্ধ হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে না, বাহুল্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার গায়ে যেন ঝুল্‌তে থাকে। সম্ভব এই দোষ দেখেই জয়দেব উমাপতিধরের কাব্যের সমালোচনায় লিখেছিলেন,—"বাচং পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ"। রচনাকে 'পল্লবিত' করেন—নামকরা লেখকদের মধ্যেও এমন উমাপতিধরের সংখ্যা কম নয়।

(৬)

আলঙ্কারিকেরা বলেন প্রসাদ-যুক্ত রচনায় যেমন বাক্যের মধ্যে অনাবশ্যক পদ থাকে না, তেমনি আবশ্যক পদের অভাবও থাকে না। অর্থাৎ বাক্য যা প্রকাশ কর্‌তে চায় তার পক্ষে, যে পদগুলি দিয়ে বাক্যটি তৈরী, তারাই হবে যথেষ্ট, মনকে বাইরে থেকে কিছু কল্পনা ক'রে নিতে হবে না। দণ্ডী দুটি উদাহরণ রচনা ক'রে কথাটা বুঝিয়েছেন। যদি বলা যায়,

মহী মহাবরাহেন লোহিতাদুদ্ধৃতোদধেঃ। (কাব্যাদর্শ, ১।৭৪)।

'মহাবরাহরূপী বিষ্ণু লোহিতবর্ণ সমুদ্র থেকে মহীকে উদ্ধার করেছিলেন,'—তবে বাক্যটির শব্দার্থ বোঝার পর স্বভাবত অ-লোহিত বর্ণ সমুদ্রের লোহিতত্বের কারণ, অর্থের সঙ্গতির জন্য, মন খোঁজ করে। এবং কল্পনা কর্‌তে হয় যে মহাবরাহের খুরে ক্ষুণ্ণ সমুদ্রশায়ী অনন্তনাগের রক্তে সমুদ্র লোহিত হয়েছে। আলঙ্কারিকেরা বলেন এটা কষ্ট-কল্পনা, এবং এ রকম কল্পনার প্রযোজন—তাঁদের পরিভাষায় 'নেয়ত্ব', বাক্যের প্রসাদগুণ নষ্ট করে। ঐ কথাকেই যদি আর একটু বিস্তার ক'রে বলা যায়,

*　　*　　*　হরিণোদ্ধৃতা।
ভূঃ খুরক্ষুণ্ণনাগাসৃগ্‌ লোহিতাদুদধেরিতি॥ (কাব্যাদর্শ, ১।৭৩)

'হরি খুরে-ক্ষুণ্ণ নাগের শোণিতে-লোহিত সমুদ্র থেকে ভূমিকে উদ্ধার করেছিলেন,'—তা হ'লে ও রকমের কষ্ট-কল্পনা আর কর্‌তে হয় না, "উপাত্তশব্দাদেবোপস্থিতিরিত্যর্থ", (১৭)—প্রযুক্ত শব্দগুলি থেকেই সম্পূর্ণ অর্থ মনে প্রকাশ পায়।

কিন্তু সামান্য পরীক্ষাতেই দেখা যাবে যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতেও শব্দার্থের অতিরিক্ত অনেক কিছুই মনকে কল্পনা কর্‌তে হয়। এ 'নাগ' যে অনন্তনাগ, 'হরি'—বরাহরূপী বিষ্ণু, আর 'খুর' হচ্ছে সেই মহাবরাহের খুর—এ সব-ই অর্থের জন্য কল্পনা না কর্‌লে চলে না। এবং বিষ্ণুর বরাহ অবতারের

(১৭) কাব্যাদর্শ, ১।৭৩, ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকা।

সমস্ত গল্পটাই মনে আন্‌তে হয। আলঙ্কাবিকেবা বলেন, সে কথা ঠিক। পদেব শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থ দিযে সাহিত্যেব ভাষা কখনও বচনা হয না। সন্দর্ভ ও বাক্যেব মধ্যে, সংস্থানেব কৌশলে, পদেব এই 'অভিধা' ভিন্ন অন্য বস্তুকে বোঝাবাব, এবং সমস্ত শব্দার্থেব অতিবিক্ত বিষয়কে ইঙ্গিতে মনে ফুটিযে তোলাব যে শক্তি জন্মে,—অর্থাৎ পদেব 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনা', তাবাই হচ্ছে সাহিত্যেব ভাষাব প্রাণ। কিন্তু প্রসাদযুক্ত বচনায মনকে কষ্ট ক'বে কিছু কল্পনা কব্‌তে হয না। শব্দার্থ বোঝাব সঙ্গে সঙ্গেই, তাব শক্তি ও ইঙ্গিতে, যা কিছু কল্পনীয তা তৎক্ষণাৎ মনে উদয হয। শব্দার্থ-বোধের পব, অর্থেব অসঙ্গতি জ্ঞান হওযায, তাকে দূব কবাব জন্য মনকে খুঁজে পেতে যে কল্পনা কব্‌তে হয—সেই কল্পনাই বচনাব প্রসাদগুণ নষ্ট কবে (১৮)। মনকে যদি অর্থেব জন্য হাতবে বেড়াতে হয তবে সে বচনাব উপব মন বিমুখ হ'য়ে ওঠে। শক্তিশালী লেখকেব লেখায পদেব নির্ব্বাচন ও বিন্যাস এমন সুকৌশল যে শব্দগুলিব 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনাকে' মনে হয যেন তাদেব 'অভিধা'।

"নিরূঢা লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবৎ
ক্রিযন্তে সাম্প্রতং কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নৈব ত্বশক্তিতঃ।" (কাব্যপ্রকাশ, ৭।৩)।

মন যে চল্‌তি অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে শব্দকে বুঝ্‌ছে, শব্দার্থেব অতিবিক্ত বস্তুকে যে সে কল্পনা ক'বে নিচ্ছে, সে কথা মনেব মনেই হয না; কাবণ সে জন্য মনেব কোনও পৃথক্ যত্ন নেই। কিন্তু এই অভিনবত্বেব বিস্ময়েব আঘাতে মগ্ন-চৈতন্যে যে গতিব সঞ্চাব হয তাব মৃদু দোলায় মন খুসিতে ভ'বে ওঠে।

The blessed damozel leaned out
  From the gold bar of Heaven,
Her eyes were deeper than the depth
  Of waters stilled at even, ১৯)

'সাযাহ্নেব শান্ত জলেব গভীবতাব চেয়ে গভীবতব তাব চোখেব দৃষ্টি'। শান্ত জলমাত্রেব দৈর্ঘ্য ও প্রস্থেব সঙ্গে যে গভীবতা থাক্‌বেই, 'depth' শব্দের অবশ্য তা লক্ষ্য নয; গভীব শান্ত জলেব অতলস্পর্শ গভীবতাকেই পাঠকেব মনে আনা ওব উদ্দেশ্য। কিন্তু যে পদগুলি প্রযোগ হযেছে তাতে সে অর্থ বিনা আযাসে পাঠকেব মনে ফুটে ওঠে না। 'Deeper' কথাব

(১৮) "যত্র ত্বন্বযবোধাৎ প্রাগ্‌বাধাদিজ্ঞানেন লক্ষণযার্থান্তবোপস্থিতিস্তত্রাপ্যর্থব্যক্তিঃ সম্ভবত্যেব, শক্তেব লক্ষণযাপ্যুপস্থাপ্যার্থস্যান্বযবোধ-বিষযতাযামবৈলক্ষণ্যাৎ। অন্বযবোধানন্তবমনুপপত্ত্যুদযেন কল্পনীয়ার্থস্যৈব নেযত্বাৎ"।

(কাব্যাদর্শ, ১।৭৪। ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশেব টীকা।

(১৯) D. G Rossetti,—'The Blessed Damozel'

মধ্যে সে ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু সে দুর্ব্বল ইঙ্গিত। মনকে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভেবে নিতে হয় যে এ 'depth' শুধু তিন dimension-এর এক dimension নয়।

> It was the rampart of God's House
> That she was standing on,
> By God built over the sheer depth
> The which is Space begun, (২০)

এ শ্লোকের 'depth' যে তৃতীয় 'dimension' নয় মনকে তা আয়াস স্বীকার ক'রে ভেবে নিতে হয় না। অর্থের সে আবিলতা থেকে এ 'depth' সম্পূর্ণ মুক্ত। যে প্রচণ্ড দূরত্ব কবির লক্ষ্য,—

> So high, that looking downward thence
> She scarce could see the sun —

তা শব্দগুলির প্রকাশ ও ইঙ্গিতের শক্তিতে, শব্দার্থবোধের সঙ্গে "একেনৈব প্রযত্নেন" পাঠকের মন গ্রহণ করে।

> O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being,
> Thou, from whose unseen presence the leaves dead
> Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
> Yellow, and black, and pale, and hectic red,
> Pestilence-stricken multitudes

হেমন্তের ঝরা পাতার রূপ চার লাইনে দুবার বদল হয়েছে। সে পাতা মরা পাতা, তারা হচ্ছে পাতার ভূত, তারা রোগে বিকৃত-বর্ণ—মারীগ্রস্ত পলায়মান জনসঙ্ঘের মত। কিন্তু মনে কোনও ধাক্কা লাগে না। ওর প্রতি রূপকেই মন স্বীকার ক'রে নেয়, হাঁ এ ঠিক। এ কবিতার অর্থ বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে গেছে পদে পদে। ঝড়ের শক্তির কথা প্রকাশ ক'রে কিছুই বলা হয় নি; কিন্তু presence ও driven দুটি কথার ইঙ্গিতে তার ব্যাপকতা ও বেগ পাঠকের মনে এঁকে যায়। লাল রং-এর hectic বিশেষণ তার ক্ষয়-রোগের ছায়া আর সব রং-এর উপর ফেলেছে। এ রোগ মহামারী, নইলে এত পাতা এক সঙ্গে মরে! এ সমস্ত কথাই শব্দার্থের অতিরিক্ত, কিন্তু তাদের কল্পনা ক'রে আন্‌তে হয় না। শব্দের অর্থ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তারা নিজেরাই ভীড় ক'রে মনের মধ্যে আসে।

(৭)

নিশ্চয়ই সকল লোকের মনে আসে না। কেবল অভীজ্ঞ ও রসজ্ঞ লোকের মনেই আসে। ইঙ্গিতের ইঙ্গিত সকল পাঠকের মন ইঙ্গিতমাত্র

(২০) D G Rossetti,—'The Blessed Damozel'

ধর্‌তে পারে না। এবং সে শ্রেণীর পাঠকের কাছে 'সরলতা' থেকে বিভিন্ন যে 'প্রসাদ' তা ব্যর্থ।

সেই জন্য ভিন্ন কালের বা ভিন্ন দেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ মর্ম্ম, ও পূরো রস আদায় করা একরকম অসম্ভব। শব্দের ধ্বনি ও তার অর্থের বিচিত্র-ইঙ্গিত-বাহী পাঠকের মনের যে সব সূক্ষ্ম নাড়ীর উপর লেখকের ভরসা,—দেশে দেশে ও কালে কালে তাদের রকম বদল হয়। বিদগ্ধ সমাজের মনের চেহারা দুই দেশ ও দুই কালে এক নয়; যেমন তাদের মিল, তেমনি তাদের গরমিল। সেইজন্য যে কথার ব্যঞ্জনা এক সমাজের মনে জোয়ারের জলের মত প্রবেশ করে, অন্য সমাজের মনের কাছে সেটা হয় ত allusion-এর প্রত্ন-তত্ত্ব।

> Of man's first disobedience, and the fruit
> Of that forbidden tree, whose mortal taste
> Brought death into the world, and all our woe,

অ-খৃষ্টান পাঠকও এ গাঢ়বন্ধ কবিতার গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করে। কিন্তু আ-জন্ম খৃষ্টান পাঠকের মনের যে সব তারে এ কবিতা ঘা দেয়, অ-খৃষ্টান পাঠক-সমাজের মন নিশ্চয়ই এতে তেমন ক'রে বেজে ওঠে না।

> হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
> সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
> ছদ্ম-রণ-বেশে।
> বারে বারে পঞ্চশরে
> অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
> দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
>
> বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
> আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
> মৃত্তিকার কোলে।

মিল্টনের স্বদেশবাসী রসজ্ঞ পাঠক, Old Shiva-র mythology-টা ভাল ক'রে জেনে নিলেও, এ কবিতায় কখনই সে রস পাবে না, যা আমরা পাই।

রচনার অন্য সব গুণের মত, এবং সম্ভব একটু বেশী মাত্রায়, 'প্রসাদগুণ' পাঠকের মনের অপেক্ষা রাখে। এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে যা 'প্রসাদ', অন্য শ্রেণীর কাছে তা হেঁয়ালী হওয়া অসম্ভব নয়। উইলিয়াম জেম্‌সের যে লেখাটি তুলেছি, যে সব পাঠকের ঐ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে একেবারেই পরিচয় নেই, তাঁদের কাছে ওর প্রসাদগুণের ঔজ্জ্বল্য ধরা না পড়াই সম্ভব। উপযোগী পাঠক-সমাজ কল্পনা করলে,

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা,—৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ যাকে বলেছেন, "অধিকপদত্ব—কষ্টত্বাদি-দোষাসম্বন্ধেন ঝটিত্যর্থো-পস্থাপকম্," তার চমৎকার উদাহরণ। তাঁর বাক্যের মধ্যে কখনও নিরর্থক পদ থাকে না, তার অর্থ কখনও কষ্ট-কল্পনা ক'রে আন্‌তে হয় না। আর মনের মধ্যে তার গতি বিদ্যুতের মত, যেমন তার শক্তি তেমনি তার আলো।

"Dr. Spooner নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্বের কর্তা ব্যক্তি এই ভূমধ্য রাজধানী খনন ক'রে আবিষ্কার করেছেন যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে দেখা যায় যে, তার নীচে ভারতবর্ষ নেই,—আছে শুধু পারস্য। Palimpsest নামক একপ্রকার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, যার উপরে এক ভাষায় লেখা থাকে, আর নীচে আর এক ভাষায়। বলা বাহুল্য, উপরে যা লেখা থাকে, তা জাল,—আর নীচে যা লেখা থাকে, তাই আসল। Dr. Spooner-এর দিব্য-দৃষ্টিতে এতকাল পরে ধরা পড়েছে যে, আমরা যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলি, সে হচ্ছে একটি বিরাট Palimpsest,—তার উপরে পালি কিংবা সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে, তা জাল, আর তার নীচে যা লেখা আছে, তাই আসল। সে লেখা অবশ্য ফার্সি—কেননা, আমরা কেউ তা পড়্‌তে পারি নে। Dr. Spooner-এর কথা বৈজ্ঞানিকেরা মেনে না নিন্, মান্য কর্‌তে বাধ্য,—কেননা, সেকালের কাব্যের যাদুঘর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একালের যাদুঘরের কাব্যকে তা করা চলে না।" (২১)।

প্রমথ বাবু দুঃখ করেছেন যে, 'অনেকে তাঁর সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর তাঁর রসিকতাকে সত্য কথা ব'লে ভুল করে' (২২)। এর অবশ্য কারণ যে মুখে রাধাকৃষ্ণ বল্‌লেও, মনে মনে আমরা অনেকেই অদ্বৈতবাদী। আমরা গোপাল ভাঁড়কে জানি, মোহমুদ্গরও বুঝি; কিন্তু 'বীরবল' আমাদের ধাঁধা লাগায়। আর যার গতি আছে তাই যে হাল্‌কা তাতে আর সন্দেহ কি; কারণ যা 'গুরু' এবং 'আবরণক'—প্রাচীনেরা যাকে বলেছেন 'তমঃ'—তাই যে গভীর, সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই কোনও সংশয় নেই।

(৮)

আলঙ্কারিকেরা বলেন যে 'প্রসাদ' বা 'অর্থব্যক্তির' শেষ ফল হচ্ছে যে, কথার মুখে বিষয়-বস্তুর স্বরূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে, "বস্তুস্বভাব-স্ফুটত্বমর্থব্যক্তিঃ" (বামন)। এবং মনে হয় যেন বস্তুই যাচ্ছে আগে আগে, আর বাক্য যাচ্ছে তার পেছনে।

'পশ্চাদিব গতির্বাচঃ পুরস্তাদিব বস্তুনঃ।
যত্রার্থব্যক্তি হেতুত্বাৎ সোঽর্থব্যক্তিঃ স্মৃতো গুণঃ॥' (বামন, ৩।১)।

(২১) বীরবলের হালখাতা—'প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস'।
(২২) নানা চর্চ্চা—'বীরবল'।

সত্য কথা এই যে, বস্তুও আগে চলে না, বাক্যও পিছিয়ে থাকে না ; ওরা চলে এক-সঙ্গে। কারণ 'প্রসাদগুণের' যেখানে চরম পরিণতি সেখানে বাক্য ও বস্তুর ভেদ লোপ হয়। কিন্তু সে পরিণতি কেবল মহাকবিদের কাব্যেই দেখা যায়। 'যোগাযোগে' কবি 'কুমুদিনীকে' যখন পাঠকদের সাম্‌নে প্রথম আন্‌লেন,—

"দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড ; চোখ বড় না হোক্ একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রং শাঁখের মতো চিকণ গৌর ; নিটোল দুখানি হাত, সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হ'য়ে গ্রহণ কর্‌তে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব।"

শব্দে-গড়া এই মূর্ত্তি কখন্ যে কাব্য থেকে পাঠকের মনে এসে অক্ষয় হ'য়ে বসে, মন তা জানার সময়-ই পায় না।

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
ঝিমি ঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শযান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

ভরা বর্ষার ধ্বনি ও সুরের মধ্যে এই বিশ্রব্ধ সুখ-সুপ্তার ছবি কি সহজেই পাঠকের মনে এসে উত্তীর্ণ হয়।

"তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরা কুলিতের সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥"

এবং আমাদের মনের পাদ-পীঠে এসে অচল হ'য়ে দাঁড়ালেন,—চিত্তে পাহাড়ের বাঁধে বাঁধা স্রোতস্বিনীর আকুলতা, বেপথুমান দেহযষ্টিতে উন্মুখ অচলতা।

" We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep "

বৈরাগ্য-শতকে নয়, মাত্র দু-লাইনে—কবি জীবনের যে রূপ দেখাতে চেয়েছেন তা ফুটে উঠেছে ;—স্বপ্নের মত বস্তু-হীন মায়া, স্বপ্নের মতই বিচিত্র ; মৃত্যুর স্বপ্নহীন সুষুপ্তির রহস্য দিয়ে ঘেরা ;—যার উপর মহাকবির বিরাগ বাসনার অতীত করুণ স্নেহ-দৃষ্টি এসে পড়েছে।

রচনার সমস্ত গুণের চরম অভিব্যক্তি মহাকবিদের মহাকাব্যে। কিন্তু সেখানে কোনও গুণের আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। সব গুণ ও সব

কৌশল কবি-কর্ম্মের রসায়নে মিলে এক হ'য়ে এ কাব্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্লেষণে যাদের পাওয়া যায় কাব্য তার সমষ্টি নয়। উইলিয়াম্ জেম্‌সের কথায়, "Out of no amount of discreteness can you manufacture the concrete"। কারণ বিশ্লেষণে তফাৎ হ'য়ে তাদের যে রূপ তা তাদের স্বরূপ নয়। কাব্যের ঐক্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যকে মিশিয়ে দিয়েই প্রত্যেক গুণ তার স্বরূপকে লাভ করে। গুণের চরম পরিণতি,—কাব্যের সমগ্রতার মধ্যে তার মুক্তি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য

ফরাসী বিজ্ঞান জার্ম্মান বিজ্ঞান আমেরিকান বিজ্ঞান এমন কথা কেউ কোনোদিন বলে না। ক্রিশ্চান সায়েন্স (Christian Science) বলে বটে, কিন্তু যাকে বলে তা বিজ্ঞানই নয়।

ফরাসী সঙ্গীত জার্ম্মান সঙ্গীত ইতালীয় সঙ্গীত কদাচ শ্রুতিগোচর হয় না, যা হয় তা সঙ্গীত। তবে তার মধ্যে ধারাভেদ আছে। কোনো ধারা হার্ম্মনি-প্রধান, কোনো ধারা মেলডি প্রধান। উপযুক্ত পরিচয়ের অভাবে ভৌগোলিক আখ্যা দিয়ে পর ক'রে দিবার প্রবৃত্তি থেকে ভারতীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত প্রভৃতি নামকরণ। বহুবিধ সঙ্গীতের স্বাদগ্রহণ যে করেছে সে জানে ধারাগত প্রভেদ প্রকৃতিগত প্রভেদ নয়। তা যদি না হতো তবে শ্রবণকালে তার চিত্ত সমানভাবে আকৃষ্ট ও সমান তালে আন্দোলিত হতো না।

চিত্রণে ভাস্কর্য্যে স্থাপত্যে ধারাবৈচিত্র্য কখনো কখনো ভৌগোলিক আখ্যা বহন করেছে, কখনো কখনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক অভিধা। সেকালে ছিল Dutch School of Painting, Gothic Architecture, একালে Cubism, Futurism। এক্ষেত্রে ত প্রকৃতিভেদ নেই, তবে পরিচয়ের অভাবে ভারতীয় ইউরোপীয় প্রভৃতি অতিরঞ্জিত উপাধি সুন্দরকে পর ক'রে দেয়।

কেবল সাহিত্যের বেলায় ভৌগোলিক স্বাদেশিকতার সদর্প আস্ফালন, মানসিক প্রাদেশিকতার নির্লজ্জ গৌরব। ইংরেজী সাহিত্য আইরিশ সাহিত্য আমেরিকান সাহিত্য—যত উপভাষা ও উপনিবেশ ততগুলি সাহিত্যের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনা।

এমন যদি হতো যে ফরাসী ও জার্ম্মান সাহিত্যের মধ্যে মূলত কোনো অমিল আছে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন হার্ম্মনি ও মেলডি-ঘটিত অমিল, তবে ভৌগোলিক আখ্যা সঙ্গত না হ'লেও সহ্য হতো। প্রকৃতিভেদ যে নেই তা ফরাসী ও জার্ম্মান সংস্কৃতির মুখপাত্রদের বাণীর তুলনা কর্‌লে জানি। প্রভেদ শুধু ভাষার। গ্যেটেও সাহিত্য সৃষ্টি করেন, ভল্‌টেয়ারও। ইনি ফরাসী ভাষার সাহায্যে, উনি জার্ম্মান ভাষার সাহায্যে। শুধু এই এক কারণে একজনের সৃষ্টি ফরাসী সাহিত্য এবং অপরের সৃষ্টি জার্ম্মান সাহিত্য ব'লে পরিগণিত।

কবি নিজের পক্ষে স্বাভাবিক ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করেন। পাঠকের পক্ষে যে ভাষা স্বাভাবিক সে ভাষা হয়তো অন্য। পাঠক পরিশ্রম ক'রে

কবির ভাষা আয়ত্ত করবে, নতুবা ভাষান্তরিত কাব্য পাঠ ক'রে অন্তত মর্ম্ম-গ্রহণ করবে। কিন্তু যে কাব্য সকলের তাকে ফরাসী জার্ম্মান ইংরেজী ইত্যাদি গণ্ডীতে পূরলে ফল হয় এই যে তা দলাদলির উপলক্ষ হ'য়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য কোথায় মানুষকে সাহিত্যের ভাব দিয়ে মিলনের আনুকূল্য করবে, না ভাষার আকস্মিকতাকে শিরোধার্য্য ক'রে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে দৃঢ়তর সীমা-সমন্বিত করছে। সাহিত্যের বাহন ভাষা, কিন্তু ভাষা অনুসারে সাহিত্যের নাম দেওয়া হ'লে গোরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীর মতো অদ্ভুত শোনায়।

ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নিবিড় হ'লেও ভাষা ও সাহিত্য এক দরের নয়। ভাষার সম্মান স্বদেশে, সাহিত্যের সম্মান সব দেশে। যেমন রাজার সম্মান, গুণীর সম্মান। রবীন্দ্রনাথের অনেক পাঠক জানেন না যে তিনি বাংলা ভাষার কবি। তাঁরা তাঁকে ভাষান্তর-সূত্রে চিনতে পেরে অভ্যর্থনা করেছেন। এই চিনতে পারা কাজটি দুরূহ। যাঁদের চেনবার ক্ষমতা আছে, যাঁরা সাহিত্যে রস পান, তাঁরা এক বিশেষ জাতের লোক, হোক না তাঁদের দেশ ও ভাষা ভিন্ন। তাঁরা আয়াস স্বীকার ক'রে পরের ভাষা আয়ত্ত ক'রে আপনার কবিকে আবিষ্কার করেন, আবার আপনার কবির বাণী নিজের ভাষায় তর্জ্জমা ক'রে নিয়ে আবিষ্কারকে বহুজনসাধ্য করেন।

অন্য জাতের লোক সাহিত্যের মর্য্যাদা বোঝে না। এরা বাঙ্গালী হ'য়েও চণ্ডীদাসের, ইংরেজ হ'য়েও চসারের পরিচয় গ্রহণ করে না; করলেও মুখে করে, মনে করে না। সাহিত্য এদের আপন নয়, অথচ ভাষা আপন। সাহিত্যকে ভাষার অধীন করলে এই জাতের লোক তার শাসক হয়, ভারতবর্ষের শাসক যেমন টমি য়্যাটকিন্স্।

রচনাকে যেমন নির্ব্যক্তিক করবার উপায় নেই—রচয়িতার ব্যক্তিত্ব তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরোবেই—তেমনি নিষ্পারিপার্শ্বিক করা সম্ভব নয়। স্থান কাল পাত্রের শাসন তাকে মেনে নিতে হবেই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলার নদী, নদীচর, নদীকূলের শ্যামল প্রাণনৃত্য, আকাশ, মেঘ, ঋতু-পরম্পরা, বাঙ্গালীর স্বল্পোপকরণ সংকীর্ণ পরিধি, হৃদয়পরিপূর্ণ জীবন-যাত্রা, ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শ ও তার ঐতিহাসিক পরিব্যক্তি—এ সকলের ছায়াপাত ঘটেছে। না ঘটলে অস্বাভাবিক হতো, রচনা অক্ষমতার পরিচায়ক হতো। কিন্তু ঘটেছে ব'লে রচনাকে বঙ্গসাহিত্য নামে অভিহিত করতে পারিনে। ডব্লিউ এইচ্ হাড্‌সন দক্ষিণ আমেরিকার অপরূপা প্রকৃতির অপূর্ব্ব মসীচিত্র এঁকেছেন। ইংরেজী ভাষার উৎকৃষ্টতম গদ্য রচনার নমুনা তাঁর গ্রন্থে। তবু তাকে ইংরেজী সাহিত্য বলতে কুণ্ঠা বোধ

কবি। খ্রীষ্টানী ভগবান মুসলমানী ভগবান হিন্দু ভগবান যেমন শ্রুতিকটু এও তেমনি উক্তিকটু ; তথৈব অসত্য।

বৈজ্ঞানিকও নিজ ভাষায় লেখেন। পাবিপার্শ্বিকেব প্রভাব যে তাঁব বচনাব উপব পড়ে না তাই বা কেমন ক'বে বলি ? সম্পূর্ণ objectivity তাঁব পক্ষে কেন, কাকব পক্ষে সম্ভব নয়। দার্শনিকও নিজ ভাষায় চিন্তা কবেন, নিজ ভাষায় লেখেন। বৈজ্ঞানিক যদি বা নির্ব্বর্ণ হবাব সাধনায় কথঞ্চিৎ সিদ্ধি লাভ কবেন দার্শনিক নির্ব্বর্ণ হতে গিয়ে যোগী হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নির্ব্বাক, ইঙ্গিতে যা ব্যক্ত কবেন তাব বিচাব চলে না।

বৈজ্ঞানিককে আমবা বড জোর বলি জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক বাশিযান বৈজ্ঞানিক, ছেলেব নামেব সঙ্গে যেমন তাব বংশপদবী জুড়ে দিই। এই লেজুড কোনো বৈজ্ঞানিকেব কীর্ত্তিব অঙ্গ নয, তাই Rœntgen Rays বা Raman Effect আলোচনা-কালে কীর্ত্তিমানেব নাম উঠ্‌লেও তাঁব দেশ বা জাতি অকীর্ত্তিত থেকে যায। সত্যিকাবেব সাহিত্যিক আলোচনাও এই প্রকাব। অতি ব্যাপক কালে ও অতি বৃহৎ দেশে সাহিত্যস্রষ্টাব বাস ও বিহাব। অনায়াসে আমবা কালিদাসেব পাশে শেক্সপীয়াবকে বসাই, মিবান্দাব সঙ্গে শকুন্তলাব তুলনা কবি। ববীন্দ্রনাথেব প্রাচীন সাহিত্য-আলোচনা সংস্কৃত ভাষাব স্বকীয় সৌন্দর্য্যেব দ্বাবা লক্ষভ্রষ্ট হযনি।

অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞান বোঝে না, আইনষ্টাইনেব বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ জার্ম্মান ভাষায় লিখিত হ'লেও অধিকাংশ জার্ম্মানেব তাতে প্রবেশ নেই। তাই বিজ্ঞানে স্বাদেশিকতাব নর্ত্তন তাবাও দাবী কবে না, বৈজ্ঞানিকবাও স্বীকার কবেন না। সাহিত্য যে অধিকাংশ মানুষ বোঝে তাব প্রমাণ অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচনাতে পাওয়া যায় না। তাবা বোঝে ভাষা ও সমাজ, জাতি ও দেশ, এবং সর্ব্বোপবি সংস্কাব। বিপদ হয়েছে এই যে সাহিত্যিককে লিখ্‌তে হয় এই সব মানুষেব অর্থানুকূল্যেব জন্য। সাহিত্যিক যদি বৈজ্ঞানিকেব মত বিশ্ববিদ্যালয়েব একটি চেয়াব লাভ ক'বে নিকদ্বেগ হতো কিম্বা সার্ব্বদেশিক সাহিত্যিকদেব যদি কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা গিল্ড্ থাক্‌ত তবে তাব বচনা বাংলা বা ইংবেজী সাহিত্য না হ'যে শুদ্ধমাত্র সাহিত্য হতো। বিজ্ঞানেব বিচার কবেন বিশাবদ, সাহিত্যেব বিচাব কবে যে কেউ দু টাকা দাম দিযে একখানা নভেল কিনেছে। বচযিতা আপত্তি কব্‌তেও পাবে না, বাজাবে নেমে সে moral right খুইযেছে।

সাহিত্য বিজ্ঞানেব থেকে বয়সে বড ব'লে, কিম্বা অন্য কোনো কারণে, ভেদবিপুব প্রাবল্য সাহিত্যেব ঘবেই বেশী। বৈজ্ঞানিক নিজেব ভাষায

লিখলেও পবেব ভাষা সাগ্রহে আযত্ত কবেন, পরের বচনা অসংকোচে ভাষান্তবিত কবেন। বক্তৃতা বা শিক্ষাচ্ছলে দেশে দেশে ঘুবে পবস্পাবেব সংবাদ নেন। বৈজ্ঞানিক মহলে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা প্রাত্যহিক ব্যাপাব। সাহিত্যবাজ্যে কোথায় কি ঘট্‌ছে সাহিত্যবসিকবা তাব খবব বাখ্‌তে পাবেন, কিন্তু সাহিত্যিকবা সে সম্বন্ধে সাধাবণত উদাসীন। তাদেব না আছে সহযোগিতা না আছে প্রতিযোগিতা। অবশ্য প্রত্যেক দেশেই চিবকাল তরুণ সাহিত্যিকদেব ছোট ছোট মণ্ডলী ছিল, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অখ্যাত শিক্ষানবীশেব মিলনমণ্ডলী। প্যাবিসেব মতো সহবে কিছুকাল থেকে মতবাদেব সাম্যকে কেন্দ্র ক'বে পবিণত বযসেব প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদেব বিভিন্ন চক্র গঠিত হযেছে। এ সকল চক্র কতক পবিমাণে আন্তর্জ্জাতিকও বটে। প্যাবিস-প্রবাসীবা যে দেশেব সাহিত্যিক হোক ফবাসীদেব এই সকল চক্রে যাতাযাত কবে ও নিজেদেব দেশে ফিবে অনুরূপ চক্র গঠন কবে। প্যাবিসে ইংবেজ ও আমেবিকান সাহিত্যিকদেব উপনিবেশ আছে, চক্রও আছে। কিন্তু চক্রেব দ্বাবা সহযোগিতা যেটুকু হয সেটুকু গণ্ডীবদ্ধ ; প্রতি-যোগিতা যদিও ভযঙ্কব ভাবে হয় তা প্রতিবেশী চক্রেব সঙ্গে, সুতবাং সেটুকুও গণ্ডীবদ্ধ। উদারমনা সাহিত্যিক চক্রেব চক্রান্ত পছন্দ কবে না। দ্বিতীযত, সাহিত্যিক স্বভাবত free lance। তার সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দলেব হুকুম মানে না। কাজেই এক চক্রেব লোক অপব চক্রে যোগ দেয়। বড়চক্রেব জনকযেক ছোট চক্র গড়ে। সব হয়, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, হবাব অনুকূল সময় পায় না। তাই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যসম্পদ তাব বিজ্ঞান-সম্পদেব তুলনায় নিষ্প্রভ।

বৈজ্ঞানিকেব ধ্যানশীলতা, ধ্যানেব সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন অব্যাহত অবকাশ, দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী, স্বভাষী ও পবভাষী সমধর্ম্মাব সহিত দৃঢনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সদাজাগ্রত প্রতিযোগিতা, নিজেব মৌলিকতা পাছে পবেব প্রভাবে বিনষ্ট হয এই আতঙ্ক পবিহাব ক'বে পবেব বচনাব সহিত মূল ভাষায় বা ভাষান্তবে পবিচিত হওযা, নিবন্তর up-to-date থাকা সাহিত্যিকেব পক্ষে সম্ভব হোক। নতুবা বিজ্ঞানে দর্শনে বাণিজ্যে যানে সংবাদবিনিময়ে, এমন কি বাজনীতিতে শিক্ষানীতিতে ভোজ্যে ও পরিচ্ছদে পৃথিবীব্যাপী একতাব দিনে সাহিত্যেব গ্রাম্যতা ও গোঁড়ামি হাস্যকব হবে।

বিজ্ঞানেব সঙ্গে সাহিত্যেব তুলনা করা আমাব উদ্দেশ্য নয়। আমি বিজ্ঞানেব দৃষ্টান্ত যথাসম্ভব অনুসবণ কব্‌তে বলি। এব অসুবিধা অনেক। প্রথমত বিজ্ঞান-বিষযে যাঁবা লেখেন তাঁবা ইংবেজী ফবাসী জার্ম্মান ইত্যাদি গোটা কয়েক ভাষাতেই লেখেন ; বিজ্ঞানেব পাঠকেব পক্ষে ঐ কয়টা শেখা শক্ত নয়। সাহিত্যেব জন্য নবওয়েজিযান থেকে সুরু ক'বে

জাপানী পর্য্যন্ত অসংখ্য ভাষা আয়ত্ত কবা যে-কোনো পাঠকেব পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিতে তা পাবে, কিন্তু সাহিত্যেব জন্য নয, পাণ্ডিত্যেব জন্য। বৈজ্ঞানিকেব মতো সাহিত্যিক যে গোটা কয়েক ভাষাতেই বক্তব্য পেশ কব্‌বে তাব সম্ভাবনা নেই। সাহিত্যিকেব পক্ষে যেটা পরভাষা সেটা পবধর্ম্মেব মত ভয়াবহ। মাতৃভাষাও কারুব কারুব পক্ষে পরভাষা হতে পাবে, যথা মনোমোহন ঘোষের পক্ষে। দেশান্তবী হ'য়ে কেউ ভাষা পবিবর্ত্তন কবেছেন দেখা যায, যেমন কন্‌রাড্‌। কিন্তু পবকীয় ভাষাব কসবৎ দেখাতে যিনি আসবে নেমেছেন তিনি বুদ্ধিমান হ'লে পৃষ্ঠভঙ্গ দিযেছেন, নির্ব্বোধ হ'লে মবেছেন। বুদ্ধিমানেব উদাহবণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নির্ব্বোধেব উদাহবণ আমাদেব বহু অধ্যাপক ও সাংবাদিক।

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক পবিভাষা অধিকাংশ ভাষাব এজমালি সম্পত্তি। বৈজ্ঞানিক বচনাকে ভাষান্তবিত কবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদেব অদলবদল। যে-সব পাঠক পবিভাষাব সঙ্গে পবিচিত তাবা বাক্য-যোজনাব ভুলে তত্ত্ব বা তথ্য ভুল বোঝে না। সাহিত্যে এক-একটা শব্দেব কতবকম প্রয়োগ, দুটো শব্দেব pun বা অনুপ্রাস; বাক্যেব মধ্যে শব্দসমষ্টিব এমন সজীব ও প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ যে অনুবাদকেব পক্ষে ধাবণা কবাই কঠিন, অনুকৃতি কবা তো পবেব কথা। সাধাবণত দু বকম অনুবাদক দেখা যায। এক, মাছিমাবা অনুবাদক। এঁরা দ্বিভাষিক অভিধান আলোড়ন ক'বে শব্দেব স্থলে শব্দ বসিযে যান। খ্রীষ্টীয় পুঁথিব মিশনাবীকৃত বঙ্গানুবাদ যে ভাগ্যবানেব হাতে পড়েছে তিনি এরূপ অনুবাদ নিশ্চয উপভোগ কবেছেন। অন্য শ্রেণীব অনুবাদক ভাবগ্রাহী। মূল লেখকেব ভাবকে যেমন ভাবে প্রকাশ কব্‌লে সুষ্ঠু হয় ইনি তাই কব্‌তে গিয়ে অনেক সময এককে আব কবেন। ববীন্দ্র-নাথ সেদিন শেলীকৃত "One word is too often profaned"-এব তর্জ্জমাব সম্মার্জ্জনা কব্‌তে ব'সে তাই কবেছেন।

আমাব মনে হয় পৃথিবীব যে কয়টি ভাষার সাহিত্যসম্পদ প্রভূত ও পবিবৃদ্ধিশীল সেই কযটি ভাষায প্রবেশ লাভ করা আমাদেব সকলেব কর্ত্তব্য। অন্যান্য ভাষায অধিকাব ব্যক্তিবিশেষেব রুচি ও ক্ষমতা সাপেক্ষ। ভাষাশিক্ষা ব্যাপক হ'লে অনুবাদেব প্রযোজন সংকীর্ণ হ'যে আসে। শেলীব মূলবচনা পড়্‌তে পেলে অনুরূপ বা প্রতিরূপ পড়্‌তে চায় কে? "মেঘদূত" বা "গীতগোবিন্দে"র অনুবাদ কব্‌তে যাওয়া আমাদেব পক্ষে অকাবণ। আমাদেব মধ্যে যাঁবা সাহিত্য পড়েন ও বোঝেন তাঁবা ইংবেজীও জানেন সংস্কৃতও জানেন। অবশ্য বিযেব উপহাব হিসাবে ওসব অনুবাদের বাজারদব

আছে। ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের বাহুল্য থাকায় ইংরেজরা বিদেশী ভাষা শিখ্‌তে গা করে না। তাদের মানসিক দ্বীপ্যতার এও একটা হেতু। কাজেই আমি বাংলা ভাষায় নির্ব্বিচার অনুবাদের পক্ষপাতী নই। ভিক্তর হিউগোর ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ আমাদের এক খ্যাতনামা মাসিকে প্রকাশিত হবার সময় অনুবাদক সম্পাদক ও কম্পোজিটার ছাড়া কেউ কি ও জিনিষ পড়েছে? শুধু কাগজ কালি হরফ ও ডাকটিকিট অপচিত হলো। অনুবাদ কর্‌বার মত বই আমাদের পক্ষে অল্পই আছে। অনুবাদ কর্‌তে চাইলেও তার যোগ্যতা থাকা সব আগে চাই। অনুবাদককে মূল লেখকের সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় হতে হবে। দুটো ভাষার উপর দখল তাঁর পাকা না হ'লে চল্‌বে না। অনুবাদ পদে পদে বিষয়াশ্রয়ী হবে ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত যথাযথ হবে। অথচ কাটা কাপড় জোড়া দিয়ে শাড়ী তৈরি করার মত হবে না, আগাগোড়া একটি গোটা জিনিষ হবে, যেন একখানা পাথর কুঁদে একটি মূর্ত্তি। যাঁরা "Spectator" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকৃত "লিপিকা"র ভবানী ভট্টাচার্য্যকৃত অনুবাদ পড়েছেন তাঁরা জানেন সত্যকার অনুবাদ কেমন হওয়া উচিত।

তা ব'লে অনুবাদের প্রয়োজন যদি থাকে এবং সে প্রয়োজন জরুরি হয়, তবে উত্তম অনুবাদকের অভাবে অধম অনুবাদককে আমরা উপেক্ষা কর্‌ব না। সাহিত্যের অনুবাদ সাহিত্য হয়নি দেখে দুঃখ কর্‌ব, এই যা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সাহিত্যের সম্পদ যে ভাষার ভাণ্ডারে রক্ষিত হোক না কেন সে সম্পদ আমাদের সকলের। ক্যানেডার কোম্পানীতে আমাদের টাকা খাটছে, ক্যানেডিয়ান ইংরেজী ভাষায় আমাদের কোনো প্রিয় লেখক যদি কিছু লিখে রেখে থাকেন তাকে এক ভাণ্ডার থেকে অন্য ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করা সব সময় সমীচীন নাও হতে পারে।

শ্রীলীলাময় রায়

সায়ামের মন্দির

মন্দিবগুলোই সাযামেব গৌবব। স্বৈবতন্ত্র বাজ্য-কটাব মধ্যে একা সায়ামই বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মাণদেব পুনরুত্থান এবং তাব অব্যবহিত পবেই মুসলমানদেব হিংসাবৃত্তি, এই দুটো কাবণে শাক্যমুনিব ধর্ম্মসূত্র ভাবতে আজ নগণ্য ; তাতে চীনেবও আস্থা নেই, আব জাপানে লোকাচাবেব সংমিশ্রণে তাকে চেনা শক্ত। ভাবতেব দক্ষিণ সীমান্ত সিংহলে, এবং ব্রহ্মদেশে ও কম্বোজে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনো টি'কে আছে বটে, কিন্তু ইংবেজ আব ফবাসী বিজেতাদেব নজববন্দিতে থেকে, তাব সহজ সমাবোহটুকু বিলুপ্ত। শুধু সায়ামে মন্দিব স্থাপন ও পালনেব ঘটাতেই তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সত্য বলতে গেলে এই দেউলগুলো খুব প্রাচীন নয়। বেঙ্গুনেব শ্বে-ডাগন অথবা অন্যান্য পাগোডাব সৌন্দর্য্যে পর্য্যটকেবা যখন মুগ্ধ হ'যে পড়ে, তখন হযতো সেগুলোব কাঁচা বয়সেব দিকে তাদেব লক্ষ্য থাকেনা, কিন্তু আসলে বালি-ধবানো ইটেব তৈবি এই ভঙ্গুব মন্দিবগুলো বৌদ্রবৃষ্টিব আক্রমণে নিযতই ভেঙে পড়ে, এবং পুণ্যলোভী ভক্তেব কল্যাণে প্রত্যহই পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয। শুধু খ্মেব-স্থাপত্য এই নিযমেব বাইবে, তাব উপকবণ স্থাযী প্রস্তব।

মন্দিব, পাগোডা ও ভাট সমস্তই এক প্রতিমাণে নির্ম্মিত। আসলে এগুলি দেবালয নয, কেননা বুদ্ধ দেবতা ছিলেননা। অন্তত প্রাবম্ভে অধ্যয়নবত পুবোহিত ও পবিব্রাজকদেবকে বর্ষাব প্রকোপ থেকে বাঁচাবাব জন্যেই এই বাড়িগুলো প্রস্তুত হয়েছিলো। তাব পবে হলো সিদ্ধার্থের মূর্ত্তিস্থাপনা, যাতে ক'বে তাঁব নির্দ্দিষ্ট পন্থা অহবহ ভক্তেব দৃষ্টিগোচবে থাকে।

বস্তুত পাগোডা একখানি ছাউনী-ঢাকা, চূণকাম-কবা, চৌকো সাদাসিদে কুটবিমাত্র। দবজা জানলা সেগুন-কাঠেব, তার উপবে গালাব কালো পালিশ, তাবও উপবে এলোমেলো ছবি, লতাপাতাব পুষ্পিত বেখা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব প্রতিমূর্ত্তি অস্পষ্ট, অস্তব্যস্ত ভাবে ছড়ানো। সাযামেব মন্দিবগুলি চয়নিকাব মতো—বিভিন্ন দেশেব বিভিন্ন প্রভাব ওই মন্দিবগুলোব মধ্যে একত্রিত। ওই ডিম্বাকৃতি গম্বুজগুলো খ্মেবদেব দান ; আবাব অতিজীবিত হিন্দুধর্ম্মকে চিবস্থায়ী ক'বে বেখেছে ওই দেবদেবীব মেলা, ওই দ্বাবপাল হাতীব দল। চৈত্যগুলোব উৎপত্তি ভাবতে, অথচ ছাদগুলো এসেছে চীন থেকে। তবে এই সংমিশ্রণেব অনুগ্রহেই একটা স্বকীযতাব সৃষ্টি হয়েছে। এব ভিতবে সায়ামেব সমগ্র ইতিহাস এক পলকে প'ড়ে নেওযা যায়। দেখা যায দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তব দিক দিয়ে চীন থেকে

স্বাধীন থাই জাতি এসে, সায়াম আক্রমণ করে, তাদের তাড়নায় খ্মেরেরা পালায় কম্বোজে এবং মনেরা আশ্রয় নেয় ব্রহ্মদেশে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অযুথ্যা-নগরীর পত্তন করেছিলো এই বিজয়ীর দল।

ব্যাঙ্ককের যে-দৃশ্যটা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, স্মৃতির আহ্বানমাত্রেই যার সাড়া মিলে, সে হচ্ছে সেখানকার মন্দিরের ছাদ। এই ভাঁজ-করা চালগুলো পরস্পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে অদ্বিতীয়, অসাধারণ তাদের উর্ব্বরতা। একটা থেকে আরেকটা, তার থেকে আরো একটা, এমনি ক'রে বংশপরম্পরায়, স্তরে স্তরে উঠে ছাদগুলো একটা ছুঁচোলো চূড়োয় গিয়ে ঠেকে। এ-গুলির মুখ্য ভূষণ নাগ, বিস্তৃত-ফণা, উন্নত-পুচ্ছ নাগ, তাদের কাঞ্চনময় নির্ম্মোক স্ফটিকখচিত। প্রত্যেক ছাদই চীনে টালিতে অলঙ্কৃত, কোনোটা বা রৌদ্রে পক্ক শস্যের মতো উদ্দীপ্ত, কোনোটার ঘননীল ছায়ায় চতুর্দ্দিক বিষণ্ণ, কোনোটায় বেগুনীরঙের উপর সবুজ পাড়, আবার কোনোটা কেবল কালো। আশপাশের চৈত্যগুলো বোধহয় এই ছাদসমূহের দর্পহরণ করার উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত হয়েছিলো। সেগুলোর কোনো-কোনোটা দৈর্ঘ্যে ফুট চল্লিশেক, আকারে লম্বা ধরণের ঘণ্টার মতো; একটা বা শঙ্খাকৃতি, অন্যটা সাদা, কারুর আপাদমস্তক হয়তো সোনালি পাতে ঢাকা। অলিন্দায় অলিন্দায় রঙবেরঙের চীনেমাটির কারুকার্য্য ফুলের মালার মতো তৃপ্তিপ্রদ। প্রাচেদী, স্তূপ, চৈত্য এ-সমস্তই এক জাতীয়, সবগুলিই স্মারকচিহ্নে পরিপূর্ণ, সকলেরই জন্ম সমাধিমন্দির হিসেবে; পার্থক্য শুধু আকৃতির, কোনো-কোনোটি বেশ সুগোল।

এই প্রাণঘন, ছন্দোবদ্ধ অলঙ্করণ, রেখা-রঙের এই স্বচ্ছন্দ লীলা, এই আনন্দময় জীবনের ধর্ম্মনিষ্ঠা, এইগুলিই সায়ামের একান্ত বৈশিষ্ট্য। ভারতের সর্ব্বত্র যে অদ্ভুত উৎপীড়নের আভাস পাওয়া যায়, এখানে তার ছায়ামাত্র নেই, চৈনিক ঊষরতা এখানে অজ্ঞাত। দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ মিশে সায়ামীদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অভিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু ক্যাটাকুমচারী ক্রিশ্চানেরা যেমন ক'রে অরফিউসকে গ্রহণ করেছিলো, তেমনিতর ভ্রাতৃভাবেই এরা ব্রাহ্মণদের আচার-ব্যবহারকে কোল দিয়েছে। একদিকে উত্তরাবর্ত্তের চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্ম, অন্যদিকে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর সিংহলী মতবাদ, এই উভয়সঙ্কটে প'ড়ে, সায়াম সিংহলের প্রচারকবর্গকেই বরণ করেছিলো। কিন্তু আদিম টোটেম-পূজার সংস্পর্শে এসে, প্রচারকদের অনুশাসন ক্রমে এতই হৃদয়বান হ'য়ে পড়েছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের করুণাময়-আখ্যা এখানেই যথার্থ সার্থক। ফলে এদের মন্দিরগুলো প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ,—পুরোহিতের দল, শিশুর পঙ্গপাল, প্রাচ্যের কৃপাজীবী অবোধের দঙ্গল, কুকুর, কুষ্ঠরোগী, সুবর্ণবণিক,

ভিক্ষুক, পচা ডিম, পানের পিক, এই সমস্তের অপরূপ সমাবেশে দেউলগুলো জীবন্ত ও মুক্তদ্বার,—এমন-কি য়ুরোপীয়দের যাতায়াতেও বাধা নেই। মুণ্ডিতমস্তক, পীতাম্বর শ্রমণের দল গায়ে প'ড়ে পর্য্যটকের সঙ্গে আলাপ জমায়। সকালে গেলে দেখা যায়, পুরোহিতেরা বিগ্রহের পদপ্রান্তে নৈবেদ্যের মাঝে ব'সে, একসার টানাখোঁপাবাঁধা বাকসর্ব্বস্ব প্রৌঢ়াদের সঙ্গে গল্পগুজবে মত্ত ; কেউ বা কাঠের বালিশ মাথায় দিয়ে মাদুরের উপর শুয়ে আছে, কেউ হয়তো পান চিবুতে চিবুতে, একমনে সুপারীর খোসা ছাড়াচ্ছে। তাদের সকলের মাথার উপর ভগবান বুদ্ধের সুগম, অভ্যস্ত, ক্ষমাশীল উপদেশ-মালা আশীর্ব্বাদের মতো পরিকীর্ণ।

পাগোডাগুলোর ও-দিকে শানবাঁধানো উঠানের পরম্পরা, এগুলোর অন্ধিতে-সন্ধিতে খেতের সিংহের দল। পারসিক পূর্ব্বপুরুষদের মতো এদের কেশরও কুঞ্চিত, গুল্‌ফে গুল্‌ফে কঙ্কণ, গুম্ফের রেখা উদ্ধত, কটিতট বঙ্কিম, দেহ নিবদ্ধ ও তেজস্বী। চতুর্দ্দিক বটের পুণ্য ছায়ায় স্নিগ্ধ ও সরস,—এই বৃক্ষের অগ্রজের আশ্রয়েই বুদ্ধ পরমার্থ লাভ করেছিলেন।

দরজায়, জানলায়, আসবাবপত্রে, সায়ামী-কলার চতুর্দ্দিকে যে জ্যামিতিক রেখাচিত্রের বাহুল্য দেখা যায়, তার আসল অভিপ্রায় জানার জন্যে মন কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। এই উর্দ্ধমুখী রেখাগুলি, এগুলি কি চোখে ধাঁধা দেবার জন্যেই পরিকল্পিত, যাতে সহজ পরিপ্রেক্ষিতের স্বল্পতা পরিপুষ্ট হ'য়ে, উচ্ছ্রায়কে পরিবর্দ্ধিত করে ? এই যে সৌধগুলো অনন্যতন্ত্র ধাপে ধাপে উর্দ্ধে চলে গেছে, এই সপ্তস্তর সিংহাসন—শাস্ত্রোক্ত সপ্তস্বর্গের মতো ভাসমান, পদ্মারূঢ়, এদের উৎপত্তি কি স্থপতিবিদ্যার মাতৃভূমি বাবিলনে, সেই বাবিলনে যেখানকার বুরুজকে, যেখানকার খিলেনকে আদর্শ ক'রে, ভারতের মন্দিরশিখর একদিন নির্ম্মিত হয়েছিলো।

এখানকার প্রাসাদে রাজা বড় একটা থাকেননা। কামরাগুলোর সাজসজ্জা খুব সুরুচিপূর্ণ নয়, কেবল রাশি রাশি কুরসি-কেদারা আর সারি সারি পিকদান। য়ুরোপে এর জোড়া দেখতে চাইলে লুই ফিলিপের যুগে ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু একখানা ঘর আছে, যেখানা দেখার উপযুক্ত। এই পুরাতন সভাগৃহে এখনো দরবার বসে। সোনালি পর্দ্দায় ঘরখানা দুভাগে বিভক্ত, সবালেই একটা সোনার পাট চোখে পড়ে, সেটা আয়ুথ্যার রাজসিংহাসনের নকল। চারদিকে সোনার ছড়াছড়ি, যেন হিন্দুস্থানী রূপকথা পড়ছি। সিংহাসনখানা মাটি থেকে ফুটছয়েক উঁচু, পাশ থেকে একটা হালকা ধরণের পানসীর মতো দেখতে। জলচরের প্রতি এদের নজর যেন একটু বেশী। পদ্ম আর জলজাত লতার জমির উপরে সাত সার দেবদেবীর মূর্ত্তি। এগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে একটা

ছত্রীতে ; বাজা তাবি নীচে দববাবেব দিন ঘটা ক'বে বসেন। তাঁকে ঘিবে থাকে গোল গোল কিংখাপে-মোড়া ছাতাব ন-নবী হাব। এই সংখ্যাটিব কি একটা ইন্দ্রজালিক গুণ আছে, এতে অধিকাব স্বযং বুদ্ধেব আব বাজাদেব।

চতুর্দ্দশ লুইব দূত, সিভালিযে দ শোমঁ সাযামবাজেব প্রথম সন্দর্শন পেয়েছিলেন এমনি ধবণেব আজব জঁাকজমকেব ভিতবে। সিংহাসনেব অসাধাবণ উচ্চতা সেদিনে সর্ব্বনাশ ঘটিযেছিলো আব কি !

এসিয়াব আদবকায়দায় এক বাজাব পক্ষে অন্য বাজাব পত্র দূতেব মাবফতে গ্রহণ কবা নিষিদ্ধ। কাজেই বার্ত্তাবাহকেবা এঁদেবকে নাগালে পায়না। কিন্তু শোমঁ ছিলেন ফবাসী সৌজন্যে লেফাফাদুবস্ত। আমাদেব দেশেব আচাবে বাজদূত বাজাবই প্রতিমূর্ত্তি। ফলে তিনি তাঁব অভিজ্ঞানপত্রটিকে মধ্যস্থেব হাতে দিতে বাজি হলেননা। পক্ষান্তবে সিংহাসনটি এত উঁচু যে চিঠিখানাকে স্বয়ং বাজাব হস্তে সমর্পণ কবাও অসম্ভব। তখন সাযামেব প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কন্স্‌টান্স্‌,—এই অদ্ভুত জঁাহাবাজটিব আসল নাম, কোল্‌নস্‌, জাত গ্রীক, পেশা দুঃসাহসিকতা। তিনি চিঠিখানাকে একটা লম্বা ছডিব আগায় বেঁধে দেবাব প্রস্তাব কবলেন। কিন্তু সেটা শোমঁব মনঃপূত হলোনা। তিনি ধ'বে বসলেন সিংহাসনখানাকে খাটো কবতে হবে। ঔদ্ধত্যেব এত বড দৃষ্টান্ত শুধু দু শ বছব পবে ইংবেজ বাজপুরুষদেব মধ্যেই দেখা গেছে। ফবাসী বাজ্যেব প্রতিনিধিকে মঞ্চারূঢ কবাব জল্পনা-কল্পনাও সেদিন চলেছিলো। অবশেষে দববাবেব দিনে বাজা সেই ছ-ফুট-উঁচু, গবাক্ষতুল্য সিংহাসনে আবির্ভূত হলেন। তাব পবেব ব্যাপাবটা শোযাজিব জবানীতেই বলি : "বাজদূত পত্রখানা একটা সোনাব বাটিতে বেখে বাজাকে নিবেদন কবলেন, কিন্তু তাঁব হাত-পাযে আযাসেব লেশমাত্র দেখা গেলোনা, কাঁধ এক তিল নড়লোনা, ভাবটা যেন বাজা আব তিনি সমস্তবেব লোক। দূতেব পিছনে নতজানু কন্স্‌টান্স্‌ চেঁচিযে উঠলেন—তুলে ধরুন, আবো তুলে ধরুন। কিন্তু শোমঁ তাতে বিচলিত হলেন না। শেষকালে বাজাই স্বযং জানলা দিযে ঝুঁকে, চিঠিখানা তুলে নিতে বাধ্য হলেন।" আব একটি সাক্ষী পাদ্রী তাশাব বলেছেন : "তাব পবে চতুর্দ্দশ লুইব লিপিখানিকে বাজা কপালে ঠেকালেন ; এ-দেশে এটা শ্রদ্ধাসম্মানেব পবমচিহ্ন।"

বাজবাগিচাব ভিতবে যতই এগুনো যায়, স্তূপেব ভীড ততই ঘন হ'য়ে ওঠে। চৈত্য ও গরুডস্তম্ভগুলো পবস্পবেব মধ্যে ঠেলাঠেলি আবম্ভ ক'বে দেয়, সোনাব প্রাচুর্য্যে আব অর্চ্চনাব উপকবণে অঙ্গনে তিলধাবণেব স্থান থাকেনা। মাঝখানেব ত্রিকোণ স্তূপটা সোনায মোড়া, থাকে থাকে

ঢালাই-কবা কাক্ষকার্য্য সেটাকে একটা প্রকাণ্ড শঙ্খেব আকাব দিয়েছে। মধ্যাহ্নেব নিদাকুণ বৌদ্রে ওটাকে মাঝে মাঝে ক্রেম্‌লিনেব সোনাব গম্বুজেব সঙ্গে গোলমাল ক'বে ফেলছি। পাশেব পাগোডাটি চিত্রিত, অব্দপ তাব সৌন্দর্য্য ; কিন্তু ভিতবে দেওযালেব ছবিতে নোনা ধবেছে ; তাব ছাযাচ্ছন্ন অন্তবাল থেকে আকাশমুখী দবজা দিযে বাইবে চাইলে, আশপাশেব সুবর্ণপুঞ্জেব খব প্রভা অন্ধ ক'বে দেয়। অদূবে দুজন অসুবতুল্য বক্ষী একটি মন্দিবে পাহাবা দিচ্ছে, তাদেব কোলে গদা, মুখে স্থানীয নর্ত্তকদেব মতো ভয়ঙ্কব মুখোশ ; কিন্তু তাদেব আডষ্ট হাবভাবে আব সল্‌মাচুম্‌কি-বসানো ছেলেমানুষি উর্দ্দিব জৌলসে মুখ দুখানিব ভযাবহ নিঃসাডতা একেবাবেই ব্যর্থ। স্কেটিঙ বিঙেব মতো পবিমার্জ্জিত মর্ম্মবেব দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যায়। আব একটু গেলেই টাঁকশাল, তাব পবেই বাজাব গ্রন্থাগাব। দুর্ম্মূল্য, মিনে-কবা সিন্ধুক-গুলোব বশ্মিতে গ্রন্থালযেব অন্ধকাব উদ্দীপ্ত। মঁসিয় পিলাব চেষ্টায় এই জাতীয় আসবাবেব কতকগুলো উৎকৃষ্ট নমুনা ১৯২৪—২৫ সনে প্যাবিসেব সেবনুশি মিউজিযমে প্রদর্শিত হযেছিলো। আলমাবিগুলি ধর্ম্মগ্রন্থে ভবা ; চাবিদিকে ছাপা বই, পালি হবফে লেখা ভূর্জ্জপাতাব পুঁথি, লিগব কোবটে প্রাপ্ত অমূল্য শিলালিপিব ছডাছডি। পাশেই বিবাটাস্থি-পাগোডা। শুধু নাম শুনেই বোঝা উচিত যে এই চীনেমাটিব মন্দিবটি হাসিব মতোই উজ্জ্বল, হাসিব মতোই শুভ্র। এটিব আষ্টেপৃষ্ঠে ছাঁচে-ঢালা মালা আব কাঁচে-কাঁটা ফুল। এবম্বিধ অলঙ্কবণ দেখা যায় শুধু পাবস্যেব আব মবোক্কোব মুসলমানী শিল্পেব মধ্যে ; তবে তাব ধবণ একেবাবে আলাদা। এই চৈত্যে বাজাদেব অঙ্গাবিত অস্থি আব ভস্মাবশেষ সোনাব জালায় সংবক্ষিত হয। মানুষেব চর্ম্মই শুধু নশ্বব, তাই তাকে ভস্মসাৎ ক'বে, অনৈহিক ক্রিয়াকলাপেব জন্যে সঞ্চিত থাকে কেবল কঙ্কাল।

বাঙ্ককেব মন্দিবগুলোব মধ্যে ভাট প্রাকিও-নামক বাজমন্দিবটাব জাঁকজমকই সব চেযে বেশী। তাব কোনো মোহন্ত নেই, কিন্তু একশ বছব ধ'বে প্রত্যেক বাজা তাকে শ্রীমন্ত ক'বে আসছেন। দুষ্প্রবিশ্য শানবাঁধানো উঠানেব মাঝখানে প্রহবীমণ্ডপ-জাতীয একটা উঁচু ছোট ঘব দেখা যায, তাব সমস্তটা সোনা দিযে মোডা, চাকচক্যে বেনাবসী সাড়িও হাব মানে। তাবি চূডোয দেবতাসুলভ ভঙ্গীতে ব'সে, সায়ামবাজ বৎসবে একবাব সামন্তবর্গকে দর্শন দিয়ে থাকেন। এই দুবাবোহ পীঠস্থানটি দেওয়ালে-বসানো আবসিব সাহায্যে আলোকিত।

ভিতবে স্ফটিক ও সুবর্ণ নির্ম্মিত উচ্চ বেদীব উপবে বুদ্ধেব বিখ্যাত মাবকত মূর্ত্তিটি দেখতে পেলুম। মন্দিবে আলো আসাব একমাত্র পথ

একজোড়া ঝিনুকেব দবজা। শিলাজতুবঙেব দেওযালে আঁকা ছবিগুলোতে আভ্যন্তবিক অন্ধকাব যেন আবো ঘনীভূত। এই অন্ধকাবেব মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতিব আকস্মিক বশ্মিতে মূর্ত্তিখানি নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিব মতো যখন হঠাৎ নজবে পড়ে, তখন বাস্তবিকই মনে হয তাব দৈর্ঘ্য বিবাট, তাব অবস্থিতি বুঝি নিবালম্ব শূন্যে। এখানিব উপাদান আসলে মবকত-মণি নয়, সূর্য্যকান্তমাত্র, কিন্তু বেশভূষা ম্যাডোনাব মতোই পবিপাটী। চাব পাশে আবতিব দীপ, নৈবেদ্যেব থালা, বেদীব পিছনে ভাণ্ডাব ও মণ্ডনাগাব, কাবণ ঋতুব সঙ্গে বেশ পবিবর্ত্তনও আবশ্যক। এখানে আগামী গ্রীষ্মেব জন্যে উপযোগী সাজসজ্জা প্রস্তুত বযেছে—কেশবিন্যাসেব সোনাব জাল, মোতিব মালা, আঙটিব সাবি। বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখাব প্রশস্ত উপায় হচ্ছে নীচে থেকে, একটু এক পাশ হ'য়ে দেখা। ওই সঙ্কুচিত স্কন্ধে, কপোলেব ওই ললিত বেখায, ওই ঊর্দ্ধগামী চোখেব কোণে যে অনুপম সৌন্দর্য্য আছে, পশ্চিমেব কোনো মূর্ত্তি কোনোদিন তাব কাছেও আসতে পাববেনা। ওই সোনায মোড়া, মিনে-কবা অথবা হীবে-বসানো চোখেব কিবণ অর্দ্ধমুদ্রিত পল্লবেব তলা থেকে এসে যখন আমাদেব স্পর্শ কবে, তখন জ্যোতির্ম্ময় তপস্যাব শিব শান্ত অন্তর্দীপ্তিতে মন যেন উদ্ভাসিত হ'যে ওঠে। দুর্দ্দৈবেব অসংখ্য অত্যাচাবেও কি এই যুগযুগান্তব্যাপী সমাধি বিচলিত হযনি? পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মূর্ত্তিটিব দুর্দ্দশা সুরু হযেছিলো, কিন্তু অজ্ঞাতবাস, ভূগর্ভে অবস্থান, লুণ্ঠন, অপহবণ, লুক্কায়ন, নির্ব্বাসন, নগবধ্বংস ইত্যাদি সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হ'যে, মাবকত বুদ্ধ আজকে আবাব সগৌববে স্বদেশে প্রত্যাগত।

প্রাসাদপ্রাঙ্গণেব বাইবে সব চেয়ে সুদর্শন মন্দিব দুটোব নাম ভাট পো আব ভাট শেঙ।

ভাট পো নির্জ্জন তপস্যাব নিকেতন। গ্রীষ্মমণ্ডলেব আকস্মিক বাত্রিব অনতিপূর্ব্বে সূর্য্যেব পবাক্রম যখন ম্লান হ'য়ে আসে, তখনই এই মন্দিবে উপস্থিত হবাব শ্রেষ্ঠ সময। সহবেব কলকোলাহলেব অন্তবে এই দেউলখানি একটি জলাশযেব মতো, ধর্ম্মঘন শান্তিতে স্নিগ্ধ, বিপুলাযতন বটেব পুণ্য ছাযায গহন। বাহিবে বৌদ্ধধর্ম্মেব সহনশীলতাব পবিচয়-স্বরূপ একটা প্রস্তবনির্ম্মিত লিঙ্গ হিন্দুকুসংস্কাবকে মূর্ত্তিমান ক'বে, বীভৎস উন্নয়নেব সাহায্যে অনপত্যাদেব আশ্বাস দিতে ব্যস্ত। ভিতবে সুপ্ত বুদ্ধেব বিবাট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি দক্ষিণ এসিযাব অত্যাশ্চর্য্য বস্তুগুলোব অন্যতম। মন্দিবেব প্রাকাব নিবাভবণ, শুধু চূণকামকবা, এই আডম্ববহীনতাব পাশে সোনামোড়া দবজা-জানলাব জাঁকজমক কেমন যেন চোখে বাজে। ভিতবে প্রবেশ কবাব পবে কিছুক্ষণ সমস্তই অন্ধকাব ঠেকে, একটু পবে

পুবোহিত যেই একটা জানলা খুলে দেয়, অমনি কিসেব একটা অসংহত স্তূপ দৃষ্টিপথে ভেসে আসে, ঠিক যেন একটা হাতীব মৃতদেহ। আব খানিক বাদে কক্ষেব অপব প্রান্তে আব একটা জানলা খোলাব সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পর্ব্বতটা বুঝি বেড়ে চলেছে, তুর্ব্বাব বেগে বেড়ে চলেছে। ভাঙেব নেশা অবিকল এই বকমেব। এই নিদ্রিত দেবতাব আয়তনটিকে হৃদয়ঙ্গম কবতে বেশ কিছু সময় লাগে। ভগবান বুদ্ধ কাল সন্নিকট জেনে, ঠিক এমনি অবস্থাতেই মৃত্যুকে ববণ কবেছিলেন। মূর্ত্তিটিব উপবে চড়া বাবণ নয, কিন্তু সেই বিশাল স্কন্ধে আবোহণ ক'বে মনে হয, মানুষ সত্যই কীটাদপি কীট, সাধ্য কি এই অনন্ত শযনে ব্যাঘাত ঘটায়! বিগ্রহেব অঙ্গসঙ্গতি স্বভাববিকৃদ্ধ বটে, কিন্তু তাব ফলে সৌন্দর্য্যেব অণুমাত্র হানি হযনি। প্রভু সুষুপ্ত, তাঁব চক্ষু মুদ্রিত, মস্তক কবতলগত, পদযুগ সংলগ্ন, জীবনেব ঝড তাঁকে ভূপতিত ক'বে দিযে গেছে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড দেহে কী বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য !

এই অনন্ত শযনকে প্রদক্ষিণ কবতে বেশ কিছু সময় ও পবিশ্রম খবচ হয। ঘবেব সীমান্তে ভগবানেব চবণপদ্ম অবস্থিত। পা তুখানি জোড়া, ঝিনুকেব আস্তবণে বক্তাভ, মাঝখানে যতিব চিহ্ন নেই। স্থানে স্থানে যেমন ফতিমাব হাত ও মহম্মদেব পাদপূজা চলে, তেমনি এই পা তুখানিও সমগ্র এসিযাব অর্চ্চনাব সামগ্রী। সিংহলে এবং ভাবতে কযেক জায়গায এই পবিত্র পাযেব ছাপ আছে, সেগুলি তীর্থস্থান। বাবাণসীব উত্তব-পশ্চিমে এক শ ক্রোশ দূবে সংকিশ্য-নামক স্থানে প্রথম পদচিহ্নটি আবিষ্কৃত হয়েছিলো। স্বর্গে তিনমাস কাটানোব পবে বুদ্ধ যখন জগতে ফিবে অসেন, তখন তাঁব পা পৃথিবীকে প্রথম স্পর্শ কবেছিলো এইখানেই। পাদপদ্মেব মাঝখানে একটি চক্রচিহ্ন দেখা যায়, এটি ধর্ম্মচক্র, কর্ম্মবাদেব বহস্যময় কুণ্ডল। আড়ষ্ট অঙ্গুলিগুলিতে কাৰুকার্য্যেব বহুলতা নেই, নবচর্ম্মেব অনুকবণে সেগুলি কেবল আবর্ত্তবেখায ভবা। যাবাব আগে মূর্ত্তিব মাথাব গোড়ায উঠে, সেই প্রকাণ্ড চিবুকেব তলে একবাব দাঁড়ালুম। এখান থেকে এই দিব্য বপুব সমস্ত বিস্তাবটা নযনগোচব হয। মনে হলো জোড়া-পাযেব সমান্তব বেখা-তুটি বিবাট দেহখানিকে যেন অনন্তেব দিকে উধাও ক'বে দিয়েছে। একটা অখণ্ড নির্ব্বাণেব আবেশে চিত্ত পবিপ্লুত হ'য়ে উঠলো। এই কল্যাণ মিলে শুধু মৃত্যুব উত্তব লোকে, যেখানে বোগ নেই, শোক নেই।

ভাট শেঙ মেনাম-নদীব দক্ষিণ তীবে অবস্থিত। জলেব এত কাছে ব'লেই, এব প্রকৃত আযতন প্রতিবিম্বেব চাতুবীতে দ্বিগুণ হ'য়ে, দর্শকদের অবাক ক'বে দেয। ব্রহ্মদেশেব লোক আব ভেনিসবাসী, এই তুটি জাতি

জলেব সাহচর্য্যে নিজেদেব কীর্ত্তিস্তম্ভগুলোব শ্রীবৃদ্ধি কবাব কৌশলটা যথার্থ আযত্ত কবতে পেবেছে ; তাদেব প্রতিফলিত হর্ম্মগুলোকে দেখে ঠিক কবা শক্ত, আসলে আব নকলে উজ্জ্বলতাব তফাৎ কতখানি। কিন্তু সায়ামীবা এই সহজ সম্বন্ধটাকে উপেক্ষা ক'বে, মন্দিবগুলো নদীব থেকে একটু দূবেই গড়েছে। ফুল ফল, দেব দানব, তাবাব আকাবে গ্রথিত তিন-তিনটে ক'বে হাতী ইত্যাদি নানাবিধ আভবণেব সন্নিপাতে ভাট শেঙেব চৈত্যগুলোই দেখতে সব চেযে ভালো। শষ্পপ্রধান দেশেব স্থপতি-কলাব যেটা প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ ফুল-ফসলেব পর্য্যাপ্তি—এইখানেই তাব পবাকাষ্ঠা দেখা যায ;—এব পাশে দুষ্ট কল্পনাব আতিশয্যকেও মনে হয সংযত। কোণাচে সিঁড়িটা শেষ হযেছে একটা লম্বা ছুঁচোলো থামেব তলায়। এইখান থেকে সাবা সহবটা চোখে পড়ে। কাছে এলেই চবুতাবাটাব নিকৃষ্ট মাল-মসলা নজব হয, চীনেমাটিব টুকবো, এমন-কি ষ্ট্রাস্‌বুর্গেব সানকি-ভাঙা পর্য্যন্ত বাদ যায়নি। কিন্তু সে-সমস্তই সিদ্ধ ; সমস্ত জঞ্জাল এক হ'য়ে, বিলেতিমাটিব সঙ্গে জমে যে-ঝকঝকে, তকতকে, অপরূপ চাতালটিব সৃষ্টি কবেছে, সেটি অধুনিক শিল্পীদেব দুঃসাহসী গবেষণাব কথা মনে কবিয়ে দেয়। অলিন্দা থেকে সমগ্র বাঙ্কক-সহবখানাব উপবে দৃষ্টি চলে। নদীব দুই বাঁকেব উভয় কূলে বিস্তৃত এই প্রাচীন নগবটি, পর্ত্তুগীসদেব তৈবি পুবানো দুর্গশ্রেণী, শুকনো বাগান, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট খালেব সাবি, শতনবী ছাদ, এ-সমস্তই যেন মানচিত্রে আঁকা।

সহবতলীব বনে-জঙ্গলে যত মন্দিব অনাদবে উপেক্ষায লুকিয়ে আছে, স্মবণে আজ আবাব সেগুলোকে দেখে বেড়াচ্ছি। আমবাগানেব গভীব অন্ধকাবে, খালগুলোর গোলকধাঁধায তাদেব আবিষ্কাব কবাব কোনো সম্ভাবনা নেই , কিন্তু অজ্ঞাতসাবে পাশ কাটিযে চলে যাবাব সময, পুবোহিত-দেব পীতাম্ববেব দুর্দ্দম্য বর্ণচ্ছটা সেগুলোকে প্রায়ই ধবিযে দেয। এই মন্দিবগুলোব উঠানে চটচটে কাদা,—যেন এইমাত্র জল নেমে গেছে, আব বটগাছ,—এত যে গুণে শেষ কবা যাযনা। গাছতলাকাব মর্ম্মবমঞ্চগুলো চীর্ণ দীর্ণ,—প্রাণপণ জোবে নিঃশ্বাস নিলে আঁটসাঁট কোমববন্ধ এমনি ক'বেই টুকবো টুকবো হ'য়ে ছেঁড়ে। ফাটগুলোকে প্রথমে দেখায় চুলেব মতো, ক্রমশ সেগুলো ছিদ্রে পবিণত হয, শেষকালে যখন গুহায গিযে দাঁড়ায, তখন হটা ছাড়া মঞ্চগুলোব গত্যন্তব থাকেনা , শ্বেত পাথবেব ভাবী ভাবী বেদীগুলোও শিকড়েব ঠেলায হেলে পড়ে। চতুর্দ্দিকে তপোবনেব প্রশান্তি , অথচ, জাতকেব বর্ণনাব মতো, সহবখানি অনতিদূবে। বৃক্ষপূজাব অতীত যুগকে ভুলতে পাবেনি ব'লেই, সাযামীবা গাছ কাটায় অত কুণ্ঠিত। লিগেশনেব সন্নিকটে একটি ফবাসী যাজকেব সঙ্গে আলাপ

হযেছিলো, তাব বাড়িটাকে একটা গাছ বেদখল ক'বে নিয়ে, আস্তে আস্তে পিষে ফেলছে, কিন্তু সেই উদ্ভিজ্জ গৌববে হস্তক্ষেপ কবায কাকুব সম্মতি নেই।

এই নিভৃত স্থানগুলি নীববতাব বিহাবভূমি, এখান থেকে মোটাব-গাড়িব হর্ন সুদ্ধ শোনা অসম্ভব। কেবল কতকগুলো বাতুড নিঃশব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাও যেন শূন্যেব মধ্যে। নদীটা বুঝি মন্ত্রঃপূত, মনে হচ্ছে যাতুকবেব আবসিব মতো তাব জলে অনাগতদেব দেখতে পাবো। সাদা-কালো আলো-ছাযাব শানবাঁধানো জমিব উপবে দাঁড়িয়ে আছি, আমাব চাবপাশে একদল কালো ববাহ, অদূবে মন্ত্রোচ্চাবণেব গম্ভীব ধ্বনি। যে-ছোট ছেলেটি অল্পক্ষণ আগে আমায পাখাব বাতাস কবছিলো, সে এসে মোহন্তেব তবফ থেকে চায়েব নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

শ্রমণেবা দিনেব মধ্যে এক বা তুই বাব মাত্র খায। ভোব হতে না হতেই তাবা বেবিযে পড়ে, পথে পথে ভিক্ষা আহবণেব জন্যে। ভিক্ষাব ভাণ্ডটাকে কেউ নেয় গলায় ঝুলিযে; কেউ তু হাত বাড়িযে কোমবেব সামনে ধ'বে থাকে। যখন তাবা কোনো বাড়িব দ্বাবে থামে, তখনো তাদেব ধ্যান ভাঙেনা, বা মুখে কথা সবেনা, সহজ উপাযে পুণ্যসঞ্চয়েব লোভে গৃহস্থেবা আপনি এসে তাদেব পাত্রে তণ্ডুলকণা ঢেলে দেয। তাবপব কৃতজ্ঞতাব নামটুকু অবধি উচ্চাবণ না-ক'বে ভিক্ষুব দল মঠে ফিবে আহাবে ব'সে যায। তাবা যখন আবাব বাহিব হয়, তখন বেলা প'ড়ে আসে, কেউ হযতো বগলেব তলে একটা প্রকাণ্ড ছাতা নিযে চলে, কাকুব সঙ্গে থাকে একটা ধামাজাতীয জিনিষ, কিন্তু অভ্যস্ত মূকতাব কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনা। ভিক্ষুদেব পবিত্র পীতাম্বব চাকচক্যে স্থানীয ট্রামকেও হাব মানায, জলে স্থলে সর্ব্বত্রই এই অভিবাম বর্ণচ্ছটা; কিন্তু ধাবন আব বয়সেব তাবতম্যে এই অভিন্ন বঙটি বৈচিত্র্যময,—বর্ণগ্রামেব এক পাশে কাঁচা সোনা, অন্য পাশে শুকনো খড, একদিকে অতসী ফুল, অন্য দিকে মুবগীব ডিম, এক প্রান্তে গেবিমাটিব মলিনতা, অপব প্রান্তে ক্যানেবিব জাঁকালো জৌলস। এই হলদে বঙটিব মূল কথা হচ্ছে যে ভাবতে ওটি অন্ত্যজদেব বঙ, সেইজন্যেই বুদ্ধ তাঁব বাজসিক পবিচ্ছদটিব বিনিময কবেছিলেন পীতাম্ববেব সঙ্গে। শ্রমণসঙ্ঘ স্বেচ্ছাসেবকেব সমাগমে পুষ্ট; আমবণ সঙ্কল্প না-ক'বেও এ-দেশে পুবোহিত হওয়া সম্ভব। ভিক্ষুবা ঠিক নিঃস্ব না-হ'লেও মাত্র আটটা জিনিষে তাদেব অধিকাব আছে: তিনখানা বস্ত্র, একটা ভিক্ষাভাণ্ড, একখানা ক্ষুব, গোটা-কতক ছুঁচ, একটা ছাঁকনি এবং একটা কোমববন্ধ। সময়ে সময়ে কোনো-কোনো শ্রমণকে একখানা হাতপাখাব আড়ালে এই পাপস্পর্শ সংসাবকে ঠেকিয়ে বাখতেও দেখেছি। তাদেব মুণ্ড ও ভ্রূ বহু ক্ষৌবিব ফলে নীলাভ।

ধর্ম্মের নির্দ্দেশ-অনুসারে প্রত্যেক সায়ামবাসীই জীবনের কয়েক মাস মঠের অন্তরালে কাটাতে বাধ্য। এই অবশ্যপালনীয় ধর্ম্মজীবন আমাদের দেশের অবশ্যকরণীয় শস্ত্রশিক্ষার মতো। দীক্ষারম্ভের দিনটা খুব ঘটা-ঘটির দিন, আত্মীয়-কুটুম্বেরা দল বেঁধে দীক্ষার্থীকে মঠে রেখে আসে, সেদিনে চাচক্র বসে যায়, গোলাপী চূণ ও পানের বিনিময় চলে, আগন্তুকের মূল্যবান বসন স্বয়ং বুদ্ধের শুক্লাম্বরের অনুকরণ করে। তার পরে গলায় ভিক্ষার ভাণ্ড বেঁধে দিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তার কোনো সংক্রামক ব্যাধি বা ঋণ আছে কিনা। এই সমস্ত অনুষ্ঠান সাঙ্গ হ'লে, তবে তার পীতাম্বরে অধিকার জন্মায়। তখন তাকে পণ করতে হয় যে তার হাত দিয়ে কখনো প্রাণীবধ হবেনা, সে চুরি করবেনা, মিথ্যা বলবেনা, সুরাপান করবেনা, নাচবেনা, গাইবেনা, জুয়া খেলবেনা, তার ব্রহ্মচর্য্য নিয়ত অটুট থাকবে, তার দেহকে আভরণ বা গন্ধদ্রব্য কখনো স্পর্শ করবেনা, তার শয্যায় আড়ম্বর দেখা যাবেনা, অর্থকে সে অশুচি ব'লে পরিহার করবে। ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া, পা মেলে বসা, কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করা, বাণিজ্যে মন দেওয়া, ভুক্তাবশিষ্ট সঞ্চয় করা, শাস দেওয়া, মাল্যধারণ করা, একজনকে অপরের চেয়ে প্রিয়তর ব'লে ভাবা, এ-সমস্তই তার পক্ষে নিষিদ্ধ। বুদ্ধের আদেশে সে ধ্যাননিরত থাকতে বাধ্য। এই দুঃখময় জগৎ, মানুষের জঘন্য প্রমোদপরায়ণতা এবং এই অনিত্য সংসারের মালিন্য, এই তিনটি বিষয়ই তার একান্ত ধ্যেয়। দেখা গেছে তার ব্রত সহজ। আমাদের ক্যাথলিক বৈরাগীরা যেমন কল্পনা ক'রে থাকে যে ধর্ম্মার্থে, সদাচরণের খাতিরে তারা সমাজবিরাগী, শ্রমণদের ভ্রান্তিও তদনুরূপ। আসলে তাদের সন্ন্যাস খুব কঠোর নয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে জীবন এতই স্বল্লাঙ্গ, তার উপকরণ এতই সামান্য, দারিদ্র্য এতই সার্ব্বজনীন, বৈষয়িক বা যৌন প্রবর্ত্তনাগুলো এতই বিরল ও ক্ষণস্থায়ী যে গার্হস্থ্য এখানে ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে পা মিলিয়েই চলে।*

পল মোরাঁ

* Paul Morand-র Rien que la Terre-নামক ভ্রমণপুস্তকের Les Temples-নামক পরিচ্ছেদের অনুবাদ।

সমষ্টি-বিজ্ঞান ও বস্তুর সমষ্টি-গণিত

নব্য বিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সব তত্ত্ব স্ব স্ব প্রতিপত্তি নিয়ে মাথা তুলে উঠেছে তাদের অন্যতম হ'ল সমষ্টি-গণিত—Statistical Mechanics। Statistics-এর নামে প্রথমেই সাধারণের মনে আদম-সুমারি ও তার কীর্ত্তি-কলাপের কথা জেগে ওঠে। গল্প শুনেছিলাম, একবার ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার গোধন নিরূপণের প্রস্তাব গৃহীত হ'লে জেলার এক ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁর এক চতুর দারোগার ওপর এর ভার অর্পণ করেন। দারোগাবাবু একদিন সকালে গ্রামের গোচারণ মাঠে গিয়ে গরুর সংখ্যা গুণে ফেলেন। তারপর বাকিটা সরল ত্রৈরাশিকের হিসাব;—সেবার বাংলার গোধন নিরূপণ কতকটা এইভাবেই সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এটা কৌতুক মাত্র কিন্তু শুধু গ্রামের দারোগাবাবু কেন বৃহত্তর সমাজেরও অনেকেই এই শ্রেণীর গণনাকে এখনও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই শ্রেণীর গণনাকে আর তিলমাত্র অবজ্ঞা করবার উপায় নেই, Statistics-ই বলুন আর সমষ্টির হিসাবই বলুন—এ হিসাব আজ আমাদের জীবনযাত্রা ও আলোচনার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার অসামান্য অধিকার বিস্তার করেছে। Statistical Mechanics বা সমষ্টি-গণিতও এই ব্যাপারের পুনরুল্লেখ ক'রে বলছে যে, শুধু ব্যষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে বিজ্ঞানের আর চলছে না, তাকে সমষ্টির স্বতন্ত্র নিয়ম-লক্ষণাদির হিসাব-নিকাশ করতে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হতে পারে যে, ব্যষ্টির বিধান যদি সর্ব্বের জানা থাকে তবে সমষ্টির আচরণ জানতে বাকি রইল কি? এ কথার উত্তরে বলতে হয় যে, সমষ্টির স্বাধীন লক্ষণাদি ধরা পড়েছে বলেই বিজ্ঞানকে আজ সমষ্টি স্বীকার করতে হয়েছে। এমন কি, এ কথা বল্লেও অন্যায় হবে না যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোন ব্যষ্টির সমূহের প্রতি সমষ্টি-গণিত খাটানো সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ সে ব্যষ্টিকে প্রাণ খুলে ও সুসম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা বিজ্ঞানের পক্ষে আজ দুরূহ হ'য়ে পড়ছে। বস্তুর সমষ্টি-গণিতে এ কথার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মোট কথা এই যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুটিই আজ আমাদের জাগতিক তত্ত্বালোচনায় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক জীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টি গণনার প্রভাব সম্বন্ধে বেশী কথা বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, Ecology প্রভৃতি সবই সমষ্টির প্রতি আমাদের মনোনিয়োগের প্রচুর পরিচয় দিচ্ছে। পদে পদে আমরা সমাজ ও সংঘকে ব্যক্তি থেকে পৃথক ক'রে দেখি। স্বদেশ ও সংঘের কাছে ব্যক্তির স্বার্থ প্রতিনিয়ত হেলায় আত্মবলি দিচ্ছে।

ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সমষ্টিহিসাবের একটা সুন্দর উদাহরণ সংক্রামক রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থায়; এ ব্যাপারে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি প্রখর অর্থাৎ কিসে রোগীরা এক-একটি ক'রে ভাল হ'য়ে ওঠে এ বিষয়ে লক্ষ্যের চেয়ে কিসে রোগ বেশী ছড়িয়ে না পড়ে এ বিষয়ে লক্ষ্য বেশী। একদিকে যেমন রোগীকে ভাল করবার জন্য পরীক্ষায়, ওষুধ, হাঁসপাতাল প্রভৃতি উন্নত প্রণালীতে সজ্জিত হচ্ছে, আর একদিকে তেমনি রোগ, তার ফলাফল ও তার ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে দেখবার চেষ্টায় হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্ট, Malaria Survey, Tuberculosis Research প্রভৃতি গ'ড়ে উঠছে। এ সবের প্রধান লক্ষ্য কি ক'রে রোগকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে আনা যায়।

সমষ্টি-গণিতের প্রসঙ্গে এ সব কথা হয়ত একটু অবান্তর কেননা এ সব প্রচেষ্টায় একটা উদ্দেশ্য, সহযোগিতা ও ইচ্ছাশক্তির খেলা আছে যা বস্তুজগতে নেই। সমষ্টি-গণিতের যেটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তান্ত তা হ'ল এই যে, ব্যষ্টির লক্ষণ ও আচরণের গড়পড়তা হিসাব নিয়ে সমষ্টির লক্ষণাদি জানবার প্রয়াস না ক'রে, তা মৌলিক উপায়ে জানবার প্রয়াস করা। কেননা সকল সময় ব্যষ্টির প্রত্যেকটির লক্ষণ ও অবস্থা জানা অসম্ভব, অথচ স্বাধীন উপায়ে সমষ্টির এমন সব লক্ষণ হস্তগত হ'তে পারে যা থেকে পরিশেষে ব্যষ্টিরই অনেক প্রধান ও প্রয়োজনীয় তথ্যের দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

ম্যাক্সওয়েলের আগে পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ ব্যষ্টির দিকে। তখন বিজ্ঞানের সঙ্কল্প ছিল কতকটা এই রকম :—আলোচ্য বস্তুর খণ্ডিত ভাগগুলির পৃথক পৃথক সংস্থান ও আচার-ব্যবহার নির্দ্দেশ ক'রে দাও, তাহলে বিজ্ঞান সমস্ত অখণ্ড জিনিষটির নাড়ী-নক্ষত্র স্থির ক'রে দেবে। এ রকম টুকরো ক'রে দেখার পরিণতি অণু-পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রণ-এর আবিষ্কারে। বিজ্ঞান যে এ ব্যাপারে অনেকটা সফল হয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য। শুধু আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যের সুচারু ব্যাখ্যা হাজির ক'রে নয়, বিজ্ঞান এই উপায়ে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও আমাদের সুখ-সুবিধা প্রসার করবার চমৎকার আয়োজন করেছে। যদি অণু-পরমাণুর রহস্য বিজ্ঞানের অজ্ঞাত থেকে যেত তাহলে আজ পৃথিবীর চেহারা কি রকম হ'ত সে বিষয়ে একটা মানস চিত্র তৈরী করা অসম্ভব হবে না। যে সব আবিষ্কার দৈবক্রমে সিদ্ধ হয়, সেগুলি নিশ্চয় আয়ত্ত হ'ত কিন্তু যেগুলি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ায় আয়ত্ত হয়েছে সেগুলি পিছিয়ে পড়ত, সন্দেহ নেই। লৌকিক অনেক কাজই হয়ত ওয়াট্‌সের ষ্টীম এঞ্জিনে সম্পাদিত হ'ত কিন্তু ঠিক প্রয়োজনসাপেক্ষ গুণসম্পন্ন ইস্পাতের অভাবে শত সহস্র অশ্বশক্তির (Horse-power) এঞ্জিন ও লোকোমোটিভের

বহুল প্রচলন হ'ত না। এ রকম সুপরিণত মোটরকার ও এখনকার অতি-পরিচিত যন্ত্রপাতির উদ্ভব হতে যুগ যুগ অবসান হ'ত। ম্যাঞ্চেষ্টার বোম্বাইয়ের লক্ষ লক্ষ যন্ত্রচালিত তাঁতের সাক্ষাৎ পেতে পৃথিবী শেষ দশায় উপনীত হ'ত ;—কাপড় ও সুতার মোহনীয় রঙ ও ডিজাইন-বৈচিত্র্য স্বপ্নলোকের বিভব থেকে যেত ; এয়ার্লিকের স্যালভার্সান ও ব্রহ্মচারীর "ষ্টিবুরিয়া"র জন্ম হ'ত না। অনেকে হয়ত জানেন না যে আজকের রেডিও ও টকি আবার এদিকে এক্স-রে ইলেক্‌ট্রণ আবিষ্কারের অব্যবহিত ফল। একদিকে রবাতে পাওয়া আবিষ্কার আর একদিকে বিজ্ঞানের ফরমাসী আবিষ্কার।

বলা যেতে পারে যে Dynamics হ'ল ব্যষ্টির গণিত যেমন সমষ্টির হ'ল Statistical Mechanics। ব্যষ্টির চালচলন নিরূপণ করবার প্রয়াসে গ্যালিলিও নিউটনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গতিগণিত যে সব প্রশ্ন ও সমস্যাপূরণ ক'রলে তা বলতে গেলে একেবারে চরম, কেননা তা শুধু পার্থিব ব্যাপারে নয়, অন্তরীক্ষে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহদের বেলাতেও পূর্ণভাবে ফলিত হ'ল। যা একটু ত্রুটি ছিল আইনষ্টাইন তা তাঁর আপেক্ষিকগণিত (Relativity) দিয়ে সংশোধিত ক'রে দিলেন। কেবল যে পদার্থ,—যার রূপ আছে, মাপ আছে, সীমা আছে, রং আছে, ভার আছে—এর ক্ষেত্রেই যে শুধু গতিগণিত প্রযুক্ত হ'ল তা নয়,—আলোক, যার আকৃতি নেই, মাপ নেই, অবয়ব নেই, যাকে মুঠো ক'রে ধরতে যাওয়া বিফল—যা' শুধু "পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়," তাকেও বৈজ্ঞানিক গতিশাস্ত্রের অধীন ক'রতে সমর্থ হ'লেন। আলোকে গতিগণিতের নিয়োগকর্ত্তার প্রধান পুরোহিত হাইগেন্স তখন তন্ময় হ'য়ে বলেছিলেন—"গতিগণিতই হ'ল একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিদান, জগতের যা কিছু সমস্তকিছুকেই এর বশবর্ত্তী কর, না পার তার তত্ত্ব নিরূপণের আশা জলাঞ্জলি দাও।" গতিগণিতের এ একাধিপত্য প্রথম খর্ব্ব করলেন ম্যাক্সওয়েল, সমষ্টি-গণিত প্রয়োগ ক'রে। আধুনিক কালে গতিগণিতের ব্যতিক্রম ইলেক্‌ট্রণের আচরণেও দেখা দিয়েছে।

শুদ্ধগণিতে সমষ্টিগণনা যে আকারে দেখা দিয়েছিল সে হ'ল বীজ-গণিতের Law of Probability, যাকে আমরা ব'লব সম্ভাবনামিতি। এর পরিচিত উদাহরণ চাঁদমারিতে রাইফেল বন্দুকের গুলি লাগার সম্ভাবনা নিরূপণে। সম্ভাবনামিতির একটা আদিসূত্র হ'ল এই যে, যদি কোন ঘটনা ণ ও ন এই দুই উপায়ে সম্ভাবিত হয় তবে প্রথম উপায়ে ঘটবার সম্ভাবনা $\frac{ণ}{ণ+ন}$, দ্বিতীয় উপায়ে ঘটবার সম্ভাবনা $\frac{ন}{ণ+ন}$। ইন্সিওরেন্স-এর প্রিমিয়ম প্রভৃতির হিসাব সম্ভাবনামিতির নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়।

পদার্থবিজ্ঞানে সমষ্টিগণনার প্রথম প্রয়োগ করলেন ম্যাক্সওয়েল।

তাঁব অনুসন্ধানেব বিষয় ছিল তাপবিজ্ঞানেব কযেকটি সমস্যা নিযে। তাপবিজ্ঞানেব মতে বস্তুব তাপ তাব অণুব গতিজনিত। গ্যাসেব অণুবা মুক্ত ও অতি প্রচণ্ডগতিতে ধাবমান, পক্ষান্তবে কঠিন ও তবল বস্তুব অণুবা নৈকট্যেব দরুণ পবস্পবেব আকর্ষণে বদ্ধ ও শুধু একবকম আণবিক কম্পনে কম্পিত হ'তে সক্ষম। অণুদেব এই সব গতি ও কম্পনেব হিসাব ধ'বে বিভিন্ন বস্তুব ও মূল পদার্থেব যাবতীয় আচবণ ব্যাখ্যা কবা তাপবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। গ্যাসেব অণুবা মুক্ত ব'লেই গ্যাসকে আধাবে আবদ্ধ ক'বে না বাখলে ধ'বে বাখা যায না। তাব তাপ যত বাড়ে তাব অণুব গতি, গতিলব্ধ শক্তি ও তাব আয়তন সেই অনুপাতে বাড়ে। গ্যাস-অণুব গতিলব্ধ শক্তি কত বেশী হ'তে পাবে তাব প্রমাণ যে কোন বিস্ফোবণে। তেমনি শৈত্যে গতি, আয়তন ও গতি-শক্তি সঙ্কুচিত হয, তাপবিজ্ঞান এমন শৈত্য অনুমান কবে যাতে তিনটি লক্ষণই সঙ্কুচিত হ'য়ে শূন্যে পবিণত হবে। এই অবস্থাব নাম Absolute Zero বা মহাশূন্য। ব্যাবহাবিক ক্ষেত্রে মহাশূন্যেব ২।৩ ডিগ্রীব কাছাকাছি পর্য্যন্ত যাওযা গিযেছে। ঠিক এই বকম ভাবে কঠিন বস্তুও তাপে আযতন-বৃদ্ধি লাভ ক'বে, ও বৰ্দ্ধিতহাবে আণবিক কম্পন বৃদ্ধি পাওযাব দরুণ উত্তপ্ত হ'যে প্রথমে লাল, ক্রমশঃ কমলা, তাবপব শাদা জ্যোতিতে প্রভান্বিত হ'যে ওঠে। ইস্পাত ও চুল্লীব উত্তপ্ত বর্ণ দেখে তাব টেম্পাবেচাব নিৰূপিত হয়। ঠিক এমনি বর্ণ-বিশ্লেষণ ক'বে জ্যোতিষ্ক ও তাবকা নীহাবিকাব টেম্পাবেচাব নিৰূপিত হ'চ্ছে। উত্তপ্ত হ'তে হ'তে ক্রমে অণুদেব বন্ধন মুক্ত হযে তা তবল ও তবল থেকে গ্যাসে পবিণত হয। প্রফেসাব সাহা দেখিযেছেন যে উত্তাপ এমন হ'তে পাবে যে, অণুবা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'যে তাদেব শেষ উপাদান ইলেক্ট্রণ ও প্রোটনে বা ইলেক্ট্রণ গ্যাসে পর্য্যবসিত হয। আধুনিক জ্যোতিষ্কবিজ্ঞানে—Astro-physics—সাহাব এই গণনা নূতন নূতন আবিষ্কাবেব পথ প্রস্তুত ক'বে দিয়েছে।

অণুদেব এই যে সমাবেশ একেই ম্যাক্সওযেল সমষ্টিহিসাবে গণনা কবাব প্রস্তাব ক'বলেন। তিনি দেখালেন, গ্যাসে সমষ্টিব একটা লক্ষণ আযত্ত কবা যেতে পাবে যাব নাম Distribution অর্থাৎ বণ্টনহাব। কিসেব? অণুদেব গতিব। অর্থাৎ কতগুলি গ্যাস-অণু থাকতে পাবে যাবা নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট গতিব অনুগমন কবে। বণ্টনহাবেব তাৎপর্য্য কি বকম হ'তে পাবে তা বোঝবাব জন্য আমবা এখানে একটা উদাহবণ দেওয়াব প্রস্তাব কবি। মনে করুন, ছাত্রবা সমষ্টি-গণিত বোঝবাব উপযুক্ত হযেছে কিনা দেখবাব জন্য একটা পবীক্ষা কবা গেল ও ধবা গেল যাবা শতকবা ৬০ পাবে তাবা সমষ্টি-গণিত পাঠেব উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হবে। পবীক্ষা-ফলেব একটা গড়পড়তা ক'বে দেখা গেল যে তা দাঁড়ায শতকবা পঞ্চাশে।

তাহলে এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত হ'ল না। তাব পব বণ্টনহাব থেকে দেখা গেল যে, শতকবা ৪০ ভাগ ছাত্র শতকবা ৮০ নম্বব পেযেছে ও বাকি ৬০ ভাগ ছাত্র শতকবা ৩০ পেযেছে। এ ক্ষেত্রে—অন্য বাধা না থাকলে, ক্লাসে সমষ্টি-গণিত পডানো সঙ্গত ব'লে বিবেচিত হতেও পাবে। আমাদেব দৃষ্টান্তটি খুব স্থূল, তাহলেও এটা নিবর্থক নয। যা হ'ক্ এই বকম ম্যাক্সওয়েলেব বণ্টনহাব থেকে কয়েকটি মূল্যবান নিযম ধবা পডল, যথা, একটি হচ্ছে অণুদেব গতি বিভিন্ন ও ভিন্নমুখী হ'লেও তাদেব শক্তি সমান সমান। আব একটা অতি মূল্যবান তথ্য তিনি বাব কবতে পাবলেন সে হচ্ছে গ্যাস অণুদেব পাডি—Mean free path—কতখানি। অর্থাৎ অণু গডপডতায় কতদূব যাবাব পব অন্য অণুব সঙ্গে সংঘর্ষে উপস্থিত হয। ম্যাক্সওযেলেব এ সব আবিষ্কাব শুধু তাঁব মস্তিষ্কেব অসামান্য উর্ব্ববতা-জ্ঞাপক কালি-কলমেব হিসাব নয,—এ সব, অর্থাৎ গতিব বণ্টনহাব, অণুব পাডি, শক্তিব সমতা,—ষ্টার্ণ, বর্ণ প্রভৃতিব দ্বাবা কঠোব পবীক্ষায যাচাই কবা সত্য। এ বিষযে আব একটু বলা দবকাব যে এ সব গণনায ম্যাক্স-ওয়েল যা স্বীকার্য্য ব'লে ধবে নিয়েছিলেন তা অতি নগণ্য, যথা (১) অণুবা স্থিতিস্থাপক গোলক, সংঘর্ষে তাদেব শক্তিব অদলবদল হয কিন্তু অপচয় হয না, (২) গতিমুখ নির্ব্বিশেষে গতিব বেগ সমান, (৩) সমান আযতনে সমান সংখ্যক অণু বিবাজ কবে। এটা লক্ষ্যেব বিষয যে, ব্যষ্টিসম্বন্ধে কতটুকু মাত্র স্বীকার্য্য ধবে নিযে সমষ্টিসম্বন্ধে কত মূল্যবান তথ্যেব সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

সমষ্টি-গণিতেব দ্বিতীয প্রধান লক্ষণটি ধবা পডেছে তাপকে ক্রিযাতে ৰূপান্তবিত কবাব ব্যাপাবে। তাপ ও ক্রিয়া মূলে এক, উভয়েই শক্তিব (energy) ভিন্ন ৰূপ; তাপকে ক্রিযায ও ক্রিযাকে তাপে পবিণত কবা যায—তাতে শক্তিব ক্ষযবৃদ্ধি হয না। তাপ-বিজ্ঞানে বলে, বিশ্বেব সমস্ত শক্তিব পুঁজিতেও ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, কেবল ৰূপান্তব হ'যে এই বিশ্বলীলা প্রকাশ ক'বছে। কিন্তু তাপকে ক্রিযায় পবিণত কবতে হ'লে উত্তপ্ত স্থান থেকে অনুত্তপ্ত স্থানে তাপকে পবিচালন কবতে হয। বিপবীত মুখে অর্থাৎ শীতল স্থান থেকে উত্তপ্ত স্থানে তাপ চালনা ক'বে কাজ আদায হয না ববং উল্টে কাজ ব্যয় কবতে হয়। জগতেব অধিবাসীব কাছে এব তাৎপর্য্যটা বড জৰুবী। যতদিন বিশ্বে উত্তপ্ত স্থান থেকে শীতল স্থানে তাপ চালনাব সম্ভাবনা আছে—অর্থাৎ যতদিন বিশ্বে উত্তাপেব অসমতা আছে, ততদিনই বিশ্বে ক্রিয়া সাধ্য হবে, যন্ত্রপাতি চালানো সম্ভব হবে। কিন্তু বিশ্বে ও আমাদেব যন্ত্রপাতিতে ক্রিযা উৎপাদিত হ'য়ে উত্তপ্ত স্থান ক্রমে শীতল হ'যে আসছে। যেদিন বিশ্বে সমস্ত সমান

উত্তাপে পরিণত হবে সেদিন ক্রিয়া ও সৃষ্টি বন্ধ হবে। পক্ষান্তরে আমরা বিনা ক্রিয়ায়—অর্থাৎ বাইরে থেকে ক্রিয়া আনয়ন না ক'রে, যদি শীতল স্থান থেকে তাপকে উত্তপ্ত স্থানে নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে বিশ্বের ক্রিয়া উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু যে কোন বস্তুসমাবেশই ধরা যাক্ না তার উত্তাপ আসছে শীতল হ'য়ে, কাজেই তার ক্রিয়াদানের অক্ষমতা যাচ্ছে বেড়ে; এই বন্ধ্যাত্বের নাম 'এন্ট্রপি'। বিশ্বের শক্তি চির অক্ষুণ্ণ কিন্তু তার বন্ধ্যাত্ব ক্রমশ বর্দ্ধমান।

এই বন্ধ্যাত্ব বা 'এন্ট্রপি' সমষ্টি-গণিতের দ্বিতীয় লক্ষণ। বাস্তবিক সমষ্টি-গণিতের প্রধান অনুসন্ধান দুটি জিনিষ নিয়ে, এক হ'ল বিভিন্ন বস্তুসমাবেশের বন্ধ্যাত্ব নির্ণয় আর এক হ'ল বণ্টনহার নির্ণয়। এ-বিষয়ে অর্থনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা সাদৃশ্য আছে। অর্থনীতিও দুটি জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামায়—একটা অবশ্য বণ্টন, দ্বিতীয় ক্যাপিটাল। ক্যাপিটাল ও এন্ট্রপিতে এই তফাৎ যে প্রথমটিতে বন্ধ্যাত্ব নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে।

গ্যাসের কথা ধরা যাক্। গ্যাসে অণুরা বিচঞ্চল, বস্তুত বিশৃঙ্খল; এ রকম ক্ষেত্রে একস্থান থেকে আর এক স্থানে তাপ পরিচালন বা ক্রিয়া আদায় হতে পারে না। কাজ আদায় করা যেতে পারত যদি সমস্ত অণুর গতিমুখকে একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হ'ত। ম্যাক্সওয়েল্ আর এক উপায় প্রস্তাব করেছিলেন যে, যদি দ্রুতগতি অণুগুলিকে লঘুগতি অণু থেকে পৃথক করা যায় তাহলে দ্রুতগতির দল থেকে লঘুগতিদের দিকে তাপ চালনা করা ও ক্রিয়া আদায় করা সম্ভব। এর জন্য তিনি এক অলৌকিক ক্ষমতাবান জিনকে কল্পনা করলেন যে ফাঁদ পেতে ব'সে থেকে গ্যাসের দ্রুতগতি অণুগুলিকে একটা বিভিন্ন কামরায় আবদ্ধ ক'রে বৈজ্ঞানিকের হাতে এনে দেবে। পদার্থবিদ্যায় ম্যাক্সওয়েলের জিন আরব্যোপন্যাসের জিনের মতই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে,—কিন্তু গল্পে। মোট কথা বস্তুসমাবেশের উচ্ছৃঙ্খলতা কমাবার উপায় নেই; শৃঙ্খলা থাকলে পরে সে অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত হ'য়ে শ্রম বা কাজের প্রকাশ হতে পারে কিন্তু বিশৃঙ্খলা হ'লে আর রক্ষা নেই। আর একটা চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে—যদি এক সেট্ লাল বল ও সাদা বল নিয়ে একটা বাক্সে পুরে ক্রমাগত নাড়া যায় তবে খানিকক্ষণ পরে শাদায় লালে মিশিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত হবে কিন্তু তার পর যতই নাড়া যাক্ না কেন শাদাগুলি ফের একটি একটি ক'রে আলাদা হবে ও লালগুলিও এই রকম ক'রে একত্র হবে এ সম্ভাবনা অতি অল্প। গ্যাসের অণুদের বা ঐ বলদের বিশৃঙ্খলার পরিমাণই হ'ল 'এন্ট্রপি'। ফলে, এন্ট্রপি তাপবিজ্ঞানে ছিল বন্ধ্যাত্ব, সমষ্টিগণিতে তা হ'ল বিশৃঙ্খলা। এ উদাহরণ

থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় কেন বস্তুসমাবেশের বা বিশ্বের 'এন্ট্রপি' বা বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলেছে। বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে বিশ্ব যে আমাদের সুবিধে ক'রে দিয়েছেন তা বড় নয়, তবে বৈজ্ঞানিকদের একটা সুবিধে ক'রে দিয়েছেন যে বিশৃঙ্খলার অবস্থা দেখে তাঁরা বিশ্বের বয়স নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

এতক্ষণ আমরা অণুসমাবেশ ক্ষেত্রে সমষ্টিগণিত প্রয়োগের আলোচনা করছিলাম। আলোক ও বিকীরণের ক্ষেত্রেও এই প্রয়োগ সম্পাদন করবার চেষ্টা হচ্ছিল কিন্তু সম্প্রতিমাত্র এটি সাধিত হয়েছে ও যে উপায়ে সাধিত হয়েছে তারই নাম বস্তুর সমষ্টিগণিত। এখানে এটি বলে রাখা ভাল যে বিকীর্ণ তাপ, রেডিও তরঙ্গ, আলোক ও আলোকাতীত উচ্চ ও নিম্ন স্তর সবই বিকীরণের অন্তর্ভুক্ত। এই আলোক ও বিকীরণকে বিজ্ঞান কিছুকাল আগেই শক্তির নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গরূপের পরিবর্ত্তে শক্তির বিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টিরূপে দেখার আভাস পেয়েছিল। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে দেখলেও তাকে সমষ্টিভাবে দেখবার কোন কৌশল খুঁজে পায় নি। কাজেই বিকীরণকে ব্যষ্টিভাবে দেখাটা বিজ্ঞান প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারে নি। যা হ'ক তার আগে থাকতেই তাপবিজ্ঞানে বিকীরণের ক্ষেত্রে গ্যাসের গতির বণ্টনধারার মত বিকীরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বণ্টনধারা আবিষ্কারের প্রয়াস হ'য়েছিল। বিকীরণের আদর্শ উৎপত্তিস্থল হিসাবে ধরা হয় চারিদিক বন্ধ ছিদ্রহীন উত্তপ্ত খোল বা গহ্বর। এই গহ্বর থেকে বিকীরণ পালাবার পথ পায় না, খোলের দেয়ালে ক্রমাগত ধাক্কা লেগে তার ভেতরেই পরিভ্রমণ করে বেড়াতে থাকে, কতকটা গ্যাসের অণুদের মত। এ রকম বিকীরণকে আদর্শ কৃষ্ণকায় বস্তুর বিকীরণ—black body radiation—বলা হয়, কেননা আদর্শ কৃষ্ণবস্তু তাই যা যতখানি বিকীরণ গ্রহণ ঠিক ততখানি বিক্ষেপ করতে পারে। এই বিকীরণের বণ্টন কি রকম তাই গণনা করবার জন্য উইয়েন, বোলটজ্‌ম্যান, লর্ড রেলে, জিনস্ প্রভৃতি প্রত্যেকে এক-একটা সূত্রের প্রস্তাব ক'রে গেলেন কিন্তু পরীক্ষায় প্রত্যেকবারই দেখা গেল যে সূত্রগুলি অভিজ্ঞতার সঙ্গে সর্ব্বাংশে মেলে না। অবশেষে প্ল্যাঙ্ক যে সূত্র দান করলেন দেখা গেল সেইটাই প্রকৃতক্ষেত্রে হুবহু মেলে। এই সূত্রের পত্তন ক'রতে প্ল্যাঙ্ক যা স্বীকার্য্য বলে মেনে নিলেন তাই হ'চ্ছে শক্তির বিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টিরূপ,—quantum,—যার আমরা অন্যত্র নামকরণ করেছি মাত্রা। মাত্রাবাদ Quantum Theory নামে পরিচিত কিন্তু মাত্রাবাদ বিজ্ঞানে বিপ্লব সৃষ্টি ক'রেছে। আমেরিকা আবিষ্কারের পর যেমন পৃথিবীকে প্রাচীন ও নব্য জগত এই দু'ভাগে ভাগ করা হ'ত তেমনি মাত্রাবাদ বিজ্ঞানকে প্রাচীন ও নব্য দু'ভাগে দ্বিখণ্ডিত করেছে। বস্তু যেমন

অণু দিয়ে গড়া, মূলপদার্থ যেমন ইলেক্‌ট্রণ দিয়ে গড়া—মাত্রাবাদের মূলকথা তেমনি আলোক ও বিকীরণের শক্তিকে মৌলিক উপাদানে গড়া ব'লে বিবেচনা করা। এ মতে শক্তির কমি-বাড়তি হয় ধাপে ধাপে, এই ধাপের মাত্রা হ'ল h-নামা প্ল্যাঙ্কাঙ্ক। শক্তির বৃদ্ধি বা ক্ষয় হবে h-এর পূর্ণ সংখ্যা অনুসারে, ভগ্নাংশ অনুসারে নয় বা অবিরত নয়। এতে প্রচলিত মতের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় কেননা প্রচলিত মতে আলোক ও বিকীরণ তরঙ্গিত গতি, একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। বিশ্বব্যাপী কল্পিত ঈথর তা'র বাহক। মজার কথা ঈথরের কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নেই। তার অবয়ব নেই, ভার নেই, চাপ নেই, গতি নেই। তার স্থিতি থাকলেও অন্ততঃ অন্য নৈসর্গিক বস্তুর সঙ্গে একটা আপেক্ষিক গতি থাকার কথা, কিন্তু মাইকেলসন-মর্লে'র বিখ্যাত পরীক্ষায় তাও কিছু ধরা পড়ল না। বস্তুতঃ আলোক ও বিকীরণই ঈথরের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে ঈথর ও ঈথর-তরঙ্গকে অস্বীকার করাই স্বাভাবিক কিন্তু তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতই স্তূপাকার প্রমাণ যে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পক্ষান্তরে মাত্রাবাদের প্রমাণও কম জড় হয় নি। বিকীরণের বণ্টনহারের কথা ত বলাই হয়েছে; আর একটি প্রমাণ specific heat—তাপশীলতার (তাপ নেওয়া দেওয়ার ক্ষমতা) প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমে। তাপবিজ্ঞান আণবিক কম্পনের হিসাব ধ'রে মৌলিক পদার্থের তাপশীলতার সূত্র আবিষ্কার ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিল কিন্তু তাতেও অনেক ব্যতিক্রম ধরা পড়ল। এ বিপর্য্যয়ে ত্রাণকর্ত্তা হ'ল Quantum Theory। কিন্তু মাত্রার সঙ্গে স্পন্দনের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক অতি সহজ, স্পন্দন সংখ্যাকে h দিয়ে গুণ করলেই স্পন্দনের energy বা শক্তি-পরিমাণ পাওয়া যাবে। এ ছাড়া মাত্রাবাদের আর দুটি প্রমাণের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য,—প্রকৃতপক্ষে এরাই হ'ল দুটি মুখ্য প্রমাণ। প্রথমটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীল্‌স্ বোর কর্ত্তৃক প্রদত্ত। এর আগে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে অণুর গঠনে ইলেক্‌ট্রণের ডিজাইন কতকটা সৌর জগতের মত, কেন্দ্রে তার যোগচিহ্নিত ইলেক্ট্রিসিটি,-প্রোটন ও চতুর্দ্দিকে তার ভ্রাম্যমাণ বিয়োগচিহ্নিত ইলেক্ট্রিসিটি,-ইলেক্‌ট্রণরা। এই মতে হাইড্রোজেনের ডিজাইনের আলোচনা ক'রতে গিয়ে নীল্‌স্ বোর দেখালেন যে হাইড্রোজেনে যে-একটি ভ্রাম্যমাণ ইলেক্‌ট্রণ আছে কয়েকটি বিভিন্ন কক্ষে তার পরিভ্রমণ সম্ভব ;—এ ক্ষেত্রে সৌরজগতের গ্রহের কক্ষের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রণ কক্ষের পার্থক্য। যা হ'ক হাইড্রোজেনের ইলেক্‌ট্রণ কক্ষরা সজ্জিত আছে ধাপে ধাপে। এক ধাপ থেকে উচ্চতর ধাপে যেতে হ'লে ইলেক্‌ট্রণকে পূর্ণমাত্রা শক্তি অর্জ্জন করতে হবে, নিম্নতর ধাপে যেতে হ'লেও পূর্ণমাত্রা শক্তি ব্যয় করতে হবে, ভগ্নমাত্রার উপযুক্ত

কোন কক্ষ নেই। এর প্রমাণ হ'চ্ছে এই যে কেবলমাত্র এই ডিজাইন অনুসারেই হাইড্রোজেনের বর্ণচ্ছত্রের পূর্ণ-ব্যাখ্যা সম্ভব, অন্য উপায়ে অসম্ভব। ইলেক্‌ট্রণ উপরোক্ত উপায়ে নিম্নতর ধাপের কক্ষে নামবার সময় যে শক্তি ত্যাগ করে তাই আলোকরূপে বিকীর্ণ হয়, অর্থাৎ এ আলোক-শক্তি পূর্ণমাত্রার। তেমনি আলোক বা বিকীরণ থেকে শক্তি-মাত্রাকে পূরাপূরি গ্রহণ না ক'রে ইলেক্‌ট্রণ উচ্চতর কক্ষে উঠে যেতে পারে না। দ্বিতীয় যে প্রমাণের কথা আমরা উল্লেখ ক'রেছি তা' আইনষ্টাইন-দ্বারা ব্যাখ্যাত। এর নাম photo-electric effect, দেখা গিয়েছিল যে কয়েকটি ধাতুগাত্রে আলোকসম্পাত হ'লে তা থেকে ইলেক্‌ট্রণ বিচ্ছুরিত হয় কিন্তু বর্ণচ্ছত্রের একটি বিশেষ বর্ণের নীচের বর্ণ দিয়ে হয় না। প্রকৃতকারণ নীচবর্ণের শক্তিমাত্রা—অর্থাৎ তার স্পন্দনসংখ্যার গুণিতক h—ইলেক্‌ট্রণকে পূর্ণমাত্রা ধাক্কা দেবার উপযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যদি ইলেক্‌ট্রণ মাত্রাক্রমে না হ'যে ক্রমশ শক্তি অর্জ্জন করতে সক্ষম হ'ত তাহ'লে নীচবর্ণের অধিকক্ষণ ব্যাপী আলোকসম্পাতে নিশ্চয় বিচ্ছুরিত হবার উপযুক্ত ধাক্কা অর্জ্জন করত। এ ছাড়া আলোকের তীব্রতার ওপরও ইলেক্‌ট্রণ বিচ্ছুরণ নির্ভর করে না, এটাও আলোকের শক্তি-মাত্রার সাক্ষাৎ প্রমাণ। এ-প্রসঙ্গে আর একটু বলা দরকার যে অতি সম্প্রতি প্রচারিত, ডি-ব্রোগলীর তরঙ্গ-তত্ত্ব মাত্রাবাদকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। মাত্রাবাদ যেমন তরঙ্গকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করেছে, ডি-ব্রোগলীর তরঙ্গ-তত্ত্ব তেমনি ব্যষ্টিকে যথা ইলেক্‌ট্রণ, অণু পরমাণুকে, তরঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজ্ঞানের এ নব-অধ্যায়ের নাম তরঙ্গগণিত। এখানেও সাক্ষাৎ প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে; ইলেক্‌ট্রণ, অণু পরমাণুর তরঙ্গধর্ম্মের ফটোগ্রাফ এখন প্রত্যেক বীক্ষণাগারেই গৃহীত হচ্ছে। বলা বাহুল্য এখানেও তরঙ্গের কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই, এমন কি কোন বাহকও নাই, আছে শুধু মাত্রার সঙ্গে স্পন্দন-সংখ্যার সেই পূর্ব্ব সম্পর্ক। আপেক্ষিক-গণিতের মতে ইলেক্‌ট্রণ প্রভৃতির বস্তুমান (mass) তার স্বকীয় শক্তি-মান (energy) হ'তে অভিন্ন; আর শক্তি থেকে স্পন্দন-সংখ্যায় আসতে হ'লে শুধু 'h' দিয়ে ভাগ দেওয়া দরকার। অর্থাৎ বস্তুমান জানা থাকলে তার স্পন্দন-সখ্যাও (frequency) অবলীলাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হয়।

আলোক ও বিকীরণের ব্যষ্টি-ভাব সম্বন্ধে আমরা বোধ হয় যথেষ্ট আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রধান কথা হ'চ্ছে এই ব্যষ্টিকে স্বীকার করলেও বা নানারকম ভাবে নাড়াচাড়া করলেও কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বিজ্ঞান একে সমষ্টির হিসাবে দেখতে সক্ষম হয় নি, অথচ বোধ করি আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পেরেছি যে এ হিসাবে না

দেখতে পাবলে কোন কিছুকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণেব পূর্ণ সার্থকতা নেই। ব্যষ্টিব সমূহকে সমষ্টির গণিতে না গণনা কবতে পাবলে সে ব্যষ্টি বিজ্ঞানে সম্মানেব পংক্তি পাবাব যোগ্য হয় না। তাই যদিও প্ল্যাঙ্ক ও আইনষ্টাইন আলোক ও বিকীরণকে ব্যষ্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন তবু তাব প্রতি সমষ্টিগণিতেব প্রযোগকৌশলেব অভাবে তা সম্পূর্ণতা লাভ কবে নি। সমষ্টিৰূপে ব্যবহাব কবলেন সর্ব্বপ্রথমে প্রফেসাব বসু। এই পদ্ধতিই বিজ্ঞানে বসুব সমষ্টিগণিত নামে প্রসিদ্ধ। এ নিয়োগেবও অনুসন্ধান সমষ্টিগণিতেব সেই পুবাতন অনুসন্ধান, অর্থাৎ বণ্টনহাব ও "এণ্ট্রপি"। প্ল্যাঙ্ক যে বণ্টনহাব নির্ণয় কবেছিলেন তা কার্য্যতঃ ঠিক কিন্তু তাঁর পদ্ধতি ছিল সমষ্টিব হিসাবসিদ্ধ নয়, ববং প্রাচীনগণিতেব মতে। আইনষ্টাইন তা থেকে একটু উন্নত উপায় অবলম্বন কবেছিলেন কিন্তু তাও প্রাচীন গণিতেবই অন্তর্ভুক্ত। বসুব পদ্ধতি হ'ল কতকটা এইৰূপ :— বিকীবণেব 'টাল'—momentum—আছে একথা ম্যাক্সওযেলেব সময় থেকে জানা ছিল। একটা কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে যদি উপযুক্ত দৈর্ঘ্য দিয়ে এই টালেব বিভিন্ন পবিমাণকে জ্ঞাপন কবা যায় তবে একটা নির্দ্দিষ্ট পবিমাণেব টালেব পবিজ্ঞাপক হয় একটা গোলক যাব ব্যাসার্দ্ধ ঐ পবিমাণেব সমান। গোলকেব আযতন তিন —three dimensional—অথবা বলা যেতে পাবে টালেব স্বাধীনতা বা অধিকাব তিন প্রস্ত। স্পন্দনেব টাল ছাডা তাব অবস্থিতিও ত্রয়ায-তনিক অর্থাৎ প্রতিস্পন্দনেব অবস্থিতি ও টাল নিয়ে ছয প্রস্ত স্বাধীনতা আছে। ছয় প্রস্ত স্বাধীনতা বলাও যা ছ'টি আয়তন বলাও তাই; তবে ছ'টি আয়তন হযত একটু কাল্পনিক ব্যাপাব, কেননা আমাদেব প্রত্যক্ষ-গোচব জ্যামিতিব মোটে তিনটি আয়তন। যাই হ'ক ছ'টি আয়তন ধ'রে একটা উত্তব-জ্যামিতি বচনা কবা যেতে পাবে ও উত্তব-জ্যামিতিক ষডায়-তনিক ক্ষেত্রে টাল ও অবস্থিতি মিলিয়ে ছ'টি আযতনযুক্ত একটা পবিবেষ্টন কল্পনা কবা যেতে পাবে; আরও কল্পনা কবা যেতে পাবে যে এই ষডায়তনিক পবিবেষ্টন প্রাথমিক কোষ দিয়ে গডা,—যাব মাপ হ'ল 'h^3'। তা' হ'লে মনে কবা যেতে পাবে যে এই কোষগুলি দিয়ে গডা ঐ পবি-বেষ্টনটি স্পন্দনেব লীলাক্ষেত্র। এখন সম্ভাবনামিতি প্রয়োগ কবে দেখা যেতে পাবে কোষে স্পন্দনগুলি কি ভাবে বণ্টন কবা আছে। কিন্তু বসুর হিসাব সাধাবণ হিসাব থেকে পৃথক। প্রচলিত বীতিতে দেখা হ প্রত্যেক ব্যষ্টি কতগুলি অবস্থায় থাকতে পাবে,—বসুব হিসাব প্রত্যেক অবস্থা কতগুলি ব্যষ্টিৰূপ ধারণ কবতে পারে। বসুব হিসাবে অনায়াসেই প্ল্যাঙ্কেব বণ্টন-সূত্রে এসে পৌছান যায়। এই থেকে মাত্রাবাদ সিদ্ধিলাভ কবে।

বস্থর সমষ্টি-গণিত প্রচাবিত হয ১৯২৪ অব্দে ; ম্যাক্সওয়েল, বোল্টজ্‌ম্যান প্রভৃতিব পব এই থেকে সমষ্টিগণিতেব নবীন জীবন স্থরু হয। তখন সবে ডি-ব্রোগলীব তবঙ্গগণিত প্রচলিত হযেছে। আইনষ্টাইন প্রস্তাব ক'বলেন যে বস্তুব যখন তবঙ্গ-ধর্ম্ম আছে তখন তবঙ্গেব এই নব্য সমষ্টিগণিত বস্তু-সমাবেশ-ক্ষেত্রেও—যথা গ্যাসে,—প্রযোজ্য। আইনষ্টাইনেব এই প্রযোগেব নাম বস্থ-আইনষ্টাইন-গণিত। সাধাবণ অবস্থায প্রাচীন সমষ্টিগণিতই গ্যাসেব পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু মহাশূন্যেব কাছাকাছি হ'লে গ্যাসেব degeneration,—আচবণে ব্যতয় হয। তখন প্রাচীন গণিত অচল, তখন বস্থ-আইনষ্টাইন গণিত প্রযোগ কবা বিধেয। অধুনা ফার্মি ও ডিবাক দেখিয়েছেন যে বস্তু-সমাবেশ-ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ ক'বলে একটু ত্রুটি থাকা সম্ভব কেন না বস্তুতে বস্তুতে আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে যা' তবঙ্গে বা মাত্রায নেই। এ কাবণ একটু 'ছাড' দিতে হয (exclusion principle)। ফার্মি-ডিবাকেব সমষ্টি-গণিত ধাতুব ইলেক্‌ট্রিক্ প্রবাহেব ব্যাখ্যায ও ইলেক্‌ট্রণ-গ্যাসেব আচবণে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হযেছে। আমবা কযেকটি প্রধান ক্ষেত্রেই সমষ্টিগণিতেব প্রয়োগ আলোচনা ক'বলুম ; কিন্তু আসলে ওই গণিতেব প্রযোগ ও কার্য্যকাবিতা অত্যন্ত ব্যাপক। এই প্রবন্ধ লেখবাব সময় মিঃ গোপাল আয়েঙ্গাব সমষ্টিগণিতেব একটা সার্ব্বভৌমিকসূত্র—generalised formula—প্রস্তাবিত ক'বেছেন।

বিজ্ঞানেব কোন পাকা গণনা বা সিদ্ধান্তেব একটি লক্ষণ হ'ল এই যে বিভিন্ন পংক্তি থেকে বিভিন্ন উপায়ে সেই গণনায পৌছান যায়। ডি-ব্রোগ্‌লীব তবঙ্গগণিত থেকে momentum cell h^3-এ পৌছানো গেছে। সম্প্রতি Lindemann নামে একজন বৈজ্ঞানিক অনিশ্চয় বিধি—uncertainty principle থেকে বস্থব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

শ্রীগিবিজাপতি ভট্টাচার্য্য

এই প্রবন্ধ রচনায প্রফেসার মেঘনাথ সাহার নব্য প্রকাশিত Text Book of Heat-এর সাহায্য নেওয়া হযেছে।

রুটির দেশ

(নেভেবফ্ হইতে)

প্রথমে গেলেন ঠাকুবদা, তাবপব ঠাক্‌মা—সবশেষে বাবা। বাকি বইল মিস্‌কা, তাব মা, আব ছোট ছুটি ভাই। সব চাইতে ছোট যে তাব বয়স চাব, তাব আগেবটিব আট, আব মিস্‌কাব নিজেব বয়স বাবো। এইতো সব বয়স, কি কাজই বা এবা কববে? শুধু মাঝে মাঝে চাবটি ভিক্ষে কবা আব ছুবি দিয়ে কাঠেব টুক্‌বো খুদে নানাবকমেব খেলনা তৈবি কবা—এ ছাড়া আব কিছুই তাবা শেখেনি। তাদেব মা না খেয়ে খেয়ে এমনি কাহিল হ'য়ে পড়েছেন যে একবাব জল আনতে নদীতে গেলে ফিববাব শক্তি আব থাকে না। তাবা সাবাদিনই কেবল কাঁদে, কিন্তু তাতে লাভ কি? ছুর্ভিক্ষেব তো আব মায়া দয়া নাই। প্রথমে তাবা একজনকে গোব দিয়ে এল, তাব পবে একসঙ্গে একেবাবে ছুজনকে। এমনি কব্‌তে কর্‌তে মিখাইলো খুড়ো গেলেন। মেবিনা খুডিই বা কি কবেন? ছু'দিন যেতে না যেতে তিনিও পিছু নিলেন। ঘবে ঘবে সবাই প্রস্তুত হচ্ছে, কবে যমেব ডাক আস্‌বে। কিছুদিন আগে যাহ'ক্ ঘোডা গোরু-গুলো ছিল, লোকেব পেট ভবাতে সেগুলো সব শেষ হ'য়ে গেছে, বাকি শুধু কুকুব বেড়াল, ক্ষিদেব জ্বালায় লোকে সেগুলোকেই তাড়া ক'বে বেডাচ্ছে।

মিস্‌কা কেবলই ভাবে। এতবড় পবিবাব, কাজ কববাব লোক একেবাবেই নাই বল্‌লে চলে। যদি কেউ কিছু কব্‌তে পাবে সে মিস্‌কা নিজে। মবাব আগে বাবা ব'লে গিয়েছিলেন, 'এদেব সবাব ভাব তোকেই নিতে হবে, মিস্‌কা।'

মিস্‌কা পথে বেবিয়ে পড়ল। চাষাবা সবাই বল্‌ছে ট্যাশ্‌কেণ্টেব কথা। কি সস্তাই না সেখানে রুটি, যাওয়া একটু মুস্কিল বটে, কিন্তু একবাব কোনো বকমে পৌঁছতে পাবলে আব কথা নেই। যেতে পাঁচশো মাইল আব আসতে পাঁচশো—মোট হাজাব। টাকা না হ'লে অসম্ভব—টিকিটেব দাম আছে তো, তা ছাডা ছাড়-পত্র চাই, তাতেও আবাব টাকা লাগে।

মিস্‌কা খানিকক্ষণ চুপ ক'বে শুন্‌ল, তাবপব জিজ্ঞাসা কব্‌ল, 'আচ্ছা, ছোট ছেলেবা সেখানে যেতে পারে?'

'কেন, তুমি চাও নাকি সেখানে যেতে?'

'কেনই বা চাব না? রেলে উঠে এক কোণে লুকিয়ে ব'সে থাকব, কেউ দেখতে পাবে না।'

চাষারা সবাই হেসে উঠ্‌ল।

'না, মিস্‌কা, তুমি বাড়িতেই থাকো। তোমার মতো যারা ছোট, তারা একবার গেলে আর ফেরে না। আরো পাঁচ বছর বড় হ'য়ে নাও, তারপর যেও।'

মিস্‌কার মন কিন্তু এতে সায় দেয় না, অত ভয়টয় তার নেই। সে কেবল ট্যাশ্‌কেণ্টের স্বপ্ন দেখে—রুটির দেশ ট্যাশ্‌কেণ্ট।

আর নিজেই সে নিজেকে বোঝায়ঃ

'একবার চেষ্টা করেই দেখোনা বাপু, তুমি তো আর কচি খুকী নও। মাগ্‌না কেউ খেতে দেবে না, সেই মজুরি কর্‌তেই হবে। এই তো বাবা যাওয়ার পর সারা গ্রীষ্মকাল লাঙল চষ্‌লে। ছোট কেবল বয়সেই, কিন্তু যা খাটো জোয়ান লোকেরও তা সাধ্যি নেই।'

মিস্‌কা আবার খুব ক'রে ভাবে।

রুটির দেশ—ঘুরে-ফিরে তার কেবল এই কথাই মনে পড়ে। সে ক্রমাগত হিসাব করে—পাঁচশো মাইল—এমন কি আর দূর? অবিশ্যি হেঁটে গেলে অনেকটা পথ, কিন্তু একবার রেলগাড়িতে চেপে বস্‌লে ঠিক তিন দিন। আর ছাড়-পত্র না হ'লেও চলে। এ রকম ছোট্ট একটি ছেলে দেখ্‌লে সবাই বল্‌বেঃ

'আরে, ওকে কিছু বোলো না—ও হ'ল মিস্‌কা। দেখ্‌ছনা? না খেয়ে খেয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কতই বা ওর ওজন? সবশুদ্ধ বড় জোর—এই পোয়াটেক!'

যদি নিতান্তই গাড়ির থেকে নামিয়ে দেয় তাহলে সে দিন-দুই ছাদের উপর থাক্‌তে পারে। কাকের বাসা পাড়ার জন্যে সে কতবার গাছে উঠেছে, গাড়ির ছাদে ওঠার চেয়ে তা ঢের শক্ত, কিন্তু তবু সে কখনো পড়েনি।

হঠাৎ তার চোখে পড়্‌ল তার মাতব্বর বন্ধু সেরেজ্‌কা কারপুখিন, তার চাইতেও এক বছরের ছোট। বন্ধুকে দেখে তার কি স্ফূর্ত্তি! সে চেঁচিয়ে বল্‌লঃ

'ওরে! চল্‌, যাই।'

'কোথায়?'

'ট্যাশ্‌কেণ্টে। রুটির জোগাড়ে। দুজনে যাওয়াই ভালো। তোর কিছু হ'লে আমি আছি, আমার কিছু হ'লে তুই আছিস্‌। এখানে তো আর কিছু জুট্‌ছে না।'

সেরেজ্‌কার তো প্রথমে বিশ্বাসই হ'ল না।

'যদি বৃষ্টি হয়?'

'গরম কালে বৃষ্টিই তো ভালো, বেড়ে আরাম হবে।'

'যদি সেপাইরা তাড়িয়ে দেয় ?'

'আরে, সেপাইদের চোখ এড়ানো কিছু শক্ত না।'

সেরেজ্‌কা তবু ঠিক ক'রে উঠতে পার্‌ল না। সে বেশ খানিকটা নাক খুঁটে বল্‌ল ঃ

'না, মিস্‌কা, সেখানে কোনোকালে পৌছতে পার্‌ব না।'

মিস্‌কার ইচ্ছে হ'ল তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে খায়। সে বল্‌ল ঃ

'অবিশ্যি পৌছব ! তবে, ভয় পেলে চল্‌বে না। লাল পল্‌টন তো এখন সর্ব্বত্র।' তারা কিছু বল্‌বে না। বরঞ্চ আমরা উপোস ক'রে আছি জান্‌তে পেলে তারা আমাদের খেতে দেবে।'

'আমরা যে বড্ড ছেলেমানুষ—আমাদের ভয় কর্‌বে।'

তারা যে মোটেই ছেলেমানুষ নয়, মিস্‌কা এই কথা নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আরম্ভ কর্‌ল। না হয় সেরেজ্‌কা বয়সে তার চাইতে ছোট, তাতে কি ? মিস্‌কাই সব কর্‌বে—ট্রেণে জায়গা ক'রে বসা, ভিক্ষা ক'রে খাবার জোগাড় করা। হাজার হ'লেও কচি খুকী তো আর তারা নয়। যদি কিছু একটা নাহয় ঘটেই, তাতে দম্‌বে কেন ? নাহয় ট্রেণ থেকেই নামিয়ে দেবে, কুছ্‌ পরোয়া নেই, যতক্ষণ দুজনে একসঙ্গে আছে ভয় কি ? রাতটা তো ঘুমিয়ে কাটানো যাবে, সকালে উঠে না হয় একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে, তারপর যেই দেখ্‌বে কেউ দেখ্‌ছে না, এম্‌নি আবার স্থড়ুৎ ক'রে ঢুকে বস্‌বে।

সেরেজ্‌কা জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'ফিরব কবে ?'

'শীগ্‌গিরই। বড় জোর যেতে চার দিন, আসতে চার দিন। সের দশেক রুটির জোগাড় হ'লেই হ'ল—বেশি বোঝা না হওয়াই ভালো।'

'আমি তো আধ মণ আনব।'

'অত দরকার নেই। বেশি দেখলে আবার কেড়ে নেবে। বরঞ্চ পথটা জানা হ'য়ে গেলে, আরেকবার গেলেই হবে।'

'তাহলে চল্‌, মিস্‌কা, যাওয়াই যাক্‌। কাউকে কিন্তু কিছু বলা হবে না।'

'বেশ।'

'শুধু জানো তুমি, আর জানি আমি, আর কেউ না। কষ্টিয়া, ভ্যান্‌কা, এরা সবাই শুন্‌লেই যেতে চাইবে, কিন্তু ওরা বড ভীতু, ওরা থাকলে বেশি দূর যাওয়া হবে না।'

'তোর তো আর ভয় করছে না ?'

'আমি কখ্‌খনো ভয় পাই না। জানো, আমি দুপুব বাতে একলা গোবস্থান ঘুবে আসি।'

* * * * * *

মাঠেব মধ্যে সব চুপচাপ। নীল আকাশে পাখীবা গান কব্‌ছে। নীচে, টেলিগ্রাফেব তাবগুলোতে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে, আব খুঁটিগুলো একটাব পব একটা দূবে মিলিযে গেছে। এই খুঁটিগুলোব ঠিক পবেই ষ্টেশন, সেখানে একটা ট্রেণ দাঁড়িযে। মিস্‌কা এব আগে দুবাব ট্রেণ দেখেছে—তাব বাবাব সঙ্গে সামাবা যাবাব সময। অদ্ভুত ব্যাপাব! কি বকম গুটিগুটি এগিয়ে চলে, আব কি ধোঁয়া, আব কি জোব বাঁশি!

মিস্‌কা তাব বাবাব কোট্‌ প'বে আব বাবাব ছড়ি ঘুবাতে ঘুবাতে চলেছে। কোট্‌টাব সঙ্গে আবাব একটা পল্টনেব কোমববন্ধ। তাব পিঠেব উপব মস্ত একটা বোচ্‌কা ঝুলছে। এই বোচ্‌কাব মধ্যে বযেছে লাল বঙেব ছোট্ট একটা ব্যাগ, তাব মা'ব পোষাক ছিঁড়ে এই ব্যাগ তৈবি হযেছে। ব্যাগটাব মধ্যে বয়েছে একটা টিনেব গেলাস, ন্যাকড়ায় বাঁধা খানিকটা নুন, ঘাসেব রুটি এক টুকবো, আব তাব ঠাকুমাব একটা পুবোণো ঘাগ্‌বা। সহরে গিযে এই ঘাগ্‌বাটা সে বেচ্‌বে।

মিস্‌কাব পাশে পাশে চলেছে সেবেজ্‌কা। তাব পিঠের উপব এক জোড়া চটিজুতো আব তার ঠাকুমাব পাযেব গুটিকয় লম্বা লম্বা মোজা ঝুলছে। চটিগুলোব সঙ্গে দুটো ব্যাগ এক সঙ্গে গোল ক'বে বাঁধা বয়েছে।

দুটি বন্ধু চল্‌তে চল্‌তে প্রতিজ্ঞা কব্‌ল যে, যাই হোক, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। যদি একজনেব অসুখ হয়, আরেকজন দেখ্‌বে। এক-জন কিছু পেলে, দুজনে তা ভাগ ক'বে নেবে।

ছোট্ট ষ্টেশনটা চোখে পডতেই সেবেজ্‌কা বল্‌ল:

'ঐ দেখো, মিস্‌কা, কি বকম ধোঁযা। ঐ কি আমাদের ট্রেণ নাকি?'

মিস্‌কা বল্‌ল: 'এখন সব ট্রেণই আমাদেব, একটাতে চ'ড়ে বসতে পাবলেই হ'ল।'

ছোট একটা পাহাড়েব উপব ব'সে তাবা বিশ্রাম কব্‌ছে। নুন-বাঁধা ন্যাকডাব পুঁটুলিগুলো খুলে তাবা ঘাসেব উপব বেখেছে। সেবেজ্‌কা বল্‌ল:

'তোমাব চাইতে আমাব বেশি নুন আছে।'

'কিন্তু রুটি আছে তো?'

'মা চাবটে আলু দিছ্‌লেন।'

'শুধু আলুতে কি হয়—একটু রুটিও চাই।'

'কিন্তু আমার তো রুটি নাই।'

মিস্কার মুখ গম্ভীর হ'ল। তার ব্যাগে এক চাক্‌লা ঘাসের রুটি আছে। যদি সেরেজ্‌কারও থাক্‌ত বেশ হ'ত। দুজনেরই তাহলে সব সমান সমান থাকত। কিন্তু এখন মিস্কার ভাগ থেকে খানিকটা দিতে হবে—বাকি যা থাক্‌বে তা কতটুকুই বা. তিন কামড় খেলেই অর্দ্ধেকটা কাবার।

'এক টুকরো রুটি আনতে কি হয়েছিল?'

সেরেজ্‌কা উপুড় হ'য়ে শুয়ে একটা ঘাসের কুটো চুষ্‌ছে। তার চোখ ছল ছল কর্‌ছে আর থেকে থেকে তার ঠোঁট কাঁপছে। গ্রামের দিকে তাকিয়ে সে দেখল গীর্জ্জার চূড়ো আর দেখা যাচ্ছে না, এখন যদি ফেরা যায় তাহলে সন্ধ্যা লাগাৎও পৌঁছতে পার্‌বে না।

সঙ্গীর জন্যে মিস্কার ভারি দুঃখ হ'ল। তার মনে পড়ল তারা চুক্তি করেছিল দরকার হ'লে পরস্পরকে সাহায্য করবে। এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে সেরেজ্‌কার হাতে দিয়ে সে বল্‌ল:

'এই নাও। নাহয় ষ্টেশনে পৌঁছে আবার শোধ ক'রে দিও। এক টুকরো রুটির জন্যে তো আমার ভারি।'

সেরেজ্‌কার মুখে কথা নাই। তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, পেলে পরে সে অমন আধ সের রুটি খেয়ে ফেলতে পারে, আর মিস্কা তাকে দিল কিনা ছোট্ট এক টুক্‌রো। যদি ষ্টেশনে কেউ কিছু না দেয়, তাহলে একেবারে সেই পরদিন সকাল—হয়তো বিকেল—পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সে আবার গ্রামের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

সকালবেলায় ট্যাশ্‌কেণ্টের গাড়ি ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। মিস্কা সেরেজ্‌কাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল, সে বেচারি তো ভয়ে যায়। কোনো-রকমে গাড়ির তলা দিয়ে হামাগুড়ি মেরে তারা চলেছে, মাঝে মাঝে চাকায় মাথা ঠুকে যাচ্ছে।

'তাড়াতাড়ি চল্।'

গাড়ির দরজাগুলো কি ভীষণ উঁচুতে, কিছুতেই তারা লাগাল পাচ্ছে না, ধরবার মতো একটাও কিছু নাই যে বেয়ে উঠ্‌বে।

'একটু উঠিয়ে নাওনা আমাদের।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে? দুবার দুবার মিস্কা সারা ট্রেণের দুই পাশটা ঘুরে এসেছে, কিন্তু কেউ তাদের একটু সাহায্য কর্‌তে চায় না।

চাষারা সব বাফারগুলোর উপর ঘোড়ায় চড়ার মতন ক'রে ব'সে—এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত। বুড়ী, ছুঁড়ী, কেউ আর বাদ নাই, সবাই ঠিক ছেলেদের মতন পা ছড়িয়ে ব'সে। তাহলে ওখানে ওঠা যেতে পারে।

বাস্! আর কথাটি নাই। মিস্কা এক লাফে একটা বাফারের উপর চ'ড়ে ব'সে ডাকতে সুরু ক'রে দিল ঃ

'এই, ওঠ্।'

সেরেজ্কা উঠ্তে চায় না।

'এই তো, আমার হাত ধ'রে উঠে আয় না।'

'পড়ে যাব।'

মিস্কার সত্যি ভারি রাগ হ'ল। দাঁত খিঁচিয়ে সে বল্ল ঃ 'শক্ত ক'রে ধর্।'

সেরেজ্কা দুই হাতে বাফারের মাথা শক্ত ক'রে চেপে ধর্ল, ওপরে তাকিয়ে দেখ্তে তার সাহস হচ্ছিল না।

'ওখানে যে পিষে যাব।'

একটা পরদার আড়ালে একটা সেপাই চেঁচিয়ে চাষাদের বল্ছিল ঃ

'এখান থেকে সব স'রে পড়ো।'

সেরে্কা ভয়ে কাঁপছে, তার অবস্থা সঙ্গীন। 'ওরে, বাবা!'

'আরে চুপ! আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। কাশিস্ না।'

'কিছুতেই থাকতে পার্ছি না, হাত ফসকে যাচ্ছে।'

'চুপ! চুপ!'

'মিস্কা, আমি পড়ে যাচ্ছি।'

মিস্কা আর রাগ সাম্লাতে পার্ল না।

'যাঃ! পড়ে মর্। আমি একলাই যাব।'

সেরেজকার মুখে কথা নাই। একটা সেপাই হঠাৎ তার মাথাটা দেখ্তে পেল।

'ওখানে কে?'

সর্ব্বনাশ! এবার আর রক্ষে নেই।

'স'রে পড়ো বল্ছি।'

কি আর করা যায়? নামতেই হবে, তা না হ'লে একটা কৈফিয়ৎ চাই। মিস্কা সেপাইকে সব কথা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা কর্ল।

'ও আমাদেরই গ্রামের ছেলে, আমার সঙ্গে যাচ্ছে।'

'তুমি আবার কে?'

'আমার নাম লোপাটিন্স্ক্, বাড়ি বুজুলুক জিলায়। ট্যাশ্কেন্টে যাচ্ছি রুটির জোগাড়ে।'

"কই, তোমার ছাড়-পত্র কই?"

পিছন থেকে আর সব সেপাইরা চীৎকার ক'রে বল্ল ঃ

'ওদের একেবারে পুলিশের হাতে দিয়ে দাও।'

মিস্‌কার তো একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম। পুলিশের হাতে! তাহলেই হয়েছে আর কি। এদিকে সেরেজকা প্রায় আধমরা। সেপাইটা তার হাত ধ'রে এমন হেঁচকা টান দিল যে ঘাড় থেকে প্রায় ছিঁড়ে আসে আর কি।

'এই দুটো ক্ষুদে বদ্‌মাসের জ্বালায় ট্রেণ চলাচল যে বন্ধ হ'ল।'

এই তো। রুটির লোভে ট্যাশ্‌কেণ্ট যেতে গিয়ে শেষকালে কিনা পুলিশের হাতে? আর পুলিশের লোকদের তো জানাই আছে, একবার রাগে পেলে দোষী প্রমাণ করতে তাদের কতক্ষণ? চাষাদের কাছে পুলিশের লোকদের সম্বন্ধে এই ধরণের কত কথাই সে শুনেছে, ভুলেও কেউ কখনো বলে না যে পুলিশের লোক ভালো হয়। সেপাইটাকে ঘুষ দিয়েও যদি ছাড়া পাওয়া যেত, কিন্তু কি করবে, একটি পয়সাও সঙ্গে নাই। কাঁদাকাটির ভাণ ক'রেই বা কি হবে, লোকটা সব ধ'রে ফেলবে। এদিকে ট্রেণ তো ছাড়ে ছাড়ে। মিস্‌কার মাথায় নানা ফন্দী আস্‌ছে, কিন্তু একটাও জুৎসই নয়। হঠাৎ সেরেজ্‌কাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে সে ভাব্‌ল একটু চালবাজি করা যাক।

'কাঁদছিস্ কেন? কচি খোকা নাকি? এরা তো আর আমাদের জেলে দেবে না, কোত্থেকে এসেছি জান্‌তে পারলেই ছেড়ে দেবে।'

তারপর সেপাইটার দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি ক'রে মিস্‌কা বলল: 'কেন আমাদের সঙ্গে এরকম করছ? জানোই তো যেখানেই একটু সুবিধে পাই সেখানেই আমরা ঢুকে পড়ি—অত আইনকানুন কি আমরা বুঝি?'

সেপাইটা কোনো উত্তর দিল না।

'লক্ষ্মী, আমাদের যেতে দাও না, আমরা একেবারে উপোস ক'রে আছি।'

'আজ ভাগো, কালকের ট্রেণে যেও।'

মিস্‌কা ভাব্‌ছে কি ক'রে লোকটার চোখে ধূলো দেওয়া যায়।

'ঐ দেখো, একজন চাষা উঠেছে।'

'কই?'

'ঐ তো, ঐ মালগাড়িটার পেছনে।'

সেপাইটা তাকিয়ে দেখল। তাদের কি কপাল, সত্যি একদল চাষী মেয়ে একটা গাড়িতে উঠে বসেছিল।

'এখান থেকে পালিও না কিন্তু।'

মিস্‌কার স্ফূর্ত্তি আর ধরে না, সেপাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে সেরেজ্‌কাকে বলল:

'তাহলে এখানেই থাকা যাক্। সারাক্ষণ আমাদের আগ্‌লাবার

মতো সময় কি আব সেপাইব আছে ?'

সেপাই মেয়েগুলোকে তাড়া ক'বে গেল—এদিক একেবাবে খালি, কোথাও কাবো চিহ্নটি নাই। এই তো চাই। মিস্‌কা সটান বোচকাটা কাঁধে তুলে চুপি চুপি সেবেজ্‌কাকে বল্‌ল ঃ 'কাঁদিস্ না, এই নে, আমাব হাত ধব্।'

তাবপব একদৌড়ে তাবা ষ্টেশনেব পেছনে হাজিব। সেখানে গোযালঘবেব পাশে জাযগায জাযগায সব গোববেব স্তূপ। তাবই উপব হোঁচট খেতে খেতে একটা জলেব কলেব পাশ দিযে তাবা ট্রেণটাব একপ্রান্তে পৌছেই মালগাড়ীগুলোব তলায ঢুকল, তাবপব হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল।

মিস্‌কা হঠাৎ হাতটা শুঁকে থুথু ফেল্‌ল।

'কে যেন এখানে মযলা ক'বে বেখেছে—আব জাযগা পাযনি, ব্যাটাব ছেলে। কিবে, তোব গাযে-টাযে লাগেনি তো ?'

'হ্যাঁ, লেগেছে।'

'বলিস্ কি ? আমাকে ছুঁস্‌নে তাহলে।'

দুজনে তাকিয়ে দেখ্‌ল—কোথাও একটি জনপ্রাণী নাই। ব্যাপাব কি ? দূবে লোকেব গলাব আওযাজ শোনা যাচ্ছে।

'সেবেজ্‌কা, এখানে তো আব হামাগুড়ি দেওযা চল্‌বে না।'

তাবা গিয়ে আবেকদিকে উঠ্‌ল—একবাবে ইঞ্জিনেব কাছে।

'দেখেছিস্ কোথায এসেছি ?'

চাষাবা স্ত্রী-পুরুষ সব ইঞ্জিনে উঠ্‌ছে।

'হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠিস্ না কিন্তু।'

মিস্‌কা তাব সঙ্গীকে ঠেলে তুল্‌ল।

'উঠে পড্।'

'আব তুমি ?'

'উঠে পড্ বল্‌ছি—ফাজ্‌লামি কব্‌তে হবে না।'

মিস্‌কা হ'ল দলপতি। তর্ক ক'বে লাভ নাই। সেবেজ্‌কা কোনোবকমে ইঞ্জিন বেযে তো উঠ্‌ল, কিন্তু কোথায যে ঢুক্‌বে ঠিক কব্‌তে পাবল না। একটা জাযগা ছুঁযে দেখল বেজায় গবম।

'মিস্‌কা, এটা বুঝি বযলাব।'

'চুপ! চুপ!'

হঠাৎ ঠিক মাথাব উপব ভীষণ জোবে বাঁশি বেজে উঠল—কানেব পবদা প্রায ছেঁড়ে আব কি! ট্রেণটা সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড লাফ দিল। তাবপব পাযেব তলায় শুধু খটাং খটাং শব্দ।

* * * *

ষ্টেশনের পিছনে মেলা উনুন। সবগুলো থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেঁয়াজের আর ফুটন্ত আলুর গন্ধ।

একটার পর একটা ট্রেণ আসে আর যায়। যাদের কপাল ভালো কেউ রাফারে, কেউরা ছাদে বসবার জায়গা ক'রে নিচ্ছে। যাদের কপাল মন্দ তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ষ্টেশনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিকারঘোরে ছট্‌ফট্ করছে। ছোট ছেলেদের আঁকড়ে ধ'রে মা'রা কাঁদছে, বুকে দুধ একবিন্দু নাই যে তাদের মুখে দেবে।

মিস্‌কা ও সেরেজ্‌কা কার একটা উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে। মিস্‌কা একটা কাঠি দিয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলোকে মাঝে মাঝে নাড়্‌ছে। বিশ্রী নোংরা একজন চাষী মেয়ে চীৎকার ক'রে বল্‌ল ঃ

'বলি, যমে কি নেয় না? এই সব হতভাগাদের আর শেষ নাই। একেবারে তিতিবিরক্ত হ'য়ে গেলাম।'

শক্ত ক'রে বোতাম-আঁটা ভেড়ার চামড়ার জামা-পরা এক চাষা মিস্‌কার দিকে তাকিয়ে দেখল।

'কি চাই?'

'কিছুই চাই না। এই একটু জানাশোনা লোকদের খোঁজ করছি।'

'তাহলে এখানে কেন? স'রে পড়ো।'

ষ্টেশনের এক কোণে একটা বেঞ্চির তলায় একজন লোক শুয়ে, তার মাথাভরা টাক্। ও হ'ল একজন তাতার। চারদিক কি রকম ঠাণ্ডা আর স্যাঁৎসেঁতে, কোথাও শব্দটি নাই, কেবল মাঝে মাঝে লোকটির চীৎকার শোনা যাচ্ছে ঃ 'হা আল্লা। হা আল্লা।'

আর এক কোণে একজন চাষা হাত-পা ছড়িয়ে গড়াচ্ছে, তার লাল দাড়ি উকুনে ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এক একবার সে চোখ মেলেই আবার বুঁজ্‌ছে। তার একটা পা ঠিক কাঠের মত শক্ত হ'যে পড়ে আছে, আর একটা পা নড়্‌ছে। তার গোঁফের উপর মস্ত একটা গুবরে পোকা।

'ও ওরকম পড়ে আছে কেন?'

মিস্‌কা কোনো কথা বল্‌ল না।

লোকটির কাছে নোংরা একটুক্‌রো রুটি প'ড়ে, মিস্‌কা একমনে তাই দেখ্‌ছে। মিস্‌কা বুঝ্‌তে পারল লোকটির প্রায় হ'য়ে এসেছে। তার মনে হচ্ছিল ঃ

'ঐ রুটির টুক্‌রোটা পেলে বেশ হ'ত। কেউ তো আর দেখছে না। তাতারটা তো মুখ ঢেকে আছে, আর দেখলেও সে কিছু বলবে না। আমি বেশির ভাগ নেব, আর সেরেজ্‌কা তো ছোট্ট, ওকে ছোট্ট একটুকরো দিলেই হবে।'

মিস্‌কা পা টিপে টিপে দেওয়াল ঘেঁসে আর একদিকে গিয়ে একবার ভালো ক'রে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল। এই তার প্রথম চুরি, তার কি রকম অদ্ভুত লাগছিল, মনে হচ্ছিল পা দুটো যেন অসাড় হ'য়ে আসছে, আর কান আর মুখ যেন জ্ব'লে যাচ্ছে। সেবেজ্‌কার কানে কানে সে বলল ঃ

'ঐ দিকটা দেখে আয়!'

'কোন্ দিকটা?'

'ঐ যে, দরজাটার পেছনে!'

সেবেজ্‌কা দরজার ওপাশ থেকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'মিসকা, কি দেখব?'

'কিছ্ছু দেখতে হবে না, হয়েছে।'

প্ল্যট্‌ফর্‌ম্‌-এর উপর চাষারা সব স্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়ে তাদের যেতে দেবার জন্যে অনেক সাধ্যসাধনা করছে।

'দোহাই, এইটুকু দয়া করুন।'

'আরে না, সে কি ক'রে আমি পারি।'

চাষাদের প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়াতে তারা সব রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ সুরু ক'রে দিল।

মিস্‌কা বিজ্ঞের মতো বল্‌ল ঃ 'ব্যাটারা ঘুষ চায়।'

* * * * *

ষ্টেশনের একপাশে রোদের মধ্যে সেবেজ্‌কা প'ড়ে। তার জিভ একেবারে জ্ব'লে যাচ্ছে, আর তাই দিয়ে মাঝে মাঝে সে ঠোঁট চাটছে। দেখলে মনে হয় না তার শরীরে একটুও শক্তি আছে। তার গাল দুটো ব'সে গিয়েছে, আর নাকটা দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক লম্বা। পাশে মিস্‌কা ব'সে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে। পকেট থেকে সেই পুঁট্‌লিটা বের ক'রে মিস্‌কা একটু নুন জিভে ঠেকাল। তারপর কি রকম বিশ্রী মুখ ক'রে উঠে খানিকটা থুথু ফেলে ট্রেণগুলোর চারপাশে ঘুরতে সুরু করল। একটা জায়গায় নর্দ্দামার মধ্যে খানিকটা আলুর খোসা প'ড়ে ছিল। তাই তুলে নিয়ে সে মুখে পুরল। কিন্তু না খেয়ে খেয়ে সে এত কাহিল হয়েছিল যে তার চোয়াল আর নড়তে চায় না।

মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা একজন মেয়ে মিস্‌কাকে ঐ অবস্থায় দেখ্‌তে পেলেন। তিনি নার্স, ঐ সহরেই কাজ করেন। তাঁর হাতে ছিল পূরো এক চাক্‌লা কালো রুটি।

মিস্‌কার সব কষ্টের কথা তার দুই চোখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছিল।

নার্স মিষ্টি গলায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?'

মিস্‌কা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল—না, তিনি ঠাট্টা করছেন না, তাঁর চোখের চাহনি কি রকম স্নিগ্ধ ! মিস্‌কা সময় নষ্ট না ক'রে সব কথা কবুল করল।

তারা দুজন ট্যাশ্‌কেন্টে যাবে ব'লে বেরিয়েছিল। কথা হয়েছিল পথে কেউ কাকে ছেড়ে যাবেনা। তার সঙ্গীটির শরীর বড় খারাপ, তাকে এক টুকরো রুটি দেবার কেউ নাই। সে নিজে যত তাড়াতাড়ি পারে চ'লে যেতে চায়, কিন্তু বন্ধুর ওরকম অবস্থায় কি ক'রে তাকে ছেড়ে যায় ? একলা থাকলে সে নিশ্চয় মারা পড়বে—বেচারির বয়স একে কম, আর সে এর আগে কোথাও যায়নি, একেবারে কিছুই জানেনা, তার উপর আবার ইঞ্জিন দেখ্‌লে বেজায় ভয় পায়।

'কি হয়েছে ওর ?'

'খারাপ জল খেয়ে পেটের অসুখ হয়েছে, আর সঙ্গে জ্বর।'

'কই, তাকে দেখি।'

সেরেজ্‌কা একলা একলা শুয়ে ছটফট করছিল। মিস্‌কা নার্সকে সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল :

'ঐ যে।'

নার্স সেরেজ্‌কাকে বেশ ভালো ক'রে দেখে বললেন :

'ওর তো শুধু জ্বর হয়নি, টাইফাস্ হয়েছে, বোধহয় বাঁচবে না।'

'তাহলে ও এখন কোথায় যাবে ?'

নার্স একটু ভেবে বললেন :

'তাইতো। আমাদের হাসপাতাল-গাড়ি যে একেবারে ভর্ত্তি, কিন্তু ওর জন্যে যেমন ক'রে হোক জায়গা করতেই হবে। পরের ষ্টেশনে গিয়ে ওকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে, কি বলো ?'

মিস্‌কা ভারি খুসি হ'ল, সেরেজকাকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে ব'লে নয়, এই কথা ভেবে সে খুসি হ'ল যে পৃথিবীতে সত্যি ভালো লোক আছে, যদিও তাদের সহজে দেখা পাওয়া যায়না। মনের আনন্দে ক্ষিদের জ্বালা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। নার্স যখন তাকে খানিকটা রুটি ছিঁড়ে দিলেন, স্ফূর্ত্তির চোটে তার প্রায় কান্না এল।

'কি মজা। আপনি সত্যি এত ভালো !'

মনে মনে সে ভাবছিল :

'এরা যদি আমাকেও এই সঙ্গে নিয়ে যায়।'

নার্সটি মায়াবিদ্যা জানেন নাকি ? নইলে চট্ ক'রে মিস্‌কার

মনেব কথা তিনি কেমন ক’বে বুঝে ফেললেন ?

'তুমি এখন কোথায যাবে ?'

মিস্‌কা তাঁব দুটি স্নিগ্ধ চোখেব দিকে তাকিযে করুণস্বরে বল্‌ল ঃ

'দেখুন, আমার জন্যেও একটু জায়গা ক’বে দিন। আমি কাউকে বলব না।'

যাই বলো, পৃথিবীতে তাহলে সত্যিকারেব দযালু লোক আছে।

*   *   *   *   *

প্ল্যাট্‌ফব্‌ম্‌-এব উপব ক্রমাগত পাযচাবি ক’বে মিস্‌কাব এমন অবস্থা হযেছিল যে তাব পা আব চলে না। তাই সে ক্লান্ত হ’যে একটু জিবিয়ে নেবাব জন্যে একটা বেলগাড়িব ধাবে ব’সেছিল। তাবপব কখন একটা চাকায় মাথা হেলান দিযে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকাল বেলায ঘুম ভাঙ্‌তেই সে লাফ দিযে উঠ্‌ল। তাইতো! কাঁধটা এরকম হাল্‌কা লাগে কেন? পিছনে হাত দিযে দেখে—ওমা! তাব বোচ্‌কাটা নাই।

সে একবাব বেলগাড়িব তলায উঁকি মেবে দেখে, একবাব সাম্‌নে ছুটে যায়—কোথাও তাব বোচ্‌কা নাই। চাব চাবটে মালগাড়িব চাবপাশ সে তন্ন তন্ন ক’বে খুঁজে দেখল—বোচ্‌কাব নামগন্ধ নাই।

মিস্‌কাব কপাল ঘেমে উঠ্‌ল আব তাব মনে হ’ল যে দম বন্ধ হ’যে আস্‌ছে।

জিনিসটা চুবি গেল!

সে আর দাঁড়াতে পাবলনা, লাইনেব উপব ব’সে হাউ হাউ ক’বে কাঁদতে সুরু কবল। দারুণ দুঃখে তাব বুক ফেটে যাচ্ছিল। তাব আব একটি মাত্র জামা ছিল ঐ বোচ্‌কাতে, শুধু যে সেই বোচ্‌কাটি সে খুইযেছে তা নয, তাব শেষ সম্বল—যে-আশা বুকে ক’বে সে বাড়ি থেকে বেবিয়েছিল—তা একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে।

অনেকক্ষণ কাঁদাব পব মিস্‌কাব মনে হ’ল একটা কিছু কবা দবকাব। চোখেব জল ফেলে তাব দুঃখেব ভাব প্রায় অর্দ্ধেক হাল্‌কা হয়েছিল। ষ্টেশনের পিছনে লাইনেব উপব দিয়ে সে সোজা হাঁটতে আবম্ভ কবল, যেমন ক’বে হোক এই জায়গাটাব থেকে তাকে পালাতে হবে। খানিকটা দূব গিয়ে তাব সেবেজকাব কথা মনে পড়ল, তাকে তো একবাব ব’লে আসা দরকাব। হযতো আব কখনো দুজনেব দেখা হবে না, যদি কেউ দয়া ক’বে তাব ভার না নেন তাহলে হযতো এই শেষ।

হাযবে, খাবাব মতো একটু কিছু যদি থাকত!

হাসপাতালের লোকবা মিস্‌কাকে বিশেষ আমল দিল না।

'কি চাই হে তোমার ?'

'এখানে সেবেজ্‌কা আছে না, তাকে দেখতে চাই।'

'যাও, যাও, আজ হবে না, কাল এস।'

'একটুক্ষণেব জন্যেও না ?'

'সে এখানে নাই, সে ম'বে গেছে।'

'ম'রে গেছে !'

'আকাশ থেকে পড়লে নাকি ? মানুষ মবে তা বুঝি তোমার জানা ছিলনা ? তাকে গোর দেওয়াও হ'যে গেছে।'

সেবেজ্‌কাব তাহলে সব শেষ হ'য়ে গেছে ? কাব মুখ দেখে মিস্‌কা আজ উঠেছিল ? হাসপাতালের আঙিনায একটা গাছের ছায়ায গিযে সে বসল। কপালের লিখন ছিল মন্দ ! জামাটা গেল চুবি, খাবাবেব নামগন্ধও নাই। কাকগুলো অমন ক'বে ডাকছে কেন ? গুটি গুটি এগিযে আসছে এটা আবাব কি ? ওমা, মস্ত একটা পোকা ! বাড়িতে তো তাবা বেড়াল কুকুব যা জুটত খেত, কিন্তু তাই ব'লে এই পোকাটাকে—তাইতো এটাকে কি কবাই বা যায় ?

ঐ যে ওখানে একটা চড়ুই দিব্যি লাফিযে বেড়াচ্ছে। তাহলে চড়ুইবা এখনো সব নির্ব্বংশ হযনি। হায়বে, যদি ইযাস্‌কা থাকত, আব দেখতে হ'ত না, বন্দুক নিযে এক্ষুণি তাড়া কবত।

ক্ষিদেয়, ক্লান্তিতে, দুঃখে মিস্‌কাব সমস্ত শক্তি প্রায় লোপ পেযেছে। তাব চোখে অন্ধকাব ঘনিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে কটিব নোনতা গন্ধ। · কোত্থেকে এই গন্ধ আস্‌ছে ?

একটা কাঠেব টুকবো কুড়িয়ে সে শুঁকে দেখল তাতে যেন কিরকম কটি কটি গন্ধ, তাবপব সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা ঘাসেব কুটো ছিঁড়ে নিযে সে চিবোতে লাগল। তাবপব অসহ্য কষ্টে তাব চোখ আপনা থেকে বুঁজে এল।

মৃত্যু ?···

*　　*　　*　　*　　*

শরৎকাল। পবিষ্কাব দিন। বুজুলুক আব সামারাব মাঝামাঝি একটি ছোট্ট ষ্টেশনে ট্যাশ্‌কেন্ট থেকে একটি ট্রেণ এসে থামল। গাড়ি থেকে একদল চাষা প্ল্যাট্‌ফব্‌ম্‌-এ লাফ দিযে পড়ল। ট্রেণটা বেশিক্ষণ দাঁড়াল না, প্ল্যাট্‌ফব্‌ম্‌-এব উপর এক গাদি মোটা মোটা বস্তা নামিযে দিযে একটু পবেই

ছেড়ে দিল। বস্তাগুলো গমে ভবা, আব সেগুলোব গায়ে নানাবকম মার্কা মাবা আব বাঁকা বাঁকা হবফে কি সব লেখা।

এব মধ্যে তিনটে বেশ ভাবি ভারি বস্তায় পেনসিল দিয়ে অস্পষ্ট ক'বে লেখা—মিখায়েল ডোডোনভ্।

মস্ত ছেঁড়া টুপি মাথায় একটি ছেলে এসে বস্তাগুলোকে ভালো ক'বে আঙ্গুল দিযে টিপে টিপে দেখল, তাদেব মুখেব বাঁধন ঠিক আছে কিনা তা পবীক্ষা কবল। ছেলেটি বেশ বলিষ্ঠ, মুখের বং বোদে-পোড়া, ধরণ-ধাবণ একেবারে সত্যিকাবেব চাষার মতো।

আকাশ পরিষ্কাব। শুধু ছোট্ট এক টুকবো মেঘ তবতব ক'বে ভেসে যাচ্ছিল, সূর্য্যেব কোণ ঘেঁসে যাবাব সময একটুক্ষণেব জন্য মাঠেব ওপব তাব ছায়া পড়েছে।

ছেলেটি খুব গম্ভীবভাবে দাঁড়িযে দাঁড়িযে তাব বস্তাদুটো দেখছিল। বেশ শক্ত ক'বে গিঁট দিযে তাদেব মুখ বাঁধা। শবতেব ঝরঝবে বাতাস তাব বেশ ভালো লাগছিল, প্রাণভবে নিঃশ্বাস নিযে মাথা নেড়ে সে বল্ল ঃ

'বেশ দেখি ঠাণ্ডা! বোধহয বাত্রে ববফপড়া আবম্ভ হযেছে।'

ছেলেটি মিস্কা।

ট্যাশ্কেণ্টে সে বাস্তায বাস্তায় ঘুবে বেড়িযেছে, গাছতলায় ঘুমিযেছে, যেখানে একটু জায়গা পেযেছে সেখানেই থেকেছে।

বাঁচবাব আশা সে একেবাবে ছেড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তবু সে বাঁচল, পোকামাকড়, ভীষণ মযলা, আব পেটেব জ্বালা, এই সব সহ্য ক'বে। তাব ছুবি আর কোমববন্ধ বেচে সে খাবাব কিনেছে, পেটেব দায়ে পচা আপেল চুবি কবেছে, দবকাব হ'লে ভিক্ষা পর্য্যন্ত কবেছে। ক্লান্তিতে, বিবক্তিতে, তাব আব বাঁচবাব সখ ছিল না। এমনি ক'বে কি আর গমেব যোগাড় হয? অথচ সে ঘর ছেড়ে বেবিয়েছিল গমেব আশায়—গম না হ'লে তাদেব যে বাঁচা দায।

অবশেষে এক ধনী লোকেব জমিদাবিতে তাব একটা চাকবি জুটল। চাকরি পাবাব কিছুকাল পবে বুজুলুকের কযজন চাষাব সঙ্গে তাব দেখা হয, তাবা সব যাচ্ছিল মাঠে ঘাস কাটতে আর গম মাড়াই কবতে। মিস্কা তাদেব সঙ্গে জুটে পড়ল। তাব মজুবি ঠিক হ'ল দু বস্তা গম, বস্তায় আধ মণ ক'বে। তাবপব আবার এই চাষাদেব সঙ্গেই সে বাড়ি ফেবে—মাগনা নয, নগদ দশ সেব গম বাহা-খবচা দিযে। চিবকালই কি আর সে ভিক্ষা ক'রে চালাবে?

বাড়ি ফিবে মিস্কা দেখল তাদেব ছোট্ট কুঁড়ে ঘবটিব কোথাও

কোনো সাড়া শব্দ নাই, জানলাগুলোর শার্সি সব শ্যাওলা প'ড়ে সবুজ হ'যে গেছে, ফটক খোলা প'ড়ে, আঙিনা ঘাসে ঢাকা, আর বেড়ার ধারে সব কাঁটার ঝোপ। এক কোণে প'ড়ে আছে একটা মরচে-ধরা জোয়াল।

কই, তার মা এসে তো তাকে আদর করছেন না? ইয়াস্‌কা, ফেড্‌কা, এরাই বা সব কোথায় গেল?

গাড়োয়ান তার গমের বস্তা দুটো ব'য়ে নিয়ে গিয়ে জানলার ধারে মাটির উপর রেখে দিল।

এখনো কেউ এলনা কেন?

তার বুক যেন কেমন ভারি ভারি বোধ হ'তে লাগল, আর তার দৃষ্টি ঘোলাটে হ'য়ে এল।

পথের ওপারের ফটক থেকে বেরিয়ে ইগ্‌ন্যাশিয়াস্‌ ঠাকুর্দ্দা বস্তা আর গাড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন:

'এসব কি দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সমিতি পাঠিয়েছে? আমাদের জন্যে বুঝি?'

সামনের ছোট্ট জানলা দিয়ে আরেকজন কে তাকিয়ে দেখছিল। মিস্‌কা খানিকটা গম বস্তা থেকে বের ক'রে গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর অস্থিসার বুড়োটির কাছে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'ঠাকুর্দ্দা, আর সবাই কই?'

হাতের রুটিটা কোনো রকমে ধ'রে বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন, তাঁর চোখের চাহনি কি রকম অদ্ভুত, মনে হয় যেন তাঁর মাথায় কিছু ঢুকছে না।

'এই যে! একটু বোসো। হঠাৎ কোত্থেকে?'

দুটি চাষার ঘরের স্ত্রীলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বস্তাদুটো বেশ ক'রে টিপে টিপে দেখে আর বাইরে যে দু-চারটে দানা প'ড়ে গিয়েছিল তা চট্‌পট্‌ কুড়িয়ে কোঁচড়ে তুলে তারা বল্‌ল:

'ছেলেটা কি এনেছে একবার দেখ! ভেলকি বাজী!'

নোংরা, খালি কুঁড়ে ঘরটার এক প্রান্তে একটা তক্তপোষের উপর তার মা শুয়ে; তাঁর মাথার উপর দেওয়ালের কোণে দুটো দেবদেবীর মূর্ত্তি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ইয়াস্‌কা আর ফেড্‌কা মারা গিয়েছে।

মিস্‌কা তার মার গায়ে ঝুঁকে প'ড়ে বলল:

'উঠ্‌বে না মা? আমি এসেছি!'

তার মা চমকে উঠ্‌লেন, আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। কোনো রকমে ঠোঁট নেড়ে তিনি বল্‌লেন:

'ওমা, মিস্‌কা! এসেছিস্‌?'

'তোমার জন্যে রুটি এনেছি মা।'

পকেট থেকে এক টুকরো ছাতাধরা রুটি আর এক মুঠো শুকনো আপেল বের ক'রে সে মার হাতে গুঁজে দিল।

'মা, এই নাও, খাও।'

'তুই সত্যি বেঁচে আছিস ?'

'বেঁচে আছি বই কি—দেখছ না ?'

মিস্কার মা ছেলের বুকে মাথায় তাঁর হাড়বেরোনো হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কি প্রকাণ্ডই না মিস্কা হয়েছে, আর রোদে পুড়ে তার কি রকম রং হয়েছে, চেনা দায়।

'আমার বাছা !'

পরে অনেকক্ষণ সে ঘাসে-ঢাকা শূন্য আঙিনায় একলা একলা ঘুরে বেড়াল। খালি আস্তাবল দেখে তার ঘোড়াটার কথা মনে পড়ল—তাকে একটা নতুন ঘোড়া কিনতে হবে। মুরগির বাসাটার বিচলিগুলো ধূলো জমে কালো হ'য়ে গেছে, তারই উপর প'ড়ে আছে ছোট্ট দুটো পালক, দেখে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল, সব আবার নতুন ক'রে করতে হবে, না আছে ঘোড়া, না আছে মুরগি।

কোত্থেকে একটি চড়ুই এসে গোলাঘরের ছাদ থেকে লাফাতে লাফাতে বরগাটার উপর গিয়ে বস্‌ল ; চড়ুইটা ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে কি যেন খানিকটা ভেবে নিল, তারপর মিট্‌মিট্ ক'রে মিস্কার দিকে তাকিয়ে রইল।

চড়ুইটার দিকে তাকিয়ে মিস্কাও কি যেন একটু ভাবল। আঙিনা থেকে মরচে-ধরা জোয়ালটা তুলে এনে সে গোলাঘরের এক কোণে রেখে দিল। তারপর, গমের বস্তাগুলো যেখানে পড়েছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, আর আপন মনে আস্তে আস্তে বল্‌ল ঃ

'কেঁদে কি লাভ ? আবার নতুন ক'রে সব গ'ড়ে তুল্‌তে হবে।'

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক,—
পরের ঘরে মানুষ হয়েছে,
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে ;—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধূলোবালি,—
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে,
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকণ সবুজ।
ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভীর্ম্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না,—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে ,—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র,—
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল,—
বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগ্‌লি তোলে।

বেলা ছুপুব
লোভ হয জলেব ঝিলিমিলি দেখে,
তলায পাতা ছডিযে শ্যাওলাগুলো ছুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা কবে।
আবো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা ?
সোনাব কাঁকই দিযে আঁচডায লম্বাচুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তাব জলেব ঢেউযে।
ছেলেটাব খেযাল গেল ঐখানে ডুব দিতে,
ঐ সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপেব চিকণ দেহেব মতো।
কী আছে দেখিই না, সব তাতে এই তার লোভ।
দিল ডুব, দামে গেল জডিযে—
চেঁচিযে উঠে খাবি খেয়ে তলিযে গেল কোথায।
ডাঙায বাখাল চবাচ্ছিল গোক
জেলেদেব ডিঙি নিযে টানাটানি কবে তুললে তাকে,
তখন সে নিঃসাড় ।
তাবপবে অনেকদিন ধবে মনে পডেছে
চোখে কী কবে শর্ষেফুল দেখে,
আঁধাব হযে আসে,
যে মাকে কচিবেলায হাবিযেছে
তাব ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায মিলিয়ে।
ভাবি মজা,
কী কবে মবে সেই মস্ত কথাটা।
সাথীকে লোভ দেখিয়ে বলে,—
"একবাব দেখ্ না ডুবে, কোমবে দডি বেঁধে,
আবাব তুলব টেনে।"
ভাবী ইচ্ছা কবে জানতে ওব কেমন লাগে।
সাথী বাজি হয় না,
ও বেগে বলে, "ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকাব।"

বক্সিদেব ফলেব বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায জন্তুব মতো।
মাব খেযেছে বিস্তব, জাম খেয়েছে আবো অনেক বেশি।

বাড়িব লোকে বলে, লজ্জা কবে না বাঁদব ?
কেন লজ্জা ?
বক্সিদেব খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভবে নিয়ে যায়,—
গাছেব ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দলে,
লজ্জা কবে না ?

একদিন পাকড়াশিদেব মেজোছেলে একটা কাঁচ-পবানো চোঙ নিয়ে
ওকে বল্‌লে, দেখ্‌না ভিতব বাগে।
দেখল নানাবঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বল্‌লে, "দে না, ভাই, আমাকে।
তোকে দেবো আমাব ঘষা ঝিনুক
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা করে,
আব দেবো আমেব কষিব বাঁশি।"

দিল না ওকে।
কাজেই চুবি কবে আনতে হোলো।
ওব লোভ নেই,
ও কিছু বাখতে চায় না শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতবে।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বল্‌লে,
"চুবি করলি কেন।"
লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব কবলে,
"ও কেন দিল না।"
যেন চুবিব আসল দায় পাকড়াশিদেব ছেলেব।

ভয় নেই ঘৃণা নেই ওব দেহটাতে।
কোলা ব্যাঙ তুলে ধবে খপ কবে,
বাগানে আছে খোঁটাপোঁতাব এক গর্ত্ত,
তাব মধ্যে সেটা পোষে,—
পোকামাকড় দেয় খেতে।
গুব্‌বে পোকা কাগজেব বাক্সোয় এনে বাখে,
খেতে দেয় গোববেব গুটি,
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।

ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালী।
একদিন একটা ছেলে সাপ্ রাখলে মাষ্টারের ডেস্কে,—
ভাব্লে, দেখিই না, কী করে মাষ্টার মশায়।
ডেক্সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীন জাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সবসময়ে
গতি ছিলনা চুরি ছাড়া।
সেই অপকর্ম্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।
আর সেই সঙ্গেই কোন্ কার্য্যকারণের যোগে
শাসনকর্ত্তাদের শসাক্ষেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হোতোনা রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।
একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনোদিন জল বেরোয়নি যে ছেলের চোখে
দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,
মুখে অন্নজল রুচল না,
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করমচা,
চুরি করতে উৎসাহ হোলো না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগনে ছিল সাতবছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি।
হাঁড়িচাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর দূর করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানী।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হোলো,
বয়সে ওর সঙ্গে তিনদিনের তফাৎ।

ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ঐ রকমই চ্যাপটা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্যি এই গয়লানী মাসির পরে,
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রং লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।
দেখি না কী হয়, তারই বিবিধ রকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানির স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ঐ ছেলেটারই।

অম্বিকে মাষ্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল
"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এত বড়ো বাঁদর।"
আমি বল্লুম, "সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হোত তার ছন্দে
যে ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাসন্তিকা

ববদেহে তা'ব বন্যনাবীব জীবন্ত যৌবন—
মৃদুনিঃশ্বাসসৌবভে দু'টি নীল আঁখি মুদে আসে !
কালো কুন্তলে সর্পিল বেণী,—মধুব সর্ব্বনাশে
ঘেবিছে আমাবে,—সাবা গায়ে লাগে বসন্ত-সমীবণ !

চম্পাব বনে কাঁপে পীত-শিখা অধীব চৈত্রমাসে—
তৃষ্ণাব তীবে বসি' হাসে সে যে, হাতে সোম-ভৃঙ্গাব,
কম-অঙ্গুলি-পবশে বাগিনী ধবে 'সুব-শৃঙ্গাব'—
জীবনেব বনে কোকিল-কাকলি কাঁপে কোন্ প্রত্যাশে !

হোম-হুতাশনে ধুতুবাব দাহ !—দেহ-লাবণ্যে তা'ব
কদম্ব বনে ঘন ছায়া মেলে শ্রাবণেব বাবিবাহ !
পবম তৃষায চোখে জ্বলে তা'ব অদম্য উৎসাহ—
আকাশ-আবশি বিদাবি' সে কবে নবজ্যোতিসঞ্চাব ।

নাগিনীব মতো কামরূপা বধূ—(গাহে প্রাণ-পবীবাহ)
কঠিন, উষব মরুপথে' তবু আনে মধু-উৎসব !
তাহাবি প্রসাদে মবণ-তিমিবে জীবনেব অনুভব—
নববিহঙ্গ চাহে পুবাতনে—সেই প্রেম-সুখদাহ !

চলে কল্পনা,—দূব গ্রাম-শেষে সন্ধ্যাব সম্ভব !
কৃষাণ-বধূব গৃহকোণে জ্বলে মৃন্ময়-দীপশিখা—
ভীরু প্রজাপতি-ডানাব আঘাতে কাঁপে বন-মল্লিকা,—
কপোত-ধূসব ছাযায চলিছে ঝিল্লীব কলবব !

সিসুগাছগুলি হাওয়ায় হেলিছে ।—মানস-বাসন্তিকা,
চামেলী ফুলেব মদিব গন্ধে ভবিয়াছে প্রাঙ্গণ !
পুলকাঞ্চিত মাধবীবাত্রি,—উন্মদ শিহবণ,
চবণ-নখব-কিনাবে কাঁপিছে অতন্দ্র চন্দ্রিকা !

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হাঁসপাতালে

(জে, ই ফ্লেকাবেব অনুভাবে)

সাতটি বৎসব যদি শুভ্রকেশ বৃদ্ধেব মতন
এখানে শুইয়া থাকি, যন্ত্রণাব শেষ হ'য়ে যায়—
সমুচ্চ মিনাব হ'তে দেখি শুধু মুমূর্ষু স্বপন—
হেথা শুয়ে দেখি শুধু বিক্ত পাংশু দেওযালেব গায
টিক্‌টিকি উঠে, নামে ; শূন্য টুল পড়ে থাকে দূবে,
চেযাব, মাদুব, জাগ্‌—বং উঠে গিয়েছে পৰ্দ্দায় !
শান্ত, পবিচ্ছন্ন সেই বুড়ী ঝি-টি আসে ঘুবে ঘুবে
চেনা মুখ ছায়া ঢাকা—কিছুই জানি না যেন তা'ব—
নিঃশব্দে আসে সে হেথা, চ'লে যায় , সাবা ঘব জুড়ে
আব কেহ কোথা নাই ; কেহ হেথা আসে না আমাব
আত্মীয় অতিথি কোনো,—বিন্দুমাত্র নাই চঞ্চলতা,
বাসনেব শব্দ শুধু, ঝন্ ঝন্ খাবাব ঢাকাব !

বাহিবে চা'ব না আজ, লুপ্ত হ'যে যাক সব কথা—
সার্শিটি টানিযা দিব দূবে ওই জানালাব 'পবে ;
বাযুব নিঃশ্বাস আব বর্ষণেব স্নিগ্ধ মুখবতা
শুনিব, ভাবিব মনে, হয়ত বা নিমেষেব তবে,
ফাল্গুন নিকটে এল, অগ্নিশিখা জড়ায়ে চবণে,
পাখীদেব গানে, আব সূর্য্যবহ্নি যেথা ঝবে পড়ে
ধীবে যেন এ আমাব মশাবিব পাশে ! ভয মনে,—
একে একে আসে যদি পুবাতন দিবা-স্বপ্নগুলি
মেঝেয দাঁড়ায় এসে, গান গায হাসিযা গোপনে,
বাতাসে ভাসিয়া যদি উড়াইয়া পৰ্দ্দাব ধূলি
খেলা কবে, খ'সে যায দিবসেব যত দণ্ড-পল,
সুগোপন ছাযা নামে দীর্ঘতব ছায়াবে আকুলি' !
তখনি মিলা'যে যা'বে বহুদূবে দেওয়াল ধূসব—
জ্ব'লে ফেটে খুলে যা'বে—দেখা দেবে অগণিত তাবা—
গোলাপে শিশিব যেন দেখা দেবে স্বচ্ছ সবোবব !

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

পতঙ্গ

(ওয়াল্টাব ডি লা মেযাবেব অনুভাবে)

নিশীথেব বাতাসে বসিযা
মৃদু তিমিবেব গন্ধে লুকা'য়ে আনন,
বাহিবে আঁধাব আব গোপন গুহায
'স্বাগতম্' কহে হুতাশন !

বর্ণে আব পাখায় সুন্দব
কম্পমান্ সুকুমাব লাবণ্যপ্রভায
পতঙ্গ শিশিব-শয্যা হ'তে
আমূর্চ্ছিত মুখ তুলি' চায।

লোভনীয় চক্ষু দু'টি তুলি'
লঘুগতি পক্ষে দেহভাব
কুহেলি-সহজ সুখে শূন্যে ঘুবি' ঘুবি'
পতঙ্গেব চলে অভিসাব।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

রাত্রে

(যালিস্ মেনেল্ হইতে)

স্বচ্ছ সুদূব দিগ্বলয়েব সীমা শেষ হ'তে যবে
সাঁতাবি নীলিমা কোমল পক্ষ ভবে,
সাবা দিবসেব স্মৃতিব বাহিনী বলাকা বাঁধিয়া আসে
ঘুমঘোব ভবা খোপে খোপে উল্লাসে।
বলত কাহাবা মধুময় হেন গোধূলিব আব্ছায়ে
ফিবিছে কুলায়ে মদিব দখিণা বাযে ?
সব চেয়ে দ্রুত সোজা পথে আসে বল, কাবা ? অনুমানি,
—তোমাব বাণী যে, তাহাবা তোমাব বাণী।

শ্রীসুবেন্দ্রনাথ মৈত্র

বৈদান্তিকের প্রার্থনা

(শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী হইতে)

আত্মা মহীয়ান্,
হৃদয়ের নীরবতা মাঝে যার স্তব্ধ ধ্যান ভূমি,
জ্যোতিঃ অনির্ব্বাণ,
আছ শুধু তুমি !
হায়, তবে অন্ধকার কেন ছায় আমার নয়নে,
মেঘ উঠে ধূমি'
আলোর গগনে ?
কেন মোরে বাসনা দুর্ব্বার করে শত ক্ষতাঙ্কিত ?
কেন প্রতিক্ষণে
লালসা-পীড়িত
দগ্ধ দীর্ণ ক্ষুব্ধ হই, দূরে ফেলি তব শান্তি, হায়,
হই বিতাড়িত
প্রতি ঘূর্ণি ঘায় ?
কেন পড়ি দুঃখের কবলে নিত্য, আবর্ত্তে শঙ্কার,
কামের দ্রংষ্ট্রায় ?
করুণা তোমার
ফিরায়োনা, যদিও অতীত মোর আসে রক্ত মাখি'
মলিন আঁধার,
হে সত্য একাকী !
দিয়ো না সে দেবগণে তব ছদ্মরূপে দিতে মম
যৌবনেরে ফাঁকি।
এ রোল বিষম
স্তব্ধ কর—চাহি তব চিরন্তন স্বর শুনিবারে
পিপাসার্ত্ত সম।
এ দীপ্ত মায়ারে
দূর কর—অনন্তের তটপ্রান্ত ভাবাক্রান্ত করে
যাহা নিজভারে।
দাও নির্ব্বিকার
দৃষ্টি মোরে, স্বচ্ছ হৃদি যৌবনের। তব তিরস্কারে
ঘুচুক আশার

তীব্র মুখরতা।
নাশো মম কলুষ-শতাব্দীরাশি, ফিরায়ে আমার
দাও পবিত্রতা।
জ্ঞানের দুয়ার
সুগোপন, খোলো খোলো আজ! বীর্য্য, লভ সফলতা!
বর্ষ, প্রেমধার!

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

উপহার

তোমারে দেবার মত নাহি মোর কোন উপহার
তাই তব জন্মদিনে কি আনিব ভাবি বসি' মনে।
অন্তরে ঐশ্বর্য্য নাহি, নাহি বিত্ত বাহির ভুবনে।
নাহি শিল্পীচিত্ত যদি রচিবারে চাহি অলঙ্কার।
কেবল পরাণ ভরি' ভুলে-যাওয়া আছে বহু গান,
খণ্ড, ছিন্ন ভাসে তারা চিত্তাকাশে লঘু মেঘ সম।
অতীতের জানা সুর তাও আজি নাহি মনে মম,
যে সুর শুনিনি কভু তারাও উতলি' তোলে প্রাণ।
পেয়ে যাহা হারাইনু, আর যাহা আজো মেলে নাই,
তারি মাঝে চিত্ত মম রিক্তসম ফেরে ভিক্ষা মাগি!
ফেলিয়া আসিনু যাহা তারে ভুলে লুব্ধচিতে চাই
আজো যাহা অনাগত অলব্ধ রয়েছে দূরে দূরে,—
সেই মোর নিত্য-চলা মর্ত্ত্যদিগন্তের প্রান্তপুরে,
সে অতৃপ্ত চাওয়া মোর কম্প্র করে আনি তোমা লাগি'।

হুমায়ুন কবির

অন্ধ-পথিক

অন্তহীন অন্ধকার, তারি মাঝে খুঁজি আমি পথ
আমি পথহারা—
অস্পষ্ট-গতির ধ্বনি শুনিতেছি কোথা সেই রথ ?
কোথা ধ্রুব-তারা ?
চিরন্তন-বন্ধ-চোখে চিরন্তন-অন্ধতার ঘোর,
নিরাশার পুঞ্জীভূত শৃঙ্খলেতে অর্গলিত দোর ,
কোথা তুমি আলোরূপা, স্পর্শ-মণি ছুঁয়ে যাবে দ্বারে,
প্রাণহীন অন্ধকার খসে যাবে দীপ্ত পথ-ধারে—
কোথা তব সাড়া ?

অন্তহীন অন্ধকার, গুমরিয়া কেঁদে ওঠে প্রাণ,
দেখিব না আলো ?
প্রণয়ের ফল্গুধারা বালুতলে হারাইবে গান ?
বাসিব না ভালো ?
ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠিবে না ?
ফোটার জগতে প্রাণ পরিপূর্ণ হ'য়ে ফুটিবে না ?
জরা এসে জড়াইবে যৌবনের না-ছোঁয়া এ দেহ ?
পথহারা পান্থ-পানে আঁখি তুলে চাহিবে না কেহ ?
শুধু ঘন কালো ?

অন্তহীন অন্ধকার, চিত্তে জাগে উন্মাদ বাসনা
উলঙ্গের মত,
নৃত্য করে রক্তে মোর বন্ধহীন অযুত কামনা
তপ্ত অসংযত ।
সাধ যায় অন্ধকারে অঙ্গে মম আঁকড়িয়া ধরি ,
কৃষ্ণ দুই ওষ্ঠে তা'র চুম্বনের পানপাত্র ভরি,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া দেই মম অন্ধ ভালবাসা,
নিরাশার বালুচরে ঢেলে' দেই তপ্ত তাজা আশা
উন্মাদের মত !

অন্তহীন অন্ধকার, অন্ধ আমি, চলি তবু পথ,
এ যে মোর নেশা ,
আশা নাই, তবু হেরি কল্প-চোখে দুরাশার রথ,
তাই প্রাণে ভাষা !

ধ্রুবতারা নাহি থাক, থাক পথ নিত্য দিশেহারা ;
থাক বালু, ফল্গু আমি তা'রি তলে দিয়ে যাব সাড়া ,
অন্তহীন অন্ধকার প্রাণহীন থাক চিরস্থির—
স্বপন পাথেয় মম, পথ চলি অন্ধ-মুসাফির,
দুরন্ত দুরাশা !

শ্রীসুমন্ত্র সেন

আগমন

(হার্বার্ট ট্রেঞ্চ্ হইতে)

গোলাপ-কাননে দুপুর রৌদ্র, সে তখন নাহি আসে,
প্রখর আলোকে উজল যখন বেলা
সে আসে না কভু অন্তরতলে শান্তির নিঃশ্বাসে
সাঙ্গ না হ'লে সব কাজ, সব খেলা ।
গিরিশিরে যবে আঁধার ঘনায়, কলরোল গম্ভীর
ভেসে আসে যবে সুদূর সাগর হ'তে,
তারার আলোকে, প্রদীপশিখায়—গতি তার অতি ধীর
সে আসে গোপনে স্বপন-আলোকপথে ।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাধবী পূর্ণিমা

দিনের দহনশেষে, সাকীসম, সিত সুরা লয়ে
মাধবী পূর্ণিমা যবে দেখা দেয় মোর বাতায়নে,
আত্মধিক্কারের জ্বালা শতগুণ হয় সে-সময়ে,
অবুঝ অন্তর মোর ব্যর্থতার রলরোল ভনে ।

বন্ধুরা বিস্ময়ে চাহে, প্রতিবাদ করে সমস্বরে,
কেহ বা প্রকাশে উষ্মা সকৌতুকে শুধায় কেহ বা—
কবিত্ব আমার ব্রত, তাই বুঝি কৌমুদীজগরে
পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা ।

কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরাবিলাসী,
মর্ত্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অন্বিষ্ট আমার ,
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি, তাহে মোর হৃদয় উদাসী,
উত্থান পতন মম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার।

বিচ্ছেদ-বাদল-বাতে মিলেছিলো যে-শেষ চুম্বন,
বাকাবে বিফল করে আজো তার নশ্বর স্মরণ ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দ্বন্দ্ব

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে ,
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে ,
বস্তুর দুর্দ্দান্ত চিতা অনির্ব্বাণ শূন্যের সৈকতে ;
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লববর্দ্ধনে ,
সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, স্নেহ কেবলি সম্ভব স্বপনে ;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্য্যসত্য জাগ্রত জগতে ,
ছুটি মোরা মর্ত্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্ত্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণে।

হার মানে খিন্ন মন।　দেহ কিন্তু অক্ষয় উৎসাহে
পরিব্যাপ্ত ব্যবধানে রচে সদা বাসনার সেতু ;
তন্ময় মুহূর্ত্তমাঝে অনন্তের আবির্ভাব চাহে ,
দেখে, জন্ম-মরণেরে কণ্ঠাশ্লেষে বাঁধে মীনকেতু।

আজিকে দেহের পালা—রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
হয়তো তাহারি কাছে প'ড়ে আছে অমরার চাবি ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

যার যেথা দেশ—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়—প্রকাশক, ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা।

একখানি উপন্যাস। সমগ্র উপন্যাস নয়, প্রথম ভাগ মাত্র। সুদীর্ঘ প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার স্বয়ং সূত্রধারের ভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক আপন পুস্তকের পরিচয় দিয়াছেন। এই মুখপত্র পড়িতে পড়িতেই বোঝা যায় তিনি কত বড় পণ্ডিত। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রস্তাবনার দুই কূল ছাপাইয়া আখ্যায়িকার অভ্যন্তরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যে পাঠক গল্পের মধ্যে অতি জটিল মনস্তত্ত্ব ও নিপুণহস্তে তাহার বিশ্লেষণ চাহেন, তিনি আলোচ্য পুস্তক পাঠ করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থের রসগ্রহণ অসম্ভব। প্রথমত, আখ্যান বা plot বলিলে যাহা বোঝায় তাহার একান্ত অভাব। তাহার উপর, ভাসমান পুরী ও শ্বেতদ্বীপের জীবন বর্ণনায় এত সামান্য সামান্য অবান্তর ঘটনাবলী পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহা বিলেত-ফেরত জাতি ব্যতিরেকে অন্য পাঠকের উপভোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য বঙ্গদেশে বাদল-জাতীয় যে কয়জন আছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা বিলেত তাঁহাদের দেশ, যাহাতে বিলেতী গন্ধ আছে তাহাই তাঁহাদের কাছে লোভনীয়।

কথাসাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান হয়ত গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট নয়, কিন্তু শিখিবার অনেক আছে এই গ্রন্থে। পাঠক গভীর জ্ঞান অর্জ্জন না করিলেও বর্ত্তমান সাহিত্য-জগতের ধুরন্ধরদের নাম জানিতে পারিবেন। এমন কি বঙ্গদেশে বিখ্যাত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখক এল, মুখার্জ্জিও বাদ পড়েন নাই। মোটের উপর পাঠককে আমার উপদেশ যে, ভূমিকা অংশটা সর্ব্বশেষে epilogue বা পরিশিষ্ট রূপে পাঠ করিবেন, এবং গল্পাংশ পড়িবার সময়ে মনে রাখিবেন যে সাধারণ মানব-মানবীর কথা পড়িতেছেন, দেবাসুরেরও নয়, কর্ণার্জ্জুনেরও নয়।

"যার যেথা দেশ" উপন্যাসের কোন শ্রেণীভুক্ত তাহা আমার মনে হয় অবান্তর প্রসঙ্গ। তবে এপিকের কোন লক্ষণই আমি ইহাতে দেখি না। নিরবচ্ছিন্ন গল্প-প্রবাহ আছে এই পর্য্যন্ত। বীরত্বের গন্ধ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। প্রধান প্রধান পাত্র, বাদল, সুধী, ডাক্তার গুপ্ত, ইহাঁদের চরিত্রেও অতিমানবীয় গুণাবলীর চিহ্নমাত্র নাই। সমস্ত পুস্তকখানা যত্নপূর্ব্বক পড়িয়া আবার চক্ষের সম্মুখে Clown, Harlequin, Pantaloon-এর ছায়া (নানা শ্রেণীর সং) অজস্র দেখিতেছি কিন্তু যবনবীর Hector, Ajax-এর কুটুম্ব একজনকেও দেখি না। আলোচ্য পুস্তককে সুরাসুরের বা ঈশ্বর ও সয়তানের মানবাত্মা লইয়া কাড়াকাড়ি বলা যায় কি না, এ প্রশ্নও অবান্তর। তবে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাদল বিদ্রোহী হইলেও তাহার সহিত মিলটনের লুসিফার কি মধুসূদনের মেঘনাদের কোন সাদৃশ্য নাই। সে অতি নগণ্য ব্যক্তি।

গ্রন্থকারকে তাঁহার গভীর জ্ঞানের জন্য প্রথমেই অভিনন্দন করিয়াছি। জ্ঞানী-মাত্রেরই কথা-সাহিত্যে কি ললিত কলায় অধিকার থাকার কথা নয়, কিন্তু অন্নদাবাবু উজ্জয়িনীর যে মনোরম চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে মোহিত করিবে। অর্দ্ধশিক্ষিতা, শ্যামবর্ণা এই ষোড়শীটিকে দেখিয়াই চিনিয়াছি। সে আমাদের নিতান্ত

আপনাব লোক। যখন প্রথম আসিযা সম্মুখে দাঁডাইবাছে, তখন হইতে তাহাব সুখ দুঃখই আমাব প্রধান অনুধাবনেব বিষয় হইল। পশু-হস্তে তাহাব নিগ্রহ, নিঃসহায নিঃসঙ্গ অবস্থায কালযাপন, অবশেষে বাণীব সঙ্গলাভ ও ধর্ম্মপুস্তককে আশ্রযস্থল বলিযা গ্রহণ, ইহাব মধ্যে অসঙ্গতি কোথাও নাই, অথচ কাব্যেব অভাব নাই।

উজ্জযিনীব পিতা পদে সাহেব ডাক্তাব হইলেও যথার্থ কল্পনালোকবিহাবী। বাস্তব জগতেব সহিত তাঁহাব সম্বন্ধ অতি অল্প। সহধর্ম্মিণী ও জ্যেষ্ঠাকন্যাদ্বয অন্যত্র দীক্ষা সঞ্চয কবিযাছেন। কিন্তু উজ্জযিনী তাঁহাব মন্ত্রশিষ্যা, একাধাবে দুহিতা ও বন্ধু। তিনি কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত বলিযাই এই কন্যাকে বিসর্জ্জন কবিলেন। যাহাব চবণে বিসর্জ্জন কবিলেন সে-ই বাদল। গ্রন্থকাবেব মত আমিও বাদলকে দেখিযাছি। অদ্ভুত জীব। বিবাহ না কবিলে বিলেত যাওযা হইবে না বলিযা বিবাহ কবিল। বিবাহ কবিল পত্নীকে ত্যাগ কবিবে স্থিব কবিযা। সে ইংবেজ হইবে। হইবে কি, সে ইংবেজই, আজন্ম ইংবেজ। বড বড কথাদ্বাবা তাহাব হীনতাকে ঢাকিবাব জন্য সদা সচেষ্ট। বাডীওযালীকে কেটী (Katie) বলিযা ডাকিযা বোমাঞ্চ হইল। Oxford (অক্সফোর্ড) বা Cambridge (কেম্ব্রিজ) এ পডিতে যাইবে না কাবণ সেখানে প্রলোভন নাই, প্রলোভন জয কবিবাব আনন্দ পাইবে না। কিন্তু বোঝা কঠিন যে, এই অপূর্ব্ব জীবেব চক্ষে প্রলোভন কি? ন্যায অন্যায, উচিত অনুচিত, (ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই বা বলিলাম) ইহাব চক্ষে আছে কি? প্রেমকে ত ইনি বলিযাছেন "Glandular action"।

এ জাতীয় জীবেব সত্য দেশ কোথায় তাহা অনেক ঋষিকল্প মহাপুরুষ নির্দ্দেশ কবিযাছেন, আমি উল্লেখ না কবিলেও চলে। হযত সে দেশ তাহাব পিতা বায বাহাদুব মহিমেব দেশেবই কাছাকাছি। পিতাব গুণাবলী পুত্রে সঞ্চাবিত হইযা উৎকটতব রূপ ধাবণ কবিযাছে মাত্র। তাহাব শেষ বার্ত্তা, "সুধীদা, I am আমি আছি।" আছে ভালই, তাহাব ধ্যান সফল হউক, এই জন্মেই সে ইংবেজত্ব লাভ করুক। কিন্তু তাহাব কদর্য্য, কৃযকায, কৃষ্ণবর্ণ, বিবল-কেশ, চশমা-পবিহিত অমানুষ মূর্ত্তিটি আমাদেব দৃশ্যপটে যেন উদয না হয। উজ্জযিনী বিধবাব জীবন পবিগ্রহ কবিতে যাইতেছে, উজ্জয়িনীব পিতা হৃদ্‌বোগে মবিযাছেন, বায বাহাদুবেব পুত্রশোকে মৃত্যুব কোন সম্ভাবনা নাই। বাদলেব কথাতেই বলি, "অতএব মাভৈঃ।" হযত কোনদিন দেখিব, বাদল বোলাঁ, বাসেল, বা G. B S -এব শূন্য সিংহাসনে বসিযাছে। কিন্তু আমাদেব আজও তাহাব জন্য যেমন দুঃখ হয নাই সেদিনও তেমনই আনন্দ হইবে না।

সুধীব চবিত্র সেরূপ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয় নাই। খদ্দবেব গলাবন্ধ কোটে আবৃত হইযা লণ্ডন পবিক্রমণ কবে। বাদলকে নানা উপদেশ দেয, কখনও বা বাঁদব বলে, অথচ বাদলেব মর্কটবৃত্তিব প্রশ্রয দেয না একথা বলা যায় না। সে দেশভক্ত লোক অথচ সে যে একদিন সুজেৎকে লইযা সংসাব-সমুদ্রে পাডি জমাইবে না তাহাও জোব কবিযা বলা যায না। Namby-pamby জডভবত মনে হয়।

ইংবেজ-জাতীয নানা লোকও চিত্রপটে আবিভূ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদেব প্রধান কাজ বাদলেব ক্রমবিকাশে সাহায্য কবা। ইঁহাদেব মধ্যে কাহাকেও পাঠকেব

বিশেষ ভাল লাগিবাব সম্ভাবনা নাই। এক কলিন্স্‌কে আমাব বড় পছন্দ হইযাছে, সে ইংবেজীতে যাহাকে বলে, a fine animal বলিযা। আমি বর্ত্তমান বিলেতেব কিছু জানি না তবে গ্রন্থকাবেব বিলেতী জীবনেব বর্ণনা যথাযথ বলিযাই মনে হয়। আমাব কেবল দুঃখ যে, এতগুলি ভাবতেব লোক বিলেতে উপস্থিত কবিযাছেন কিন্তু একটিও মানুষেব মত মানুষ নয। সত্যই কি মানুষেব এত অভাব ?

গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিবাব অনেক কথাই ছিল কিন্তু সম্পাদক মহাশযেব ভযে অধিক আব কিছু লিখিব না। ভাষা সম্বন্ধে দুই-চাবিটি কথা বলিযা আমাব আলোচনা শেষ কবিব। অন্নদাবাবুব পুস্তকেব বাঙ্গলা অনেক কঠিন কঠিন স্থলে বেশ সুন্দব হইযাছে। তবে ইংবেজী শব্দেব এত বহুল ব্যবহাব বাঞ্ছনীয নয। তাঁহাব মত লোক সাহায্য না কবিলে আমবা নূতন নূতন প্রতিশব্দ কোথা হইতে পাইব ? ইংবেজীব কথায কথায অনুবাদও ভাল শোনায না। আমি নীচে দুই-চাবিটা নমুনা দিতেছি। পাঠক ও গ্রন্থকাব দেখিবেন আমি বিনা কাবণে অনুযোগ কবিতেছি না।

৬৭ পৃঃ—"কান থেকে চশমাটাকে টেনে বেব কবে।"—মানে কি ?

"আগ্রহেব সঙ্গে উভয কাগজ আগ্‌লে বস্‌ল।"—ভাল শোনায কি ?

৬৮, ৬৯ পৃঃ—"কত বকম অবস্থা পর্য্যায", "খ্যাতিতে দূবত্ব হ্রাস কবে"—স্পষ্ট বোঝা যায না।

১৩৯ পৃঃ—"অতলস্পর্শী পবিবর্ত্তন"—এব অর্থ কবা কঠিন।

১১৮ পৃঃ—"হাস্য পবিহাসেব হাতল কবলেন"—হযত ইংবেজী কিন্তু বাঙ্গলায ভাল শোনায না।

১১১ পৃঃ—""মন টন টন কবে—তাজা ক্ষতেব উপব আঙ্গুল লাগ্‌লে যে বকম কবে।"—শ্রুতিমধুব নয।

১৬৩ পৃঃ—"উত্তবেব মামুলীত্বেব দরুণ অবহেলিত হয।" এবং

১৬৭ পৃঃ—"বাদল ইন্‌ডিগ্‌ন্যাণ্ট্‌ হযে বল্ল,"—এই দুই বাক্যই বাঙ্গলায অচল।

আমাব সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ, তথাপি আমাব যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন কবিলাম, সুবিজ্ঞ গ্রন্থকাব অপবাধ লইবেন না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

কামরূপশাসনাবলী।—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত এবং কামরূপ বাজাবলী বিষযক ভূমিকাসম্বলিত। রঙ্গপুব সাহিত্য-পবিষৎ হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকাব ভূমিকায় লিখিযাছেন—'তাম্রশাসন প্রাচীন ইতিহাসেব ছিন্নপত্রস্বরূপ।' বস্তুতঃ যে দেশেব ধাবাবাহিক ইতিহাস নাই, তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা, 'শিল', লেখ, কাবিকা, কডচা ও বুবঞ্জীব আশ্রযগ্রহণ ভিন্ন সে দেশেব বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সঙ্কলনেব উপায়ান্তব কি ? গ্রন্থকাবেব ২৫ বর্ষব্যাপী অনুসন্ধান ও গবেষণাব ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ কামরূপেব প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ঘাটনে প্রচুব সাহায্য কবিবে—এ কথা নিঃসংশযে বলা যায়।

কামরূপের সুপ্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কথা আছে কিন্তু কামরূপের নামোল্লেখ নাই। কালিদাসের রঘুবংশে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর'কে 'কামরূপানাম্ ঈশঃ' বলা হইয়াছে। কালিদাস সম্ভবত পঞ্চম শতকের লোক। কালিকা পুরাণে কামরূপের এবং ঐ রাজ্যের ঐতিহ্য-প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা নরকের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ বিবরণ রঘুবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহা নিশ্চয় করা সহজ নয়।

মহাভারতে দেখা যায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্তেরও স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে। অতএব ইঁহাদিগকে কাল্পনিক ব্যক্তি মনে করা যায় না। ইহার পর প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরিয়া কামরূপের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। গ্রন্থকার 'কামরূপ-শাসনাবলী'তে ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসনকে প্রথম স্থান দিয়াছেন, ঐ তাম্রশাসনই কামরূপের প্রথম ঐতিহাসিক লেখক। ভাস্করবর্ম্মা সম্রাট্ শ্রীহর্ষের সমসাময়িক। হর্ষবর্দ্ধন যখন গৌড়াধিপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন তখন ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতে একথার উল্লেখ আছে। হর্ষের রাজ্যারম্ভ ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখনই ভাস্করবর্ম্মা কামরূপের অধিপতি। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে চীন পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং কামরূপে গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও ভাস্করবর্ম্মার উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার ঐ তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী এগার জন রাজার তালিকা দিয়াছেন। ঊর্দ্ধতন রাজার নাম ছিল পুষ্যবর্ম্মা এবং তাঁহার কাল চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ভাস্করবর্ম্মার পরেই কামরূপে এক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তাহারই সুযোগ লইয়া রাজপরিবারের সহিত অসংসৃষ্ট শালস্তম্ভ-নামক এক ব্যক্তি কামরূপের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। ঐ হইতে প্রায় তিনশত বৎসর তদ্‌বংশীয় রাজগণ কামরূপের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। গ্রন্থকার ঐ রাজাদিগের যে তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় ঐ বংশের শেষ রাজা ত্যাগসিংহ শালস্তম্ভ হইতে একবিংশতিতম। এই একুশজন রাজার মধ্যে তিনজনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথম হর্জ্জরবর্ম্মা, দ্বিতীয় হর্জ্জরের পুত্র বনমাল এবং তৃতীয় বনমালের পৌত্র বলবর্ম্মা। হর্জ্জরবর্ম্মার তাম্রশাসনে ৫১০ গুপ্তাঙ্ক (৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে) অঙ্কিত আছে। ঐ শাসন হারূপ্পেশ্বর স্কন্ধাবার হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। বনমাল ও বলবর্ম্মার শাসনেও হারূপ্পেশ্বরের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে গ্রন্থকার ঠিকই অনুমান করিয়াছেন যে, শালস্তম্ভ-বংশীয়েরা প্রাচীন রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান তেজপুর সহরের নিকটস্থ হারূপ্পেশ্বরে স্থানান্তরিত করেন। গ্রন্থকার ঐ তিনখানি তাম্রশাসনের সহিত হর্জ্জরবর্ম্মার খোদিত একখানি পাষাণলিপিরও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ঐ লিপি হইতে হর্জ্জরবর্ম্মার নৌবাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্যাগসিংহের সহিত শালস্তম্ভ-বংশের অবসান হইলে প্রাচীন রাজবংশীয় ব্রহ্মপাল সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা দশম শতকের শেষভাগের ঘটনা। ব্রহ্মপালের পরবর্ত্তী ঐ পালবংশীয় ছয়জন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষ রাজা ধর্ম্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। এই পালরাজাদিগের ছয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথম ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপাল, দ্বিতীয় তৎ পৌত্র ইন্দ্রপাল এবং তৃতীয় ইন্দ্রপালের

প্রপৌত্র ধর্ম্মপাল—প্রত্যেকের দুই-দুইখানি। ঐ সকল তাম্রশাসনের স্থানে স্থানে শালস্তম্ভ-বংশীয় রাজাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। এমন কি শালস্তম্ভের বিশেষণ 'ম্লেচ্ছাধিনাথ'। কিন্তু বনমাল, বলবর্ম্মা প্রভৃতির তাম্রশাসনে তাঁহারা নিজদিগকে নবকবংশজাত বলিয়াই দাবী করিয়াছেন এবং ম্লেচ্ছগন্ধ থাকিলেও তাঁহারা যে হিন্দুসমাজে সম্মানের আসন প্রাপ্ত হইয়া উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদভাজন ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

ধর্ম্মপালের শেষ বয়সে কামরূপ রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। কারণ, গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, গৌড়াধিপ রামপাল একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার প্রতাপী অমাত্য বৈদ্যদেব দ্বারা কামরূপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ বিজিত করেন। গৌড়ীয় পালবংশের তিরোধানের পর সেন রাজা বিজয় সেন ও লক্ষ্মণ সেনও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সম্বন্ধে এক শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে "বিক্রম বশীকৃত কামরূপঃ"।

এইবার আমরা বঙ্গে মুসলমান বিজয়ের সন্নিকটে আসিয়াছি। ১১২৭ শকে (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গবিহার-বিজেতা বক্তিয়ার খিলিজি প্রকাণ্ড মোসলেমবাহিনী লইয়া কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত হইয়া বঙ্গে ফিরিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার একটি স্মারক-লিপি ঐ সময় পাষাণ-গাত্রে খোদিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাক ১১২৭

শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মায়য়ুঃ ॥

এরূপে দেখা যায় গ্রন্থকার 'কামরূপ-শাসনাবলী'ভুক্ত শাসনসমূহ হইতে অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। আসামের সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলন কালে ঐ সকল উপকরণ অনেক কাজে লাগিবে। গ্রন্থ মধ্যে উল্লিখিত তাম্র-শাসনসমূহের মূলপাঠ ও অনুবাদ টিপ্পনীসহ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল টিপ্পনীতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। তাছাড়া প্রায় বারখানি লিপি ও শাসনের প্রতিলিপি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকার প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর পথ সুগম করিয়াছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বনমর্ম্মর—নয়টি গল্পের সমষ্টি। শ্রীমনোজ বসু প্রণীত। প্রবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত।

বইখানির বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া "প্রবাসী" বলিয়াছেন যে মনোজ বসু বয়সে কাঁচা হইলেও লেখার spirit-এ অতি-আধুনিক নহেন। আমার ধারণা, তাঁহারা অত্যুক্তি করেন নাই। অতি-আধুনিক লেখকদের সহিত মনোজবাবুর একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেটি হইতেছে তাঁহার চিন্তার ধারায় এবং গল্পের বিষয় নির্ব্বাচনে। তাঁহার লেখার মধ্যে কোথাও অশ্লীলতার আবিলতা নাই। একটু উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে।

বইখানির দ্বিতীয় গল্প "রাজা"র একটি পাড়াগাঁয়ের বধূ লোকের মুখে শুনিয়াছে যে তাহার স্বামী সুধীর কলিকাতায় বড় চাকরি পাইয়া রাজার মত লোকলস্কর লইয়া

বাস করিতেছে। অনেক দিন পরে এই স্বামী যখন বাড়ী আসিতেছেন এবং বধূর সহিত মিলনের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তখন বধূ কিন্তু সাজগোজের বাহুল্যে স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠেন নাই, তিনি ভাবিতেছেন, "যেন কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারাণো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুসী হইয়াছেন যে, সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাঁহার সেই জন্মদুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরাণী।" যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্য্যায়ে গিয়া পৌছায় তাহা মনোজ বসুর আছে।

গল্পগুলির মধ্যে "বনমর্ম্মর" নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। ইহাতে লেখক যে লিপিকুশলতা, কল্পনাশক্তি, ভাষার সৌন্দর্য্য এবং সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য। মনোজ বসু কবি না হইলে ঐরূপ গল্প সৃষ্টি করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বে যে retrospect-এর উল্লেখ করিয়াছি তাহা-ও এখানে বিদ্যমান। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজবধূ মালতীমালা এবং এই বিংশ শতাব্দীর সুধারাণী যেন কালের যবনিকা অপসারিত করিয়া এক হইয়া মিলিয়াছে। এই যে অতীতে এবং বর্ত্তমানে যোগসূত্র গ্রন্থন, ইহাতে মনোজ বসুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিশাশেষের বনভূমির বর্ণনা কল্পনা এবং শ্রদ্ধার প্রাচুর্য্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এত কথা বলিবার পরেও মনে হয় লেখক যদি শেষের দিকে শঙ্করকে ঘোড়া হইতে আছড়াইয়া না ফেলিয়া স্বাভাবিক ভাবে গল্পের পরিসমাপ্তি করিতেন তবে তাহা আরও জোরালো হইত। মনের সম্মুখের অতি-প্রাকৃত ঘটনা অতি-প্রাকৃত রাখিলেই চলিত, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজকুমার জানকীরাম যদি বিংশ শতাব্দীর ডেপুটি শঙ্করের ঘোড়াটি সম্বন্ধে লোলুপ না হইতেন তাহা হইলেই শোভন হইত।

কিন্তু "রাত্রির রোমান্স" গল্পটি এই হিসাবে আমার নিকট একেবারে নিখুঁত বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহাতে একবিন্দু কষ্টকল্পনা বা আতিশয্য নাই। একেবারে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক গল্প পরিপূর্ণ রসে টল্‌টল্ করিতেছে। গল্পের শেষের প্যারাটি পড়িয়া পাঠক একেবার হাসিয়া লুটাইয়া পড়িবেন। যে কিশোরী বধূটি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বামীর সহিত প্রেমালাপ করিয়াছে এবং নিদ্রাতুর স্বামী তাহার গল্পকে উপেক্ষা করিতেছেন মনে করিয়া অভিমানে এই-পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইতে ইচ্ছুক হইয়া চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, যে কোমল-হৃদয় ভীরু স্বামী এই পত্রাংশকে সত্য মনে করিয়া প্রত্যূষেই স্ত্রীকে সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া ফিরিতেছে, সেই অভিমানিনী মহিলাই রান্নাঘরে বসিয়া ননদীর সহিত লঙ্কা ও লবণ সহযোগে কাঁচা আম জরাইয়া নির্ভাবনায় গলাধঃকরণ করিতেছে দেখা গেল। মনোজবাবুর এইরূপ হাস্যরস সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে তাহার আর দুই একটি প্রমাণ দিব।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হইতেছে—প্রভা বলিতেছে, "ওঃ সর্ব্বনাশ। তুমি যে অত কাছে এসে বসলে—মাঝে মোটে পাঁচ-সাত হাত জায়গা। আর একটুখানি দূরে গিয়ে বসতে হয়। মাঝিরা দেখ্‌লে ভাববে কি?"

এক যাত্রাদলের যাত্রার বর্ণনায় মনোজবাবু বলিতেছেন, "আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চিঁ চিঁ করিয়া বলিতেছে—দুধ, দুধ খাব বাবা—আর দ্রোণাচার্য্য দুই হাতে সেই দাড়ি-সমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে একবার বেহালাদারদের

পশ্চাদ্দেশে একবাব বা ছেঁডা সামিয়ানাব ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিযা বেডাইতেছেন। কিন্তু এত অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকবা হাবমোনিযামেব বাক্সেব এক কোণ হইতে একটা ছোট এলুমিনিযমেব তেলেব বাটি বাহিব কবিযা আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য্য কোনপ্রকাব উপকবণ ব্যতীত বোধকবি কেবলমাত্র তপঃ-প্রভাবেই সেই বাটিতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিযা ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওযাইযা দিলেন।”

বইখানিব সব গল্প লিখিবাব কালে ছোট গল্প লিখিবাব টেকনিক যে লেখকেব পূর্ণরূপে আযত্ত হয নাই তাহা লেখা হইতে ধবা পডে। মনোজবাবু নব-বিবাহিত দম্পতিব প্রেমালাপন চিত্রিত কবিতে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তাঁহাব লেখাব মধ্যে কোথাও প্লটেব দ্বন্দ্ব দেখিলাম না। জীবন স্বচ্ছতোযা তটিনীব মত তব্ তব্ কবিয়া বহিয়া গেলে সুখেব হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তব জীবনে ত তাহা হইবাব নহে। এখানে ব্যর্থতা আছে, নিবাশা আছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, বিশ্বাসঘাতকতা আছে কিন্তু মনোজবাবুব গল্পে সেরূপ কোন ঘটনা ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি সবলভাবে সোজা গল্প বলিযা গিযাছেন। পবে তিনি যে গল্প লিখিবেন তাহাতে মনস্তত্ত্বেব দ্বন্দ্বেব অভাব থাকিবে না আশা কবি।

প্রচ্ছদপট শিল্পী মনীষী দেব অঙ্কিত। ভালই লাগিল।

শ্রীঅবনীনাথ বায

Poems—BY HUMAYUN KABIR (Basil Blackwell, Oxford)

কাব্যগ্রন্থে ভূমিকা আমাব কোনদিনই পছন্দ হয না, আব যে-মুখবন্ধ দিযা হুমাযুন কবিব মহাশয তাঁহাব ক্ষীণকায কবিতাপুস্তক আবম্ভ কবিযাছেন তাহাব মতো বিবক্তিকব ভূমিকা আমি খুব কমই পডিযাছি। তাহাতে এই সংবাদটি দেওযা আছে যে পুস্তকস্থ প্রায সবগুলি কবিতাই অল্প কযেকদিনেব মধ্যে অনুবাদ কবা হইযাছে। মনে হয এ তথ্যটি নিতান্ত বাহুল্য। যে-পাঠকেব কিছুমাত্র বসবোধ আছে তিনি ইহাব কযেকটি কবিতা পডিযাই কাঁচা ও চঞ্চল হাতেব পবিচয পাইবেন। তাডা-হুডাব কাজে কত যে গলদ থাকিযা যায গ্রন্থকাব যদি তাহা জানিতেন তবে নিম্ন-লিখিত লাইনগুলি প্রকাশ কবিবাব পূর্ব্বে তিনি থামিলেন না কেন,—

On the infinite waveless ocean of
unplumbed depths (Taj Mahal)

কিংবা

Till at last encircled by the flame
I saw my lost darling (The Quest)?

আব তিনি যখন মডার্নিষ্ট্ কবি নন্, তখন 'her'-এব সহিত 'far'-এব মিল দিবাব পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল। (ভূমিকায যখন তিনি যথাযোগ্য বিনযেব সহিত Foreigner's uncertainty about English sound-এব কথা বলিয়াছেন, তখন আশা কবি, তিনি ইহাবই উল্লেখ কবেন নাই।) এই মিলটি আছে তাহাব Faith-নামক কবিতায। মাত্র এই কবিতাটি সমিল, অনুবাদ নহে, মূলত ইংবাজীতে লেখা বলিযা বোধহয, এমন কি ইহা ১৯৩০-সালেব Oxford Poetry-তে

স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার কয়েকটি কবিতায় শিল্প-কুশলতার অভাব, চিন্তার দৈন্য ও রসালুতার বাড়াবাড়িকে তিনি যৌবনোদ্‌গমের দোহাই দিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ও সেই সঙ্গে এই যৌবনাবেগে গৌরববোধও করিয়াছেন। কিন্তু এ চেষ্টা তাঁহাদের কাছে খাটিবেনা যাঁহারা তাঁহার কবিতায় (তাঁহার ভাষায়) "যৌবনের জয়" না দেখিয়া, সোজাসুজি দেখিতে পাইবেন তাঁহার মানসিক অপরিণতি ও শিল্প-তন্ত্রের শিথিলতা। তথাপি বইটি একেবারে গুণ-শূন্য নহে। ১৯২৭ সালের কবিতাগুলি বাদ দিলে—এগুলি শুধুই কথার ঝুড়ি—তাঁহার কবিতায় অনেক লাইনে সুন্দর ভাব উপযুক্ত ভাষায় ও ছন্দে সজ্জিত হইয়া রূপ পাইয়াছে। 'জেহানআরা'র উপর কবিতাটি বা শেষ কবিতা 'জন্মদিনের উপহার'-কে আমি তাঁহার শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করি। সৌন্দর্য্যবোধের বা বুদ্ধির অভাব নিশ্চয়ই তাঁহার নাই, তবে, আধুনিক ভারতের অনেক তরুণ কবির মতো ইনিও অত্যন্ত রূপকপ্রিয় ও বিক্ষিপ্তচিত্ত। এই প্রবৃত্তিকে বলা যাইতে পারে, অনুধাবনযোগ্য উপদেশনাকে এড়াইয়া গীতিরূপ সৃষ্টির ফাঁকা চেষ্টা। কবিরের প্রেমের কবিতাও এই দোষে দুষ্ট। স্থান কাল ও ঘটনার খুঁটিনাটি এত বেশী যে আসল গীতি-মূলটি বর্ণনাবাহুল্যে চাপা পড়িয়া যায়। য়ুরোপের তরুণতর কবিদের অতি-আধুনিক কবিতার যে দুটি প্রধান বিশেষত্ব—সবল, বিশেষণবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ গীতিময় প্রকাশ, ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত নাটকীয় রূপ তাহার একটিও প্রত্যাশা করা বৃথা। প্রতীকগুলি ভাবালুতায় ভরা, পটভূমিকায় প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনার অপব্যবহার শুধু রসোৎসের ক্ষীণতা লুকাইবার জন্যই। বাক্-জালের বিস্তারে কাব্যের সুমিষ্ট ফলটি আচ্ছাদিত।

কবির মহাশয়ের গ্রন্থ দুটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের অবতারণা করে। ভারতীয়ের পক্ষে ইংরাজীতে কবিতা লেখা উচিত কি ? এ প্রশ্নের বিচার করা এখানে অসম্ভব। এটুকু আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয়ের ইংরাজী কবিতা মাতৃভাষায় লিখিত কবিতার উৎকর্ষ বা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। শুধুই difference in atmosphere, tradition and background—যাহার উল্লেখ কবির মহাশয় করিয়াছেন—ইহার সম্পূর্ণ কারণ নয়। বোধহয়, আমাদের মেজাজ ইংরাজীভাষায় ভাবপ্রকাশের অনুপযুক্ত। ইংরাজীভাষার প্রকৃতি আমাদের উচ্ছ্বাসপ্রিয়তার বিরোধী। অপর প্রশ্নটি এই, অনুবাদে মূলের গুণবৃদ্ধি হয় কি না। কবির মহাশয়ের ক্ষেত্রে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত কবিতার লক্ষণই এই যে তাহা অননুবাদ্য। পরিমগুলটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ফিট্‌স্‌জেরাল্ড্ ওমর খৈয়ামের ভাষা ভাঙিয়া-চুরিয়া লইয়াছিলেন। আমার বক্তব্য ইহা নহে যে প্রকৃত কাব্যের সারভূত বিশ্বজনীনতা মূলভাষাভাষীর পরিধির বাহিরে বোধগম্য হইবার নয়। রূপনার বিস্ময়করত্ব ও প্রকাশের যাথার্থ্য অন্য ভাষায় সংক্রমিত করা যায় না। কাব্যে ভাব ও ভাবচ্ছদ ভাষার সংযোগে এমনই প্রাণময় যে এক হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। কবির মহাশয় এ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিলে ভাল করিবেন। ইহা নিঃসন্দেহ তাঁহার রচনায় সাফল্যের আভাস আছে। আর আছে বাংলা ও ইংরাজী দুভাষাতেই দক্ষ পরিচালন-শক্তির পরিচয়। কিন্তু যতদিন না তিনি স্বকীয়তর প্রতীকাবলী ও রচনারীতি অর্জ্জন করিতে পারেন, ততদিন তাঁহার কিছু না লেখাই ভালো।

শাহেদ সুহরর্দ্দি

Akbar—BY LAURENCE BINYON (Peter Davies Limited)

এই নাতিদীর্ঘ পুস্তকখানি সম্রাট আকবরের জীবন-কথা। যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তিনি ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাত নহেন। তাঁহাকে লোকে জানে কলাশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া। কিন্তু ইতিহাস লেখা তাঁহার পেশা নয় বলিয়াই আলোচ্য বইখানি এমন সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে যে বাদ্শাহ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, অনেক জিনিস বাদ পড়িয়াছে। তবু স্মিথ্‌ তাঁহার পুস্তকে যাহা পারেন নাই বিনিয়ান তাহা করিয়াছেন, Perspective পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। ইতিহাস হিসাবে, স্মিথের গবেষণার পর এ বই পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ইতিহাসই ত সব নয়। সাহিত্যের তরফ হইতে বিনিয়ানের পুস্তকের স্থান বহু উচ্চে। তাঁহার ভাষা এত সরস ও মনোরম যে পড়িবার সময় জানা যায় না শুষ্ক নীরস ইতিহাস পড়িতেছি। অথচ প্রাঞ্জলতার অভাব কোথাও নাই। ঘটনাবলীর পশ্চাতে লুক্কায়িত যে সনাতন নীতি বা সনাতন সত্য আছে তাহা, কোথাও তুলনার দ্বারা কোথাও বিনা দৃষ্টান্তে, গ্রন্থকার সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। শেষের দিকে মোগল বাদ্শাহীর অন্তর্নিহিত ট্রাজেডি পাঠকের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া আকবর-চরিত্রের মহিমা সুস্পষ্টতর করিয়াছেন।

মোটের উপর, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া মনে হয় যেন একখানি সুন্দর চিত্রপট দেখিলাম। জ্যোতিষ্কখচিত ভারত-গগন। মধ্যস্থলে সূর্য্যোপম এক মহিমা-মণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। তাহার চতুর্দ্দিকে তাহারই আলোকে উদ্ভাসিত গ্রহমণ্ডলী। বিনিয়ান আগে কল্পনা চক্ষে এই চিত্র দেখিয়াছেন, পরে তাহাই যথাযথ অঙ্কিত করিয়াছেন পাঠকের জন্য। যুগাবতার বাদ্শাহের এই মূর্ত্তিকে পূর্ণগৌরব দান করিবার জন্য যে রঙ ফলান উচিত তাহাই ফলাইয়াছেন, যে কাঠামোর মধ্যে তাহাকে বসান উচিত তাহাই বসাইয়াছেন, যাহাতে চিত্রের সামঞ্জস্য নষ্ট হয় এরূপ জিনিস চিত্র হইতে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু পটুয়ার বাহাদুরী এই যে পট দেখিয়া মনে এত আনন্দ হয় যে তাহা বিশ্লেষণ করিবার কোন প্রবৃত্তি থাকে না।

আকবরের যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবলপরাক্রান্ত শক্তিমান্ নরপতির উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অবতার ছিলেন। মধ্যযুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত ও ভৌমিকদিগকে দমনপূর্ব্বক মহাজাতি সংঘটন করাই তাঁহাদের যুগধর্ম্ম ছিল। কিন্তু এই মহাবল নৃপপুঞ্জের মধ্যে চরিত্রে আকবরের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। বিনিয়ান তাই তাঁহাকে "The greatest Potentate of his time in the world" বলিয়াছেন, আর তুলনা করিয়াছেন, সমসাময়িক কাহারও সহিত নয়, প্রাচীন ভারতের মগধসম্রাট অশোকের সহিত।

ভারতবর্ষসম্বন্ধে ইংরেজ-লিখিত অনেক পুস্তকে দুই-চারিটা হাস্যাস্পদ ভুল না থাকিয়াই যায় না। বিনিয়ান সাহেবের ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় নাই, অথচ "আকবর"-এ এরূপ গলদ নাই বলিলেই হয়। একস্থানে (৯৬ পৃঃ) "হিন্দু, জৈন, পার্সী, জরথুস্ত্রী, ইহুদী ও খৃষ্টী," এইরূপ আছে। এ ভ্রম নিশ্চয়ই অনবধান-জনিত, কারণ পুস্তকের অন্য অংশ (১০৮-১০৯ পৃঃ) হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিনিয়ান জানেন, পার্সীরাই ভারতের জরথুস্ত্রী। আর এক কথা, ইংরেজ গ্রন্থকার ভারত-সম্বন্ধে লিখিতে গেলেই, কোন না কোন রকমে তাহার superiority complex

(বড়াই) প্রকাশ হইয়া পড়ে। আলোচ্য পুস্তকে এ দোষও প্রায় নাই। জেসুইট্‌ পাদ্‌রীদের মতামতের উপর হয়ত গ্রন্থকার একটু বেশী নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু তাহা পক্ষপাতশূন্য বাহিরের লোক বলিয়া, সাহেব বলিয়া নয়। দু-এক স্থলে একটু ঠাট্টাও করিতে ছাড়েন নাই,

It appeared that Akbar had the utmose reverence for Christ and delighted in the Gospel but when he heard that there are three persons in one God, and that God had begotten a son from a virgin, then 'the king's judgment was dulled and clouded' (P 97)

উপরে বলিয়াছি যে বিনিয়ান মুক্তকণ্ঠে আকবরকে সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়াছেন। ১৯ পৃষ্ঠায় আকবরের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে করিতে লিখিয়াছেন—

But a man shows his greatness by the measure in which he surpasses the standards of his age Akbar's acts of cruelty, less cold-blooded than the cruelties of contemporary rulers in Europe—and even twentieth-century Europe cannot afford to give itself superior airs in this respect—these acts shock us because they were done by Akbar, who could be so singularly generous and forgiving

এখানে পাঠক স্মিথের সহিত বিনিয়ানের তুলনা করুন। স্মিথ্‌ স্বীকার করিয়াছেন যে প্রথম জীবনে নানাপ্রসঙ্গে আকবর দয়াপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সম্রাটকে দয়ালু-স্বভাব বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে আকবর প্রথম জীবনে নানা বিপদ্‌জালে বেষ্টিত ছিলেন বলিয়া ভয়ে লোককে শাস্তি দিতে সাহস করিতেন না। সমসাময়িক সাহেবেরা অধিকাংশই স্বীকার করিয়াছেন যে আকবর ন্যায়পরায়ণ, সরলচিত্ত ও দয়াপরবশ ছিলেন। স্মিথ্‌ সকলের মত অগ্রাহ্য করিয়া এক Bartoli-র মত গ্রহণ করিয়াছেন যে বাদ্‌শাহ বাহিরে দেখিতে সরল ছিলেন কিন্তু অন্তরে স্বার্থপর ও মতলবী ছিলেন। ইতিহাস মিথ্যা কথা বলে না বটে কিন্তু ঐতিহাসিকেরা অনেক মিথ্যা কথাই বলেন। এই যুগেরই ফ্রান্সের চতুর্থ হেন্‌রী একজন বিখ্যাত সদানন্দ নির্ভীক বীর ছিলেন। কিন্তু ক্যাথলিক ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে ক্রমাগত বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব সত্যের অপলাপের উদ্দেশ্য propaganda, কোন একটা বিশেষ মতের প্রচার। বিনিয়ান এরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়া আকবরের জীবনকথা লিখিয়াছেন এমন মনে করিবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যদি কোন গ্রন্থকার মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে না পারেন যে মেরী ও এলিজাবেথের দেশের তুলনায়, বর্জিয়া মেডি-চিদের দেশের তুলনায়, সেণ্ট বার্থলোমিউ হত্যাকাণ্ডের দেশের তুলনায়, প্রটেষ্টাণ্ট্‌ উন্মূলন বা Inquisition-এর জন্মভূমির তুলনায় ভারতের দয়া-দাক্ষিণ্যের আদর্শ অনেক উচ্চে ছিল, তাহা হইলে সেই গ্রন্থকারকে Miss Mayo-র সমধর্ম্মী বলা ছাড়া উপায় কি? উপরে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতে পাঠক দেখিবেন যে বিনিয়ান এ বিষয়ে সত্য কথা বলিতে ভয় পান না। আর একটা উদাহরণ দিতে পারা যায়। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে পাণিপথের যুদ্ধের পর বিজিত হিন্দুবীর হেমুর মাথা কাটিয়া ফেলা হয়। যুদ্ধান্তে হেমু আহত অবস্থায় আনীত হইলে বেহরাম খাঁ বালক আকবরকে বলিলেন, "উহার মাথা স্বহস্তে কাটিয়া গাজী হও।" বিনিয়ান

অধিকাংশ সমসাময়িক লেখকের মতানুযায়ী হইয়া বলিয়াছেন, আকবর আহত শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে সম্মত হইলেন না। স্মিথ্ কিন্তু এই লেখকবৃন্দকে চাটুকার আখ্যা দিয়া এক আহম্মদ্ যাদ্‌গারের কথা গ্রাহ্য করিয়া বেশ জোরের সহিত লিখিয়াছেন, আকবর হেমুর মাথা স্বহস্তে কাটিলেন। Propaganda বই আর কি? এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সত্য নির্দ্ধারণের জন্যও বিনিয়নের পুস্তকের প্রয়োজন ছিল।

আকবর বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী তুর্কীযোদ্ধা তৈমুরের বংশধর। তাঁহার পিতামহী গুলবদন বানু নির্ম্মম নির্ভীক মোঙ্গলবীর চেঙ্গীসের বংশজাতা। তুর্কী ও মোঙ্গল এই দুই রক্তের ধারা আকবরকে যুদ্ধ-পাগল করিবে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি যে মহাবীর ছিলেন তাহাতে সংশয় নাই। বিনিয়ন তাঁহার সাহস ও বাহুবলের অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী বশ করিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সশস্ত্র মহাবল আহমদ্ খাঁকে তিনি তাঁহার বজ্রমুষ্টির এক আঘাতে প্রায় বধ করিয়াছিলেন। চিতোর অবরোধের সময় বহুদূর হইতে অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া জয়মল্লকে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব হয়ত ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরীও পারিতেন। আকবর যে শুধু মল্লবীর কি সেনানী কি দিগ্বিজয়ী ছিলেন তাহা ত নহে, তাঁহার হৃদয়ে অসংখ্য সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল। মাতা হামিদাবানুর রক্তের সহিত ইরাণের কাব্য, ইরাণের চিত্রকলা, ইরাণের স্বাধীন চিন্তা তাঁহার ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

পিতামহ বাবরশাহ জগজ্জয়ী বীর হইলেও কবি ছিলেন, সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিনিয়ন বড় সুন্দর কয়টি কথা লিখিয়াছেন ঃ

A man could win his heart by his love of poetry as surely as by his swordsmanship Was he flying from his enemies in bitter weather with a handful of followers, he would compose a few couplets as he rode, and his spirits revived as by magic But it was his intense delight in the beauty of the world which made so large a part of his unquenchable zest in life Was ever such a lover of flowers? His first thought in a newly acquired territory was to make a garden

পিতা হুমায়ুন যোদ্ধা ছিলেন না, বাবরের সাম্রাজ্য সহজেই হারাইলেন। তাঁহার নিকট হইতে পুত্র যুদ্ধবিদ্যা শেখেন নাই। কিন্তু ইরাণের culture- (কৃষ্টি) এর সহিত আকবরের মিলন তিনিই করাইয়াছিলেন। যখন পুত্রের জন্ম হয় তখন হুমায়ুন সাম্রাজ্যহীন সম্রাট, নানারূপে বিপন্ন। তথাপি তিনি পুত্রকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ করার চেষ্টা একদিনের তরেও ত্যাগ করেন নাই। গ্রন্থকার আকবরের বাল্যশিক্ষার বিবরণ অল্পকথায় কিন্তু সুন্দর ভাষায় দিয়াছেন। অক্ষর পরিচয় হইল না বটে কিন্তু হাফেজ্ ও রুমীর কবিতা আগা-গোড়া আবৃত্তি করিতে শিখিলেন।

একটা কথা বিনিয়ন বলেন নাই কিন্তু বলিতে পারিতেন। পরজীবনে আকবরের হিন্দুদের সহিত যে ঘনিষ্ঠ যোগ হইয়াছিল তাহারও গোড়া-পত্তন পিতার চরিত্রে। হুমায়ুন চিতোরের কুমারী কর্ণাবতীর রাখী-ভাই ছিলেন। ধর্ম্মান্ধ হিন্দুবিদ্বেষী হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না। পরে যখন উমরকোটে আকবরের জন্ম হইল তখন হুমায়ুনের প্রধান সহায় ও দেহরক্ষক ছিলেন এক হিন্দু রাণা ও তাঁহার সৈন্যদল।

এইরূপ নানা কারণে আকবরের মনে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা সার্ব্বজনীন ভাব অল্প বয়সেই বিকশিত হইযাছিল, ফৈজী ও তাহার ভ্রাতার সহিত পরিচয়ের অনেক পূর্ব্বে। ইহারই ফল ফতেহপুরের ইবাদতখানা ও নবধর্ম্ম দীন ইলাহীর প্রচার।

এ পর্য্যন্ত বোঝা যাইতেছে যে আকবর একাধারে দিগ্বিজয়ী বীর ও সুফী ভাবুক। কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষাও মহৎ ছিলেন। সৃষ্টি ও ধ্বংসের সম্বন্ধ পূর্ণমাত্রায় বুঝিযাছিলেন। হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে কত স্বাধীন রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বদা এই একই উদ্দেশ্যে যে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন আর সেই সাম্রাজ্যের চালনায় ভারতের সকল জাতি সকল সম্প্রদাযকে তাঁহার সহায করিবেন। বিনিযান ঠিক বলিযাছেন যে বিজিত স্বাধীন রাজাদের জন্য দুঃখ হওযাই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্রাটের উদ্দেশ্য যে কত মহৎ তাহাও আজিকার দিনে ভারতবাসীর হৃদযঙ্গম হওয়া উচিত। যে-সৌধ নির্ম্মাণ তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল তাহাই কি আজ আমাদের রাষ্ট্রনীতির মুখ্য কাম্য নয? যদি এরূপ বলা যায যে আকবর নিষ্কাম ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করিতেন, হযত কথাটা ভাল শুনাইবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে অনেক সমযে সম্রাট শত্রুবধের পর গভীর অনুতাপে দগ্ধ হইতেন। দিল্লীতে জযমল্ল ও পত্তের মূর্ত্তিস্থাপন বোধহয এইরূপ পশ্চাৎতাপের দৃষ্টান্ত।

আকবরকে বিদেশী বিজেতা মনে করার মত ভুল আর কিছু নাই। তিনি বিদেশ হইতে আসেন নাই, এই দেশেই তাঁহার জন্ম। সিংহাসনে বসিযা সারা জীবন চেষ্টা করিযাছিলেন যে ভারতবাসীর চক্ষে তিনি বিদেশী বা বিধর্ম্মী না থাকেন। হিন্দুকন্যার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, গোঁড়া মুসলমান ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। পরিশেষে এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। স্বধর্ম্মীদের প্রতি সদ্ব্যবহার হযত করেন নাই কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারাও রাজকার্য্যে সম্রাটের সমদর্শন, ধর্ম্মবিষযে সার্ব্বজনীন উদারমত বুঝিতে পারিতেন না। নিন্দাবাদও করিতেন, শত্রুতাচরণও করিতেন। সম্রাট মথুরাযাত্রীদের দেয কর বদ করিলেন, জিজিযা কর উঠাইযা দিলেন, এ সব বাদৌনিপ্রমুখ মুসলমানদের কিরূপে ভাল লাগিবে? ভগবানদাস, মানসিংহ, টোডরমল্লকে বিশ্বাস করিযা শাসকসম্প্রদাযের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, ইহা মোগল আমীর উমারাওদিগের কেমন করিযা গ্রাহ্য হইবে? কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে আকবর স্বজাতি স্বধর্ম্মীর বিরাগভাজন হইযাও এই সব কাজ করিলেন সে উদ্দেশ্য ত সফল হইল। বাবর ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান বাদ্‌শাহেরা কেহই ভারতে স্থাযী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। আকবর পারিযাছিলেন। প্রায দুই শতাব্দী সে সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। আরও এক শতাব্দী আকবরের বংশধর দিল্লীর তক্ত অলঙ্কৃত করিযাছিলেন, যদিও সে তক্ত নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইযাছিল। বিনিযান এ সমস্তই আলোচনা করিযাছেন এবং বারবার বলিযাছেন যে আকবর অন্তরে সুফী ফকীর ছিলেন, স্বার্থপর ভোগী ছিলেন না।

তিনি একটা আশ্চর্য্য কথা বলিযাছেন। নানাসমযে বাদ্‌শাহ যে অসমসাহসিক কার্য্য করিযা নিজের জীবন বিপন্ন করিতেন তাহার মূল উদ্দেশ্য নিজের বাহাদুরী প্রকাশ নহে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। যেন তিনি ভগবানকে বলিতেছেন, "এই ত সুযোগ দিতেছি যদি আমি অযোগ্য হই আমার জীবন শেষ করিযা দাও।" এইরূপ এক ঘটনা ৪৮ পৃষ্ঠায বর্ণিত হইযাছে। তখন আকবর চৌদ্দ বৎসরের বালক। একদিন সংসারের

ক্ষুদ্রতা স্বার্থপবতা দেখিযা বিবক্ত হইযা বাদ্শাহ আগ্রাব নিকটস্থ মরু-প্রদেশে বাহিব হইযা গেলেন। সঙ্গে কেহ নাই, সহিস পর্য্যন্ত নয়। সেখানে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইযা বসিলেন। দুর্দ্দান্ত অশ্ব পলাইযা গেল। বালক অনেকক্ষণ বসিযা ধ্যানস্থ বহিলেন। কিছুকাল ভগবৎ-সান্নিধ্য অনুভব কবিযা প্রাণমন শান্ত শীতল হইল। কিন্তু একাকী কি কবিবেন? কোথায যাইবেন? এমন সমযে দেখিলেন অশ্ব হাযবান হইযা দুব হইতে দৌড়িযা আসিতেছে। প্রভুব নিকটে আসিয়া স্থিব হইযা দাঁড়াইল। যেন বলিতেছে, "হাজিব জাহাঁপনা"। আকবব বুঝিলেন ভগবান তাঁহাকে আদেশ কবিতেছেন সিংহাসনে ফিবিযা যাইতে। বিনিযান বলেন, "This adventure was the prelude to other experiences of a like nature"। বাজসিক চাঞ্চল্যেব সহিত সাত্ত্বিক শান্তিব অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এই বাজর্ষিতে। তাঁহাব জীবনেব অনেক ঘটনা বোঝা যায না। প্রযোজন বোধ কবিলেই তিনি সংগোপনে ভগবানেব আদেশ প্রার্থনা কবিতেন, আব সেই ধ্যানলব্ধ আদেশ সত্য হউক বা কল্পিত হউক অক্ষবে অক্ষবে প্রতিপালন কবিতেন। ফতেহপুব সিক্রী নির্ম্মাণ কবিবাব জন্য চৌদ্দ বৎসব ধবিযা কি আশ্চর্য্য উদ্দাম ও অধ্যবসায দেখাইলেন। তাবপব পঁচিশ বৎসব যাইতে না যাইতে হঠাৎ সেই বিশাল নগবী ত্যাগ কবিলেন, চিবদিনেব জন্য। মস্জিদেব তোবণেব উপব ক্ষোদিত বাণী সার্থক হইল, "ঈশা বলিযাছেন, এই জগৎ সেতুস্বরূপ, ইহাব উপব দিযা চলিযা যাও কিন্তু কদাপি ইহাব উপব গৃহ নির্ম্মাণ কবিও না।"

শেষ জীবনে সম্রাট কষ্ট পাইযাছিলেন পুত্রদেব জন্য। দানিযল মুবাদ অতিবিক্ত মদ্যপান কবিযা অকালে পবলোকে গেল। জ্যেষ্ঠ সেলিম বাববেব বংশে পিতৃদ্রোহ পাপেব বীজ বপন কবিল। তাঁহাব চবম শুকীর্ত্তি আবুল ফজলেব হত্যা। আকবব পুত্রবৎসল ছিলেন তথাপি এ মহাপাপ তিনি আমবণ মার্জ্জনা কবিতে পাবেন নাই। অসীবগড় বিজয যুদ্ধক্ষেত্রে আকববেব শেষ কীর্ত্তি। তখন বৃদ্ধ হইযাছেন, সেলিমেব জন্য প্রাণে শান্তি নাই। অসীবগড় দখল কবাব সময তিনি এমন সব কার্য্য কবিযাছিলেন যাহা বীবজনোচিত বলা যায না। বিনিযান একথা স্বীকাব কবিতে একটুও দ্বিধা কবেন নাই। দাক্ষিণাত্য জয স্থগিত বহিল। কিন্তু পুত্রকে বিশাল সাম্রাজ্য দিযা গেলেন, আব বাজপুতদিগকে সেই সাম্রাজ্য বক্ষা কবিবাব কাজে বহাল কবিযা গেলেন।

আমাব সমালোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইযা পড়িল। তবু হযত পাঠককে বিনিযানেব পূর্ণ পবিচয দিতে পাবিলাম না। আমাব একান্ত অনুবোধ, সকলে বইখানা নিজে পড়েন।

পুস্তকে সম্রাটেব একখানি প্রাচীন চিত্র দেওযা হইযাছে। চিত্রখানি অতি সুন্দব। দেখিলে বোঝা যায যে আকবব তুর্কী ও মোগল বক্তে জন্ম লইযাও ভাবতবাসী বই আব কিছু ছিলেন না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

The Fountain—By Charles Morgan (MacMillan & Co)

সত্যসত্যই ভালো ইংরাজী নভেলের আজকাল এতই অভাব যে যুদ্ধের পর হইতে প্রকাশকদিগকে বাধ্য হইয়া বিদেশী লেখকের অনুবাদ ছাপিতে হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক সংস্পর্শও এ ঝোঁকের সহায়তা করিয়াছে। কাজেই মর্গ্যান্-এর ফাউণ্টেন-এর মতো কোন যথার্থ ভাল নভেল সাধারণের নিকট উপস্থাপিত হইলে তাহাকে অভিনন্দন করাই কর্ত্তব্য। ইহাকে কোনক্রমেই মহৎ গ্রন্থ বলা চলেনা, যদিও মহত্ত্বের অনেক নিদর্শন বইটিতে বিদ্যমান। যে-ধরণের চমৎকার রচনা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা আজ ইংলণ্ডে উপেক্ষিত, অথচ ইহা ইংরাজী নভেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধারার সহিত নিকটসম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে আরো আছে সম্মোহন, প্রশান্তি ও চিন্তার গভীরতা—যাহা গ্রন্থকারের স্বকীয় বিশেষত্ব। যেখানে তিনি মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন সেখানে আমরা এমন অন্তর্ভেদী, প্রায় নিষ্করুণ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখিতে পাই যাহা সচরাচর ইংরাজী পুস্তকে চোখে পড়েনা ও যাহা হইতে গ্রন্থকারের য়ুরোপীয় রচনাপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বোঝা যায়। তাঁহার জীবনদর্শনে ইংরাজিত্ব নাই বলিলেই চলে—দুএক স্থানে ছাড়া, যেখানে তাঁহাকে ব্যবসায়-বুদ্ধির দিক দিয়া বইটির খুব কাট্‌তির কথা ভাবিতে হইয়াছে, অথবা যেখানে লোকচিত্তের উপর আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের প্রভাবের পরিমাপ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ যখন হল্যাণ্ডের মনোরম বর্ণনাগুলি পড়া যায়—স্থবির, নিরপেক্ষ কৃষক-আভিজাত্যের ঘুণ-ধরা সাধুতাপূর্ণ হল্যাণ্ড—ও তাহার পর যুদ্ধশীল জাতিগুলির বিভিন্ন নরনারীর মানসিক বিশ্লেষণের অংশগুলির সহিত প্রতি-তুলনা করা যায়, তখন ভয় হয় মর্গ্যান্ বুঝি-বা সমর-সাহিত্যের সদ্য-স্ফীত ধারাকেই প্রবর্দ্ধনের চেষ্টায় আছেন। এই সমর-সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপে একটি বিশেষ অভাব পরিপূরণ করিতেছে, ইহা একদিকে যুদ্ধকে ভুলাইবার চেষ্টায় আছে, অন্যদিকে তাহার শোকাবহ করুণ স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চায় তাহাদের জন্য যাহারা পূর্ব্বতন সামরিকগণের অক্ষমতার বিষয়ে উদাসীন ও যাহারা ভুলিয়া যায় যে তাহারা উচ্চ-নিনাদিত মন্ত্রের নিকট আত্মাহুতি দিয়াছিল। কিন্তু মর্গ্যানের মতো ক্ষমতাশালী লেখক বিরল। তাই তিনি স্বীয় বৃত্তির অখণ্ডতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রেমবিষয়ক বিস্ময়কর পৃষ্ঠাগুলি লিখিয়া ফেলিলেন। মর্গ্যানের মনস্তাত্ত্বিক সত্যশীলতা গল্পটির ন্যায়সঙ্গত পরিণতি পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে নাই বটে, শেষ মধুর মিলনের চিত্রটি প্রত্যাশিত ও দুর্ব্বল—তা সত্ত্বেও আমরা অনেক আবেগকম্পিত পরিচ্ছেদ পড়িতে পাই যাহাতে প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহার একমুখিনতা, তাহার প্রলয়ঙ্কর সমারোহ, তাহার আত্মসর্ব্বস্ব আত্মত্যাগ ও তাহার সন্ন্যাসময় সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় হল্যাণ্ডের প্রান্তস্থিত একটি দুর্গে একদল ইংরাজ সেনাপতি কথা দিয়া বন্দী আছে গল্পের আরম্ভ এইখানে। নায়কটি ঠিক সাধারণ সৈনিক শ্রেণীর নহে, যদিও সৈনিকোচিত সমস্ত গুণাবলী তাহার আছে। সে ছিল একটি ইংরাজ প্রকাশালয়ের অংশীদার। অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সে খুঁজিতেছিল এমন সংকীর্ণ নির্জ্জন স্থান যেখানে সে মানব জীবনের চিন্তাগর্ভ মুহূর্ত্তগুলির সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিতে পারিবে। সেনাপতিরা শপথগ্রহণের পর বড় বড় সহরে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ইংলণ্ডে পলাইয়া গেল, কেননা তাহার

প্রাণ ছিল যুদ্ধোন্মাদনায পূর্ণ, তাহাব দেশ যখন যুদ্ধ কবিতেছে তখন তাহাব পক্ষে নিষ্ক্রিয থাকা অসম্ভব। সম্প্রতিকাব সামবিক সাহিত্যে সেনাপতিগণেব ধর্ম্মবিশ্বাসে লেখকদিগেব অন্ধ আস্থা দেখা যায। মর্গ্যানেব পুস্তকেও দেখা যায, সেনাপতিটি সাধাবণ ফর্ম-এব অনুরূপ একটি প্যাবোল্-ফর্ম ছাপাইল যাহাতে ফিবিযা আসিবাব দিব্য কবাব কথাগুলি ছাপা হইল না। দুর্গেব অধ্যক্ষ অবশ্য সে-চালাকী ধবিতে পাবিলেন না, কাজেই ইংবাজ সেনাপতিটিব ধর্ম্মবোধ ও সমববাসনা দুই-ই বজায বাখা হইল। মর্গ্যানেব মনেব গতি দেখাইবাব জন্য আমি ইচ্ছা কবিযাই এই অসংলগ্ন ঘটনাটিব উল্লেখ কবিলাম। নাযকেব পলাযনে ইচ্ছা নাই, তথাপি সহচাবিত্বেব উপবোধ, তাহাবই শয্যাতল হইতে সুডঙ্গ খননে সহাযতা কবিল ও এ প্রচেষ্টা ধবা পডিযা যাওযায মহাস্বস্তি পাইল। তাহাব বচনায সে একান্ত নিবিষ্ট, বিশ্ব জগৎ তাহাব নিকট লুপ্ত, এমন সময হঠাৎ একদিন হলণ্ডেব অতি প্রাচীন ভান্ লাইডেন বংশেব এক ভদ্রলোক দুর্গ পবিদর্শন কবিতে আসায, তাহাব মনে পডিযা গেল একটি বালিকাব কথা যাহাকে সে ইংলণ্ডে পডাইত ও যাহাব মাতা স্বামীবিযোগেব পব জ্যেষ্ঠ ভান্ লাইডেন-এব শিশুগুলিব গভর্ণেস্ হইযা আসিযা পবে তাহাদেব বিমাতৃত্বে উন্নীত হইল। দুর্গত্যাগেব পব সে একটি বন্ধুব সহিত ভান লাইডেন জমিদাবীতে বাস কবিতে চলিল, তাহাদেব বহুমূল্য গ্রন্থাগাবেব আকর্ষণে। এখানে তাহাব প্রাক্তন ছাত্রী জুলি-ব সহিত সাক্ষাৎ। তাহাদেব পবস্পবেব অনুবক্তি বাডিবাব কাবণ এ নয যে তাহাবা কোন এক সমযে মিলিত হইযাছিল, কাবণ এই যে জুলি ইংবাজকন্যা, সুতবাং যুদ্ধে পক্ষপাতিত্বেব তীব্রতা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব কবিত। তাহাব বিবাহ হইযাছিল ফন্ নাব্‌ভিৎস্-নামক একজন অভিজাত বংশীয জর্ম্মান অফিসাবেব সহিত। জুলি তাহাব নামই কবিত না। স্বজাতীয সমবেদনাব জন্য সে শ্বশুবকুল হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা যুদ্ধ শেষ না হওযা পর্য্যন্ত হল্যাণ্ডে মাযেব কাছে বাস কবিতে আসিযাছিল, তাহাব স্বামীবই ব্যবস্থায। জুলি কোনদিন তাহাব স্বামীকে ভালোবাসিতে পাবে নাই, কিন্তু প্রগাঢ় শ্রদ্ধা কবে; সে জানে তাহাবই পূজাব জন্য স্বামী নিজেব হৃদযকে প্রেমমন্দিবে পবিণত কবিযাছে। সন্দেহ জাগে, না ভালোবাসাব কাবণ সম্ভবতঃ এই যে কোন লোকপ্রিয পুস্তকে ইংবাজললনাব বিদেশীকে ভালোবাসিতে পাবা অসম্ভব। অনেক মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণাব পব ও সপ্তদশ শতক সম্বন্ধীয পুস্তক প্রণযণে সহকর্ম্মিতাব ফলে (যে-পুস্তক নাযকেব কাববাব ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশিত হইবাব সম্ভাবনা দেখা যায না) অ্যালিসন্ ও জুলি সহবাস কবিতে সঙ্কল্প কবিল। জুলিব প্রেমপবাযণতা ও আত্মসম্মানবোধ ইহাকে দেখিল যেন একটি ক্ষণস্থাযী আনুষঙ্গিক ব্যাপাব, চলমান জগতেব একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা, প্রুসীয প্রাসাদে আচাববহুলতাব মধ্যে স্বামীপ্রেমে ফিবিযা যাইবাব পূর্ব্বে একটি মাযাময উজ্জ্বল দৃশ্য। তাবপব ফন্ নাব্‌ভিৎস্‌কে আনা হইল ভান্ লাইডেনদেব সংসাবে। আব তিনি আগেব মানুষটি নহেন, বযস বাডিযা গিযাছে, দেহ যেন কতকগুলি খণ্ডাংশেব সমষ্টি, সুধু দৃষ্টিব সাবল্য তাঁহাব চোখে বহিযা গিযাছে। মর্গ্যান্ তাঁহাব শিল্পকলাব শীর্ষদেশে উঠিযাছেন নাব্‌ভিৎস্-এব অনমনীয অভিজাত ধর্ম্মেব বর্ণনায, যাহা ষ্টোইক্ মহত্ত্বেব ভাবধাবায পবিপুষ্ট হইযা, শাবীবিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণাব ভিতব দিযা গিযা প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানেব সম্পূর্ণতায উপনীত হইয়াছে। জুলিব খামখেযালী অথচ অপরূপ কোমল স্বভাব ইঁহাব মহত্ত্বব

আত্মশক্তির নিকট নত হইয়া পড়িল। ইঁহার শারীরিক সংস্পর্শ সহ্য করিতে না পারিলেও, জুলি তাঁহাকে যে অনিচ্ছাবিহীন, ঋদ্ধিসম্পন্ন ও স্থায়িষ্ণু প্রেম নিবেদন করিল তাহাতে এমন একটি বিরিক্তি অথচ পরিপূর্ণতা ছিল যাহা সে কখনও তাহার প্রেমিককে উপহার দিতে পারে নাই। আর অ্যালিসন্ তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইল চিন্তাশীলতার শরীরী মূর্ত্তি, বিশ্বের তরঙ্গাঘাতে যাহা প্রশস্ত দুর্গের মতো অটল স্থির হইয়া গিয়াছে। জুলি যে তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে তাহা স্বামীর অগোচর রহিল না। তাঁহার উৎসর্গীকৃত প্রেমই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিল, এখন নিজেকে অনাবশ্যক বুঝিয়া তিনি বাঁচিবার আগ্রহ ত্যাগ করিলেন। অনন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার ক্রমিক ক্ষয়প্রাপ্তি ও তাঁহার চরম অবসানের শেষ দৃশ্য বোধহয় বইটিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। পরিশেষে অ্যালিসন্ ও জুলি পরিণীত হইল।

মর্গ্যানের একটি বিশিষ্ট অভ্যাস আছে, কতকগুলি চরিত্রে ভাস্কর্য্যের উচ্চাবচতা প্রবর্ত্তন করা আর কতকগুলিকে প্রায় অখোদিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা। চরিত্রচিত্রণের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায় সেইগুলিতে যেগুলিকে তিনি হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। জুলি, ফন্ নার্‌ভিৎস্, ও বৃদ্ধ ভান্ লাইডেন্, সংযতবাক্, শক্তিমান্, সংকল্পিতমতি, ও কোমলচিত্ত,—এই চরিত্রগুলিকে তিনি প্রাণময় ব্যক্তিত্বের সজ্জায় সাজাইতে চাহিয়াছেন। গল্পের নায়ককে তিনি নিজ ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে দিয়াছেন, তাই তাহাকে প্রত্যক্ষ করার মতো তথ্য আমরা পাই না। অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্বন্ধে এ মন্তব্য আরো খাটে, যদিও মাঝে মাঝে তাহাদের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। যে-দৃশ্যে জুলি বিস্রস্তবসনে তাহার ঘরে প্রেমিকের অপেক্ষায় আছে, অথবা যে দৃশ্যগুলিতে ফন্ নার্‌ভিৎস্ মানবাত্মার গৌরবের বর্ণনা করিতেছেন আর তাহারা তাহাদের গুপ্তপ্রণয়ের অপরিহার্য্য প্রকাশ-সম্ভাবনায় কম্পিতচিত্তে তাঁহার নিকট ঘেঁষিয়া বসিতেছে—এগুলির বর্ণনায় মর্গ্যান্ সামাজিক নীতিব্যবহারের যে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে নিঃসন্দেহে সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের প্রথমশ্রেণীতে বসানো যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে তাঁহার অন্তর-বিশ্লেষণের সকরুণ ক্ষমতা যাহার সহিত মিশিয়া আছে নিষ্করুণ ন্যায়শীলতা ও জীবনপ্রবাহে জ্ঞান ও জ্ঞানাতীতের প্রতি সুগভীর অনুকম্পা।

শাহেদ সুহরবর্দ্দি

The Essential Shakespeare—By J Dover Wilson, (Cambridge University Press)

সাহিত্যজগতে মতভেদের অন্ত নাই, মিলের চেয়ে গরমিলের উদাহরণই অতি সহজে চোখে পড়ে, ইহাদের অনুপাত পৃথিবীর স্থলজলের অনুপাত অপেক্ষা অনেক বেশী। তবু একটি সাহিত্যিক সত্য হিমালয়ের উচ্চতার মতনই অবিসংবাদিত। তাহা এই, শেক্‌স্‌পিয়ার সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে চেষ্টা হইয়াছে গ্রীসের প্রাচীন নাট্যকারত্রয় বা ইটালীর দান্তেকে তাঁহার সমকক্ষ প্রমাণ করিতে। কিন্তু কবিকে মানবজীবনের অখণ্ড সমগ্রতার অবিকার চিত্রশিল্পী হিসাবে দেখিলে এ চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। একমাত্র হোমারই

হয়ত এ সমকক্ষতাব দাবী কবিতে পাবেন। কিন্তু তাঁহাব ক্ষেত্রেও বলা যায় নাকি জীবনেব বিস্তৃতিবোধে তাঁহাব ক্ষমতা শেক্‌স্‌পিযাবেব সমশ্রেণীব হইলেও, জটিলতাবোধে শেক্‌স্‌পিয়াবেব দৃষ্টি গভীবতব ? ইংবাজেব সহিত সংস্পর্শে আসিযা আমাদেব অন্নজগতে যত ক্ষতি হইয়া থাকুক, মনোজগতে পবমলাভ এই শেক্‌স্‌পিযাবেব সহিত পবিচয। ইংবাজীভাষাব সম্যক অনুশীলন ব্যতীত এ পবিচয নিবিড ও ঘনিষ্ঠ হইতে পাবে না। কোন্ অনুবাদে মূলেব অভাব মিটাইতে পাবে ? আব অনুবাদকেব হাতে পড়িযা অনেক সময বড কবিদেব কি দুর্দ্দশা হয তাহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ, শেক্‌স্‌পিযাবেব ফবাসী অনুবাদ।

জানিনা কেন, ইংবাজীভাষাব প্রচুব আলোচনা সত্ত্বেও আমবা শেক্‌স্‌পিযাবেব নিকট হইতে যতটা শেখা উচিত ততটা শিখি নাই। বঙ্গসাহিত্য মিলটন বাইবন শেলী কীট্‌স্ স্কট্-এব নিকট যতটা ঋণী, শেক্‌স্‌পিযাবেব নিকট তাহাব সিকিও নহে। বাংলাভাষায নাটক আছে নামে মাত্র। গুণবিচাবে এমন তিনখানি নাটক পাওযা যায না যাহাবা কোন বিখ্যাত ইংবাজী নাটকেব পাশে দাঁড়াইতে পাবে। নাটক না হইযাও একটিমাত্র বাংলা পুস্তক অনাসক্ত কল্পনাব সাবেগ স্ফুটনে শেক্‌স্‌পিবিযত্বেব পর্য্যাযে পড়ে—ববীন্দ্রনাথেব চতুবঙ্গ। এ কথা সত্য নয যে বাংলা নাট্যকাবেবা শেক্‌স্‌পিযাবেব সহিত পবিচিত নহেন। ববং অনেকস্থলে তাঁহাব অন্ধ ও অসংলগ্ন অনুকবণ হাস্য ও করুণাব উদ্রেক কবে। এই অক্ষমতাব মূলে আছে শেক্‌স্‌পিয়াবেব বিশাল প্রতিভাব স্বরূপ উপলব্ধি কবিবাব শক্তিব অভাব। এমন পাঠকেব সংখ্যা বিবল নয যাঁহাদেব শেক্‌স্‌পিযাব ভালো লাগে অবান্তব কাবণে, যে বিশিষ্ট কাবণে লাগা উচিত তাহাব জন্য নয। অনেক পাঠকেব নিকট শেক্‌স্‌পিযাবেব নাটকাবলী নৈর্ব্যক্তিক শিল্পকুশলতাব চবম নিদর্শন। ইহাদেব পিছনে যে গতিশীল, প্রতিক্রিযা-প্রবণ মানবীয় মন আছে তাহাব প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঁহাবা যথেষ্ট সচেতন নহেন্। কাব্য বুঝিতে গিয়া কবিপ্রকৃতিকে বুঝিতে চাহি না বলিযা আমাদেব কাব্যবোধ সম্পূর্ণ ও সৃষ্টি-সমৃদ্ধ হইযা উঠে না।

এ ত্রুটি শুধু আমাদেব দেশেবই বিশেষত্ব নয, যে দেশে শেক্‌স্‌পিযাবেব জন্ম সেখানেও ইহা অল্পবিস্তব দেখা যায। সেখানেও কবিব কাব্যেব আলোচনা হয জীবনকে বাদ দিযা, জীবনেব আলোচনা হয় কাব্যকে বাদ দিযা। সিড্‌নে লি লিখিত শেক্‌স্‌পিযাবেব জীবনচবিত কবিব জীবন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। তথ্য ইহাতে বহুল আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়াবেব যে-ছাপ ইহা মনে মুদ্রিত কবিযা দেয তাহা বিশ্বেব অদ্বিতীয কবিব নহে, যেন কোন সফলকাম বণিকপ্রববেব। ষ্ট্র্যাটফোর্ড-এব বাখাল বালক কেমন কবিয়া লণ্ডনে আসিযা কাব্যেব ব্যবসা কবিযা, পযসা কবিল—ইহাই এ গ্রন্থেব প্রতিপাদ্য, নিজেব ও কন্যা দুইটিব সংস্থানসংগ্রহ ছিল যেন কবিব সাহিত্য-সাধনাব প্রধান উদ্দেশ্য।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে এক কথায এই বলিয়া বর্ণনা কবা যায়, ইহা সিড্‌নে লি-ব জীবনচবিতেব তীব্র প্রতিবাদ। অবশ্য ইহা পূর্ণাঙ্গ জীবনচবিত নহে, দেড শত পৃষ্ঠাব মধ্যে তাহা আশা কবা বৃথা। ইহা একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা, a biographical adventure। ভূমিকায গ্রন্থকাব বলিতেছেন, কেহ যেন গ্রন্থেব নাম দেখিযা ভুল না বোঝেন। "Here, in a nutshell, is the kind of man I believe Shakespeare

to have been " is what it is intended to convey। তাঁহার ধারণা, অগণ্য জীবনচরিতের মিথ্যার তলে সত্য শেক্‌স্‌পিয়ার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকেই তিনি উদ্ধার করিতে চান। তিনি জানেন, কোন জীবনচরিতই লেখক-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, লেখকের স্বকীয় ঝোঁক বর্ণিত ব্যক্তির চরিত্রগঠন নিয়মিত করে। প্রত্যেক চরিতকারের মনে তাঁহার বিষয়-বস্তুর একটি আলেখ্য ফুটিয়া উঠে, তাঁহার লিখিত জীবনচরিতকে সেই আলেখ্যের অনুবর্ত্তী হইতেই হয়। ডোভার উইলসন্ বলেন, ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-এ শেক্‌স্‌পিয়ারের যে আবক্ষ মূর্ত্তিটি আছে তাহাই সিড্‌নে লি-কে ভুলপথে চালাইয়াছে। গারাট্ যানসেন্ কৃত এই প্রস্তর মূর্ত্তিটি সাধারণতঃ শেক্‌স্‌পিয়ারের যথার্থ প্রতিকৃতি বলিয়া গৃহীত, কিন্তু ডোভার ইউলসনের মতে শেক্‌স্‌পিয়ারের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধির পথে এই মূর্ত্তিটি সব থেকে বড় বাধা। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই মূর্ত্তিটিতে নাকি ফুটিয়া উঠিয়াছে নির্ব্বোধ ও আত্মতুষ্ট বিত্তশালীর ভাব। লি অনেকবার ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-এ গিয়া এ মূর্ত্তিটি ধ্যান করিতেন। তাই তাঁহার রচনা হইয়া উঠিয়াছে, এ মূর্ত্তিটি সজীব হইলে যেরূপ মানুষ হইত তাহার, শেক্‌স্‌পিয়ারের নহে।

লি-র বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহাভিযানের ধ্বজা ডোভার উইলসন্ তাঁহার গ্রন্থের মুখচিত্র হইতেই উড়াইয়াছেন। এ মুখচিত্রটি শেক্‌স্‌পিয়ারের নহে, তাঁহার একান্ত সমসাময়িক একজন যুবকের প্রতিকৃতি। ইহা "গ্রাফ্‌টন্ পোর্ট্রেট্" নামে পরিচিত। ছবিটির বিশেষত্ব এই, চিবুক, ঠোঁট, নাক ও প্রকাণ্ড কপাল মিলাইয়া দেখিলে শেক্‌স্‌পিয়ারের প্রচলিত প্রতিকৃতির সহিত ইহার ঘন সাদৃশ্য আছে, অথচ ইহার মুখের ভাব শেলীর মুখের মতো কবিত্বপূর্ণ ও চোখের দৃষ্টি অপূর্ব্ব বিস্ময়কর। এমন কোন প্রমাণ নাই যে ছবিটি শেক্‌স্‌পিয়ারের। অথচ ডোভার উইলসন্ বলেন, তিনি যত এটিকে দেখেন, ততই তাঁহার লোভ হয় ইহাকে শেক্‌স্‌পিয়ারের মূর্ত্তি বলিয়া ভাবিতে। অন্ততঃ তাঁহার বিশ্বাস, এটিকে প্রকৃত বলিয়া ভাবিলে শেক্‌স্‌পিয়ারের কবিপ্রকৃতিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত নাই-ই, তাঁহার কবিত্বের মর্ম্মোপলব্ধি করার সম্ভাবনাই বেশী।

এই সূত্রে গ্রন্থকার শেক্‌স্‌পিয়ার সম্বন্ধে আরো দু-একটি সুপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিয়া সজোরে খণ্ডন করিয়াছেন। শেক্‌স্‌পিয়ার সর্ব্বকালের কবি ত বটেনই কিন্তু একথা সাধারণতঃ মনে রাখা হয় না যে তিনি তাঁহার সমকালের কবিও বটেন। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল তাঁহার সমকালবর্ত্তীদের আনন্দবিধান করা। তাই তাঁহার নাটক তৎকালীন ঘটনাবলীর সরল ও বক্র উল্লেখে পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। এরূপ অনেক উল্লেখ বৃত্তিকারেরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তবু আরো কত যে লুকাইয়া আছে তাহার অবধি নাই। এলিজাবেথীয় ও জাকোবীয় যুগকে তন্ন তন্ন করিয়া না জানিলে এ সমস্ত আবিষ্কৃত হইবার নয়। আর এই সময়কার বাহ্য ও আন্তর ইতিহাসের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের আলোকে তাঁহার কাব্য পড়িতে হইবে, নহিলে তাঁহার কবিপ্রকৃতির রহস্য আমাদিগকে এড়াইয়া যাইবে। শেক্‌স্‌পিয়ার সম্বন্ধে আর একটি অতিপ্রচলিত ধারণা, তাঁহার ছিল চরম জ্ঞান ও পরম শান্তি। ছিলই ত, কিন্তু চিরদিনই কি তিনি এইরূপ জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন? তাঁহার তরুণ বয়সের কমেডিগুলি কি সাক্ষ্য দেয়? অভব্য অশ্লীলতায়ও তিনি ছিলেন ওস্তাদ এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে কি? তাঁহার জীবন সম্বন্ধেও কি একথা বলা চলে না যে " We cannot ascribe to Shakespeare that rigid

propriety of sexual conduct, the absence of which in more modern poets it has been too often the duty of their family biographers to conceal "?

এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়া ডোভার উইলসন তাঁহার ক্ষুদ্র চরিতাখ্যায়িকাটি লিখিয়াছেন। তিনি কবির জীবন দিয়া কাব্য বুঝিতে চাহিয়াছেন, আর কাব্য দিয়া জীবন। কীট্‌স্-এর এই উক্তিটি তাঁহার মূলমন্ত্র : "Shakespeare led a life of Allegory, his works are comments on it" শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবন একটি রূপক, ও তাঁহার রচনাবলী তাহার ব্যাখ্যা। প্রয়োজনমত তিনি অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক কবিচিত্তের বিকাশধারার উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডে যে মনোবৃত্তি Aldous Huxley-র Point Counterpoint-এ বা T S Eliot-এর The Waste Land-এ ফুটিয়াছে, তাহাকে আমরা বিশেষভাবে আধুনিক বলিয়াই ভাবিয়া থাকি। অথচ দেখা যায় শেক্‌স্‌পিয়ার ইহার ভিতর দিয়াও কাটাইয়া গিয়াছেন। ফলে পুস্তিকাখানির আদ্যন্ত অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। শেক্‌স্‌পিয়ারের বিষয় নূতন বই হাতে পাইলে প্রায়শঃ পড়িতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, সমালোচক সুধুই বাক্যের থলি উজাড় করিয়াছেন। কিন্তু ডোভার উইলসন একটি কথারও অপব্যয় করেন নাই। এত অল্প কথায় বেশী বুঝাইবার ক্ষমতা সমালোচনা গ্রন্থে কদাচিৎ পাওয়া যায়। জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যগুলি সর্ব্বদাই প্রণিধানযোগ্য। লীয়ার, হ্যামলেট, ফলষ্টাফ্ ইত্যাদির প্রসঙ্গে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, ও শেক্‌স্‌পিয়ারের শেষ যুগ সম্বন্ধে লিটন ষ্ট্রেচি-র মত খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন। শাইলক্-এর চরিত্র-চিত্র বিষয়ে তিনি বলিতেছেন—

Shylock is the first unmistakable example of what may be called Shakespeare's tragic balance, the balance between pitiless observation, and divine compassion and understanding He hides nothing He shows us everything of Shylock's meanness, cunning and cruelty —vices which he himself detested above all vices—and notwithstanding, he compels the best of us, and the best in us, to cry out with Heine's " fair Briton " upon the Jew's exit, " By heaven, the man is wronged "

This is the quality that makes Shakespeare one of the great moral forces of the world, a world Saviour and Redeemer " The great secret of morals is Love," Shelley writes, " or a going out of our own nature, and an identification of ourselves with the beautiful which exists in thought, action, or person, not our own A man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively, the pains and pleasures of his species must become his own " Shakespeare is even more " greatly good " than Shelley suggests is possible, for he can identify himself with what he thought ugly and detestable, knocking all the time at our heart for pity and awe No one but Dostoieffsky among the moderns can touch him here

ডোভার উইলসন যাহাকে বলিতেছেন, "tragic balance", তাহাই শেক্‌স্‌পিয়ার-প্রতিভার মূলসূত্র। এইটিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে সাহিত্য ও জীবনের পর্য্যালোচনা আরম্ভ হইলে অচিরে উৎকর্ষলাভের সম্ভাবনা। অবশ্য সৃষ্টি-প্রতিভা, প্রকাশ-সামর্থ্য কাহারো নিকট হইতে ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু স্রষ্টা হইতে

হইলে জীবনের পর্য্যালোচনা না করিলে চলে না , সে পর্য্যালোচনা যত উচ্চস্তরের হইবে, ততই মঙ্গল। সৃষ্টিশিল্পের আদর্শ সম্বন্ধেও তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয়—অপরের সৃষ্টির বেলায় যদিই বা উদাসীন থাকা সম্ভব হয়, নিজের সৃষ্টির বেলায় কিছুতেই সম্ভব নয়। অচেতন শিল্পী কোনদিন বড় শিল্পী হইতে পারে না।

" L'ecrivain est classique qui porte un critique en soi-même, et qui l'associe intimement à ses travaux " (Paul Valéry)

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The Literary Mind—BY MAX EASTMAN (Scribner's)

The Physiology of Beauty—BY ARTHUR SEWELL (Kegan Paul)

কবি-পাঠকের সম্বন্ধই সাহিত্যের সনাতন সমস্যা। কাব্যবিবেচনার জন্মদিন থেকে প্রত্যেক সমালোচক হেরফের ক'রে যে-প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন, সে হচ্ছে এই : লেখক অধোগতির ধাপে নেমে পাঠকের পাশে দাঁড়াবে, না পাঠক উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে লেখকের স্তরে উঠবে ? কিন্তু জিজ্ঞাসা এক হ'লেও, ভিন্ন যুগের উত্তর ভিন্ন রুচির পরিচায়ক। এই বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, কারণ সামাজিক জীবনের প্রতিনিধি হিসেবেই পাঠক কবির কাছে মর্য্যাদা পায় , এবং জীবন যেকালে পরিবর্ত্তনশীল, তখন সাহিত্যের অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী। প্লেটোর গণতন্ত্র থেকে অকারী বিবেচনায় কবিরা নির্ব্বাসিত হ'লে পরে, এরিষ্টটল কাব্যকে জীবনের দর্পণ ব'লে, আবার তাদের সমাজে স্থান দিয়েছিলেন। আজকে হয়তো সেই প্রাচীন আদর্শে সাহিত্যিকের আর নিষ্ঠা নেই, কিন্তু সৎসাহিত্যমাত্রেই যখন সুবিধামতো জীবন্ত-আখ্যায় দাবি ক'রে বসে, তখন সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত হওয়া সাহিত্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যসেবী পাকে-প্রকারে জীবনের বশ্যতা মেনে নিলেও, সাধারণ পাঠককে সে অবজ্ঞা করতে ছাড়েনা। এই অবজ্ঞার অনেকটাই হয়তো প্রাপ্য , কিন্তু তাহলেও পাঠকের পক্ষেও যে কিছু বলবার আছে, কাব্যের বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখে তার বঞ্চনাবোধও যে একেবারে গর্হিত নয়, সেই কথাটাকেই ম্যাক্স্ ইষ্ট্ম্যান তাঁর মনোজ্ঞ পুস্তকে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা মনে রাখতে হবে, যে কাব্য অতিমর্ত্ত্যের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে যাত্রারম্ভ করেছিলো। কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে বাক্য ঐশিক ও সর্ব্বশক্তিময় , তার থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং তার প্রাক্তন রূপ ছন্দে। অবশ্য এই অলৌকিকতা চিরদিন টিঁকেনি , পুরোহিতের প্রাধান্য খর্ব্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র আর কাব্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের মায়া কাটিয়ে, আলাদা সংসার পেতেছিলো। তখন থেকে কাব্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার বদভ্যাসটা গেলো বটে, কিন্তু কবিকে ভগবানের প্রিয়পাত্র ব'লে ভাবার ধরণটা ঘুচলোনা। মানুষের জ্ঞাত ইতিহাসে ধর্ম্মের প্রভাব যতখানি দুর্ম্মরতা দেখিয়েছে, তা অন্যত্র বিরল , এবং সম্ভবত অতদিন ধ'রে সেই ধর্ম্মের একান্ত অনুগ্রহ পেয়েই কাব্যের আত্মগরিমা প্রায় অসীমে গিয়ে ঠেকেছিলো। সে স্বভাবতই ভাবতে পারলে যে পরিশীলনের অন্যান্য বিভাগ তার তুলনায় নগণ্য। কবিরা ঢাক পিটিয়ে রটিয়ে দিলেন যে তাঁরা শুধু শিল্পী নন, তাঁরা ভাবিকথক , তাঁরা কেবল অনুকরণ ক'রেই ক্ষান্ত হননা, স্বয়ং বিধাতার বিশ্বসৃষ্টি চলে তাঁদেরই উদাহরণে।

সৌভাগ্যবশত তাঁদের গর্ব্ব তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিত হলোনা। সভ্যতার তখন বয়ঃসন্ধি, জীবন সঙ্কীর্ণ, বিজ্ঞান তখনো অপ্রস্তুত। সুতরাং তখনকার পাঠককে সহজেই চমৎকৃত করা গেলো। ঐন্দ্রজালিক ছন্দের বশীকরণে সে যে-জাগ্রত সুপ্তাবস্থায় নিমজ্জিত হলো, তাতে কবিদের অপলাপকে আর্য্যসত্য ব'লে মানা ছাড়া তার গত্যন্তর রইলোনা, সম্মোহনের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনায় সে ভাবলে তাঁদের অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া বুঝি অদৃশ্যভেদের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু মিথ্যার রাজ্যও অবিনশ্বর নয়। ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর উদয় হলো, গালিলিওর মন্ত্রণায় বিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বেই যে-অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলো, সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি কুড়িয়ে সে ফিরে এলো নিউটনের জয়তোরণে, এবং স্বপ্নবিহ্বল কাব্য অচিরে আবিষ্কার করলে যে প্রবর্দ্ধমান জীবন সত্যই তার শিথিল কবল থেকে পালিয়েছে, তার মুষ্টিতে যা প'ড়ে আছে, সে কেবল জীবনের শৈশবসজ্জার ছিন্ন প্রান্ত। অভিমানে সে পণ করলে যে নিজের নাক কাটিতে হয়, তাতেও সে রাজি, তবু পরের যাত্রা ভাঙবেই ভাঙবে। গালি-গালাজের বন্যা বইয়ে, বাজারে বাজারে সে ঘোষণা করলে যে জীবনের মতো দুর্বৃত্ত হট্টচারীর সংসর্গ তার আর সহ্য হচ্ছেনা, ভবিষ্যতে সে কেবল শিষ্টতার সঙ্গেই কুটুম্বিতা করবে; মানুষের মধ্যে যা ধ্রুব, যা সম্ভ্রান্ত, যা সুন্দর, কেবল সেই সমস্তই হবে তার আরাধ্য।

সেদিনে যে-আত্মহত্যার পালা সুরু হয়েছিলো, আজও তার শেষ দেখা যাচ্ছেনা। মধ্যে একবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ কাব্যকে গদ্যাত্মক করার ব্যর্থ প্রয়াসে কবিকে যুগচৈতন্যের আধার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রিরাফেলাইট্‌দের স্বপ্নপ্রয়াণ ব্যাপারটাকে যাত্রাস্থলে ফিরিয়ে আনলে। তার পরে যখন আধুনিক কবিদের আমল এলো, তখন দেখা গেলো যে, অন্ধকূপের দরজা পাথর গেঁথে বন্ধ করা হয়েছে। এখনো বন্দীরা মাঝে মাঝে পথের আওয়াজ শোনে বটে, কিন্তু অর্থ বোঝার সামর্থ্য তাদের আর নেই, বংশপরম্পরায় অন্ধকারে কাটিয়ে, আলোকের অস্তিত্ব সুদ্ধ তারা ভুলে গেছে, মিথ্যাভিমানের উত্তরাধিকারে জন্মে, তাদের স্বার্থ হচ্ছে স্বাধীন সত্যকে অন্ত্যজ ব'লে ভাবা। সেইজন্যেই আজ তারা নিজেদের মধ্যে কথা কয় ব্যাসকূটের সাহায্যে, জিজ্ঞাসুকে নিরস্ত করে বিশুদ্ধ কাব্যের দোহাই দিয়ে, সমালোচনার জবাবে জপে "নিয়োক্লাসিজ্‌ম্‌," "নিউ হিউম্যানিজ্‌ম্‌", "মেটাবাইয়োলজি" ইত্যাদির নাম। পাছে তাদের কাব্য সাধারণভোগ্য হয়ে ওঠে, এই তাদের একমাত্র ভয়। সেইজন্যেই আজকে আর তারা কেবল ছন্দমুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়, ব্যাকরণশুদ্ধিকেও বিড়ম্বনা ব'লে ভাবে। অজ্ঞাতকুলশীল পূর্ব্ববর্ত্তীদের রচনা-উদ্ধার, বিনা-প্রয়োজনে বিদেশী শব্দকোষ উজাড় করা, ছেদ-বর্জ্জন ইত্যাদি সমস্ত উপকরণই আধুনিক কাব্যের দুরূহতাপ্রীতির পরিচায়ক। এমন-কি একেও অনেকে যথেষ্ট মনে করেননা। তাঁদের প্রধান প্রতিনিধি ই-ই-কামিঙস্‌ তো ঐতিহ্যকে পরিহসনীয় ব'লে ভাবেনই, অধিকন্তু মুদ্রাকার্য্যের চিরন্তন প্রথাকেও তাঁর অসহ্য লাগে। নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রচলিত প্রণালীতে ছাপা হ'লে পাছে পাঠক তাঁকে সুকবি আখ্যা দিয়ে বসে, তাই তিনি ওটিকে এইভাবে সাজিয়েছেন:

Among
these
        red pieces of
day (against which and

quite silently hills
made of blueandgreen paper

scorchbend ingthem
-selves-U
pcurv　E,into
　anguish (clim
b)ing
s-p-i-r-a-
l
and, disappear)
　Satanic and blasé
a black goat lookingly wanders

There is nothing left of the world but
into this noth
ing il treno per
Roma si-gnori?
jerk
lyr, ushes

এটি যে কোনো অতিশ্রান্ত মুদ্রাকরের দুঃস্বপ্ন নয়, একটি সহজ ও সুন্দর কবিতা, তা বিভীষিকাটিকে গদ্যের মামুলি সাজে সাজালেও চাপা থাকবেনা :

Among these red pieces of day—against which, and quite silently, hills made of blue and green paper, scorch-bending themselves, upcurve into anguish, climbing spiral, and disappear—satanic and blasé, a black goat lookingly wanders There is nothing left of the world, but into this nothing 'il treno per Roma signori?' jerkily rushes

এমন সুখপাঠ্য কবিতাসম্বন্ধে ও-ধরণের পাগলামির কৈফিয়ৎ চাইলেই, সম্প্রতিবিদেরা সমস্বরে ব'লে ওঠেন যে ওটা আসলে নূতনত্বের কোনো দাবিই রাখেনা, বরং গ্রীস-প্রবর্ত্তিত কাব্যাদর্শের হুবহু নকল করে। ছোট-বড় অক্ষরের ওই অদ্ভুত সমাবেশ, কমা-সেমিকোলনের ওই ভয়াবহ স্বেচ্ছাচার, শব্দবিভাগের ওই উদ্ভট প্রকরণ, ও-সমস্তই নাকি পার্ব্বত্য রেলগাড়ির লম্ফঝম্পের যথাযথ অনুবাদ। এতেও যে-অন্ধেরা উক্ত কবিতায় কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার আক্ষরিক প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পায়না, তাদের জন্যে গালভরা নজির আওড়ানোর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যত মহারথীর নামই উল্লিখিত হোক্‌না কেন, এটা নিশ্চয় যে সনেটবিশেষে শেক্‌স্‌পীয়রের চ্ছেদ-ব্যবহার অন্যমনস্কতা-সূচক ব'লেই সে-দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় নয়, এবং কামিঙসের বিরামচিহ্ন রীতিবিরুদ্ধ হ'লেও এ-কবিতাকে অমর বলা চলেনা। আসলে কামিঙস্‌-প্রমুখ আধুনিকেরা শেক্‌স্‌পীয়র অথবা অন্য কোনো পূর্ব্বগামীর অনুকরণে বদ্ধপরিকর নন, তাঁরা ব্যস্ত তাঁদের স্বকীয়তা-প্রমাণে। বস্তুত ধ্রুপদী ঢঙ বর্ত্তমান কাব্যের ছদ্মবেশমাত্র, তার তন্মাত্র হচ্ছে স্বকীয়তা, উদগ্র, আত্মজ্ঞ স্বকীয়তা।

এই স্বকীয়তাই, সাহিত্যের আধুনিক অনর্থের মূল। ওই মায়ামৃগের অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা বারেবারেই ভুলে যাই যে, সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে

লেখকের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে পাঠকের চৈতন্যকে জাগরূক করা। মানবচৈতন্য স্বভাবত অলস, কিন্তু তার মৌলিক জড়তা ধাক্কা না-খেলে যদিও বিদূরিত হয়না, তবু ধাক্কা যদি অবিরত চলতে থাকে, তাহলেও তার সাড়া পাওয়া অসাধ্য। অর্থাৎ বাহ্য উদ্দীপনার পরমায়ু দীর্ঘ হ'লে চৈতন্য তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে, এবং আলস্য অনায়াসেই আবার তার স্বাধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। কলিকাতার কলকোলাহলে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নজর ক'রে থাকবেন যে রাজপথের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর তাঁদের মনোযোগে ব্যাঘাত আনেনা; কিন্তু পাশের ঘরে যদি কেউ ফিসফিস ক'রেও কথা কয়, অমনি তাঁদের অভিনিবেশে বিঘ্ন ঘটে, তখন তাঁরা শুধু পারিপার্শ্বিক ষড়যন্ত্রকে নয়, সারা সহরের চিৎকারকে জাহান্নমে পাঠাতে চান। এই থেকে বোঝা যাবে শিল্পসৃষ্টিতে অতিমাত্রিক স্বকীয়তা কেন অপচিত হতে বাধ্য। নূতনত্ব ব্যতীত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও যেমন শক্ত, অগোগোড়া নূতনত্বের সাহায্যে তার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখা তেমনিই অসম্ভব, এবং শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনমাত্রকে বিশ্লেষণ করলেই প্রাচীন-অর্ব্বাচীনের নিপুণ সংমিশ্রণ চক্ষে পড়বে।

শেক্‌স্‌পীয়রের মতো মহাকবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বভাব বুঝতেন না, অথবা সাধারণ চ্ছেদপদ্ধতি তাঁর অবিদিত ছিলো, এমন বিশ্বাস অসঙ্গত। তিনি জানতেন যে ছন্দকে আপাদমস্তক নিয়মের নিগড়ে ঘিরে রাখলে, যথাসময়ে শ্রোতার সাড়া পাওয়া দুষ্কর হবে। তাই হয়তো তাঁর পরমোক্তিগুলোয় অঙ্কের বালাই নেই, অমিত্রাক্ষরের কাঠামোতেও মিলের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, গদ্য পদ্য অভিন্নহৃদয় হ'য়ে ওঠে। তাই হয়তো তিনি আলঙ্কারিকের উদ্যত তর্জ্জনীকে ঠেলে ফেলে, উপমাসঙ্করের চূড়ান্তে পৌঁছে, বিপদসমুদ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝতেন যে অনন্ত স্বকীয়তা নিজের কলে প'ড়ে নিজেই মরে। তিনি দেখেছিলেন যে ঈর্ষ্যা-সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য নূতন নয়, সেইজন্যেই সেই সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তকে তিনি রূপায়িত ক'রে তুলেছিলেন ওথেলো ও ইয়াগোর মতো অসাধারণ চরিত্রদ্বয়ে। কিন্তু হ্যামলেটের ট্রাজিডি একেবারেই অভিনব, সম্পূর্ণ নিজস্ব, সেইজন্যেই ওই নাটকের আখ্যানভাগ তিনি সমসাময়িক গল্পভাণ্ডার থেকে নিষ্কুণ্ঠচিত্তে ধার নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য বর্ণাড শ হৃদয়ঙ্গম করেননি; তাইতে অত দীপ্তি, অত মৌলিকতা, অত শিল্পকৌশল সত্ত্বেও 'ম্যান এণ্ড্ সুপারম্যান' পড়তে পড়তে ঘুম আসে। বিশিষ্টতার সুমিত প্রয়োগে ডিফো এবং সুইফ্‌ট্ শেক্‌স্‌পীয়রের অনুগামী। "রবিন্‌সন ক্রুসো"র আখ্যায়িকা এমনি অদ্ভুত, এতই বাহুল্যময় যে ডিফো বুঝেছিলেন তার উপরে আর অতিরঞ্জনের বোঝা সইবেনা, তাই সে-কাহিনী অত আড়ম্বরবর্জ্জিত, অত বৈচিত্র্যহীন, বৈজ্ঞানিক বিবরণের অত কোলঘেঁষা। পক্ষান্তরে গালিভারের আসল উপলক্ষ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমাজ, তাই তাকে গন্তব্যে পৌঁছতে হলো অত বামন-দৈত্যের দেশ-বিদেশ ঘুরে। এই ধরণের শেষ কবি সম্ভবত ব্রাউনিঙ। কে জানে হয়তো নিজের কাব্যের অন্তম দৈন্য তাঁর অগোচর ছিলোনা ব'লেই তিনি তার রূপকে অতখানি অসামান্য ক'রে তুলেছিলেন।

মানবচৈতন্যের এই পঙ্গুতার কারণ অদ্যাবধি ধার্য্য হয়নি, এমন-কি স্থির সিদ্ধান্ত করবার মতো তথ্যসংগ্রহেও আমরা এখনো অপারগ। তবে চেষ্টা নানা দিক থেকেই চলছে, এবং অনুমিতির সংখ্যা বাড়ছে বই কমছেনা। এর মধ্যে আমার নিজের

পক্ষপাত পাভ্লোভ্-প্রমুখ জড়বাদীদের প্রতি। এঁরা অবশ্য কোনো ব্যাপক তত্ত্বদর্শনকে প্রশ্রয় দেননা, তবু এঁদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পৃষ্ঠপোষণে আর্থার সিউয়েল যে-মতবাদ খাড়া করেছেন, তা আমার বিবেচনায় সমীচীন। মতের গরমিল হ'লেও কোনো ক্ষতি ছিলোনা, কারণ স্বয়ং হগ্রেন যাঁকে অভিনন্দন করেছেন, তাঁর কথা কোনোমতেই অবজ্ঞেয় নয়। কিন্তু বইখানির দিকে এতটা ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও, ওটিকে নিখুঁৎ বলতে পারলুম না। ওটির প্রধান দোষ হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা। মাত্র দু শ পাতার বইয়ে পাঁচ হাজার বৎসর বয়সের দার্শনিক মতামত খণ্ডন, সদ্যস্তন খ্যাতনামাদের ছিদ্রান্বেষণ এবং আর্টসম্বন্ধে একটা অভিনব থিয়োরির বিস্তার কেমন যেন পণ্ডশ্রমের মতো ঠেকে। সিউয়েল-সাহেবের প্রকৃত বক্তব্য এক শ পাতার মধ্যে নিরেট-ভাবে ঠাসা, উপরন্তু তাঁর ভাষা প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। কাজেই সেই সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের সংক্ষেপসার দেবার ব্যর্থ প্রয়াস না-ক'রে, তার সাহায্যে বরং ইষ্টম্যানের অভিমতকে বিশদ করি।

পূর্ব্বোক্ত জড়বাদী মনোবিদেরা চৈতন্য বলতে কোনো ব্রহ্মোদ্ভূত আধিদৈবিক গুণকে বোঝেননা, তাঁরা ওই পদবীর দ্বারা মনুষ্যদেহের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াকেই নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে মানুষের শরীর (অতএব মন) একটা স্থিতি-স্থাপক যন্ত্রমাত্র। বাহ্য প্রবর্ত্তনার প্রভাবে যখনই তার তুলাসাম্য নষ্ট হয়, অমনি সমগ্র যন্ত্র বিচলিত হয়ে, আদিম স্থৈর্য্যে ফিরে যেতে চেষ্টা করে, এবং স্বাভাবিক সঙ্গতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'লেই, তার প্রাক্তন আলস্য ফিরে আসে। কর্ম্মমাত্রের উদ্দেশ্য ইষ্ট-সিদ্ধি, সুতরাং সামঞ্জস্যবিধানেই যেখানে ইষ্ট, সেখানে সমীকরণের পরেও ব্যতিব্যস্ত হওয়া অকল্যাণকর। পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষায় মনুষ্যদেহের এই ধর্ম্মকে ন্যূনতম চেষ্টার নিয়ম অথবা "প্রিন্সিপ্ল্ অফ্ লীস্ট্ য়্যাক্সন্" বলা যেতে পারে। জগৎ-সম্বন্ধে আজ আমাদের যতটুকু জ্ঞান হয়েছে, তাতে মনে হয় জড়তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকথা। অণু থেকে আরম্ভ ক'রে নীহারিকাপুঞ্জ পর্য্যন্ত সকলেই শান্তিপ্রিয়, কাজের জন্যে কেউ কাজ করেনা; শুধু যতক্ষণ শান্তির মধ্যে কোনো বিঘ্ন থাকে, ততক্ষণই সংক্ষিপ্ততম পথে সেই বিঘ্নজয়ের ব্যবস্থা চলে, এবং বিঘ্নের সঙ্গে সঙ্গে আয়াসেরও অবসান হয়। এখানে সমস্ত জোর ওই সংক্ষিপ্ততম পথের উপরে; অর্থাৎ বস্তু-মাত্রেই প্রযত্নের পরিমাণকে আবশ্যিকতার অতিসঙ্কীর্ণ কোঠায় আবদ্ধ রাখতে চায়।

এইজন্যেই উত্তেজনার হেতু বিবিধ হ'লে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হতে বাধ্য। মনে করা যাক কেউ একটা পাহাড়ের খোঁচে পাথর আঁকড়ে ঝুলে আছে, তার নিচে খাত এবং খাতে মৃত্যু। এখানে মৃত্যুভয়ই সামঞ্জস্যসিদ্ধির মুখ্য প্রবর্ত্তনা, কাজেই এ-সময়ে যদি তার আঙুল হঠাৎ পাথরের ধারে ক্ষত হয়, তবু তার বাহুপেশীতে কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখা যাবেনা, কারণ তার দেহযন্ত্র স্বজ্ঞাগুণে জানতে পারবে যে এখন জ্বালার প্রতিকার করলেও, তার তুলাসাম্য রক্ষিত হবেনা, এক্ষেত্রে স্থিতি-স্থাপনের একমেবাদ্বিতীয়ম্ উপায় হচ্ছে কেবল ঝুলে থাকা। এই কথাকেই ঘুরিয়ে কোনো কোনো জার্ম্মান মনস্তাত্ত্বিক মানুষের সমস্ত উদ্যোগকে একটা আদর্শ নির্ম্মাণের, একটা 'প্যাটার্ণ্ মেকিঙ্'-এর চেষ্টায় পরিণত করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেন, মানুষের বাতবহা নাড়ি উত্তেজনাগুলোকে মস্তিষ্কের যথাস্থানে

পৌঁছে দিলে, মস্তিষ্ক সেগুলোকে গোটাকয়েক পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতাব প্রতিমাণে চিত্রার্পিত ক'বে ফেলতে চায। অতএব উত্তেজনাসমূহ থেকে কেবল সেই অংশই গৃহীত হয, যা এই চিত্রবচনাব উপযোগী, বাকিটা হয ফেলা যায, নচেৎ অব্যক্ত দূবদৃষ্টিব কল্যাণে ভাণ্ডাবজাত হয়ে, ভবিষ্যতে আবাব কোনো সমধর্ম্মী অনুষঙ্গ-নির্ম্মাণেব উপাদান জোগায।

সৌভাগ্যক্রমে পাহাড আঁকড়ে আত্মবক্ষাব মতো বোমহর্ষক ব্যাপাব আজকেব দিনে অত্যন্ত বিবল। এমন-কি হয়তো এতদূব পর্য্যন্ত বলা যায যে, ঘটনাটি সিনেমা-চিত্রকবদেব একান্ত প্রিয় না-হ'লে, ও-অবস্থাকে কল্পনা কবাও কঠিন হতো। বস্তুত সভ্যসমাজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব প্রতিবন্ধক, সংসাবে তীব্র প্রবর্ত্তনা ও তাব সহযোগী তন্ময়তাব স্থান নেই; এবং শিষ্ট মানুষ যুগযুগান্ত ধ'বে পবেব মুখে ঝাল খেযে, আজকে কাজেব চেয়ে কথাতেই বেশি আত্মহাবা হতে শিখেছে। এব ফলে আমাদেব ভাষা যে কেবল পবোক্ষ অভিজ্ঞতাব বার্ত্তাবহ হয়েছে, তা নয, সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাব প্রকৃতিও তাব মধ্যে অল্পবিস্তব সংক্রামিত। অভিজ্ঞতামাত্রকেই দুটো মহলে ভাগ কবা যায়, একটাব নাম দেওয়া যেতে পাবে সদব, অন্যটা অন্দব। সদবে যা ঘটে, তা সার্ব্বজনীন, শাশ্বত ও সহজ; অন্দববাসিনীবা পবান্নজীবী ও অসূর্য্যম্পশ্যা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রবর্ত্তনাই ব্যাবহাবিক ও মানসিক বিভাগে বিভক্ত; প্রথম দিকটা আমাদেবকে কৃতকর্ম্মা ক'বে তোলে, বিশিষ্ট আচবণেব নিমিত্ত জোগায়, এক প্রবর্ত্তনা থেকে অন্য প্রবর্ত্তনাকে আলাদা ক'বে চিনতে শেখায; দ্বিতীয় দিকটা আমাদেব আবেগ জাগায, ছবি আঁকায, স্মৃতিব অন্ন-জলেব ব্যবস্থা কবে।

ভাষারূপ রূপান্তবিত প্রবর্ত্তনাতেও এই দ্বৈধভাব বিদ্যমান, এবং প্রাচীন আলঙ্কাবিকেবা শব্দেব স্বভাবকে লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, অভিধা ইত্যাদি স্তবে শ্রেণীবদ্ধ ক'বে, সম্ভবত এই প্রভেদেবই ইঙ্গিত কবেছিলেন। উদাহবণ হিসেবে নীল-শব্দেব উল্লেখ কবা যেতে পাবে। ওই শব্দেব যেটুকু সদবে বাস কবে, অর্থাৎ যেটুকু সাধাবণগোচব, সে হচ্ছে এই যে নীল বস্তু লাল বা অন্য বর্ণেব বস্তু হতে পৃথক। কিন্তু নীলেব অন্তবঙ্গ আবেগটুকু অনির্ব্বচনীয। চণ্ডীদাসেব মনে হয়তো তা বজকিনীব নীল সাডিব সহযোগে প্রেমেব কান্তিরূপেই প্রতিভাত হতো, স্বয়ং বামী সম্ভবত বঙটিকে নিজেব পেশাব সত্তা ব'লে ভাবতো; এবং আমাব প্রথম পাঠ্যপুস্তক ওই বঙেব হওযায়, আমি হয়তো নীলেব মধ্যে আমাব স্বর্গীয গুরুমহাশয়েব জবাকুসুমসঙ্কাশ চক্ষুদুটিকেই প্রত্যক্ষ কবি। বলাই বাহুল্য এক নীল-শব্দেব দ্বাবা এত বকম ভাব-গৌবব প্রকাশ কবা অসম্ভব, এবং আধুনিক কবি ও কাব্যবিবেচকেবা এই অসম্ভবকে সম্ভব কবতে চান ব'লেই, তাঁদেব বচনাকে ব্যঙ্গ্য কবা অত সহজ। আজকালকাব অধিকাংশ সাহিত্যেই শব্দ অর্থবাহক-রূপে ব্যবহৃত না-হয়ে, হয আবেগবাহক-রূপে। অথচ আবেগ অন্তঃপুবচাবী, তাব বিশ্রম্ভালাপ সদবে শোনা গেলে, সোহাগেব চেয়ে পবিহাসই বোধহয় স্বাভাবিক, পবিহাসই বোধহব শোভন।

অবশ্য অনেকেব মতে প্রগতি অধঃপতনেবই নামান্তব। সভ্যতা ছুৎমার্গ-বিবোধী, এবং শিক্ষাবিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুব অভিজাত পবিত্রতাই জনতাব স্থূল হস্তাবলেপে কলঙ্কিত হযে পডে। আমবা স্তবভেদে বিমুখ হয়েছি, আমাদেব অধ্যয়ন চলে একই বিশ্ববিদ্যালযে, আমাদেব অবসব কাটে একই সিনেমায, একই সংবাদপত্রেব পথ্যে

আমরা মানুষ হয়ে উঠি। কাজেই মানুষমাত্রের মনোভাবেই আজকে একটা ঐক্য দেখা দিয়েছে; আর তার ফলে আমাদের অন্দরের দ্বার এখন অপেক্ষাকৃত মুক্ত। অর্থাৎ ভাষা যার প্রকৃতি মূলত বস্তুবাচক, তা কালক্রমে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাববাচক, গুণব্যঞ্জক। হিন্দু-শব্দের উল্লেখ ক'রে, দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আগে ও-কথার দ্বারা একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, একটা সুনির্দ্দিষ্ট আচার, একটা ঐতিহ্যনিষ্ঠ সমাজ বোঝাতো, কিন্তু শব্দটি এখন আর সেই পার্থক্যসূচক অথবা আচরণজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়না, এখন আমরা তাকে প্রয়োগ করি মনোভাব-প্রকাশে, আজকাল তার অর্থ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, বিশেষ থেকে সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ও দিয়ে এখন আর আমরা অবচ্ছেদ বুঝি না, বুঝি ঐক্য। তাই জন্যেই ব্রাহ্মসমাজের ব্রাত্যেরাও আজকে গোঁড়া হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ান, এবং শুনতে পাই গোখাদক ক্রিশ্চানও নিজেকে ব্রাহ্মণ-উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভাষার স্বভাব উপরোক্ত ধরণে বিকারপ্রবণ ব'লে, কোনো-কোনো অধুনা-অনাদৃত কবি ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে, বর্ত্তমানের সমালোচনা ভুলতে চেষ্টা করেন। অবশ্য অনুগামীদের পূজা পাওয়া-না-পাওয়া নিশ্চয়ই অদৃষ্টের মর্জ্জি। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য যদি একেবারে মিথ্যা না-হয়, তবে ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের চেয়ে উদারতর মনে করা অনুচিত। পরিবর্ত্তনই ভাষার ধর্ম্ম হ'লেও, সে-পরিবর্ত্তন কোনো বিশেষ কবিকে পক্ষপাত দেখাতে বাধ্য নয়। আসলে ভাষা বদলায় জৈব প্রয়োজনের তাগিদে, এবং যে-কবি কুম্ভীররূপ জীবনের সঙ্গে বিবাদ ক'রে, কালস্রোতে ভেলা ভাসাবেন, তাঁর ললাটলিপিতে নৈরাশ্যের স্বাক্ষর আছে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের প্রয়োজনেই শুধু তারতম্য ঘটে, তার প্রকৃতি বদলায়না। পাভ্‌লোভ্‌ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন যে কুকুরকে যদি খাদ্য-পরিবেশনের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সুর শোনানো যায়, তবে কালে খাদ্য বাদ দিয়ে, কেবল সেই সুরের সাহায্যেই তার রসনাকে লালায়িত ক'রে তোলা সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রেও একই উপায়ে উদ্বোধকের রূপান্তর করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত ও নির্ব্বিকার। অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষার গুণে আমরা প্রাণী-বিশেষের অভ্যস্ত উদ্দীপনাকে নির্ব্বাপিত ক'রে, তার দেহদীপে একটা নূতন উত্তেজনার শিখা জ্বালতে পারি বটে, কিন্তু এমন করতে হ'লে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার আনুকূল্য আবশ্যক।

কুকুর বা মানুষ অকারণে গান-সম্বন্ধে সচেতন হয়না; তারা সুরের মধ্যে বাছাই করতে শেখে তখন, যখন একটা বিশেষ সুর ব্যতিরেকে তাদের জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তিগত আবেগমাত্রেই একদিন সাধারণের জ্ঞানগম্য হবেনা, কেবল এমন আবেগ বিশ্বজনের আদর পাবে, যা বিশ্বের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক। ইতিপূর্ব্বে যে-দুএকজন কবি সমসাময়িকদের অবজ্ঞাভাজন হয়েও, পশ্চাদ্‌গামীদের বরণমালা পেয়েছেন, তাঁরাও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করেননি। ডান্‌, ব্লেক্‌, কীট্‌স্‌, এঁরা নিজেদের দোষে উপেক্ষিত হননি, যে-যুগ এঁদের উপেক্ষা করেছিলো, দোষ ছিলো তারই। এঁরা মহাকবি, মানুষের সার্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন সন্ধানই এঁদের কাব্যপ্রেরণার মূলমন্ত্র ছিলো, কিন্তু যে-কাল এঁদের জন্ম দিয়েছিলো, সে ছিলো অত্যন্ত কৃত্রিম, তার মানসিক সংগঠনে প্রত্যক্ষ প্রবর্ত্তনার লেশমাত্র ছিলোনা। তখনকার পাঠক সহজ অনুভূতিকে একেবারে অবদমিত ক'রে ফেলে-

ছিলো, অতএব উক্ত তিন কবিব কালাতীত সবলতা তাব কৃত্রিম প্রয়োজনেব খোরাক জোগাতে পাবেনি, কেবল অর্জ্জন কবেছিলো তাব তিবস্কাব।

দুঃখেব বিষয় আজকে আব সেই প্রত্যক্ষ কাব্যপ্রেবণাব চল নেই। আজকে আমবা যে যত জটিল লেখা লিখি, সেই তত আত্মশ্লাঘা অনুভব কবি। আমবা জানি যে বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে পাঠকেব চিত্তাকর্ষণ অসম্ভব, অথচ সভ্যতা-প্রসারেব গুণে প্রকৃত বৈশিষ্ট্যে সেও আমাদেব সমকক্ষ্য। আগে পবমার্থেব অগ্রদূত ব'লে কবিব মর্য্যাদা ছিলো, কিন্তু তাব ভবিষ্যদ্বাণী এতবাব অপূর্ণ বযে গেছে যে বর্ত্তমান জগৎ সত্যসমাগমেব খবব এখন বৈজ্ঞানিকেব কাছেই নিযে থাকে। একদিন কবিবা সভাসমিতিব আনন্দবর্দ্ধনে অদ্বিতীয় ছিলো, কিন্তু সে-সব আসব হয আজকে উঠে গেছে, নয় বাজনৈতিক বা সমাজসংস্কাবকেব প্রতিযোগিতায় সেখানেও কবি পবাজিত। এ-ক্ষেত্রে খামখেযালই তাব নান্যপন্থা। তাই তাব স্বকীযতা এখন স্বেচ্ছাচাবেব ভেক নিযেছে, তাব বিশিষ্টতা অহংকাবে পবিণত, ব্যক্তিস্বরূপ হাবিয়ে সে আজ আঁকড়ে আছে হিংস্র ব্যক্তিবাদকে।

অবশ্য এমন হতে পাবে যে এব জন্যে কবিবা মোটেই দাযী নয, দোষ স্বযং ভাষাব। এরূপ কবি হযতো আজও মেলে, কাব্যকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষেব পটভূমি কবতে যাব বিবেকে বাধে, যে আত্মবতিব মোহ কাটিযে ম্যাথু আর্নল্ডেব উপদেশমতো কাব্যকে যুগচৈতন্যেব কষ্টিপাথব কবতে প্রস্তুত। কিন্তু তাবই বিপদ হযতো সমূহ। নিজেব অতিসংবেদনশীলতাকে নিষ্ঠুবভাবে সংযত ক'বেও, সে হযতো দেখে যে মানুষেব অনুসন্ধিৎসা আজকে বচনাতীত লোকে উপস্থিত হযেছে। আমাদেব উদ্ভাবকেবা ভাষাব মৌল অক্ষমতাব কথা মনে বাখেননি; কাজেই দূববীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ছাযাচিত্র, বেডিযম ইত্যাদিব অনুগ্রহে তাঁবা মানুষেব দৃষ্টিকে যে-দিব্যধামে উন্নীত কবেছেন, সেখানে ভাষাব ইন্দ্রিযনির্ভবতা সহায়ক না-হযে, হযতো অন্তবায়মাত্র। অবশ্য অনির্ব্বচনীযকে বোধগম্য কবাই উপমা-ইত্যাদি অর্থালঙ্কাবেব কাজ। কিন্তু গণিতেব সাঙ্কেতিক সুদ্ধ যেখানে লজ্জামৌন হযে যায, সেখানে মান্ধাতাগন্ধী অলঙ্কাবশাস্ত্রেব বাচালতা কেবল হাস্যকব নয়, অসহ্য। সে যেন এই বঞ্জনবশ্মিব যুগে ভিষগ্‌বত্নেব আনুমানিক নাডিজ্ঞান। এব পবে এলিযটেব মতো সাত্ত্বিক কবিও যদি শিশুমনোভাবেব পবিচয দেন, তবে অবাক হবাব কিছু নেই। তিনি যেহেতু কবি, সেকালে জগৎসম্বন্ধে, বিশেষত আধুনিক জগৎসম্বন্ধে, সহজ বিস্ময় তাব পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আজ আব ভাষায় সেই বিস্ময প্রকাশেব উপায নেই, কাজেই পূর্ব্বেব মহাকবিবা যেখানে তাঁদেব শিশুসুলভ অভিজ্ঞতা দেবদুর্লভ বাক্যে অভিব্যক্ত কবতে পাবতেন, আজ সেখানে এলিযট তাঁব ত্রিকালজ্ঞ সম্বিৎকে হয় বচনাভাবে অব্যক্ত বাখতে বাধ্য, নয শিশুদেব মতো, অর্থবিনিমযেব অস্তিত্ব সুদ্ধ ভুলে গিয়ে অন্তবঙ্গ প্রতীক ব্যবহাবে বাধ্য।

এব পবে কবিতাব সত্যযুগ আবাব ফিবে আসবে কিনা বলা শক্ত। ইষ্ট্‌ম্যান ও সিউয়েল, দুজনেই ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অত্যন্ত আস্থাবান। কিন্তু আমাব লিখিত, অলিখিত অনেক মতই তাঁদেব অনুবাদী হ'লেও, আমাব কণ্ঠ সেই আগমনী-সুবেব প্রতিধ্বনি কবতে অপাবগ। তাঁদেব বিবেচনায কাব্যেব দুর্দ্দশাব কাবণ এই যে সে বিজ্ঞানেব শবণাপন্ন না-হযে, বিজ্ঞানেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধবেছিলো। কিন্তু এখনো

সন্ধিস্থাপনের উপায় আছে, সে যদি অবিলম্বে বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে, তবে তার পরিণাম সার্থক হবে। এ-যুক্তিতে আমার মন সায় দেয়না। আমি বিশ্বাস করি যে শিল্প যদি তার স্বধর্ম্মত্যাগে রাজি না-হয়,—এবং তাহলে তাকে শিল্প-নাম দেওয়া বৃথা—তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধের নিষ্পত্তি হবেনা। কলা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা তো করবেই, এমন-কি এক দেবতাকেও সে দুবার সমান চোখে দেখতে পারবেনা। কিন্তু বিজ্ঞানের অদ্বৈতবাদ মুসলমানের নিরাকার সাধনার চেয়েও সাংঘাতিক। বিজ্ঞান হয়তো পরব্রহ্মকেও মানেনা, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিণত করতে চায় একটিমাত্র অনাত্ম্য নিয়মে। একই মন্দিরের একশখানা ছবি আঁকার দরকার হ'লে, শিল্পী চেষ্টা করে যাতে তার প্রত্যেক ছবিই অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় হয়। কিন্তু হাজারখানা মন্দিরকে একটা অবিকার প্রতিমাণে অবরুদ্ধ করাই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সাধনা। বিজ্ঞান এখন যেদিকে ঝুঁকেছে, তা থেকে মনে হয় যে শিল্পের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ক্রমে দুর্ল্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্লিষ্ট ব্যক্তি-সম্বন্ধে যে-সামান্য মমতাটুকু সে পোষণ করতো, গণগণিতের প্ররোচনায় আজ তাকেও সে জলাঞ্জলি দিয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞানের এলেকার বাইরেও বহু ভূখণ্ড অনাথ অবস্থায় প'ড়ে আছে; এবং ইষ্ট্ম্যানের প্রতিধ্বনি ক'রে এমন বলা হয়তো অসঙ্গত নয় যে এই নিরুদ্দেশযাত্রায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়েই সমান অধিকারী। কিন্তু সে-আশাও কুহকিনী। বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় যে-ভীম বেগে চলেছে, তাতে তার রাজসূয় সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হওয়া কেবল সময়সাপেক্ষ। তার পরেও সে যদি কোনো প্রদেশে বিজয়বৈজয়ন্তী স্থাপনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে-স্থানে তার প্রয়োজন নেই, সে-স্থান জীবধর্ম্ম পালনের পক্ষে অনুপযোগী। মানুষ যখন অনাবশ্যক ডাকে সাড়া দিতে সদাই অসম্মত, তখন সাহিত্য ভবিষ্যতে যতই বহির্ম্মুখ হোক, তার সম্বন্ধে আমি নিরাশ্বাস।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Recovery—By Sir Arthur Salter (G Bell & Sons, Ltd)

The World's Economic Crisis and the Way of Escape: A Symposium—By Sir Arthur Salter, Sir Josiah Stamp, Mr J M Keynes, Sir Basil Blackett, Prof Henry Clay and Sir W H Beveridge (George Allen & Unwin Ltd)

এই অর্থসঙ্কটে সবাইকেই অল্পবিস্তর ভুগ্‌তে হচ্ছে। এমন কোনও দেশ নেই যেখানে এটা ছড়িয়ে পড়েনি। সেইজন্য নানা দেশে নানা ভাষায় নানা লেখক এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং কর্‌ছেন। এ সম্বন্ধে দুখানা প্রামাণ্য বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সে দুটীর পরিচয় দেওয়া গেল।

Sir Arthur Salter পাঠকদের নিকটে বোধহয় অপরিচিত নন। Economic Council-এর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার জন্যে তিনি ১৯৩০ সালে (?) ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি অনেক বছর ধ'রে League of Nations-এর Economic and Finance Section-এর Director ছিলেন। এ হেন লোকের

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের বিষয়ে লেখা মূল্যবান্ হবেই। বইটার আদরও হয়েছে যথেষ্ট। এই বছর এপ্রিল মাসে বইটা প্রথম বেরিয়েছে এবং জুনের মধ্যেই পাঁচ-পাঁচবার ছাপা হ'য়ে গিয়েছে।

Recovery বইটার একটা sub-title দেওয়া হয়েছে,—The second effort অর্থাৎ দ্বিতীয় চেষ্টা। গ্রন্থকারের মতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এর আগেই একবার হয়েছিল। এমন-কি তিনি বল্‌ছেন যে সে সময়ে অর্থনৈতিক প্রগতি আশাতীত বেগে চলেছিল। তাঁর মতে মাথাপিছু হিসাব ধর্‌লে দেখা যায় ১৯২৫ সালে সারা পৃথিবীতে ১৯১৩ সালের চাইতে বেশি জিনিস উৎপাদিত হোতো ও খরচ হোতো—অর্থাৎ জীবনযাত্রার আদর্শের অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক দশ বৎসর পরে, ১৯২৯ সালে, দু-চারটী দেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হলেও মোট পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা তার চাইতে শুধু যে অনেক ভালো হয়েছিল তা নয়, অতি দ্রুতগতিতে এমন বিপুল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিল যা কখনো আগে কেউ কল্পনাও কর্‌তে পারেনি। (Recovery, p 4)

অন্যান্য লেখকেরা এই কথাটা হয়ত এত জোর দিয়ে এমন স্পষ্ট ক'রে বলেননি। কিন্তু তাঁদেরও মত এই যে, অর্থনৈতিক জগৎ থেকে যুদ্ধের ধ্বংসের চিহ্ন অনেকটাই মুছে গিয়েছিল। ১৯২৯ সালের শেষ থেকে যে অর্থসঙ্কট সুরু হয়েছে এবং এখনও চল্‌ছে তার থেকে উদ্ধারের চেষ্টাটাকেই দ্বিতীয় চেষ্টা বলা হয়েছে।

Salter সাহেব যুদ্ধের ফলে যে-ক্ষতি হয়েছে তার একটু বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বল্‌ছেন যে অনেক কল-কারখানা, বাড়ী-ঘর এবং লোকজনের প্রাণ গিয়েছিল বটে কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনেকাংশে হয়েছিল। কিন্তু যে ক্ষতিপূরণ না হওয়াতে এই বর্ত্তমান বিপত্তি ঘটেছে, সেটা উৎপাদনের (production) না বণ্টনের (distribution) । কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। সকল দেশই প্রচুর ঋণ ক'রে যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে গভর্মেণ্ট চড়া ট্যাক্স বসিয়ে উৎপন্ন জিনিষের অনেকাংশ ঋণশোধ বা সুদের জন্য আদায় কর্‌তে বাধ্য হয়েছে। উৎপাদকের অর্থ মহাজনের (rentier) হাতে গিয়ে পড়্‌ছে। কিন্তু মহাজনেরা নূতন উৎপাদনের জন্যে টাকা খাটাচ্ছেন না,—এইটেই বর্ত্তমান সঙ্কটের একটী প্রধান কারণ।

অবশ্য শুধু উৎপাদনের দিক দিয়ে যে বিপত্তিটা ঘটেনি এ কথা প্রায় আর সকলেই বলেছেন। Blackett সাহেব খুব অল্প কথায় খুব স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন যে, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের কারণ অভাব নয়, প্রাচুর্য্য। (Economic Crisis, p 13)

বাস্তবিক এটা একটা অর্থনৈতিক প্রহেলিকা। প্রাচুর্য্যের মধ্যে এত দৈন্য কেন? শুনি বেদে আছে "অন্নং বহু কুর্ব্বীত।" হয়ত বৈদিক যুগে উৎপাদনের সমস্যাই বড় সমস্যা ছিল, এখন কিন্তু দেখি যে বণ্টনের সমস্যাই সব চেয়ে জটিল সমস্যা দাঁড়িয়েছে। এবং তার জন্যেই অর্থনৈতিক জগতে ভূমিকম্প চল্‌ছে এবং চল্‌বে।

এটী যে যুদ্ধ বা যুদ্ধঋণের ফলেই হয়েছে এমন নয়।

" developments in the economic methods and the social desires of man already in progress before the War but accelerated

by it required us in some vital respects to rebuild on new foundations" (Recovery, p 4)

বণ্টনের এই বৈষম্য কি কি রূপে প্রকাশ পেয়েছে? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। Clay সাহেব বলেছেন—

" the misdirection of industry has been the most important influence on industrial activity and an important, if not the only influence producing the general fall in prices"—(Economic Crisis, p 127)

আবার অন্যান্য জায়গায় বলেছেন—

"Two elements of dislocation date from the war, which are of exceptional influence in explaining the world depression of the last two years—the uneconomical movement of exported capital, and the destruction of the balance in the world between agriculture and industry Since the war, the export of capital has been twice cursed In one important case, in the case of reparation payments by Germany, capital has been taken out of a country in which it was urgently needed for local purposes for the ultimate benefit of France and America, which had a superfluity of capital (p 134) There has been ever since 1920, a tendency to overproduction in the chief agricultural staples" (Economic Crisis, p 135)

এটা খুবই সত্যিকথা। আমরা অবশ্য (ইংল্যাণ্ডের মতন industrial) শ্রমশিল্পপ্রধান দেশে বেকারদের সাহায্য ক'রে শ্রমশিল্প বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাটাই বেশী ক'রে দেখ্‌তে পাই, কিন্তু অনেক কৃষিপ্রধান দেশেও গভর্মেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে ঐ ঐ দেশে ফসলের দাম ঠিক রাখার বিপুল চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টা প্রায়ই বিফল হয়েছে,—আমাদের দেশে অবশ্য সে চেষ্টাও হয়নি এবং সে-চেষ্টা ব্যর্থও হয়নি।

বণ্টনের বৈষম্য টাকার দামের (purchasing power of money) হ্রাস বৃদ্ধি দিয়েই বেশী প্রকাশ পায়। যখন পাটের মণ ১০৲ থাকে তখনও চাষী সুদ বাবদ ৫৲ দেয়। আবার যখন পাটের দর ২৷৷০ টাকায় নামে তখনও সে ৫৲ দেয়। কিন্তু সত্যিকারের ব্যাপারটা কি? প্রথম বারে আধ মণ পাট বেচে দেয়, দ্বিতীয় বারে কিন্তু দুই মণ না বেচলে চলে না। অর্থাৎ কিনা উৎপাদকদের কাছ থেকে চার গুণ জিনিষ মহাজনের কাছে চ'লে গেল। অর্থনীতির এই দিকটা লক্ষ্য ক'রেই Beveridge সাহেব বলেছেন :—

"This is essentially a money crisis, there is a breakdown in the machinery of exchange and the system of regulating production by prices" (Economic Crisis, p 163)

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার তিনি একটা নতুন নাম দিয়েছেন, "anarchy of purchasing power"।

যখন বিনিময়ের কাজ অচল হয়, তখন অবশ্য ব্যবসাবাণিজ্য সবই অচল। এর কারণ কি? Salter সাহেব দেখিয়েছেন যে, অনেক দিন ধ'রে অনেক উপায়ে অর্থনীতির বিশাল সৌধের অধঃখনন চলেছে। এখন যে সেই সৌধ টলমল করছে তা'তে আর বৈচিত্র্য কি? Salter সাহেব পুরোনো কথারই উল্লেখ ক'রে বলছেন

laissez-faire-এর মূলসূত্র হচ্ছে এই যে "the individual would work r the public advantage by pursuing his private profit."—(Recovery, p 10)। এরই যখন ব্যতিক্রম ঘটে তখন আর laissez-faire থাকে কেমন করে? Trade union legislation, free education, poor-law maintenance, unemployment and health insurance, old age pensions—এ সব থেকে প্রমাণ হয় যে শুধু laissez faire-এ কুলুচ্ছে না, অন্য কিছু চাই। আবার অন্য দিকে "growth of combines. cartels, tariffs, control of immigration, sterilisation of gold" এগুলিও laissez-faire-এর কম ব্যতিক্রম নয়। শেষটির সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা দরকার। যদি কোনও কারণে কোনও দেশের জিনিষপত্রের দাম ক'মে যায় তবে সেই দেশের সস্তা জিনিষ অন্য দেশে খুব কাটে, কিন্তু অন্য দেশের জিনিষ সে দেশে বেচা চলে না। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, সেই দেশে রপ্তানি হয় বেশী, আমদানি হয় কম। এবং এর জন্যে সেই দেশে সোনা আস্‌তে থাকে কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সোনাই হচ্ছে বিনিময়ের প্রধান উপাদান। সোনা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে টাকা (অর্থাৎ মুদ্রা বা নোট বা চেকের) প্রচলন বাড়ে এবং জিনিষপত্রের দামও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কিন্তু যদি সেরূপ না হয় তবে অবশ্য জিনিষপত্রের দাম সস্তাই থাকে। নানা কারণে এখন সোনার আমদানি রপ্তানি যুদ্ধের আগেকার চেয়ে অনেক বেড়েছে। যুদ্ধের ঋণ দিতে হয়, সুদ দিতে হয়, অথচ অনেক উত্তমর্ণ (creditor) দেশেই অধমর্ণ (debtor) দেশের জিনিষের উপর চড়া শুল্ক বসিয়ে সেই সব দেশের জিনিষের আমদানি কমান হয়েছে; কারণ তা নইলে মহাজন-দেশের কৃষি বা শ্রমশিল্প অচল হ'য়ে পড়ে।

সুতরাং যতদিন খাতক দেশগুলি একেবারে দেউলিয়া না হ'যে যায় ততদিন মহাজনদেশে সোনা আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু তার ফলে টাকার প্রচলন বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে সব জিনিষের দামের সমতা রক্ষার জন্য সোনার যে বিশেষ কাজটি ছিল সেটি একেবারে যেতে বসেছে। বর্ত্তমান দুর্গতির বিষয়ে ছোট বড় আরও অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে সব কথার চেয়ে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে সেটাই বেশী মূল্যবান্ তাতে সন্দেহ নাই। এখানে কিন্তু গোড়ায় গলদ। কারুর মতে রোগী প্রায় চিকিৎসার বাইরে চ'লে গেছে। Keynes-এর কথাতেই বলি ঃ—

"Competitive wage reductions, competitive tariffs, competitive liquidation of foreign assets, competitive currency deflations, competitive economy campaigns, competitive contractions of new development—all are of this beggar-my-neighbour description (Economic Crisis, p 74) . through lack of foresight and constructive imagination the financial and political authorities of the world have lacked the courage or the conviction at each stage of the decline to apply the available remedies in sufficiently drastic doses , and by now they have allowed the collapse to reach a point where the whole system may have lost its resiliency and its capacity for a rebound" (Ibid, p 75)

অবশ্য যাঁরা Keynes-এর লেখা প'ড়ে থাকেন তাঁরা জানেনই যে Keynes

শুভবাদীদের মধ্যে একজন। বর্ত্তমান ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও তিনি আলোর একটী সন্ধান দিয়েছেন :—

"The outstanding ground for cheerfulness lies, I think, in this—that the system has already shown its capacity to stand an almost inconceivable strain This remarkable capacity of the system to take punishment is the best reason for hoping that we still have time to rally the constructive forces of the world" (Economic Crisis, p 77)

কি ভাবে যে এইটী করতে হ'বে সে বিষয়ে Salter সাহেব সবিশেষ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে উদ্ধারের প্রথম উপায় স্বর্ণমানের সংস্কার এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সমতা রক্ষা। এটী অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত। মতবিরোধ হয় এর উপায় নিয়ে। Salter সাহেবের মতে—

"Central Banks, consulting and co-operating through the Bank of International Settlements, could deal with the short-term fluctuations in the general price level If the situation was getting beyond their control because gold was becoming too scarce or too plentiful . Governments would lend their aid . by securing a simultaneous change in the legal reserve ratios and, in case of necessity, a simultaneous change in the gold content of the currency standards 'Devaluations' in time of gold scarcity, . would not be open to the ordinary objections if made simultaneously by all principal countries, and so as not to increase prices but to keep them stable, for it would not alter exchange rates or create injustice to creditors" (Recovery, p 291).

পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় ঋণপদ্ধতির (credit) সংস্কার। বাস্তবিক পদ্ধতি বল্‌তে এখন কিছুই নেই। এতে যত রকমে ক্ষতি হ'য়েছে তার অনেক উদাহরণ বিভিন্ন দেশ থেকে Salter সাহেব দিয়েছেন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী প্রায় ৪০০ কোটী ডলার ধার করেছে। তার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের আগে অর্থাৎ ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে এর অর্দ্ধেকেরও উপর ঋণ নিয়েছে। এবং সেই সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ্ যে টাকা দিয়েছে ঐ ঋণ তার প্রায় আড়াই গুণ। ১৯২২ সালে ব্রেজিল বৈদ্যুতিক রেলওয়ের জন্যে ৮০ লক্ষ ডলার ঋণ নিয়েছিল, কিন্তু কাজে তার কোনও চিহ্নই দেখা যায়নি। অবশ্য, এর ফলে দেশের কোনও লাভ হোক্ বা নাই হোক্, সেই সব শাসনকর্ত্তাদের বেশ কিছু লাভ কোন কোন সময়ে হ'য়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া অবশ্য কঠিন। কিন্তু একটা প্রমাণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

"It was admitted that $415,000 had been paid to Don Juan Leguia, son of the deposed President of Peru, for his assistance in floating loans to the total value of $100 million for the account of the Peruvian Government" (Recovery, p 103)

এর জন্যে Salter সাহেব বলেন—

". loans to foreign Governments and public authorities need to be . examined by a Joint Committee of the League of Nations and the Bank of International Settlements At home, similarly, the mechanism for directing the savings of the private

investor needs to be improved so as to prevent his money from being wasted." (Recovery, p 293)

এই ঋণের আর একটা দিক আছে। সেটা ভবিষ্যতের নয়, অতীতের। যে-ঋণের ভারে সমস্ত দেশই এখন প্রপীড়িত,—তা সে যুদ্ধের জন্যই হোক্ বা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্যই হোক্—তার ভার লাঘব না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের ঋণসম্বন্ধে কোনও সুবন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে একথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ইংল্যাণ্ডে আর ভারতবর্ষে দুইদেশেই সম্প্রতি Conversion ক'রে গভর্ণমেণ্টের ঋণের সুদের হার কমান হয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া পৃথিবীর সমৃদ্ধি অসম্ভব, আর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় বিদেশী জিনিষের উপরে শুল্ক। প্রায় পঞ্চাশটী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯২৭ সালে যে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে সকলে একবাক্যে একথা স্বীকার করেন, Salter সাহেব তার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ফলে দেখা যায় যে শুল্ক কমা দূরের কথা, যে-সব দেশে শুল্ক ছিল না সে সব দেশেও শুল্ক আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্য দেশে শুল্কের হার বেড়ে চলেছে। আবার অন্য উপায়ে যেমন exchange depreciation এবং rationing of exchang-এর দ্বারাও আমদানি কমানর চেষ্টা হয়েছে। প্রথমটীর উদাহরণ ইংল্যাণ্ড এবং জাপান। দুইদেশেই নিজের নিজের টাকার (money) দাম কমানর ফলে বিদেশী জিনিষের মূল্য এত চড়েছে যে বিদেশী জিনিষের আমদানি কমেছে আর দেশী জিনিষের রপ্তানী বেড়েছে। আগে যে জিনিষ America-তে চৌদ্দ ডলারে তৈরী হ'ত, তা তিন পাউণ্ডে ইংল্যাণ্ডে বিক্রী হ'তে পার্‌ত; কারণ তখন exchange-এর হার ১ পাউণ্ড= ৪⅚ ডলার ছিল; এখন exchange-এর হার ১ পাউণ্ড=৩¾ হওয়াতে চৌদ্দ ডলারের জিনিষ প্রায় চার পাউণ্ডে না বেচলে চলে না। Rationing of exchange-এরও ঐ একই ফল।

কিন্তু এর আশু প্রতিকারের কোনও উপায় দেখা যায় না। এ বিষয়ে সবাইকার এক যোটে কাজ করা প্রায় অসম্ভব।

আবার অন্য দিকে শুল্ক একেবারে বাদ দেওয়াও অসম্ভব।

এই অবস্থায় যেটুকু সম্ভব সেই সম্বন্ধে Salter সাহেব বলেছেন :—

" We may therefore hope that, to an increasing extent, whatever be their height and general character, they will be part of a deliberate, general, and reasonably stable policy, and rarely be changed except after consultation with all those concerned, consumers as well as producers at home, and the representatives of foreign countries " (Recovery, p 195)

কিন্তু আমরা Salter সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই, এটীও কি সম্ভব? যদি এটী সম্ভব হয়, তবে ত কোনও গোলযোগই থাকে না। কারণ তাহলে আগে যে-উপায়গুলির কথা বলা হ'ল সবই কাজে পরিণত হ'তে পারে। জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আন্তর্জাতিক মৈত্রীর চেষ্টা চল্‌ছে বটে কিন্তু তাতে বড় বড় দেশের কর্ত্তৃপক্ষের আস্থা বিশেষ কিছু আছে ব'লে মনে হয়

না। কারণ তা নইলে প্রকৃতপক্ষে লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জামের ব্যয়সঙ্কোচ করতে কেউই রাজী হন না কেন? সত্যি কথা বলতে কি, সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবার প্রবৃত্তির মধ্যেই বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের মূলকারণ অন্বেষণ করা যেতে পারে। আমরা শুধু গভর্মেন্টের খরচ এবং আয়-ব্যয়ের সমতার কথা বলছি না, যদিও সেটাও বড় কম কথা নয়। এর ফলে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে এই যে অশান্তি এবং অবিশ্বাসের বিষ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে জর্জ্জর করেছে এবং করছে।

Salter সাহেব অবশ্য লড়াইয়ের সময়ের কথা মনে করেই বলেছেন :—

"Which country of us has not but a few years since shown the resources we now require of courage, of personal devotion, of industrial and financial leadership, of public direction, in a need no greater and in a cause less worthy? . . . Now, and now only, our material resources, technical knowledge and industrial skill, are enough to afford to every man of the world's teeming population physical comfort, adequate leisure, and access to everything in our rich heritage of civilisation that he has the personal quality to enjoy. We need but the regulative wisdom to control our specialised activities and the thrusting energies of our sectional and selfish interests To face the troubles that beset us, this apprehensive and defensive world needs above all the qualities it seems for the moment to have abandoned—courage and magnanimity" (Recovery, p 302).

এটা কি সুদূরের সাধনার বস্তু নয়? একি বাস্তব জগতে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে Blackett সাহেবের কথাও প্রণিধানের যোগ্য। তিনি এই ব'লে আরম্ভ করেছেন

"We are in immediate danger of finding ourselves the victims of a Frankenstein of our own creation , the genius of man has outstripped his code of morals, both in the national and in the international sphere" (Economic Crisis, p. 91)

তবে আশার কথাটা এই,—এবং তাঁর ভাষাতেই বলি—

"Never in the World's history has there been so large and widespread a fund of human goodwill among men and women all over the world, anxious to serve their generation, and never have men and women felt more keenly the exasperating frustration which renders their good intentions and desires nugatory and unavailing" (Economic Crisis, pp 100—110).

এই ট্রাজেডির (tragedy) কারণ কি? মনে হয় যে এই সব লোকদের রাষ্ট্রপরিচালনার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, সেটাই এই tragedy-র কারণ। Blackett সাহেবের মতে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নৈতিক শক্তির অভাব সত্ত্বেও economic planning সফল হ'তে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ফ্যাসিষ্ট ইটালি ও বলশেভিক রাশিয়ার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে দুইটা গুরুতর আপত্তি আছে। Bolshevism এবং Fascism দুইয়েতেই এখন নতুনের মোহ মাখান আছে। দুইয়েতেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে যে উদ্যম এখন দেখা যাচ্ছে সেটা হয়ত সাময়িক। এর পরিণতি কি হবে তা' বলা শক্ত। আর একটা আপত্তি এই যে দুইই একটা দেশে এবং জাতিতে

সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান সঙ্কট এবং তার কারণগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপক—একেবারে জগৎজোড়া। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য planning কতদূর সফল হবে তার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

এইজন্যেই Keynes সাহেব এমন দুটী উপায়ের কথা বলেছেন যা প্রত্যেক দেশ নিজের চেষ্টাতে অবলম্বন করতে পারে। একটী exchange depreciation, এর কথা আগেই বলা হয়েছে। আর একটী "wise spending"—অর্থাৎ বেশ বুঝে-সুঝে এমনভাবে খরচ করা যাতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসাধনের ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সাহায্য হয়।

এর একটী উত্তর Blackett সাহেব দিয়েছেন।

"What has been wrong in recent years is not that there has been too much saving—there has been too little—but that owing to the breakdown of the monetary system and the catastrophic fall in prices the saving has not been effective in creating new capital" (Economic Crisis, p 111).

আর একটী উত্তর Sir Josiah Stamp দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ইংলণ্ডে অন্ততঃ "spending" কম হয় নি।

"   when we have had reduced purchasing power by 15 per cent, our actual physical consumption of foreign imports has increased by 5 or 6 per cent, so that instead of going down *pari passu* it has gone up" (Economic Crisis, p. 62)

যাই হোক্ না কেন, যে দুটী উপায়ের কথা Keynes সাহেব বলেছেন তা সফল হ'লেও মাত্র একটী জাতির বা একটী দেশের অবস্থার আংশিক ও সাময়িক উন্নতি হ'তে পারে,—বর্ত্তমান জগৎজোড়া অর্থসমস্যার স্থায়ী সমাধান এতে মোটেই হ'বে না, বরং অন্ততঃ প্রথমটীতে অনিষ্টই হ'বে।

এই বিস্তীর্ণ আলোচনাতে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আর কোনও ফল হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। Beveridge সাহেবের কথাতেই বলি—

".   I would like to say that if there are any of you who are by now content to leave yourselves in the hands of Dr Keynes with his regimen of high feeding or of Dr Stamp with his policy of low feeding, if there are any to whom the bedside manner of Dr Clay has brought confidence, if you think health will certainly be won back by taking Dr Blackett's Planning Pills or Dr Salter's International Elixir—then, in the name of Adam Smith, go home" (Economic Crisis, p 162)

এই দুঃখেই তিনি বলেছেন—

"The way of escape from world crisis is barred and doubly barred—by disagreement among economists and by lack of international will among Governments" (Economic Crisis, p 188)

তিনি যথার্থ ইবলেছেন—

"The world will not escape this crisis, not if escape means getting out of danger by deliberate thought and action . the crisis will become less acute of itself long before we have done

anything to better it this deflation is the inevitable aftermath of inflation, the headache after the debauch, . there is not much that anyone can do now to help us , what is wanted ought to have been done five years ago The most that we can hope for this year—really it is too much to hope for this year—is that the Governments will do something, not to cure the crisis but to remove some of its aggravations—will deal with reparations and war debts, with some of the obstacles to trade, with one or two needless rigidities " (Economic Crisis, pp 186—7)

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ

Triumphal March—BY T S ELIOT (Faber and Faber)
The Orators—BY W H AUDEN (Faber and Faber)
Rooming House—BY HORACE GREGORY (Faber and Faber)
Poems—BY CLERE PARSONS (Faber and Faber)
New Signatures—(The Hogarth Press)

শেষ বইটীর সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় প্রসঙ্গত বলেছেন যে নিছক গীতিকাব্য ছাড়া সব কাব্যেই কবির কর্ত্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও কুশ্রীতা দুয়েরই আবশ্যক আমাদেরকে উপলব্ধি করানো। এবং কাব্য যদি মরমী অথচ বন্ধ্যা ধ্যানধারণায় আবদ্ধ না হয়ে পড়ে, তাহ'লে কবিমাত্রেই Lear-রচয়িতার মতো কুশ্রীতা ও পাপের উচ্ছেদসাধনও যে আমাদের কর্ত্তব্য, সে বোধও আমাদেরকে দিয়ে যান। আরেক জায়গায় রবার্টস্ বলেছেন—এই রোমান্টিক-বিরোধী সংযত নৈর্ব্যক্তিকতা কেবল নির্লিপ্ততা মাত্র নয়, এর জন্ম অন্যের সঙ্গে একান্ত একাত্মবোধে। Good Citizenship-এর যে ধারণা গ্রীক্‌দের ছিল, এইখানে তা আবার কাব্যদেহ পেয়েছে। আর্টহিসাবে কাব্যের স্বাধীনতা এতে গেল কি ফিরে এল, তা নাকি রবার্টস্ এখনো বল্‌তে পারেন না। তিনি বলেন যে, এই প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা হচ্ছে মানবজীবন সম্বন্ধে এমন এক মতের জন্য, যে মতপ্রচার সার্থক হ'লে কবিরা খাঁটি কাব্য লিখতে পারবেন, অন্তত উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার্ লেখবার মতো আদর্শ পাবেন।

Marriage of Heaven and Hell-এর বিবাহভঙ্গের যে আশা রবার্টস্ করেছেন, সে আশা আমরাও রাখি। কাব্য জীবনের আলিঙ্গনবদ্ধ না হ'লেও, জীবনকে করস্পর্শ করা কাব্যের উচিত, সে আমারও বিশ্বাস। তাই আমার আপত্তি হলো New Signatures সফল প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা নয় ব'লেই। মনে হলো, এই নয়জন কবি ব্যর্থ হলেন, অক্ষমতা ও চালিয়াতিতে এঁদের প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ও কাব্য দুইই চাপা পড়েছে ব'লে। অবশ্য এঁরা কেউই এলিয়ট্ বা হার্ডি নন এবং এঁদের বয়স কম। কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পরিণত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও এই কবিরা ব্যর্থ হলেন, পাছে তাঁরা সাধারণের বোধগম্য ও সাধারণ হ'য়ে পড়েন, সেই ভয়ে। এলিয়ট্ বা হপ্‌কিন্সের কাব্যে লেখকের উদ্দেশ্য অনেকসময়ে স্পষ্টতায় বিফল হয়। ডানের বোধ্য হবার সময় ও প্রয়োজন ছিল না। এই কবিরা কিন্তু স্মার্ট ও উচ্চলাট

হবার সবল বাসনায় দুর্ব্বোধ্য চালিয়াতি করেছেন। বিনীত হ'লে তাঁরা যেটুকু ভালো লিখতে পারতেন, সেটুকুও তাই আর New Signatures-এ নেই।

তবে এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ, যথা, বেল্ অপেক্ষাকৃত সুস্থ সবল ভাবে লিখেছেন। এই মুক্তছন্দের দিনে বেলের বারো পৃষ্ঠা-ব্যাপী পোপের ছন্দের আলাপ সত্যই তারিফ্ করতে হয়। বলা বাহুল্য বেল্ ইংল্যাণ্ড্ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ইংরেজদের মতোই। আমাদের মনোরোচক একটা উদাহরণ দেওয়া গেল—

A noble statesman once observed with tears
That Peterloo was won by volunteers,
But now at last, crowned with an equal fame,
The regulars can boast Amritsar's name.

* * * * *

You can discover from the *Daily Mail*,
Where all agree in telling the same tale
"Throughout Bengal, if once broke free,
You would not find a virgin or rupee?"
Yet is not this a shade ridiculous?
What are Bengal Virginities to us?
And, really does it matter, after all,
Even in England—let alone Bengal?
Why keep a Fleet and Army at such cost
To save intact what might be better lost?

কিন্তু একে গ্রীক বা শেক্সপিয়রীয় মানবীয়তা বলতে বাধে। এ বইটীতে ওরই মধ্যে অডেন, স্পেণ্ডর্ ও লুইসের মধ্যে যদি কিছু মানবীয়তা থাকে। এঁদের সম্বন্ধে ও অন্যান্য নবীন কবিদের কারো কারো সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে যে ইংরেজি কাব্যকে ন্যাকামি ও কবিয়ানা থেকে এলিয়ট্ যে মুক্তি দিয়েছেন, সে মুক্তির খবর এঁরা পেয়েছেন। তাই এঁরা পাহাড় পর্ব্বতের প্রেমে প'ড়ে লেখেন না—

Shepherds, dwellers in the valleys, men
Whom I already loved,—not verily
For their own sakes, but for the fields and hills
Where was their occupation and abode

এই আধুনিক কবিরা অন্তত উদ্ধৃত কাব্যের পাত্র ন'ন—

And while midst lakes and mountains wild he ran
Full of himself and shunned the haunts of man
Taught her o'er each lone vale and Alpine steep
To lisp the stories of his wrongs and weep,
Taught her to cherish still in either eye
Of tender tears a plentiful supply,
And pour them in the brooks that babbled by—
Taught her to mete by rule her feelings strong
False by degrees and delicately wrong,
For the crushed Beetle, first—the widowed Dove,
And all the warbled sorrows of the grave,
Next for poor suff'ring Guilt—and last of all
For Parents, Friends, or King and Country's fall

হ্যারিয়েট্, এলিসাবেথ্, মেরি, জেন্, এমিলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে কাব্যজীবী প্রেম ক'রে এঁরা বলেন না—

I said to my heart between sleeping and waking,
Thou wild thing that always art leaping or aching,
What black, brown or fair, in what clime, what nation,
By turns has not taught thee a pit-a-pat-ation?

এবং পরিণত মানুষ ছেড়ে তিনবছরের শিশু বা কুকুর-বিড়ালের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও আধুনিক কবিযশপ্রার্থীরা করেন না।

সেইজন্য Orators সব না বুঝতে পারলেও মোটামুটি ভালোই লেগেছে। প্রথম অধ্যায় Address for a Prizeday-টাই সবচেয়ে সহজ ও সমগ্র বইখানির সূত্র ধরিয়ে দেয়। এটা ও পরের গদ্যরচনাগুলিতে অডেনের গদ্যের কৌশলও মুগ্ধ করে। Argument, Statement ও Letter to a Wound-এর বক্তব্যও তৃপ্তিদায়ক। যে বুদ্ধি সব দেখতে পায় ও বিচার ক'রেও গ্রহণ করে, সেই শুভবুদ্ধির আভাস পেয়ে, এবং এইগুলিতে ও অন্যান্য যে সব রচনায় অডেন অস্পষ্ট ও অসাধারণ হতে যান্ নি তা প'ড়ে, আমরা আশান্বিত হই। কিন্তু দীর্ঘ Journal of an Airman জয়স্ বা আর কার দোহাই দিয়ে যে ভালো লাগাব, ভেবে পেলুম না। তবে এই এলোমেলো ও পেশাদার বিমানবিহারীর ডায়েরিতেও মাঝে মাঝে কবিতায় বা গদ্যে, হাসি বা প্রীতিকর খাম্‌খেয়ালি ভাব, হয়ত বা গভীরতাও, এসে পড়েছে। শেষের ওড্-কটার শিল্পনৈপুণ্য ছেলেমানুষি সত্ত্বেও অডেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা আনে। Assonance, dissonance, internal rhyme, aliteration প্রভৃতি যে সব কায়দা বর্ত্তমান সমালোচনায় খাতির পায়, তাও অডেনের আছে। যথা,

This life is to last, when we leave we leave all,
Though vows have no virtue, though voice is in vain,
We live like ghouls
On posts from girls
What the spirit utters
In formal letters

গ্রেগরির মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত কবিদের দোষ আছে। কিন্তু ইংরেজির চেয়ে এমেরিকান কাব্য স্মার্টন্মন্যতায় ঢের বেশি পীড়িত। সে হিসাবে গ্রেগরি বরঞ্চ প্রশংসনীয়। জনৈক এমেরিকান্ কবি লিখেছিলেন—তুমি বড়ো মিষ্টি মেয়ে, আমি তোমায় ভালোবাসি; তুমি বড়ো মিষ্টি মেয়ে, আমি তোমার কানটা খাব, আর গ্রেগরি লিখেছেন—

Be for a little while eternal
singing with all the songs in your body
but making no sound
The Rose of Sharon singing in an old city
was eternal suddenly
for a little while

যদিও গ্রেগরির কবিতার বিষয় হচ্ছে ইহুদি, ডেম্‌সি, খুন, যৌনব্যভিচার, দোকানের পরিচারিকার প্রণয়, ব্যবসাদার ধার্ম্মিক, কয়েদী ইত্যাদি, তবুও মনে হয় গ্রেগরির কাব্যউৎস শুধু নব্যতাভিমান নয়। সেকালের মতোই তিনি লেখেন—

—Yes, we shall share
this everlasting earth

গ্রেগরির প্রায় সমবয়সী ইংরেজ পার্স‌ন্‌স্‌ তেইশ বছরে মারা যান। তাঁর স্বল্প কবিতার দাম কারুণ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিকায় পড়লুম—

Mallarmé for a favour
teach me to achieve
the rigid gesture won only with labour
and comparable to the ease
balance and strength with which the ballet-dancer
sustains her still mercurial pose in air

মালার্মের অনুবর্ত্তন পার্স‌ন্‌সের কতটা সার্থক সে বিচার করবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে এই কবির রচনাবলীতে—মালার্মে বা কৈশোর, যার জন্যই হোক্, একটা অক্সফোর্ডের ছায়াশীতল স্বপ্নালু মন্থরতা আছে। অবশ্য রেস্তোরাঁয় কেমন ভদ্রলোকটী পরিচারিকার সঙ্গে সময় স্থির করলেন সে দৃশ্যও পার্সন্‌স্‌ দেখতে পারতেন এবং রোমান্টিক্ ও রোহিনীয় জীবনের শূন্যতাও এ কবি বুঝেছিলেন—

Living from day to day provides no clue
For certain happiness—it is a shallow
Youngster philosophy and easy to see through
Sirs, we know what usually it comes to—
The drunkard's bliss, the braggadoccio
' Admire me now triumphant over virtue '
The rake's bravado and tedious libido
Gin in small hours, praise for the cunning ruse

ভবিষ্যতের আশা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'যে শেষে সিদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া যায় এলিয়টের সঙ্গে। Marina নামক আশ্চর্য্য কবিতাটীতে জেনেছিলুম যে জাহাজ-ডুবির পর এল নবজগৎ, নবজীবন; জেনেছিলুম যে কুকুরের দাঁত, ময়ূরের পুচ্ছছটা, আত্মতৃপ্তির শূকরপঙ্ক ও জীবক্রিয়ার পুলক অনিত্য। সেখানে এলিয়ট্ এই জীবন ত্যাগ করেছিলেন সেই নবজীবনের শান্তিতে। তারপরে Triumphal March-এ দেখি শোভাযাত্রা। দারুণ ভিড় আর কত কামান, বন্দুক, উড়োজাহাজ, সৈন্য—আরো কত কি। কয় লক্ষ কয় হাজার কি কি এল তার একটা সঠিক ফর্দ্দ এলিয়ট্ দিয়েছেন। তারপরে "তিনি" এলেন—হতাশা, ব্যর্থতা। কৃষ্ণমূর্ত্তি বুঝি মেসায়া হলেন না! কোথায় তাঁর চোখে সেই দীপ্ত প্রশ্ন। কোথায় সেই আলো। তারপরে বাড়ী ফিরে গিয়ে খাওয়া, সসেজ্ যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়া। সৈন্যেরা তখন বেড়ার মতো সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে আলো এল না যে আলো আছে—

O hidden under the dove's wing, hidden in the turtle's breast,
Under the palm-tree at noon, under the running water
At the still point of the turning world O hidden

শ্রীবিষ্ণু দে

Fleche d'Orient—par PAUL MORAND (Nouvelle Revue Francaise)

Le Cercle de Famille—par ANDRE MAUROIS (Bernard Grasset)

Le Noeud de Vipères—par FRANCOIS MAURIAC (Bernard Grasset)

ইংবেজ, দেখছি, কাঞ্চনকে কামিনীব মতোই অস্পৃশ্য ব'লে ভাবতে প্রস্তুত। শোনা যাচ্ছে, এমেবিকা অবিলম্বেই যুদ্ধঋণেব মাযা কাটাবে। অবশ্য, ফবাসীবা এখনো ক্ষতিপূবণেব আবদাব ছাডতে পাবেনি বটে, কিন্তু তাদেব সাহিত্যে সম্প্রতি যে-বদল লক্ষ্য কবেছি, তাকে, মহাত্মাব পবিভাষায, হার্দ্দ্য পবিবর্ত্তন বলাই উচিত। উত্তব-সামবিক যুগ তবে কি সত্যই শেষ হলো? জানি যে এ-প্রশ্নেব জবাবে বাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রবিশাবদদেব মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে যাবে। দুঃখবাদীবা হযতো রুযেব নবতন পঞ্চবার্ষিক উদ্যোগেব দিকে তাকিযে মাথা নাডবেন, এবং বৈনাশিকেবা ব্যঙ্গ্যভবে নেবেন মাঞ্চুকুযোব নাম। কিন্তু তাহলেও মন্বন্তবেব পালা ফুবিয়েছে ব'লেই আমাব বিশ্বাস, কাবণ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস যাই বলুক, কালেব স্বরূপ কেবল যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষেই অভিব্যক্ত হযনা; তাব যথার্থ পবিচয় হয়তো আমাদেব শিল্পে সাহিত্যে, আমাদেব বিজ্ঞানে দর্শনে, আমাদেব স্বপ্নে সঙ্কল্পে।

যুগরূপেব চিত্রাঙ্কনে ফবাসীবাই সম্ভবত সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য। অন্ততপক্ষে ফবাসীদেশে শিল্পবিষযক যত অভিজ্ঞানপত্রেব উৎপাদন হযেছে, অন্যত্র তাব তুলনা নেই। উনিশ শতকেব মৃত্যু ঘোষণা কবেছিলো ফবাসী প্রতীকী কবিবা, এবং বিংশ শতাব্দীব আগমনী গেযেছিলো ভবিষ্যপ্রেমিক ফবাসী ফিউটুবিষ্ট্। ইদানিকাব হিংস্র জাতীযতাব উদ্বোধন "লাক্সির্য ফ্রাঁসেজ্"-এব মধ্যস্থতায, এবং সমবান্তবেব প্রস্তাবনা ওই দেশেবই লক্ষণাবৃত্ত লেখকদেব বিজ্ঞাপনে। এই সুব্-বেযালিস্ত্-নামক নব সম্প্রদাযেব পুবোধা ছিলেন পল মোবাঁ; এবং তাঁব "উভেব লা নুই" ও "ফের্মে লা নুই" উপাধিধাবী দ্বিতীয ও তৃতীয গল্পপুস্তক-দুটি প্রসাদগুণেব পবাকাষ্ঠা না-হ'লেও, ঐতিহাসিক বিববণ হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। এই কাহিনীগুলিব অভূতপূর্ব্বতাব সঠিক সমাচাব দেওযা শক্ত, কাবণ সে-অসামান্যতা কোনো মুদ্রাদোষ থেকে উদ্ভূত নয, সে কেবল পাবিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলাবই প্রতিভাস। অবশ্য এই প্রতিবিম্বন-প্রকবণে কতকটা স্বকীযতা ছিলো, কিন্তু মোটেব উপব তাও সিনেমা-চিত্রপদ্ধতিব অনুগামী। অর্থাৎ মোবাঁব চাবিত্র্যচিত্রণে সুসঙ্গতিব কোনো বালাই থাকতোনা, উপাখ্যান বচিত হতো গোটাকযেক বিশ্লিষ্ট ঘটনাব পবম্পবায। গল্প-গুলিব অন্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো ভাষাব: সে ভাষা অনেকটা আধুনিক বাঙালী লেখকদেব বচনাবীতিব মতো—স্বদেশী ব্যাকবণেব প্রকৃতিবিবোধী এবং ইংবেজি শব্দকোষেব অধমর্ণ। এটা সম্ভবত তাঁব অক্স্ফোর্ড্-বিশ্ববিদ্যালযে শিক্ষা-নবিসীব অবশ্যম্ভাবী পবিণাম।

তাব পবে মোবাঁ তাঁব পুবানো বন্ধুদেব ভাসিযে দিযে, অসংখ্য গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। এতে ক'বে হযতো তাঁব অর্থবৃদ্ধি হযে থাকবে, কিন্তু 'ল বুদ্ধ ভিভঁা'-ব মতো এক-আধখানা বসোত্তীর্ণ উপন্যাস সত্ত্বেও, তিনি তাঁব প্রাথমিক প্রসিদ্ধিকে অতিক্রম কবতে পাবেননি। প্রাবম্ভে তাঁব বচনায যে-ঔজ্জ্বল্যকে উপলব্ধিব

উদ্দীপ্তি ব'লে মনে হতো, ক্রমে অভ্যাসদোষে তাকে ঝুটো জহরতের চাকচক্যের মতো লাগতে লাগলো, তাঁর নিরাসক্ত সমালোচনাশক্তি বহুব্যবহারে হঠকারিতায় গিয়ে ঠেকলো; অতিপরিচয়ের ফলে সেই বিশ্বব্যাপ্ত মনে কূপমণ্ডূকের লক্ষণ দেখা দিলো। এই অবস্থায় মাস ছয়েক আগে তাঁর "ফ্লেশ দরিয়াঁ" প্রকাশিত হলো, এবং চমৎকৃত পাঠক উৎফুল্লচিত্তে আবার স্বীকার করলে যে মোরাঁর আর যাই অধঃপতন ঘটে থাকুক, পশ্চিমের দিক্‌নিরূপকদের মধ্যে তিনি এখনো অগ্রগণ্য। স্বদেশী সমালোচকেরা বইখানিকে মোরাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন, এবং এই অভিমতকে নতশিরে মেনে নেওয়াই বিদেশীর পক্ষে নিরাপদ; তবু আমার মনে হয় কেবল সাহিত্য হিসেবে, এর চেয়ে অনেক ভালো গল্প মোরাঁ ইতিপূর্ব্বে লিখেছেন। আসলে জাগ্রত কালজ্ঞানই বোধহয় পুস্তকখানির প্রধান সম্পদ।

"ফ্লেশ দরিয়াঁ"-র আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই: এক প্যারিসপ্রবাসী, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন রুষ যুবক বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে, বিমানপথে বুদাপেস্তে কাভিয়ারে আনতে ছুটলো। ঘটনাক্রমে সে ফিরতি এয়ারোপ্লেন ধরতে পারলেনা, এবং বন্ধুদের উপরোধ না-এড়াতে পেরে, কয়েকদিনের জন্যে নৌকাবিহারে বাহির হলো। ফেরার দিন রাত্রে এক জিপসীর মুখে স্বদেশের গান শুনে, তার মন হঠাৎ মানসযাত্রী হংসের মতো চঞ্চল হয়ে উঠলো, এবং বন্ধুদের ফাঁকি দিয়ে, পত্নী-পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে, সেই শিষ্ট, শান্ত, সোভিয়েৎদ্বেষী যুবকটি উধাও হয়ে গেলো তার মাতৃভূমির ভয়ঙ্কর নিরুদ্দেশে।

যাঁরা মোঁরার পূর্ব্বতন রচনার সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁরা হয়তো গল্পের এই সংক্ষেপে কোনো যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন দেখবেননা। এটা নিশ্চয় যে কাহিনীর কাঠামোটি মোরাঁ-সাহিত্যে বারবার মেলে। "ল বুদ্ধ ভিভাঁ"-র রাজসিক নায়ক পৃথিবী-প্রদক্ষিণ ক'রে, অবশেষে কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশের স্বৈর সিংহাসনে নির্ব্বিবাদে অভিষিক্ত হলো; "লা মাজি নোয়ার"-এর নিগ্রো কুশীলবেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার চূড়ান্তে উঠে, নিয়তির ঈষদ্ ইঙ্গিতেই স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করলে, এবং "ফ্লেশ দরিয়াঁ"-র দিমিত্রিও দেশের আকর্ষণে সমাজ-স্বজনকে জলাঞ্জলি দিলে। এর মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? কিন্তু "ফ্লেশ দরিয়াঁ"-র সঙ্গে তার পূর্ব্ববর্ত্তীদের একটা বংশানুক্রমিক যোগ থাকলেও, আলোচ্য পুস্তকখানি যে-মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অদ্যাবধি মোরাঁর নায়ক-নায়িকার পদস্খলন বাহ্য প্রবর্ত্তনাতেই ঘটেছে। হয় প্রবঞ্চনার দুঃসহ ধাক্কা, নয় পরিবেষ্টনের দুর্নিবার বিকার, এই ছিলো প্রকৃতির প্রতিহিংসাতর্পণের দুটিমাত্র উপায়। কিন্তু দিমিত্রির ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটলোনা। তার স্ত্রীর, তার স্বাচ্ছন্দ্যের, তার সম্পত্তির সম্মোহন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপ্রতিহত রইলো। কেবল মহেন্দ্রলগ্নে সে বুঝলে যে শুচিগ্রস্ত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই হবেনা, তার জন্যে চাই মুক্তি, দিগন্তবিস্তৃত মুক্তি, তার জন্যে চাই স্বার্থত্যাগ, সর্ব্বস্বান্ত স্বার্থত্যাগ, তার জন্যে চাই গ্রহণ, বিঘ্ন-বিপদ, মালিন্য-কুশ্রীতা, দৈন্য-দুঃস্বপ্ন, সকলকে সাদরে গ্রহণ। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের সজ্ঞান কৃত্রিমতার মধ্যে এই উপলব্ধি এমনি অপ্রত্যাশিত, এতই রোমাঞ্চকর যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকও আমাদের অভিনন্দনের যোগ্য। রূপস্রষ্টা হিসেবে মোঁরার কীর্ত্তি এখনো হয়তো মহার্ঘ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তাহলেও তাঁকে যেহেতু আমি পশ্চিমাকাশের বায়ুবিদ্

যন্ত্র ব'লে বিশ্বাস করি, তখন তাঁর পূর্ব্বমুখী তীরের নির্দ্দেশ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে-অঞ্চলের হাওয়া বদলেছে।

আঁদ্রে মোরোয়া একজন ইংরেজ লেখককে য়ুরোপের জরের কাঠি ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি নিজে জু, এবং এরা এদের আন্তর্জ্জাতিক ধরণধারণের জন্যেই বিখ্যাত। সেই কারণেই তাঁর শেষ উপন্যাস "ল সের্ক্‌ল্ দ ফামি"-র মতো নিখুঁৎ বইয়ের নাম নিয়ে এই সমালোচনা সুরু করিনি। কিন্তু সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মোরাঁ-প্রমুখ প্রতিনিধিদের থেকে শিক্ষা-সংস্কারে পৃথক হ'লেও, মোরোয়া একালের আধিব্যাধির সংক্রমণ এড়াতে পারেননি। তাঁর হীরকতুল্য রচনারীতির মধ্যেও বৈদেশিকতার দোষ বিদ্যমান এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাত আধুনিক উদ্বাস্তুদের নিরুদ্দিষ্ট চঙ্ক্রমণকেই প্রতিবিম্বিত করে। তাঁর কল্পনাপ্রবণ চরিতাবলীর নায়কনির্ব্বাচন আমাদের বিপরীত খেয়ালের পরিচয় দেয়, এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁর বাগ্মিতা বর্ত্তমান আত্মশ্লাঘার অভিজ্ঞান। তিনি শেলিকে উজ্জীবিত করেন, তার প্রচ্ছন্ন সামন্যতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে, এবং ডিজ্‌রেলির ছবি আঁকেন, তার অভাবনীয় উন্নতিতে রমণীদের করকৌশল দেখাবার উদ্দেশ্যে। তবে মসীচিত্র-জুটোর মধ্যে তফাৎ এই যে আলেখ্যকার শেলির চরিত্রে মহত্ত্বের লেশমাত্র খুঁজে পাননা, কিন্তু ডিজ্‌রেলির নাটকীয় দিকটা তাঁর শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ। তথাপি নিছক ধ্বংসোন্মাদনায় মোরোয়া সমসাময়িকদের সমকক্ষ হতে পারেননি। এই হয়তো তার কারণ যে আজকে স্বজাতির ঐতিহ্য লুপ্তপ্রায় ব'লে, তিনি ঐতিহ্যশূন্যতার সমূহ বিপদ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন; কিম্বা বিশ্বব্যাপী প্রলয়কে আলোকিত করতে হ'লে যে-পরিমাণ আতসবাজি দরকার তা তাঁর ঘরে নেই। কারণ যাই হোক, অন্তত উপন্যাস রচনায় মোরোয়া বরাবরই ফরাসীদের মহান আদর্শের অনুগত। অবশ্য এতদিন ধ'রে তিনি যত বই লিখেছেন, তাতে উক্ত আদর্শের অস্তিত্ব শুধু অভাবের দ্বারাই বিজ্ঞাপিত; কিন্তু "ল সের্ক্‌ল্ দ ফামি"-র উৎকর্ষে সবুরে মেওয়া ফলার যাথার্থ্য প্রমাণিত হলো। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই মোরোয়া নিজে তো পূর্ব্বে লেখননিই, এমন-কি অপরেও সম্প্রতি লিখেছেন কিনা সন্দেহ।

বইখানির পরম গৌরব হচ্ছে নায়িকা দেনিসের চরিত্র, কিন্তু ছবিটি রেখার এমন খুঁটিনাটিতে প্রাণবন্ত যে গল্পের চুম্বক দেওয়াও দুরূহ ব্যাপার। তবু আখ্যায়িকার সূত্র এইরূপ: দেনিস অল্প বয়সেই আবিষ্কার করে যে, তার মা উদ্বাহবন্ধনকে নগণ্য ব'লে ভেবে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা, মায়ের স্বার্থপর ঔদাস্য, পিতার দুঃখ ও পারিবারিক কলঙ্ক রটার দরুণ সামাজিক নিগ্রহ, এই কটা কারণে সে মাকে শত্রুরূপে দেখতে শেখে, এবং পণ করে যে নিজের জীবনে এই জঘন্য ইতিহাসের পুনরভিনয় সে কোনোমতেই ঘটতে দেবেনা। কিন্তু যুদ্ধকালীন ভাববিলাসের যূপে সে দেহকে উৎসর্গিত করতে বাধ্য হয়, অথচ যে-অপাত্রকে সে এই শ্রেষ্ঠদান দেয়, সে-ক্ষুদ্রমনা তার প্রেমের চেয়ে গুরুজনদের আজ্ঞাপালনকেই শ্রেয়স্কর মনে করে। তার পরে দেনিস দয়াপরবশ হ'য়ে এক প্রসিদ্ধ ধনিকপুত্রের সঙ্গে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়, এবং অবিলম্বেই আবিষ্কার করে যে প্রেমের অভাব করুণায় মেটেনা। প্রথম পদচ্যুতির চিত্তবিক্ষোভে তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে বটে, কিন্তু ক্রমে তার উচ্ছৃঙ্খলতা এমনি দেশবিখ্যাত হ'য়ে পড়ে যে তার মা সুদ্ধ তাকে হিতোপদেশ দিতে বাধ্য হন। মায়ের এই অমার্জ্জনীয় প্রগল্‌ভতা সুরুতে

তার অসহ্য লাগলেও, দেনিস অচিরে প্রমাণ পায় যে তার মেয়েরাও তার সম্বন্ধে অনুকারী বৈরভাব পোষণ করছে। ফলে তার অভিসারের আয়োজন বন্ধ হয়, এবং পিতার মৃত্যুর পরে তার মা পূর্ব্বপ্রেমিককে বিবাহ ক'রে যে-নূতন সংসার পেতেছিলেন, সেই সংসারে দেনিস প্রায় ষোল বৎসর পরে প্রথম পদার্পণ করে।

বলা বাহুল্য এই ধরণের উপন্যাস আজ আর বড় একটা লেখা হয়না। এর বিপুল আকার, এর মন্থর গতি, এর চরিত্রচিত্রণের ব্যাপকতা, এর সাবেকি বস্তুনিষ্ঠা, এ-সমস্তের মধ্যেই একটা বাল্জাকী ভাব আছে। এমন-কি উপন্যাসটিকে হয়তো নীতিমূলক ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে। অবশ্য সাহিত্যের এই গুণটি আজ আমাদের সন্দেহ জাগায়; এবং সেইজন্যে বিশুদ্ধ আর্টসেবীদের জানিয়ে রাখা ভালো যে মোরোয়ার নীতি মোহমুদ্গর-জাতীয় নয়, পরিপূর্ণ শিল্পদৃষ্টিতেই তার জন্ম। প্রকৃত শিল্পী নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিকৃতি গ'ড়েই ক্ষান্ত হয়না, সে চায় ওই অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে। কারণ রূপই প্রকাশের একমাত্র প্রণালী, তার ঘটকালি ব্যতিরেকে একের অনুভূতি দশের কাছে উপস্থাপিত হতে পারেনা। কাজেই স্বকীয় ভাবকে রূপ দেওয়ার মানেই হচ্ছে তাকে বসে উত্তীর্ণ করা, অর্থাৎ তার মধ্যে যেটুকু সার্ব্বিক তাই ছেঁকে নিয়ে, বাকিটুকুকে ফেলে দেওয়া। এইখানেই নীতির সঙ্গে রূপের যোগ, কারণ রূপের মতো নীতিরও কর্ত্তব্য হচ্ছে এককে ছেড়ে বহুকে বরণ করা, ব্যক্তির উপরে সঙ্ঘকে প্রাধান্য দেওয়া, বিশেষ থেকে সাধারণে উপনীত হওয়া। মোরোয়া এই নিরীহ রকমের নীতিকার। তাঁর মধ্যে গুরুগিরির অপ্রমাণ অহংকার তো নেইই, এমন-কি কতকগুলো দৃশ্যে,—বিশেষ ক'রে প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের বিবরণে, তাঁর নির্লিপ্তি স্তঁদাল-এর পবিত্র নৈর্ব্যক্তিকতাকে স্মরণে আনে। এবং এই রক্ষাকবচের গুণেই তিনি ফরাসী আধুনিকদের মন্ত্রদাতা জীদের প্রভাবকেও এড়িয়ে গেছেন। জীদের নায়ক-নায়িকারা সংসারবিরত, সমাজাতিরিক্ত, আত্মার গূঢ় বৈশিষ্ট্যকে পরিব্যক্ত করার জন্যে তারা হয়তো নরহত্যায় সুদ্ধ পশ্চাদপদ নয়; তাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে মুক্তির একমাত্র পন্থা হচ্ছে সকলকে ত্যাগ ক'রে, নিঃসহায়-নিরুপায়ভাবে আত্মস্থ হওয়া, তারা মনে করে যে ব্রহ্মসাযুজ্য, সেও হয়তো মূলে একটা অনুভূতি, একটা বেদনা, একটা সম্ভোগ। তাই তারা বিকার-বিক্ষোভকেও বাদ দেয়না, তাদের লুব্ধ ব্যক্তিতা জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গবেষণা করে। কয়েক বিষয়ে জীদের সঙ্গে পুরানো গ্রীকদের ঐক্য দেখা গেলেও, এই মনোভাব যে ধ্রুপদী আদর্শের পরিপন্থী, তা বলা অনাবশ্যক। গ্রীকেরা ব্যক্তিত্বের বাড়াবাড়িকে বিপজ্জনক ব'লে ভাবতো; এবং ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সংসারকে গ্রহণ করাই ছিলো তাদের ধ্যানধারণার সূত্র-সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয় পশ্চিমে আবার সেই উদাত্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অন্ততপক্ষে দেনিসের পারিবারিক চক্রে পুনরাগমনের প্রবর্ত্তনা যে তাই, সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এ-প্রসঙ্গে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক্-এর "ল ন্য দ ভিপের"-কে প্রামাণ্য মনে করা সঙ্গত কিনা জানিনা। মোরিয়াক প্রথম থেকেই ক্যাথলিক লেখকদের অন্যতম, এবং সেইজন্যে আমি তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত নই। যতদূর জানি তিনিও, পল ক্লোদেল্-এর মতো, সাহিত্যসৃষ্টিকে ভগবৎ-সেবার উপলক্ষ্য ব'লে ভাবেন, এবং তাঁর মতেও খৃষ্টোক্ত সদাচারপদ্ধতিই মোক্ষলাভের অনন্যপন্থা। শুনেছি তা সত্ত্বেও তিনি পোপের অনুমোদন পাননি, কারণ মোরিয়াক মনে করেন যে যাজকের আশীর্ব্বাদ ব্যতিরেকেও সদ্গতি

সম্ভব ; এব জন্যে শুধু খৃষ্টেব প্রতি অচলা ভক্তিই যথেষ্ট, এবং তাও যদি দুঃসাধ্য হয, তবে বাইবেলবর্ণিত একটা যে-কোনো গুণ আশ্রয কবলেই, অজ্ঞান-সজ্ঞান সমস্ত পাপকে উত্তীর্ণ হওয়া যায। খৃষ্টানদেব বিভিন্ন সম্প্রদাযেব তর্ক-বিতর্কে বিধর্ম্মীব মন স্বতই উদাসীন, স্বভাবতই নির্ব্বাক ; তাই ওই প্রসঙ্গই আলোচ্য উপন্যাসেব ভিত্তি কিনা, তা বিচাব না-ক'বে, বইখানি থেকে ববং আমাব নিজেব প্রতিপাদ্য বিষয়েব উপকবণ জোগাই। কিন্তু উপক্রমণিকাতেই বলা বিধেয যে লেখকেব ধর্ম্ম যাই হোক, তাব ফলে আখ্যানস্রোতে কোনো আবিলতা আসেনি। একদেশদর্শিতা তো দূবেব কথা, "ল ন্য দ ভিপেব"-এব ঘনসন্নদ্ধ সৌন্দর্য্যব্যূহে লেখক, মোটেব উপবে, কোনো অবান্তব মতামতেব অবকাশ বাখেননি। মোটেব উপব বললুম এই কাবণে যে পুস্তকখানিব শেষ ত্রিশ পাতা-সম্বন্ধে আপত্তি হ'লেও হতে পাবে, হযতো ওই পবিশিষ্টটা নিখাদ সাহিত্যেব তাগিদে পবিকল্পিত হযনি। কিন্তু এ নিযে বাক্যব্যয অশোভন, কাবণ উক্ত ক্রোড়পত্রেব বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, গ্রন্থখানিতে যে-বস পেযেছি, যে-পবিপূর্ণতা দেখেছি, তাতে, অন্তত আমাব বিবেচনায, 'ল ন্য দ ভিপেব' অমব-জাতীয়।

প্রশংসা হযতো অতিবঞ্জিত হযে পড়লো, এবং সেইজন্যেই কাহিনীটিব পুনবাবৃত্তি কবতে ভয পাচ্ছি। চুম্বুকে তাব উৎকর্ষ ধবা পড়বেনা, কাবণ অন্যান্য প্রথম শ্রেণীব শিল্পসম্পদেব মতো এ-গল্পেও বাহুল্য একেবাবেই নেই। একে রূপান্তব কবা তো চলেইনা, এমন-কি ভাষান্তবও বোধ হয অসাধ্য। তা ছাড়া বইখানি ঘটনাভূয়িষ্ঠ নয়, নিটোল, নিবিড় গীতিকবিতাব মতো আবেগপ্রধান। তবু তাব আখ্যানসাব এইরূপ : এক ধনাঢ্য কৃষকপুত্র সঙ্কীর্ণ পল্লীসমাজেব ঈর্ষ্যা-অবজ্ঞায বিষজর্জ্জবিত হ'যে, হঠাৎ এক অভিজাত খাতকেব মেযেকে বিবাহ ক'বে বসলো। এই প্রতিলোম কুটুম্বিতায তাব নিজেব মাযেব সম্মতি ছিলোনা, কিন্তু তিনি পুত্রেব উন্নতিব পথে বিঘ্ন ঘটাবেননা ব'লে, স'বে দাঁড়ালেন, এবং সত্যই দেখা গেলো এই বর্ব্বব, হিংস্রস্বভাব যুবকটিব অন্তবাত্মা প্রেমেব আবতিদীপে জ্যোতির্ম্ময় হ'যে উঠলো। এক মাধবী পূর্ণিমাব বাত্রে সে স্ত্রীকে প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনেব কথা শুধিযে জানলে যে ইসাব (অর্থাৎ তাব স্ত্রীব) একটি সম্ভ্রান্ত সুদর্শন যুবকেব সঙ্গে সম্বন্ধ হবেছিলো, কিন্তু ইসাব দুই ভাযেব ক্ষয-বোগে মৃত্যু হওযাতে, পাত্র-পাত্রীব একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, ববপক্ষেব অনুমতি পাওযা যাযনি। ইসা অবশ্য মুখে বললে যে সে-বিযে ভেঙে গিযে ভালোই হযেছে, নচেৎ এমন স্বামী তো আব পাওযা যেতোনা ; কিন্তু নাযক এতে আশ্বস্ত হলোনা। তাব মনে পড়লো যে সে যেদিন প্রথমে ইসাব অধবস্পর্শ কবে, সেদিন ইসাব ক্রন্দনকে সহজে থামানো যাযনি। আত্মগবিমাব আত্মহাবা হ'যে, সেদিন যে-অশ্রুকে সে প্রেমাশ্রু ব'লে ভুল কবেছিলো, আজ বুঝলে সে-ক্রন্দন প্রাকৃত অনুবাগেব স্মৃতিতর্পণ। চৈতী জ্যোৎস্না তাব চোখে তমসাবৃত হ'যে গেলো, মনে হলো পার্শ্ববর্ত্তিনী আব তাঁব মাঝে অনন্ত ব্যবধান মুখব্যাদান ক'বে আছে ; যুগযুগান্তেব যত বিসংবাদ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব যত ট্রাজিডি নিমেষমধ্যে তাব বক্ষে জগদ্দলেব মতো নেমে এলো। সে পণ কবলে এই প্রবঞ্চনাব প্রতিশোধ নেবেই। তাই ইসা আস্তিক ব'লে, সে নাস্তিক হ'যে উঠলো ; ইসা শিষ্টাচাবী ব'লে, সে অত্যাচাবেব আশ্রয নিলে, ইসা সন্তানবৎসল জেনে, সে পুত্রকন্যাদেব পব ক'বে দিলে। সমস্ত সংযম গত হওযাতে তাব কৃষকী কৃপণতা তাকে বীভৎস ও বিভীষণ ক'বে তুললে।

অদৃষ্টও তাব সঙ্গে শত্রুতাচবণ কবতে ছাডলেনা। অতিপবিশ্রমে তাব স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। সন্তানসন্ততিদেব মধ্যে যে-মেযেটি পিতাকে নির্ভযে ভালোবেসেছিলো, গ্রাম্য চিকিৎসকেব অজ্ঞতায তাব অকালমৃত্যু ঘটলো। এক ক্ষণিকাব সংস্পর্শে তাব আন্তব জীবন কিছু দিনেব জন্মে মধুময হ'যে উঠলো বটে, কিন্তু সন্তানসম্ভবা হওযাতে তাকেও আব কাছে বাখা গেলোনা। ইসাব স্বর্গগত বিদ্রোহী ভগ্নীব একমাত্র পুত্রকে অবলম্বন ক'বে, সে তাব অসীম ক্ষুধা মিটাতে চাইলে, কিন্তু যুদ্ধ এ-ছেলেটিকেও বাদ দিলেনা। বার্দ্ধক্য তাকে স্থবিব ক'বে তুললে; মৃত্যুর অগ্রদূত বাবেবাবে প্রভুব আগমবার্ত্তা ঘোষণা ক'বে গেলো। যে-অর্থেব লোভে ইসা তাব পাণিগ্রহণ কবেছিলো, সেই উত্তবাধিকাব থেকে ইসা ও ইসাব সন্তানদেব সে বঞ্চিত কববে, এই ছিলো তাব জীবনেব একমাত্র লক্ষ্য। তাই মুমূর্ষু অবস্থাতেও, তাব প্রণযিণীব কানীনপুত্রেব সন্ধানে তাকে প্যাবিসে যেতে হলো। কিন্তু এখানেও বিধি বাদ সাধলেন। বৃদ্ধেব পবিবাববর্গেব তর্জ্জনগর্জ্জনে সে-অপদার্থ ভয পেযে, তাদেব সঙ্গে চক্রান্ত কবতে লাগলো, এবং ইসাব জন্মে অন্য শাস্তি উদ্ভাবিত হবাব পূর্ব্বেই, বৃদ্ধেব সমস্ত জল্পনা-কল্পনাকে লণ্ড ভণ্ড ক'বে দিযে, ইসা গেলো মাবা। বৃদ্ধেব অসমাপ্ত জীবনেব ভাবকেন্দ্র পলকে ভেঙে পডলো; অভিব্যাপ্ত সর্ব্বনাশেব মধ্যে সে বুঝলে যে সে সঞ্চযেব লোভে কৃপণতা অভ্যাস কবেনি, উৎপীডনেব লালসায ইসাকে নিঃসম্বল কবতে চাযনি, বিদ্বেষেব তাডনায সংসাববিমুখ হযনি। সে চেযেছিলো ইসাব অখণ্ড হৃদয, ইজাব পবিপূর্ণ অনুকম্পা; ইসাকে সহকর্ম্মী-রূপে পেযেই তাব আকাঙ্ক্ষা মেটেনি, সে দাবি কবেছিলো ইসাব সর্ব্বমুখী সহধর্ম্মিতা। কিন্তু তাব সহজ প্রত্যাশাব দিকে ইসা দৃকপাত কবলেনা; তাই যত দ্বন্দ্ব, তাই তাকে সঙ্কল্প কবতে হলো যে তাব মৃত্যুব পবে ইজা যখন দলিল-দস্তখৎ খুঁজতে আসবে, তখন সে-সব কিছুই পাবেনা, পাবে কেবল তাব ব্যর্থ জীবনেব ব্যথিত ইতিহাস। কিন্তু এখন? এখন হিংসাব আঘাতেও ইসাব বিমুখতা ঘুচবেনা, তাব প্রভূত সম্পত্তি এখন আব প্রহবণ নয, কেবল ভাব, কেবল বিডম্বনা। সে তৎক্ষণাৎ উকিল ডাকিযে নিজেব যথাসর্ব্বস্ব ছেলেমেযেদেব লিখে দিলে। ফলে তাবা হযতো বৃদ্ধকে পাগল ভাবলে, কিন্তু তাব নিবপেক্ষ দৃষ্টিতে জীবনেব পবম অভিপ্রায স্পষ্ট হ'যে উঠলো। সে তন্ময হ'যে বুঝলে, যদি বাঁচতেই হয, তবে সকলকে বাঁচতে দিযে, সকলেব আনন্দ-বেদনাব মধ্যে অনাত্মভাবে বাঁচাই একমাত্র বাঁচা। তাই লব্ধকাম পুত্রকন্যাবা তাব সত্যজাগ্রত স্নেহ-সমবেদনাকে যখন নিতে পাবলেনা, তখনো সে বিচলিত হলোনা, ভগবানেব সঙ্গে আজন্মেব বিবাদ সখ্যে পবিণত ক'বে, অনাবশ্যক আত্মজীবনী লিখতে লিখতে ভবলীলা সংববণ কবলে।

এই হ্রস্বীকবণ মুখ্যত আমাব অক্ষমতাবই পবিচয দেবে, কিন্তু এব থেকেও বোঝা শক্ত হবেনা যে "ল ন্য দ ভিপেব"-এব সঙ্গে আজকালকাব উপন্যাসেব প্রভেদ প্রকৃতিগত। যে-অপ্রতিভ হৃদযহীনতা, যে-বক্রোক্তিপূর্ণ দীর্ঘসূত্রতা, যে-অতিচেতন ইন্দ্রিযপবাযণতা আধুনিক কথাসাহিত্যেব অপবিহার্য্য উপাদান, মোবিযাকেব বচনায সে-সমস্ত চিবদিনই অবর্ত্তমান। সুতবাং আলোচ্য পুস্তকেব পুবাকালীন গাম্ভীর্য্যে চমৎকৃত হওযা হযতো নিষ্প্রযোজন। কিন্তু যে-খৃষ্টানী ধার্ম্মিকতা তাঁব আখ্যানাবলীব সনাতন লক্ষণ, এখানে তাব অভাব সত্যই বিস্ময়কব। অবশ্য পূর্ব্বেই বলেছি যে একটা অহেতুক অধ্যাত্মনিষ্ঠা বইখানিব শেষ কযেক পাতাকে একটু অবাস্তব ক'বে তুলেছে।

কিন্তু এই অংশের অনুপ্রেরণাও বোধহয় রোমপ্রসূত নয়, গ্রীসজাত। গল্পটি উত্তম-পুরুষে লিখিত হওয়ায়, তার মধ্যে খৃষ্টীয় চরমোক্তির ইঙ্গিত পাওয়া সহজ। কিন্তু প্রতিপক্ষে এটাও স্মরণীয় যে নায়ক আমরণ অননুতপ্ত, তার মনোভাবে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যীশুকথিত দীনতার লেশমাত্র দেখা যায়না। যেটা দেখা যায় সে হচ্ছে খৃষ্টীয় চিত্ত-বৃত্তিনিরোধের উল্‌টো গুণ, অর্থাৎ চিত্তের দ্বারমুক্তি, বিষকুণ্ডলীর ব্যবচ্ছেদ। অন্তঃকালে বৃদ্ধ ভগবানকে পেলে বটে, কিন্তু সে-পাওয়া পরিত্যাগের মধ্যে দিয়ে নয়, পরিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে; তার পারমার্থিক সার্থকতার সীমান্তে নির্ব্বাণের রহস্য নেই, আছে মনুষ্যধর্ম্মের রহস্য।

আমি জানি যে মাত্র তিনখানা বইয়ের সাহায্যে অর্দ্ধেক পৃথিবীর হার্দ্দ্য পরিবর্ত্তন প্রমাণ করতে যাওয়া দুঃসাহসেরই নামান্তর। উপরন্তু শিল্প-সাহিত্যকে ইতিবৃত্তের মর্য্যাদা দেওয়া আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু সাহিত্য যতই নৈর্ব্যক্তিক হোক, তাকে আমি লোকোত্তর মনে করিনা। তার মধ্যে জীবনের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যেমন অসম্ভব, সে-দর্পণে সমাজের দ্বিমাত্রিক ছায়া দেখাও তেমনি স্বাভাবিক। অতএব আমি যদি আমার অনুমিতির পক্ষ থেকে কৈবল্যের দাবি না-করি, তবে সিদ্ধান্তের সত্যতা-নিরূপণে এই তিনজন ভিন্নস্তর ও ভিন্নরুচি লেখকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি এতে সন্তুষ্ট নন, তিনি শ্লুম্‌বের্জে ও দ্রিয় লা রোচেল্‌-এর সর্ব্বশেষ উপন্যাস দুখানি, জালু-র সন্দর্ভাবলী, ফের্নাদেস্‌-এর জীদ্‌-সম্বন্ধে গবেষণা, পিয়ের আব্রাম্‌-এর প্রস্‌ৎ-সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রভৃতির শরণ নিতে পারেন। এত লোক থাকতে আমি শুধু তিনজনের নাম করলুম এই কারণে যে, প্রথমত পাঠকের ধৈর্য্য অপরিমেয় নয়, দ্বিতীয়ত উল্লিখিত পুস্তকগুলির ইংরেজি অনুবাদ কেবল সময়সাপেক্ষ, তৃতীয়ত এঁরা তিনজনেই সুবিখ্যাত ও সাহিত্যজগতে সমবয়সী।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

একটি বসন্ত—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, (এম, সি, সরকার, এণ্ড সন্স্‌)।

কবিতার বই। বইখানিতে ২৭টি ছোট কবিতা আছে। সম্ভবত কৈফিয়ৎ হিসাবেই গোড়ায় লেখা আছে—"এই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯ সাল ও রচনাস্থল ইংলণ্ড। পরে কিছু পরিমার্জ্জিত হয়েছে।" ভালো কথা। কিন্তু পরিমার্জ্জিত যদি করাই হইল তবে "কিছু" করা হইল কেন তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই। যথাসাধ্য পরিমার্জ্জিত করিয়া বাহির করিলে কাব্যেও রুচি প্রকাশ পাইত এবং জীবে দয়ারও কোনো ব্যত্যয় ঘটিত না।

প্রথম কবিতাটি যেন মানকুমারীর কবিতা—আঁচলে বাঁধা বেলফুল ফেলিয়া দিয়া একটু বিলাতী গন্ধসার মাখিয়া আসিয়াছে।

"ক্ষণেক বসো গো প্রিয়ে পাশ।"
"প্রথম হেরিনু তোমা"
"আহা এ যে হৃরিষে বিষাদ।"

প্রভৃতি আজকালকার দিনে অচল।

ইহাব মধ্যে ৯টি কবিতা পযাব ছন্দে ১৪ লাইন কবিযা বাঁধা। তাহা sonnet নয—পযাব চতুর্দ্দশী বলা চলে। পযাবেব আদিম গন্ধটুকু ইহাতে এখনো বজায আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীব পযাবেবই মত ইহাব প্রত্যেকটি পংক্তি একএকটি unit।

"বিধাতারে অভিশাপ দিবনা দিবনা
আপনারে ধিক ধিক তাও বলিব না।
তখন স্মবিব তোমা হে আমার লতা
নিশিদিন যে সৌভাগ্য দিযেছ সর্ব্বথা।"

সব পংক্তিগুলিই এইরূপ।

বলিবাব কথা যখন সুনির্দ্দিষ্ট নয অথচ জাহিব কবিবাব আকাঙ্ক্ষা যখন অত্যুগ্র সেই কাঁচা বযসেব লেখাব মত এই কবিতাগুলিতে বহু অসংলগ্নতা-দোষ বহিযা গিযাছে। এবং দুর্জ্জয গিবি লঙ্ঘন কবিযা আঙিনায আসিযা আছাড খাওযাব মত অধিকাংশ কবিতাবই শেষ লাইনগুলি জোলো অর্থাৎ flat।

৬ নং কবিতায—

"আব কারো পানে
আনমনে চেযে রই
সে আমার নয ভালোবাসা
প্রেমের তিযাসা নয রূপের তিযাসা।

এখানে বক্তব্য বোধহয—রূপেব তিয়াসা নয প্রেমেব তিযাসা। আবাব ১০ম পংক্তিতেও

"প্রেমের অন্যতা নয তৃষার অন্যতা।'

এ স্থলেও বোধহয প্রেম ও তৃষাব স্থান পবিবর্ত্তনে অর্থসঙ্গতি হয।

"অন্যতা" শব্দেব ব্যবহাবে সাহসেব জন্য কবি প্রশংসা পাইবাব যোগ্য।

১০ নং কবিতা—

"তুমি মোর ব্রিটানিযা। তুমি মৌন হাসি"

idea বেশ। কিন্তু কটুশব্দ ও গদ্যপদ প্রযোগে ইহাব অন্তর্নিহিত বসমাধুর্য্যটুকুকে কবি প্রায সম্পূর্ণরূপে বিস্বাদ কবিযা তুলিতে সক্ষম হইযাছেন।

"ভাস্কর খোদিত মুখ"
"কুঞ্চনবহিত মুখ।"

বাংলা ভাষাব উপব এত খোন্তা চালানো সহিবে না। নূতন শব্দ-প্রযোগ কবিতে হইলে বাংলাব নিজস্ব ভাষা-সঙ্গীতে কান খুব দুবস্ত হওযা চাই। নহিলে experiments গদ্যেও চলে না—কাব্যে ত দূবেব কথা।

১৫ নং কবিতাটিতে কবি "জীবন ফাঁকিতে ফাঁকা" সুতবাং "হিযাব হায হায থামিল না যে" বলিযা কান্নাকাটি কবিযা সুরু কবিযাছেন। কবিতাব মাঝামাঝি পৌঁছিযা দেখি

"অপথে চলা মোর নয বিফলা
সকলে ভালবাসে ভোলা পথিকে
ধন্য করে দিল জীবন মম"

এইরূপ সৃষ্টিছাড়া প্রলাপোক্তি আবো আছে। সব কথা ধবিতে গেলে পুঁথি শেষ কবা যায না।

১১ নং কবিতায়—

"ওরে কবি তোর ছবির পসরা
ভরিয়া লইবি আয"

বলিযা আহ্বান কবিযা লইযা, ক্রমে নানা ছবিব লোভানি দেখাইযা শেষ মহড়ায অকস্মাৎ

"ছবির পসরা করিযা উজাড
প্রিয রমণীর পায
মন হ'তে তোর নেমে গেছে ভার
ওবে কবি ছুটে আয।"

বলাব অর্থ কি ?

১৮ নং কবিতায—

"আর কভু আমি কহিবনা কটু কথা"
"আর কভু আমি ভাবিবনা কুভাবনা"
"আর কভু আমি করিবনা হীনকায"

পডিযা মনে হইল খোকা দাঁডাইযা Sunday School-এ "হলপ" পাঠ কবিতেছে। খোকাব মনে কি আছে খোকাই জানে। ২০ নং কবিতাটি বজনী সেনেব দাওযায দাঁডাইযা প্রিযা প্রিযা গো বলিযা বিনাইযা বিনাইয়া মডা কান্না কাঁদিতেছে। ২৬ নং কবিতাটি গো গো গো গো শব্দে অনন্যাব প্রতি অনন্য প্রেমেব চাপা ব্যথায় যেন গোঙ্রাইতেছে।

২৭ নং অর্থাৎ শেষ কবিতাটিব একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাব শান্ত ছন্দ মনকে স্পর্শ কবে—

"বাসনার দীপে নিবিলো নিবিড় জ্বালা"
"অনল হইতে আলোক ছানিযা তোলা"
"আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি
"চুম্বনতাপ হিম হযে আসে ধীরে"

প্রভৃতি পংক্তিগুলিব অন্তবে জ্বালাময তীব্র প্রেমেব প্রখব যৌবনতাপ জুড়াইয়া আসিযা একটি আনন্দঘন পবম পবিতৃপ্তিময় শান্ত পবিণতিব অনুভূতি পাঠকেব ক্ষুব্ধ চিত্তকে ছাযাস্নিগ্ধ নিবাময শান্তিবসস্পর্শ দান কবে। এমন কবিতাটিতেও শব্দ-সামঞ্জস্যেব অভাবে স্থানে স্থানে হোঁচোট খাইতে হয , অর্থেব দিশা পাওয়া দুষ্কব হয এবং পডিতে পডিতে মনেব মধ্যে অতর্কিত বাধাব অতৃপ্তি জমিতে থাকে। তবুও ছন্দেব অবন্ধুব পথে এক প্রকাবে অগ্রসব হইযা চলা যায। কিন্তু শেষ পংক্তিব শেষ কথাটিতে আসিযা অকস্মাৎ একেবাবে খাদে পডিযা কবিতাটি "তাই নিঃশেষে মোলো।"

এ ছাডা বইখানিতে কানে বাজে এমন বেতালা শব্দ প্রচুব। সবগুলি এখানে তুলিযা দেখানো সম্ভব নয়। কাবণ লাইনেব অন্যান্য শব্দেব ঝঙ্কাবেব সঙ্গে যাহা খাপ খায নাই তাহা, লাইনগুলি না তুলিযা, দেখানো যায না। তোমা, প্রবঞ্চিকা, কুঞ্চনবহিত,

স্মরাও সূর্য্যবদনা মেদিনী, আমার নাসার পাশে; মুচুকি, পীড়াভাগ, তুল্ল'ভা, ম'লো প্রভৃতি শব্দ শ্রুতিকটু। শিষর শব্দের অর্থ মাথার দিকে। শিথান কি শিতান?

হাতের লেখা যাহাদের কাঁচা থাকিয়া যায় তাহারা যেমন নানা সময়ে ভালমন্দ নানা হস্তলিপির ছাঁদে লিখিয়া থাকে—কাঁচা হাতের কবিতাও তেমনি নানা লোকেরা নকলে বহুরূপীত্ব লাভ করে। সেই জন্য এই বইখানিতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, মানকুমারী, পয়ারী মিলিয়া স্টাইল দাঁড়াইয়াছে রাবোযারী।

Clever জিনিস লিখিবার চেষ্টা আজকাল কবিদের প্রায় একটা মুদ্রাদোষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই বইখানিতে অনেকগুলি ঐরূপ লাইন আছে। সাধারণতঃ সেগুলি মন্দ নয়। যথা,

"একের মিলনে আমি অন্যের বিরহী"
"প্রেমের অন্যতা নয় তৃষার অন্যতা"
"আদিত্য সভায় খুঁজি আমার সমান।"
"দিনে থাকি আনমনা রাত্রে অচেতন"
"প্রভাতে হেরিব তোমারি অচেনা মুখ"
"জেনো, প্রিয়ে, যা দিইনি সেও যে তোমারি"

এ সত্ত্বেও বইখানিতে যথেষ্ট কবিত্বের খোরাক আছে। এমন অনেক চমৎকার লাইন ও ভাবসম্পদে পূর্ণ এমন কবিতাও আছে যাহা পাঠ করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়। নিচে যে অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম তাহা আমার ভাল লাগিয়াছে এবং পাঠকেরও ভালো লাগিবে আশা করিতেছি—

১। তারা হতে তাঁরকায়
আমার রথাশ্ব ধায়
রথচক্র রেখা মোর ছায়াপথময়।

২। তারায় তারায় খুঁজি রহস্যের আলো

৩। ভুঁই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুটিয়েছে ফুল
রূপসীর পদপাতে,
নবশিশু সম নাড়িছে আঙুল
সুরঙীন আঙিনাতে।

৪। তার কণ্ঠের পারিজাত হার
খুলে পড়ে আর ফুল ফুটে যায় ঘাসে

৫। আমারে ঘেরিয়া করে তীর্থপরিক্রমা
কোটী তারা কোটী যাত্রীসমা
দিনে থাকি আন্‌মনা রাত্রে অচেতন
ওরা হানে কপালে কঙ্কণ।

৬। আকাশে রয়েছি চেয়ে—
এ-যেন অবর্ণ্য বর্ণ অচিত্রিত কিরণমার্জ্জিত
তপন-কেশর পদ্ম পূর্ণমুক্ত অনন্তশায়িত।
এ যেন স্ফটিকময় ময়সৃষ্ট ইন্দ্রপ্রস্থপুর
দীপাধারে রবি জ্বলে আভাচলে দিকপ্রান্তদূর

৭। আমার তনুময় বাণীর বীণা বাজে
পরশে বোঝনি কি সে ভাষা?

৮। এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।

এই লাইনগুলিতে কবির কাব্যরসোপলব্ধি ও প্রকাশক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিম্বা

আমারে কাঁদায় চির বসন্ত
কুসুমবন্ত রূপসুগন্ধবান।

ছন্দঝঙ্কারে চিত্তহরণ করে।

এই পুস্তকখানির মধ্যে এই লাইনগুলি যেন পঙ্কজ। যাহার মধ্যে জন্মিয়াছে তাহার সহিত ইহাদের গোত্র-সম্পর্ক নাই।

দিলদার হুসেন

সমাজতন্ত্রবাদ—শ্রীগোপাললাল সান্যাল। সান্যাল বুকষ্টোর। দ্বিতীয় সংস্করণ।

লেখক তাঁহার 'নিবেদন'-প্রসঙ্গে বলিতেছেন: "বর্ত্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী"। সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে লেখক ইংরাজীতে যে-সকল মতবাদকে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ আখ্যা দেওয়া হয়, ব্যাপকভাবে তাহাই ধরিয়া লইয়াছেন মনে হয়। এই সকল মতের বিরোধী মতকে ধনিকতন্ত্রবাদ (ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌) বলা হয়—সাম্রাজ্যবাদ নয়। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীরা ধনিকতন্ত্রবাদকে মানিয়া লন—কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

বইখানির গোড়াতেই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে-অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, বইখানির ভিতরে তাহা ভালো করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজিতে 'সোশ্যালিজ্‌ম্‌' কথাটি অনেক সময় ব্যাপকভাবে নানা বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়—অবশ্য এই সকল মতবাদ মোটামুটি এক জাতীয়। কিন্তু সোশ্যালিজ্‌ম্‌ কমিউন্‌স্‌ প্রভৃতি বাক্যগুলি আবার বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়—আদর্শ মোটামুটি এক হইলেও সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখক এই বিভিন্নতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই। 'কমিউনিজ্‌ম্‌' কি তাহা তিনি একেবারেই জানেন না মনে হয়। বহুস্থানে তিনি 'সমবায়-সাম্রাজ্য' বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং যে-প্রসঙ্গে তিনি এই বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতেও মনে হয় যে তাঁহার মতে সমাজতন্ত্র ও সমবায়-সাম্রাজ্য একই ব্যাপার। লেখক বোধ হয় জানেন না যে ইংরাজিতে 'Co-operation' কথাটি অর্থনীতিতে একটি বিশিষ্ট মতবাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। এই মতবাদ সোশ্যালিজ্‌ম্‌ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর ন্যায় ইহাও ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌-এর বিরোধী এবং ইহার প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক আদান প্রদান ব্যাপারে 'Profits' বা 'লাভ'-এর উচ্ছেদ সাধন। ইংরাজি Co-operation কথাটির বাংলায় অনুবাদ করা হয় 'সমবায়', সুতরাং 'সমবায়-সাম্রাজ্য' বলিতে বুঝায় 'Co-operative Empire'। ঠিক এই বাক্যটি ইংরাজিতে কোথায়ও পাইয়াছি মনে হয় না। তবে Co-operative Republic বা Co-operative

Democracy যথেষ্ট শোনা যায়। অন্তত সোশ্যালিষ্টরা যে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে চান তাহাকে কিছুতেই সমবায়-সাম্রাজ্য বলা যাইতে পারে না ; যদি গোপাল বাবু জোর করিয়া বলেন তাহা হইলে সমবায়বাদীরা তাহাতে আপত্তি করিবেন এবং যাঁহারা এই সকল বিষয় আলোচনা করেন তাঁহারা এই আপত্তি সমর্থন করিবেন।

সোশ্যালিজ্‌ম্, কমিউনিজ্‌ম্ কো-অপারেশন যে-সকল অর্থনৈতিক মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত লেখক সেই সকল মতামত সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত বলিয়া মনে হয়না। তাহার ফলে বইখানিতে লেখক যে-সকল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হয় স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, নয় বলিতে গিয়া যাহা বলা উচিত তাহার একেবারে উল্‌টো কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু লেখকের প্রাঞ্জল বাংলা লিখিবার ক্ষমতা আছে। আলোচ্য বিষয়টি ভালো করিয়া বুঝিয়া যদি তিনি বইখানির সংশোধন করেন তাহা হইলে বাংলা দেশের উপকার হইবে।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

তীর্থপথে—কবিতা (১৩৩১—১৩৩৮) শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী (গুরুদাস লাইব্রেরী)

এই বইয়ের গোড়ায় লেখা আছে—"এই লেখকের লেখা দীপান্বিতার কবিতাগুলি মূল্যবান সাহিত্য সমালোচনায় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে।" দীপান্বিতা আমি পড়ি নাই। তাহার সমালোচনাও দেখি নাই। কিন্তু তীর্থপথে পড়িলাম। পড়িয়া মনে হইল যে লেখক বহুযত্নে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে নানা শব্দ, বাক্য ও ভাব চয়ন করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা গাঁথিয়া গিয়াছেন। অর্থ হইল কিনা সে দিকে মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। ছন্দের বেগে ছুটিয়া চলাই যেন তাঁহার লক্ষ্য। ফলে অধিকাংশ কবিতাই পড়িতে বাধে না বটে, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা করিলেই মনে হয় যেন ধাঁধা পড়িতেছি—তাহার উত্তরটা যেন বোঝা যাইতেছে অথচ কিছুতেই মিলিতেছে না।

এক প্রকারের দুর্বোধ কবিতা আছে যাহার দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দপুঞ্জ ধ্বনির কুচকাওয়াজ করিয়া তাহার অর্থের দুয়ারে পাহারা বসাইয়া রাখে। সেখানে সাধারণের প্রবেশ অব্যাহত নয়।

আর এক প্রকারের দুর্বোধ কবিতা আছে যাহার অর্থ, সেই জালকাটা ঘরের মধ্যবিন্দুর ইঁদুরের মত। কোণের বিড়ালের তাহার নিকট যাওয়ার রাস্তা একটা আছেই কিন্তু যাইতে হইলে তাহাকে অনেক গোলোকধাঁধাঁয় নাজেহাল হইতে হয়।

তৃতীয় প্রকার দুর্বোধ কবিতা সুস্পষ্ট প্রলাপের মত। পড়িলেই তাহার অনর্থপাত ধরা পড়ে।

কবি হেমচন্দ্র বাগচী ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের সংমিশ্রণে আর এক চতুর্থ প্রকার দুর্বোধ কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত দিব না কারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সমগ্র কবিতা তুলিয়া দেখাইতে না পারিলে

context-এব অজুহাত তোলা অস্বাভাবিক হইবে না। তত স্থান এ সমালোচনায নাই। তৃতীযটিব দু একটি দৃষ্টান্ত দিব। প্রথম কবিতাটিতেই উত্তব বাযুকে সম্বোধন কবিযা কবি বলিতেছেন

বহি' কার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
এলে তুমি শীতের বাতাস ?

বাযুবোগ খুব কঠিন না হইলে শীতেব বাতাসও "তপ্ত" বোধ হয না। বা

দেহের মন্দিরা-তারে অহরহ ঝঙ্কারিয়া যার

মন্দিবা সেতাব নয। মন্দিবা কাংস্য নির্ম্মিত ছোট কবতাল বিশেষ।

এইরূপ অজস্র আছে। কিন্তু তাঁহাব উদ্ভাবিত এই চতুর্থ প্রকাব দুর্ব্বোধ কবিতাব স্বরূপ ঐ দ্বিতীয ও তৃতীয প্রকাব পার্থিব দুর্ব্বলতা লইযাও সেই সকলেব বহুঊর্দ্ধে যেন কল্পলোকে বিচবণ কবিতেছে। পডিলে অতর্কিতে মনে হয যে ভাষা ও ছন্দেব অন্তবালে যেন একটা চমৎকাব ভাবেব আভাস পাওযা যাইতেছে। কী যেন একটা গভীব কথা বলিবাব আছে—আব একটু পডিলেই যেন তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু সেই প্রতীক্ষিত "আব একটু" আব আসে না—কবিতাব পব কবিতা পডা হইতে থাকে, এবং এ অন্তস্তলপবিশূন্য নিববচ্ছিন্ন ধ্বনিব আঘাতে, বেলগাডীব একটানা দ্রুততালেব খঞ্জনীব মত, মনকে কখন অসাড অন্যমনস্ক কবিযা ফেলে।

কবিব চিত্তে তাঁহাব কাব্য বিষযেব পূর্ণ অনুভূতি ও সেই অনুভূতিব আবেগে তাঁহাব মানসচিত্রপটে তাহাব ছবি সুস্পষ্ট না জাগিলে কাব্য বচনা অসংলগ্ন হয। অথবা চেষ্টা পূর্ব্বক সংলগ্ন সুসমঞ্জস (logical) কবিযা প্রকাশ কবিতে যাইলে তাহা প্রাণহীন হইযা পডে। প্রাণে কবিতাব আবেগমাত্র আসিযাছে অথচ ছবি সুস্পষ্ট হইযা মানসনেত্রে জাগে নাই এমন অবস্থায প্রকাশেব জন্য কবিতা না লেখাই শ্রেয। কাবণ এইরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সমযই ছন্দেব গতিবেগে ভাষা গাঁথিযা যাওযা মাত্র সাব হয। প্রাণেব অন্তস্তলে যে ভাব, যে ছবি পাবিপার্শ্বিক নিখিল জগৎকে আচ্ছন্ন কবিযা জাগিযা উঠে এবং অন্তর্নিরুদ্ধ সৃজনেব বেদনায যাহা প্রকাশিত হয তাহাই কবিব কবিতা—চিত্রকবেব আলেখ্য।

যাহাই হোক, কবিতাগুলিব অধিকাংশই পডিতে ভালো এবং আশা কবা যায অদূব ভবিষ্যতে কবিচিত্তাকাশে কবিতাব নীহাবিকাব অবস্থা কাটিযা যাইবে এবং নব নব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিব গৌববে তিনি কবিসমাজে "বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন" কবিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীজীবনময বায

But for the Grace of God—By J W N Sullivan (Jonathan Cape)

সালিভানেব প্রকৃতি অতি সবল। তিনি যে অতি সাধাবণ লোক একথা তিনি নিজেই স্বীকাব কবিযাছেন। তাঁহাব বই পডিযা মনে হযনা তাঁহাব নিজেব সম্বন্ধে এই উক্তি অস্বাভাবিক এবং অসবল বিনযেব উচ্ছ্বাস। কিন্তু সাধাবণ লোকেব জীবনেও সমযে সমযে এমন অনেক ঘটনা, এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটে, যাহাব

বিবরণ অন্যান্য সাধারণ এবং অসাধারণ লোকের আগ্রহের ও বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে। খানিকটা এই ভরসাতেই সালিভান তাঁহার জীবন-কাহিনী পুস্তকাকারে লিখিয়াছেন ও ছাপাইয়াছেন. 'খানিকটা,' কেননা তাঁহার প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে তাঁহার জীবনের পরিসর এত ব্যাপক এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা সমূহের অর্থ এরূপ গূঢ় যে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানযুগের মানবমনের স্বরূপ পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু সালিভান সাধারণ লোক হইলেও বোকা নহেন, তাই তাঁহার নিজের জীবন সম্বন্ধে এই বিরাট কল্পনা তাঁহার নিজের কাছে যতই মূল্যবান হউক না কেন, তাঁহার পুস্তকের ভাবী পাঠকগণের নিকট হয়তো অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হইবে এই কথা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং ঠিক যে-ভাবে তিনি নিজের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন তাহার পরিকল্পনারও পরিবর্ত্তন হইল ও তাহার ফল দাঁড়াইল BUT FOR THE GRACE OF GOD।

দুঃখের বিষয়, লেখকেরা বই লিখুন যে-উদ্দেশ্যেই প্রকাশকেরা তাহা ছাপান পয়সার জন্য। তাই যে-কোনো ধরণেরই বই হোক্ না কেন, একটু হৈ-চৈর ব্যবস্থা না করিয়া তাঁহরা ছাড়েন না। এ ক্ষেত্রে দেখিতেছি সমালোচকবৃন্দ প্রকাশকদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের নানা বিজ্ঞ সমালোচকের মতে সালিভানের বইখানি নাকি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। একজন বলিতেছেন—এই পুস্তকে আমাদেরই সমসাময়িক এক ব্যক্তি তাঁহার অন্তরঙ্গ জীবন অকপটভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং পূর্ব্বতন কোনো লেখক অপেক্ষা তিনি এই বিষয়ে কম যান নাই। এইরূপ সমালোচনা পড়িয়া মনে হয় সেণ্ট অগষ্টিন, চেলিনি বা রুসো বোধহয় বিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে আবার আবির্ভূত. হইয়াছেন, কিম্বা আরও রোমাঞ্চকর কোনো ব্যক্তি, হয়তো ক্যাসানোভার অতি-আধুনিক সংস্করণ।

যে-পাঠক এই ধারণা লইয়া সালিভানের বই পড়িতে বসিবেন তিনি নিরাশ হইবেন। বইখানির মধ্যে ভালো বা মন্দ এমন কিছু নাই যাহা পাঠকের মনে চমক লাগাইতে পারে। সালিভানের জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত। গরীবের ঘরে তিনি জন্মিয়াছিলেন, ছেলেবেলায় গরীবের ছেলের মতনই মানুষ হইয়াছিলেন। পরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তাঁহার এক খুল্লতাত হঠাৎ মারা যান। তিনি কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফলে সালিভান কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর পংক্তি-ভোজনে আসনলাভের অধিকার অর্জ্জন করেন।

ছেলেবেলা হইতে দুইটি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল—বিজ্ঞান ও সঙ্গীত। কিন্তু অনুরাগ থাকিলেও, সঙ্গীতের চর্চ্চা তিনি বিশেষ করেন নাই। বিজ্ঞানের চর্চ্চা তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি করিয়াছেন, কিন্তু নিজের খেয়ালমতো চর্চ্চা করিলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে-একনিষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন, বোধহয় তাহার অবসর তাঁহার ঘটে নাই। প্রথম বয়সে তিনি কিছুদিন এক কারখানায় কাজ করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হইত। পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের সহিত এই সামান্য সংস্রবও পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন।

সালিভান যে কৃতী সাংবাদিক তাহা অস্বীকার করা যায়না, কেননা, তাহার আত্ম-চরিত সুলিখিত। দক্ষ সাংবাদিকের ন্যায় তাঁহার রচনা বাহুল্য-বর্জ্জিত। কিন্তু

স্থাযী সাহিত্যেব উৎকর্ষ তাঁহাব বচনাতে নাই। যে-আশ্চর্য্য শক্তিব গুণে প্রকৃত শিল্পী জীবনেব তুচ্ছতম অভিজ্ঞতাব বর্ণনাব মধ্যেও অপৰূপ ৰূপ ফুটাইযা তোলেন, সে-শক্তিব পবিচয তিনি দেন নাই।

সালিভানেব আত্ম-চবিতেব পূর্ব্ব অংশ সুলিখিত হইলেও সর্ব্বত্র সুপাঠ্য নয। বিজ্ঞানে গভীব অনুবাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক হন নাই। ফলে, বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক এই দুই জাতীয মানুষ সম্বন্ধেই তিনি এমন অনেক মন্তব্য কবিযাছেন যাহা সত্য হইলেও সাহিত্য বচনাব যোগ্য বিষয় বলিযা কখনই স্বীকৃত হইবে না এবং যাহা মামুলী হইলেও আদৌ সত্য কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ উঠিতে পাবে। কিন্তু লেখক সবল হইলেও অবিনযী নহে, তাঁহাব এই সকল মতামত তাঁহাব নিজেব অভিজ্ঞতাব উপব প্রতিষ্ঠিত তাহা তিনি বলিযাছেন এবং এই অভিজ্ঞতা যে সকল দেশেব সকল মানুষেব অভিজ্ঞতা এমন কোনো দাবী তিনি কবেন নাই। সুতবাং এই সব মতামত লইযা তর্ক কবা চলে না, শুধু জিজ্ঞাসা কবিতে ইচ্ছা হয এই জাতীয মতামত বিজ্ঞেব মতো প্রচাব কবিবাব কি প্রযোজন ছিল ?

শুধু বিজ্ঞান নয, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধেও তিনি এই জাতীয মতামত মাঝে মাঝে প্রকাশ কবিতে কুণ্ঠিত হন নাই—কেননা তিনি সবল প্রকৃতিব লোক। একস্থানে ব্যক্তিবিশেষেব কাব্যানুবাগেব উল্লেখ কবিযা তিনি বলিতেছেন—

> তাঁহাব কাব্যানুবাগেব প্রধান কাবণ বোধহয এই ছিল যে কাব্যচর্চ্চাব দ্বাবা অত্যন্ত স্থূল এবং সাধাবণ দৈহিক কামনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং নিষ্পাপ উপাযে পবিতৃপ্ত হয। কিন্তু এই জাতীয ব্যাপাবে আমি ববাববই অকপটতাব পক্ষপাতী। প্রকৃত সঙ্গীতানুবাগ যাহাদেব আছে তাহাদেব সহিত আমি একবিষযে একমত—লোকে যে কেন শুধু কবিতাব ধ্বনি-মাধুর্য্য লইযা এত বাডাবাডি কবে তাহা আমি আদৌ বুঝিনা। শুধু ধ্বনি-মাধুর্য্যেব দিক দিযা দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও একেবাবে শ্রেষ্ঠ কবিতা অনেক সমযে তুল্যমূল্য হইতে পাবে—এবং সঙ্গীতেব উৎকর্ষ বিচাব কবিতে গেলে আমাব মনে হয, এই মূল্য নিতান্তই সামান্য। আমাব দৃঢ বিশ্বাস, মানুষেব মনেব উপব কবিতাব যে-প্রভাব তাহাব সহিত ধ্বনি-মাধুর্য্যেব সম্পর্ক নগণ্য।

তর্ক না কবিযাও বলা চলে যে এই মত নিতান্তই অনধিকাবচর্চ্চাব পবিচাযক। কিন্তু সালিভানেব সব মতামত সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য নয। অনেক স্থলেই তাঁহাব মতামতেব মধ্য দিযা তাঁহাব চিন্তাশীলতাব, নিজেব জীবন সম্বন্ধে গভীব দাযিত্ববোধেব, মানুষেব সঙ্গে আচাবব্যবহাবে তাঁহাব আন্তবিকতাব পবিচয পাওযা যায়। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাব বিজ্ঞতাব ভাব যদি সীমা অতিক্রম কবে পাঠক তাহা অনাযাসেই মার্জ্জনা কবিতে পাবিবেন।

সালিভান মানুষটিব সর্ব্বাপেক্ষা অন্তবঙ্গ পবিচয পাওযা যায তাঁহাব পুস্তকেব উত্তবাংশে। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বিজ্ঞভাব সম্পূর্ণ বর্জ্জন কবিযা এই অংশে তিনি যে-সকল অভিজ্ঞতাব অত্যন্ত অকপট বর্ণনা কবিযাছেন তাহাব মূল মানুষেব যৌন-প্রবৃত্তিতে। সালিভানেব পবিণত জীবনে এই প্রবৃত্তিব প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক হইলেও দুর্দ্দান্ত হইযা উঠে নাই। এবং যদিও এই প্রবৃত্তিব তাড়নায তিনি অনেক

সময়ে এমনভাবে জীবনযাপন কবিযাছেন যাহা মোটেই শাস্ত্রানুমোদিত নয, তবু তিনি যে সাধাবণ লোক এবং তাঁহাব জীবন যে অত্যন্ত মামুলী ধবণেব এই মত পবিবর্ত্তনেব কোনো সঙ্গত কাবণ পাওযা যায়না। যে-সকল- অভিজ্ঞতাব বর্ণনা তিনি কবিযাছেন তাহাতে বৈচিত্র্য বিশেষ না থাকিলেও তাঁহাব পুস্তকেব এই অংশে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায যাহা পূর্ব্বাংশে দুর্লভ। তাঁহাব আডম্ববহীন আত্ম-পবিচয ও তাঁহাব আন্তবিক আবেগ পাঠকেব মনকে স্পর্শ না কবিযা পাবে না।

সালিভানেব বই পডিবাব সময লোকটি সম্বন্ধে যে-ধাবণা জন্মে বই শেষ কবিযা সেই ধাবণাই আবো বদ্ধমূল হয। তিনি খাঁটি লোক, চিন্তাশীল লোক ও সবল প্রকৃতিব লোক। বিজ্ঞান সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহাব মতামতেব যাহাই মূল্য হউক না কেন, গুছাইযা লিখিবাব ক্ষমতা তাঁহাব আছে। কিন্তু তাঁহাব আব যে-ক্ষমতা বা অক্ষমতাই থাকুক, দার্শনিকেব ব্যাপক দৃষ্টি বা সাহিত্যিকেব বসবোধ তাঁহাব নাই। তাঁহাব সুখদুঃখেব কাহিনী পাঠকেব মনে যতই সহানুভূতি উদ্রেক করুক না কেন, যে অপরূপ আলোকসম্পাতে মানুষেব জীবনেব বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে দীপ্ত হইযা ওঠে, সে আলোক-বশ্মিব সন্ধান সালিভান পান নাই।

শ্রীহিবণকুমাব সান্যাল

পরিশেষ—শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব। বিশ্বভাবতী।

দেবিতে পাওযা গিযাছে বলিয়া এই সংখ্যায ইহাব সমালোচনা সম্ভব হইল না। আগামী সংখ্যায ইহাব সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। বইখানিব ছাপা ও বাঁধাই জাপানী ধবণেব—চমৎকাব।

সঃ পঃ

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোযার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৩৯

পরিচয়

চিহ্নবিভ্রাট

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু

সঞ্চয়িতার মুদ্রণভার ছিল জীবনময়ের উপর। প্রুফ দেখার কালে চিহ্ন ব্যবহার নিয়ে তাঁর খটকা বাধে। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার যে-চিঠি চলেছিল সেটা প্রকাশ করবার যোগ্য বলে মনে করি। আমার মতই-যে সকলে গ্রহণ করবেন এমন স্পর্দ্ধা মনে রাখিনে। আমিও-যে সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিজের মতে চলব এত বড়ো সাহস আমার নেই। আমি সাধারণত যে-সাহিত্য নিয়ে কারবার করি পাঠকের মনোরঞ্জনের উপর তার সফলতা নির্ভর করে। পাঠকের অভ্যাসকে পীড়ন করলে তার মন বিগড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটা রসগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। তাই চলতি রীতিকে বাঁচিয়ে চলাই মোটের উপর নিরাপদ। তবুও সঞ্চয়িতার প্রুফে যতটা আমার প্রভাব খাটাতে পেরেচি ততটা চিহ্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত বজায় রাখবার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েচে। মতটা কী দুখানা পত্রেই তা বোঝা যাবে। এই মত সাধারণের ব্যবহারে লাগবে এমন আশা করিনে কিন্তু এই নিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তি হয়তো উপাদেয় হতে পারে। এখানে "উপাদেয়" শব্দটা ব্যবহার করলুম ইণ্টারেষ্টিং শব্দের পরিবর্ত্তে। এই জায়গাটাতে খাট্‌ল কিন্তু সর্ব্বত্রই-যে খাট্‌বে এমন আশা করা অন্যায়। "মানুষটি উপাদেয়" বল্‌লে ব্যাঘ্রজাতির সম্পর্কে এবাক্যের সার্থকতা মনে আসতে পারে। এস্থলে ভাষায় বলি, লোকটি মজার, কিম্বা চমৎকার, কিম্বা দিব্যি। তাতেও অনেক সময়ে কুলোয় না, তখন নতুন শব্দ বানাবার দরকার হয়। বলি, বিষয়টি আকর্ষক, কিম্বা লোকটি আকর্ষক। 'আগ্রহক' শব্দও চালানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়। মনোগ্রাহী শব্দও যথাযোগ্য স্থানে চলে—কিন্তু সাধারণত ইণ্টারেষ্টিং বিশেষণের চেয়ে এ বিশেষণের মূল্য কিছু বেশি। কেননা, অনেক সময়ে ইণ্টারেষ্টিং শব্দ দিয়ে দাম চোকানো পারা-মাখানো আধ্‌লা

পয়সা দিয়ে বিদায় করার মতো। বাঙালীর গান শুনে ইংরেজ যখন বলে, "হাউ ইণ্টারেষ্টিং" তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠা মূঢ়তা। যে-শব্দের এত ভিন্ন-রকমের দাম অন্য ভাষার ট্যাকশালে তার প্রতিশব্দ দাবি করা চলে না। সকল ভাষার মধ্যেই গৃহিণীপনা আছে। সব সময়ে প্রত্যেক শব্দ সুনির্দ্দিষ্ট একটিমাত্র অর্থ ই-যে বহন করে তা নয়। সুতরাং অন্য ভাষায় তার একটিমাত্র প্রতিশব্দ খাড়া করবার চেষ্টা বিপত্তিজনক। "ভরসা" শব্দের একটা ইংরেজি প্রতিশব্দ courage, আর একটা expectation। আবার কোনো কোনো জায়গায় দুটো অর্থ ই একত্র মেলে, যেমন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।

এখানে courageও বটে hopeও বটে। সুতরাং এটাকে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে হলে ও দুটোর একটাও চল্‌বেনা। তখন বল্‌তে হবে—

Keep firm the faith, my heart,
it must come to happen

উল্টে বাংলায় তর্জ্জমা করতে হলে "বিশ্বাস" শব্দের ব্যবহারে কাজ চলে বটে কিন্তু "ভরসা" শব্দের মধ্যে যে একটা তাল ঠোকার আওয়াজ পাওয়া যায় সেটা থেমে যায়।

ইংরেজি শব্দের তর্জ্জমায় আমাদের দাসভাব প্রকাশ পায় যখন একই শব্দের একই প্রতিশব্দ খাড়া করি। যথা "সিম্প্যাথির" প্রতিশব্দে সহানুভূতি ব্যবহার। ইংরেজিতে সিম্প্যাথি কোথাও বা হৃদয়গত কোথাও বা বুদ্ধিগত। কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে দুই কাজ চালিয়ে নেওয়া কৃপণতাও বটে হাস্যকরতাও বটে। "এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে" বল্‌লে মানতে হয় যে প্রস্তাবের অনুভূতি আছে। ইংরেজি শব্দটাকে সেলাম করব কিন্তু অতটা দূর পর্য্যন্ত তার তাঁবেদারি করতে পারব না। আমি বলব "তোমার প্রস্তাবের সমর্থন করি।"

এক কথা থেকে আরেক কথা উঠে পড়ল। তাতে কি ক্ষতি আছে। যাকে ইংরেজিতে বলে essay, আমরা বলি প্রবন্ধ, তাকে এমনতরো অবন্ধ করলে সেটা আরামের হয় বলে আমার ধারণা।

নিরামিষভোজীকে গৃহস্থ পরিবেষন করবার সময় ঝোল আর কাঁচকলা দিয়ে মাছটা গোপন করতে চেয়েছিল হঠাৎ সেটা গড়িয়ে আসবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে গেল, নিরামিষ পংক্তিবাসী ব্যাকুল হয়ে বলে উঠ্‌ল "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।"

তোমাদের কোনো কোনো লেখায় এই রকম আপ্‌সে-আনে-ওয়ালাদের নির্ব্বিচারে পাতে পড়তে দিয়ো, নিশ্চিত হবে উপাদেয়,

অর্থাৎ ইণ্টারেষ্টিং। এবার পত্র দুটোর প্রতি মন দেও। এইখানে বলে রাখি, ইংরেজিতে যে-চিহ্নকে অ্যাপস্ট্রফির চিহ্ন বলে কেউ কেউ বাংলা পারিভাষিকে তাকে বলে "ইলেক", এ আমার নতুন শিক্ষা। এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি দায়িক নই। এই পত্রে উক্ত শব্দের ব্যবহার আছে।

এই প্রসঙ্গে অবান্তর ভাবে আর একটা দুঃখের কথা বলে নিই।

কাল্‌চার্‌ শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েচে ; চোখে পড়েচে কি। কৃষ্টি। ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে। এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কাম্‌ড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেচে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা ?

অন্য প্রদেশে ভদ্রতাবোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার "সংস্কৃতি।" যে-মানুষের কাল্‌চার আছে তাকে বলা চলে সংস্কৃতিবান, শব্দটাকে বিশেষ্য করে যদি বলা যায় সংস্কৃতিবত্তা, ওজনে ভারি হয় বটে কিন্তু রোমহর্ষক হয় না। নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তবু আন্দাজে বল্‌তে পারি, বন্ধুরা আমাকে কালচার্‌ড্‌ বলেই গণ্য করেন। কিন্তু যদি তাঁরা আমাকে সহসা কৃষ্টিবান উপাধি দেন বা আমার কৃষ্টিবত্তা সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথার উত্থাপন করেন তবে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। অন্তত, আমার মধ্যে কৃষ্টি আছে ঞ কথার প্রতিবাদ করাকে আমি আত্মলাঘব মনে করব না।

ইংরেজি ভাষায় চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দে চলে গেছে বলে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব ? ইংরেজিতে সুশিক্ষিত মানুষকে বলে কাল্‌টিভেটেড—আমরা কি সেই রকম উঁচুদরের মানুষকে চাষ-করা মানুষ বলে সম্মান জানাব, অথবা বলব কেদারনাথ।

সংস্কৃতভাষায় উৎকর্ষ প্রকর্ষ শব্দের ধাতুগত অর্থে চাষের ভাব আছে কিন্তু ব্যবহারে সে অর্থ কেটে গেছে। কৃষ্টিতে তা কাটেনি। সেইজন্যে তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে আমার এই প্রশ্ন, চিৎপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কালচার অর্থে চালালে দোষ কি ? কালচার্‌ড্‌ মানুষকে প্রকৃষ্টচিত্ত লোক বলা যেতে পারে। কালচার্‌ড্‌ ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান পরিবার বল্‌লে সে-পরিবার গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কৃষ্টিবান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছা হবে।

রবীন্দ্রনাথ

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২।

*　　*　　*　　*　　*　　*

দার্জ্জিলীং

শ্রীযুক্ত জীবনময় বায়

কল্যাণীয়েষু

প্রুফে তুমি যে যে জায়গা নির্দ্দেশ কবে দিয়েচ সেগুলো প্রশ্নসঙ্কেতেব যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে কেন মূল সংস্কবণে তাব ত্রুটি দেখচ তাব একটু ইতিহাস আছে। একদা আমাব মনে তর্ক উঠেছিল-যে চিহ্নগুলো ভাষাব বাইবেব জিনিষ, সেগুলোকে অগত্যাব বাইবে ব্যবহাব কবলে ভাষাব অভ্যাস খাবাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে ভব কোবে চললে পাযেব পবে নির্ভব কমে। প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আব কোনো উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেবই বাক্যগত ভঙ্গীদ্বারাই নিজেব সমস্ত প্রযোজন-সিদ্ধি কবত। এখন তাব এত বেশি নোকব চাকব কেন। ইংবেজেব ছেলে যখন দেশে থাকে তখন একটিমাত্র দাসীতেই তাব সব কাজ চলে যায় ভাবতবর্ষে এলেই তাব চাপবাসী হবকবা বেহাবা বাট্‌লাব চোপদাব জমাদাব মালী মেথব ইত্যাদি কত কি। আমাদেব লিখিত ভাষাকেও এইবকম হাকিমী সাহেবিয়ানায় পেয়ে বসেচে। "কে হে তুমি" বাক্যটাই নিজেব প্রশ্নত্ব হাঁকিযে চলেচে তবে কেন ওব পিছনে আবাব একটা কুঁজ-ওয়ালা সহিস। সব চেয়ে আমাব খাবাপ লাগে বিস্ময়েব চিহ্ন। কেননা বিস্ময় হচ্চে একটা হৃদয ভাব—লেখকেব ভাষায় যদি সেটা স্বতই প্রকাশিত না হযে থাকে তাহলে একটা চিহ্ন ভাড়া কবে এনে দৈন্য ঢাকবে না। ও যেন আত্মীয়েব মৃত্যুতে পেশাদাব শোকওয়ালিব বুক-চাপড়ানি। "অহো, হিমালযেব কী অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য।" এব পবে কি ঐ ফোঁটা-সওয়াবি দাঁড়িটাব আকাশে তর্জ্জনী নির্দ্দেশেব দবকাব আছে—(বোসো, প্রশ্নচিহ্নটা এখানে না দিলে কি তোমাব ধাঁধা লাগবে (?)। কে, কি, কেন, কাব, কিসে, কিসেব, কত, প্রভৃতি এক ঝাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নেব খোসামুদি কবা কেন। "তুমি তো আচ্ছা লোক" এখানে "তো"—ইঙ্গিতেব পিছনে আবো একটা চিহ্নেব ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্‌ল্ চমক খাওয়ানোব দবকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোব। "বোজ বোজ যে দেবি কবে আস" এই বাক্যবিন্যাসেই কি নালিশেব যথেষ্ট জোব পৌঁছল না। যদি মনে কবো অর্থটা স্পষ্ট হোলো না তাহলে শব্দযোগে অভাব পূবণ কবলে ভাষাকে বৃথা ঋণী কবা হয না,—যথা, "বোজ বোজ বড়-যে দেবি কোবে আসো।" মুস্কিল এই যে, পাঠককে এমনি চিহ্ন-মৌতাতে পেযে বসেচে, ওগুলো না দেখলে তাব চোখেব তাব্ থাকে না। লঙ্কাবাটা দিযে তবকাবী তো তৈবি

হয়েচেই কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আস্ত লঙ্কা দৃশ্যমান না হলে চোখের ঝালে জিভেব ঝালে মিলনাভাবে ঝাঁঝটা ফিকে বোধ হয়।

ছেদ চিহ্নগুলো আব এক জাতেব। অর্থাৎ যতি-সঙ্কেতে পূর্ব্বে ছিল দণ্ডহাতে একাধিপত্য-গর্ব্বিত সীধে দাঁড়ি—কখনো বা একলা কখনো দোকলা। যেন শিবেব তপোবনদ্বাবে নন্দীব তর্জ্জনী। এখন তাব সঙ্গে জুটে গেছে বাঁকা বাঁকা ক্ষুদে ক্ষুদে অনুচব। কুকুববিহীন সঙ্কুচিত ল্যাজেব মতো। যখন ছিল না তখন পাঠকেব আন্দাজ ছিল পাকা, বাক্যপথে কোথায় কোথায় বাঁক তা সহজেই বুঝে নিত। এখন কুঁড়েমিব তাগিদে বুঝেও বোঝে না। সংস্কৃত নাটকে দেখেচ বাজাব আগে আগে প্রতিহাবী চলে—চিবাভ্যস্ত অন্তঃপুবেব পথেও ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে ওঠে, "এই দিকে" "এই দিকে"। কমা সেমিকোলনগুলো অনেকটা তাই।

এ মোহ ক'দিন থাকে এ মায়া মিলায়
কিছুতে পাবেনা আর বাঁধিযা বাখিতে
কোমল বাহুব ডোব ছিন্ন হযে যায়
মদিরা উথলে নাকো মদিব আঁখিতে।

এখানে সংস্কৃত শ্লোক-লিখনেব নিয়ম অনুসারে একমাত্র দাঁড়ি চিহ্ন ফেলা গেল চতুর্থছত্রেব শেষে। তাতে [illegible] বুঝতে বাধা পেলে। চোখটা অভ্যস্ত খুঁটিগুলোক খুঁজে মবে প্রয়োজন না থাকলেও। তুমি হয় তো বলবে পদ্যেব নিয়মে লাইন ভাগ কবে লিখেচি বলেই অসুবিধে হয় নি। কথাটা সত্য। পুবোনো পুঁথিতে দেখেচি সমপংক্তিতে লেখবাব সময় ছন্দেব যতি অনুসাবে প্রত্যেক ভাগেই দাঁড়িব ব্যবহাব চলে। সেই অনুসাবে লেখাটা হবে এই বকম—

এ মোহ কদিন থাকে এ মাযা মিলাষ। কিছুতে পাবে না আব বাঁধিযা বাখিতে। কোমল বাহুব ডোব ছিন্ন হযে যায। মদিবা উথলে নাকো মদিব আঁখিতে।

—এতে বুঝতে কিছুই বাধেনা কেবল অভ্যাসে বাধে। শেষোক্ত বাক্যটাতে "বাধে না" শব্দেব পবে একটা কমা দিতে ঝোঁক হয। কিন্তু যদি না দিই নালিশ কববে কি।

একদিন চিহ্নপ্রয়োগে মিতব্যযেব বুদ্ধি যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল তখনই আমাব কাব্যেব পুনসংস্কবণকালে বিস্ময়সঙ্কেত ও প্রশ্নসঙ্কেত লোপ কবতে বসেছিলুম। প্রৌঢ় যতিচিহ্ন সেমিকোলনকে জবাব দিতে কুণ্ঠিত হই নি। কিশোব কমা-কে ক্ষমা কবেছিলুম, কাবণ, নেহাৎ খিড়কিব দবজায দাঁড়িব জমাদাবী মানানসই হয না। লেখায় দুই জাতেব যতিই যথেষ্ট, একটা বড়ো একটা ছোটো। সূক্ষ্ম বিচাব করে আবো একটা যদি আনো তাহলে অতি সূক্ষ্ম বিচাব কবে ভাগ আরো অনেক বাড়বে না কেন।

অতএব আমাব নিয়মে যদি ছাপাতে চাও তাহলে এইবকম দাঁড়াবে—

এ মোহ ক'দিন থাকে এ মোহ মিলায়,
কিছুতে পাবে না আব বাঁধিয়া বাখিতে,
কোমল বাহুব ডোব ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিবা উথলে না কো মদিব আঁখিতে।
কেহ কাবে নাহি চেনে আঁধাব নিশায়।
ফুল-ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
বাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধব,
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত
কম্পিত পুলকভবে যৌবনকাতব।
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা
সেই চিব-পিপাসিত যৌবনেব কথা
সেই প্রাণপবিপূর্ণ মবণ অনল,
মনে পোড়ে হাসি আসে, চোখে আসে জল॥

একটা কথা লক্ষ্য কোবো, যেখানে "সেই" সর্ব্বনাম শব্দেব পুনরুক্তি আছে সেখানে "কমা"ব প্রয়োজন বোধ কবি নি।

কিন্তু সাধাবণ পাঠকের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে তুমি যদি আধুনিক চিহ্নগুলো ব্যবহাব কবো [illegible]লিশ কবব না—কেবল বিস্ময়চিহ্ন নৈব নৈবচ। এই সঙ্গে বলে বাখি উক্ত কবিতা থেকে "কমা"-গুলোকে যদি আগাগোড়াই উপড়িয়ে ফেলো তাহলেও ক্ষতি হয় না।

চিহ্নেব উপব বেশি নির্ভব যদি না কবি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হতে হয়। মনে কবো কথাটা এই :—"তুমি যে **বাবুয়ানা** সুরু কবেচ।" এখানে বাবুয়ানাব উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয়—ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন—পূবিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, "তুমি যে বাবুয়ানা সুরু কবেচ তাব মানেটা কি বল দেখি।" "যে" অব্যয় পদেব পবে ঠেস দিলে বিস্ময় প্রকাশ পায়। "তুমি **যে** বাবুয়ানা সুরু কবেচ।" প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সাবা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তাহলে ভাষাটাকেই নিঃসন্দিগ্ধ কবে তুলতে হয়। তাহলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে শুধবিয়ে বলতে হয়— "যে-বাবুয়ানা তুমি সুরু কবেচ।"

এইখানে আব একটা আলোচ্য কথা আছে। প্রশ্ন-সূচক অব্যয় "কি" এবং সর্ব্বনাম "কি" উভযেব কি এক বানান থাকা উচিত। আমাব মতে বানানেব ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভযেব ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবাব

সুবিধা হয। "তুমি কি বাঁধচ" "তুমি কী বাঁধচ"—বলা বাহুল্য এদুটো বাক্যেব ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি বাঁধচ কিনা, এবং তুমি কোন্ জিনিষ বাঁধচ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রযোজন সাবতে গেলে বানানেব খবচ বাঁচিযে প্রযোজনেব বিঘ্ন ঘটানো হবে। যদি দুই "কি"-এব জন্যে দুই ইকাবেব ববাদ্দ কবতে নিতান্তই নাবাজ থাকো তাহলে হাইফেন্ ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত ঃ—"তুমি-কি বাঁধ্চ" এবং "তুমি কি-বাঁধ্চ।" এই পর্য্যন্ত থাক্। ইতি ৫ নবেম্বব, ১৯৩১।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্রীজীবনময বায

কল্যাণীযেষু

আমাব প্রুফ-সংশোধনপ্রণালী দেখলেই বুঝতে পাববে আমি নিবঞ্জনেব উপাসক—চিহ্নেব অকাবণ উৎপাত সইতে পাবিনে। প্রশান্ত যাকে ইলেক্ বলে (কোন্ ভাষা থেকে পেলে জানিনে) তাব ঔদ্ধত্য হাস্যকব অথচ দুঃসহ। অসমাপিকা [illegible] ব'লে প্রভৃতিতে দবকাব হতে পাবে কিন্তু "হেসে" "কেঁদে"-তে একেবাবেই দবকাব নেই। "কবেছে বলেছে"-তে ইলেক চড়িযে পাঠকেব চোখে খোঁচা দিয়ে কী পুণ্য অর্জ্জন কববে জানিনে। কববে চলবে প্রভৃতি স্বতঃসম্পূর্ণ শব্দগুলো কী অপবাধ কবেছে যে ইলেককে শিবোধার্য্য কবতে তাবা বাধ্য হবে। "যাব"—"তাব" উপব ইলেক চড়াওনি বলে তোমাব কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাছে হল এবং হ'ল শব্দে অর্থ নিযে ফৌজদাবী হয সেজন্যে ইলেকেব বাঁকা বুড়ো আঙুল না দেখিযে অকপটচিত্তে হোলো লিখতে দোষ কী। এ ক্ষেত্রে ঐ ইলেকেব ইসাবাটাব কী মানে তা সকলেব তো জানা নেই। হোলো শব্দে দুটো ওকাব ধ্বনি আছে—এক ইলেক কি ঐ দুটো অবলাকেই অন্তঃপুবে অবগুণ্ঠিত কবেচেন। হতে ক্রিযাপদ যে-অর্থ স্বভাবতই বহন কবে তা ছাড়া আব কোনো অর্থ তাবপবে আবোপ কবা বঙ্গভাষায সম্ভব কি না জানিনে অথচ ঐ ভালোমানুষকে দাগীরূপে চিহ্নিত কবা ওব কোন্ নিযতিব নির্দ্দেশে। স্তম্ভপবে পালঙ্কপবে প্রভৃতি শব্দ কানে শোনবাব সময কোনো বাঙালীব ছেলে ইলেকেব অভাবে বিপন্ন হয না, পড়বাব সমযেও স্তম্ভ পালঙ্ক প্রভৃতি শব্দকে দিন মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালার্থক শব্দ বলে কোনো প্রকৃতিস্থ লোকেব ভুল কববাব আশঙ্কা নেই। "চলবাব" "বলবাব" "মববাব" "ধববাব" শব্দগুলি বিকল্পে দ্বিতীয

কোনো অর্থ নিয়ে কারবার করে না তবু তাদের সাধুত্ব রক্ষার জন্যে ল্যাজগুটোনো ফোঁটার ছাপ কেন। তোমার প্রুফে দেখলুম "হয়ে" শব্দটা বিনা চিহ্নে সমাজে চলে গেল অথচ "ল'য়ে" কথাটাকে ইলেক দিয়ে লজ্জিত করেছ। পাছে সঙ্গীতের লয় শব্দটার সঙ্গে ওর অধিকার-ভেদ নিয়ে মামলা বাধে এই জন্যে। কিন্তু সে রকম সুদূর সম্ভাবনা আছে কি। লাখে যদি একটা সম্ভাবনা থাকে তারি জন্যে হাজার হাজার নিরপরাধকে দাগা দেবে। কোন্ জায়গায় এ রকম বিপদ ঘট্‌তে পারে তার নমুনা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। যেখানে যুক্ত ক্রিয়াপদে অসমাপিকা থাকে সেখানে তার অসমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। যেমন, বলে ফেল, করে দাও ইত্যাদি। অবশ্য করে দাও মানে হাতে দাও হতেও পারে কিন্তু সমগ্র বাক্যের যোগে সে রকম অর্থদ্বৈত হয় না—যেমন কাজ করে দাও। "বলে ফেল" কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখলে আর একটা মানে কল্পনা করা যায়, যথা, কেউ একজন বলে, "ফেল"। কিন্তু আমরা তো সব প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের টুক্‌রো কথার ব্যবসায়ী নই। "তুমি বলে যাও" কথাটা স্বতই স্পষ্ট, কেবল দুর্দ্দৈবক্রমে, তুমি বল্ নাচে যাও এমন মানে হতেও পারে সেই ক্বচিৎ দুর্য্যোগ এড়াবার জন্যে [illegible] punishment কি দয়া কিম্বা ন্যায়ের পরিচায়ক। "দেবতা নি[illegible]ড়ি কহিলেন"—সমস্ত বাংলা দেশে যত পাঠশালায় যত ছেলে আছে পরীক্ষা করে দেখ একজনেরও ইলেকের দরকার হয় কি না, তবে কেন তুমি না-হক্ মুদ্রাকরকে পীড়িত করলে। তোমার প্রুফে তুমি ক্ষুদে ক্ষুদে চিহ্নের ঝাঁকে আমার কাব্যকে এমনি আচ্ছন্ন করেছ যে তাদের জন্য মশারি ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার প্রুফে আমি এর একটাও ব্যবহার করিনি—কেননা জানি বুঝতে কাণাকড়ি পরিমাণও বাধে না। জানি আমার বইয়ে নানা বানানে চিহ্নপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্য ঘটেচে—তা নিয়েও আমি মাথা বকাইনে—যেখানে দেখি অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে সেখানে ছাড়া এইদিকে আমি দৃকপাতও করিনে। প্রুফে যত অনাবশ্যক সংশোধন বাড়াবে ভুলের সম্ভাবনা ততই বাড়বে—সময় নষ্ট হবে, তার বদলে লাভ কিছুই হবেনা। ততো যতো শব্দে ওকার নিতান্ত অসঙ্গত। মতো সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। মোটের উপর আমার বক্তব্য এই পাঠককে গোড়াতেই পাগল নির্ব্বোধ কিম্বা আহেলাবেলাতি বলে ধরে নিয়ো না—যেখানে তাদের ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে কেবলি তাদের চোখে আঙুল দিয়ো না—চাণক্যের মতো চিহ্নের কুশাঙ্কুরগুলো উৎপাটিত কোরো তাহলে বানানভীরু শিশুদের যিনি বিধাতা তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করবে।

আমি যে নির্ব্বিচারে চিহ্নস্থূয়যজ্ঞের জনমেজয়গিরি করতে বসেচি তা মনে কোরো না। কোনো কোনো স্থলে হাইফেন চিহ্নটার প্রয়োজন স্বীকার করি। অব্যয় "যে" এবং সর্ব্বনাম "যে" শব্দের প্রয়োগভেদ বোঝাবার জন্যে আমি হাইফেনের শরণাপন্ন হই। "তুমি যে **কাজে** লেগেছ" বল্‌তে বোঝায় তুমি অকর্ম্মণ্য নও, এখানে "যে" অব্যয়। "তুমি **যে** কাজে লেগেছ" এখানে কাজকে নির্দ্দিষ্ট করবার জন্য "যে" সর্ব্বনাম বিশেষণ। প্রথম "যে" শব্দে হাইফেন দিয়ে "তুমি"-র সঙ্গে ও দ্বিতীয় "যে"-কে "কাজ" শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ স্পষ্ট হয়। অন্যত্র দেখ,—"তিনি বললেন যে **আপিসে** যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।" এখানে "যে" অব্যয়। অথবা তিনি বল্‌লেন "**যে** আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।" এখানে "যে" সর্ব্বনাম, আপিসের বিশেষণ। হাইফেন্‌ চিহ্নে অর্থভেদ স্পষ্ট করা যায়। যথা, "তিনি বল্‌লেন-যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।" এবং "তিনি বল্‌লেন যে-আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইস্কুলেব বিদ্যা শেষ ক'বে ১৮৯০সালে বাগ্‌দেবীব মন্দিবেব তোবণে ধবনা দিতে কলকাতায এলাম। পাঠককে গোড়াতেই ব'লে বাখা ভাল যে বিদ্যা বেশী সঞ্চয হলনা শেষ পর্য্যন্ত, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল অনেক। যাহোক, আমাব সুবুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিব জন্য বাণীমন্দিবকে দাযী কবলে অন্যায হবে। মানুষেব যে বিষয সম্পত্তি থাকে তাব কতক উত্তবাধিকাব সূত্রে পাওযা আব কতক স্বোপার্জ্জিত। আমাব কলকাতাব কীর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত। একটা কথা হয়ত আগে বলি নেই যে আমাব জন্মেব সময সনাতন প্রথামত এক জন্ম-পত্রিকা তৈযাব হয়েছিল। তাব ফলাফল সম্বন্ধে কখনও কুতূহল হয় নেই কিন্তু শুনেছি যে মোটামুটি তাব ডিক্রী এই বকম যে বুধ আব বৃহস্পতি আমায় নিযে সাবা জীবন টানা হেঁচড়া কববে। কলকাতায যে এলাম তাব কাবণ বুধেব চাঞ্চল্য না বৃহস্পতিব জ্ঞানপিপাসা তা আজও ঠিক কবতে পাবিনি। যাহোক, ১৮৯০সালে বাড়ী ছেড়ে এই আমাব প্রথম পাড়ি। কলকাতাব ছবছবেব জীবনকে ওযেসিসেব সঙ্গে তুলনা কবতে পাবলাম না, কাবণ আমাব বাকী জীবনটা মোটেই মরুভূমি নয়। জীবনটাকে মোটামুটি বসময ব'লে পেয়েছি। বসময় বল্‌তে তো নানা বস বোঝায়, আমাব কলিকাতাব জীবন তাবই একটা বকমাবী।

খুব সঙ্গোপনে একটা কথা পাঠকেব কাছে জানাচ্ছি যে আমাব এই সমযটা সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কথা বলতে হবে। তাব প্রথম কাবণ যে বন্ধুবান্ধববা অনেকেই সাংসাবিক হিসেবে এত উঁচু জাযগায় গিযে পৌছেছেন যে তাঁদেব বাল্যজীবনেব কতকটা অলৌকিকত্ব না দেখাতে পাবলে সাজন্ত হবেনা, কাজেই দবকাব হলে দুচাবটে ঘটনা ঠাকুমাব ঝুলি থেকে বেব কবব। দ্বিতীয় কাবণ, ব্রহ্মচর্য্য সুরু কবতে না কবতেই আমাব গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ঘটল, অর্থাৎ কলেজে পডতে পড়তেই কলকাতা আমাব শ্বশুববাডী হল। এখন আমি যদি বলি কলকাতায বাবমাস কোকিল ডাকে না, গঙ্গাব জল উজান বয না, ষ্টীমাবেব বাঁশী ছাড়া কোন বাঁশী বাজেনা, তাহলে কি সেটা ভাল দেখাবে? এই সব পাঁচবকম কাবণে আমাব জীবনেব এই অংশটায় একটু বেশী ক'বে কল্পনাব বঙ্গ চড়াতে আমি বাধ্য।

কলেজ খোলবাব আগে লম্বা ছুটিটা এবাব দেশে কাটিয়েছিলাম। আগে জানিয়েছি যে তখন আমাব মনে একটা বেশ বড় বকম টিকি গজিযে-

ছিল। সেই টিকির জন্যই এবার দেশে এই আড়াই মাস কাল এত ভাল লেগেছিল। সব ভাল লেগেছিল, এমন কি গ্রামের দলাদলি পর্য্যন্ত। গাঁয়ে এক ওলাইচণ্ডীতলা ছিল। সেখানে নানারকম কাণ্ড হত যার আজ কোন অর্থই বুঝতে পারি না। তখন কিন্তু তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত জানতাম, আর তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতাম। পূর্ব্বপুরুষদের বসান ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলোর ক্রিয়াকর্ম্ম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। ভালও লাগত। কিন্তু এত সাত্ত্বিকভাব সত্ত্বেও বন্দুকের ঝোঁক ছাড়তে পারি নেই। একদিন আমরা দুতিনজন গোটাকয়েক কাঁদাখোঁচা মেরে কাছের এক গ্রামের ভেতর দিয়ে আসছি। দুই বৃদ্ধা জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন, আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন "এরা কারা লো।" তিনি চুপিচুপি কি জবাব দিলেন। তখন প্রথম বৃদ্ধা বেশ চেঁচিয়ে বার দুই বললেন, "দেখ সে লো দেখ সে, কালীরায়ের ছেলেগুলো পাখমারা হয়েছে।" আমরা পাখীগুলো সেখানেই ফেলে দিয়ে মানে মানে চম্পট দিলাম। তামসিক আহারের হাত থেকে সেদিন নিষ্কৃতি পেলাম। এই একবার মাত্র ধরা পড়েছিলাম, তা নইলে রায়মহাশয়ের ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে দেবদ্বিজে ভক্তির অপূর্ব্ব সংযোগ দেখে গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী চমৎকৃত হয়েছিলেন। ছেলেরা এখন বললে বিশ্বাস করবেনা যে পূরো আড়াই মাস সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত খাদ্য খেয়েই কাটিয়েছিলাম। কিন্তু বৃথা প্রয়াস। দেশের অবনতি বন্ধ হলনা। কয়েক বছর পরে আমার ভ্রাতা যখন গ্রামে যেতেন তখন পাঁউরুটি কেক বাবত অনেক খরচ হত। হপ্তায় একদিন করে আমাদের গ্রামে হাট বসত। মহা উৎসাহে আমরা দরোয়ানের সঙ্গে তোলা আদায় করতে যেতাম। যতদূর মনে আছে আদায় বেশ জোরেই করতাম। আদায় ব্যাপারটা সনাতন ধর্ম্মসঙ্গত কিনা, তাই আগ্রহের অভাব হতনা।

একদিন রাজেন্দ্রবাবু নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি আমাদের দূর কুটুম্ব। পরে ফকীর রাজেন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন। দশভূজা মূর্ত্তি আর সন্ধি-পূজার বলি সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করলেন যে গাঁয়ের লোক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমাদের কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। সনাতন ধর্ম্মের আর বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অদ্ভুত সমন্বয়—জগাখিচুড়ী—ব'লে। তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আগেই শোনা অভ্যাস ছিল।

আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তে ভীষণ বৃষ্টি নামল। দামোদরে বান এল। দেখতে দেখতে চারিদিক জলে জলময় হয়ে গেল। জল মররার

আগেই ছুটি শেষ হল। কিন্তু নিরুপায়, ভেলায় চ'ডে ত আব সাগব পাব হওয়া যাযনা। সেজন্য মনে কিন্তু ক্ষোভ বইল না। আমাব কোষ্ঠীব বৃহস্পতিব ফলাফল দিন কয়েক মুলতুবী বইল মাত্র। ইতিমধ্যে বুধকে সহায ক'বে ডিঙ্গীতে আব ভেলায় চেপে চতুর্দ্দিক তোলপাড কবতে লাগলাম। পাডাগেঁয়ে ছেলে হলেও দিনে দশবাব ঘোলা বেনো জলে ডুব দেওযা অভ্যাস ছিল না। সইল না। কলকাতায এসে দশদিন ডাক্তাববাবু কুইনিন হস্তে মেলেবিয়াব সঙ্গে অনববত যুদ্ধ ক'বে কোনও বকমে খাডা করলেন। কুইনিনেব প্রভাবে মেঠো বঙ্গটা গেল। একটা কাঞ্চনবর্ণ আভা মুখে দেখা দিলে। তখন সাহস ক'বে শহুবে কলেজে ঢুকতে পাবলাম।

যে কেলাসে ঢুকলাম সেটাব একমাত্র বর্ণনা হতে পাবে—হবিঘোষেব গোয়াল। লেক্‌চাব হত কিন্তু শোনা যেত না। দুযেকদিনেই বুঝতে পাবলাম যে যদি কিছু বিদ্যা শিক্ষা কবতে পাবি ত সে ওখানে হবেনা, অন্যত্র। কিছুদিন পবে কেলাসটা দুভাগ হযে গেল। মোটামুটি একটা ভাগে হেযাব ইস্কুল হিন্দু ইস্কুলেব মার্জ্জিতরুচি ছেলেবা গেল, আব অন্যটায আমবা শ' খানেক জঙ্গলী অর্থাৎ বাঙ্গাল, বেঢো, মুসলমান গেলাম। কিন্তু এই সেক্‌শান্ ভাগা হওযাব আগেব একটা ঘটনা বলি।

তখনকাব দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্গালী মাষ্টাব খুব কমই ছিলেন। তাঁদেবই একজনেব কেলাসে কার্ত্তিকপূজোব দিন টেবিলেব উপব ঠাকুব এনে বাখা স্থিব হল। আমাব অত্যন্ত লজ্জা হওয়া উচিত একথা স্বীকাব কবতে যে আমি ঐ ব্যাপাবে সামিল ছিলাম, তবে চুনোপুঁটিরূপে। ধুবন্ধব যাঁবা ছিলেন তাঁদেব একজন আজ নেই, আব একজন এখন যোগাভ্যাস কবেন। মাষ্টাব মশায টেবিলাধিষ্ঠিত দেবসেনানীকে দেখে প্রথমটা বেগে কথা কইতে পাবলেন না। দুই এক মিনিট চুপ ক'বে থেকে তাবপব বজ্রগম্ভীবস্বরে হাঁকলেন, "তোমাদেব ব'লে দিচ্ছি যে আমি অপবাধীকে খুঁজে বেব কববই, আব বাষ্টিকেট কবাব।" এই না ব'লে, তিনি ঘুবে ঘুবে আমাদেব প্রত্যেককে জিজ্ঞেস কবলেন, 'তুমি কিছু জান?' আমাদেব দিকেব প্রায় সত্তব আশীজন নির্ভীক বীবেব মত বললাম, "না স্যাব, আমবা কিছুই জানিনা।" তখন মাষ্টাবমশাই আমাদেব দিকে পেছন ক'বে অন্য দিকেব ছেলেদেব জিজ্ঞেস পডা কবতে লাগলেন। তাদেবও কযেকজন 'না' বলাব পবে যাব কাছে মাষ্টাবমশায পৌছলেন তিনি অপেক্ষাকৃত বয়স্থ, মুখে ছোট্ট ছাগলদাডী, ঢাকা জেলায বাডী, ধর্ম্মে ব্রাহ্ম। আমাদেব সেকালেব ব্রাহ্মবা মিথ্যাকথা কইতেন না। অতএব এই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে, একটু বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমি জানি, স্যাব।" ব'লে

বোধ হয় নাম প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটল। আমাদের ষড়যন্ত্রের একজন নেতা তাঁর কলমকাটা ছুরির ফলাটা খুলে একটু নাটুকে ভাবে সেটা ছোরার মত ভাঁজতে লাগলেন। দাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটী ছুরি দেখবামাত্র মুখব্যাদন ক'রে ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লেন। জগতে আবার সত্যের নিগ্রহ, মিথ্যার জয় হল। জলখাবার ঘরের উড়িয়া বেয়ারাটার একটাকা জরিমানা হল। আমরা সেটা গোপনে দিয়ে দিলাম।

এ সব গল্পগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই দেখান যে ছেলেমানুষ চিরদিনই ছেলেমানুষ। একটা বে-পরোয়া ভাব, একটা চাঞ্চল্য, তার নিজস্ব। অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনি যে সেকালে আমরা গোপালের মত সুবোধ বালক ছিলাম, আর আজকালকার ছোকরারা হয়েছে কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত বর্ব্বর। এটা নিছক রূপকথা। গোপালের দল আজও বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমান। তবে তাদের হাতে বঙ্গমাতার দুঃখ কতটা ঘুচবে তাতে আমার ঘোর সন্দেহ। মা পথ চেয়ে রয়েছেন লর্ড ক্লাইবের মত সোনার চাঁদদের জন্য।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকি তখন আমাদের বড় সাহেব ছিলেন খ্যাতনামা মিষ্টার টনী। তাঁর ছাত্রেরা শিক্ষক হিসাবে তাঁর খুব প্রশংসা করতেন। আমার নিজের তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয় নেই। তবে বড় সাহেব ব'লে তাঁর সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তিনি আর পাঁচজন বড় সাহেবের মতই দুরধিগম্য ছিলেন। মোটের উপর কলেজটা বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব, বড় বাবু, মেজ বাবু, ছোট বাবু অধিষ্ঠিত একটা প্রকাণ্ড সরকারী আফিসের মত ছিল। এঁদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক কিছুই ছিলনা। টনী মহাশয়কে বার দুই দেখেছিলাম ব'লে মনে আছে। একবার যখন তিনি আমাদের কেলাস শুদ্ধ বিনা দোষে জরিমানা করতে আসেন, আর একবার যখন সেই জরিমানা প্রত্যাহার করাবার জন্য তাঁর খাস কামরায় যেতে হয়েছিল। এই সাহেবের শেষ বয়সের কীর্ত্তি যে তিনি বিলেতে প্রকাশ্য সভায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাকে মিথ্যাবাদী—monumental liars—বলেছিলেন। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ঢাকার ছেলেদের কাছে ঢাকা কলেজে শিক্ষক ছাত্রের একসঙ্গে খেলাধূলোর গল্প শুনে আমাদের বিশ্বাস করা শক্ত হত। কারণ আমাদের খেলার ক্লাবে সাহেব বা বাঙ্গালী অধ্যাপক একদিনও কেউ খেলতে আসেন নেই। কলেজের বাঙ্গালী মাষ্টাররা সর্ব্বরকমে ইংরেজদের নকল করতেন। আমাদের সঙ্গে যদি কখনও বারান্দায় লাইব্রেরীতে কথা কইতে হত তা ইংরেজীতেই কইতেন। ধূতি প'রে কোন অধ্যাপকই কলেজে আসতেন না—পণ্ডিত মশাযরাও নয়।

এই সুত্রে বেশভূষাব কথা একটু বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ধূতিব তখন বড় তুর্দ্দিন। সাহেবদেব অবজ্ঞা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ত ছিলই। তাছাড়া সহবেব নানাস্থানে ধূতি প'বে প্রবেশ নিষেধ ছিল। তুটো একটা জায়গাব নাম কবি। ইডেন গার্ডেনেব গঙ্গাব দিকটায় অনেকখানা জাযগা প্যাণ্টুলুন-ওয়ালাদেব জন্য দড়ি দিয়ে ঘেবা থাকত। ঘোড়দৌড়েব মাঠে জুযো খেলতে গেলেও ধূতি-পবিহিত লোকেব অনেক বাধা বিপত্তি ছিল। আপিস সভা সমিতিব ত কথাই নেই। এই সবে আমাদেব নিজেদেব মনেও ধাবণা জন্মে গেছল যে কোনও সভ্যভব্য স্থানে যেতে হলে একটা ইজাব চড়ানই চাই। বিদ্যাসাগব মশায অবশ্য কখনও ইজাব পবেন নেই। কিন্তু ডাক্তাব মহেন্দ্রলাল, যিনি সর্ব্বত্র ধূতি প'বে ঘুবতেন, তিনিও টাউন হলেব সভায যেতে হলে একটা চাপকান চোগা প'বে নিতেন। কলেজেব ছেলেদেব বেশভূষাব কথা একটু বলি। নানাবকমেব পিবান, পাঞ্জাবী ও মের্জ্জাই তখনও হয় নেই। আমবা গৃহস্থ ঘবেব ছেলেবা ধূতিব সঙ্গে হয় কামিজ পবতাম, নয় খাটো গলাবন্ধ কোর্ত্তা। তবে গায়ে একটা চাদব সর্ব্বদাই থাকত। পায়ে অধিকাংশ ছেলেই ফিতে বাঁধা কালো জুতো পবত। নাগবা হিন্দুস্থানীদেব একচেটে ছিল। আব মাদ্রাজী চটি মাদ্রাজীদেব। বড়লোকেব মধ্যে বিদ্যাসাগব মশায পবতেন ঠনঠনেব চটি, মহেন্দ্রবাবু পবতেন তালতলা।• আমাদেব চটি প'বে নগব পবিভ্রমণ বেওয়াজ ছিল না। এই ত হল সাধাবণ পোষাক। তবে ধনীলোকেব ছেলেদেব কি সাহেববাড়ীব ছেলেদেব ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। তখন জাতিভেদ প্রবল, আজই সব একাকাব হযে গেছে।

কলেজে উঠে প্রথম বছবে বাবাব হুকুমে জিনেব ইজাব ও গলাবন্ধ কোর্ত্তা প'বে যেতে হত। অনেকেবই এই সাজ ছিল। তাই বিশেষ খাবাপ লাগত না। কিন্তু একদিন এক বিভ্রাট হল। শিযালদহ ষ্টেশনে গেছি ঐ বেশে। গাড়ীব অপেক্ষায প্ল্যাটফর্মে বেড়াচ্ছি, এমন সময এক সাহেব আমায় টিকিটবাবু মনে ক'বে ট্রেণ সম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞেস কবতে লাগলেন। সাহেবকে ত কোন বকমে ভাগালাম, কিন্তু মনে বড় তুঃখ হল। দূব হোক্‌গে, আব কখন প্যাণ্টুলুন পববনা। তাব পবদিন থেকে ধূতি প'বে কলেজে যেতে লাগলাম। মা এতে খুশী হলেন বলেই মনে হল। বাবাব অনুমতি তিনিই আনিযে দিলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল, কিন্তু যখন বি এ পাশ কবলাম তখন তুতিন জোড়া কোট প্যাণ্টুলুন সংগ্রহ কবতে হল। বড় হযেছি, পাঁচ বকম সভাসমিতি জলসায় যেতে হবে ত। সে কোট-প্যাণ্টুলুন সাজও অপরূপ। মাথায় গোল টুপী গায়ে গলাবন্ধ পার্শীকলাব খাটো কোর্ত্তা ও ফতুই। ভেতবে বিলেতী কামিজ, তাব ছাতি

তক্তাব মত শক্ত। ইজাবটা পূবোপূবি ইংবেজী ফেশানেব। আমাব কিন্তু অদৃষ্ট খাবাপ। এত সাধেব সভ্য কাপড পবেও এমন বিপদে পডলাম যে, বিলেত বওযানা হওযা পর্য্যন্ত বাকী কটা দিন ধূতি প'বেই কাটিযে দিতে হযেছিল। ব্যাপাবটা বলি। মিসেস বেসাণ্টেব তখন খুব নাম ডাক। তিনি কলিকাতায় এলেন বক্তৃতা কবতে। টাউন হলে প্রকাণ্ড সভা জমল। আমি আমাব 'মিটিংকা কাপডা' প'বে গিযে একেবাবে সামনেব সাবে জাঁকিযে বসলাম। বক্তৃতা চলল। বক্তা খুব উত্তেজিত হযে উঠেছেন। টাউন হল্ ভবা জনতা একেবাবে নিস্তব্ধ। এমন সময়, হঠাৎ মনে হল বক্তা আমাব দিকে আঙ্গুল দেখিযে খুব জোবে বলছেন, And you there in your English costume, let me tell you, that behind your starched shirt front there beats a Hindu heart!' "আব তুমি বিলেতী সাজে সজ্জিত বাবু, তোমাকে আমি বলি যে তোমাব ঐ বর্ম্মেব মত কঠিন কামিজেব বুকেব ভেতব যে হৃদয় লুকানো আছে সেটা হিন্দুব হৃদয়।"

আশে পাশে সকলেব নজব আমাব উপব পডল। আমাব Hindu heart (হিন্দু-হৃদয) এমন ডুড ডুড ক'বে উঠল যে আমি চুপি চুপি হল্ থেকে বেবিযে বাডী পালালাম।

আবার কলেজেব কথা বলি। আমাদেব বসায়নেব থিয়েটাব ছিল একটা আলাদা একতলা বাডীতে। ঘণ্টা পডলেই, সেইদিকে শ'খানেক ছেলে ঠেলাঠেলি ক'বে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান, আমাদেব একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। ফার্ষ্ট ইযাব ক্লাসে একদিন এই ঘোড়দৌডে আমি ফার্ষ্ট হযে কি গোল বাধিয়েছিলাম শুনুন। থিযেটাবে উঠতে হত পেছনে সরু এক কাঠেব গোল সিঁডি দিযে। আমি সেই সিঁডি বেযে ডুড ডুড় ক'বে যেই উপবে উঠেছি, দেখি যে তখনও সেকেণ্ড ইযাব ক্লাস চলছে। ডাক্তাব বায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেলাস নিচ্ছেন। আমায় দেখেই সেকেণ্ড ইযাবেব একজন ছাত্র দাঁডিয়ে খুব থিযেটাবী ঢঙ্গে হাত নেডে ব'লে উঠলেন, "ভগ্নদূত। কহ শুনি লঙ্কাব সমাচাব।" চাবিদিকে হাসিব বোল উঠল। আমি হুড়মুড ক'বে আমাব পিছনেব ছেলেব ঘাডে পড়লাম। এই ভদ্রলোক পবে একজন পেশাদাব অভিনেতা হযে খুব নাম কিনেছিলেন। অনেক বছব বাদে একবাব 'চোখেব বালি' নাটক দেখতে গিয়ে তাঁকে হঠাৎ 'বিহাবী'ব ভূমিকায় দেখে এই পুবানো গল্প মনে প'ডে গিযেছিল। ফলে প্রায় দশ মিনিট হাসি থামাতে পাবি নেই। সঙ্গীদেব অনেক ক'বে বোঝাতে হযেছিল যে ববিবাবুব 'বিহাবী' চবিত্রে হাস্যাস্পদ কিছু নেই।

ডাক্তাব বাযেব কথা বলতে বলতে মনে হল যে propagandist zeal (প্রচাব কার্য্যে উৎসাহ), সেকালেও তাঁব বড কম ছিলনা। তবে তখনও

তিনি দেশশুদ্ধ লোককে বৈশ্যধর্ম্মে দীক্ষিত কবাব চেষ্টা আবম্ভ কবেন নেই। উৎসাহ বেশী ছিল ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কাবে। বসাযনেব মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে সংস্কাব-বস আবিষ্কাব কবতেন, আব আমাদেব সেই বস বিতবণ কবতেন। দুযেকটা নমুনা দেব। অঙ্গাব (carbon) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবাব সময় আমাদেব শেখালেন "অঙ্গাব-পবমাণুব চাবহাত, তোমাদেব বিষ্ণুব মত।" সাবান তৈবী কবা দেখিযে আমাদেব গ্যালাবীব দিকে ফিবে হাসিমুখে বললেন, "এবই নাম সাবান, সেই মহামূল্য জিনিষ যা মেথবকে ব্রাহ্মণ কবতে পাবে।" আশ্চর্য্য রূপক! তবে হিন্দু ছাত্রেব কেলাসে ব্রাহ্ম অধ্যাপকেব এসব কথা না বলাই বোধ হয সুশোভন হত। আমাদেব কেউ কেউ একথা তাঁব কাছে নিবেদনও কবেছিলেন। আচার্য্যদেব পবম পূজনীয ব্যক্তি। তাঁব সম্বন্ধে এ গল্প কবা হযত অমার্জ্জনীয। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এই দেখান যে হিন্দু আজও যেমন তখনও তেমন, "নিজ বাসভূমে পববাসী।" নইলে, আচার্য্যদেব সেই অল্পবযসেও দানশীল ও উন্নতমনা ছিলেন। কলেজেব বাহিরে, ছাত্র সমাজেব উপব তাঁব অসীম দযা ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজেব প্রথা ছাত্রদেব তৃণজ্ঞান কবা। তিনিও কলেজেব চৌহদ্দিব ভেতব তা ছাডিযে উঠতে পাবেন নেই।

কিছুদিনেব জন্য বুথ সাহেব ব'লে আমাদেব এক বিজ্ঞানেব অধ্যাপক এসেছিলেন। তিনি বিশালকায জোযান ছিলেন ও খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। তবে আমাদেব সঙ্গে কখন খেলেনও নেই, আমাদেব কোনদিন খেলতে শেখানও নেই। তাঁব একটা গল্প মনে হচ্ছে, গল্পটাব সঙ্গে টনী সাহেবেব বাক্য—"monumental liars"-এব কিছু যোগ আছে। একদিন আমাদেব কোন সহপাঠী গ্রন্থাগাবে এক আলমাবীব সামনে দাঁডিয়ে বিজ্ঞানেব বই দেখছিলেন। হঠাৎ বুথ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বন্ধু তাঁকে অভিবাদন কবলেন, কিন্তু সবলেন না। সাহেব তাঁব পেছনে পা ফাঁক ক'বে কলোসাসেব মত খানিকক্ষণ দাঁডিযে বহিলেন, তাবপব বেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডাফ্‌টাবী, ডাফ্‌টাবী, নিকাল দেও।" দপ্তবী আমাদেব নিযমিত বখশিশ-ভুক্ প্রাণী, সে শ্যাম বাখি কুল বাখি ভাবে বন্ধুকে স'বে যেতে মিনতি কবলে। বন্ধু স'বে গেলেন কিন্তু বাহিবে এসে তাঁব ভেতবকাব সুপ্ত সিংহ জেগে উঠল। বড সাহেবেব কাছে দবখাস্ত কবলেন যে তাঁব সম্মানে বিষম ঘা লেগেছে। তখন বড সাহেব ছিলেন সর্ব্বজনপ্রিয গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব। তিনি বুথ সাহেবেব কৈফিযৎ চাইলেন। সাহেব বললেন তিনি বাবুকে কিছুই বলেন নাই, নিকলেব (Nicoll) একখানা বই দপ্তবীব কাছে চেযেছিলেন মাত্র। এ কৈফিযতেব টীকা অনাবশ্যক।

কিছুদিন টনী সাহেবেব কথাগুলি লোকেব মুখে মুখে ফিবত।

একদিন বো সাহেবেব কেলাসে কযেকজন ছাত্র একসঙ্গে দুমদাম ক'বে বই বন্ধ কবাতে সাহেব বিবক্ত হয়ে জিজ্ঞেস কবলেন, 'কে কবেছে?' কেউ যখন কবুল কবলে না, তখন তিনি একগাল হেসে বললেন "Oh! you monumental liars"! এমন মধুব হেসে কথাটা বললেন যে কেউ বাগ কবলে না। আব ভেবে দেখলে, একথা বলতে মেকলে থেকে কার্জ্জন পর্য্যন্ত কোন সাহেবই বা কসুব কবেছেন? এই বো সাহেব ব্যবহাবে বড় অমায়িক ছিলেন। মাঝে মাঝে কেলাসে বাংলা কথাবও বুকনি দিতেন। প্রশ্নেব উত্তব দিতে দেবী হলে সাক্ষীগোপাল, বিধুমুখী ইত্যাদি নানা নাম ধবে ডাকতেন। কেলাসে যে সব হাসি তামাসা কবতেন তা কখনও কখনও আদিবসাশ্রিত হয়ে পডত। এক আধটা উদাহবণ না দিলে হয়ত কেউ বিশ্বাস কববেন না। একদিন কেলাসে জিজ্ঞেস কবলেন যে গ্রীক পুবাণেব Graces ক'জন? উত্তব হল, চাবজন। সাহেব হেসে বললেন, "চতুর্থটিকে হাজিব কবতে পাব? তাঁবা বেশ সাজ কবেন।" ব্যাপাব হচ্ছে এই যে এই গ্রীক্ দেবীবা তিনজন এবং তাঁদেব মূর্ত্তি দিগম্ববী। আব একদিন নানা বকম Knight-দেব কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ মেযেদেব Garter সম্বন্ধে যে বসাল টিপ্পনী কাটলেন তা আমাব পাঠিকাদেব ভযে এখানে ব্যক্ত কবতে পাবলাম না। একদিন এই সাহেব হাসি ঠাট্টাব মাত্রা একটু বেশী চডিযে ফেলেছিলেন; কিন্তু অন্য বকমে। ফলে মুসলমানবা (আমবাও পিছনে ছিলাম) তাঁকে মাপ চাইযে ছেডেছিল। কিন্তু তিনি মাপ চেযেছিলেন যে ভাষায সে অতি অপৰূপ। "আমাব কোন পোষা জন্তুকে আমি যা কিছু নাম দিতে পাবি। তোমবা মূর্খ, ইংবেজী বোঝ না।"

বো সাহেবেব নাম কবলেই ওযেব্ সাহেবেব নাম মনে পডে। এই দুই সাহিত্যবথী, শুধু কলেজ কেন, সমগ্র বাঙ্গলাদেশকে ইংবেজী শেখা-বাব ভাব মাথায ক'বে নিয়েছিলেন। গালাগালও খেয়েছিলেন অনেক। তাঁদেব সে বই আজ ইণ্ডিয়া অফিসেব লাইব্রেবীতে আশ্রয নিযেছে, অন্যত্র আব দেখা যায়না। এ ছাডা ওয়েব্ সাহেব নেটিব লোকদিগকে ইংবেজী আদব কাযদা শেখাবাব মতলবে এক বই লিখেছিলেন। এক সময সবকাবেব সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচাবীব টেবিলেব উপব সে বই দেখা যেত। ওযেব্ সাহেবেব কাছে কখনও পডি নেই কিন্তু তাঁব আদব কায়দা সম্বন্ধে জ্ঞান কি বকম ছিল তাব নমুনা পাঠককে একটা দেব। আমি বছব দুই Dr Atkinson ব'লে এক সাহেবেব কাছে পডতে যেতাম। সাহেব এক বড ইংবেজী কলেজেব কর্ত্তা ছিলেন। আমাব সঙ্গে তিনি এমন সুন্দব ব্যবহাব কবতেন যেন এটা

ভাবত নয, যেন আমি বিলেতেব ছাত্র। একদিন পডাব সময় তিনি বললেন, "আজ আমাদেব চা খাওযা এখানে নয, ওয়েব্ সাহেবেব বাডীতে। তাঁকে চেন ত ?" আমি জানালাম, "চিনি, যে বকম প্রেসিডেন্সী কলেজেব শিক্ষক ছাত্রেব পবিচয় হযে থাকে।" যথাসময় ওয়েব্ সাহেবেব ওখানে চা খেতে গেলাম। সাহেব আমাকে সমস্ত সময়টা Baboo, Baboo, ক'বে কথা কইতে লাগলেন, এবং জিজ্ঞাসা কবলেন যে আমাব ভাত ও নেটিব তবকাবীব অভাবে চা খাওযাব কষ্ট হচ্ছে না ত ? আমাব তখন সব কথা বোঝবাব হযত ক্ষমতা ছিলনা, কিন্তু Dr Atkinson নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কেননা তিনি বেবিয়ে যাবাব সময আমায বললেন, "I am sorry I brought you here lad" (তোমাকে এখানে না আনলেই ভাল হত)। নিজেব কলেজেব নিন্দা আব কত কবব ? এম এ কেলাসে অবস্থাব অনেক উন্নতি হল। হতে পাবে আমবা বড় হযেছি ব'লে, হতে পাবে হাওয়া বদলাচ্ছিল ব'লে। নিন্দা ত অনেক কবলাম, কিন্তু দুজন অধ্যাপক যাঁবা অন্ততঃ আমাব আন্তবিক শ্রদ্ধাব পাত্র ছিলেন তাঁদেবও নাম কবব, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও অধ্যাপক পেড্লাব। যতদূব মনে আছে এই দুজনকে সকলেই ভালবাসত। প্রেসিডেন্সী কলেজেব দমবন্ধ কবা হাওয়ায় না থাকতে হলে এঁদেব গুণ আবও ফুটে বেবোত।

আমাদেব কলেজেব সভাসমিতি ও খেলাব ক্লাবেব কথা পবে বলব। আমাদেব সময়েই এখনকাব Institute, Higher Training Society নাম দিয়ে আবম্ভ হল। তাব প্রথম পাণ্ডা ছিলেন আমাদেব অধ্যাপক উইলসন। আমাব নিজেব ঘটনাচক্রে higher training (উচ্চশিক্ষা) হলনা। সোসাইটীব ঘরে তাস খেলা সঙ্গত কিনা এই নিযে সাহেবেব সঙ্গে মতভেদ হওয়ায আমাদেব সোসাইটী ত্যাগ ক'বে অন্যত্র তাসেব আড্ডা জমাতে হল। এই তাসেব আড্ডাব মেম্বাব কেউ কেউ এখন ভাবতেব ভাগ্যবিধাতাব মধ্যে গণ্য। তাঁদেব নাম কবলে বসভঙ্গ হবে।

এই সমযেই কলেজেব Speech Day (বাৎসবিক উৎসব) সুরু হল। সেই উপলক্ষে Julius Cœsar-এব হত্যাকাণ্ড ও Merchant of Venice-এব আদালতেব দৃশ্য অভিনয হল। আমাদেব উইলসন সাহেব ও Oxford Mission-এব ডগলাস সাহেব আমাদেব শিক্ষক ছিলেন। অভিনয ভালই হল, অন্ততঃ লাটসাহেব এলিযট তাই ব'লে গেলেন। একটা মজাব কথা কেবল মনে হয, যে সেদিন Cœsar-কে যাঁবা খুন কবলেন তাঁবা অনেকেই আজ নিজেবা উচ্চ মসনদে অধিষ্ঠিত।

আব যিনি Portia হযেছিলেন তিনি আদালতকে বহুদূবে ঠেলে বেখে আজ সবকাবেব আবকাবী মালেব হেপাজৎ কবছেন। একমাত্র Antony তাঁব থিযেটাবেব পার্ট কাযেম বেখেছেন। প্রিয়দর্শন Brutus-কে খুনে আসামী সেজে যা দেখিযেছিল জজ্ সেজে তাব চেয়ে অনেক ভাল দেখায।

এলিয়ট সাহেবেব নাম কবতে মনে পড়ে গেল যে তিনি এক সময় বাংঙ্গলাদেশে ধূম ধড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রদেশ থেকে জুবীব বিচাব তুলে দেওযাব জন্য কোমব বেঁধে লেগে গেলেন। কিন্তু এমন হৈ চৈ উঠল, যে কিছু ক'বে উঠতে পাবলেন না। এই সিভিলিযান লাট সাহেব শুধু যে দেশী লোকদেব উত্যক্ত কবেছিলেন তা নয, ইংবেজ বড় হাকীমদেবও প্রাণ অতিষ্ঠ ক'বে তুলেছিলেন। এক গল্প আছে যে একবাব তিনি ষ্টীমাবে সফবে বেবিযে, ষ্টীমাব খুব দূবে নোঙ্গব ক'বে ডিঙ্গী বেযে পাবনাব সদবে উপস্থিত হলেন, আব সোজা স্থানীয় হাকীমদেব কাছাবীতে চ'লে গেলেন। বড় হাকীম তখনও আসেন নেই, যদিও ১১টা বেজে গেছে। লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে এনে খুব ধমকে দিলেন, মাষ্টাব যেমন ইস্কুলেব ছেলেকে ধমকায। কখন কাকে অপদস্থ হতে হবে এই ভয়ে কিছুদিন হাকীমবর্গ সন্ত্রস্ত থাকতেন।

একবাব এলিয়ট সাহেব কুচবেহাঁবে এসেছিলেন। দেশী বাজ্যে লাটেবা যান প্রধানতঃ শিকাব ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপাবেব জন্য। কিন্তু এই সময মহাবাজেব নিজের ও বাজ্যেব অনেক খবচ বেড়ে গিযেছিল ব'লে কিঞ্চিৎ ধমকে দেওযাও বোধ হয এলিয়ট সাহেবেব উদ্দেশ্য ছিল। এই সাহেবেব বাঁধা বুলি ছিল, "আমি জাঁকজমক আড়ম্বব দেখতে পাবি না, আমি চাই কাজ।" এঁব গুণাগুণ সম্বন্ধে বাবা সবই শুনেছিলেন আগে, প্রধানতঃ সেক্রেটাবী মহল থেকে। তাই তিনি মহাবাজেব সঙ্গে পবামর্শ ক'বে ঠিক ক'বে বেখেছিলেন যে দেখাবেন, কুচবেহাবেও তাঁবা efficiency-ব উপাসক—কাজেব লোক। স্থিব হল মহাবাজ ষ্টেট-কর্ম্মচাবীদেব নিয়ে বাজবাড়ীতেই লাট সাহেবকে স্বাগত কববেন। আব বাবা তাঁকে অভ্যর্থনা কববেন ১২ কোশ দূবে যেখানে সীমান্তে রেল থামে। যথা সময় ট্রেণ এল। ষ্টেশনে বাবা একজন মাত্র চাপবাসী নিয়ে উপস্থিত। স্বযং খাকী চাপকান প'বে আব এক সাদা ছাতা বগলে, আব চাপবাসীব উর্দ্দী এক আধময়লা পট্টুব কোট ও ধুতিব উপব পট্টী। লাট সাহেব অযথা জাঁকজমকেব জন্য না ধমকাতে পেয়ে বোধ হয় একটু নিবাশ হলেন। তখন প্রায় দশটা। বাহিবে দুই হাতী তৈযাব ছিল। বাবা সাহেবকে অভিবাদনাদি ক'বে বললেন

যে তিনি যদি শ্রান্ত না হযে গিয়ে থাকেন ত ধবলা নদীব চব দেখিযে নিয়ে যাবেন, যেখানে যেখানে দুই বাজ্যেব সীমানা নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। সাহেব তাব অদম্য উৎসাহ নিযে সব চবগুলো দেখে বাবোটাব সময় ওপাবে ডাকবাঙ্গলায পৌছলেন। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন হল। আড়ম্বব কিছু ছিল না। একজন মাত্র খানসামা খাবাব পবিবেশন কবলে। তাবপব বাবা একটু siesta মধ্যাহ্ন বিশ্রামেব কথা তোলাতে সাহেব বললেন, "না, ও সব আলস্য আমাব নেই। চলুন, বেবিযে পড়া যাক।" বাবা বললেন, "যদি আপত্তি না থাকে ত পথে আপনাকে চওডাহাট বন্দব দেখিযে নিয়ে যাব, যেখানে বেলী, আপকাব, এদেব বড বড পাটেব আড়ৎ আছে।" লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ বাজী হলেন।

চওডাহাট ইত্যাদি দেখে যখন বাজধানীব প্রান্তে পৌছলেন তখন চাবটে বেজে গেছে। সেখানে তোবসা নদীর পাবঘাটে জঙ্গী ও পুলিশ কর্ত্তাবা সাহেব বাহাদুবকে সেলামী দিলেন। তাঁদেব সঙ্গে এসেছেন বালক বাজকুমাব ও একজন A.D.C. (মহাবাজেব পার্শ্বচব)। আবাব দেওযানজী জিজ্ঞাসা কবলেন যে হুজুব সোজা বাজবাড়ী যাবেন, না পথে সেপাইদেব ও সওযাবদেব লাইন (Lines) দেখে যাবেন। সাহেবের কার্য্যপিপাসা তখনও নিবৃত্ত হয নেই। বললেন যে পথে যা দ্রষ্টব্য আছে দেখে যাবেন। কাজ শেষ ক'বে পাঁচটায় বাজবাড়ী পৌছলেন। নেমেই মহাবাজকে বললেন, "আপনাব বাজ্যেব চমৎকাব বন্দোবস্ত। সর্ব্বত্র নিয়মিত কাজকর্ম্মেব হাওযা।" মহাবাজ জানতেন, একটু হাসলেন। যা দুতিন দিন এলিযট সাহেব কুচবেহাবে বইলেন সেই একইভাবে এঁবা তাঁকে ঘোবালেন। ধূমধামও নিতান্ত মামুলী বকমেব বেশী হল না। সাহেব এত আনন্দে সময় কাটালেন যে খবচ পত্রেব জন্য টীকা টিপ্পনী কিছু আব কবলেন না। ফেববাব আগে সাহেবেব একজন কর্ম্মচাবী মহাবাজকে ব'লে এল, "আপনাব দেওয়ানেব এলিযটেব চেযেও বেশী এলিযটী চাল।" সেবাব দার্জ্জিলিঙ্গে একাধিক সিভিলিযান মহাবাজকে খুব তাবিফ কবেছিলেন এই ব'লে যে "তোমবা দেশী বাজ্যে জান কাকে কি বকমে জব্দ কবতে হয।" এলিযট সাহেব নিজে দার্জ্জিলিঙ্গে বাবাকে ডেকে বললেন যে নূতন বছবে তাঁকে বাজা খেতাব দেবেন। বাবা নিজেব দাবিদ্র্য উল্লেখ ক'বে কোন বকমে পাব পেলেন। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকেব কুমাব বাহাদুব হওযা এই বকম ক'বে ফস্‌কাল।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

মুক্তের অবস্থা

গত বারের 'পরিচয়ে' মোক্ষের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, মোক্ষ মননের বচনের বর্ণনের অতীত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯
'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্য মন হটিয়া আইসে।'

পুনশ্চ, মোক্ষ 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত, অনিলয়ন'—কেন না, 'Nirvana is the land of silence and non-being' (*Voice of the Silence*). অতএব মোক্ষ 'অস্তি-নাস্তি'র অতীত অবস্থা। যিনি নির্ব্বাণী, তিনি 'is nó-where and everywhere.'

নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং
ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনং নত্থি।* —মজ্ঝিমনিকায

যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সমুদ্রের মতই অগাধ, অনন্ত, অপ্রমেয়। সেইজন্য একজন অভিজ্ঞ লেখক মোক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

To reach Nirvana is to pass beyond humanity and to gain a level of peace and bliss far above earthly comprehension (Man, Visible and Invisible)

মোক্ষ = ভূমানন্দ

মোক্ষ সম্বন্ধে উহাই সার কথা—a level of peace and bliss, এমন স্বস্তি ও শান্তি, যাহা মনুষ্যধারণার বহু ঊর্দ্ধে। সেইজন্য মুক্তিকে পরা শান্তি এবং পরম আনন্দ বলা হয়।

ঐ আনন্দের দিক্ হইতে গীতা ইহাকে 'অত্যন্ত সুখ' বলিয়াছেন—ঐ সুখ 'ব্রহ্মসংস্পর্শ'-জনিত।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে—গীতা, ৬।২৮

অন্যত্র গীতা মুক্তের (ব্রহ্মযোগ-যুক্তের) সুখকে 'অক্ষয়' সুখ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষযম্ অশ্নুতে—গীতা, ৫।২১

উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমা' বা 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' (বৃহ, ২।১।১৯) (acme of bliss) বলা হইয়াছে।

---

*I am not anywhere whatsoever, to any one whatsoever, in anything whatsoever, neither is anything whatsoever mine, anywhere whatsoever, in anything whatsoever —Majjhim Nikaya, II, 263

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি—মুণ্ডক, ২।২।৭
যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং × × যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্—ছান্দোগ্য, ৭।২০।১-২

অর্থাৎ মোক্ষ বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি ভূমানন্দেব অবস্থা। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এই ভূমানন্দেব কথঞ্চিৎ পবিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—মনুষ্যেব মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধিমান্, সকলেব অধিপতি, সর্ব্ববিধ মনুষ্য-ভোগেব অধিকাবী—ঐ ব্যক্তিব যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যলোকেব চবম আনন্দ।

স যো মনুষ্যাণাং বাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্ব্বৈ র্মানুষ্যকৈ র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যানাং পবম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পিতৃলোকেব যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ আনন্দেব শতগুণ; গন্ধর্ব্ব-লোকেব যে আনন্দ, পিতৃলোকেব আনন্দেব তাহা শতগুণ, দেবলোকে কর্ম্মদেবগণেব যে আনন্দ, গন্ধর্ব্বলোকেব আনন্দেব তাহা শত গুণ এবং আজানদেবগণেব যে আনন্দ, কর্ম্মদেবগণেব আনন্দেব তাহা আবাব শতগুণ; প্রজাপতি লোকেব যে আনন্দ, আজানদেবগণেব আনন্দেব তাহা শতগুণ; কিন্তু ব্রহ্মালোকেব যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতি লোকেব আনন্দ তাহাব শতাংশেব একাংশ মাত্র— .

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ।

ইহাই চবম আনন্দ, পবম আনন্দ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহাব ঐ পবিমাণ আনন্দ—

যশ্চ শ্রোত্রিযোঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পবম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ নির্ব্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষেব আনন্দেব মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দেব দশলক্ষকোটি গুণ (billion times)। তৈত্তিবীয়-উপনিষদ্ ইহাব উপব কযেক গ্রাম চডাইয়া বলিয়াছেন—

যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যাযকঃ আশিষ্ঠো দ্রঢিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ—২।৮

'যুবা যদি সাধু হন, অধ্যাযক হন, আশিষ্ঠ দ্রঢিষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ব্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহাব কবতলগত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দেব চবম।'

ব্রহ্মেব যে আনন্দ সে আনন্দ ঐ মনুষ্য-আনন্দেব ১০০০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০ গুণ অর্থাৎ one hundred trillion times। অকামহত শ্রোত্রিযেব অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবন্মুক্তেব আনন্দ ঐরূপই—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিযস্য চাকামহতস্য—তৈত্তি ২।৮

একরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির আনন্দ মনুষ্য-মানের অতীত। সেইজন্যই ইহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরাও নির্ব্বাণের প্রসঙ্গে বলেন—Bliss is Nibbana, Bliss is Nibbana (অঙ্গুত্তর-নিকায়)। ইহা শারিপুত্রের মুখের কথা। বুদ্ধদেবের নিজের বাণী আরও উদাত্ত। তিনি বলেন, মুক্ত পুরুষ পীতিসুখং অধিগচ্ছতি, অঞ্‌ঞং চা ততো সন্ততরং (মজ্ঝিম নিকায) অর্থাৎ নির্ব্বাণ কেবল সুখ নহে, উহা সুখোত্তর দশা। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—আনন্দং নন্দনাতীতম্। অন্যত্র বুদ্ধদেব পোট্ঠপাদকে বলিয়াছিলেন—

'Rather will all that I have mentioned happen, and then only joy, pleasure, quietude, earnest reflection, complete consciousness and *bliss* ensue'——দীঘনিকায IX।

এই আনন্দ যে পরম সুখ * (highest bliss), ধম্মপদে তাহার বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ—

নিব্বাণং পরমং সুখং—সুখবগ্‌গো, ৮
পস্‌সে চ বিপুলং সুখং—পকিণ্ণক বগ্‌গো, ১

মুক্তি = পরা শান্তি

মুক্তি শুধু পরম আনন্দ নহে—মুক্তি পরা শান্তি—

'that peace that passes understanding'—'an inward peace that can never be shaken, a joy that can never be ruffled' (Rhys Davids, p. 166).

তম্ আত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্—কঠ, ৫।১৩

'সেই ব্রহ্মকে যে ধীর ব্যক্তি আত্মার মধ্যে অনুভব করেন, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি—অপরের নহে।'

ইহাই প্রকৃত জ্ঞান—যাহার ফলে অচিরে পরা শান্তি।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি—গীতা, ৪।৩৯

---

* এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাইস ডেভিড্স্ (Professor Rhys Davids) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

One might fill pages with the awestruck and ecstatic praise lavished in the writings of the early Buddhists upon the glorious *bliss* and peace of the mental condition it (Nirvana) involved They had endless love-names for it —Lectures on Buddhism, pp 150-151

গীতায ভগবান্ ইহাকে 'শান্তিং নির্ব্বাণপবমাং' বলিযাছেন (৬।১৫)। হংস-উপনিষদেব বর্ণনায যিনি মুক্ত, তিনি 'স্বযং-জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিবঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশতে'—মুক্ত 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ (self-illuminated), শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিবঞ্জন (stainless) ও শান্ত।' বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণেব পবা শান্তি লক্ষ্য কবিযা, ইহাব নাম দেওয়া হইয়াছে—

'Blissful tranquility' 'stainless bliss of eternal peace' 'absolute peace' 'eternal peace' 'eternal rest, eternal stillness, the great peace'—(The Doctrine of the Buddha, pp 350 & 356)

মুক্ত পুরুষ যে শাশ্বত শান্তিব অধিকাবী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। অশান্তিব নিদান কি ? কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা। নির্ব্বাণ দশায যখন—যত্র কামাঃ পবাগতাঃ, সমস্ত কামনা তিবোহিত হয, সমস্ত বাসনা উন্মূলিত হয় (ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীযন্তি কামাঃ—মুণ্ডক, ৩।২।২) সমস্ত তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয় (মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষযঃ—মুক্তিক, ২।৬৮)—তখন নির্ব্বাণীব অশান্তি আসিবে কোথা হইতে ? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুক্ত পুরুষকে 'শ্রোত্রিয, অকাম-হত' বলিলেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম' এই বিশেষণ-চতুষ্টযে বিশেষিত কবিলেন (বৃহ, ৪।৪।৬) এবং বলিলেন তিনি ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। ইহাকেই বলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। এই ব্রহ্মভূতকে লক্ষ্য কবিয়া গীতা বলিযাছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—১৮।৫৪

ব্রহ্মভূত পুরুষ কেবল প্রশান্ত নহেন, তিনি কামেব ও শোকেব অতীত।

যাজ্ঞবল্ক্যেরও ঐ কথা—

তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদযস্য ভবতি—বৃহ, ৪।৩।২২
অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ, হৃদযেব সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

অন্যান্য উপনিষদেবও ঐ কথা—

তবতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য, ৭।১।৩
তবতি শোকং তবতি পাপ্মানং—মুণ্ডক, ৩।২।৯
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীবো ন শোচতি—কঠ, ২।২২

'সেই মহতো মহীয়ান্ (বিভু) পবমাত্মাকে মনন কবিযা ধীব ব্যক্তি শোকেব অতীত হন।'

এই জন্যই মোক্ষশাস্ত্রে তৃষ্ণাক্ষয়েব এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাসভাষ্যে একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহাব মর্ম্ম এই যে, ইহলোকে যে কামসুখ এবং দিব্যলোকে যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয-সুখেব তাহাবা ১৬ ভাগেব এক ভাগও নহে।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়ষীং কলাম্॥

বুদ্ধদেবও মনোজ্ঞ ভাষায় তন্হা-বিজয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সর্ব্বসঙ্খারসমথে সব্বুপধিপটিনিস্সগ্গো তন্হক্খয়ো বিরাগো নিব্বাণংতি—মজ্ঝিমনিকায়

অর্থাৎ 'This is the peaceful, this is the exalted the coming to rest of all organic processes,' the becoming free from all *Upadhis*, the drying up of thirst, the unattractiveness, Niroda, Nibbana.'

'In him who dwells in the insight into the transitoriness of all the fetters of existence, thirst (তন্হা) is annihilated, through the annihilation of thirst, উপাদান (grasping) is annihilated, through the annihilation of grasping, ভব (becoming) is annihilated, through the annihilation of becoming, জাতি (birth) is annihilated, through the annihilation of birth, old age, sickness, death, pain, lamentation, suffering, sorrow and despair are annihilated'

অশান্তির আর একটি কারণ—স্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃত—এক কথায় কর্ম্মবিপাক, যাহার ফলে সুখ দুঃখ, 'হ্লাদ পরিতাপ'।

তে হ্লাদ পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ—যোগসূত্র, ২।১৪

মুক্তপুরুষ কিন্তু বিসুকৃত, বিদুষ্কৃত—

বিসুকৃতঃ বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্—কৌষী, ১।৪

তিনি পুণ্যপাপ-প্রহীন (ধম্মপদ, চিত্ত বগ্গো, ৭)

তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম অবসিত—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক, ২।২।৮

অতএব পাপ ও পুণ্য, কৃত ও অকৃত তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

এতং হ বা ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্ কিমহং পাপম্ অকরবম্ ইতি স য এবং বিদ্বান্—তৈত্তি, ২।৮

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী—তাঁহাকে 'কেন আমি পুণ্য করিলাম না—কেন আমি পাপ করিলাম'—এ চিন্তা কখনও তাপিত করে না।' কারণ তিনি

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই—

এবম্ উ হৈব এতে ন তরতঃ। ইত্যতঃ পাপং অকরবম্ ইত্যতঃ কল্যাণম্ অকরবম্ ইত্যুভে উ হৈব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ × × আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।২২-৩

'ইঁহাকে 'কি আমি পাপ করিয়াছি, কি আমি পুণ্য করিয়াছি' এ চিন্তা পীড়িত করে না। এ উভয় চিন্তাই তিনি অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না। × × যিনি আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি 'আত্মরতি, আত্মক্রীড' (মুণ্ডক ৩।১।৪)—পাপ তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন; পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।'

ব্রাহ্মণ কে? ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহার চর্য্যা কিরূপ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩।৫।১)—'By living as chance may determine' অর্থাৎ যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টঃ (গীতা)।*

এই ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিয়াছেন

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ন কনীয়ান্
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন।

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম্ম দ্বারা অপচিত বা উপচিত হন না। ব্রহ্মের পদ (তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন কেন?'

ইহাকেই বলে, সঞ্চিতের বিনাশ—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—গীতা, ৪।৩৭

বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যদ্ ইহ বা অপি বহ্বিব অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্ব্বম্ এব তৎ সংদহতি, এবং হৈব এবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমৃতঃ সংভবতি—বৃহ, ৫।১৪।৮

'যদি বহু কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি সে সমুদায়ই দগ্ধ করে। সেইরূপ এই প্রকার বিজ্ঞানী ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন তথাপি তিনি সে সমস্ত বিনাশ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর অমর হয়েন।'

---

* বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের ঐরূপই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন
আয়ন্তীং নাভিনন্দতি পথামন্তীং ন শোচতি।
সংজাসংগামজিং মুত্তং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥—উদান, ১।৮

The coming does not make him glad,
The going does not make him sad,
The monk, from longing all released
Him do I call a Brahmana

ছান্দোগ্যেব এ সম্বন্ধে উক্তি এই—

তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূযেত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—৫।২৪।৩

'যেমন ঈষিকা বৃক্ষেব তুলা (fibre), অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয, তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞানীব সমস্ত পাপ প্রদগ্ধ হয।

ইহাব সহিত ধম্মপদেব নিম্নোক্তি তুলনীয ঃ—

মাতবং পিতবং হন্ত্বা বাজানো দ্বে চ খত্তিযে।
বট্‌ঠং সানুচবং হন্ত্বা অনিঘো যাতি বাহ্মণো॥
—ধম্মপদ, পকিণ্ণক বগ্‌গো, ৫

ব্রহ্মজ্ঞেব পক্ষে শুধু সঞ্চিতেব বিনাশ হয না—ক্রিয়মান কর্ম্মেবও 'অশ্লেষ' হয।

তদ্ যথা পুষ্কবপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে—ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩ *

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ কবে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম্ম স্পর্শ কবে না।' ইহাকেই গীতা 'পদ্মপত্র মিবাম্ভসা' বলিযাছেন।

ঈশ-উপনিষদ্ সেইজন্য বলিলেন—

এবং ত্বযি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নবে—২

অর্থাৎ এইরূপ হইলে, (ক্রিয়মান) কর্ম্মেব আব সংশ্লেষ হয় না। বাদবায়ণ মুক্ত পুরুষেব কর্ম্মসম্পর্কে এই 'অশ্লেষ-বিনাশ' লক্ষ্য কবিয়া সূত্র কবিয়াছেন—

তদধিগমে উত্তব-পূর্ব্বাঘযোঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ ব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১৩

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞেব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মবাশি বিনষ্ট হইযা যায় এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্ম (যাহা সাধাবণতঃ বন্ধেব কাবণ) বন্ধেব হেতু হয না।

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণেব (ব্রহ্মজ্ঞেব) একটি বিশেষণ দিলেন 'বিচিকিৎস'। বিচিকিৎসাব অর্থ সংশয় (doubt)। ইহাও অশান্তিব অন্যতম কাবণ। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহাব সমস্ত সংশয তিবোহিত হয, কাবণ তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকাব কবেন, সত্যেব তাঁহাব অপবোক্ষ অনুভূতি হয়—পাশ্চাত্যেবা

* ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয

'Just as, O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water just so, Brahmin, I am born within the world, but I have vanquished the world and unspotted by the world I remain —অঙ্গুত্তব নিকায II

ইহার পালি মূল এই ঃ—সেয্যথাপি ব্রাহ্মণ। উপ্পলং বা পদুমং বা পুণ্ডরীকং বা উদকে জাতং উদকে সংবট্‌ঠং উদকং অচ্চুগ্‌গম্ম ঠাতি অনুপলিত্তং উদকেন, এবমেব খো অহং ব্রাহ্মণ। লোকে জাতো লোকে সংবট্‌ঠো লোকং অভিভুয্য বিহরামি অনুপলিত্তো লোকেন।

যাহাকে temperamental reaction to the vision of reality বলিতেছেন। অতএব—

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ—মুণ্ডক, ২।২।৬

ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—ইতি যস্য স্যাৎ, অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি (৩।১৪।৪)—'যাঁহার এই অবস্থা, তাঁহার কখনও সংশয় হয় না অর্থাৎ 'The illusion, when once it has been penetrated can no longer delude'

তাঁহার অবস্থা বর্ণন করিয়া ছান্দোগ্য আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসংভেদায। নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপমানোঽতো নিবর্ত্তন্তে—অপহতপাপ্‌মা এষ ব্রহ্মলোকঃ।

তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি।—ছান্দোগ্য, ৮।৪।১-২

'যিনি পরমাত্মা, তিনি সেতু—এই সমস্ত লোকের বিভাজক ধারক সেতু। ঐ সেতুকে দিবারাত্রি, জরা মৃত্যু, শোক, সুকৃত দুষ্কৃত, উত্তরণ করিতে পারে না।

অতএব যিনি এই সেতু উত্তীর্ণ হন, তিনি যেন অন্ধ ছিলেন চক্ষুষ্মান্ হন, ক্ষত ছিলেন অক্ষত হন, রোগী ছিলেন অরোগী হন।'

ইহার সহিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্তি তুলনীয়ঃ—

এবমেব খো মহারাজ! ভিক্‌খু যথা ইণং যথা রোগং যথা বন্ধনাগারং যথা দাসব্যং যথা কন্তরদ্ধানমগ্‌গং ইমে পঞ্চ নীবরণে অপ্পহীণে অত্তং সমনুপস্সতি, সেয্যথাপি মহারাজ। যথা আনণ্যং যথা আরোগ্যং যথা বন্ধনা মোক্‌খং যথা ভুজিসং যথা খেমন্ত ভূমিং এবমেব খো মহারাজ। ইমে পঞ্চ নীবরণে পহীণে অত্তং সমনুপস্সতি—দীঘনিকায়

'Even thus, O king, as a debt, as an illness, as imprisonment, as thraldom, as a desert journey, does the monk regard these Five Impediments, while as yet they are not banished from within him But, like a cancelled debt, like recovery from illness, like release from prison, like being a freed man, like safe soil—even so does the monk regard the banishing of these Five Impediments from within him'—Digha Nikaya, II

যিনি নির্ব্বাণের তোরণে উপনীত হইয়াছেন, বুদ্ধদেব অন্যত্র তাঁহার অবস্থা (attitude) এই ভাবে বর্ণন করিযাছেনঃ—

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। দুক্‌খং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। অদুক্‌খং অসুখং চে বেদনং বেদেতি, সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতাতি পজানাতি।

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি ; সো দুক্খং চে বেদনং বেদেতি, বিসংযুত্তো নং বেদেতি : সো অদুক্খং অসুখং চ বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি ।—মজ্ঝিমনিকায, ৩

'তিনি যদি সুখকর বেদন (sensation) অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত (unappropriated), ইহা অনভিনন্দিত'। যদি দুঃখকর বেদন অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয— 'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'। যদি অদুঃখ-অসুখকর বেদন অনুভব করেন, তবেও তাঁহার বোধ হয—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত'। তাঁহার অনুভব সুখকর হ'ক, দুঃখকর হ'ক, অদুঃখ-অসুখকর হ'ক, তিনি 'বিসংযুক্ত' (উদাসীন) ভাবে তাহা ভোগ করেন।'

গীতার সেই প্রাচীন কথা—উদাসীনবদ্ আসীনং × × অসক্তং তেষু কর্ম্মসু।

বুদ্ধদেবও ঐ মর্ম্মে আনন্দকে বলিয়াছেন—

পটিখুলং চ অপটিখুলং চ তদ্উভবং অভিনিবজ্জেত্বা উপেখকো বিহরেয্যং সতো সংপজনো তি উপেখকো তত্থ বিহরতি সতো সংপজানো এবং খো আনন্দ অরিয়ো হোতি ভাবিতেন্দ্রিযো—মজ্ঝিমনিকায, ৩

অর্থাৎ প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল (Repugnant and unrepugnant)—উভয়কেই বর্জ্জন করিয়া উপেক্ষক (উদাসীন ভাবে=with equal mind) বিচরণ করিতে হইবে—সৎ ও সম্প্রজান (thoughtful and clearly conscious) হইয়া। হে আনন্দ। যিনি 'অরিয' (আর্য্য=saint) তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপই বশীকৃত।

এই যে 'Equal Mind,' গীতা ইহাকেই 'সমত্ব' বলিয়াছেন—সমত্বংযোগ উচ্যতে। এই অবস্থার নাম দ্বন্দ্বাতীত হওয়া—

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ—গীতা, ৪।২২

সেই অবস্থায় নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদ্ আসীনং গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥—গীতা, ১৪।২২-৩

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত'-বির্নিমুক্তি—ইহা 'অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণম্,' নির্ব্বাণের সমীপস্থ দশা—

পক্ষপাত বির্নিমুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা—ব্রহ্মবিন্দু, ৬

বুদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

যে মে দুক্খং উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দেন্যো কোপিন বিজ্জতি॥

সুখদুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বত্থ সমকো হোমি এসা মে উপেক্খাপবং॥
—চর্য্যাপিটক, ৩

'যাহাবা আমাকে দুঃখ দেয এবং যাহাবা আমাকে সুখ দেয, তাহাবা সকলেই আমাব পক্ষে সমান—তাহাদেব সম্পর্কে আমাব বাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ আমাব নিকট তুল্য মূল্য - যশঃ ও অযশঃ। সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমাব চবম উপেক্ষা (Perfection of my equanimity)।

সেই গীতাব কথা—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিযং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিববুদ্ধি বসংমূঢো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥—৫।২০

'যিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মেস্থিত—তিনি স্থিববুদ্ধি, মোহহীন—প্রিয-প্রাপ্তিতে তাঁহাব প্রহর্ষ নাই, অপ্রিয-প্রাপ্তিতে তাঁহাব উদ্বেগ নাই।'

ইহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা—যাজ্ঞবল্ক্যেব অভিমত 'ব্রাহ্মণে'ব অনুষ্ঠেয়—যে ব্রাহ্মণ 'শ্রোত্রিয, অবৃজিন, অকামহত'।

তমেব ধীবো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ—বৃহ, ৪।৪।২১

কাবণ, এইরূপ 'প্রাজ্ঞ' ব্রাহ্মণই—শান্ত দান্ত উপবত তিতিক্ষু সমাহিত হইযা আত্মাব অভ্যন্তবে পবমাত্মাকে দর্শন কবেন।

তস্মাদ্ এবংবিৎ শান্তো দান্তঃ উপবতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি, সর্ব্বম্ আত্মানং পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।২৩

সন্ন্যাস-উপনিষৎ-সমূহে এ অবস্থাব সবিশেষ বর্ণনা আছে।

ব্রহ্ম-উপনিষদ্ বলেন 'তাঁহাবই ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ, যাঁহাব জ্ঞানময়ী শিখা, যাঁহাব জ্ঞানময় উপবীত।'

শিখা জ্ঞানমযী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

এইরূপ ব্রাহ্মণেব লক্ষ্য—পবম পদে প্রবেশ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য।
গুহাং প্রবেষ্টু মিচ্ছামি পবং পদম্ অনাময়ম্।

এইরূপ ব্রাহ্মণ পবম-হংস-পদারূঢ।

'তিনি শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বেব অতীত। ক্ষুৎপিপাসা, শোক মোহ ও জবামৃত্যুরূপ সংসাব-সমুদ্রেব ছযটি উর্ম্মি তাঁহাকে স্পর্শ কবে না। তিনি নিন্দাগর্ব্ব হিংসাদম্ভদর্প ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহ হর্ষ অসূয়া অহংকাবাদি বর্জন কবিয়া, (দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম পূর্ব্বক) নিজ শবীবকে শবদেহ জ্ঞান কবেন।'

ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানে চ ষড়ূর্ম্মিবর্জ্জং নিন্দাগর্ব্বমৎসরদম্ভদর্পেচ্ছাদ্বেষ সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে—পরমহংস, ২

'তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করেন ?' ইহার উত্তরে আরুণেয়ী-উপনিষদ্ বলিয়াছেন ঃ—

ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসাং চ অপরিগ্রহং চ সত্যং চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত—৩

'হে সন্ন্যাসী ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা অপরিগ্রহ ও সত্য সযত্নে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

সঙ্গে সঙ্গে কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প হিংসা মমত্ব অহংকার অসত্য সর্ব্বথা বর্জ্জন কর।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারানৃতাদীন্ অপি ত্যজেৎ —আরুণেয়ী, ৪

সন্ন্যাসী কিরূপ আচরণ করিবেন ?

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ সুখে ন স্পৃহা ত্যাগো রাগে, সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োঃ অনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন মোদতে—পরমহংস ৪

'দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, কাম্যবস্তুতে কামনাহীন সর্ব্বত্র শুভাশুভে স্নেহহীন—সন্ন্যাসী দ্বেষরাগ-বর্জ্জিত।'

তিনি নিন্দা স্তুতির অতীত—

স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্—সন্ন্যাস ৪

তাঁহার সম্পর্কে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিতেছেন ঃ—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারাদীন্ বিতীর্য্য মানাপমানৌ নিন্দাস্তুতী চ বর্জ্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবং বিদ্বাংস ইহৈব অমৃতা ভবন্তি—১৮

সন্ন্যাসী 'কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প ঈর্ষা মমতা অহংকার প্রভৃতি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মান-অপমান নিন্দা-স্তুতি বর্জ্জন করিয়া তরুর মত (সহিষ্ণু হইয়া) অবস্থান করিবেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহিবেন না। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি এখানেই অমৃতত্ব লাভ করেন।"

তখন তাঁহার স্থিতি কিরূপ হয় ?

সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গতিঃ উপরমতে য আত্মনি এব অবস্থীয়তে যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্ ব্রহ্মাহমস্মি ইতি কৃতকৃত্যো ভবতি কৃতকৃত্যো ভবতি—পরমহংস উপনিষদ্।

'মনঃস্থিত সমস্ত কামনা ব্যাবৃত্ত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়। যিনি আত্মাতে অবস্থিত হন, তিনি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোঽহং ভাব প্রত্যক্ষ করতঃ কৃতকৃত্য হন—কৃতকৃত্য হন।'

এইবার চরমপন্থী পরিব্রাজক পরমধামে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁহার জন্য 'বৈতরণী'র ঘাটে ওঁকার-নৌকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, (ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা—মৈত্রী ৬।২৮), তিনি ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে ভবপারে চলিয়া যান—

ওঁকাররথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাথ সারথিম্।
ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রারাধন তৎপরঃ॥—অমৃতনাদ ২

যিনি এই অবস্থায় উপনীত হন, তিনি বুদ্ধদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্ম চরিযং; কতং করণীযং নাপরং ইত্থত্তা যাতি—মজ্ঝিমনিকায

'পুনর্জন্ম রহিত হইয়াছে, ধর্ম্মজীবন অবসিত হইয়াছে, করণীয় সম্পূর্ণ হইয়াছে—আর কোন কিছু অবশিষ্ট নাই।'

যোগসূত্রে এইরূপ পুরুষকে 'চরিতাধিকার' বলা হইয়াছে—তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা (২।২৭ সূত্র)—'তাঁহার সপ্তবিধ প্রজ্ঞা উদিত হয়'। কি কি?

(১) পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়ম্ অস্তি—'হেয়' পরিজ্ঞাত হইয়াছে, আর কিছু পরিজ্ঞেয় নাই। (২) ক্ষীণাঃ হেযহেতবঃ, ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যম্ অস্তি—'হেয-হেতু' ক্ষয়িত হইয়াছে, আর কিছু ক্ষয় করিবার নাই। (৩) সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্—নিরোধ-সমাধি দ্বারা 'হান' অধিগত হইয়াছে। (৪) ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ—বিবেকখ্যাতি-(প্রকৃতি পুরুষের ভেদবিজ্ঞান-) রূপ 'হানোপায' উপলব্ধ হইয়াছে।

(প্রজ্ঞার এই চতুর্বিধ কার্য্য-বিমুক্তি—ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্য-বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—আর ত্রিবিধ চিত্তবিমুক্তি লইয়া সপ্তবিধ প্রজ্ঞা)

(৫) চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ—বুদ্ধির করণীয সম্পূর্ণ হইয়াছে। (৬) গুণা গিরিশিখরতটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেন অস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈষাং প্রবিলীনানাং পুনরস্তি উৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ইতি—গিরিশৃঙ্গ-চ্যুত প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় নিরাশ্রয় গুণত্রয় স্বকারণ প্রকৃতিতে অস্তোন্মুখ হইয়াছে—প্রয়োজনের অভাবে আর তাহাদের উদয় হইবে না। (৭) এতস্যাম্ অবস্থায়াং গুণ-সম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি—আর পুরুষ? ঐ অবস্থায় তিনি গুণসম্বন্ধের অতীত (অসঙ্গ) হইয়া স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ (স্বয়ং জ্যোতিঃ), অমল, কেবলী হইয়াছেন।—ব্যাসভাষ্য।

অধ্যাপক ডয়সান এইরূপ 'চরিতাধিকার' পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া, উপনিষদের ভাষায় বলিয়াছেন—

'He who has recognised 'Aham Brahma asmi' 'I am Brahman,' he already is, not will be delivered, he sees through the

illusion of plurality (নানাত্ব), knows himself as the sole real, as the substance of all that exists—and is thereby exalted above all desire (কাম) ।

মোক্ষশব্দের নিরুক্তি

এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম, মোক্ষশব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি। মোক্ষ অর্থে বন্ধন-মুক্তি (Release, Liberation, Emancipation)। কিসের বন্ধন (Bondage)? অবিদ্যার বন্ধন, কামনার বন্ধন, বাসনার বন্ধন, তৃষ্ণার বন্ধন, মোহের বন্ধন। ইহাদিগকে উপনিষদে গ্রন্থি, গ্রহ, বন্ধ, পাশ বলা হইয়াছে। এই সকলের দ্বারা জীবের বদ্ধ ভাব—পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেত, ৪।৭)—মোহের অধীন হইয়া ঈশ্বর ভাবের অভাব হয়। অতএব ইহারা Fetters, knots, bands, bonds that bind the soul to the objects of sense ; এবং ঐ অবিদ্যার শাতন হইলে, ঐ কামনা-বাসনার বারণ হইলে, ঐ মোহের উন্মূলন হইলেই জীবের মুক্তি (Deliverance)।

তখন—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ—মুণ্ডক, ২।২।৮
তখন গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯
তখন স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২
তখন জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১

অতএব ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ (Summum Bonum)। সেইজন্য মুক্তির নাম নিঃশ্রেয়স। ধম্মপদের ভাষায়,—নিব্বাণং যোগক্ষেমং অনুত্তরং (অপ্পমাদবগ্‌গো, ৭)

উপনিষদ্ প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়ঃ
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ—কঠ, ২।১

প্রেয়ঃ প্রবৃত্তির পথ (Primrose Path of dalliance)—শ্রেয়ঃ নিবৃত্তির পথ। আর মোক্ষ নিঃশ্রেয়স—নিবৃত্তি পথের goal (গম্যস্থান)। সেই জন্য বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'the highest, holy freedom' বলিয়াছেন ; কারণ—যিনি নির্ব্বাণী, তিনি

already in this present life, has actually realised complete deliverance from everything that is অনাত্মা —has completed the gigantic task of getting rid of his bondage to this will (তন্‌হা)—he has burst all the fetters, 'whether refined or gross.'—(Grimm, p. 333).

সেই জন্য সাংখ্যেরা মুক্তিকে 'অন্তরায়-ধ্বস্তি' বলিয়াছেন—মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তিঃ ন পরঃ (সাংখ্যসূত্র, ৬।২০)—অন্তরায়-ধ্বংসই মুক্তি। কি অন্তরায়? কামনা বাসনা, শোকমোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা মৃত্যু—(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়) অশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরা মৃত্যুম্ অত্যেতি (বৃহ, ৩।৫।১)

বুদ্ধদেব এই মোক্ষকে নির্ব্বাণ বলিলেন কেন? তাঁহার নিজের মুখের বাণী শুনুন।

সেয়্যথাপি ভিক্খবে! তেলং চ পটিচ্চ বট্টিং চ পটিচ্চ তেলপ্পদিপো ঝায়েয্য, তত্র পুরিসো ন কালেন কালং তেলং আসিঞ্চেয্য ন বট্টিং চ উপসংহরেয্য। এবং হি সো ভিক্খবে! তেলপ্পদিপো পুরিমন চ উপাদানস্স পরিযাদানা অঞ্ঞস্সচ অনুপাহারো অনাহারো নিব্বায়েয্য। এবং এব খো ভিক্খবে। সঞ্ঞোজনীয়েসু ধম্মেসু আদীনবানুপস্সিনো বিহরতো তন্হা নিরুজ্ঝতি, তন্হানিরোধা উপাদাননিরোধোপি। এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খখন্ধস্স নিরোধো হোতি *—সংযুক্ত-নিকায, ২

'হে ভিক্ষুগণ! যেমন তৈল ও বর্ত্তি সংযোগে প্রজ্বলিত প্রদীপে যদি কেহ আর তৈল ও বর্ত্তি যোগ না করে, তবে সেই প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ যিনি সমস্ত সংযোজনের' (fetters of existence) অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনাহারে বিহরণ করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান (grasping) নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

I teach the annihilation of craving, the annihilation of hatred, the annihilation of delusion †

অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহাদের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নহে।

Nirvana is the dying out of the three fires of লোভ, দ্বেষ and মোহ— of desire, hatred and illusion—What is Buddhism, p 60?

This epithet is Nirvana, 'the going out' that is to say the going out in the heart of the three fires of lust, ill-will and dullness '—Rhys Davids, p. 151

---

* সেয্যথাপি ভিক্খু। তেলং চ পটিচ্চ, বট্টিং চ পটিচ্চ, তেলপ্পদীপো ঝাযতি তস্স এব তেলস্স চ বট্টিযা পরিযাদানা অঞ্ঞস্স চ অনুপাহারা অনাহারো নিব্বাযতি—মজ্ঝিম নিকায—১৪০ সুত্ত

† 'Nibbana, Nibbana, so they say friend Sariputta! Now what means Nibbana?' 'That which is the vanishing of desire, the vanishing of hate, the vanishing of delusion—that, friend, is called Nibbana '
—সংযুক্ত নিকায, IV

সব্বরাগ দোস মোহ নিহিত নিংনীতকসাবো—He (the Delivered One) is entirely free from greed, hate and delusion —মধ্যম নিকায়, III

এই যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহারা তৃষ্ণা বা তন্হারই প্রকট মূর্ত্তি, সেই জন্য ত্রিপিটকে বহুবার 'তন্হা-নির্ব্বাণকে'ই নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে।*

'All that is extinguished is the flaring flame of thirst (তন্হা) to remain in contact with the world'—Grimm, p 339

অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায়—সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেত, ৬।১৬

অতএব যিনি মুক্ত, যিনি নির্ব্বাণী, তিনি বুদ্ধদেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

অহু পুব্বে লোভো, তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে দোসো, তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে মোহো তদ্ অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং ইতি—অঙ্গুত্তর-নিকায I।

'এক দিন লোভ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র), এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। এক দিন দ্বেষ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন মোহ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

*Desire, hate and delusion represent the three modes of manifestation of thirst Accordingly in the Canon, we find frequent direct mention of Tanha-Nibbana, thirst-extinction —Grimm, pp 338-9

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বর্ত্তমান জগৎ *

শবৎকালেব সকাল, প্রবাসীব মনে সহজেই দেশের ভোবেব শিশিব-ভেজা ঘাসেব কথা মনে পড়ে, নদীব তীবে কাশবনেব উপব বৌদ্রছাযাব খেলা, আঙিনায খঞ্জন পাখীব চপল নাচ, আসন্ন পূজোব ছবি নদী গিবি প্রান্তব অতিক্রম কবে চোখেব সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু পশ্চিম দেশেব আকাশে মেঘেবা বারিবর্ষণ নিঃশেষ কবে বহুদিন ফিবে গিয়েচে, সেখানে নীল আকাশে শাদা মেঘেব টুকবো উদ্দেশ্যহীন ভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভেসে যায় না। এমনি দিনে সুরেশ তানপুবো নিয়ে বাগালাপে ব্যস্ত। দবজাব ফাঁকে গুটিকয়েক কববী আব শিউলি গাছ দেখা যায়, তাব দিকে চেয়ে সুবেশেব মনে হল যে ললিতবাগের গান্ধাব থেকে ধৈবতেব করুণ মিড়েব সঙ্গে যেন এই স্নিগ্ধ শাবদ প্রাতের নিগূঢ় যোগ আছে। যদিচ রাগবিশেষে কোন নির্দ্দিষ্ট বসেব স্থাপনায় তাব কোন আস্থা ছিল না, তবুও এ অনুভূতি তাব তীব্র হয়ে উঠেছিল যে সাহিত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রকলায় মনেব যে উচ্ছ্বাসকে মানুষ মূর্ত্ত কবতে চায়, সঙ্গীতে মনেব দুই কূল ছাপিয়ে তা উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ললিতবাগেব ধৈবত স্ববসঙ্গতিব কাবণে কোমল ও তীব্র ধৈবতেব মধ্যে সঞ্চবণ কবে, কোথাও তাব স্থিব থাকবাব যো নেই। "প্যাবি তেবে নৈন বর্গে মগে নিসপিয়া সৌংগ জাগে"—এই বিলম্বিত খেয়ালের আলাপে যখন মগ্ন হয়ে পড়েচে, তখন প্রবেশ কবল তাব বন্ধু, চোখে চশমা, মুখে সিগাবেট, হাতে একখানা ইংবাজী বই। বমেশ ঢুকেই বল্ল—"সেই সৈঁয়া সৈঁয়া সুরু কবেচ। ওস্তাদি গান এখন বাখ। মান্ধাতাব আমলেব বাগবাগিণী বেখে নবযুগেব বাণী শোনা অভ্যাস কব।"

সুবেশ—নবযুগেব বাণীটা কি ?

বমেশ—সেটা এখনও পবিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। তবে এটুকু বোঝা যায় তোমাদেব বাগগুলি অত্যন্ত পুরোনো এবং অতিশয় পবিচিত হয়ে পড়েচে।

সুবেশ—এই ত সকালে গৌবী মিশিব আব ছম্মন সাহেবেব সঙ্গে মল্লাব ও সারঙ্গেব ঘব নিয়ে আলোচনা হল, কই তারা ত কিছু বল্ল না।

বমেশ—তোমাব কথা শুনে রাগ হয়। তাবা নিবক্ষর, এসব খবর কোথা থেকে পাবে ?

---

* হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এ প্রবন্ধের সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উচ্চ সঙ্গীত বলতে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী এই কয়েকটি ধরে নিতে হবে।

সুবেশ—তবে তুমি কোথায় এ সব শুনলে ? বাগ পুবোনো হয়ে পড়লে ত এবাই প্রথম খবব পাবে।

বমেশ—শিক্ষিত লোকেব চেয়ে তোমাব গৌবী মিশিব আব খাঁ সাহেবরা বোঝেন বেশী ?

সুবেশ—তাই বল, শিক্ষিত লোকের কাছে শুনেচ। আচ্ছা, এই সব শিক্ষিত লোকেরা হিন্দুস্থানী গান জানেন ?

বমেশ—তাঁবা বুদ্ধিমান, শুনলে বুঝতে পাবেন না ?

সুবেশ—আমবা গান কবি, ১৫।১৬ বছব শোনাব ও বেয়াজের পব আমবা বাগেব খবর পাই, আব তোমাব শিক্ষিত লোকদেব কাছে শুধু লেখাপড়াব জোরে দু-একবাব শোনাব পব বাগ সুপরিচিত হযে পড়ে, এতে যদি আমাব সন্দেহ হয ত সেটা কি গুরুতর অপবাধ হল ? কিন্তু সে কথা থাক, তোমাব হাতে বইটা কি ?

বমেশ বইটীব মাঝামাঝি একটা পাতা খুলে বল্ল, "এইটে পড়ে দেখ।"

পডবাব বিশেষ কিছু ছিলনা, তবু সুবেশ চোখ বুলিয়ে দেখলে জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতেব সম্বন্ধে খবব পেযেচেন যে সেটা static ও traditional এবং তা কোন উচ্চশিক্ষিতেব কাছে। এরকম কিছু সুবেশেব চোখেও পড়েচে, কিন্তু সে এসবে বড় একটা কান দিত না। সে জানত হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতেব গায়ক বা বাদক এবকম কোন আশঙ্কা কখনও প্রকাশ কবে নি এবং এবা সামান্য হিন্দি উর্দ্দু জানলেও বুদ্ধিমান।

সুবেশ—Static ও traditional-এব উত্তব আমি পবে দেবো। কিন্তু যাঁবা বলচেন, তাঁদেব সম্বন্ধে কিছু বলা দবকার। ইংবেজ পর্য্যটকেব কোন দোষ দিই না, এ মত তাঁর নিজেব নয, দেশ থেকে নেওয়া। তুমি যদি ইংবেজ ও ভাবতীযেব লেখা স্কুল ও কলেজপাঠ্য ইতিহাসেব বইগুলো তুলনা কব, দেখবে প্রায় প্রত্যেক বিদেশী গ্রন্থকাব হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব যথাসাধ্য খোঁজখবব নিযে লিখেচেন, কিন্তু ভাবতীযেব মধ্যে শতকবা একজনেব সম্বন্ধেও একথা খাটে কিনা সন্দেহ। Sir W. Hunter ও Mr. Havell-এব বই দেখলে আমাব কথা সুবোধ্য হবে। Sir William Jones সঙ্গীতেব পুঁথি উদ্ধার কববাব সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী বাগেব তৎকালীন প্রকাবভেদেব অনুসন্ধান করতে ভোলেন নি। বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব সম্বন্ধে ইংবাজীতে যে কখানা বই পাওয়া যায়, তাদেব গ্রন্থকাবগণ, যেমন Capt. Willard, Fox Strangways, Mr. Clements ইত্যাদিবা সকলেই বিদেশী। হাজার সহানুভূতি ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিদেশীব কাছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত দুর্ব্বোধ্য হযেচে, কিন্তু সে ত্রুটিটুকু স্বীকাব কবেও তাঁদের অনুসন্ধিৎসাব প্রশংসা না কবে থাকা যায় না।

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে আমার নালিশ আছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চসঙ্গীতের মজলিশে ব্রিজ খেলেন, খোশগল্প করেন এবং পান-ভোজনে ব্যস্ত থাকেন এবং নিতান্ত উত্যক্ত হলে গাইয়েকে পয়সার জোরে ক্রমাগত ঠুংরী ও গজল গাইতে বাধ্য করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, যার যা রুচি। শিক্ষিতের মাঝে এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা জানতে চান, বুঝতে চান, বোঝবার ক্ষমতা রাখেন।

রমেশ—এদের বিরুদ্ধে কথা বলবার আগে একথাটা তোমার মনে রাখা উচিত, বোঝবার মত করে তোমরা কখনও সঙ্গীতের কথা আলোচনা কর নি।

সুরেশ—কারুর বিরুদ্ধে কথা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলিনে। তোমরা বাদবিসংবাদ বাধাবে, যদি প্রতিবাদ করি, বলবে ঝগড়াটে, এ অপবাদ দেওয়া তোমার সাজে না। কিন্তু তুমি যে অনুযোগ করেছ তা একবর্ণ অসত্য নয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা মানে এদেশে অধিকাংশ স্থলে নাদব্রহ্মের দ্বাবিংশতি নাড়ীর ও খাঁ সাহেবদের অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও অপরিপক্ক উদ্‌গীরণ। যদি কিছু বলতে যাও শুনবে 'বাপরে, ঋষিদের উপরে কথা'! ভারতের সুজলা সুফলা ভূমিতে ঋষিরা অতি স্থূলভের কোঠায় উপস্থিত হয়েছেন। যাঁদের লেখবার বা বোঝবার শক্তি আছে, তাঁদের হয় গান শোনা হয় না, না-হয় পুস্তকের অভাব ঘটে। নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীতরত্নাকর, রাগতরঙ্গিনী, সঙ্গীতপারিজাত, হৃদয়কৌতুক, হৃদয়প্রকাশ, রাগতত্ত্ববিবোধ, সদ্রাগচন্দ্রোদয়, রাগমালা, রাগমঞ্জরী, স্বরমেলকলানিধি, চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা, সঙ্গীতসারামৃতম্, রাগলক্ষণম, অনূপবিলাস, অনূপসঙ্গীতরত্নাকর, অনূপাংকুশ, রাগবিবোধ—এই কখানি বই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে সঙ্গীতশিক্ষার্থীর ব্যবহারে আসতে পারে। প্রায় সবগুলিই তিনি নিজ ব্যয়ে মারাঠি ও গুজরাটি অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশ করেন, অধিকাংশই বিক্রী হয়ে যাওয়াতে অল্প কয়েকটী মাত্র কিনতে পাওয়া যায়। এগুলির পুনরায় ছাপা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েচে। সবগুলিই পুস্তিকা বললেই হয়, সুতরাং ব্যয় অধিক হবে না। এ হল প্রাচীন সঙ্গীতের কথা, যার মূল্য বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক। আধুনিক সঙ্গীতের সম্বন্ধে দু একখানা বই লেখা হয়েচে, যা পড়লে সঙ্গীতের যা কিছু বোধগম্য, তা বোঝা যায়। বাংলায় স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' ও বাংলার বাইরে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি"। এগুলি তাঁর সর্ব্বত্র প্রচলিত স্বরলিপি-সম্বলিত চারিখণ্ড 'ক্রমিক পুস্তক' থেকে আলাদা।

রমেশ—দ্বিতীয়টী কোন ভাষায় লেখা ?

সুবেশ—মবাঠিতে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে এটা একমাত্র প্রামাণ্য ও সুলিখিত গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয়না। কৃষ্ণধনবাবুব বই অনেকদিন আগে লেখা, অনেক অধুনা প্রকাশিত সংস্কৃত বই তিনি কাছে পান নি, তাই অনেক অসম্পূর্ণতা বয়ে গিয়েচে। বাগবাগিণী সম্বন্ধেও তিনি বিস্তৃত ভাবে লিখে যেতে পাবেন নি। কিন্তু তাঁব বই তীক্ষ্ণবুদ্ধিব, বিশৃঙ্খলকে সুসম্বদ্ধ কবাব·চেষ্টাব একটী সুন্দব দৃষ্টান্ত।

বমেশ—তবে দাঁড়াল যে একখানা বই আছে তাও মবাঠিতে লেখা, আমাদেব দোষ কতটুকু তুমি নিজেই ভেবে দেখ।

সুবেশ—অন্য কোন দেশ হলে এ বই এতদিন বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে যেত। মবাঠি আমি সামান্য বুঝি, এবং এটুকু বলতে পাবি যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিব পক্ষে এই সহজ, সবল এবং অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অমানুষিক পবিশ্রমেব নিদর্শনটা অবোধ্য হবে না। এ ছাড়া 'লক্ষ্যসঙ্গীতম্' বলে একটা ছোট সংস্কৃত বই তিনি লিখেচেন, তাব দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। ববোদা কনফাবেন্সে অভিভাষণ ও কযেকটা প্রবন্ধ ছাড়া পণ্ডিতজী ইংবাজীতে কিছু লেখেন নি।

বমেশ—আচ্ছা শিক্ষিতদেব কথা না-হয ছেড়ে দিলাম, কিন্তু জনসাধাবণ তোমাদেব কতটুকু বুঝতে পাবল? মানুষেব স্বাভাবিক জল বায়ু মাটিব সংস্পর্শ ছেডে কৃত্রিম আবহাওয়ায় তোমবা সঙ্গীতকে লালন কবলে, এখন দোষটা অন্যেব ঘাডে ঝেডে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চাও। পথেব মানুষ যা বুঝল না, সংসাবেব গুটিকযেক লোকেব মধ্যে যাব সমাপ্তি হল, তুমি বলবে তাই বড।

সুবেশ—তোমাব উক্তিব পেছনে ফবাসী বিপ্লবেব equality, fraternity ইত্যাদি বলশালী কথাগুলিব ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। টলষ্টযেব শেষ জীবনে আর্ট সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হযেছিল। কিন্তু গোটাকতক তথ্য তুমি সত্য বলে ধবে নিয়েচ, স্থিব হয়ে বিচাব কব, তোমাব অভিজ্ঞতাব সায় পাবে না। তোমার প্রথম কথা সকলেব সব কথা বুঝতে হবে এবং দ্বিতীয এই যে যেই কোন কিছু সাধাবণেব দুর্বোধ্য হতে আবম্ভ কবল অমনি হল কৃত্রিম। সাধাবণকে ভালবাস ক্ষতি নেই, বিশ্বপ্রেম কথাটা অত্যুক্তি নয়, কিন্তু যাব যা আযত্তেব বাইবে, সে ভাব যদি তাব উপব চাপাও, সেই মুহূর্ত্তে তা দুর্ভব হয়ে উঠবে। টাকা, জমি, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সমানভাবে বণ্টন কব আপত্তি নেই, কিন্তু জন্মগত অধিকারসূত্রে মানুষ যা পায় সেখানে হস্তক্ষেপ চলে না। পাবিপার্শ্বিককে হাজাব নিয়ন্ত্রিত কবলেও তুমি শেলিব মত কবি বা আইনষ্টাইনেব মত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করতে পারবে না। তোমাব প্রথম অভিযোগের উত্তব,

এই জগৎ যাঁদেব বড বলে মেনে নিযেচে, তাঁবা সাধারণের বুদ্ধিব বাইবে বয়ে গিয়েচেন। কিন্তু যদি বল সেই কাবণে তাঁবা কৃত্রিম ত আমি প্রতিবাদ কবব। ববীন্দ্রনাথেব 'বলাকা' বা 'ঘবে বাইবে' গ্রামেব লোকে বুঝবে না, কিন্তু এ কি তুমি বলতে পাব, তাঁব বইযেব সঙ্গে গ্রাম্য জীবনেব অনুভূতিব কোথাও যোগ নেই? কৃষক তার উপলব্ধি হয়ত ভাষায় সুন্দব কবে প্রকাশ কবতে পাবে না, কিন্তু তাব সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, তাব জীবনে প্রেম নিষ্ঠুবতা, মৃত্যুর অনুভূতিব মূল সত্তা কি ববীন্দ্রনাথের অনুভূতিব থেকে পৃথক? হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীত ওস্তাদদেব হাতে সংস্কৃত হলেও সঙ্গীতেব যে বৈশিষ্ট্য ঐকান্তিকভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ কবে তা সে হাবায নি। ঠুংবী বলে যা গাওযা হয, তাব পনবো আনা গ্রাম্য সঙ্গীতেব উপব প্রতিষ্ঠিত এবং বড খেয়ালী ধ্রুপদীবা তা গাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

রমেশ—তবু একটা কর্ত্তব্য কি নেই? লোকে যদি শুধু নিজের প্রতিভাবিকাশে ব্যস্ত থাকে, সেটা কি নিছক স্বার্থপরতা নয়?

সুবেশ—জগতে অনেকগুলি নিয়ম আছে তা নিষ্ঠুব কিন্তু তা বলে অস্বীকাব কবলে শেষ পর্য্যন্ত শুভ হয় না। পাপিয়ার গান তোমাব ভাল লাগা বা না-লাগাব অপেক্ষা কবে না, সে গেয়ে যায়, সেটা তাব ধর্ম্ম। তুমি যদি তাকে মেবে ফেলতে চাও মাব. কিন্তু সে কোনপ্রকাবেই অন্যকে বোঝাবাব মত কোন পরোপকাব বা কর্ত্তব্য কবতে পাববে না। তুমি ত দর্শনেব অনুবাগী, শুনতে পাই স্ত্রীকেও যথেষ্ট ভালবাস। তাঁকে ক্যাণ্টেব Critique কর্ত্তব্যপবায়ণ হয়ে বোঝাবাব চেষ্টা কবে দেখতে পাব। ভাল-বাসাব, কর্ত্তব্যেব কোন কথাই এখানে আসচে না। বিষযটা নির্ভব কবচে গ্রহীতাব যোগ্যাযোগ্যতাব উপব। হাজাব বছব ধবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গডে উঠেচে, সেটা কিঞ্চিৎ দুরূহ হবেই। সমস্ত বিদ্যা সাধনার অপেক্ষা বাখে, আব গান শুনলেই বুঝতে পাবা যাবে এমন কোন কথা নেই। কানে শুনতে পেলেই তা সহজ হয়ে যায না, ঠিক কবে শোনা শিখতে হয়, অভ্যাস কবতে হয। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা এখনও বলা হয় নি। সাধাবণকে বোঝাবাব জন্যে কোন বড় চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নি। মাত্র বাশিযায তাব সূচনা হয়েচে। এব ফলাফল কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না। ললিতকলাব চর্চ্চটা কতদূব ব্যাপক হতে পাবে, এব প্রমাণ এখনও পাওয়া যায নি। লেলিন এদিকে কিছু ভেবেছিলেন, তাঁব স্ত্রীব লেখা জীবনী থেকে তাব পবিচয় পাওয়া যায়। জনপ্রিয সাহিত্যেব সম্বন্ধে যে কথাটা আছে, সঙ্গীতেও তা প্রযোজ্য হতে পাবে—

"But while working hard to assure that he conveyed his ideas to the workers in the clearest and best possible form, Ilyich at the

same time remonstrated against all vulgarisation, all attempts to narrow the question down for the workers, to simplify its substance

Ilyich wrote in 'What is to be done?' (1901-1902) "Attention must be devoted principally to the task of *raising* the workers to the level of revolutionists, but without, in doing so, necessarily *degrading* ourselves to the level of the 'labour masses,' as the economists wish to do   I am far from denying the necessity for popular literature for the workers, especially popular (but, of course, not vulgar) literature for the especially backward workers . . You, gentlemen, who talk so much about the 'average workers,' as a matter of fact rather insult the workers by your desire to *talk down* to them, to stoop to them when discussing labour politics or labour organisation Talk about serious things in a serious manner."

(Memoirs of Lenin by N. Krupskaya, p. 193)

এখন সেইজন্য কৃষক ও শ্রমিক সকলে নিয়মিত উচ্চ সঙ্গীতের concert-এ যেতে আরম্ভ করেচে। কিন্তু এত বড় বিশাল দেশে চট করে সবরকম সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন, তাই এখনও যে সকলে পর্য্যাপ্ত সুযোগ পেয়েচে এমন বলা যায় না। ভারতের প্রত্যেক গ্রামে যদি একটা রেডিও সেট থাকে, রমেশ, কি বল তুমি ?

রমেশ—লোকগুলো কিছু শুনতে পায়, অন্ততঃ কলকাতার রয়ের ব্রডকাষ্টিং-এর যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু রাশিয়ার সাহিত্যে ও নাটকে যূথবদ্ধ সমাজের মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া সোভিয়েটরা আর যে কিছু লিখতে দেয় না, এখানে কি তোমার কথাটা খাটচে ?

সুরেশ—মানুষের চিন্তাকে যেখানে সক্রিয় হতে দেয় না সে দেশে বাঁচার মত দুর্ভাগ্য কমই আছে। রাশিয়ার নিজের উপর নির্ভর এত কম কেন বুঝতে পারিনে। আর্টে‌ও তার প্রোপাগাণ্ডা চালান চাই। লোকে অনুশাসন অনুযায়ী সাহিত্য লিখবে একথা ভাবতে ভয় করে। চিন্তা মানেই মনের স্বাধীনতা, একটা ছাড়া অন্যের কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু আমরা অবান্তর বিষয়ে এসে পড়েচি। সঙ্গীতে ব্যক্তিক ও সামাজিক ভেদ করা কঠিন, নইলে আজ সারা রাশিয়ায় কমিউনিজম-মার্কা সঙ্গীত চলত।

রমেশ—মহাত্মাজী ত শুনি বলেন গানের মধ্যে ভজনই যথেষ্ট আর ছবির বদলে আকাশের তারা দেখলেই চলবে।

সুরেশ—মহাত্মাজীর মত কি আমি জানি না, কারণ তিনি এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন নি। সেদিন কাগজে দেখলাম তায়াবজীর কন্যা উপবাসের সময় তাঁকে গান শুনিয়ে প্রীত করেচেন। লোকমুখে শুনতে পাই তিনি সুগায়িকা ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়ালী ফৈয়াস খাঁর শিষ্যা। সুতরাং উচ্চ অঙ্গের গান হয়ত ভাল বলতেও পারেন।

কিন্তু শিক্ষিত এবং সাধারণ নিয়ে তর্ক করতে কবতে আমরা অনেক দূব এসে পড়েছি, তোমাব static ও traditional কথাটার উত্তব দিতে হবে আমি ভুলে যাই নি। সাধাবণের পক্ষে আমি এইটুকু বলতে পাবি, উচ্চ সঙ্গীতেব শ্রোতাব ও গায়কেব সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে, শিল্পীব সংখ্যাও কিছু বাড়বে।

বমেশ—শিল্পীব বেলায় কিছু কেন ?

সুবেশ—ওপথ চিবকালই কিঞ্চিৎ দুর্গম বইবে এমন ভাবা অসঙ্গত নয়। যুবোপে সঙ্গীত শিক্ষাব সুযোগ যথেষ্ট, কিন্তু আর্টিষ্ট সেই অনুপাতে বাড়ে নি, কিছু কমেচে। সেটাব হেতু যোগ্য মানুষের অভাব বা যুগপ্রভাব, এ বলা শক্ত। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যাবা শুনতে ভালবাসে তাবাও একবকম শিল্পী। মনস্তত্ত্বেব বইতে পাওয়া যায় প্রবুদ্ধ শ্রোতা ও গায়কেব মস্তিষ্কেব প্রতিক্রিযায বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সাধাবণ যদি এসব সুকুমাববৃত্তি থেকে বঞ্চিত থাকত ত বহুপূর্ব্বে কলাবিদ্যাব প্রাণবিয়োগ ঘটত।

রমেশ—তোমাব কথাগুলো অনেকটা প্রবোধবাক্যের মত শোনাচ্চে। তবে হিন্দুব সংস্কাবে অধিকাব ভেদেব কথা জড়িয়ে আছে, ক্ষুণ্ণ হওয়াব বিশেষ কাবণ নেই। আর্টিষ্ট যা সুখ পায়, তাব বদলে তাব যে দাম দিতে হয, সেটাও বিবেচ্য। কিন্তু এখন আসল কথায় আসা যাক।

সুবেশ—ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে পড়েচে, বেলাও হল। সহধর্ম্মিণী আমাব বাগালাপে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন, দেবি হলে তাঁর মেজাজটী যে বিলক্ষণ তিক্ত হবে বলা বাহুল্য এবং সে কাবণে বক্তব্যটী সংক্ষিপ্ত কবলে তোমাব এবং আমাব বিশেষ কল্যাণেব সম্ভাবনা। Static ও traditional-এর বাংলা যদি 'চলৎশক্তিহীন' ও 'গতানুগতিক' কবি, তোমাব আপত্তি আছে ?

বমেশ—অনুবাদটা একটু নিবঙ্কুশ হয়ে পড়ল, যাক মানেটা বোঝা যাক।

সুরেশ—প্রাচীন সঙ্গীতের সধ্বনি বিবরণ দেওয়া যায় না কাবণ একেত সে সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না ও দ্বিতীয়তঃ ফোনোগ্রাফেব আবিষ্কাব হয় নি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে ববাবব চলে এসেচে, বিভিন্ন সভ্যতাব সংঘাতে পুষ্ট হযেচে, কোথাও অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নি একথা বোঝাতে হলে পুঁথিব সাহায্য নিতে হবে। এ পবিচ্ছেদটী শুধু প্রমাণেব জন্য হাজিব কবাতে অতিশয় সংক্ষিপ্ত হবে, সাঙ্গীতিক পবিভাষাব আশ্রয় নিতে হবে, সুতবাং অস্পষ্ট হলে তুমি বাগ কোবো না। সামবেদে তিন প্রকাব স্ববের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম, ঋক, গাথা যথাক্রমে

এক দুই তিন স্ববেব সমষ্টি ছিল ও এক প্রকাব ৪ স্ববেব স্কেল ব্যবহাব হত তাব নাম ছিল স্ববান্তব। এইসব স্ববেব পবস্পবেব সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল অর্থাৎ তাবা আমাদেব 'সা, বে, গা, মা'ব মত ছিল, না অন্য কোন-প্রকাব ছিল তাও বোঝা যায় না। সামবেদী ব্রাহ্মণেবা এখন খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছব পূর্ব্বেব গান করেন না, সুতবাং জানাব কোন উপায় নেই। তারপবই আমবা ভবতেব নাট্যশাস্ত্র পাই, সেটী পঞ্চম খৃষ্টাব্দে লেখা। এব মধ্যে ৪ স্ববেব স্কেল বেড়ে ৭টী স্ববে পৌছেচে, কিন্তু বাগবাগিণী সম্ভবতঃ এসে উপস্থিত হয় নি। গান খুব সম্ভব ছিল, কোন স্কেলে স্ববগুলি পব পব গেযে যাওয়া। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বত্নাকবেব সময় বাগেব নাম পাওয়া গেল, নাট্যশাস্ত্র আব বত্নাকবেব মধ্যে কোন বই পাওয়া যায় না। এখন আমবা রাগ বলতে যা বুঝি তখন তা গাওযা হত না। যা গীত হত, তাব ধবণ ছিল সম্ভবতঃ অনেকটা বর্ত্তমান দক্ষিণী সঙ্গীতেব মতন, কম্পন ছিল বেশী। আমাব একটী মবাঠা বন্ধু অনুমান কবেন এব স্বল্প চিহ্ন এখনও বাংলা ও মবাঠী গ্রাম্য সঙ্গীতে পাওয়া যায়, কথাটা খুব অযৌক্তিক নয়। বত্নাকবেব সময় নানাপ্রকাব নিযমেব ভাবে বাগ আড়ষ্ট ছিল, সেটা অবশ্য আমাদেব মতে, নইলে আমাদেব পূর্ব্বপুরুষেরা নিশ্চয খুব হৃষ্টচিত্তে সে সব গাইতেন সন্দেহ নেই। নাট্যশাস্ত্র এবং বত্নাকবেব শুদ্ধ স্কেল তাঁদেব দুবধিগম্য জটিলতাব কারণে বোঝা গেল না। ঠিক এই সময থেকে মুসলমান প্রভাব আমাদেব গানে পড়ে। তাঁবা কাঠামটী বাখলেন হিন্দু, কিন্তু গানেব চাল দিলেন বদলে, স্ববগুলি স্থিব হতে আবম্ভ কবল। খুব সম্ভব এই কাবণে হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীতে কম্পন বা tremolo-ব স্থান নেই বল্লেই হয। সপ্তদশ শতাব্দীব রাগতত্ত্ববিবোধেও পাবিজাত বাগেব আবোহ অববোহেব সূচনা পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তাব 'উদ্‌গ্রাহক' তানেব মধ্যে বর্ত্তমান বাগেব পকড়-ব (সংক্ষেপে যে কয়টী স্ববকে সংহতিকে কেন্দ্র কবে বাগ নিজেকে প্রকাশ কবে যেমন বেহাগে নিসাগমপ, গমগ বা হমীবে গমধ, নিধ, সা) ছাযা পাওয়া যায। পাবিজাত তাঁর শুদ্ধ স্বরগুলি তাবেব দৈর্ঘ্যেব অনুপাতে দিযে দিলেন, সুতবাং তাঁব শুদ্ধ স্কেল ও রাগগুলিব স্বব পাওয়া গেল। এব পব দুশ বছব ইতিহাসেব দিক থেকে বিশেষ কিছু পাওযা যায না। কিন্তু স্কেল যে আবাব বদলেচে, অনেক বাগ লুপ্ত হযেচে, কিছু পবিবর্ত্তিত হযেচে, কিছু নতুন তৈবি হযেচে এব যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায। গত ১৬।১৭ বছবেব মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে বিস্তব বদলেচে একথা আমি নিজেব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এখনও কি বলতে চাও হিন্দুস্থানী গান আজ

অচল অনড হযে স্থাণুব মত বিবাজ কবচে। কিন্তু এসব কথা ছেড়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা কবি যে static হলে কি হিন্দুস্থানী গান এক-ঘেয়ে হযে আপনি মবে যেত না? জোব কবে অচল জিনিষকে আব কোথায চালান যায় কিনা জানি না, অন্ততঃ আর্টে এতদিন এ প্রবঞ্চনা চলত না এটা ঠিক।

বমেশ—কিন্তু স্বব ত তোমাদেব মোটে বাবটী, তাদেব দিয়ে কত বৈচিত্র্যেব সৃষ্টি তুমি কববে? লোকে সাধে traditional বলে।

সুবেশ—বাংলা ভাষায অক্ষবগুলির সংখ্যা পঞ্চাশেব বেশী নয়, কিন্তু তা দিয়ে শব্দবিন্যাসেব অন্ত আছে? অঙ্ক কষে এ বৈচিত্রেব সীমা নির্দ্দেশ কবা যায় না। গান যদি কবতে ত বুঝতে পাবতে রাগে বাবটী স্ববেব ব্যবহার কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হতে পাবে। তারপবে অনেক বাগে এ বাবটী স্বব ছাড়া অন্য স্বরেবও দবকাব হয়। এই জন্যেই কি গতানুগতিক বলতে চাও? সুবেব মধ্য দিয়ে নিজেব emotion প্রকাশ কবাই সঙ্গীত, যদি অন্য কোন মধ্যবর্ত্তীব আশ্রয় নেও, তাকে অন্য নাম দিও। আমি এইটুকু বলতে চাই যদি static বলে স্বীকাব না কব, তাহলে traditional-এব যুক্তি সেই সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়ে। আমেবিকান সভ্যতাব পেছনে tradition না থাকাতে কি অসুবিধা হচ্চে সে তর্ক আজ নাই বা তুললাম।

বমেশ—যাক, ওকথা ছাড়, বাংলা গানে যে সুন্দব ভাব, কবিত্বেব পবিচয় পাই, এ ত তুমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দিতে পাববে না।

সুবেশ—কবিত্ব একেবাবে নেই একথা বোলোনা। প্রকৃতিব, মানুষেব ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, ভালবাসা, অভিমান, ঈশ্ববে ভক্তিব বর্ণনা নিয়েই হিন্দুস্থানী গান। আমাদেব সুসভ্য কানে তত উচ্চ কাব্যেব খোবাক সে জোগায না, কিন্তু মানুষেব চিবন্তন আদিম প্রবৃত্তিব বর্ণনা কোনদিনই নীবস হবে না। সূক্ষ্ম কাব্যবসপূর্ণ কবিতা হিন্দী লেখকগণ আবম্ভ করেচেন কিনা আমাব জানা নেই, কিন্তু আমবা যাবা গান করি শব্দমাধুর্য্যেব অভাব কখনও বোধ কবি না। কত গান ১৫০।২০০ বছব গাওয়া হচ্চে, এখনও একটুও পুবোনো মনে হল না। কিন্তু কথাব সংস্কৃত মাধুর্য্য যদি না থাকে, তাহলে সঙ্গীতেব কি কোন ক্ষতি হল? সঙ্গীতেব সম্বন্ধে তোমবা মস্ত ভুল কব, কথা ছাড়া নিজেকে প্রকাশ কববাব emotion যেন সুবেতে থাকতে পাবে না। কথায় তুমি নিজেব যতটুকু বিকীবণ কর, সুবেব আবেদন তাব চেয়ে গভীবতব স্তবে গিয়ে স্পর্শ কবে। বাংলা গানেও যে সুরই বেশী চাও, বাংলা গান থেকেই তা প্রমাণ কবতে পাবি। বাংলা গানে সুর যেই পুবোনো হয়, সেই মুহূর্ত্তেই লোকে তাকে ভুলতে

আবম্ভ কবে, শত কবিত্ব-সম্ভাবও তাকে তুলে ধবে বাখতে পাবে না। বাংলার প্রত্যেক গান তাই স্বল্পায়ু। কথার অংশ সঙ্গীতে নিতান্তই গৌণ। Lowes Dickinson তাঁব After Two Thousand Years নামে বইতে Plato এবং Philalethes-কে যথাক্রমে প্রাচীন গ্রীক ও বর্ত্তমান সভ্যতাব প্রতিনিধিরূপে দাঁড় কবিযেচেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদেব মতামতটা উদ্ধৃত কবলে মন্দ লাগবে না—

"PLATO—In them (Greek music), at any rate, you can hardly deny an ethical character since there the words determine the music

PHILALETHES—Not so much as with you, for with us the music is more important than the words And perhaps that is as well, for, as our songs are sung, we can seldom hear the words at all" (P 158)

বমেশ—বাংলা গানে কত নতুন মিষ্টি সুব তৈবি হচ্চে এটা তুমি স্বীকাব কর কিনা।

সুবেশ—কবি, তাব খানিকটা হিন্দুস্থানী বাগ থেকে নেওয়া, খানিকটা গ্রাম্যসঙ্গীতেব কাছে পাওয়া, বাকিটা বিলিতি মেলডিব অনুকবণ। এতে আমি কোন দোষ দেখি না, সব দেশেব গানেই এসব মিশেল থাকে। কিন্তু যদি বল নতুন সৃষ্টি ত আমি আপত্তি কবব। বাংলা গান যদি যুবোপেব নকল কবে, হার্ম্মনি (স্ববসমূহের যুগপৎ সুমিষ্ট ব্যবহাব) এসে পড়বে, যে ক্ষীণ চেষ্টা কখনও কখনও এদিক ওদিক দেখতে পাই। হার্ম্মনিতে যুবোপীযেব সঙ্গে টেক্কা দিতে যাওয়া আর বামনেব চাঁদে হাত দেওয়া একই কথা। মেলডিব (স্ববসমূহেব পব পব ব্যবহাব) দিকে হিন্দুস্থানী বাগসঙ্গীত তাব বিশাল সমৃদ্ধি নিযে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা গানেব সৌন্দর্য্য নেই এমন বলি না, নিজেব স্থানটীতে অর্থাৎ বাংলাব মর্ম্ম-স্থানে সে সগৌর্ববে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত জগতে এবকম গান ছড়িযে আছে; চীনে আছে, কঙ্গোব অবণ্যে আছে, মেক্সিকোতে আছে, সুইস আল্পসে আছে ও ভাবতে সর্ব্বত্র আছে। এগুলো হচ্চে গান, বাগ ভিন্ন জিনিষ। পৃথিবীতে একমাত্র ভাবতে মেলডিব এইদিকে পবিণতি হযেচে।

বমেশ—হিন্দুস্থানী গানে যদি হার্ম্মনি আসে?

সুবেশ—কি কবে আসবে? বাগ মুখস্থ কবে গাওয়া যায না। প্রত্যেক গাইযে প্রতিবাব একই বাগ গাইতে পারে, অথচ একবকম কববে না। স্রোতেব গাযে অলঙ্কাব দিতে হলে, প্রতি মুহূর্ত্তে হার্ম্মনিব সৃষ্টি কবতে হয়, মানুষেব তা সাধ্যাতীত। ভাবতে গাইযেবা বাগ মুখস্থ কবেন না, বা অন্যের composition যুবোপীযেব মত interpret কবেন না। বস্তুতঃ দুই সভ্যতার সাঙ্গীতিক মনোভাব আলাদা।

রমেশ—তার মানে ভারতীয় রাগ কোনকালেই পুরাতন হবে না।

সুরেশ—ভবিষ্যতের কথায় অনুমান করাই ভাল, কোন স্থির সিদ্ধান্তে না আসাই শ্রেয়ঃ। কখনো হবে না একথা কি করে বলি? মানুষের রুচির স্থৈর্য্য কতটুকু তা কে বলতে পারে? অনেক সময় শুধু অত্যধিক পরিণতির ভারে মানুষ শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন হাতের কাছে যা পায়, তারই মাঝে বিশ্রান্তি বিরাম চায়। আমার মনে হয় সাহিত্য, চিত্রকলার ললাটে ক্লান্তির যে গভীর রেখা পড়েচে, সঙ্গীতেও তাই হবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আরম্ভ হয়েচে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেও নতুন experiment-এর যুগ এল বলে।

রমেশ—তোমার কি মনে হয় না এ নিরুদ্ধ বেদনায় কোন নবসৃষ্টির আবির্ভাব সূচিত হচ্চে।

সুরেশ—নবসৃষ্টির আবির্ভাবকে একটু ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায় বর্ত্তমান সৃষ্টির মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। জগতে অনেক সভ্যতার লোপের কত কারণ বার হয়। কেউ গেল বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে, কেউ অনুন্নতের সঙ্গে বিবাহ করে, কেউ সাম্রাজ্য সামলাতে না পেরে, কেউ ম্যালেরিয়া, কেউ অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির আক্রমণে, এমনি কত কি। আবার ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি জাতি মরে যায়, তার মনের সম্পদ চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। গ্রীসের দর্শন বিজ্ঞান স্থাপত্য, রোমের ব্যবহার-বিধি কি সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে নি? ভারতে যদি হিন্দুস্থানী গান মরে যায়, সে পরবর্ত্তী সঙ্গীতের মাঝে কোথাও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে এ আশা আমার আছে।

রমেশ—এর মধ্যে সব জাতগুলো যদি যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এসব বালাই বড় একটা থাকবে না। তবে সম্ভবতঃ মানুষ সে পথে যাবে না। কিন্তু হিন্দুস্থানী খেয়াল গাওয়া উঠে গিয়েচে, আর তুমি বেঁচে আছ এটা ভাবতে আমার কষ্ট হয়।

সুরেশ—মানুষের স্বভাব আজন্ম যাতে পুষ্ট হয় তাকে ছাড়তে পারে না। সে অনাগত ভবিষ্যতে আমি ব্যথা পেতে পারি, কিন্তু আশ্চর্য্য হব না।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

গদ্যের ছন্দ *

পদ্যেব ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্পাধিক চর্চ্চা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাব্যছন্দেব বীতি নির্ণযেব চেষ্টাও হইযাছে। কিন্তু ছন্দ কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধবিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমাব কলাবই লক্ষণ। সুলিখিত গদ্যও যে সুন্দব হইতে পাবে তাহা আমবা সকলেই জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয, তাহাব যে বাহ্য ৰূপ আছে, ধ্বনি-বিন্যাসেব কৌশলে তাহা যে 'কানেব ভিতব দিয়া মবমে' প্রবেশ কবিতে ও আবেগেব দ্যোতনা কবিতে পাবে, সে বকম একটা বোধও আমাদেব অনেকেব আছে। অর্থাৎ ছন্দোময় গদ্যের অস্তিত্ব আমবা অনেক সমযে অনুভব কবিয়া থাকি। কিন্তু গদ্যছন্দেব স্বৰূপ নির্ণয়েব জন্য তাদৃশ চেষ্টা হয নাই, এবং ইহাব প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদেব জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে। Aristotle বলিয়া গিযাছেন যে গদ্যেবও rhythm অর্থাৎ ছন্দঃ আছে, কিন্তু তাহা metrical অর্থাৎ কাব্যছন্দেব সমধর্ম্মী নহে। গদ্য-ছন্দেব ও কাব্য-ছন্দেব পবস্পব পার্থক্য কিসে—এতৎসম্বন্ধে Aristotle-এর মতামত জানা যায় না। যাঁহাবা Latin ভাষাব বিশেষ চর্চ্চা কবিযাছেন তাঁহাবা Cicero প্রভৃতি সুবক্তা ও সুলেখকগণের বচনায় ছন্দেব সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত cursus ব্যবহাব ইত্যাদি রীতি লক্ষ্য কবিয়াছেন। Latin ভাষার শেষ যুগেও Vulgate Bible ইত্যাদিতে ছন্দেব লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংবাজী ধর্ম্মপুস্তকাদিতে Vulgate Bible-এব প্রভাব যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্য ব্যবহাবেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল হইতে ইংবাজী সাহিত্যবসিকবৃন্দেব মধ্যে কেহ কেহ গদ্যেব ছন্দ লইযা আলোচনা কবিতেছেন এবং তাহাব ফলে ইংবাজী গদ্যছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসাব তৃপ্তি না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধাবণা অনেকটা পবিষ্কাব হইয়াছে। বাংলা গদ্যছন্দ লইয়া এ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা কবিযাছেন বলিযা জানা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলা গদ্যছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা কবাব চেষ্টা হইবে।

ইংবাজী উচ্চাবণে accent-এব গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিযা accent-এব অবস্থানেব উপবেই ছন্দেব প্রকৃতি নির্ভব কবে। ইংবাজী পদ্যছন্দেব ন্যায় ইংবাজী গদ্যছন্দেও accentই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ। কিন্তু বাংলায যতিব অবস্থানেব উপবেই ছন্দেব প্রকৃতি নির্ভব

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে পদ্যছন্দ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করা হইযাছে এবং যে সমস্ত পাবিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইযাছে তাহার ব্যাখ্যা লেখকের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

করে। দুই যতির মধ্যবর্ত্তী শব্দসমষ্টি বা পর্ব্বের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দোময় গদ্যেরও উপকরণ—এক এক ঝোঁকে (impulse) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পর্ব্ব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

"সত্য সেলুকস্। কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম দৃশ্য)

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির ভাষা গদ্য হইলেও তাহা যে ছন্দোময় —এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংলা গদ্যছন্দের ইহা খুব উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমৎকার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গদ্য—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্য রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ হয় সুপরিচিত। সহর মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে এমন কি অনেক বিদ্যালয়েও বহুবার এই কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই রচনার ছন্দ লইয়া আলোচনা করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে।

যতি মাত্রাভেদে দুই প্রকার—অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি। গদ্যে এক একটি phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়া, কখন কখন্ বা এক একটি শব্দ লইয়া এক একটি পর্ব্ব গঠিত হয়, এবং এবম্বিধ পর্ব্বের পর একটি অর্দ্ধযতি পড়ে। কয়েকটি পর্ব্ব সহযোগে গদ্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণযতি পড়ে। উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির পর্ব্ব বিভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে।

[। চিহ্নের দ্বারা অর্দ্ধযতি এবং ॥ চিহ্নের দ্বারা পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করা হইবে]

১ম বাক্য - সত্য, । সেলুকস্ ॥
২য় „ - কি বিচিত্র । এই দেশ ॥
৩য় „ - দিনে । প্রচণ্ড সূর্য্য । এর গাঢ়-নীল আকাশ । পুড়িয়ে দিয়ে যায় ॥
৪র্থ „ - আর । রাত্রিকালে । শুভ্র চন্দ্রমা এসে । তাকে । স্নিগ্ধ জোৎস্নায় । স্নান করিয়ে দেয় ॥

৫ম বাক্য - তামসী রাত্রে। অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে। যখন। এর আকাশ। ঝলমল করে॥

৬ষ্ঠ „ - আমি। বিস্মিত আতঙ্কে। চেয়ে থাকি॥

৭ম „ - প্রাবৃটে। ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি। গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে। প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মতন। এর আকাশ ছেয়ে আসে॥

৮ম „ - আমি। নির্ব্বাক্ হয়ে। দাঁড়িয়ে দেখি॥

৯ম „ - এর। অভ্রভেদী। ধবল তুষার-মৌলি। নীল হিমাদ্রি। স্থিরভাবে। দাঁড়িয়ে আছে॥

১০ম „ - এর। বিশাল নদনদী। ফেনিল উচ্ছ্বাসে। উদ্দাম বেগে। ছুটেছে॥

১১শ „ - এর। মরুভূমি। বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত। তপ্ত বালুরাশি নিয়ে। খেলা কর্চ্ছে॥

পদ্যের পর্ব্বের ন্যায় গদ্যের পর্ব্বও দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলির পরস্পর অনুপাত ও তুলনা হইতে-ই এক একটি পর্ব্বের বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনানুভূতি হয়। বাংলায় পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। বাংলা গদ্যে মাত্রাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় পদ্যের পদ্ধতির অনুরূপ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা syllable এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়, কেবল শব্দের অন্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এক কথায়, গদ্যের মাত্রাপদ্ধতি বর্ণমাত্রিক। * এই পদ্ধতিই বাংলা উচ্চারণের সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি। তবে, মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতি একেবারে বাঁধাধরা নয়, আবশ্যক মত আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরেও দীর্ঘীকরণ করা যাইতে পারে।

গদ্যেও এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন কখন এক মাত্রার পর্ব্বাঙ্গও দেখা যায়।

গদ্যে পর্ব্বাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ থাকিবে। গদ্যে শব্দাংশ লইয়া পর্ব্বাঙ্গ গঠন করা চলে না। সুতরাং বলা বাহুল্য যে গদ্যের এক একটি পর্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে।

পদ্যের পর্ব্বের সহিত গদ্যের পর্ব্বের প্রধান পার্থক্য এই যে পদ্যে পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয় তাহাদের

* পয়ারজাতীয় ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি বর্ণমাত্রিক বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ অভিযোগপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ইহা লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন। বাংলায় লিখনের একটি বিশিষ্ট প্রথা হইতে না কি ইহা উৎপন্ন। এমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ছন্দোবোধ দৃষ্টিগত নয়, শ্রুতিগত। লিপিচাতুর্য্য দিয়া কানকে ঠকান যায় না। বরং বলা যায় যে বাংলার স্বাভাবিক মাত্রাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই বাংলার লিপিপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ণকায় বর্ণসংখ্যা হইতে মাত্রাসংখ্যা বুঝা যায়।

মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে; কিন্তু গদ্যে নানা উপায়ে পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সাজান যায়। আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

		পর্ব্বসংখ্যা
১ম বাক্য -	[২] । [৪] ·	২
২য় „ -	(১+৩-) ৪ । (২+২-) ৪ ·	২
৩য় „ -	[২] । (৩+২-) ৫ । (২+৪+৩-) ৯ । (৩+৪-) ৭ ·	৪
৪র্থ „ -	[২] । (২+২-) ৪ । (২+৩+২-) ৭ । [২] । (২+৩-) ৫ (২+৩+২-) ৭	৬
৫ম „ -	(৩+২-) ৫ । (৩+৩+৪-) ১০ । [৩] । (২+৩-) ৫ । (৪+২-) ৬	৫
৬ষ্ঠ „ -	[২] । (৩+৩-) ৬ । (২+২-) ৪	৩
৭ম „ -	[৩] । (৪+৪-) ৮ । (২+৩+৩-) ৮ । (৩+৫ ?+২-) ১০ । (২+৩+৪-) ৯ ..	৫
৮ম „ -	[২] । (৩+২-) ৫ । (৩+২-) ৫ ...	৩
৯ম „ -	[২] । (২+২-) ৪ । (৩+৩+২-) ৮ । (২+৩-) ৫ । (২+২-) ৪ । (৩+২-) ৫ ...	৬
১০ম „ -	[২] । (৩+৪-) ৭ । (৩+৩-) ৬ । (৩+২-) ৫ । [৩] ..	৫
১১শ „ -	[২] । (২+২) ৪ । (৩+৫?+২-) ১০ । (২+৪+২-) ৮ । (২+২-) ৪	৫
		৪৬

এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার সুবিধা হইবে।

এখানে মোট ৪৬ টি পর্ব্ব আছে। তন্মধ্যে যে পর্ব্বগুলির দুই দিকে [ ] চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। এইরূপ ১৩টি পর্ব্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইরূপ একটি পর্ব্ব থাকে ধরা যাইতে পারে। এইরূপ পর্ব্বে একটি মাত্র পর্ব্বাঙ্গ থাকে বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে ইহাদের ছন্দের পর্ব্ব বলা উচিত নয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ছন্দের অতিরিক্ত (hypermetric) এক একটি শব্দ মাত্র। ইহাদিগকে বাক্যের মধ্যে যেখানে নূতন একটি ছন্দ-প্রবাহের আরম্ভ তাহার পূর্ব্বে পাওয়া যায়। কদাচ ছন্দ-প্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিস্পন্দ শব্দগুলিকে ভর করিয়াই ছন্দ-তরঙ্গে ভেলা ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেলা আসিয়া এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয়া স্থির হয়।

পদ্যেও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু গদ্যেই ইহাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বহুল। *

বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে উদ্ধৃতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে। পদ্যে তিনটি পর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কোন পর্ব্ব গঠিত হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর আর একটি পর্ব্বাঙ্গ পর্ব্বের আদিতে বা শেষে স্থান পায়, কিন্তু মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না। গদ্যে কিন্তু তাহা চলিতে পারে, এমন কি মধ্যলঘু বা মধ্যগুরু অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্ব্বের ব্যবহারেই গদ্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধৃতাংশে ১০টি পর্ব্বে তিনটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পদ্যরীতির অনুযায়ী ("অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে," "গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে," "ধবল-তুষার-মৌলি")। কিন্তু "শুভ্র চন্দ্রমা এসে" "তপ্ত বালুরাশি নিয়ে" ইত্যাদি পর্ব্বের ব্যবহার পদ্যে চলে না।

এতদ্ভিন্ন গদ্যে পরস্পর অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়াও পর্ব্ব গঠিত হইতে পারে, পদ্যে তাহা চলে না। এই ধরণের চারিটি পর্ব্ব উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় ("এর গাঢ়-নীল আকাশ", "প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত", "এর আকাশ ছেয়ে আসে" "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত")। অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। "এর গাঢ়-নীল আকাশ" এই পর্ব্বটিতে মধ্যে এবং "এর আকাশ ছেয়ে আসে" এই পর্ব্বটিতে অন্তে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটির স্থান হইয়াছে।

("প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত" ও "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত" এই দুইটি পর্ব্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঙ্কেত ৩+৫+২, সুতরাং এই দুইটি পর্ব্বে যেন গদ্যছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+৪+৩ এই সঙ্কেত অনুসারে, 'বিরাট্ স্বেচ্ছাচার এর্‌মত' এই ধরণে।)

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গদ্যে নয়মাত্রার পর্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু পদ্যে নয়মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখা যায় না। পদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য উপায়েও গদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইয়া থাকে।

পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে—পদ্যছন্দ ঐক্যপ্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান। পদ্যে এক একটি বৃহত্তর

* অনেক সময় পদ্যের মধ্যে গদ্যের আভাস আসার জন্য নূতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় এবং পদ্যের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গূঢ় রহস্য। পদ্য ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা গদ্যের আভাস আনিবার অন্যতম উপায়।

ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ চরণের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্ব্বটি পূর্ণ বিরামের পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময় অপেক্ষাকৃত হ্রস্বতর হয়। যে স্থলে পর পর পর্ব্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গদ্যে কিন্তু বৈচিত্র্যের-ই প্রাধান্য। পর পর পর্ব্বগুলি সমান না হওয়া কিম্বা কোন নক্সার অনুসরণে পর্ব্বের মাত্রা নিয়মিত না হওয়াই গদ্যের রীতি। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাময়িক আবেগের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হ্রস্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। কিন্তু বাক্যের শেষে পৌঁছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্ব্বে বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গদ্যের ভাবসাম্য রক্ষিত হয়। এই ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গদ্যছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্ধৃতাংশের পর্ব্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

প্রথম বাক্যটির দুইটি পর্ব্বই এক-শব্দ-যুক্ত এবং ছন্দঃস্পন্দনহীন। শুধু এই বাক্যটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে চারি মাত্রার পরস্পর সমান দুইটি পর্ব্ব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পর্ব্ব থাকায় এই বাক্যটির ভাবসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। গদ্যে এইরূপ প্রতিসম বাক্যের ব্যবহার চলে, কিন্তু পদ্যছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং ইহাতে বিশিষ্ট গদ্যছন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি একত্র পাঠ করিলে এবং একই ছন্দ-প্রবাহের অংশ বলিয়া ধরিলে, গদ্যছন্দের লক্ষণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব্ব এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর একটি পর্ব্ব বলিয়া ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে গদ্যসুলভ উত্থানশীল (rising) ছন্দের ভাব আসিবে। তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত শব্দের উপর ঝোঁক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্ব্বগুলি বিশিষ্ট গদ্যছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ভাবে (waved rhythm) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছন্দ-প্রবাহ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপান্ত্য পর্ব্বে পৌঁছিয়া পতনশীল হইয়াছে। এইরূপ পর্ব্ব সন্নিবেশ অন্যান্য বাক্যেও দেখা যাইবে। কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও ৯ম বাক্যে, দুইটি প্রবাহ আছে। দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে। ছন্দের প্রবাহ কখন উত্থানশীল, কখন তরঙ্গায়িত। অনেক সময়ই ছন্দ-প্রবাহের ঝোঁক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। কদাচ যেমন ১০ম বাক্যে, পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায়। ক্বচিৎ প্রতিসম পর্ব্বের যোজনা দেখা যায়, কিন্তু এ ব্যবহার গদ্যছন্দে খুব কম।

অন্যান্য আদর্শেব ছন্দ-প্রবাহেব মধ্যে পডিয়া ইহাব প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে।

পব পব পর্ব্বগুলি গদ্যে ঠিক একরূপ না হওযাই বাঞ্ছনীয। তাহাদেব মোট মাত্রাই সাধাবণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পব পব ছুইটি পর্ব্বেব মোট মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদেব মধ্যে পর্ব্বাঙ্গ সন্নিবেশেব দিক্ দিয়া পার্থক্য থাকে। যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষব ব্যবহাবেব দিক্ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্দাবা সমান মাত্রাব ও একই সঙ্কেতের ছুইটি পর্ব্বেব মধ্যে অসাদৃশ্য পবিস্ফুট হয়। এইরূপে গদ্যে বৈচিত্র্য বক্ষা হইযা থাকে।

গদ্যে সাধাবণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দেব আদর্শেব পূর্ণতা হইযা থাকে, সুতবাং স্তবক-গঠনেব প্রযাস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কখন পব পব কয়েকটি বাক্য লইযা একটি ছন্দেব আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায। এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তবঙ্গাযিত ছন্দেব আদর্শের অনুরূপ হইযা থাকে। বস্তুতঃ তবঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যেব বিশিষ্ট ছন্দ।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বিবাহ-বিধি

যে নিয়মে চন্দ্রসূর্য্য দেখা দেয়, বাতাস বহে, গাছে ফুল ফোটে, সেই নিয়মেব শাসনেই মানুষেব কাজ ও সমাজেব গতি শাসিত হয, ইহা বেশিব ভাগ লোকে মানে না। আমাদেব বিবাহ হয নিজেব ইচ্ছায়, না-হয় বড় জোব অভিভাবকদেব ইচ্ছায়, আব স্বেচ্ছায কত লোক অবিবাহিত থাকে ; এ অবস্থা দেখিয়া অনেকে ভাবে এই যে চলিয়াছে সামাজিক বিধি যে, মেযে-পুরুষকে নির্দ্দিষ্ট নিযমে স্থাযী জোড় বাঁধিতে হইবে আব সেই বৈধ নিযমে জোড় ন' বাঁধিলে সন্তানেবা সমাজে আদৃত হইবে না, সে নিয়ম ইচ্ছা কবিলেই উল্টাইযা বা উঠাইযা দিযা সমাজকে কুশলে চালাইতে পাবা যায।

বিবাহ প্রথা যে এক সময়ে সুবিধাব খাতিবে মানুষে চালাইযাছিল, এই প্রবাদ অনেক দেশেই পাওযা যায়। আমাদেব প্রাচীন প্রবাদে পাই যে একদিন একজন ঋষি অস্থাযী যৌন আকর্ষণে শ্বেতকেতুব মাকে শ্বেতকেতুব চোখেব সাম্‌নেই ডাকিযা নিলেন, শ্বেতকেতুব হইল লজ্জা ও ক্রোধ, আব তিনি তৎক্ষণাৎ এই অমোঘ বচন উচ্চাবণ কবিলেন যে, সমাজ ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আব চলিবে না,—সকলকে বিবাহেব আইন মানিতে হইবে। বিবাহটা নাকি সেইদিন হইতে চলিত হইয়াছে। ইহাবই অনুরূপ প্রবাদ পাই প্রাচীন মিসবে ও প্রাচীন চীনদেশে। গোডায ছিল উচ্ছৃঙ্খলা বা স্বেচ্ছাচাবিতা, তাব পবে সামাজিক অবস্থাব ফলে নানা দেশে নানা ধবণেব বিবাহ-প্রথাব উৎপত্তি হইযাছিল, এই কথা ষাট সত্তব বছব আগে ইউবোপেব কযেকজন সমাজতত্ত্বজ্ঞেবাও বলিযাছিলেন। এই পণ্ডিতদেব মতেব সমালোচনাব আগে একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধাবণাব ইতিহাস দিতেছি, যে ভ্রান্ত ধাবণায মানুষে ভাবে যে, বিশ্বেব সুসম্বদ্ধ সৃষ্টিব পূর্ব্বে বিশ্বেব উপাদানগুলি ছিল অতি বিশৃঙ্খল বা এলোমেলো অবস্থায় বা chaos রূপে ; এই অবৈজ্ঞানিক ধাবণা জন্মিবাব কাবণ দেখাইতেছি।

মানুষে যখন ঘব বাঁধে তখন এখানকাব কাঠ সেখানকাব পাথব মাটি বহু চেষ্টায় ও শ্রমে কুডাইযা আনে ; প্রায় সকল প্রযোজনেব কাজেই মানুষকে অনেক জোডা-তালি দিয়া কাজ গুছাইযা নিতে হয়। নিজেদেব কাজ বা সৃষ্টিকে উপমেয় ভাবিযা লোকে মনে কবে যে এলোমেলো উপাদান জুডিযাই বিধাতাকে সুসম্বদ্ধ বিশ্ব গডিতে হইযাছিল। যাঁহাবা অল্পাধিক পবিমাণে বিশ্বেব উপাদানেব প্রকৃতি জানেন তাঁহাদেব পক্ষে chaos কল্পনা কবা অসম্ভব। ইথব বল বা শূন্যসাগব বল বা যে নামেই নামকবণ কর, দেখিতে পাইবে যে তাহাবই মধ্যে অবিবাম কম্পন বা তবঙ্গ চলিয়াছে,

আব তাহাব নির্দ্দিষ্ট বাঁধা গতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে বিদ্যুৎ-গর্ভ কুঁড়ি, যে কুঁডিব বিকাশে জন্মিতেছে পবমাণু। এই পবমাণুব অতি সূক্ষ্ম অণুতে অণুতে সেই ধর্ম্ম আজন্ম জডাইয়া আছে, যাহাব ফলে পবমাণুগুলিকে নিবন্তব বিশ্ব গড়িযাই চলিতে হইবে,—অতি ক্ষুদ্র কাল্পনিক মুহূর্ত্তেও সে তাহাব অঙ্গেব নিযম বা ধর্ম্ম এড়াইযা এলোমেলো অবস্থায থাকিতে পাবে না। আলো হউক, জল হউক হুকুমেব অপেক্ষা না কবিয়াই আদি অথবা অনাদিকাল হইতে আকর্ষণাদি নানা নিযমে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি উদ্ভাবিত কবিয়া চলিযাছে। ঐ যে পবমাণু নিত্য আপনাব ধর্ম্ম বক্ষা কবিয়া চলিযাছে উহাদেবই এক ধবণেব যোগে যে আমাদেব উৎপত্তি, আমাদেব আপন-পব বুঝিবাব চৈতন্যেব উৎপত্তি ও জীবনেব সকল শ্রেণীব কর্ম্ম কবিবাব প্রবৃত্তিব উৎপত্তি, তাহাব কিঞ্চিৎ বিববণ ভাবতবর্ষ মাসিকে "মবণ ভোল" প্রবন্ধে দিয়াছি। উহাব পুনরুক্তিতে পুঁথি বাড়াইব না।

এমন অনেক জীব আছে যাহাদেব মধ্যে বিকাশেব অল্পতাব দরুণ সেই ধবণেব চেতনা জাগে নাই যাহাতে আত্মবোধ জন্মিতে পাবে, কিন্তু তাহাবা বাঁচিয়া চলিযাছে খাইযা ও আত্মবংশ বাডাইযা চলিযাছে আপনাদেব শাবীব উপাদানেব টানে। শবীবে নানাবকমেব টান বা প্রবৃত্তি আছে আব সেই টান বা প্রবৃত্তির ফলেই তাহাবা কাজ কবে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তিব টান আত্মজ্ঞানরূপে বিকশিত চেতনাব আওতায় ঘটে না বলিযা সেই ভাবেব জন্ম হয নাই, আমবা যে ভাবেব নাম দিযাছি ইচ্ছা, সঙ্কল্প প্রভৃতি। উহাবা ক্ষয়েব বা মবণেব অবস্থাব স্পর্শে আসিলে উপাদানেব ধর্ম্মেই কোঁচ্‌কাইযা দূবে যায, আব স্থিতিব অনুকূল অবস্থাব স্পর্শে শবীব ফুলাইযা অগ্রসব হয়, কিন্তু আমাদেব মত ইচ্ছা বা সঙ্কল্প অনুভব কবে না। এইজন্যই অন্য জীবেব আলোচনা কবিযা খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিতে হইবে যে আমাদেব যাহা বাঞ্ছনীয ও কর্ত্তব্য তাহাব অচ্ছেদ্য শিকড কিভাবে বহিয়াছে আমাদেব অপবিবর্ত্তনীয় উপাদান-ধর্ম্মে জডাইয়া। অর্থাৎ বুঝিয়া নিতে হইবে যে আমাদেব কোন্ শ্রেণীব ব্যবস্থাকে শবীব ও সমাজ ধ্বংস না কবিয়া বদ্‌লাইতে পাবা যায, আব অন্যদিকে কিরূপ মৌলিক ব্যবস্থাকে বদ্‌লাইতে গেলে আমাদেব ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয। তত্ত্বেব খোঁজেব গোডাব কথায় সক্রেটিসেব উপদেশ ছিল—know thyself, আপনাকে জান। এখানেও সেই কথা, জীবনেব ও সমাজেব কর্ত্তব্য বুঝিবার গোডায় আপনাব উপাদানকে চিনিয়া নাও, আপনাকে চিনিয়া নাও।

জীব শ্রেণীব অতি নীচেব স্তবে এমন অনেক জীব আছে যাহাবা সাবা শবীব দিযা খায় ও পুষ্ট হয়, আব উপযুক্ত সময়ে তাহাদেব শবীব ভাঙ্গিয়া দুখানা হয ও সেইরূপে দুইটি জীবেব উৎপত্তি হয। এই প্রথায়

ঐ জীবদেব বংশ বাড়িয়া চলে। এই জীবদেব মধ্যে একের সঙ্গে অন্যেব কোনও বকমেব সহযোগিতাব প্রয়োজন নাই; তবু উহাবা এক দলে এক সঙ্গে বাস কবে। নীচেব দিকেব এমন অন্য একটু উচ্চতব জীব আছে যাহাদেব মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে আব বংশবৃদ্ধিব জন্য স্ত্রীপুরুষেবা নির্দ্দিষ্ট কালে জোড় বাঁধে। আত্মজ্ঞানেব চেতনাশূন্য এই জীবেবা কোনও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে জোড় বাঁধে কি-না তাহা এখনও পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ধবা যায় নাই, তবে যতটুকু জানা গিয়াছে, পবে তাহাব উল্লেখ কবিতেছি। একে ত এই জীবগুলি বড় ক্ষুদ্র ও চেহাবা দেখিয়া একটিকে অপবটি হইতে আলাদা কবিয়া চিনিয়া বাখা কষ্ট, তাহাব উপব আবাব মানুষে যখন উহাদের গতি-বিধি পবীক্ষা কবিতে বসে, তখন উহাদেব স্বাভাবিক স্থিতিব পদ্ধতি উল্টাইয়া যায়। মানুষেবা প্রায় জোব কবিযাই একটি পুরুষ জীবকে অন্য স্ত্রী জীবেব সঙ্গে মিলায়; কিন্তু যদি ঐ জীবেবা মানুষের হস্তক্ষেপ না পাইত, তবে তাহাদেব প্রাকৃতিক টানে কিভাবে একটি অন্যটিব সঙ্গে জুটিত, তাহা ধবা যায় না। একথাটি কিজন্য বলিলাম, তাহা বুঝাইতেছি। এমন অনেক বড় বড় জীব আছে, যাহাবা বন্য থাকিবাব সময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথায় জোড বাঁধে, কিন্তু মানুষেবা যখন তাহাদিগকে গৃহপালিত কবে, তখন আব সে নিয়ম পালিত হয় না। আমবা জোব কবিয়া ঘোড়া, গরু প্রভৃতিব পক্ষে প্রাকৃতিক ভাবে দল বাঁধিয়া থাকাব সুবিধা উড়াইয়া দিয়াছি আব উহাদেব বংশ-বৃদ্ধিব জন্য আমাদেব প্রয়োজনে যেমন খুসী তেমন কবিযা জোড় বাঁধিযা দিই আব ঐ জন্তুবাও যৌন আকর্ষণে পবস্পবে মেলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেবা ঠিকই বলিযাছেন যে মানুষেব শাসনে যাহাবা প্রাকৃতিক অবস্থায নাই ও যাহাবা হইয়াছে degraded বা অধঃপতিত, তাহাদেব দৃষ্টান্তে জীবেব জোড বাঁধিবাব আইন ধবা কঠিন। তবুও গৃহপালিত পশুদেব প্রাকৃতিক টান কিরূপ, তাহা যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা বলিব। মানুষ জাতিব মধ্যেও কোন কোন জাতি এমনভাবে কোণ-ঠেসা হইয়াছে যাহাতে তাহাদেব নিজেব দলের পুষ্টি ও প্রসার নষ্ট হইয়াছে। ইহাবা দায়ে ঠেকিয়া যৌন আকর্ষণেব টানে আপনাদের ক্ষুদ্র দলেব মধ্যে এমনভাবে জোড় বাঁধে, যাহা আমাদেব দৃষ্টিতে মানুষেব বেলায় অস্বাভাবিক। ইহাবা যে এই দায়েপড়া অবস্থাব জন্য ধ্বংসেব পথে চলিতেছে সে দৃষ্টান্ত পবে দিব। এখানে শুধু এইটুকু বক্তব্য যে এই সকল দৃষ্টান্তেব অল্প উল্লেখেব পব অন্যান্য জীবেব মধ্যে লক্ষিত সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তেব উল্লেখ কবিব।

প্রথম দৃষ্টান্ত দিতেছি সেই নীচেব স্তবেব জীবেব যাহাদেব আত্ম-জ্ঞান অস্পষ্ট, আর যাহাদেব মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জন্মিয়াছে। পণ্ডিত

Maupas এই শ্রেণীর জীবদের কয়েকটি বংশে ঠিক লক্ষ্য করিয়াছেন যে যদি উহাদের এক স্থানের দলের জীবেরা অন্য স্থানের দলের জীবদের কাছে যাইতে না পায়, আর যদি এক স্থানের স্ত্রী-জীবদের সঙ্গে দূরের অন্য পুরুষ-জীবদের জোড় বাঁধা না ঘটিতে পায় তবে ঐ জীবেরা ক্ষয়ের পথে বা মরণের পথে অতি শীঘ্র অগ্রসর হয়। এই জীবদের অপেক্ষা খানিকটা উন্নত মৌমাছিদের সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে এক চাকের মাছিরা অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখে, যদিও অন্য চাকের মাছিদের সঙ্গে জোড় বাঁধিয়া বাস করে না। নিজের দল ছাড়িয়া অপরিচিত অন্য দলের জীবদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাই যে জীব-সাধারণের মধ্যে সাধারণ নিয়ম, তাহাই অনুসন্ধানের ফলে নিত্য নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

গৃহপালিত পশুদের অধঃপতিত অবস্থার কথা ও মানুষের ইচ্ছায় তাহাদের ক্ষণিক যৌনসম্বন্ধ-স্থাপনের কথা বলিয়াছি। যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই পশুদের শরীরের ও গুণের উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে ব্রতী তাঁহাদের মধ্যে এবিষয়ে কোনও মতভেদ নাই যে, যেখানেই যত কাছাকাছি রক্ত সম্পর্কে পশুদের যৌন সম্পর্ক হয় সেখানেই পশুদের বংশে তত পরিমাণে ক্ষয় দেখা দেয়। আবার ইহাও সযত্নে লক্ষ্য করিবার জিনিস যে কাছাকাছি রক্ত-সম্পর্ক না থাকিলেও এক পালের পশুরা আপনাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ঘটাইতে না পারিলেই অধিক সুখী হয়, আর অপরিচিত সমজাতীয় পশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অধিক হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ Heape লিখিয়াছেন—All breeders will agree that animals when brought into contact with strangers experience increased sexual stimulation। অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

এবারে দিব পক্ষী জাতির মধ্যে জোড়-বাঁধার দৃষ্টান্ত বা স্থায়ী বিবাহের দৃষ্টান্ত। যে সকল পণ্ডিত অতি নিপুণভাবে পক্ষী-জাতির আচরণ-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Marquis de Brisay, Brehm ও Hermann Muller-এর পাকা অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনাইব। আমরা সকলেই লক্ষ্য করি যে পাখীরা তাহাদের জাতি অনুসারে দল বাঁধে আর এক সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ও এক গাছে রাত্রি কাটায়। যাহাকে বলে কাজের বেলায় সহযোগিতা পাওয়া, ইহাদের মধ্যে তাহার ত কোন প্রয়োজন নাই; কারণ উড়িতে শিখিবার পর যে যাহার নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে ও বিপদে পড়িলে নিজের চেষ্টাতেই মুক্তির পথ খোঁজে। যৌন আকর্ষণে

যে এক-এক জোড়া পাখীকে কাছাকাছি থাকিতে হয়, তাহাও ত বছরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কালে ঘটে। তবুও পক্ষী-জাতিদেব বেশির ভাগ একসঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকে ও ঝাঁক বাঁধিযা ওড়ে। আমবা এক জাতির এক পাখীকে অন্য পাখী হইতে আলাদা কবিয়া চিনিয়া রাখিতে পাবি না, তাই কি নিয়মে কে কাহাব সঙ্গে জোড় বাঁধে তাহা ধবিতে পারি না। আন্দাজে ভুল কবিয়া ভাবি যে এক জোড়া পাখী এক বাসায় যে এক জোডা ডিম পাড়িল তাহাবই পুরুষ ও মেযে ছানা বড় হইবাব পব বুঝি এক সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষরূপে জোড় বাঁধে। যে সকল পণ্ডিতদেব নাম কবিয়াছি তাঁহাবা নিপুণ পবিদর্শনে দেখিয়াছেন যে মুবগী জাতীয় ও আব দু-একটি জাতীয় পাখী ছাড়া পাখীদেব মধ্যে ভাই-বোনে জোড় বাঁধা নাই। পাখীরা বড় হইযা যখন দল বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায় তখন এক বাসাব পাখীবা অপবিচিত অন্য বাসাব পাখীদেব সঙ্গে জোড বাঁধে। একবাব জোড বাঁধিবাব পব বা বিবাহ হইবাব পব ইহাদেব বিবাহ ভঙ্গ হয় না ও আশ্চর্য্য এই যে জোডাব একটা মরিযা গেলে অপবটি অনেক সময়েই সাবা জীবন বিবাহ কবে না। Captain Forsyth একবাব সম্বলপুবেব পশ্চিমভাগে একজোড়া চখা-চখী দেখিয়া গুলি কবিযাছিলেন ও তাঁহাব গুলিতে একটি মবিয়াছিল। অপবটিব দুঃখ-যাতনা দেখিযা সেটিকে মাবিয়া ফেলিবাব জন্য একুশ দিন ধবিযা চেষ্টা কবিযাছিলেন কিন্তু পাবেন নাই। তিনি ঘুরিযা দেখিয়াছিলেন যে বিপত্নীক বা বিধবা পাখীটি নদীব চড়ায় চখা-চখীদেব দলেব কাছে অথচ দল হইতে দূবে একা বসিয়া থাকিত। ঘুঘুদেব ও পায়বাদের জোড বাঁধা ও প্রেমেব কথা আমাদেব দেশে অনেকে আন্দাজে খানিকটা লক্ষ্য কবিযাছেন। প্রেমেব একনিষ্ঠ আকর্ষণে যে একা মানুষেবাই ধন্য নয় তাহা এক পণ্ডিতেব ইংবেজী উক্তিতে এইভাবে আছে—This absorbing passion for one is not confined to the human race। পক্ষী জাতিব মধ্যে অসম্পর্কিত বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেমেব গভীবতা অত্যন্ত অধিক দেখিযা পণ্ডিত Brehm বিস্ময়ে বলিযাছেন যে যথার্থ একনিষ্ঠ বিবাহ (monogamy) পক্ষী জাতিতেই সর্ব্বাধিক লক্ষ্য কবা যায়। তাঁহাব উক্তিটি ইংবেজীতে এইরূপ আছে—Real genuine marriage can only be found among birds।

শবীবেব স্বাভাবিক টানেব আগ্রহকে চেতনাব মধ্যে ইচ্ছারূপে সাজাইয়া হউক আব নাই হউক জীবদেব মধ্যে এই যে বিবাহেব গতি ও পদ্ধতি চলিযাছে তাহাব অচ্ছেদ্য মূল শবীবেব সেই উপাদানেব ধর্ম্মে চলিয়াছে, যে উপাদানেব নাম জৈবনিক বা germplasm। এই জৈবনিক নিম্নতম হইতে উচ্চতম জীব পর্য্যন্ত সকলেব জীবনে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ভিত্তি ;

ঐ ভিত্তিকে না বদ্‌লাইলে অর্থাৎ শবীবকে না মাবিয়া ফেলিলে ঐ টান ও টানেব পদ্ধতিকে কাহাবও বদ্‌লাইবাব সাধ্য নাই। জৈবনিকেব এই লীলা নানা ইতব জন্তুব মধ্যে লক্ষ্য কবা গেল; এখন দেখিব সেই জীবদেব আচাব যাহাবা মানুষদেব পূর্ব্বপুরুষদেব একটু দূব সম্পর্কে পিতৃব্য ও ভ্রাতৃব্য স্থানীয় অর্থাৎ শিম্পাজী, গবিলা প্রভৃতি কিম্পুরুষ বা বনমানুষদেব আচাবেব উল্লেখ কবিব। শিম্পাঞ্জী, গবিলা প্রভৃতি যে জীবনে স্থাযী জোড বাঁধে ও এক এক পবিবাব সন্তান-সন্ততি নিয়া একসঙ্গে বাসা বাঁধিযা থাকে ও নানাস্থানে বিচরণেব সময়েও বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেবা বড় বড় সন্তানগুলিকে সঙ্গে কবিয়া বেড়ায়, ইহা সকল পবিদর্শকেবাই বিশেষভাবে লক্ষ্য কবিয়াছেন। যে সংস্কাব নীচ জীব হইতে কিম্পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেব শবীবে ও মনে বদ্ধমূল, তাহা যে কিম্পুরুষ-দেব কিঞ্চিৎ দূব সম্পর্কিত আদি মানবেব সহজজ্ঞান বা সংস্কাবরূপে স্থায়ী ছিল, তাহা স্বীকাব না কবিবাব যুক্তি পাওয়া যায় না। আদিম কালেব মানুষেব খাঁটি আদিম সমাজ আব নাই,—তাহাদেব উত্তবাধিকাবীদেবও সমাজ অনেক লক্ষ বছব আগে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাদেব আচাব প্রভৃতিও পববর্ত্তী সমযে পবিবর্ত্তিত সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়; তবে যে ধাবা জৈবনিকেব ধর্ম্মে সাবা জীবশ্রেণীতে বহিয়া আসিযাছে তাহা যে জৈবনিকে গড়া মানুষেব উত্তবাধিকাবক্রমে চলিয়া আসে নাই, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

মনুষ্যেতব প্রায সকল জন্তুব মধ্যেই সন্তান-সঞ্চাব কবাইবাব এক-একটা নির্দ্দিষ্ট কাল বা ঋতু আছে; কিন্তু মানুষেব মধ্যে এই কাল বা ঋতু সাবা বছব ধবিয়াই চলে, বলিতে পাবা যায। অন্য জন্তুব পক্ষে সম্ভব হইতে পাবে যে কেবল নির্দ্দিষ্ট কালে স্ত্রী-পুরুষেব মিলন হইলেই চলে, কিন্তু মানুষেব বেলায় একেবাবেই তাহা নয। তবুও দেখা যায যে অন্য জীবেবা নির্দ্দিষ্ট কালে মিলিবাব সম্ভাবনাব উপবে নির্ভব কবিয়া আলাদা আলাদা থাকে না, একেবাবেই যৌবনে স্থাযী জোড় বাঁধিযা চলে ও প্রয়োজনেব বেলায় সেই জোড-বাঁধা জীবেবাই বংশ বৃদ্ধি কবে, আব অনিশ্চিতভাবে উপযোগী ভবিষ্যৎ মিলনেব পথ চাহিয়া থাকে না। সন্তান পালনেব কাজেব সমযটুকু পর্য্যন্ত নীচেব শ্রেণীব সকল জীব জোড বাঁধিযা বসিয়া থাকে না,—সাবা ভবিষ্যতেব জন্য জোড়-বাঁধা বজায রাখে। কাজেই মানুষের বেলায় বিশেষ কবিযা স্বীকাব কবিতে হইবে যে যাহাবা প্রতিনিয়ত যৌন আকর্ষণেব টান অনুভব কবে ও যাহাদেব পক্ষে অনেক বছব ধবিয়া সন্তান পালনেব কাজ চালাইতে হয তাহাবা ভবিষ্যতেব অনিশ্চিত উপযোগী মিলনেব অনিশ্চিত আশায় না থাকিয়া যৌবনেই পাকা জোড় বাঁধে বা স্থায়ী বিবাহ

কবে। যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে প্রাণেব টান বা আকাঙ্ক্ষাব অনুরূপে মানুষে স্ত্রী বা পুরুষ সঙ্গী পাইতে পাবে না বা সন্তানদেব বক্ষক পাইতে পাবে না।

পৃথিবীব প্রায় সকল স্থানেই অনুন্নত ও উন্নত মানব-সমাজ পরিদর্শন কবিয়া সমাজেব ক্রমবিকাশেব যে আইন বা নিয়ম কিছুদূব পর্য্যন্ত ধবা গিয়াছে, সেই নিয়মেব আলোকে মানুষেব বিবাহ-পদ্ধতিব বিকাশ ও বিচিত্রতাব আলোচনা কবিতেছি। বিবাহেব সংস্কাব ও পবিবাব-পালনেব সংস্কাব যে আদিম মানুষ পাইয়াছিল উত্তবাধিকাবসূত্রে, অর্থাৎ সুবিধাব বিচাব কবিয়া কোন এক সময়ে নূতন প্রথা গড়ে নাই—তাহা স্বীকাব কবিবার অনুকূলে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এবাবে প্রথমে মানুষেব যৌন আকর্ষণেব প্রবৃত্তিব বিশিষ্টতাব কথা বুঝিতে চেষ্টা কবিব।

আগেকাব কালে মানুষেবা যখন বনে পাহাডে স্বচ্ছন্দজাত সামগ্রীব উপব নির্ভব কবিত অথবা অল্প পবিমাণে চাষেব কাজ কবিতে শিখিয়াছিল, তখন এক-একটি পবিবারেব পোষণেব জন্য অতি অধিক স্থানেব প্রয়োজন হইত। একটা বড জেলাব মত আযতনেব স্থান অল্প কয়েকটি আলাদা-আলাদা পবিবাবেব পক্ষে হয়ত যথেষ্ট হইত না; কাজেই একটি পবিবাব হইতে অন্য পবিবাব অনেক দূব দূবে বাস কবিতে বাধ্য হইত। কোন একটা বিশেষ বড বনে শিকাবেব কাজে সফল হইবাব জন্য যখন অনেক লোকেব প্রয়োজন হইত, তখন অনেক স্থানেব অনেক মানুষকে এক সঙ্গে জুটিতে হইত ও শিকাবেব পবে আপনাদেব ভাগ নিয়া যে যাহাব দূব স্থানে চলিযা যাইত। ঠিক এই বকমে দূবে দূবে বাস কবা ও সময়ে সময়ে মেলার প্রথা এখনও উড়িষ্যাব জঙ্গলেব পাবুদিয়া ভুইঞাদেব মধ্যে আছে ও প্রায় পঞ্চাশ বছব আগে জুয়াঙ্গ প্রভৃতি ক্ষয়শীল জাতিব মধ্যে ছিল। ইহা আমাব নিজেব দেখা কথা। কি ভাবে এক-একটি গ্রামে কেবল একটি পবিবাবেব এক ঘব মানুষকে বাস কবিতে দেখিযাছিলাম, তাহা ১৮৮৫ অব্দে তখনকাব 'পতাকা' নামক পত্রিকায লিখিয়াছিলাম। অতি প্রাচীনকালে এই ধবণেব স্থিতিব সময়ে তরুণ-তরুণীবা যৌন আকর্ষণে পডিত তখন, যখন দৈবে অপবিচিত স্থানেব তরুণী-তরুণদেব সঙ্গে দেখা-শোনা হইবাব সম্ভাবনা হইত। মনেব প্রকৃতিব কিরূপ মৌলিক অবস্থাব ফলে, দূবেব অপবিচিতদেব সঙ্গে দেখা হওয়াব উপর যৌন-অনুবাগের বিকাশ নির্ভব কবিত, তাহা বুঝিয়া নিতে হইবে।

শিশুবা মা-বাপেব আশ্রয়ে যখন বাড়ে, তখন মা-বাপেব মনে যে শ্রেণীব দয়া-মিশ্রিত স্নেহ জন্মে তাহা যে অন্য সম্পর্কেব স্নেহ-মমতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর সেই ধাতুব স্নেহেব সহিত যে অন্য ধাতুব মমতাব আকর্ষণ

জুড়িতে পাবে না তাহা সকল বৈজ্ঞানিকেবাই স্বীকাব কবেন ও সাধাবণ সকল লোকেই স্বীকাব কবিবে। অন্যদিকে অসহায় অবস্থায় যে ধবণের স্নেহ-মমতায় শিশুবা বাড়িয়া উঠিবাব সময় মা বাপেব প্রতি প্রাণেব গভীব টান বাড়াইয়া চলে, সেই টানেব বা আকর্ষণেব ধাত্ বা ধাতু অন্য যে কোন ধবণেব আকর্ষণেব প্রকৃতি হইতে এত স্বতন্ত্র যে স্বাভাবিক নিয়মে সে আকর্ষণেব গায়ে অন্যবিধ আকর্ষণ লাগিতেই পাবে না। এই কথাটিও সর্ব্ববাদিসম্মত ও মনস্তত্ত্বেব পবীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বীকৃত। তবুও ইহাব উল্লেখ কবিতে হইল এই জন্য যে ফ্রয়েড্ ও তাঁহাব দুই-একজন চেলা ইহাব বিরুদ্ধে একটি কুপবীক্ষিত কথা বলিযাছেন। এখানে সে তর্ক তুলিব না; তবে এইটুকু বলিযা বাখি যে অনেক বড় বড় দক্ষ পণ্ডিতেবা ঐ মতেব অসাবতা ও ভুল ভালভাবেই দেখাইযাছেন। বাপ-মাযেব প্রতি মনেব যে ভাব সৃষ্টি কবিয়া ও পুষিযা শিশুবা যৌবনেব সীমা পর্য্যন্ত গিযা পৌছে, সেই ভাবেব গায়ে (আব কিছু না হউক, কেবল অধিক পবিমাণে বযোধিকদেব প্রতি) এমন ভাব আসিযা জোড়া লাগিতে পাবে না যে ভাবেব প্রথম অঙ্কুব হয় যৌবনেব বিকাশে। ফ্রয়েড পবীক্ষা কবিয়াছেন বিকৃত মস্তিষ্কদেব মনেব অবস্থা, আব সে পবীক্ষাও হইয়াছে অতি কুপবীক্ষিত। অন্যান্য অনুবাগেব প্রাকৃতিক বিকাশেব ইতিহাসে পাঠকেবা এই মতবাদেব অসাবতা পবিপূর্ণ ভাবে দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই অনেক নীচ শ্রেণীব জীবদেব জোড বাঁধাব প্রকৃতিব আলোচনায় উল্লেখ কবিয়াছি যে যৌন আকর্ষণ বাড়ে অপবিচিত বা stranger-কে দেখিযা, ও নিজেব দল বা বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াই বহু শ্রেণীব জীবকে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি কবিতে দেখা যায়। যদিও পৃথিবীময় সকল জাতিব সকল সমাজেই এই অভিজ্ঞতা ও সংস্কাব আছে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষেব মধ্যে কখনও ভাই-বোনে প্রেমেব আকর্ষণ জন্মে না, তবুও Westermarck প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদেবা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনায দেখাইযাছেন যে ভাই-বোন ত অতি দূবেব কথা, স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুবা যাহাদেব সঙ্গে অতি পবিচিত, যাহাদেব সঙ্গে একত্র খেলা কবিয়া বাড়িয়াছে তাহাদেব প্রতিও যৌন আকর্ষণ জন্মে না। যৌন আকর্ষণ যে যৌবনে অপবিচিতেব নূতন মুখ দেখিয়া প্রথম জন্মে, আব ঐ ভাব যে সঙ্গীদেব প্রতি সঞ্চাবিত স্নেহ-সৌহার্দ্দ্য প্রভৃতিব সম্পূর্ণ অননুরূপ, তাহা বুঝাইবাব জন্য তাঁহাব বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় Havelock Ellis এইরূপ লিখিয়াছেন—Between those who have been brought up together from childhood all the sensory stimuli of vision, hearing and touch have been dulled by use, trained to

the calm level of affection, and deprived of their potency to arouse erethistic excitement which produces sexual tumescence। এই সকল কারণেই যাহাকে বলে incest বা অবৈধযোগ তাহার প্রতি মানুষের আছে স্বাভাবিক গভীর ঘৃণা, যাহাকে পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে বলিয়াছেন deep-seated natural aversion।

যৌবনের প্রথম বিকাশে প্রেমের নূতন ভাব বাড়ে নূতন মুখ দেখিয়া। যুবকের চোখে তখন নূতন যুবতী রক্ত-মাংসে গড়া জীবের কিছু উপরে; she is a phantom of delight—সে আনন্দের মানস-প্রতিমা। একসঙ্গে বাসের প্রযোজনে এই আকর্ষণের কথা বাপ-মাকে জানাইতে হয়, কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম এই যে একথা নিয়া তরুণ-তরুণীরা দশজনের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারে না; নিজেদের কথা গোপনে রাখে, যেযুগে এদেশে প্রেমে পড়ার প্রকৃতি সামাজিক অবস্থার দরুণ জানা ছিল না, সেই যুগের কবিতাতেই রাধাকে 'সখি রে, সখি রে' বলিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে দেখি। মানুষের প্রকৃতিতে যে এই ব্রীড়া স্বাভাবিক, তাহা এ প্রসঙ্গে অন্য কথা বুঝিবার সময়ে প্রযোজন হইবে। Companionate Marriageএর অবৈজ্ঞানিক জজ্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে মেয়েরা তাহাদের একাধিক পুরুষ-সেবার গোপন প্রেম-লীলার কথা অসঙ্কোচে তাঁহাকে বলিয়াছে। এই মেয়েরা যে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা আত্মব্যবহারে ধ্বংস করিয়া লজ্জা ছাড়িয়াছে তাহা প্রেমের ভাবের বিশ্লেষণে দেখিতে পাইব। জজ্ গ্রন্থকার যৌন সম্পর্কের লজ্জার ভাবকে তুচ্ছ করিয়া বলিযাছেন যে তিনি অনায়াসে যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন লেখকের সমক্ষে নগ্ন হইতে পারেন। এই উক্তিটুকুই প্রমাণ করিতেছে যে তিনি স্বাভাবিক প্রেম-বিকাশের ও লজ্জার উৎপত্তির ইতিহাস একবিন্দুও জানেন না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতি নিভৃত জঙ্গলেও অসভ্য জুয়াঙ্গেরা গাছের পাতা গাঁথিয়া পরিয়া চিরকাল লজ্জা নিবারণ করিযাছে। বিবাহের ইতিহাসের প্রসঙ্গে এবিষয়ের পূর্ণ বিচার এখন না করিলেও চলে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষার বিকাশে যে নূতনত্বটুকু হয় প্রেমিকদের প্রার্থনীয় ও আকর্ষণের বস্তু, তাহার সঙ্গে এই লজ্জার ভাবও অনেকখানি জড়াইয়া আছে।

আমাদের সমাজে বিবাহ হইত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবার পূর্ব্বেই—শৈশবে, 'বিবাহ হইত' লিখিযাছি এইজন্য যে এখন সব্দা আইন পাস্ হইযাছে। শৈশবে বিবাহ হইবার পর বৌকে আসিয়া থাকিতে হইত স্বামীর বাড়ীতে বা শ্বশুর বাড়ীতে; যে কারণেই হউক নিয়ম ছিল ও আছে যে, বৌকে সর্ব্বদাই ঘোম্‌টা দিযা চলিতে হইবে। পরোক্ষভাবে ইহাতে এই উপকার হইত যে স্বামীটি বাড়ীর বোনেদের মত বাল্যেই তাহার স্ত্রীকে

সর্ব্বদা কাছাকাছি পাইয়া তাহাব প্রতি যৌন আকর্ষণেব ভাবটুকু নির্ম্মূল কবিতে পাবিত না, ঘোম্‌টায নূতনত্ব বক্ষা কবিত। নূতনত্বে আকর্ষণ জন্মে, ইহা প্রায় সকলেই বুঝি, কাজেই এ বিষয়েব অতিবিক্ত আলোচনা কবিব না।

অল্প পূর্ব্বে লিখিযাছি যে আদিমকালেব সমাজে যখন এক-এক পবিবাবেব লোক আপনাদেব দলের অন্যান্য পবিবাবেব বাসস্থান হইতে দূবে বাস কবিত, তখন তরুণ-তরুণীবা কোন-কোন প্রয়োজনে আপনাব বাসগৃহ হইতে দূবে গিযাই প্রেমে পডিবাব সুবিধা পাইত। আকর্ষণ পাকা হইলে যখন বিবাহ হইত তখন বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পবিবাবেব অবস্থা ও সুবিধা অনুসাবে ববকে বা তরুণ পতিকে হয তাহাব মা-বাপেব ঘবে পত্নীকে আনিযা বাস কবিতে হইত, না হয শ্বশুবেব ঘবে গিয়া থাকিতে হইত, আব না হয় ত নিজে একখানি নূতন গ্রাম বসাইবাব মত নিজেব বাসভবনেব কিছু দূবে পত্নীকে নিয়া নূতন ঘব-সংসাব পাতিতে হইত। যে-যে বিভিন্ন অবস্থায় এই ভিন্ন-ভিন্ন বকমেব ব্যবস্থা হইত, তাহা এখানে খুঁটাইয়া না বলিলে চলে। এই যুগেব তরুণ-তরুণীবা এমনভাবে আপনাদেব ঘব-সংসাবেব কাজে লাগিত, যাহাতে দূবেব অন্যান্য পবিবাবেব যুবক-যুবতীদেব সঙ্গে (কালে-ভদ্রে ছাড়া) মিলিয়া মিশিয়া আলস্যে সময় কাটাইবাব বা দীর্ঘ সময ধবিয়া গল্প-গাছা কবিবাব সময় পাইত না। যেখানে তরুণ-তরুণীবা আলাদা নূতন সংসাব পাতিত সেখানে ত দিন-বাত্রি নিজেদেব কাজে সময কাটাইত। তাহাব পব ঘাড়ে পড়িত শিশু-সন্তান পালনেব ভাব। না ছিল তখন একালেব মত যখন-তখন অপবিচিতদেব সঙ্গে বৈঠক বসাইবাব সুবিধা, আব না ছিল কাজকর্ম্মে ব্যাপৃতদেব মধ্যে অস্বাভাবিক বকমে যৌনভাবের নূতন-নূতন উত্তেজনা পাইবাব সুবিধা। সময়ে-সময়ে আনন্দেব উৎসবে নানা দলেব লোকে মিলিত বটে, কিন্তু এই সকল নানা-বয়সী লোকেব দঙ্গলে উপবে লিখিত ঘটনাগুলি ঘটিতে পাবিত না। ঐ উৎসবেব সময়ে নূতন তরুণ-তরুণীদেব মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে তাহাবা সুবিধামত দেখা-শোনা করিয়া প্রেম বাড়াইত, কিন্তু যাহাবা বিবাহিত হইয়া নিজেদেব নূতন দায়িত্বেব কাজে লাগিত তাহারা কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া নূতন প্রেম বাধাইবাব প্রবৃত্তি ও সুবিধা পাইত না। অতি সেকালের এই সকল অবস্থাব চাপে (স্বাভাবিক প্রবৃত্তিব বশেও বটে) সমাজেব প্রথম যুগে একনিষ্ঠ বিবাহ প্রথাই (monogamy) বিকশিত হইযাছিল। বেবাব প্রদেশেব সীমান্তে সাতপুরা পাহাড়েব কুর্কু সম্প্রদায়েব লোকেবা ও সম্বলপুব বাঁচী পর্য্যন্ত প্রসাবিত প্রদেশে ঐ কুর্কুদের জ্ঞাতি মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির লোকেবা সর্ব্বদাই একনিষ্ঠ বিবাহ-

বীতি চালাইয়া আসিয়াছে; কেবল বাঁচী অঞ্চলে হিন্দুদেব প্রভাবে ক্বচিৎ-ক্বচিৎ ঐ প্রথাব ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই জাতিব লোকেদেব বিববণ আমি যে গ্রন্থে লিখিয়াছি তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে আদিম জাতিব গতি-বিধিব অনেক কথা আছে।

একালেব উন্নত ও জটিল সমাজে স্ত্রী পুরুষে যেভাবে ঘবে বসিয়াই সুড়সুড়ি দেওয়া সাহিত্য পড়িয়া ও অন্য দশ বকমে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পাবে, সে অবস্থা যখন ছিল না তখনও প্রবল জাতিব পীড়ন-প্রভৃতিতে অনেক স্থানেব অসভ্য জাতিব লোকেবা নিতান্ত কোণ-ঠেসা হইযা পড়িয়া স্বাভাবিক বিকাশেব সুবিধা হাবাইযা যৌনসম্বন্ধে অনেক স্বৈবাচাবেব ও দুবাচাবেব হাতে পড়িযাছে। এ বিষযে মেলানেসিয়াব দৃষ্টান্ত অতি উপযোগী। বিখ্যাত পণ্ডিত মালিনওস্কি উহাদেব স্বৈবাচাবেব বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; কিন্তু ঐ মনীষী গভীবভাবে সকল অবস্থা বুঝিয়া লিখিযাছেন যে এখনও উহারা স্থাযী বিবাহকেই জীবনেব আদর্শ মনে কবে ও অনেক দুবাচাবেব মধ্যেও একনিষ্ঠ বিবাহেব আদর্শকে যথার্থ আদর্শ মনে কবে। প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদিম যুগে স্বাভাবিকভাবে একনিষ্ঠ বিবাহই জন্মিযাছিল আব ঐ প্রথাই মানুষেব মনে সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে আদর্শরূপে বহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ হববর্ট্‌ স্পেন্সব সমাজতত্ত্ব লিখিবাব সময়ে ভুলভাবে সংগৃহীত স্বেচ্ছাচাবেব বিববণই বেশি পাইয়াছিলেন; তথাপি গভীবভাবে সকল অবস্থাব বিচাব কবিয়া প্রায় ৬৫ বৎসব আগে লিখিয়াছিলেন যে, মানব সমাজেব গতি একনিষ্ঠ বিবাহেব দিকে ও মানুষেবা ভবিষ্যতে ঐ বিবাহপ্রথা পাইয়াই ধন্য হইবে।

সমাজেব কি-কি অবস্থায় প্রাচীনকাল হইতেই নানাস্থানে একনিষ্ঠ বিবাহেব বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল তাহাব আলোচনাতেও একনিষ্ঠ বিবাহেব স্বাভাবিকতা আবও সুস্পষ্ট হইবে। কোথাও দেখা দিয়াছিল ও এখনও চলিয়াছে বহুপত্নীগ্রহণেব বহু বিবাহ, আব কোথাও চলিয়াছিল ও চলিতেছে বহুপতিত্ব। এই সকল প্রথাব উৎপত্তিব কাবণ নির্দ্দেশ কবিয়া আলোচনা কবিতে হইবে যে, সামাজিক উন্নতিব জন্য একনিষ্ঠ বিবাহই শ্রেষ্ঠতম কি-না ও একালেব কোন-কোন সভ্য সম্প্রদায়েব মতেব অনুসাবে বিবাহ-প্রথা উড়াইযা দিয়া বা শিথিলতব কবিয়া মানুষেব সমাজ বক্ষা কবা চলে কি-না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদাব

ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ *

হর্বর্ট্ স্পেন্সর নাকি গদ্য-পদ্যের প্রভেদ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওই দুই রচনারীতির তারতম্য কেবল মুদ্রাকরের মর্জ্জির উপরে প্রতিষ্ঠিত: একপাতা ছাপা গদ্যের চারদিকে যে পাড় থাকে, তা সমান্তর, আর পদ্যের কিনারা বন্ধুর। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ, হয়তো সেইজন্যেই ওই ধরণের মৌল ব্যাখ্যায় আমার অবিদ্যা না-কেটে, মন হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রণালী-দুটির পার্থক্য আমার কাছে যতই সুস্পষ্ট হোকনা কেন, গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আমি অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারিনি; বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার পরিপূর্ণ সঙ্গমই সাহিত্য-তীর্থ-নামে বিদিত। এ-মতটি প্রথমে যদিও অতিরঞ্জিত ব'লে বোধ হয়, তবু এর সমর্থন শুধু সময়সাপেক্ষ। গদ্যবিলাসীরাও লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে রচনাবিশেষের আবেদন যখন বুদ্ধিবিবেচনার পাহারা এড়িয়ে, একেবারে তাঁদের অন্দরের দ্বারে ঘা দেয়, তখন তার থেকে কাব্যকে পৃথক করা কেমন যেন আর সার্থক মনে হয়না। কাব্যামোদীও অনুরূপ অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী। প্রায়ই এমন কবিতা তাঁর হাতে এসে পড়ে, যার মধ্যে, ছন্দ-মিল-উপমা-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, কাব্যের লেশমাত্র মিলেনা, যার রাজকীয় অলঙ্করণের ফাঁকে ফাঁকে দৈনন্দিন দাস্যের গদ্যময় দীনতা মুহুর্ম্মুহু উঁকি পাড়তে থাকে। এত কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই, সেখানে গদ্য পদ্য উভয়েরই সমান অধিকার, বিচার্য্য কেবল প্রবেশপ্রার্থীর মহানুভবতা, আবেগের গভীরতা এবং কার্য্যকারণের সুসঙ্গতি। এবং সাহিত্য যেহেতু মূলত জীবনেরই প্রতিবিম্ব, সেকালে, আমার মতে, গদ্য-পদ্যের যে-সমন্বয় সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, তার দৃষ্টান্ত জীবনেও সুলভ। মলিয়ের্-এর একজন নায়ক শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন যে তিনি আজীবন না-জেনে গদ্য ব'লে আসছেন। আমাদের মতো আষ্টপ্রহরিক মানুষেরা হৃদয়াবেগের তাগিদে বৎসরে যতবার কবিতায় কথা বলি, তার তালিকাও কিছু কম বিস্ময়কর হবেনা।

উপরে যা বললুম তাতে গদ্য-পদ্যের ঐক্য প্রমাণিত হলোনা জানি; এবং সে-চেষ্টাও আমার নেই. কারণ সকল সভ্য মানুষই এদের দ্বৈধ স্বীকার ক'রে এসেছে। যতদূর মনে পড়ে, এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই দুই সংজ্ঞার বাহকরূপে কেবল একটিমাত্র শব্দকে দেখা যায়।

---

* পরিশেষ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)
 পুনশ্চ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)

এবং আমি যেহেতু ভাষাব অতিমর্ত্ত্যতা মা'নিনা, মনে কবি মানুষেব অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধিব উপায়েব মতো ভাষাও আবশ্যিকতাব চালনে গ'ড়ে ওঠে, তখন আমি বিশ্বাস কবতে বাধ্য যে এ-দুটো অভিধাব মধ্যে অর্থেব বৈষম্য সহজ ব'লেই ওদেব আক্ষবিক চিহ্ন বিভিন্ন হয়েছে। কিন্তু গদ্য ও পদ্য সাধাবণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদেব স্কন্ধে যখন বসসৃষ্টিব দাযিত্ব এসে পড়ে, তখন আব এই সুনির্দ্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যেব অবকাশ থাকেনা ; তখন তাবা তাদেব স্বকীয় মূলধন একত্র ক'বে যে-যৌথ কাববাব পাতে, তাই জনসমাজে পায় কাব্য-আখ্যা। কাব্য যে মানবচৈতন্যেব শুদ্ধতম অবস্থা, এ-প্রসঙ্গে আজ বোধহয় আব মতভেদ নেই। অর্থাৎ কাব্যেব মধ্যস্থতায় যে-বস্তুকে চেনা যায়, তাব মধ্যে আব প্রতর্কেব স্থান থাকেনা। সে-পবিচয়েব বাচনিক অভিব্যক্তি হয়তো নেতি নেতি হতে পাবে, কিন্তু তাব কেন্দ্র নঙর্থক নয়, একটা অতিনিশ্চিত উপলব্ধিব উৎস। কাব্যলব্ধ বস্তু অনেক সময়েই অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু অজ্ঞেয় সে কোনোকালেই নয়। কথাগুলো হযতো মবমীদেব অতিশয়োক্তিব মতো শোনাচ্ছে ; কিন্তু তাহলেও ব্যাপাবটাব সঙ্গে কার্য্যত আমবা সকলেই অল্পবিস্তব পবিচিত,—প্রায় সকল জাদুকবই তাদেব ভেল্‌কিবাজি সম্পন্ন কবে এই উপাযে। ব্যাস-বাল্মীকিব বংশধবদেব মতো ভানুমতীব শিষ্যেবাও তাদেব চিবাচবিত কবকৌশলকে হয় সঙ্গীতেব আচ্ছাদনে, নয় অনর্গল বক্তৃতাব আড়ালে এমনি অসূর্য্যম্পশ্য ক'বে তোলে যে তাকে অলৌকিক ভাবা ছাড়া মোহমুগ্ধ দর্শকেব গত্যন্তব থাকেনা। সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিব সাহায্যে দর্শক বা পাঠকেব মনে একটা আবিষ্ট তন্ময়তাব সৃষ্টি হয়, যেটা স্বপ্নাবস্থাব অনুৰূপ। এই ধবণেব অর্দ্ধসুপ্তি সঞ্চাবণ ক'বেই সাপুড়ে আনে সাপকে বশে, হিষ্টিবিয়া বোগীকে হিপ্‌নোটিষ্ট্‌ চালায় স্বাস্থ্যেব পথে, কাবণ এ-অবস্থাব বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এব অনিকামতা, এব বাধ্যতা ও ব্যঞ্জনা-প্রবণতা। তবে পালনীয় আদেশমাত্রেব যেটা সনাতন লক্ষণ, এখানেও তাব ব্যতিক্রম চলেনা,—অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আজ্ঞাকাবীব মনে আত্মপ্রত্যয এবং আজ্ঞায সহজবোধ্য নিশ্চয়তা একেবাবেই অপবিহার্য্য। কাব্যেব গদ্যময অংশ এই প্রাঞ্জল বিজ্ঞাপনেব কাজে ব্যাপৃত থাকে, এবং পদ্য নেয় পূর্ব্বোক্ত সমাধি উৎপাদনেব ভাব। Cover her face, mine eves dazzle, she died young—জাতীয় একটা নিবালম্ব পঙক্তি যদি হঠাৎ বাস্তব জীবনে শোনা যায়, তবে তাকে পাগলেব প্রলাপ ব'লে মনে হ'লেও হতে পাবে। কিন্তু এই লাইনেব অহৈতুক প্রভাব নিয়ে অবসিকেবা যখন হাসাহাসি কবেন, তখন তাঁবা ভুলে যান যে ওযেব্‌ষ্টব কেবল ওই কটা কথাকে পবপর সাজিয়েই ক্ষান্ত হননি, ওই বাণী যাতে

দৈববাণীর মতো অমোঘ হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাও করেছেন পূর্ব্বগামী পদ্যের মোহময় কল্লোলে। শেক্‌স্‌পীয়রের রচনারীতিও অনুরূপ। সেখানেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এই প্রস্তুতিতেই অতিবাহিত হয়। তার পরে যখন পাঠকের মন সেই উদাত্ত ধ্বনিহিল্লোলে তন্দ্রালু হয়ে পড়ে, তখন আসে কবির দুর্নিবার্ব্বার প্রত্যাদেশ—Absent thee from felicity awhile। ততক্ষণে তার অন্তরের সমস্ত বাধা অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সুতরাং তখন এই অকিঞ্চিৎকর শব্দ-কটাকেই পাঠক ওঙ্কারের মতো প্রাথমিক ব'লে ভাবতে বাধ্য ; সে মনে করতে বাধ্য যে হ্যাম্‌লেটের চিরপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্কেও, কিছু দিনের জন্যে নয়, চিরকালের মতো, যবনিকাপতন হলো।

ধ্বনিরচনা মুখ্যত পদ্যের কর্ত্তব্য হ'লেও, গদ্য সে-সম্পদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন ধারণা অমূলক। তবে এক্ষেত্রে উভয়ের তুল্যমূল্য নয়। পদ্যের ধ্বনি সাধারণত সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু গদ্য সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যময়, তার উত্থান-পতন অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো বিধান মানেনা। এই স্বাধীনতার দরুণ গদ্যের কোনো লোকসান হয়নি, একথা বললে অন্যায় হবে কিন্তু এতে ক'রে তার লাভের অঙ্ক যে লোকসানের হিসাবকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছে, তাও একান্ত নিঃসন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানজগতে অনর্থ আজ যতই সম্মান পাকনা কেন, ললিত কলায় এখনো অর্থই অগ্রগণ্য, এবং গদ্য যেহেতু অর্থপ্রধান, তাই কনিষ্ঠ হয়েও শক্তিতে ও সম্ভাবনায় সে আজ পদ্যের অগ্রণী। অবশ্য পদ্য এখনো একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েনি, ভাবের ছায়াময় রাজ্যে আজও সেই পুরোধা ; এবং যৌবন-সুলভ চাপল্যের চালনে গদ্যও যখন কালেভদ্রে এই রাজত্বের সীমানায় এসে পড়ে, তখন তাকেও জ্যেষ্ঠের কাছ থেকেই এখানকার হালচাল-সম্বন্ধে উপদেশ নিতে হয়। কিন্তু কাম্য যেখানে বর্ণনা, প্রয়োজন যেখানে সংবাদের, সন্দেহভঞ্জনই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান এত গভীর যে ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন সুদ্ধ বিড়ম্বনা, যেখানে সংক্রমণ অসাধ্য, সম্ভব কেবল জ্ঞাপন, সেখানে গদ্যের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। জগৎ এক স্তরে ঢালাই করা হয়নি ; তার মৌলিক তত্ত্ব জানতে হ'লে হয়তো সমাধিলব্ধ দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই ব'লেই, উপরের স্তরগুলো অবজ্ঞেয় নয়, বরং সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। সুতরাং জীবনের দর্পণ হয়ে ওঠাই যদি কাব্যের চরম সার্থকতা হয়, তবে সেই প্রতিবিম্বে স্থূল স্তবকগুলোরও স্থান হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

বলাই বাহুল্য যে গদ্য-পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্ম্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্য অথবা বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে উক্ত জীবননিষ্ঠ কাব্য কোনোমতেই

বচিত হতে পাবেনা। তাব জন্যে প্রয়োজন এমন এক বাহকের যাব মধ্যে কোনো বাচবিচাব নেই, যাতে খুসিমতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতাযাতেব পথ পবিষ্কৃত হয়ে গেছে। কাব্যেব এই ধাতুসঙ্কবে নির্ম্মিত আধাবটিব নামই মুক্তচ্ছন্দ—Free Verse। এতে নূতন পুবাতন সকল বয়সেব সুবাই ইচ্ছামতো মেশানো চলে, অথচ পাত্র ফাটবারও কোনো ভয় থাকেনা। এ-ছন্দকে উপলক্ষ্যেব তাগিদে পদ্যেব নিযমে দববেশী নৃত্যে নামানো যায়, আবাব অবস্থান্তব ঘটলে গদ্যেব দীর্ঘায়িত গম্ভীব গতিও এতে বেমানান হযনা। ও সন্ন্যাস গ্রহণ কবেনি বটে, কিন্তু তাই ব'লেই যে সময়ে সময়ে গৈবিকধাবণ কবেনা এমন কথা বলতে পাবিনা। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কাবেব বাহুল্যে ওব অঙ্গে তিলার্দ্ধ স্থান অনাবৃত নেই। ওর কণ্ঠে "সাধাবণ মেয়ে"-ব সুস্থ সবল উক্তিও যেমন অব্যাহত বেজে ওঠে, "বিশ্বশোক"-এর মহানুভবতাও তেমনি শোভন লাগে। ওব প্রশস্ত পথে "ছেলেটা"-ও খেলে বেড়ায়. আবাব "শিশুতীর্থ"-এব যাত্রীবাও মিছিল ক'বে এগিয়ে চলে। ওব প্রাঙ্গণে "মাঝে মাঝে মবচে-পড়া কালো মাটি"-ব সীমান্তেই দেখা যায় "বক্তবর্ণ শিখবশ্রেণী রুষ্টরুদ্রেব প্রলয়-ভ্রূকুঞ্চনেব মতো"। অল্প কথায় ওব "গর্জ্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তবলতালে" শোনা যায় "চিরকালেব স্তব্ধতা আব চলতিকালেব চাঞ্চল্য।" ভাষাব সহজ বৈচিত্র্য এ-ছন্দকে শক্তি যোগায়, তাই সহস্র স্বৈবাচবণেব মধ্যে সে কেবল এইটুকুব হিসাব বাখে যে তাব লম্ফঝম্পে যেন অর্থগৌববেব কোনো হানি না-হয়। এই কাবণেই হ'তো গদ্যেব সঙ্গে এব বেশি মিল, কিন্তু তাহলেও পদ্যেব সঙ্গে এব অহি-নকুল সম্বন্ধ নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে আমাব বিবেচনায প্রাত্যহিক জীবনেও পদ্যেব স্থান খুব নগণ্য নয। কাজেই মুক্তচ্ছন্দেও পদ্যেব প্রভাব প্রচুব, এমন-কি হয়তো এতদূব পর্য্যন্ত বলা যায় যে এতে যে-গদ্য ব্যবহৃত হয়, তাও একেবাবে সাংসাবিক গদ্য নয। কাবণ কবিতাব প্রসঙ্গ যতই সামান্য হোক, তাব তলায তলায় একটা অসাধাবণ আবেগেব উৎস থাকেই থাকে; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্ম্মেব ভাষা নয়, মানুষেব উন্নীত চৈতন্যেব ভাষা।

মুক্তচ্ছন্দেব প্রশস্তি প'ড়ে, অনেকেই হযতো বিবক্ত হযে জিজ্ঞাসা কববেন, এই অর্দ্ধনাবীশ্বব মূর্ত্তিটি তো অতি আধুনিক শিল্পেব দান, সাহিত্যেব সুদীর্ঘ ইতিহাসে তবে কি কাব্য আব কখনো জীবনেব প্রতীক হয়ে ওঠেনি? বলাই বাহুল্য আদিকবিবা তাঁদেব কাব্যে জীবনকে যে সম্পূর্ণতা দিযেছিলেন, অর্ব্বাচীনেরা তাব ত্রিসীমানাতেও পৌছতে পারেনি। অবশ্য এই বৈকল্যেব

জন্যে আধুনিক লেখকদের দায়ী করা হয়তো অনুচিত; এমন হতে পারে যে ইতিমধ্যে জীবন এত বহুলাঙ্গ হয়ে পড়েছে যে কোনো একটা রচনায়—এমন-কি বিভিন্ন শিল্পের সম্মিলিত উদ্যোগেও—তাকে চিত্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু দোষ যদিও বা সদ্যস্তন লেখকদেরই হয়, তবু তাদের পদ্ধতি সত্যসত্যই নিরপরাধ। পুরাতন কবিতার কলাকৌশলের সঙ্গে মুক্তচ্ছন্দের তুলনা করলে, কোনো দ্বন্দ্ব ধরা পড়বেনা ব'লেই আমার বিশ্বাস। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে জগৎ কখনো দাঁড়িয়ে থাকেনা, কালক্রমে শৈবাল বনস্পতির আকার ধরে। অচেতন বিবর্ত্তনেই যখন এই ফল ফলে, তখন এত বৎসরব্যাপী সজ্ঞান অনুসন্ধানের শেষে বর্ত্তমান কাব্যের বহিরেখায় যদি অল্পাধিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তবে বিস্মিত হওয়া অসঙ্গত। আসলে সাহিত্যের সত্তা অবিকৃতই থেকে গেছে, এবং এ-যুগের ভাবুকেরা কাব্যের তরফ থেকে যে-স্বাধীনতার দাবি করছেন, তা ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়। আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণায় সেকালের কবিরা একালের কবিদের চেয়ে কিছু কম তৎপর ছিলেননা; এবং এইজন্যে শেক্‌স্‌পীয়র-প্রমুখ প্রথম এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ কতখানি লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, তা ইংরেজিনবিশমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের আগ্রহ কমেনি, তা সত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে স্থান-কাল-ঘটনার গতানুগতিক ঐক্যের চেয়ে জীবন্ত নাটকের আবশ্যকতা অনেক বেশি। এমন-কি, সারি-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষরের অভাবনীয় সম্প্রসারণ দেখে, মনে হয় যে ছন্দসম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব তাঁদেরই অনুবর্ত্তী। অবশ্য সে-যুগে, আজকালকার মতো, একই কবিতায় গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ চলতোনা। কিন্তু একই দৃশ্যে, একই চরিত্রের মুখে সাধুভাষা ও সাধুচ্ছন্দের সঙ্গে অপভাষা ও অপচ্ছন্দের যে-উদার রাখীবন্ধন অনায়াসে সাধিত হতো, এই বিপ্লবের দিনেও তার অনুকরণ অসম্ভব। যদিও তখনকার গীতিকবিতায় সাম্প্রতিক আত্ম-নির্ভরতা ছিলোনা, তবু ছন্দকে তাঁরা কখনো কারাগাররূপে দেখেননি, তাকে গণ্য করেছিলেন কাব্যপ্রেরণার প্রণালীরূপে। ফলে এলিজাবেথীয় কাব্য কখনো গণিতের বশ্যতা স্বীকার করেনি। সে-শাসন সুরু হলো মিল্‌টনের আমলে। তাঁর মহাকাব্যও নবাবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষরে লিখিত; কিন্তু প্যারাডাইস্ লষ্ট্-এর ছন্দ প্রবীণ শেকস্‌পীয়র ও নবীন বোমণ্ট্-ফ্লেচারের ছন্দের জ্ঞাতি, এমন কল্পনাও কষ্টকর। অবশ্য ওই কবিত্রয় সম্ভবত বাধ্য হয়েই ছন্দোমুক্তি বরণ করেছিলেন, কারণ তাঁদের আবেগপুঞ্জ শেষের দিকে এতই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলো যে অমিত্রাক্ষরের পাঞ্চপর্ব্বিক স্বাচ্ছন্দ্যেও তাকে কুলানো যায়নি। সুতরাং এঁদের নাম না-নিয়ে, যদি মার্লোর মতো সাম্যবিলাসী ছান্দসিকের সঙ্গেই মিল্‌টনের তুলনা করি, তবু

একটা অকারণ বিষণ্ণতার পীড়নে মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; একটা অজানা অবরোধের আশঙ্কায়, এত বড় মহাকবিকে ছেড়ে, প্রাণ চায় হেরিকের মতো গ্রাম্য কবির আসঙ্গ; বুদ্ধি যদিও নতশিরে মানে যে লুপ্তস্বর্গের বার্ত্তা কেবল এঁর কাছেই মিলতে পারে, তবু অন্তর খোঁজে মার্ভেল্-এর ফুলবাগানের খোলা হাওয়া, যেখানে পার্থিবার ছলাকলা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে এই ধূলির ধরণীকেই স্বর্গাদপি গরীয়সী ক'রে রেখেছে।

জানি, মিল্টনকে খর্ব্ব করার প্রবৃত্তিও হাস্যকর, এবং সে-প্রয়াস আমার নেই। তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ও অতুলনীয় সাফল্যের কথা না-পাড়লেও, কেবল তাঁর অধমর্ণদের অফুরন্ত তালিকার দিকে চাইলেই সে-মহত্ত্বের ঠিকানা পাওয়া যাবে। এ-ঋণ এমনি বিশ্বব্যাপী যে অখ্যাত বাঙলা সাহিত্য সুদ্ধ তার দায় এড়াতে পারেনি। কিন্তু তাহলেও একথা বলা নিশ্চয়ই মার্জ্জনীয় যে তাঁর কাব্যাদর্শের তনুবাত শিখরে আমার মতো জড়বাদীর স্বচ্ছন্দ বিহার স্বতই সংক্ষিপ্ত। মিল্টনী কাব্যের নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্যে মানুষী দুর্ব্বলতার স্থান নেই, তার মর্ম্মে নীতিকারের নিশ্চিন্ত নির্ব্যূঢ়তা নিত্য বিরাজমান, তার সম্ভ্রান্ত বন্ধুমণ্ডলীর মুখপাত্র স্বয়ং বিধাতা। কাজেই যে-নাট্যশালায় মিল্টনী ট্রাজিডির অভিনয় হয়, সেখানে মর্ত্ত্যচারীর প্রবেশ কোনোমতেই সহজসাধ্য নয়। অবশ্য অনেকে বলেন যে একটা অলৌকিক গরিমাই মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। আমি কিন্তু এ-মত গ্রহণে অক্ষম। কথাটা যদি একেবারে মিথ্যা নাও হয়, তবু তার একাদশদর্শিতা নিঃসন্দেহ। আমি অন্তত যে-মহাকাব্য-দুটির সঙ্গে সুপরিচিত—মহাভারত ও ইলিয়ড্—তাদের পরিপ্রেক্ষিতে মিল্টনী পবিত্রতার ছায়া নেই। এই কাব্য-দুটির বাণী মুখ্যত অনুবাদের মধ্যে দিয়েই আমার কাছে পৌঁছেছে, তাই তাদের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হবে। কিন্তু তাহলেও এ-সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক চলেনা যে ওই আদি কবিদ্বয়ের দৃষ্টি বর্জ্জনের দিকে নিবদ্ধ ছিলোনা, অঙ্গীকারের জন্যেই উন্মুখ ছিলো। তাঁরাও কিছু তাঁদের কাব্য থেকে দেব-দেবীদের বাদ দেননি, বরং এমন এক প্রাক্তন যুগের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন যখন সংসারের তুচ্ছতম ব্যাপারগুলিও অমর অধিকর্ম্মাদের উৎপাত থেকে অব্যাহতি পেতোনা। তবু অনুবাদের সময়ে দেখা গিয়েছে যে এই অতিমর্ত্ত্য অতিথিদের উক্তি-প্রত্যুক্তি সাধুভাষা ও পদ্যছন্দের সংস্পর্শে কেমন যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ চলিত ভাষার অনাড়ষ্ট চরণ যেই পাষাণীর অঙ্গস্পর্শ করে, অমনি তার এতদিনের জড়তা কেটে যায়, অমনি বুঝি চিরন্তনী ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু মৃত সে কখনই হবেনা। এ-সত্য কেবল ইলিয়ড্-

অনুবাদকেরাই অনুভব করেননি, যিনিই প্রাচীন কাব্যকে ভাষান্তর করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরই অভিজ্ঞতা অনুরূপ। ষোড়শ শতকে ইংরেজি ভাষা যখনও সংহত ও সংস্কৃত হয়ে ওঠেনি, তখন সে-দেশের অনুবাদশিল্প উৎকর্ষের যে-স্তরে পৌঁছেছিলো, আজকের পরিবর্দ্ধিত ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও আমরা তার অনেক নিচে প'ড়ে আছি। সুতরাং এমন মনে করা অনুচিত নয় যে অপ্রচলিত হয়ে প'ড়ে যত শব্দ আজ আভিধানিক জাদুঘরে সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে, কর্ম্মজীবনে তাঁদের অত ঘটা ছিলোনা। দূরত্ব চিরদিনই গৌরবপ্রসূ, কাজেই মহাভারতাদির ভাষাকে যদি কোনো আধুনিক অনবদ্য ব'লেও ভাবেন, তবু সমসাময়িকদের চোখে সে ভাষা যে অতিশুদ্ধির পরিচায়ক ছিলো, এমন বিশ্বাস খুব সম্ভব পোষণীয় হবেনা।

সে যাই হোক, এতদিন অপ্রতিহত প্রতাপে অনাচার ক'রে এসে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কাব্য হঠাৎ তার অমায়িক অবৈধতা পরিত্যাগ করলে। এই উৎক্রান্তির ইষ্টানিষ্টের ভার যদিও মুখ্যত মিল্‌টনকেই বহন করতে হবে, তবু আসলে তিনি উপলক্ষ্যমাত্র। এলিজাবেথীয় যুগের আতিশয্যের পরে তথাকথিত ধ্রুপদী আদর্শের প্রাদুর্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। উপরন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যের "শ্রমবিভাগ"-ও অনেক দূর এগিয়েছিলো। ড্রাইডেনের অধ্যবসায়ে আড়ষ্ট ইংরেজি গদ্যে যে-অপূর্ব্ব সংবেদনশীলতার সাক্ষাৎ মিললো, তার পরে পদ্যকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করার আর সার্থকতা রইলোনা। দেখা গেলো, গল্প বলা, তর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কর্ত্তব্য, যা এতদিন অগত্যা পদ্যের সাহায্যে কায়ক্লেশে সেরে নিতে হতো, তা গদ্যের দ্বারা অতি সহজে ও শোভন উপায়ে সম্পন্ন হয়। উপরন্তু ঠিক এই সময়েই জীবনের স্থূল দিকটাও খুব বিস্তৃত হয়ে পড়লো। রিনেসেন্সের পর থেকে কৌতূহলী মানুষ যে-সকল নূতন ক্ষেত্রে কর্ষণ আরম্ভ করেছিলো, তাতে অভাবনীয় ফল ফল্‌লো, এবং বোঝা গেলো যে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার পদ্যের মারফতে কোনোমতেই লোকসমক্ষে উপস্থিত করা যাবেনা। এ-অবস্থায় গদ্যের পদবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তখনকার সাহিত্যিকেরা যদি সত্যই কঠোরহৃদয় ব্যাবহারিক মানুষ হতেন, তবে অকারী মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে অব্যবহার্য্য পদ্যকেও তাঁরা বিস্মৃতির পিঁজরাপোলে পাঠাতে দ্বিধা করতেননা। কিন্তু অতখানি অকৃতজ্ঞতা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলোনা, তাঁরা ঠিক করলেন যে সভ্যতার এই অতিজীবিত সেবকটিকে অজ্ঞাতবাসে না-পাঠিয়ে, তাকে দৈনিক জীবনযাত্রা থেকে ছুটি দেওয়া হবে; কিন্তু যখন উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় আসবে, তখন মিছিলের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করবে সে-ই।

আমাব বিশ্বাস মুদ্রাযন্ত্রেব বহুল প্রচলন এই সঙ্কল্পেব অন্যতম কাবণ। যতদিন অলি-গলিতে ছাপাখানাব আবির্ভাব হয়নি, যতদিন সাহিত্যেব পাণ্ডুলিপি কেবল গ্রন্থাগাবেই বিবাজ কবতো, ততদিন কাব্যেব ইচ্ছাবিহাব অপেক্ষাকৃত নিবাপদ ছিলো, কাবণ ততদিন যাবা কাব্যেব মজলিসে আসন পেতো, তাবা অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ, কাব্যেব ঐতিহ্যেব সঙ্গে সুপবিচিত, তাব দুর্ব্বলতাব সম্বন্ধে সচেতন, কাব্যপাঠে সুদক্ষ। কিন্তু এখন থেকে যাবা ভিড ক'বে এলো, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাব ধৈর্য্য তাদেব ছিলোনা। সাহিত্য তাদেব অবসবেব সাথী হযে উঠলো, এবং যেহেতু সে-যুগেব প্রলোভন যে-মাত্রায় বেডেছিলো, অবসব সে-অনুপাতে বাড়েনি, তাই লেখকেব প্রচ্ছন্ন অভিপ্রাযকে প্রত্যক্ষ কবাব মতো সময তাবা ক'বে উঠতে পাবলেনা, আভবণেব পাবিপাট্যকে প্রকর্ষতাব চিহ্ন ব'লে ভুল কবলে। এই শ্রেণীব পাঠক, বিশেষ ক'বে এই শ্রেণীব অনুকাবকেব কাছে স্বাধীনতা সহজেই স্বেচ্ছাচাবে পবিণত হতে পাবে, কাজেই সন্ত্রস্ত কবিবা কাব্যকে বিধিবদ্ধ কবাব চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করলেন। ফলে হিবোযিক কাপ্‌লেটেব শৃঙ্খল নির্ম্মাণ হলো, স্থান-কাল-ঘটনাব নির্ব্বাসিত সঙ্গতি বঙ্গালযে পুনঃপ্রবেশ কবলে, বিবেচকেবা জানালেন যে ট্রাজিডিব জাতিবক্ষাব একমাত্র উপায হচ্ছে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে বাজসিক আডম্ববে বর্ম্মাবৃত কবা। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাষাও এত গম্ভীব হ'যে উঠলো যে জনসাধাবণ শ্রুতিমাত্রেই বুঝলে এই রুচিসমাহিত সমাজে শৈথিল্যেব উপক্রম সুদ্ধ দণ্ডিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত এত ক'বেও অভিষ্টসিদ্ধি হলোনা, ফল দাঁডালো ঠিক উল্‌টো। হয়তো সংস্কৃতি কাব্যেব প্রকৃতিবিবোধী। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে ড্রাইডন-পোপেব পবে ইংবেজি কাব্যেব অতি উর্ব্বব ভূমিও, বহুদিন পর্য্যন্ত ঊষর বয়ে গেলো। আত্মপ্রকাশেব প্রণোদনা যাদেব সক্রিয ক'বে তুললে, তাবা ববণমালা দিলে গদ্যেব গলায। অন্যেবা গ্রে-ব আক্ষেপকে সার্থক ক'বে, অব্যক্তিব সোনাব খনিতে গেলো মৌবসি স্বত্বেব খোঁজে। অবশ্য ব্লেকেব মতো দু-একজন হঠকাবী গোল বাধাতে ছাড়লেনা বটে, কিন্তু সমসামযিক সুধীমণ্ডলী তাতে বিচলিত না-হয়ে, তাদেব ঔদ্ধত্যকে উন্মত্ততা ব'লে ক্ষমা কবলেন; এবং অতিবড় খেযালীকেও একথা মানতে হবে যে তাদেব কবিত্ব-সম্বন্ধে সহধুবীদেব মত যতই ভ্রান্ত হোক, তাদেব চিত্তবিকাব-সম্বন্ধে সেকালেব সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়।

এব পবেব ইতিহাস সুবিখ্যাত। আঠাবো শতকেব শেষ দশায় ফবাসীদেশে যে-উপনিপাত সুরু হলো, তাব ধাক্কা রুচিবাগীশেবা সামলাতে পাবলেননা, কণ্ঠাগত-প্রাণে স্বীকাব কবলেন যে উপেক্ষিত বর্ব্ববেবা সত্যই যদি ক্ষেপে ওঠে, তবে স্বয়ং বিধাতাবও নিস্তাব নেই। ফলে কলিন্স্‌-এব

গৌবব পোপেব প্রতিপত্তিকে ছাড়িয়ে গেলো, ওযার্ডস্‌ওযার্থ্ চলতি ভাষাকে কাব্যেব ভূষণ ব'লে প্রচাব কবলেন, অভিজাত বাইবণ দিগ্বিজযে বাহিব হলেন, বথপতাকায় বর্ণস্‌-এব কৃষকী প্রবচন লিখে। দেখতে দেখতে গদ্যের চাহিদা কমে, পদ্যেব প্রসাব বেড়ে গেলো, শুভবাদীবা জোব গলায হাঁকলেন যে কাব্যসম্ভাবে উনিশ শতক এলিজাবেথীয যুগকেও হাব মানাবে, এবং যেন তাঁদেব আত্মশ্লাঘাব শাস্তিস্বরূপ, মাত্র ছাব্বিশ বছব বযসে এমন এক কবিব দেহান্তব ঘটলো যিনি শেক্‌স্‌পীয়বেব সমকক্ষ না-হলেও, পদমর্য্যাদায ঠিক তাঁব নিচেই আসন পেলেন। এব পবে কাব্যকে ঠেকিয়ে বাখা দায হলো। নিববচ্ছিন্ন সুসমযেব ফলে কবিবা আবাব উচ্ছৃঙ্খল হযে উঠলেন। গদ্য-পদ্যেব পুনর্বিবাহে পৌবহিত্য ক'বেও ব্রাউনিঙ জাতিচ্যুত হলেননা, টেনিসন্ গ্রাম্য ভাষায় কাব্যবচনাব প্রযাস পেলেন, এবং স্বযং স্যুইন্‌বর্ণ্ বিদ্রোহী হুইট্‌ম্যানকে কাব্যেব ত্রাণকর্ত্তা ব'লে উপাধি দিলেন। অবশ্য মুক্তচ্ছন্দেব এই আদিপুরুষটিব যথার্থ মূল্য ইংলণ্ড সেদিনেও বোঝেনি, আজও ঠিক বোঝেনা; এবং অল্প দিন যেতে-না-যেতেই স্যুইনবর্ণ্ সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্রেব প্রত্যাহাব ক'বে, নিজেব অমার্জ্জনীয ভুল নিষ্কুণ্ঠ-চিত্তে মেনে নিযেছিলেন। কিন্তু তাহলেও স্যুইনবর্ণেব পবে যে-কবিদেব আবির্ভাব হলো, তাদেব কাব্যাদর্শে একটা অভাবনীয় অভিনবত্ব দেখা দিলে। ইযেট্‌স্‌-প্রতিষ্ঠিত "বাইমার্স্ ক্লাব"-এব সভ্যেবা যে-কবিতা লিখতে লাগলেন তাব অঙ্গে গদ্যেব পাপস্পর্শ হয়তো লাগলোনা, কিন্তু স্যুইন্‌বর্ণেব বসালু বহুলতাও প্রশ্রয পেলেনা। বক্ষণশীলেদেব উপহাস কুড়িযে তাঁবা ঘোষণা কবলেন যে কাব্য ততটা পাঠ্য নয, যতটা শ্রাব্য। এই অনভ্যস্ত আদর্শে কাব্যেব সঙ্গে জনগণেব ঘনিষ্ঠ সংযোগ তো স্বীকৃত হলোই, উপবন্ত লিখিত সাহিত্যেব যেটা অবশ্যম্ভাবী পবিণাম, অর্থাৎ অচলযাতন পাবিভাষিকতা, তাও কেটে গিযে সঞ্জীবিত কাব্য আবাব ঋজু, স্বচ্ছ ও স্বাবলম্বী হযে দাঁড়ালো। দেখা গেলো যে কাব্যকে আবৃত্তিব যোগ্য ক'বে তুলতে হলে, তাব অলঙ্কাবেব ভাব হালকা কবা দবকাব। সুতবাং ছন্দেব গ্রন্থী আলগা ক'বে, ভাষাব স্বাভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্যকে অব্যাহতি দেওযা হলো, রূপকেব মোহ কাটিযে প্রত্যক্ষেব অনুসন্ধান চললো. অপবিচযেব অসীম বিস্ময অত্যাসঙ্গেব পবিতৃপ্তিব কাছে মাথা নোযালো। অবশ্য এত কবা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীব শেষ কবিবা ছন্দোমুক্তিতে পৌঁছতে পাবলেননা, তাব জন্যে আবো পনেবো-বিশ বছবেব দেবি ছিলো। তবু এই বিদ্রোহবাহিনীব শিবোমণিদেব অকালমৃত্যুব পবেও, সাইমন্‌স্ ফবাসীদেশ থেকে যে-নববিধানেব নমুনা ইংবেজি কাব্যে আমদানি কবতে লাগলেন, তা দেখে আব সন্দেহ বইলোনা পবিবর্ত্তন আসন্ন। এব পরেব ঘটনা

আব ইতিহাসের অঙ্কাব্ঢ় নয়, সমসামযিক পক্ষপাতেব অন্তর্গত। আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টা এখনো পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হযনি। কাজেই তাব ভবিতব্য-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া নিশ্চযই মূঢ়তা হবে। তবে একটা কথা বোধহয ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হযেছে ; সে হচ্ছে এই যে কাব্য আব মুক্তি, এ-দুয়েব মধ্যে কোনো বিবোধ নেই, ববং এবা পবমাত্মীয ; যদি নিবাসক্ত ভাবে সাধনা কবা যায় তবে অবাজকতাব মধ্যে দিযেও কাব্যেব নির্দ্বন্দ্ব লোকে উপনীত হওয়া যাবে।

কাব্যেব স্বরূপ-সম্বন্ধে আমাব উদ্‌ভট অনুমান যে কেবল ইংবেজি সাহিত্যেব পৃষ্ঠপোষণেই প্রমাণিত হবেনা, তা আমি জানি। অপবাপব সাহিত্যকে সাক্ষী ডাকা আমাব সাধ্যেব অতীত। কিন্তু তাহলেও একটা অন্ধ ধাবণা আমি কিছুতেই কাটিযে উঠতে পাবিনা যে সমস্ত পাশ্চাত্য কাব্যই আমাব সমর্থন কববে। প্রাচীব কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কাবণ এ-অঞ্চলে মানুষেব শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি কেবল আধ্যাত্মচিন্তাতেই নিমগ্ন থেকেছে। ফলে এদেশেব কাব্য হয চিত্তবিনোদনেব নিঃসাব উপাদান, নয তত্ত্বদর্শনেব আধাব। কাজেই যেখানে অচিন নূতনেব অগমন-আশঙ্কায় আমাদেব আমোদ-প্রমোদে বিঘ্ন ঘটেছে, সেখানে কবি এতটুকুও আমল পাযনি, আবাব যেথায উপদেশকে সাবগর্ভ মনে হযেছে, সেথায় উপদেশবাহকেব বিষযে আমবা নিকুৎসুক থেকেছি। এতাদৃশ আবেষ্টন উচ্চাঙ্গেব শিল্প-সৃষ্টিব প্রতিকূল, কাবণ জীবনেব সকল হিসাবনিকাশেব মতো ললিত কলাব খতিযানেও দেনা-পাওনায যোগবিয়োগ হয়ে কেবল শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। তবু যতদূব জানি ও শুনেছি, তাতে মনে হয পূর্ব্বেব উদাসীনতাও আব অটল নেই। চৈনিক জীবনেব সর্ব্বত্র প্রথাপসাবণেব ফলে যে-সর্ব্ব-নাশেব সূত্রপাত হযেছে, চীনে কবিতায তাব ছাযা দেখিনি ; এবং জাপানী সাহিত্যেব অভিজ্ঞতা অন্যরূপ নয ব'লেই আমাব বিশ্বাস। ভাবতেব বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেব সঙ্গে আমি পবোক্ষভাবেও পবিচিত নই, তাই তাদেব বিষয়ে মন্তব্য কবা আমাব অসাধ্য। কিন্তু বাঙলা সাময়িকীতে বাকবিতণ্ডাব বহর ও ঝাঁঝ দেখে মনে হয যে এদেশ পাণ্ডববর্জ্জিত হলেও, কালাতিক্রান্ত নয। অবশ্য বাঙলা কাব্যে খুব বেশি ভাঙাচোবাব দবকাব হযনি, কাবণ তাব গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতা কোনোদিনই অত্যধিক ছিলোনা। কিন্তু এই ব্রাত্যতাব কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আব কতটা আবশ্যিক, তা বলা কঠিন। আমাব বিবেচনায উনিশ শতাব্দীব পূর্ব্বে বাঙলা গদ্যেব নামমাত্র জানা ছিলোনা ব'লেই এখানকাব ছান্দসিকেবা বাধ্য হযে পদ্যকে অবাবিত-গতিব অধিকাব দিযেছিলেন। নচেৎ যাবা সমাজেব শ্রদ্ধা হাবাবাব ভয়ে নিজেদেব কামাগ্নিকে দেবতাব আড়ালে লুকাতে দ্বিধা কবেনি, তারা

যে কেবল ছন্দের বেলায় স্বায়ত্তশাসনের নির্দ্দেশ মানবে, এমন ভাবা সহজ নয়। প্রাচ্যের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বঙ্গসাহিত্যেও জীবনের প্রভাব অত্যল্প, কিন্তু যখন তার বংশকবিকার কথা স্মরণ করা যায়, তখন মনে হয় এই অনধিক সংস্পর্শই যথেষ্ট বিস্ময়কর। কারণ বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়ায়, এবং সে-সাহিত্যের গর্ব্বই হচ্ছে এই যে তার ভাষা দেবভাষা, অর্থাৎ মানুষের অকথ্য ভাষা। নৃতত্ত্ববিদেরা ব'লে থাকেন মন্ত্র বিবর্ত্তিত হয়েই কাব্যে দাঁড়িয়েছে। এক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আচারনিষ্ঠা দেখেই এ-সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে হবে। অবশ্য আর্য্যাজাতীয় দু-একটা ছন্দ শুনে, এমন ভুল হয়তো মাঝে মাঝে হয় যে সংস্কৃত কবিদের সহিষ্ণুতাও বুঝি অসীম ছিলোনা। কিন্তু সে-মরীচিকার আয়ু সামান্য, ঈষদ্ মনোযোগেই ধরা পড়ে আর্য্যার আপাত-স্বাচ্ছন্দ্যও একটা অকাট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ব্যায়ামকুশলী সৈন্যদলের কুচকাওয়াজে যেমন থেকে থেকে এক-একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও আয়াসসাধ্য শৈথিল্যের ফাঁক আসে, এও ঠিক তেমনি। নেপথ্য থেকে প্রযোজক ইঙ্গিত করেছেন, তাই অনুগত নর্ত্তকের দল পূর্ব্বাভিনীত ভঙ্গীতে সার ভেঙে, শিক্ষানুরূপ উপায়ে বৈচিত্র্য-উৎপাদনের চেষ্টা করছে।

আমাদের বিধিলিপিতে এতখানি দুর্দ্দশা লেখা ছিলোনা বটে, তবু পয়ারের পদ্মমধু খেয়ে বঙ্গভারতীও নেহাৎ অল্প বিব্রত হননি। তবে দেবীর পুণ্যবল বোধহয় অশেষ ছিলো, তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় একদিন হঠাৎ এক নূতন কালাপাহাড় সদর্পে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সরস্বতীকে বনেট পরিয়ে দিলেন, এবং পোষাকের এমনি গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাপল্যের হিল্লোল উঠলো। দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেলের বিপ্লবপ্রবৃত্তি যতটা ছিলো, কবিপ্রতিভা ততখানি ছিলোনা, কাজেই মেঘনাদ-বধ যে-পরিমাণে গর্জ্জন করলে, তার তুল্য বর্ষণে অপারগ হলো। মাইকেলের উপরে মিল্টনের প্রভাবও অত্যল্প ছিলোনা। এবং রুগ্ন কারাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে এই কবিরাজের চিকিৎসা যেহেতু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, তাই মাইকেল কেবল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই ক্ষান্ত হলেন, বুঝলেননা যে ভাষা প্রাকৃত না-হলে প্রকৃত কাব্য লেখা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ভাষা-সম্বন্ধে তিনি কোনোকালেই উদাসীন ছিলেননা। তৎকালীন পুঁথিগত বাঙলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিলো, এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তাঁকে যদি শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোশেরই শরণাপন্ন হতে হয়ে থাকে, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবেনা, অসংস্কৃত বাঙলার আত্যন্তিক দৈন্যও মেনে নিতে হবে। অবশ্য এই দারিদ্র্যের জন্যে আমরা লজ্জা অনুভব করতে

বাধ্য নই, কারণ অত শতাব্দীর অবজ্ঞায় যে অপাঙক্তেয় হয়েছিলো, সেই কাঠবিড়ালী যদি লঙ্কাবিজয়ের দিনে গায়ের ধূলা ঝেড়ে সেতুবন্ধের এক-আধটা ছিদ্রও ভরাতে পেরে থাকে, তবে সেটাই তার প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তির পরিচয়, অন্য সমস্তই একান্ত বাহ্য। উপরন্তু মাইকেল-সম্পর্কে একথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি ইংরেজিশিক্ষার প্রথম যুগের মানুষ, এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিলো তখনকার চিৎপ্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এমন সন্দেহ হয়তো অনুচিত নয় যে মাইকেল বাঙলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেননা, তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবাই ক'রে গেছেন, তাকে সুস্থ করতে পারেননি। এ-অনুমান মিথ্যা হলেও এটা অন্তত সত্য যে বাঙলা আক্ষরিক ছন্দকে স্বভাবত ত্রৈমাত্রিক মনে করায় যতখানি বৈদেশিকতার আভাস আছে, বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের গোত্রজ ব'লে ভাবায় সে-পরিমাণের বিধর্ম্মিতা নেই। কিন্তু এ-আলোচনার মূল্য খুব বেশি নয়, কারণ মাইকেলের ছিদ্রান্বেষণ আমার অনভিপ্রেত। আমি জানি যে মহাকবি না-হলেও নিয়ামক হিসাবে তিনি অদ্বিতীয়, এবং যতদিন বাঙলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে, ততদিন তাঁর নামকীর্ত্তনে লোকাভাব হবেনা। কারণ মাইকেল শুধু মৃয়মাণ বাঙলা কাব্যকে উদ্দীপিত ক'রেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর অব্যবহিত পরেই বঙ্গাকাশে যতগুলি জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছিলো, তারা নিতান্তই আকাশ-প্রদীপ। তবু বাঙালী মনীষীরা এই নগণ্যদের জন্যে যে-অকৃপণ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই মৃন্ময় দ্রোণের চরণে একলব্যের অর্ঘনিবেদনের মতো।

মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না-পেলে বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হতোনা, এমন কল্পনাও পাগলামি, কারণ তাঁর সমান কবি শতযুগে একবার জন্মায়, এবং তাদের আগমন ধূমকেতুর মতোই স্বয়ম্বশ ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাহলেও একথা অতিসত্য যে মাইকেল ও বিহারীলালের বৈফল্যের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে জাজ্বল্যমান না-থাকলে, তাঁকে অনেক অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে বহু শক্তি ব্যয় করতে হতো। ভুললে চলবেনা যে শুধু আবেগাতিশয্য বা অফুরন্ত কল্পনা দিয়ে কাব্যরচনা হয়না, তার জন্যে রূপায়ণও অপরিহার্য্য। আমার মনে হয় রূপই কবিতার প্রধান উপকরণ, এবং এ-রূপ যদি যথার্থই উপযোগী রূপ হয়, তবে কল্পনার ন্যূনত্বেও বিশেষ আসে যায়না। অবশ্য ঐশ্বর্য্যমাত্রেই বর্জ্জনীয় নয়। কিন্তু যেমন অর্থশাস্ত্রবিদদের মতে প্রভূত সঞ্চয়ের চেয়ে যথেচ্ছ অপচয়ও ভালো, তেমনি মস্তকে সুমেরু প্রমাণ কল্পনা বয়ে বেড়ানো ততটা প্রয়োজন নয়, যতটা প্রয়োজন নিজের কল্পনাকে পরের কাজে লাগানো। এ-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরদিনই সুস্পষ্ট, তাই তাঁর সাহিত্যে

প্রসঙ্গ ও প্রকরণের যে-নিবিড় সহযোগ দেখি তা অন্যত্র দুর্লভ মনে হয়। বলাই বাহুল্য এই সামঞ্জস্যবিধানের অধিকাংশ ভারই প্রসঙ্গকে বইতে হয়, কারণ প্রসঙ্গ দৈবের দান, তার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জ্জন ছাড়া কোনো মধ্যপন্থার অবকাশ নেই। অতএব যা তাকে ধারণ করে, অর্থাৎ ছন্দ, ভাষা ও প্রতীক, স্থিতিস্থাপকতা চাই তাতে। এইখানেই পূর্ব্ববর্ত্তীদ্বয়ের পরীক্ষার—হয়তো ভ্রান্ত পরীক্ষার— ফল রবীন্দ্রনাথের শ্রমলাঘবের সহায়তা করেছিলো। সত্যে পৌঁছানোর পথ যদিও একটি, তবু তার স্থিতি গোলকধাঁধায় হওয়াতে, বারম্বার পথচ্যুতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কাজেই বিপথগুলো যদি পদচিহ্নে পরিপূর্ণ থাকে, তবে ঠিক পথটাকে চিনে নেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেও কেউ কেউ অদৃষ্টক্রমে নান্যপন্থায় পদার্পণ করেন বটে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সদাসচেতন শিল্পীর সম্বন্ধে এই দৈবানুগ্রহ কেমন যেন নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। তাই যখন দেখি যে রবীন্দ্রনাথকে হাতড়ে বেড়াতে হলোনা, প্রথম যৌবনেই তিনি চিত্রাঙ্গদার মতো অনবদ্য কাব্যের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের এলেকায় উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন, তখন কেবল চিত্রাঙ্গদা-লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েই খালাস হতে পারিনা, সেই প্রাক্‌বৈরিক কবিদেরও প্রণাম করি, যাঁদের গবেষণায় বাঙলা ভাষা ও ছন্দের স্বরূপ অত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলে।

কাব্যের ধনিকতন্ত্রে জন্মে রবীন্দ্রনাথ অনুপার্জ্জিত সম্পত্তির আয়ে বিত্তশালী ব'লে খ্যাত হয়েছেন, এমন উদভ্রান্ত ধারণা আমার নেই। তাঁর কর্ম্মযোগের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রসাহিত্যের অতুল ঐশ্বর্য্য কি অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরত আত্মত্যাগের ফল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে কী পরিমাণে অবদমিত করলে, তবে তাঁর মতো ছন্দস্বচ্ছন্দ হওয়া যায়, তা অকবিদের সুদ্ধ বোঝা উচিত। তাছাড়া প্রকৃতি ও পুরুষকারের পরিণয়েই যে প্রতিভার সম্ভব হয়, এ-তথ্যও আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও এমন বিশ্বাস হয়তো যুক্তিসঙ্গত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হননি। মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ, এ-কথা মানার জন্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা অনাবশ্যক। মহত্ত্ব, তা সে যে-প্রকারেরই হোকনা কেন, সুযোগব্যতীত ব্যক্ত হয়না; এবং সাহিত্যিক মহত্ত্ব প্রকাশের সুসময় হচ্ছে ভাষার শৈশবাবস্থা। সম্প্রতিবিদরা মুখে যতই বড়াই করুন, মনে তাঁরাও জনসাধারণের সঙ্গে একমত, যে প্রগতির পথে মহাকবির সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে। মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্য যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধমান, তখন শুধু তার কাব্যানুভূতিতেই ক্ষয় ধরেছে, এমন বিশ্বাস টিঁকবেনা। তাই আমরা মনে করতে বাধ্য যে

কাব্যেব উপাদানে এখন আব সে-নমনীযতা নেই, যাতে মহাকবিব মহানুপ্রেবণা মূর্ত্তিমান হযে উঠতে পাবে। এই সিদ্ধান্ত যাঁদেব কাছে অলীক ব'লে ঠেকবে, তাঁদেব অতীত ইতিহাস স্মবণ কবতে বলি। সফোক্লিস্, লুক্রিশিযস্, শেক্স্পীয়ব, গোযটে, এবং সম্ভবত কালিদাস, এতগুলি মহাকবিব মধ্যে কেউই যে পবিপুষ্ট ভাষাব পবিচর্য্যা করেননি, তা নিছক দৈবযোগ হতে পাবেনা। তাঁবা প্রত্যেকেই যখন এসেছিলেন, তখন তাঁদেব স্ব স্ব ভাষাব বযঃসন্ধিকাল, গতানুগতিকেব শাসন তখনো সুরু হযনি, বার্দ্ধক্যেব স্থবিবতা তখনো কল্পনাতীত, সম্মুখে শুধু সম্ভাবনাব অবাধ প্রান্তব। অথচ অতীত তখন আব নিতান্ত নগণ্য নেই, তাব পবিণতিব পূর্ব্বাভাস ইতিম'ধ্যই সূচিত হযে গেছে, অসংখ্য ভুলভ্রান্তিব মধ্যে দিযে সে প্রত্যুষেব অনিশ্চযতা ছেড়ে সবেমাত্র প্রভাতেব আত্মস্থ আলোকে এসে পৌঁছেছে। এ-অবস্থায মহাকবিব আগমন যেমন বাঞ্ছনীয, তেমনি স্বাভাবিক, এবং ববীন্দ্রনাথেব জন্মলগ্নেও আমি এই ঘটনাচক্রেব পুনবাবৃত্তি দেখতে পাই।

এখনি যা বললুম, তাব থেকে যদি কেউ ভাবেন যে আমি আধুনিক কবিদেব সুযোগেব প্রতীক্ষায নিষ্ক্রিয় হযে ব'সে থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, তবে ভুল হবে। সে তো দূবেব কথা, আমি ববং মনে কবি যে অত্যধিক কালনিষ্ঠাই আধুনিক কাব্যেব প্রধান শত্রু। এমন লেখক কোনোদিনই বিবল নয়, বচনাশক্তিব প্রাখর্য্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেতে পাবেন, কিন্তু তাঁদেব অহমিকার মাত্রা শ্রেষ্ঠ কবিদেবও হাব মানায। তাই যদি কখনো সুযোগেব সাহায্যে তাঁবা সমকালীন পাঠকেব শ্রদ্ধায অধিকাবী হন, তাহলে সেই শ্রদ্ধা হাবাবাব ভযে তাঁদেব রূপকাবী বিচাববুদ্ধি পঙ্গু হযে পড়ে। ফলে যে-উপাযে একদিন পাঠকেব হৃদয় জয কবেছিলেন, তাকে জরাজীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য জেনেও তাঁবা উপাযান্তব উদ্ভাবনে অক্ষম হন, এবং এই অক্ষমতাব জন্যেই অকৃতজ্ঞ পাঠকেব পক্ষপাত হাবান। কাব্যেব সত্তা কি, এ নিযে অনেক তর্ক হযে গেছে, কিন্তু মীমাংসা হযনি। কাজেই সে-প্রসঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না-ক'বে, শুধু এইটুকু বলাই নিবাপদ যে কল্পনামূলক সাহিত্যমাত্রই যখন বৈচিত্র্য-ব্যতিবেকে বাঁচতে পাবেনা, তখন তাকে বাদ দেওযা কাব্যেব পক্ষেও নিশ্চযই অকল্যাণকব। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাই কালোপযোগী হতে বাধ্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতাব আবও একটা বাড়তি গুণ থাকে, যেটা কালাতিবিক্ত। সুযোগ যেমন আসে, তেমনি যায, সুতবাং তাব সহযোগ ভিন্ন যদি শ্রেষ্ঠ কাব্য লেখা না-ই যায, তবে মহাকবিকে এমন কোনো মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আযত্ত কবতে হবে, যাতে অতীত সুযোগ প্রযোজনমতো পুনর্জ্জীবিত হযে উঠতে পাবে। মহৎ কাব্যের এই ঐন্দ্রজালিক লক্ষণটিকেই আমি উপরে বৈচিত্র্য নাম

দিয়েছি। এই বৈচিত্র্য পশ্চিমদেশের ঐকতান সঙ্গীতের মতো, একটা সমষ্টিগত রূপ তার অবশ্যই আছে, এবং সেটাই সর্ব্বপ্রথমে শ্রোতাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। কিন্তু এইখানেই তার আবেদনে পূর্ণচ্ছেদ পড়েনা; বহুবার শুনে যখন তার সমগ্র বহিরেখা শ্রোতার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যায়, তখন সুরু হয় তার বিশ্লেষণ, প্রত্যেক অঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যেক যন্ত্রের স্বরসঙ্গতির বিবরণ, প্রত্যেক সুরের সার্থকতার পরিমাপ। যে-শিল্পসৃষ্টি এই দ্বিরায়তনিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে, সাময়িক শিল্পের আপাতরমণীয়তা হয়তো তাতে থাকেনা, কিন্তু একটা আত্মসমাহিত উৎকর্ষ তাকে অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া অন্য উপায়েও বৈচিত্র্য সৃজন চলে। হিন্দুসঙ্গীতের নির্দ্দেশে সমগ্র কাব্যজীবনকে নানাবিধ রাগরাগিণীর মধ্যে ভাগ ক'রে দিলে কবির ব্যয়কুণ্ঠা সূচিত হয় বটে, তবু সে-রীতি ইতিহাস-অনুমোদিত। কিন্তু ভৈরবীর তানে খ্যাতিসূর্য্য উদিত হয়েছিলো ব'লে যে-সুগায়ক সারাদিন কেবল ভৈরবীই ভাঁজতে থাকেন, তাঁর আসরে শ্রোতার সংখ্যা যে অচিরেই শূন্যে এসে ঠেকবে, তা বলাই বাহুল্য।

দুঃখের বিষয় কথাগুলো লেখায় যতটা সুবিদিত ব'লে লাগছে, কার্য্যত ততটা সুস্পষ্ট নয়। এমন-কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্, শেলি, টেনিসন ইত্যাদির মতো প্রথম শ্রেণীর কবিরাও কাব্যে বিচিত্রতার মূল্য বোঝেননি, তাঁরা কাব্যকে তাঁদের নির্ব্বিকার ব্যক্তিত্বের ভাববাহীরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে উদ্দেশ্যে, আদর্শে ও প্রতিভায় শেক্‌স্‌পীয়র-প্রমুখ নৈর্ব্যক্তিক কবিদের সমকক্ষ্য হয়েও, এঁরা সম্ভবত লোকোত্তর অমৃত-লোকের বহিঃপ্রান্তেই থেমে গেছেন। শিল্প-সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক বিশেষণ নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে, তাই এইখানেই ব'লে রাখা ভালো যে ঐ শব্দের দ্বারা আমি কোনো অমানুষিক লক্ষণের ইঙ্গিত করছিনা, শুধু সেই ধরণের শিল্পসামগ্রীর কথা বলছি, যাতে লোকশিক্ষার চেয়ে লোকরঞ্জনের চেষ্টাই বেশি পরিস্ফুট। উদগ্র ব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি যে কবিও যখন মানুষ, সেকালে অন্যান্য মানুষের মতো কবির ভাবনাবেদনাও তাঁর ক্রিয়াকলাপে অল্পবিস্তর প্রকাশ পেতে বাধ্য। তাহলেও এমন কাব্য আমি অনেক দেখতে পাই যার প্রবর্ত্তনা কবি-পরিচিত নয়, কেবল সৃষ্টি। আমার বিবেচনায় "টেম্পেষ্ট্" মুখ্যত নাটক হিসাবেই লিখিত হয়েছিলো। শেক্‌স্‌পীয়রের তৎকালীন অভিজ্ঞতা যে ওই রচনায় স্থান পায়নি, তা হলফ ক'রে বলতে পারবোনা বটে, কিন্তু এটা নিশ্চিত জানি যে টেনিসনের জীবনকাহিনীর ছায়াতিরিক্ত হয়েও "আইডিল্‌স্ অফ দি কিঙ্" যে-ভাবে টেনিসনকে ধরিয়ে দেয়,

প্রস্‌পেরো কখনো ঠিক তেমনি ক’রে আত্মবিস্মৃত হয়না। সে যাই হোক্‌, এই রকমের আরও অনেক উদাহরণ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে উক্ত নৈর্ব্যক্তিক লক্ষণ ব্যতীত কাব্য উপাদেয় হতে পারে কিন্তু অমর হয়না, কারণ নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তার মজ্জায় মজ্জায় যত বিদ্রোহই থাকুকনা কেন, স্থান-কালের দাসত্ব তার অবশ্যকর্ত্তব্য। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে শোনা যায় যে একটা ঐকান্তিক একাগ্রতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের আর কোনো অর্থ নেই। ফলে নিজের ভিতর থেকে সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের পথ্যসংগ্রহ কবির সাধ্যাতীত, কাব্যকে সে যদি চিরন্তনের প্রকোষ্ঠে পৌঁছে দিতে চায়, তবে উৎকেন্দ্রিক হওয়া ছাড়া তার গতি নেই। বিশ্ব অবশ্যই অমিত নয়, কিন্তু মানুষের শক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে এই সঙ্কীর্ণ জগৎকেই তার অনন্ত লাগে; ঘটনার ঘূরন্ত চক্রের দিকে চেয়ে সে এতই দিশাহারা হয়ে পড়ে যে একই ঘটনা বহুবার ফিরে আসছে কিনা তা বোঝবার তার সামর্থ্য থাকেনা। কাজেই যে-কবির বক্তব্য ব্যক্তিকে ছে’ড বিশ্বকে আশ্রয় করে, তার সাহিত্যে বৈচিত্র্যের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক। এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ব্যঞ্জনা যেহেতু সর্ব্বদাই বিষয়ের সঙ্গে দুচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাই এই জাতীয় বিশ্ববান্ধব মহাকবিদের রচনায় শিল্পপ্রকরণের কোনো গতানুগতিক আকার দেখা যায়না। যাঁরা মমত্ববোধকে কাব্যের যজ্ঞানলে আহুতি দিতে পেরেছেন, নিরর্থ প্রথাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মহতের এতাদৃশ নিয়মলঙ্ঘনই রসিকসমাজে আর্ষপ্রয়োগ-নামে পরিচিত; এবং প্রাচীন গ্রীস থেকে আরম্ভ ক’রে প্রাচীন ভারত পর্য্যন্ত এই প্রয়োগ একদিন যেমন প্রশ্রয় পেয়েছিলো, আধুনিক পশ্চিম থেকে সুরু ক’রে আধুনিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আজও তার তেমনি সমাদর।

আমার ম’তে রবীন্দ্রনাথও এই আর্ষপ্রয়োগক্ষম কবি, এবং সেইজন্যেই তিনি আবাল্য তাঁর কাব্যকে মুক্তির বিজন পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গ-পদ্ধতির যে-অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়, সেটা হয়তো খুব বড় কথা নয়, কারণ প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবিই তাঁদের প্রসঙ্গকে যে-পরিমাণে বিস্তৃত করেন, পদ্ধতিকেও বদলান সেই অনুপাতে। যা রবীন্দ্র-প্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য লক্ষণ, সে হচ্ছে তাঁর প্রণালীর অদ্ভুত অস্থৈর্য্য, তাঁর অশেষ পরিবর্ত্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি। অপর প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনায় একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারা দেখা যায়. একটা সীমাবদ্ধ সরণী বেয়ে তাঁরা উৎকর্ষে উপনীত হন, এবং একবার গন্তব্যে পৌঁছলে তাঁদের আর কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা চাঞ্চল্য থাকেনা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই কঠিন

সন্তোষ অবর্ত্তমান; তাঁর কাব্যের ক্ষিপ্রস্বভাব দেখে মনে হয় তিনি পরিপূর্ণতায় আস্থা রাখেননা। "মানসী"-র কৃতিত্ব অসামান্য, এবং শুধু সেই পুস্তকের জোরেই তিনি বিশ্বসাহিত্যে বরেণ্য হতে পারতেন। কিন্তু সে-প্রকরণ যখন "কল্পনা"-য় এসে চূড়ান্তে পৌঁছলো, তখন কবি হঠাৎ তাতে বীতরাগ হয়ে পড়লেন। তার পরের বই "ক্ষণিকা" যে-পরীক্ষার ফল, তাতে কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি কেন স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হন, তা বোঝা শক্ত। অবশ্য পিছনের পানে চেয়ে আজ মনে হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের রত্নাকরেও এই মধ্যমণিটির জোড়া মিলবেনা; কিন্তু যেদিন "ক্ষণিকা"-র প্রথম কবিতা লিখিত হয়েছিলো, সেদিনে এমন প্রত্যয়ের কোনো কারণ ছিলোনা, বরং বিপদের আশঙ্কা ছিলো সমূহ। ততদিন রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার চিরাচরিত পথেই চলেছিলেন, এবং "কল্পনা" বন্ধ করার পরে যে-ঝঙ্কার পাঠকের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, সে হচ্ছে সংস্কৃতির ধ্রুপদ। এতাদৃশ কবির পক্ষে কৃষ্ণকলির কাঁকণের আওয়াজকে ছন্দোবদ্ধ করার চেষ্টা শুধু দুঃসাহসিকতা। এই অগ্নিপরীক্ষায় কেবল তিনিই আত্মসমর্পণ করতে পারেন, যাঁর মনে অহমিকার পাপ নেই; যিনি নিজের ইষ্টের চেয়ে কাব্যের মঙ্গলকে অধিক কাম্য মনে করেন।

"ক্ষণিকা"-প্রণেতার মনোবিকলন এখানে অবান্তর। ক্ষণিকার উদ্ভব যে-চিত্তবৃত্তি থেকেই হয়ে থাক, ওই পুস্তক প্রকাশের পরে আর কোনো সন্দেহ রইলোনা যে কাব্যের সঙ্গে ভাষাশুদ্ধির কোনো জন্মগত যোগ নেই। কিন্তু ছন্দসম্বন্ধে এখনো সংশয় রয়ে গেলো। একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের হাতে ছন্দ কখনো নিগড় হয়ে ওঠেনি, বেজেছে নূপুরের তালে। তাঁর কৈশোরিক কবিতার ছন্দবৈচিত্র্য যদিই বা কারুর কাছে অনবধানতা-প্রসূত ব'লে ঠেকে, মানসীর "নিষ্ফল ক্রন্দন"-এ যে কবি সজ্ঞানেই ছান্দসিকদের উপেক্ষা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই সর্ব্ববাদিসম্মত। অবশ্য বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি এই স্বচ্ছন্দ ছন্দকে আর ব্যবহার করেননি; তাহলেও ছন্দের গাণিতিক রূপ তাঁর কাছে কত তুচ্ছ, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে "বর্ষশেষ"-এর মতো ঘনসম্বদ্ধ ধ্রুপদী কবিতার উপান্ত্য স্তবকটি উল্লিখিত হতে পারে। এই স্বাধীনতার সঙ্গে যথার্থ মুক্তচ্ছন্দের আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে, তাতে সন্দেহ নেই, এবং একথা রবীন্দ্রনাথেরও জানা ছিলো। তাই দেখি "গীতাঞ্জলি"-তে ভাষার প্রকৃতিসম্বন্ধে গবেষণা শেষ ক'রে, "বলাকা"-য় তিনি ছন্দের স্বরূপসন্ধানে নামলেন। "বলাকা"-র ছন্দ একেবারে বন্ধনমুক্ত হলোনা। সেখানে তেমন হওয়াও হয়তো বিপজ্জনক ছিলো, কেননা, বলাকার বিচরণ মর্ত্তসীমার বাইরে, সেই নিরালম্ব লোকে যদি মাধ্যাকর্ষণের নির্দ্দেশও না-থাকে, তবে কবির জয়যাত্রা সহজেই মহাপ্রস্থানে পরিণত

হ্তে পারে। কিন্তু মিলের টান এবং পদক্ষেপের সমতা অটুট রেখেও, এ-ছন্দ এমন একটা ওজসের পরিচয় দিলে, যা দেখে আর সন্দেহ রইলোনা যে স্বর্গবিজয়ের দিনে বাঙালী কবিকে আর অস্ত্রের জন্য ভাবতে হবেনা। মানুষের যেগুলো উর্দ্ধগ আবেগ, তার অভিব্যক্তিতে এই ছন্দ যে-রকম যোগ্যতা দেখিয়েছে, অন্যত্র, এমন-কি ইংরেজি অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, তার তুলনা নেই। গদ্য থেকে বহু দূরে হয়েও, এ-ছন্দ স্বকীয় গতিভঙ্গিতে ও ধ্বনিগৌরবে এতই সংযত যে আবেগের হিল্লোল এর তলায় কখনো হারিয়ে যায়না। তাই ভাবপ্রধান কাব্যরচনায় এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভাগ্যক্রমে জগৎ কেবল ভাবের উপাদানেই নির্ম্মিত হয়নি, তাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্ব্বব্যাপী। এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের সংসর্গে "বলাকা"-র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ হয়ে আসে; মনে হয় বেয়াদবের সঙ্গে ঘর করার জন্যে দারকার এমন এক মুখরাকে যে অমর্য্যাদায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়বেনা, অপমানের সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারবে। "পলাতকা"-য় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দের সৃষ্টি করলেন। এর মধ্যে ছন্দসম্বন্ধে আর কোনো ভেদবুদ্ধি রইলোনা, যতিস্থাপনা প্রায় অর্থানুসারেই চলতে লাগলো। মিল এখনো পরিত্যক্ত হলোনা বটে, কিন্তু আভরণের বহর এতটা কমিয়ে আনা গেলো যে নিছক গদ্যের সহায়তা ছাড়া আর সংক্ষেপের সম্ভাবনা রইলোনা। সে-পর্ব্বেরও আর দেরি ছিলোনা। "পলাতকা" লেখার সময়ে সময়েই রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ গদ্যে ক'বতা রচনা সুরু করেছিলেন। এগুলি "লিপিকা"-র প্রথমাংশের অন্তর্গত।

"লিপিকা" প্রকাশের পর দেখা গেলো হর্বর্ট স্পেন্‌সর একেবারে মিথ্যা বলেননি। ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাককে যদিই বা কেউ ময়ূরের সঙ্গে ভুল করে, তবু গদ্যবেশী কাব্যকে তার যথার্থ উপাধি দিতে সকলেই নারাজ। কবির নিজের মনেও হয়তো এই বইসম্বন্ধে দ্বিধা ছিলো, কারণ তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকায় এর নাম গদ্যেরই পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু আকারে এবং জাতিবিচারে তাদের স্থান যেখানেই হোক, "পায়ে চলার পথ", "রাত্রি ও প্রভাত" ইত্যাদি লেখাগুলিকে যে-মুহূর্ত্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, অমনি তাদের কাব্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গদ্যরচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ কত গভীর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সব্যসাচী, এবং তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যের কাছে যে-হিসাবে ঋণী, তাঁর পদ্যও তাঁর গদ্যের কাছে সেই অনুপাতেই কৃতজ্ঞ। তাহলেও অন্যত্র, যেমন "ক্ষুধিত পাষাণে", কাব্যের অধিকাংশ উপকরণ ধার নিয়েও তাঁর গদ্য কাব্য হয়ে ওঠেনি, কাব্যগন্ধী থেকে গেছে; অথচ "লিপিকা" সজ্ঞানে সরলতার দিকে চ'লেও কাব্যাদর্শে পৌঁছেছে। এই অসাধ্যসাধন কি ক'রে সম্ভব

হলো, তা বলা আমাব কর্ম্ম নয়। কিন্তু "লিপিকা"-র একটা সুবিদিত বৈশিষ্ট্যেব বিচাব করলে হয়তো এই বহস্যেব খানিকটা উদ্‌ঘাটিত হবে। সকলেই লক্ষ্য ক'বে থাকবেন যে ববীন্দ্রনাথেব গদ্য তাঁব পদ্যেব মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁব গদ্য-উপমাব সঙ্গে তাঁব পদ্য-উপমাব কোনো মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমা প্রযোগ ক'বে থাকেন সাধাবণত অর্থেব খাতিবে, এখানে উপমাব সাহায্যে বক্তব্য স্পষ্টতব হয়। কিন্তু কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতি অথবা ধ্বনিমাধুর্য্যেব তাগিদে। এ-জাতীয় উপমায অর্থ তো স্পষ্ট হয়না বটেই, এমন-কি অনেক সময়ে প্রাঞ্জলতাব অভাব ঘটে। তাহলেও এতে কাব্যেব ক্ষতি হযনা, কাবণ কবিতাপাঠে যুক্তি হযতো অনাবশ্যক, শুধু নিষ্ঠাই অপবিহার্য্য ; এবং কাব্যে উপমাব একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে পাঠকেব নিষ্ঠাকে ডাক দেওযা। নিষ্ঠা যুক্তিব আদেশে আসেনা, আসে প্রত্যক্ষতার আকর্ষণে ; তাই ব্রহ্মেব নির্গুণতা-সম্বন্ধে শঙ্কবভাষ্যই লিখিত হয়, পূজা পায় মনসা, শীতলা, তাবকেশ্ববের মতো জাগ্রত দেবতা। এই সনাতন সত্যেব নির্দ্দেশেই আধুনিক বিজ্ঞাপনবিশেষজ্ঞেবা বিজ্ঞাপন-চিত্রে বিজ্ঞাপিত বস্তুব স্থান ক্রমশই সংক্ষেপ ক'বে আনছেন। দেখা গেছে ছবিটি যদি দ্যোতনাপূর্ণ হয, তবে পণ্যসামগ্রীব গুণকীর্ত্তনেব প্রয়োজন থাকেনা, ববং তর্কের কোনো সুযোগ না-পেয়ে দর্শকেব মন কল্পনা-প্রবণ হয়ে ওঠে, এবং এ-অবস্থায সে যে-দ্রব্যের নাম শোনে, তাকে ভোলা আব সহজ হয়না। কবিও তাঁর উপমা ব্যবহাব কবেন এই বকমে। বলাকাব পক্ষধ্বনি শব্দময়ী অপ্সববমণীব অনুষঙ্গে বেশি পবিস্ফুট হওয়া দূবে থাকুক, ববং একেবাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ওই কথাকটাব জাদুতে পাঠক চিত্রবচনায এমনি মনোনিবেশ কবে, যে এ-অসঙ্গতিব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তাব সাধ্যে কুলায়না। তখন হয় সে সমস্ত কবিতাটিকে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ কবে, নচেৎ সজোবে আবেশ কাটিয়ে, মাথা নেড়ে বলেঃ একেবাবে প্রলাপ! "লিপিকা"-ব উপমা এই জাতীর স্বপ্নময় উপমা, তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত। সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় বেখে পাঠককে মোহাবিষ্ট ক'বে তোলে, "লিপিকা"-য তেমনি উপমা আলেখ্যেব সামঞ্জস্য বক্ষা ক'বে তার তর্ক-প্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়। সেইজন্যেই "লিপিকা"-র বেশ যাই হোক, কাব্যই তার স্বরূপ।

আমাব বিচাবে "লিপিকা" অমূল্য পুস্তক। তার কাবণ শুধু এ নয় যে এতদিন পর্য্যন্ত বাঙলা মুক্তচ্ছন্দেব একমাত্র নিদর্শন কেবল এই গ্রন্থেই পাওয়া যেতো ; উপবন্তু প্রাকৃত বাঙলাব প্রভূত শক্তি ও যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রথম এইখানেই আত্মপ্রকাশ কবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও "লিপিকা"-ব

দুর্ব্বলতা নিতান্ত অল্প নয় ; এ-কবিতাগুলিব প্রসঙ্গ-নির্ব্বাচনে কবি বেশ একটু শুচিবায়ুব পবিচয় দিযেছিলেন। আমি জানি বিষয়েব উপরে প্রভুত্ব চলেনা ; সে আসে তাব নিজেব খেযালমতো : সময়ে সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন ক'বেও তাব সাক্ষাৎ মিলেনা, আবাব মাঝে মাঝে তার উৎপাতে স্নানাহাবেব অবকাশ সুদ্ধ মুছে যায। তাছাড়া রূপকার হিসাবে ববীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন হলেও, তাঁর কাব্য মুখ্যত প্রেবণাপ্রসূত। কিন্তু এ-সমস্ত মনে বেখেও "লিপিকা"-ব সম্বন্ধে নালিশ চোকেনা, প্রশ্ন ওঠে, বিষয়ই যদি প্রথাব গণ্ডি ছাড়াতে পাবলেনা, তবে ছন্দকে জীবন্মুক্ত কবাব সার্থকতা কোথায ? এবং একথা না-মেনে উপায় নেই যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণেব দিক থেকে ছন্দোবদ্ধ "পলাতকা" যে-উদারতা দেখাতে পেবেছে, ছন্দোমুক্ত হ'য়েও "লিপিকা" তাতে বঞ্চিত। সুতরাং সিদ্ধান্ত কবতে হয় এই পুস্তকেব সাফল্য-সম্বন্ধে কবিব নিজেব মনেও দ্বিধা ছিলো। বাঙলা কবিতাব ছন্দোমুক্তি এতদূব পর্য্যন্ত সইবে কিনা, তা তাঁব জানা ছিলোনা ব'লেই, তিনি "লিপিকা"-ব কবিতাগুলিকে গদ্যাকারে ছেপেছেন ; সেইজন্যে বেছে বেছে এমন প্রসঙ্গের অবতাবণা কবেছেন, যা সকল বকমে নিগুর্ণ হয়েও, কেবল কৌলিন্যেব জোবেই বসোত্তীর্ণ হতে পাবে। "লিপিকা"-ব পববর্ত্তী পুঁথি-কখানিতে এ-সন্দেহ আবো বদ্ধমূল হয়। "শিশু ভোলানাথ", "প্রবাহিনী", "পূববী", "মহুয়া" প্রভৃতিতে দেখি যে বসেব দিক দিয়ে ববীন্দ্র-প্রতিভা যদিও শুধু এগিযেই চলেছে, তবু প্রকবণ ও পবীক্ষাব প্রতি কবিব যেন আব দৃকপাত নেই। তার মানে এ নয় যে এই বইগুলিব কাব্যসম্ভাব বা কলাকৌশল শিথিল, তাব মানে শুধু এই যে এগুলিব বচনাবীতি নবাবিস্কৃত নয, পুবাতন বীতিবই পবিমার্জ্জিত ও পবিবর্দ্ধিত সংস্কবণ।

অবশ্য ববীন্দ্রনাথ যে-পথেই চলুন তাঁব অব্যর্থ প্রয়াণ প্রতিবাবই অমৃতলোকে এসে থামে। উপরোক্ত পুস্তকগুলিতেও সে-নিযমের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে এই আভিজাতিক নন্দনে যাদেব সাক্ষাৎ মিলে, তাবা প্রায় সকলেই উর্ব্বশীব গোত্রসম্ভূত, তাদেব মুখে অনন্তযৌবনেব অপাব সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু অজানাব অভ্যাঘাত তাদেব চোখে নেই। সুতবাং ববীন্দ্রনাথের মতো নিরুদ্দেশযাত্রীব পক্ষে এই অচলায়তন উৎকর্ষে স্তিমিত হযে বসে থাকা বেশিদিন সম্ভব হলোনা, তিনি আবাব স্বর্গ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু এবাবে বোধহয় আব অমবাবতীব চক্ষু নিবশ্রু থাকেনি, নিঃসঙ্গ হয়নি কবিব প্রত্যাবর্ত্তন ; স্বয়ং কবিতালক্ষ্মী তাঁব আকর্ষণে এই ধূলিব ধবণীতে নেমে এসেছেন। অবশ্য দেবীব কণ্ঠে সেই অভ্যস্ত মন্দারমালা নেই, তাঁব মৃন্ময় দেহ নিঃসঙ্কোচে অদিব্য ছায়াপাত ক'বে চলেছে ; কিন্তু আমাদের মতো মোহান্ধেরাও তাঁব দিকে চেয়েই

বুঝতে পারি যে বহিরাঙ্গে সনাতন আড়ম্বর না-থাকলেও, তাঁর অন্তরে আছে কাব্যের তন্মাত্র। আমি এমন কথা বলছিনা যে "পরিশেষ" ও "পুনশ্চ" রবীন্দ্রকাব্যের চূড়ান্ত। শুনেছি কবি পার্ব্বত্য প্রদেশ পছন্দ করেননা, তাঁর ভালো লাগে সমভূমির সার্ব্বত্রিক উর্ব্বরতা। এ-খবর যদি তাঁর রুচিসম্বন্ধে মিথ্যাও হয়, তবু তাঁর সাহিত্যের সম্পর্কে উপমাটি খুব প্রযোজ্য, কারণ সেখানে যে-উচ্চাবচতা দেখা যায়, সে হচ্ছে অধিত্যকার বন্ধুরতা, শিখর-গহ্বরের উত্থান-পতন তাতে নেই। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও, এমন মনে হওয়া অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থ-দুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগুনো অসম্ভব। সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিরোধ দূর করবার চেষ্টা করে এসেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে-বিবাদের নিষ্পত্তি হলো। যে-বিচিত্রতার প্রয়োজনে মহাকাব্য গীতিকবিতার কাছে হার মেনেছিলো, তার সিদ্ধি হয়তো এইখানে। কারণ এই প্রকাশভঙ্গী জীবনের মতোই পরিবর্ত্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্ব্বভুক অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেইজন্যেই তার আসঙ্গ নিরাপদ নয়; চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি স্বয়ং বসুধার দুহিতা সীতা। স্বরাজ্য মজ্জাগত না-হয়ে গেলে নৈরাজ্য কেবল অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। তাই ভয় পাই, তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের হাতে তা সর্ব্বনাশে পরিণত হবেনা তো?

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কার্‌স্‌টা

(কাইজাবলিঙ্‌ হইতে)

অল্প অল্প বরফ গলা আরম্ভ হয়েছে। গীর্জ্জার পথ নভেম্বরের নরম ভিজে তুষারে ঢাকা, একটি 'শ্লে'-গাড়ি হোঁচট খেতে খেতে কোনোরকমে তাল সামলিয়ে এই পথে ছুটেছে। তাতে যাত্রী চারজন, ম্যারি, ক্যাটি, ইল্‌সে ও কার্‌স্‌টা—যার মা এ্যান্‌লিসে একটি কুঁড়েঘরে থাকে। চারজনই মেয়ে, গীর্জ্জা থেকে বিয়ে ক'রে তারা ফিরছে, তাদের স্বামীরা 'রংরুট'—সবে সৈন্যদলে তারা নাম লিখিয়েছে, কালই তাদের ব্যারাকে চ'লে যাবার কথা। চারটি বড় নীল রুমাল চারজনের মাথার উপর চূড়ো ক'রে বাঁধা—গাড়ি চলার তালে তালে এই চারটি চূড়ো একবার উঠছে একবার নামছে। গাড়ি চালাচ্ছে ক্যবেন জেজ। লোকটি বেজায় টেনে এসেছে আর নির্দ্দয়ভাবে ঘোড়াদের চাবুক মারছে। এদের স্বামীরাও ঠিক পিছন পিছন আস্‌ছে, একটি শ্লেতে দুজন দুজন ক'রে। তাদের ভাঙা গলার চীৎকার ও গান শুনলে বোঝা যায় তাদেরও অবস্থা ক্যবেনেরই মতন। মেয়ে চারটি কিন্তু শান্ত হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে, কেবল গাড়ির দোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নীল রুমালে-বাঁধা মাথাগুলো দোল খাচ্ছে। এদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট কার্‌স্‌টা। তার টুকটুকে গোলগাল মুখ, তার দুটি গোলগোল হালকা-নীল চোখ, আর তার গোল নাকের ডগা দেখলে তাকে একেবারে শিশু ব'লে মনে হয়; কিন্তু যে-সব চাষার ঘরের মেয়ে অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছে, সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাট যাদের পোয়াতে হয়, ঠিক তাদের মতন তার ঠোঁটের কোণ টোল-খাওয়া। কার্‌স্‌টা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল চারদিক কুয়াসায় ঢাকা, এই ধূসর পটভূমিকার উপর জুনিপারের ঝোপ ও কাকগুলিকে অদ্ভুত রকমের কালো দেখাচ্ছে, মাঝে মাঝে এক একটি পাতা-ঝরা লালচে অলডার গাছ ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত পথ এই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন বর্ণহীন দৃশ্য কার্‌স্‌টার চোখের সামনে ধীরে ধীরে দুলছে, যেন সে ইষ্টারের মেলায় দোলনায় ব'সে আছে আর খুব আস্তে আস্তে তাকে কেউ দোল দিচ্ছে।

পথে প্রত্যেক ভাঁটিখানায় তারা থামতে থামতে এসেছে। প্রতিবারই, কার্‌স্‌টার স্বামী টোম্‌—দেখ্‌তে সে প্রকাণ্ড লম্বা—ঝুঁকে পড়ে তার কার্‌স্‌টার খবর নিয়েছে, আর "কি? একেবারে জমে গেছ নাকি?" এই ব'লে ব্র্যাণ্ডির বোতল এগিয়ে দিয়েছে। কার্‌স্‌টা সত্যি প্রায় জমেই গিয়েছিল; কোনোরকমে একটু হেসে সে বোতলটা হাতে নিয়ে খানিকটা খেয়ে ফেলল। বাস্তবিক ব্র্যাণ্ডি খেলে শরীরটা বেশ তাজা হয়ে ওঠে,

আব কি আবামই না হয়, আব সব চাইতে মজা এই যে মনেব সব ভাবনা চিন্তা একেবাবে চ'লে যায়। কারস্টাব চোখেব সামনে এই কুয়াসায় ঢাকা অস্পষ্ট পৃথিবী আবো অস্পষ্ট হ'য়ে উঠল, এমন কি তাদেব গাড়িব কোচম্যান জেজেব মস্ত পিঠটা যেন ক্রমশই দূবে চ'লে যেতে লাগল। কিন্তু সকাল থেকে আবম্ভ ক'বে সেদিনেব প্রত্যেকটি ঘটনা বাববাব তাব হুবহু মনে হ'তে লাগল, একটিব পব একটি, যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনি। বিয়ে! সকাল থেকে তাবই আয়োজন। সব প্রথম ক'নেব সাজ, মখমলেব মতন কোমল, দুধেব মত শাদা, সেমিজ দিযে সাজেব আবম্ভ; উঃ, কি পাৎলা আব কি ঠাণ্ডা! তাব মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শিউরে উঠল। আব তাব মাথাব গয়নাগুলো কি জোবেই না চেপে দেওয়া হযেছিল, নিশ্চয় দাগ প'ড়ে গিয়েছে। তারপব একেবাবে গীর্জ্জায়, জায়গাটি কি ভীষণ ঠাণ্ডা আব কি অটল তাব গাম্ভীর্য্য! পাথবেব মেজেব উপব নতুন জুতো জোড়া বিশ্রী বকমেব খট্‌খট্ শব্দ কবছিল, কাব্‌স্‌টাব ভয় হচ্ছিল সে পা পিছলে উলটে না পড়ে। পাদ্‌বিব মুখটি একেবাবে গোল আব টক্‌টকে লাল; এমন কপ্ কপ্ ক'বে ভদ্রলোক কথা বলেন মনে হয় যেন খুব মুখবোচক একটা কিছু খাচ্ছেন। কিন্তু যাই বলো, তাঁব উপদেশ ভাবি সুন্দব! তাদেব স্বামীবা তাদেব ছেড়ে চলে যাবে, সে সময তাদেব সতীত্ব যেন অবিচলিত থাকে—এই সব অনেক কথা তিনি বল্‌লেন, আব বল্‌লেন ভগবানেব কথা ও মানুষেব প্রতি তাঁব কি বাণী তাবই কথা। এই সব কথা কাব্‌স্‌টাব মনকে এত স্পর্শ কবেছিল সে না কেঁদে পাবেনি। যাবা যুদ্ধে যাবে তাদের বউবা বিয়ের সময় অমন কেঁদেই থাকে। আব এবকম কাঁদা নিশ্চয়ই খুব ভালো, একেবাবে এমন কাঁদা যে সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে ও চোখেব জলে ভিজে যায, আব সঙ্গে সঙ্গে এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা যে সেমিজেব বোতাম প্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া হয়। কাব্‌স্টা যে সব চাইতে বেশি কেঁদেছিল পবে যখন এ বিষয় কথা হচ্ছিল তখন খুব জোব ক'বেই সে তা বল্‌তে পারত। বিয়েব পালা সাঙ্গ হবাব পর সবাই মিলে গেল গীর্জ্জাব সামনেব ভাঁটিখানায়, এই একটু শবীবটা তাজা ক'বে নেবার জন্যে। সেখানে পুরুষগুলো আবাব একটি ঝগড়া বাধিয়ে দিল। ঠিক বিযেতে যেমন হওয়া উচিত প্রত্যেকটি ব্যাপাবই তেমনি হয়েছিল, কোনো ত্রুটি হযনি। বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে! জেজেব ছোট্ট ঘোড়াগুলোব গলাব ঘণ্টা টুন্ টুন্ ক'বে কেবল এই এক কথাই বলছে। কাব্‌স্‌টাব স্বপ্ন আবাব আবম্ভ হল—সেই সেমিজ পবা থেকে। আব তিনটি মেযে চুপ চাপ ব'সে, তাদেব স্থিব দৃষ্টি কুয়াসাব উপব নিবদ্ধ, তাদেব চোখের ভাব দেখলে মনে হয় না তাবা কিছু দেখতে পাচ্ছে বা দেখবার চেষ্টা কবছে।

কেবল মাঝে মাঝে এক একটি খবগোস মাঠ থেকে এসে এক দৌড়ে যখন বাস্তা পাব হচ্ছে, চাবজনই একসঙ্গে চেঁচিযে উঠছে, 'ত্থাখো, ত্থাখো খবগোস!' তাবপব কোনোবকমে একটু হেসে আবাব সব চুপ চাপ!

গ্রামেব সবাইখানাব সামনে তাদেব গাড়ি থামল; সেখানে বেশ একটা ভিঁড় জ'মে গিযেছিল, বিয়েব উৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথিবা ফিট্‌ফাট্‌ পোষাক প'বে সেখানে জড় হযেছে। মেয়েদেব ও ছোট ছেলেদেব দল জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখছিল, সবাই ক'নেদেব দেখতে চায়। কাব্‌স্‌টাব হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেও ক'নে, তাব মন উৎসবেব আনন্দে ভ'বে উঠল। বিয়েব দিন মানুষেব জীবনে সব চাইতে সুখেব দিন, বিয়েব ক'নে হওয়া কি কম গৌববেব কথা!

কাব্‌স্‌টা দবজাব কাছে তাব স্বামীব জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা কবল, তাদেব তুজনেব একসঙ্গে ভিতবে যাবাব কথা। সে ভাবি গম্ভীব হয়ে দাঁড়িয়ে বাস্তাব ওপাবের বুড়ীটিব সঙ্গে কথা বলছিল। গ্রামেব মাতব্বব পর্য্যন্ত তাকে ডেকে কথা বললেন, আব ছোট মেয়েব দল হাঁ ক'বে তাকিয়ে তাব সাজসজ্জা দেখতে লাগল। কাব্‌স্‌টাব মা এ্যান্‌লিসে ছিল অতি সাধাবণ লোক, ছোট্ট একটি কুঁড়েঘবে তাব বাস। সবাব কাছে এবকম সম্মান কাব্‌স্‌টাব ভাগ্যে কখনও জোটেনি। সে ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র ও গবীব ও নগণ্য, তাব সম্বল ছিল একটিমাত্র ছাগল, কিন্তু বিয়ে ক'বে সেও আজ একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছে। গর্ব্বে তাব ছোট্ট শিশুব মতো মুখখানি আপেলেব মতন লাল টক্‌টকে হযে উঠল।

ইতিমধ্যে পুরুষেব দলও এসে পড়ল, তাদেব গান আব চীৎকাব তখনো সমানে চলেছে। টোম্ গিযে হটাৎ কাব্‌স্‌টাকে জড়িয়ে একেবাবে তুলে ধ'বে বল্‌ল, "ছোট্ট খাট্টো মানুষটি, কিন্তু ওজনে যেন এক বস্তা ময়দা আব কি!" সবাই হেসে উঠল। আনন্দে কাব্‌স্‌টাব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আব টোমেব প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাব মন ভ'বে গেল।

সবাইখানাব সব চাইতে বড় ঘবটিতে খাওয়াব আয়োজন হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সেখানে সকলে জড় হয়ে কাঠেব টেবিলগুলোব পাশে যে-যাব জাযগা ক'বে বসল। কাবো মুখে কথাটি নাই, সবাই গম্ভীবভাবে খেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে এল সুরুয়া, তাবপব শূয়বের মাংস, তাবপব ভেড়াব মাংস, তাবপব আবাব শূযবেব মাংস। একেবাবে সত্ত তৈবি খাবাব, এত গবম যে তখনও ধোঁওযা বেবোচ্ছে; ক্রমে এই ধোঁওয়ায় ঘব গেল ভ'বে। কাব্‌স্‌টা একমনে খেযে যাচ্ছিল, অবশেষে তাব পেট এত ভ'বে গেল যে কোনোবকমে জামাব নীচেব বোতামগুলো আলগা ক'বে সে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাব মনে হচ্ছিল, এই তো চাই, বিয়েতো একেই

বলে—খাসা ! টোমেব জামাব হাতায হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে ভাবছিল, এখন থেকে টোম্ তাব নিজেব লোক হোলো, একেবাবে সম্পত্তিব সামিল, বাস্তবিক স্বামী থাকা কি সুখেব। টোম্‌ও বাববাব তার স্ত্রীকে বলছিল, "খেযে নাও গো, ভালো ক'বে খেযে নাও।"

বাইবে অন্ধকাব ঘনিয়ে এল। ঘবে মোমবাতিব ব্যবস্থা হোলো, খালি মদেব বোতলগুলো হোলো বাতিদান। ব্যাণ্ডে পোলকা নাচেব সুব বেজে উঠল। কাব্‌স্‌টা খুসী হযে ভাবল, কি মজা ! এবাব নাচ। একটুক্ষণেব জন্যে সে একবাব বাইবে গেল—চাবদিক অন্ধকাব, সমস্ত পৃথিবী ববফে ঢাকা, আব তাবই উপব জলো হাওযা হুহু ক'বে বইছে; ধূসব মেঘেব ভাব পৃথিবীর উপব নেমে পডেছে। কাব্‌স্‌টা ভাবল, কাল নিশ্চযই ববফ পডবে।

গ্রামেব স্তব্ধ বাস্তাব দুই পাশে ছোট্ট কুঁডেঘবগুলি ভিঁড ক'বে বযেছে—মাঝখানে এক একটা জানলায় মিটমিট ক'বে একটা আলো জ্বলছে, কোথাও বা ছোট ছেলে কাঁদছে আব মা গান গেয়ে তাকে ঘুম পাডাচ্ছে—সেই মামুলি একঘেযে সুবে। বাস্তাব এক প্রান্তে ঐ যে বিশ্রী কালো ছোট্ট কি একটা দেখা যাচ্ছে ঐ হোলো এ্যান্‌লিসেব কুঁডে। কাল সব শেষ হযে যাবে—যেন কোনোদিন কিছু হযনি। কাব্‌স্‌টা আবাব তাব মাব কাছে গিযে থাক্‌বে আব—দুই হাতে সে মুখ ঢাকল। আজ কেন তাব এত কান্না পাচ্ছে ? কাঁদাব সময সে কাল যথেষ্টই পাবে।

কাব্‌স্‌টা ভিতবে গিযে নাচ সুরু কবল্। একজন বলিষ্ঠ পুরুষ যদি দুই হাত দিযে প্রায আঁকডে ধ'বে ক্রমাগত ঘুবপাক খাওয়ায় তাতে কি মজা ! তাব হাতেব স্পর্শে সমস্ত শবীবটা তাজা হযে ওঠে। ভাবনা চিন্তা সব যে কোথায উধাও হয, শুধু থাকে বক্তেব উদ্দাম প্রবাহ আব বুকেব মধ্যে প্রচণ্ড তোলপাড়। কাব্‌স্‌টাব চোখে সব অস্পষ্ট হযে এল, যেন সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। একপাল লোক ক্রমাগত বন্‌বন্ ক'বে ঘুবছে, চুরুটেব ঘন ধোঁয়াব মধ্য দিয়ে তাদেব কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে, আব পুরুষেব দল মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে,—শব্দ শুনে মনে হয় ঢেঁকিতে যেন ধান কোটা হচ্ছে। কাব্‌স্‌টা ভাবল, "একটু স্ফূর্ত্তি ক'বে নেওযা যাক। আব তো কখনো এমন দিন আসবে না।" ক্রমে পুরুষদেব মধ্যে একটা ঝগডা বেধে উঠল, তাবপব ঘুঁষোঘুঁষি। অন্য মেযেদেব সঙ্গে কাব্‌স্‌টাও গিয়ে তাতে যোগ দিল। আব যাকে সামনে পেল তাবই চুলেব মুঠি ধ'বে টেনে আব চেঁচিযে সে একটা বিপর্য্যয কাণ্ড কবল—তার স্বামীব পক্ষ হযে সে লডছে, কি তার গর্ব্ব। ক্রমে সব শেষ হল। গ্রামেব যুবক যুবতীব দল গান গাইতে গাইতে নব-

দম্পতীকে রাস্তার প্রান্তে এ্যান্লিসের কুঁড়েঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল, সেখানে আজ তাদের বাসর-শয়ন।

কার্‌স্‌টা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতে না জ্বালতে টোম্ গিয়ে সটান বিছানায় গড়িয়ে পড়ল—সারাদিন মদ খেয়ে তার এমনি অবস্থা হয়েছিল যে যেই শোওয়া অমনি ঘুমে একেবারে বেঁহুস। কার্‌স্‌টা গিয়ে আস্তে আস্তে তার জুতো খুলে বালিশটা ঠিক ক'রে তার মাথায় গুঁজে দিয়ে তার পাশে শুল। ক্লান্তিতে তার গা হাত পা টন্‌টন্ করছিল, চোখ বুজে মনে হোলো খাট্‌টা যেন নৌকার মত দুলছে। কিন্তু তবু তার ঘুম এল না, সে কেবল স্বপ্ন দেখে গীর্জ্জায় তাদের বিয়ে হচ্ছে, কিম্বা সরাইখানায় বোঁ বোঁ ক'রে সবাই মিলে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার খোপার ফিতেগুলো চাবুকের মত সোঁ সোঁ ক'রে বাতাসে উড়ছে—আর বারবার সে চমকে জেগে ওঠে। খানিকক্ষণ সে চোখ মেলে চুপ ক'রে থাকল—চারদিক অন্ধকার, নিঝুম। কি যেন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তার জীবনে আসছে—কিন্তু কি ? ওঃ তাইতো, কাল তার স্বামী তাকে ছেড়ে যাবে, আর তারপর আবার সেই একঘেয়ে জীবন সুরু হবে; বিয়ের পালা ফুরোলো—এখন বহুদিন তার জীবনে আমোদ প্রমোদ একেবারে থাকবে না।

ক্রমে ভোর হোলো, জানালার শার্সিগুলো নীল হয়ে উঠল। কার্‌স্‌টা উঠে বসে দেখল টোম্ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তার সুন্দর কোঁকড়ান চুলগুলো তার কপালের উপর এলোমেলো হয়ে পড়েছে, তার মুখ তখনো বেজায় লাল। কার্‌স্‌টা আস্তে আস্তে তার বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ছোট্ট ছেলেটির মতো তাকে আদর করতে লাগল। তার স্বামী—একেবারে তার নিজের ধন, ঠিক যেমন তার সেমিজ, তার সেলাই, তার ছাগল—না, ছাগলটার থেকেও বেশি নিজের, কেন না ছাগলটা তো শুধু তার একলার নয়, তার মা'রও। এই তো হওয়া উচিত। সব মেয়ের যা নিত্যকার কামনা—স্বামী—আজ সে তা পেয়েছে—আর স্বামীর মতন স্বামী—কি বলিষ্ঠ বিপুল তার চেহারা! কিন্তু লাভ কি হোলো ? পেতে না পেতেই তো তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কি দারুণ দুঃখ! ভাবতেও পারা যায় না। কার্‌স্‌টা আর বসে থাকতে পারল না, তাড়াতাড়ি উঠে দুধের ভাঁড় নিয়ে ছাগলটাকে দোহাতে চ'লে গেল।

বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়া বইছে আর তুষার পড়ছে। ভোরের নীল আলো আকাশ ছেয়ে পৃথিবীর উপর লুটিয়ে পড়েছে। বহুদূরে দিগন্তে বনের কালো রেখার উপর আলোর আভা দেখা যাচ্ছে—একেবারে শাদা তার রঙ্। কার্‌স্‌টা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে দুধের ভাঁড়,

আব এক হাত দিয়ে সে চোখ আডাল ক'বে আছে যাতে আলো না লাগে। ক্রমে চাবদিক পবিষ্কাব হোলো। গ্রামেব বাস্তাব তুইপাশে ছোট ছোট মেটে বঙেব বাড়িগুলোব সামনে আবো অনেক মেয়ে দ'াডিযেছিল। সবাব হাতে তুধেব ভঁাড়, সবাই কাব্‌স্‌টাব মত বিষণ্ণ মুখে ভোবেব আলোব দিকে তাকিয়ে—এই যে দিনটি এল, এদিনে যেন কি একটা ঘটবে, তাবই প্রতীক্ষায় সকলে দ'াডিয়ে।

কাব্‌স্‌টা হঠাৎ শিউড়ে উঠে এক দৌডে গিয়ে গোলাবাড়িতে ঢুকল, বাডি অবিশ্যি নামে, আসলে একটা নীচু ছাদওযালা গুদোম ঘব বিশেষ, ছাগল, শুযোব ও মুবগীদেব এই হোলো আবাস। বাডিব ভিতবটা গুমট হয়েছিল। কাব্‌স্‌টাব পায়েব শব্দ পেযে মুবগীগুলো ডানা ঝট্‌পট্‌ ক'বে উঠল। শূযবটা আবামে ঘুমোতে ঘুমোতে আপন মনে ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ শব্দ কবছিল। কাব্‌স্‌টা ছাগলটাব পাশে হঁাটু গেডে বসে দোহাতে আবস্ত ক'বে দিল—তাব আঙ্গুল বেযে তুধ গডিযে পডল, টাট্‌কা তুধেব স্পর্শ তাব বেশ লাগ ছল। তাব চোখে যেন ঘুম জডিযে এল। ছাগলটাব পিঠেব উপব মাথা বেখে কাব্‌স্‌টা কঁাদতে আবস্ত কবল—বিযেব সময যে বকম ভাবে সকলকে জানিযে সশব্দে কেঁদেছিল কিম্বা আজ তাব স্বামী চ'লে যাবাব সময় সহবেব মধ্যে সবাব সামনে যে ভাবে কঁাদবে ঠিক সে বকম কান্না নয—সে একটি ছোট্ট মেযেব মত ফুঁপিযে ফুঁপিযে কঁাদতে লাগল। চোখেব জলে তাব মুখ ভেসে গেল, দেখলে মনে হয় যেন সে মুখে গবম জলেব ছিটে দিয়েছে, আব তাব নিজেব জন্য তুঃখে মন উঠল ভ'বে—খুব গভীব তুঃখে। এই ভাবে কঁাদতে কঁাদতে সে ঘুমিযে পডল। ছাগলটা যেমনি ছিল তেমনি দ'াডিযে বইল, শুধু মাঝে মাঝে মুখ ফিবিযে এই ঘুমন্ত মেয়েটিকে ঠিক মাব মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখছিল।

হঠাৎ তাব মাব গলাব আওয়াজ পেযে কাব্‌স্‌টাব ঘুম ভেঙে গেল, সে শুনল তাব মা বলছেন, "ওমা, মেযে যে দেখি তুধ দোহাতে দোহাতে একেবাবে ঘুমিয়ে পডেছে। কিন্তু তোব কি দবকাব ছিল আজ তুধ দোহাবাব বল্‌তো ?"

কাব্‌স্‌টা ঘুমেব ঘোবেই জবাব দিল, "কাউকে তো দোহাতে হবেই।" এ্যান্‌লিসে ব'লে উঠল, "তা তো বটেই! তাই কিনা তুধ দোহাতে গিযে ঘুমোতে হবে।"

এই প্রবীনা নাবীটিব কথাবার্তা ববাববই এই বকম কর্কশ, কিন্তু তবু কাব্‌স্‌টাব মনে হোলো আজ যেন তাব মাব গলাব স্ববে একটু চাপা হাসির আব একটু সম্ভ্রমেব ভাব বয়েছে। তাতো হতেই হবে, একজন

কুমাবীব সঙ্গে যে ভাবে কথা বলা চলে একজন বিবাহিতা মেযেব সঙ্গে তো আব সে ভাবে কথা বলা চলে না। কাব্‌স্‌টা যে এখন বিবাহিতাদেব দলে।

"যা, গিয়ে আগুন টাগুন জ্বালা, তোব স্বামী এতক্ষণে নিশ্চযই উঠেছে।" কাব্‌স্‌টা লাফিযে উঠল। তাই তো! আজকেব দিন আব অন্য দিন তো সমান নয। আজকে যে সে তাব সেবা পোষাক প'বে গাড়ি হাঁকিযে সহবে যাবে, সবাব চোখে সে আজ পডবে আব তাব দুঃখে সবাই দুঃখ পাবে। এ সব ভেবেও আনন্দ।

প্রকাণ্ড এক শ্লে-গাড়িতে ক'বে গ্রামেব মাতব্বব বংকুটদেব সহবে নিযে যাবে এই কথা হয়েছে। তাদেব বাপ মা ও স্ত্রীবা পিছন পিছন ষ্টেষণ পর্য্যন্ত তাদেব পৌঁছতে যাবে।

খেতে বসে টোমেব মুখে মোকদ্দমা ছাড়া আব কোনো কথা নাই—কি কবতে হবে না হবে স্ত্রীকে সে ভালো ক'বে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপাবটা এই। গ্রামেব বনেব কাছে ডাণ্ডবেব যে ছোট্ট জমী ছিল পিটাব রুজ তা দখল ক'বে বসেছিল, কিন্তু আসলে এই জমীটি পাবাব কথা কাব্‌স্‌টাব; কেননা বক্তেব সম্পর্ক ধবলে সে ছিল এই সম্পত্তিব পূর্ব্বেকাব মালিকেব সব চাইতে নিকট আত্মীয়, আব পিটাবেব দাবী তাব সৎমেযেব স্বামী হিসাবে। কাব্‌স্‌টাকে বিযে ক'বে টোমেবও এই জমীব উপব দাবি হযেছিল—সে চায় তাব অনুপস্থিতিতেও কাব্‌স্‌টা নিজেব অধিকাব সাব্যস্ত কবে। "জ্যাকসন ব'লে যে উকীল আছে তাব কাছে যাও। যিহুদীদেব মাথা খুব পবিষ্কাব হয, আব তাব ফিও বেশি না। দেখো, ওবা যেন কিছুতেই তোমাকে না ঠকায়।" নিজেব দাযিত্ব সম্বন্ধে কাব্‌স্‌টা খুব সজাগ। খুব গম্ভীবভাবে সে বলল, "নিশ্চয। আমি সব ঠিক ক'বে দেব—আমি তো আব বোকা নই।" "বোকা হলে কি আব আমি তোমায বিয়ে কব্‌তাম?" এই ব'লে টোম এই বিষয়ে আলাপ শেষ কবল।

বেজায় চ্যাঁচ্যামেচি ও তামাসা কবতে কবতে বংকুটেব দল গাড়িতে উঠল। মেয়েবা ও ছোট ছেলেবা চাবদিকে চুপ ক'বে দাঁড়িয়ে, সবাব চোখেই জল। চাবটি কনে আবাব একটি 'শ্লে'-তে চডে চলেছে। ববফ আবো বেশি পড়ছে। কনেদেব মাথাব চূডোগুলি ঠিক কালকেব মতো উঠছে আব নামছে, কিন্তু ববফ পডে তাবা একেবাবে শাদা হযে গেছে।

গাড়ি বনেব কাছে পৌঁছাতে ম্যাবি বল্‌ল, "এতে লাভটা কি হোলো? কাল থেকে তো আবাব যেমন তেমনি!" আব তিনজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "উপায কি?" যখন তাবা সমুদ্রেব ধাবেব বাস্তাব উপব গিযে পড়ল, ইল্‌সে বল্‌ল, "যা অবস্থা দেখছি মনে হয় ক্ষেতেব ফসল

একেবাবে যাবে।” তাতে আব সবাই ব’লে উঠল, “এমনিতেই যা দিন যাচ্ছে, তাব উপর ফসল নষ্ট হলে তো বাঁচাই দায় হবে।” এব পব সহবে পৌছানো পর্য্যন্ত আব কেউ কথা বলেনি।

সহবে পৌছে এত জিনিষ দেখবাব ছিল যে একটু সুস্থিব হয়ে দুঃখ কববাব অবসবও তাদেব হোলো না। তাবপবে টাউন-হলেব সামনে পুরুষদেব জন্য অনেকক্ষণ তাদেব দাঁড়াতে হয়েছিল, সেখান থেকে সবাই মিলে সবাইখানায় গিয়ে খাওয়া, তাবপব আবাব মদ ও কেক খাবাব পালা, আব সব শেষে ষ্টেশনে গিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীদেব ট্রেণে তুলে দেওয়া, এই সবেব মধ্যে দিযে দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।

যাবাব আগে টোম্ কাব্‌স্‌টাব পিঠ চাপড়ে বল্‌ল, “ভয় কি? এটুকু জেনো আমবা কেউ মবছি না। খাবাবেব বড অভাব—মাঝে মাঝে টাকা পাঠিযো কিন্তু।” “নিশ্চয়।” “আব মোকদ্দমাটাব কথা ভুলো না—শীগ্‌গিবই উকিলেব সঙ্গে দেখা কোবো!” “নিশ্চয।” “বেশ ভেবে চিন্তে বুদ্ধি ক’বে সব কাজ কোবো। ফিবে এসে যেন বোকা না বনি।” “নিশ্চয়।”

ট্রেণ ছেড়ে দিল। কাব্‌স্‌টা ও তাব সঙ্গিনীবা স্থিব হয়ে প্ল্যাটফব্‌ম্-এ দাঁড়িযে, তাদেব পা আব চলে না, তাদেব মুখে শুধু এক কথা, “ভগবান্—একি কবলে।”

সব প্রথম কাব্‌স্‌টা চুপ কবল, তাকে যে উকিলেব বাড়ি যেতে হবে।

উকিলের বাড়ি কাব্‌স্‌টাকে খানিকক্ষণ বসতে হযেছিল, বেশ সুন্দব আব গবম একটি ঘবে। উকিল লোকটি দেখতে ছোট্ট খাট্টো, কথা মিষ্টি। কাব্‌স্‌টাব কাছে সব শুনে তিনি আশ্বাস দিলেন, কোনো ভয় নাই, মোকদ্দমায় জিতেব সম্ভাবনা খুব বেশি। তাব উপব আবাব একটু বসিকতা কবতেও তিনি ছাড়লেন না। কাব্‌স্‌টাব চিবুক ধ’বে তিনি বললেন, “সেপাইব গিন্নি, আব এই রূপসী, তাব কপালে কিনা এতদিনেব বিবহ। হাযবে!” কাব্‌স্‌টা ভাব্‌ল, যা হোক্ মোকদ্দমাব গতিক ভালো।

যখন শ্লে-গাড়িব দল লম্বা সাববন্দী হযে বাড়িব দিকে বওযানা হোলো, তখন বেলা পড পড, অন্ধকাব হয়ে এসেছে, মেঘগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন আগুণেব ডোবা, আস্তে আস্তে সমুদ্রেব মধ্যে সূর্য্য ডুবছে—ব্যাস্‌প্‌বেবিব মতো টকটকে লাল তাব বং, ধূসব জল যতদূব দেখা যায় লাল হয়ে উঠেছে, ঢেউযেব মৃদু গর্জ্জন মনে হচ্ছে ঠিক যেন বেশমেব খস্‌খস্ শব্দ।

সাবাদিন হেঁটে, দাঁড়িযে, মদ খেয়ে, আব কেঁদে সেপাইব স্ত্রীবা ক্লান্ত হযে পড়েছিল। মনে তাদেব স্ফূর্ত্তি নাই,—চুপ ক’বে ব’সে তাবা দেখছিল

সূর্য্যাস্তেব বঙেব ছটা ক্রমে ম্লান হযে আসছে। বনেব ভিতব অন্ধকাব যখন ঘনিয়ে এল আব পাইন গাছেব ঝাঁকবা চুলেব মতো কালো মাথাব ওপব চাঁদ দেখা দিল, এই চাবটি নাবীব মনেব ভাব অসহ্য হয়ে উঠল। কাঁদাব শক্তি আব তাদেব ছিল না, তাই তাবা গান ধবল—যে গান তাদেব সব প্রথম মনে পড়ল। তাবই করুণ সুবে বন ভ'বে গেল।

কি লাভ হোলো এই বিয়ে ক'বে? এ্যান্‌লিসেব কুঁড়েঘবে জীবনেব ধাবা ঠিক তেমনি বইছে। কাব্‌স্‌টা বোজ ছাগল দোহায়, বনে বনে কাঠ কুড়ায়, তাঁতে কাপড় বোনে। ডিসেম্বব মাসেব ছোট দিন, তিনটেব সময অন্ধকাব হয, কাব্‌স্‌টা ঠিক ছ'টায গিয়ে তাব বিছানায় শোয, তাব সেই ছেলেবেলাব ছোট্ট খাট্‌টিতে, সেটাকে আব বদলান হয়নি, বদলাবাব দবকাবই বা এমন কি ছিল? ওদিকে বাত ছুটো বাজতে না বাজতেই তাব ঘুম ভেঙে যায় আব সে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে আবাব তাঁতে বসে। দিন আসে দিন যায়, কিন্তু এই একঘেযে নিবানন্দ জীবনেব আব কোনো নড়চড় হয না, ঠিক ছাই বঙেব পশমেব সুতোর মধ্যে তাঁতেব মাকু যেমন চলে—এদিক আব ওদিক, এদিক আব ওদিক। কাব্‌স্‌টাব যে বিয়ে হযেছিল তাব একমাত্র চিহ্ন সে এখন বিনুনিব বদলে খোপা কবে। ছুটিব দিন সে আব সবাব সঙ্গে নাচতে যায় না, আব শনিবাব বাত্রে তাব কোনো ছেলে-বন্ধু লুকিযে তাব সঙ্গে দেখা কবতে আসে না। মেয়েদেব জীবনে যা প্রধান ব্যাপাব, ছেলেদেব কথা ভাবা, তাদেব জন্য অপেক্ষা কবা, আব মাঝে মাঝে তাদেব জন্য কাঁদা—কাব্‌স্‌টার তা ফুবিয়ে গিযেছে। কেইবা আছে তাব গল্প কববাব লোক আব কি গল্পই বা সে কববে? যে-সব মেযেদেব বিয়ে হযনি তাবা বলে তাদেব ছেলে-বন্ধুদেব কথা, আব যাদেব বিয়ে হযেছে তাবা বলে স্বামীব কথা, ছেলেপিলেব কথা, আব ঘবকন্নাব কথা। কাব্‌স্‌টাব তো এসব কিছুই নাই। তাই সে মুখ ভাব ক'বে চুপ ক'বে থাকে। মাঝে মাঝে তাব আব কিছুতেই ঘুম আসে না, বিছানায শুযে সে শুধু ছট্‌ফট্‌ কবে। চাবদিক নিস্তব্ধ। জানলাব ছোট্ট শার্সিব ভিতব দিয়ে সে দেখতে পায শীতেব আকাশে তাবাগুলো জ্বল্‌জ্বল্‌ কবছে। পাশেব কুঁড়ে-ঘবগুলোব প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট তাব কানে আসে। ঐ যে বিলিব ছোট্ট ছেলে কেঁদে উঠল। জেজ্‌ মাতাল হয়ে সবে বাড়ি ফিবছে, ঘবে পা দিতে না দিতে চৌকাঠেব উপব সে হোঁচট খেল। এবাব সে বিলিকে ধবে মাবছে, বিলি চ্যাঁচাচ্ছে আব বকছে। কাব্‌স্‌টাব মনে হয় সে বড় একা। তাব কেন এসব কিছু নাই? সে চায় তাব স্বামীকে—তাব টোমকে। তাব ছুই চোখে জল ভ'বে আসে, বালিশে মুখ গুঁজে মড়াব মতো সে পড়ে থাকে।

তবু যা হোক মোকদ্দমাটা ছিল। তাব মন একেবাবে জুড়ে ছিল এবই ভাবনা, আব এব জন্যে তাব কদব বেড়ে গিয়েছিল। সপ্তাহে একদিন সে চাবঘণ্টাব পথ হেঁটে উকিলেব বাড়ি যেত। বাস্তাব ধাবেব প্রত্যেকটি গাছ, এমন কি প্রত্যেকটা পাথব পর্য্যন্ত তাব জানা। তাব পথেব এই বোবা সাথীগুলোব সঙ্গে তাব এমনি নিবিড় পবিচয় যে যেমন দিনই হোক না কেন সে ঠিক তাদেব চিনতে পাবে। যদি ঠাণ্ডায় তাব হাতেব আঙুলগুলো একেবাবে জ'মে যাবাব মতো না হয়, তাহলে সে পথ চলতে চলতে মোজা বোনে। মাথায় লাল রুমাল জড়িয়ে যখন সে উকিলেব বাড়ি যায় তখন তাকে চিনতে পাবে না এমন লোক ও অঞ্চলে নাই, আব কেইবা না জানে তাব মোজা বোনাব আব তাব মোকদ্দমাব কথা ?

কাঠুবেব দল তাকে দেখতে পেলে চেঁচিয়ে বলে, "বলি, ও সেপাইব গিন্নি, একলা একলা লাগে কেমন ?" প্রশ্ন শুনে কাব্‌স্‌টা থমকে দাঁড়ায়, তাবপব জামাব হাত দিয়ে মুখেব ঘাম মুছে বলে, "মন্দ কি ? বেশ তো আছি।"

"টোমেব আসতে তো আবো বছব ছয়েক হতে পাবে, না ?" "তা হোক না, আমাব তাতে ভাবি।" এই জবাব শুনে বনেব মধ্যে হাসিব বোল ওঠে। কাঠুবেব দল বলে, "দেখি ভাবি একলা থাকাব সখ! বলি, মোকদ্দমা চলছে কেমন ?" "চমৎকাব! যাব দিকে স্বয়ং ধর্ম্ম, তাব ভাবনা কি ?" "বলো কি ?"

একটি লোকেব সঙ্গে তাব প্রায়ই দেখা হয়—এই বনেব যে তদাবক কবে তাবই সহকাবী। কালো গোঁফ, সবুজ কোটেব কলাব আব রূপোব ঘড়িব চেন—এই হোলো তাব পবিচয়। বয়স অল্প। লোক খাসা। সে প্রতিবাবই কাব্‌স্‌টাকে ডেকে কথা বলে আব ঠাট্টা ক'বে জিজ্ঞাসা কবে, "সেপাইব গিন্নিব খবব কি ?" কাব্‌স্‌টাব মুখ প্রায় লাল হয়ে ওঠে, তাব দিকে ফিবে কাব্‌স্‌টা জবাব দেয়, "কেন, বেশ ভালো।"

"স্ত্রী না হলেও টোম্ তাহলে বেশ আছে—একেবাবে এতদিন পর্য্যন্ত।" "তাব ভাব্‌না কি ? য়িহুদী আব পোল মেয়েব কি আব তাব অভাব হবে ?" "তোমাবই বা কি ভাবনা ? এখানেই কি কিছু পুরুষ মানুষেব অভাব নাকি ?" "তাতো বটেই।" "তা যাই বলো, তোমাব মতো অমন টুকটুকে তরুণীটি হলে আমি কি আব পথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তাম যে কবে আমাব সেপাই স্বামীটি ফিববেন ?" "কে বল্‌ল আমি ব'সে আছি ?" এই ব'লে কাব্‌স্‌টা হো হো ক'বে হেসে ওঠে—কেউ রসিকতা কবলে যেমন ভাবে হাসা উচিত ঠিক তেমনি ক'রে।

লোকটি ছাডবাব পাত্র নয়। সে ব'লে উঠল, "ওঃ তাই নাকি? তা তোমাতে আমাতে মানায় ভালো, তুমি কেমন ছোট্ট খাট্টো আব আমি তেমনি লম্বা।" "যা বল্লে। এই যে পার্ব্বন আস্‌ছে, তখন তোমাতে আমাতে একটা চুক্তি কবা যাবে।" এই বলতে বলতে কাব্‌স্‌টা আবাব পথ চলা সুরু কবে। একদিন লোকটি কাব্‌স্‌টাকে ধ'বে আদব কবে আব কি! কাবস্‌টা জোব ক'বে তাব হাত ছাডিযে এক দৌড। কিন্তু সাবাদিন এই কথা যতই ভাবে ততই তাব হাসি পায়। বাত্রে বিছানায শুয়ে তাব কেবল মনে পডে লোকটিব চোখ, আব যখন সে শোনে ছেলেবা সব যে-যাব মনেব মতো মেযেব ঘবেব দবজায় টোকা দিচ্ছে, তখন তাব বুকেব বক্ত চঞ্চল হযে ওঠে, তাব চোখেব ঘুম যায চ'লে।

বসন্ত আসাব সঙ্গে সঙ্গে এই সহবে যাওযা আসাব ব্যাপাবটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। পবিষ্কাব ঝবঝবে বিকালগুলো, দেবিতে সন্ধ্যা হয, বাডি ফিববাব পথে তাই তাব কোনো তাডা থাকে না। সে প্রাযই খুব আস্তে আস্তে পথ চলে, একবাবে পা পা ক'বে হাঁটাব মতো, যেন সে প্রাণে ধ'বে বন ছেডে যেতে পাবে না। তাব মনে হয় "এতো দেখি ভাবি মজা! এই বসন্তকালেব বিকালবেলায মানুষকে কি আলসেমোতেই না ধবে। এমনি আলসেমো যে মোকদ্দমাব কথা পর্য্যন্ত আমাব ভাবতে ইচ্ছা হয় না। অদ্ভুত!"

লম্বা লম্বা ফাবগাছেব সাবি, তাবি মাঝে এক একটি বার্চ্চ নতুন পাতায় ছেযে গেছে, যেন একটা সবুজ কানাৎ দিয়ে কেউ ঢেকে দিয়েছে, কোথাও বা বনেব মধ্যে শাদা বঙেব কি একটা জ্বল্‌জ্বল্ কবছে, ঠিক যেন কেউ শাদা কাপড মুডি দিয়ে দাঁডিযে আছে—ওটা হোলো বুনো বেবি গাছ, একেবাবে ফুলে ছাওয়া, এক মাইল দূব থেকে এব গন্ধ নাকে আসে।

বনেব পাশে মাঠেব মধ্যে কালো হবিণগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁডিয়ে থাকে, মেযেদেব গানে পাহাড আব মাঠ ভেসে যায়। কি গান যে তাবা গায় কাব্‌স্‌টা তা খুব ভালো ক'বেই জানে। বসন্তেব বাতে প্রকৃতিস্থ থাকতে পাবে এমন মেয়ে ক'জন আছে? ঘুমোবাব চেষ্টা কবা বৃথা। কাব্‌স্‌টা তাও জানে। সেও এমনি কত বাত গান গেযে কাটিয়েছে —তাব গলাব সুব বাত্রিব নিস্তব্ধতা ভেদ ক'বে অনেক দূব ছডিযে পডেছে। উৎসুক হযে সে অপেক্ষা কবেছে—কেউ কি সাডা দেবে না? একটি সুন্দব মুখেব নিবিড স্পর্শে কি তাব তৃষিত অধব তৃপ্ত হবে না? কাব্‌স্‌টা পথ চেয়ে কান খাডা ক'বে শোনে বনেব ভিতব কোনো আওযাজ পায় কি না, অতীতেব স্মৃতিগুলো ঠিক ছবিব মত তাব চোখেব সামনে জেগে ওঠে।

একদিন বনেব মধ্যে মব্‌মব্‌ শব্দ শুনে কাব্‌স্‌টা চমকে উঠল। একটা হবিণ ভয় পেয়ে ঝোপেব আড়াল থেকে বেবিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে আবম্ভ কবল। আবাব সেই মব্‌মব্‌ শব্দ—কাব্‌স্‌টা তাকিয়ে দেখল তাব বনেব বন্ধু তাব সামনে দাঁড়িয়ে।

কাব্‌স্‌টাকে সে কতই সোহাগ ক'বে ডাকল। চাঁদ তখন ঠিক মাথাব উপব, তাবই আলোয় লোকটিব মুখ আব চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ কব্‌ছিল। সে জিজ্ঞাসা কবল, "আবাব বুঝি সহবে যাওয়া হয়েছিল?" কাব্‌স্‌টা থেমে দাঁড়াল,—তাব মুখেব দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল, হ্যাঁ, সে সহবে গিয়েছিল বৈকি—নইলে তাব আব বেবোনোব দবকাব কি? "কি সুন্দব হয়েছে। হেঁটে বেডাবাব মত বাত বটে।" "হ্যাঁ, সত্যি ভাবি সুন্দব!"

লোকটি হেসে উঠে একবাব কাব্‌স্‌টাব মুখেব দিকে তাকালো, তাবপব চুপ ক'বে বইল। কাব্‌স্‌টাও কোনো কথা বলল না, শুধু অপেক্ষা ক'বে থাকল। অবশেষে কাব্‌স্‌টাকে দুই হাতে বুকেব কাছে টেনে নিয়ে সে বল্‌ল, "চলো, যাই—শুধু আমবা দুটি—আব কেউ না।"

"তাই তো, তোমাব হোলো কি?" কথাটা কাব্‌স্‌টা বেশ খব্‌খবে গলায় বলবাব চেষ্টা কবেছিল, যেন সে ছেলেদেব সঙ্গে তামাসা কবছে—কিন্তু তাব স্বব কেমন যেন আপনা হতে কোমল হয়ে এল। তাবপব তাবা যখন গাছেব ছায়ায় গিয়ে বসল আব লোকটি তাব মস্ত হাত বুলিয়ে কাব্‌স্‌টাকে আদব কবছিল, তখন তাব সমস্ত শবীব অবশ হয়ে এল, সে ভাবল লোকটি যাই চাক্‌না কেন, না বলবাব সাধ্য তাব নাই।

ভোব হোলো। কাব্‌স্‌টা যখন বেশ পা চালিয়ে গ্রামেব দিকে চলেছে, তখন পাখীব ডাকে পৃথিবী মুখব হয়ে উঠেছে।

সে পথ চলে আব ভাবে, "যদি বনেব ভিতব একটা পুরুষ মানুষেব সঙ্গে বাত কাটানো যায়—তাহলে যা হবাব তা হবেই। আবাব কি!"

এবপব সহব থেকে ফেবাব পথে কাব্‌স্‌টাব সঙ্গে লোকটিব প্রায়ই দেখা হয়, আব বাড়ি ফিবতে দেবি হয়ে যায়। কাব্‌স্‌টাব মা এ্যান্‌লিসে বলেন, "তোব দেখছি দেবি ক'রে বাড়ি ফেবা একটা বোগ হয়েছে—ব্যাপাব কি?"

কাব্‌স্‌টা জবাব দেয়—"ব্যাপাব মোকদ্দমা। অত চট্‌ ক'বেই কি আব তা হয়, এতো আব বান্না নয়।"

মেয়েবা গান গায়, ছেলেব দল তাদেব বাড়িব দবজায় হানা দেয়, কিন্তু কাব্‌স্‌টাব মন আব এতে চঞ্চল হয় না।

ফসল কাটবাব সময় কাব্‌স্‌টা জানতে পাবল তাব সন্তানসম্ভাবনা হয়েছে। মোটেই সুবিধাব কথা নয়। এখন উপায় কি? সে গোলাঘবে

১৩

তাব ছাগলটাব কাছে গিয়ে সবাব চোখেব আড়ালে খানিকক্ষণ কাঁদল, তাবপব আস্তে আস্তে গিয়ে কাজে মন দিল। লোকটিব সঙ্গে দেখা হতে সে খুব বাগ ক'বে তাকে যা'তা' বলল, কাঁদাকাটি কবল। কিন্তু এ ক'বে আব লাভ কি ?

সে ধীবভাবে তাব কাজ ক'বে যায়, তাব মুখে কথা নেই, তাব বং ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। গ্রীষ্মেব সময় কাজেব চাপ খুব বেশি, কিন্তু কোনো কাজ সে ফাঁকি দেয না। কেবল মাঝে মাঝে তাব মেজাজ বিগড়ে যায়, তখন সে মাব সঙ্গে খিটিমিটি কবে, কিম্বা ছাগলটাকে ধ'বে মাবে। আব মোকদ্দমাব কাজ থাকুক বা না থাকুক ঘন ঘন সহবে যায়। যদি মোকদ্দমায় হাব হয তাহলে তাব দফা শেষ, টোম্ এসে তাকে আব তাব ছেলেকে আস্ত বাখবে না। তাই তো, ছোট ছেলেটা যে আসছে, তাব কি দশা হবে ? কি আব হবে ? অমন ছেলে পৃথিবীতে কতই হয়—আব ম'বেও যায়। টোমেব আসতে তো এখনো অনেক দেবি। কিন্তু তবু সে তাব ছেলেব কথা না ভেবে পাবে না ! তাব কেমন টুক্‌টুকে একটা দোলনা হবে, তাব বিছানায় কেমন ধব্‌ধবে চাদব পাতা হবে,—আব অমন ছোট্ট একটি নবম জিনিষ একেবাবে বুকেব মধ্যে চেপে ধবতে কেমন লাগবে ! "দূব ছাই ! ছেলে না বাঁচলেই ভালো !"

আলুব ক্ষেতে যখন ফসল ধবল, কাব্‌স্‌টা তাব অবস্থা আব গোপন বাখতে পাবল না। সে একটি একটি ক'বে আলু তুলে তাব আঁচলে বাখে আব শোনে পেছনে বিলি বলছে, "কাব্‌স্‌টা দেখছি টোম্ বাড়ি ফিবলে তাকে দেবাব মতো একটা কিছু জোগাড় কবেছে—অমন জিনিষ পেলে টোম্ কি আব খুসী না হয়ে পাবে !" এই কথায় অন্য মেয়েবা হেসে ওঠে, আব তাদেব হাসি দেখতে দেখতে মাঠময ছড়িয়ে পড়ে। কাব্‌স্‌টা ভাবে, "এবকম যে হবে জানাই তো ছিল আব হোলোও তাই।" তাব হাঁটু ঠক্ ঠক্ ক'বে কাঁপে, তাব আঁচল থেকে আলুগুলো মাটিতে পড়ে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়িযে জ্বলন্ত চোখে সে সবাব দিকে তাকায়—কিন্তু জানে সে অসহায়। আবাব সে তাব কাজে মন দেয়। তাব লাঞ্ছনাব আব শেষ নাই। যখন মাঠ পাব হয়ে সে আলুব বোঝা গাড়িতে তুলতে যায়, চাবদিক থেকে তাকে মেয়েবা জিজ্ঞাসা কবে, "বল্ না, কাব্‌স্‌টা, এমন বত্ন পেলি কোথায় ? সহবে নাকি ? তা সহবে খুব সস্তাতেই ওসব জোটে। এ বুঝি মোকদ্দমাব ফল ? না তোব টোম্ ডাকে পাঠিয়েছে ?" কাব্‌স্‌টা নিরুত্তর।

একদিন না একদিন লোকেব কথা থামবেই। তখন সে একটু সোয়াস্তি পাবে। তার মাও কম যায় না—সাবাদিন তার ঘ্যান্ ঘ্যান্ আব

মুখ-ঝাট্‌কা লেগেই আছে। বকাবকি ক'বে লাভ কি? কাব্‌স্‌টা ভাবে যা ঘটে মেনে নেওয়াই ভালো। মানুষেব কপালে দুঃখ আছেই—এই ভেবে তবু সে মনে একটু বল পায়।

একদিন শীতকালে বনেব ভিতব কাঠ কুড়োতে গিয়েছে এমন সময় তাব ব্যথা উঠল। মেয়েবা সবে মিলে যখন তাকে একটি স্লে-গাড়িতে তুলে টানতে টানতে গ্রামে নিয়ে এল, তখন তাদেব সে কি উদ্দাম হাসি! কাব্‌স্‌টাব একটি মেয়ে হোলো। সে এতদিন যাব অপেক্ষায় ছিল—যাক্, অবশেষে তিনি হাজিব! কই, মববাব নামও তো নেই। কেমন পুষ্ট শবীরটি! আব ছোট্ট কচি মুখটি দেখলে মনে হয় যেন কত ভাবনাই তাঁকে ভাবতে হয়, আব মিষ্টি দুটো চোখ একেবাবে জ্বল্‌জ্বল্ কবছে। কেউ আব ঠাট্টা কবে না। করলেই বা কি যায় আসে? মোকদ্দমা ছাড়াও কাব্‌স্‌টাব জীবনে এখন এমন জিনিষ আছে যাব জন্যে সে বেঁচে থাকতে পাবে। অবিশ্যি মোকদ্দমাব তদ্বিব কবা তাব প্রধান কর্ত্তব্য—কিন্তু এই ছোট্ট মানুষটিকে যে সাবাদিন না দেখলে চলে না। এঁব কাজ কি কম—এঁকে দোল দেওয়া, এঁকে দুধ খাওয়ানো, আর গবম দিনে কোলে নিয়ে দোব-গোড়ায় ব'সে গান গাওয়া।

টোমেব চিঠি এল। সে লিখেছে—"খবব খাবাপ। অসুখে পড়েছি। এবা আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। আসছে সপ্তাহেই পৌঁছাব। সাবধানে থেকো। ইতি তোমাব টোম্।"

শীতকালে ঘবে আগুন জ্বালা হয়েছে, তাবি আলোয কষ্টে কাব্‌স্‌টা চিঠিটা পড়ল। মা জিজ্ঞাসা কবল, "কি লিখেছে?" "কি আব লিখবে?" এই ব'লে কাব্‌স্‌টা আগুনেব কাছে বেঞ্চিব উপব ব'সে পড়ল, সে আব দাঁড়াতে পাবছিলনা। মা আবাব জিজ্ঞাসা কবল, "কিবে? ভালো আছে তো?" কাব্‌স্‌টা কোনো জবাব দিল না। চুপ ক'বে আগুনেব দিকে তাকিয়ে থাকল। "জবাব দিচ্ছিস না কেন? কি লিখেছে টোম্ বল্‌তেই হবে।" আস্তে আস্তে শুক্‌নো গলায় কাব্‌স্‌টা বল্‌ল, "শীগগিবই ফিবছেন।" কাব্‌স্‌টা ভাবছিল, "আব যাই হোক ছেলেটাকে যদি কিছু না বলে।" তাব মাব মনেও ঐ এক চিন্তা, কেন না সে বল্‌ল, "দোলনাটা এমন জায়গায় বাখতে হবে যেন যেতে আস্‌তে সব সময় তাব চোখে না পড়ে।" কাব্‌স্‌টা বল্‌ল, সে ব্যবস্থা সে কববে। খানিকক্ষণ তাবা দু'জন পাশাপাশি চুপ ক'বে বসে থাকল, তাবপব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে যে-যাব বিছানায় গিয়ে শুল। শুয়ে শুয়ে মা মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবে, "মোকদ্দমা ভালো চল্‌ছে তো?" "ভালো না চ'লে উপায় আছে?" "আচ্ছা—তাহলে"—এই বল্‌তে বল্‌তে এ্যান্‌লিসে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন শনিবাব, বিকাল বেলা, কাব্‌স্‌টা সবাইখানাব সাম্‌নে দাঁড়িযেছিল। যে-সব সেপাই ছুটি পেয়েছে তাবা আজ ফিববে, সহব থেকে শ্লে-গাড়িতে ক'বে তাদেব আসাব কথা। অসহ্য শীত! টক্‌টকে লাল সূর্য্য কাচেব মত স্বচ্ছ আকাশে অস্ত যাচ্ছে। গ্রামেব মেয়েব দল সব সেখানে জড হয়েছে। কোঁচবেব মধ্যে হাত গুঁজে তাবা ঠক্ ঠক্ ক'বে কাঁপছে আব ব্যগ্র দৃষ্টিতে বাস্তাব দিকে তাকিযে দেখছে। ঐ যে—সেপাইবা আসছে! তাবা টুপি নেড়ে চীৎকাব কবতে আবম্ভ কবল।

কার্‌স্‌টাব সঙ্গে দেখা হতে টোম্ বল্‌ল, "তেমনি ছোট্টটি, কিন্তু যাহোক তবু ত বেঁচে আছ।" কাব্‌স্‌টাব মুখ লাল হযে উঠল, সে প্রায ভুলেই গিয়েছিল টোম এমন জোযান। তাব কি বকম লজ্জা কবতে লাগল। কোনো বকমে একটু হেসে বলল, "না বাঁচাব কি হয়েছে।" কিন্তু তাব চোখে জল ভ'বে এল, সে টোমেব জামাব হাতায় আস্তে আস্তে হাত বুলিযে দিতে লাগল। তাবপব বল্‌ল—"চলো, খাবাব তৈবী।" "খাবাব—তা বেশ" ব'লে টোম্ হালকা মনে হাসল। "আমি বোধ হয় এখনো যথেষ্ট মোটা নই, তাই গিন্নিব এত উৎসাহ আমাকে ভালো ক'বে খাওয়ানোব।" এই ভাবে গল্প কবতে কবতে তাবা বাড়ি চল্‌ল—আগে আগে টোম্, পিছন পিছন কাব্‌স্‌টা।

সবুজ পাতা দিয়ে তাদেব ছোট্ট কুঁড়েঘবটি সাজানো হয়েছে, আব তাতে আলো দেওয়া হয়েছে ছুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে, টেবিলেব উপব একটা পবিষ্কাব শাদা চাদব পাতা, সরু সরু পাইন পাতা মেজেতে ছড়ানো। আগুণেব উপব হাঁড়ি চড়ানো, এ্যান্‌লিসে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে তাতে কাঠি দিচ্ছে।

"তাই তো, মা এখনও ঠিক বয়েছেন। বুড় হাড়েব তেজ আছে!" এ্যান্‌লিসে বল্‌ল, "এখনো কিছুকাল এতেই চ'লে যাবে। যা হোক্, তোমাকে দেখে এত ভালো লাগছে।"

টোম্ টেবিলে গিয়ে বসল। তাকে শূয়োবেব মাংস খেতে দেওয়া হোলো। খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে সে খেতে লাগল। ভবা মুখে কাব্‌স্‌টাব দিকে তাকিয়ে সে বলল, "জমীদাব, ডাণ্ডবেব জমীদাব।" ঠিক তাব সামনে ব'সে কার্‌স্‌টা ভাবছিল, "একজন পুরুষ মানুষেব চেহাবা কি এত সুন্দবও হতে পাবে, আশ্চর্য্য!" টোমেব মুখ বোদে এমনি পুড়ে গিয়েছিল যে তাব গোঁফগুলো প্রায় সাদা দেখাচ্ছিল, কিন্তু কি বকম তাব কাঁধেব বহব, আব ছুটি বিশাল বাহু, আব গলা! এমন বলিষ্ঠ স্বামী পাওয়া কি আনন্দ!

টোমেব ক্ষিদে মিটেছে। হাত দিয়ে মুখ মুছে সে চেয়াবটাতে হেলান দিয়ে বল্‌ল, "তাহলে এবার মোকদ্দমাব খববটা শোনা যাক।"

কাব্‌স্‌টা খুব গম্ভীব মুখে সব খবব ব'লে যেতে লাগল। উকিল কি বকম সব বুদ্ধিমানেব মতো কথাই না বলেছেন, আব সেই বা কি কম গিয়েছে—কি কথায়, কি কাজে! সম্পত্তিটা প্রায় তাবই বলা চলে। টোম্‌ মন দিয়ে সব শুনে বল্‌ল, "একবত্তি মেয়ে—কিন্তু বাপ! কি মাথা।" কাব্‌স্‌টাকে আব পায় কে—সে গডগড় ক'বে ব'লেই চলেছে। দূবেব কোণ থেকে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ শোনা গেল। কাব্‌স্‌টাব কথা থাম্‌ল না। ঠিক কলেব পুতুলেব মতন উঠে গিয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে জামাব বোতাম খুলে তাকে খাওযাতে লাগল। কেবল তাব গলাব স্বব একটু চড়ে গেল, যাতে ঘবেব আব এক প্রান্ত থেকে শোনা যায়। হঠাৎ কথাব মাঝখানে সে থমকে দাঁডাল। আস্তে আস্তে এ্যান্‌লিসে ঘব থেকে বেবিয়ে গেল। কাব্‌স্‌টা ভাবল, "এবাব আমাব দফা শেষ।" টোম্‌ আস্তে আস্তে তাব দিকে এগিয়ে আসছিল—তাব ভাব দেখে মনে হয একটা কি যেন সে ধবাব চেষ্টা কবছে। মেয়েটাকে দোলনায় শুইয়ে কার্‌স্‌টা সেটা আগ্‌লে দাঁডালো, তাব রং ফ্যাকাশে, তাব চোখের দৃষ্টি ভযকাতব! তাব হাত দুটো এমনি কাঁপছিল যে সে দুই হাত পেটেব উপব শক্ত ক'বে চেপে ধবেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে সে ভাবছে, "অবশেষে যা হবাব তা হতে চল্‌ল।" টোম্‌ জিজ্ঞাসা কবল, "ওটা কি?" তাব গলার স্বব চাপা, যেন কেউ টুঁটি চেপে ধবেছে। "কি মনে হয়?" "এই ছোট্ট মেয়েটা কোত্থেকে এল?" "কোত্থেকে আবাব আস্‌বে?" কথাগুলো খুব জোব দিয়ে সে বল্‌ল—যেন কাবো তোয়াক্কা সে বাখে না, কিন্তু ব'লেই দুই হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, যেন একটি ছোট ছেলে দুষ্টুমি কবতে গিয়ে ধবা পড়েছে।

"ও! তুই কিনা এই বকম। আচ্ছা।" এই ব'লে টোম্‌ তাব হাত ধবে টানতে টানতে ঘবেব মাঝখানে তাকে নিয়ে গেল। "স্বামীব সঙ্গে প্রতাবণা! মজা টেব পাওয়াচ্ছি! দুজনকেই যদি খুন না কবেছি।" নির্দ্দয়ভাবে সে কাব্‌স্‌টাকে ধ'বে পিটোতে আবম্ভ কবল। কাব্‌স্‌টা চ্যাঁচাতে লাগল আব সাধ্যমত চেষ্টা কব্‌ল স্বামীব হাত থেকে ছাড়া পেতে। তাব মনে হচ্ছিল, "একেবাবে লোহাব মত হাত! বাপ্‌বে! কি জোব! আমাকে নিশ্চয় মেবেই ফেল্‌বে—কি সর্ব্বনাশ!" কিন্তু গায়ে যতই ব্যথা লাগুক, মনে সে তৃপ্তি পাচ্ছিল। হ্যাঁ—তাব যে একজন স্বামী আছে তাব হাতেব মাব খেয়ে সে আবো স্পষ্ট ক'বে তা' বুঝল।।

টোম্‌ হাঁপিয়ে পড়েছিল। স্ত্রীকে এক ধাক্কা দিয়ে সবিয়ে সে টেবিলেব ধাবে গিয়ে ব'সে পড়ল। কাব্‌স্‌টা মেজেয় গড়াচ্ছে, তাব সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। টোমেব দিকে আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখছে তাব মার শেষ

হয়েছে কিনা। সে যে অমন চুপ ক'বে ব'সে থাকবে, তাব দিকে ফিবেও চাইবে না, তাব চেয়ে ববং মাবধোব সওয়া যায়। টোম্ দুই হাতে মাথা ধ'বে ভাবছে। কাব্‌স্টা কষ্টে উঠে আগুণের ধাবে ব'সে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আপন মনে কাঁদছে আব ভাবছে—"বেচাবি! সত্যি ওব কি দুঃখ!"

মোমবাতিগুলো পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাইবে ববফ পড়ছে, জানলাব শার্সিব উপব ছোট ছোট ববফেব টুকবোব টপ্‌ টপ্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আগুণেব সামনে একটা ঝিঁঝি প্রাণপণ ডাকছে। কার্‌স্টা ভাবছিল—"ও কববে কি? আবাব বাতে আমাকে মাববে নাকি?"

টোম্ ঢক্‌ঢক্ ক'বে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেল, তাবপব মস্ত এক হাই তুলে জুতো খোলাব ব্যবস্থা কবছিল। কার্‌স্টা উঠে নিজেই তাব জুতো জোড়া খুলে দিল। তাবপব পোষাক ছেড়ে টোম্ বিছানায় ধপ্‌ ক'বে গিয়ে শুল, তাব বিপুল দেহেব চাপে খাট্‌টা এমনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে লাগল যে মনে হোলো ভেঙে পড়ে আর কি! খুসিতে কাব্‌স্টা মুখেব হাসি চাপতে পাবল না। "কি বকম ভারী শবীব!" বাতি নিবিয়ে দিয়ে আবাব গিয়ে আগুণেব ধাবে সে বসল। তাব খালি পা দুটো আগুণেব আভায় গোলাপী দেখাচ্ছিল। স্তব্ধ হয়ে উৎসুক মনে সে ব'সে—তার স্বামীব প্রত্যেকটি নিশ্বাসেব শব্দ সে কান পেতে শুনছে।

হঠাৎ বিছানাব উপব থেকে টোম্ বলে উঠল—"এই! ওখানে ব'সে কেন? শোবে না?" কার্‌স্টা অস্বাভাবিক রুক্ষ গলায় জবাব দিল—"না শুয়ে কবব কি?" কিন্তু বিছানাব কাছে যেতে না যেতে তার মন আবেগে ভবে গেল—সেও এখন অন্য স্ত্রীদেব মতন।

কিছুদিন পর্য্যন্ত এই ছোট্ট কুঁড়েঘবটিতে শান্তি ছিল না। মাঝে মাঝে টোমেব মনে পড়ে যেত তাব স্ত্রী তাব প্রতি কি অন্যায় কবেছে, আর সে একেবাবে ক্ষেপে যেত। কি মাবধোব আব চীৎকাবই না তখন হোতো। ভাঁটিখানায় সে শপথ কবল যে স্ত্রী ও তাব মেয়ে দুজনকেই সে খুন কববে। মেয়েটাকে তাব কাছ থেকে কেবলই লুকিয়ে বাখা হ'ত। কাব্‌স্টা কিন্তু বলত, সব সয়ে যাবে, পুরুষবা সবই এক বকম—তার আব নড়চড় নাই। সত্যি, যতই দিন যায় টোমেব মুখে মেয়েটাব কথা ততই কম শোনা যায়, সে কেবল বলে মোকদ্দমাব কথা। জমীটা পেলে তাবা কটা গোরু বাখবে, আর কটা শূয়োব, এই সব আলোচনাতেই তাদেব সময় কাটে—তাছাড়া আবো কত কি! ক্রমে মেয়েটা যে আছে সে কথা সে এক বকম ভুলেই গেল। কার্‌স্টাকে এখন আব লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে হয় না।

টোম্ ঠিক কবল, নিজেই সহবে গিয়ে সব ব্যবস্থা কববে। অবিশ্যি মেয়েদেব পক্ষে কার্স্টা বেশ চালাক, তবে সত্যিকাবেব বুদ্ধিতে কি আব ছেলেদেব কাছে লাগে! কাব্স্টা বল্ল, "সত্যিই তো, ছেলেদেব মতো বুদ্ধি কেমন ক'বে মেয়েবা পাবে বলো?" টোম্ সহবে গেল। তার ফিবতে বাত হোলো, বেশ একটু টেনে সে ফিবেছে। তাব স্ফূর্ত্তি দেখে কে? মোকদ্দমায় তাদেব জিৎ হয়েছে। কাব্স্টাকে ডেকে সে বল্ল, "বলি জোতদাবেব গিন্নি, একবাব এদিকে এস। দেখ কি এনেছি।" এই ব'লে সে কাব্স্টাব মাথায় একটা লাল রুমাল বেঁধে দিয়ে বল্ল, "জোতদাবেব বউকে একটু সাজগোজ না কবলে চল্বে কেন? লোকে বলবে কি?" "এটা আনাব কি দবকাব ছিল?" কিন্তু কার্স্টাব মুখে হাসি আব ধবে না।

"হ্যাঁ—আব দেখো—এই যে"—টোমেব যেন কেমন বাধ বাধ লাগছিল। ধবধবে এক বাণ্ডিল কাপড় সে টেবিলেব উপব ছুঁড়ে দিল। তাবপব কাব্স্টাব দিকে পিছন ফিবে কোনো বকমে ঢোক গিলে সে বল্ল, "এ গুলো সব ঐ ওটাব জন্যে।" "কাব জন্যে?" "ঐ মেয়েটাব জন্যে।" কাব্স্টা বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধবল। এতদিনে বুঝি তাব সত্যি কপাল ফিবেছে।

শ্রীহিবণকুমাব সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

তীর্থযাত্রী *

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হোলো আমাদেব যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খাবাপ,
রাস্তা ঘোবালো, ধাবালো বাতাসেব চোট,
একেবাবে দুর্জ্জয় শীত।
উটগুলোব ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ চড়া,
তাবা শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা ববফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগ্‌ড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলীতে বসন্তমঞ্জিল, তাব চাতাল,
আব সব্‌বতেব পেয়ালা হাতে বেশমীসাজে যুবতীব দল।
এদিকে উট-ওয়ালাবা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ কবে বাগে,
ছুটে পালায় মদ আব মেযেব খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা বাখবাব জায়গা জোটেনা।
নগবে যাই, সেখানে বৈবিতা, নগবীতে সন্দেহ,
গ্রামগুলো নোংবা, তাবা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুস্কিলে পড়া গেলো।
শেষকালে ঠাওরালেম চলব সাবাবাত,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে,
আব কানে কানে কেউ গান গেয়ে যাবে—
এ সমস্তই পাগলামি॥

ভোবেব দিকে এলেম, যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে,
সেখানে ববফসীমাব নীচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালিব গন্ধ।
নদী চলেচে ছুটে, জলযন্ত্রেব চাকা আঁধাবকে মাবচে চাপড়।
দিগন্তেব গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েচে।
পৌঁছলেম সরাবখানায়, তার কপাটেব মাথায় আঙুবলতা।
দু'জন মানুষ খোলা দবোজাব কাছে পাশা খেল্‌চে টাকাব লোভে,
পা দিয়ে ঠেল্‌চে শূন্য মদেব কুপো।
কোনো খববই মিল্‌লনা সেখানে,
তাই চল্‌লেম আবো আগে।
যেতে যেতে সন্ধ্যে হোলো ;

---

* T S Eliot-এর The Journey of the Magi-নামক কবিতার অনুবাদ

সময পেবিয়ে যায যায, তখন খুঁজে পেলেম জাযগাটা ;
বলতেও পাবো, ব্যাপাবটা তৃপ্তি পাবাব মতো বটে।

মনে পড়ে, এসব ঘটেচে অনেক কাল আগে,
আবাব ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে বাখো,
এই লিখে বাখো, এত দূবে যে আমাদেব টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মেব সন্ধানে না মৃত্যুব।
জন্ম একটা হয়েছিল নিশ্চিত,
প্রমাণ পেয়েচি, সন্দেহ নেই।
এব আগে তো জন্মও দেখেচি, মৃত্যুও,
মনে ভাবতেম তাবা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোব,
দারুণ এব যাতনা, মৃত্যুব মতো, আমাদেব মৃত্যুব মতোই।
এলেম আমবা ফিবে, আপন আপন দেশে. এই আমাদেব
রাজত্বগুলোয়।
কিন্তু আব স্বস্তি নেই সেই পুবানো বিধানেব মধ্যে,
যেখানে আছে সব অনাত্মীয তাদেব দেবদেবী আঁকড়ে ধবে।
আব-একবাব মবতে পাবলে আমি বাঁচি।

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব

রূপবাণী

প্রাঙ্গণে নামল অকাল সন্ধ্যাব ছায়া,
সূর্য্যগ্রহণেব কালিমাব মতো।
উঠল ধ্বনি ঃ—খোলো দ্বাব।
প্রাণপুরুষ ছিল ঘবেব মধ্যে,
সে কেঁপে উঠ্‌ল চমক খেযে।
দরজা ধবল চেপে,
আগলেব উপব আগল লাগলো।
কম্পিতকণ্ঠে বল্‌লে, কে তুমি।
মেঘমন্দ্র-ধ্বনি এলো, আমি মাটি-বাজত্বেব দূত,
সময় হয়েচে, এসেচি মাটিব দেনা আদায় কবতে।

ঝন্‌ঝন্‌ বেজে উঠ্‌লো দ্বারের শিকল,
থরথর প্রাচীর কাঁপতে লাগল।
ঘরের হাওয়া উঠ্‌ল হায় হায় করে।
নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।
ধক্‌ধক্‌ ধক্‌ধক্‌ আঘাত বাজলো দ্বারের উপর,
খান্‌খান্‌ হোলো আগলগুলো, কপাট পড়লো ভেঙে।

কম্পমান কণ্ঠে প্রাণ বল্‌লে, হে মাটি, হে নিষ্ঠুর, কী চাও তুমি?
দূত বল্‌লে, আমি চাই দেহ।
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে প্রাণ, বল্‌লে,
এতকাল আমার লীলা এই দেহে,
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য,
নাড়ীতে নাড়ীতে ঝঙ্কার,
মুহূর্ত্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে,
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,
ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে।
দূত বল্‌লে, ঋণে বোঝাই তোমার এই দেহ,
শোধ করবার দিন এলো।
মাটির ভাণ্ডারে ফিরবে তোমার দেহের মাটি।
প্রাণ বল্‌লে, মাটির ঋণ শোধ করে নিতে চাও, নাও।
কিন্তু তার চেয়ে বেশি চাও কেন?
দূত বিদ্রূপ করে বল্‌লে, এই তো তোমার নিঃস্ব দেহ,
কৃশ ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর চাঁদ,
এর মধ্যে বেশি আছে কোথায়।
প্রাণ বল্‌লে, মাটিই তোমার, রূপ তো তোমার নয়।
অট্টহাস্যে হেসে উঠ্‌ল দূত, বল্‌লে, যদি পাবো, দেহ থেকে
রূপ নাও ছাড়িয়ে।
প্রাণ বল্‌লে, পারবই, এই পণ আমার।

প্রাণের মিতা মন। সে গেল আলোকউৎসের তীর্থে।
বল্‌লে জোড়হাত করে—
হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়োনা তোমার সত্যের অপলাপ,
তোমার সৃষ্টির অপমান।
সে তোমার রূপকে লুপ্ত করে কোন্ অধিকারে,
আমাকে কাঁদিয়ে দিয়ে যায় কার অভিশাপে।
মন বস্‌ল তপস্যায়।
কেটে গেল হাজার বছর, লক্ষ বছর, প্রাণের কান্না থামেনা।
পথে পথে বাটপাড়ি চলে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ যায় চুরি।
সমস্ত জীবলোক থেকে প্রার্থনা ওঠে দিনরাত—
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
যা দান করেচ নিজহাতে, জড় দানব তাকে কেড়ে নিয়ে যায় যে।
ফিরিয়ে আনো তোমার আপন ধন।

•

যুগের পর যুগ গেলো—নেমে এলো আকাশবাণী ঃ—
মাটির জিনিষ ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের ধন রূপ ফিরে আসে আমার ধ্যানে।
বর দিলেম, হারা রূপ ধরা দেবে,
কারামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।

রূপ এলো ফিরে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এলো চারিদিক থেকে রূপের প্রেমিক।

আবার দিন যায়, বৎসর যায়। প্রাণের কান্না থামেনা।
আরো কী চাই।
প্রাণ জোড়হাত করে বলে—
মাটির দূত আসে, নির্ম্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়, বলে, কণ্ঠনালী আমার।
শুনে আমি বলি, মাটির বাঁশিখানি তোমার বটে,
কিন্তু বাণী তো তোমার নয়।

উপেক্ষা করে সে হাসে।
শোনো আমার ক্রন্দন, হে বিশ্ববাণী,
জয়ী হবে কি জড়মাটির অহঙ্কার—
সেই অন্ধ সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব,
যে-বাণী অমৃতের বাহন, তার বুকের উপর স্থাপন করবে জড়ের জয়স্তম্ভ।

শোনা গেলো আকাশ থেকে—
ভয় নেই।
বায়ু-সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।
আশীর্ব্বাদ এই আমার—সার্থক হবে মনের সাধনা।
জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী।

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ্ করে চলেছিলো
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে,
জয়ধ্বনি উঠলো মর্ত্ত্যলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হোলো দেহমুক্ত বাণীর,
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সনেট

দৈন্যমাঝে দুঃখমাঝে সংকীর্ণতামাঝে
অন্তর-অতলে কে গো ক্রন্দে মুক্তি তরে?
বন্ধনকারায় আত্মা লুঠে শ্রান্তিভরে,
মুমূর্ষু স্বপন তার ক্ষুব্ধাকাশে বাজে।
কোথা স্বাধীনতা, কোথা সম্পূর্ণতা রাজে?
জিজ্ঞাসে মানব ক্লান্ত আগ্রহের স্বরে
কোনোদিন শ্রমকৃচ্ছ্র সাধনার পরে
পূর্ণতা আসিবে ফুল্ল সার্থকতা সাজে?

সেদিন মানব সত্য লভিবে কি শান্তি ?
অনির্ব্বাণ মহানন্দে হবে জ্যোতিষ্মান ?
হয়ত সেদিন এক নবতব ক্লান্তি
নামি ভাবাক্রান্ত তাব কবিবে পবাণ !
পূর্ণতা সেদিন তাব মনে হবে ভ্রান্তি,
মাগিবে নিযতি হস্তে অপূর্ণতা দান ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন।

জ্যোৎস্নায

আজ চোখে ঘুম নাই। আকাশেবো ঘুম নাই যেন।
নবম ঘুমেব মত জ্যোৎস্না জেগে বয।
ভেবে ছাখো একবাব—এমনি মদিব জ্যোৎস্নাবাতে
মালিনীব স্তব্ধ জল কেঁপেছিল রূপালী বাতাসে,
উটজে ফেবেনি শকুন্তলা,
চেযে আছে, কোন্ পথে এসেছিল দুষ্মন্তেব বথ।
সমুদ্র-সৈকতে এসে এমনি জ্যোৎস্নায
দাঁড়াযে কেঁদেছে ডিডো, কার্থেজেব স্বপ্ন চোখে তাব।
সেদিনো এমনি ছিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাবাত—
ট্রযেব পাষাণপুবী পবিশ্রান্ত পশুব মতন
ঘুমাযে পড়েছে; শুধু জেগে আছে হেলেনেব চোখ—
জেগে আছে—দ্রুতগতি সমুদ্রেব পাখীব পালকে,
জেগে আছে—দূবান্তেব অর্দ্ধস্ফুট ঢেউয়েব সঙ্গীতে!

ঘুম ? আজ না-ই হোল ঘুম! থাক' জেগে।
এই বাতে ঘুমাযনি ইস্তুফ জুলেখা।
নেমে এসো অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নাব বর্ষণে।
নগ্ন আকাশেব তলে অসহ্য নূতন
প্রথম প্রেমেব মত স্পর্শ জাগে নিঝুম জ্যোৎস্নায।
আজ আর না-ই হোল ঘুম!

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

নব আবাহন

সৃষ্টির আকাশে সাজে
ভীষণ দুর্য্যোগময়ী বিস্রস্ত-ভূষণা অমানিশা।
নাহি গ্রহ নাহি তারা,
ক্ষণে ক্ষণে জাগিতেছে
মেঘপুঞ্জে বিদ্যুন্ময়ী করালীর ভয়াল ভ্রূকুটি,
তাণ্ডব-অশনি-মন্দ্রে ঘোর অট্টহাসি !
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া নৃত্যক্লান্ত ঝঞ্ঝার নিঃশ্বাসে
অসহায়া ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলে লাগে দোলা,
অরণ্যের ক্রমে ক্রমে উৎপাটন-উৎসব-মর্ম্মরে
বাজে যেন উচ্ছৃঙ্খল দামামা দুন্দুভি !

গৃহহারা পথহারা লক্ষ্যহারা মানবের মর্ম্মে জাগে
দুর্বিষহ অরুন্তুদ একী আর্ত্তনাদ !
একী আন্দোলিত করুণ প্রার্থনা !

"ওগো প্রভু,
রুদ্ধশ্বাস ভীত বক্ষে বেদনার বহ্নিজ্বালা
সহে না—সহে না
নয়নের ক্ষীণ দীপ্তি নাহি হেরে সম্মুখের পথরেখা আর !
দাও, দাও, কোথা প্রভু, খুলে দাও আলোক-নির্ঝর,
প্রাচীর ললাট-দেশে মুক্ত কর স্বর্ণপ্রভ প্রভাতের দ্বার,
মুছে নাও ধরা পৃষ্ঠে মৃত্যুর কালিমা,
মুছে নাও নির্ম্মম নিষ্ঠুর ঘোর রাক্ষসী-আক্রোশ !
দাও প্রভু মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের পরম আস্বাদ,
সুষমা-সুরভি বায়ে পূর্ণ কর দিক,
দীপ্ত কর জীবনের অপ্সরা-সঙ্গীত !"

হে মহিমময়,
আর কত কাল রবে অপাবৃত রহস্যের মোহিনী মায়ায়,
যোগনিদ্রাতুর ?
অসুন্দর-অন্তরালে মহিমা তোমার
কত কাল রবে আর অস্ফুট কোরক ?
মানবের চেতনায় ভাস্কর দীপ্তিমা তব
কত কাল রবে আর কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা ?

আব নহে
জীবনেব সিন্ধুতীবে ফেনশীর্ষ অজ্ঞানেব তবঙ্গ-কল্লোল।
ক্ষণপ্রভা ক্ষণিকাব ধাঁধা,
শ্রান্তিব ক্লান্তিব ক্লেদ-জর্জ্জবিত মুহ্যমান্ প্রাণে
সুন্দবেব দারুণ লাঞ্ছনা,
নাহি নাহি প্রেম প্রীতি
দুর্দ্দম দুবন্ত ক্ষিপ্ত অবণ্য পশুব
নগ্নতাব কাম-পঙ্কে কামনা বিলাসে,
শোণিত-পিপাসা-মত্ত উৎকট উল্লাসে,
সৌন্দর্য্যেব শুভ্রতাব ক্রুব নিষ্পেষণে।
ক্ষুদ্রতা-সঙ্কোচ-ভয়-অহমিকা-অসবল-অন্ধ কাবাগাবে
মোহেব তিক্ততাবাহী উদগ্র সুবায়
প্রেম-দেবতাব, হায়, হয না আবতি!
পঙ্কিল-পিচ্ছিল-বক্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল পথে
সুন্দবের অভিসার হয় না কখন!

হে দেবতা,
যুগে যুগে তব পূজা হ'ল যত বিশ্বেব দেউলে
লক্ষ কোটি তীর্থ-যাত্রী হৃদয় নিঙাড়ি
প্রীতি-ভক্তি-অর্ঘ্য-ডালা স্থাপিযাছে তব বেদী 'পবে,
নযনেব তপ্তজলে ধুইয়াছে চবণ তোমাব,
তবু তুমি দাও নাই বিশ্বমাঝে ধবা,
সখারূপে বন্ধুরূপে সর্ব্ব মানবেবে
লহ নাই বক্ষে তব টানি।
তাই দিল তাবা প্রতিশোধ,—
কহিল তোমাবে ডাকি
"তব সৃষ্টি মিথ্যা-মায়া-দুঃখ-শোক-জ্ববা-ব্যাধিময়
নাহি সত্য নাহি শিব সুন্দবেব প্রতিষ্ঠা হেথায়,
ফলে ফুলে ভবা এই বিশাল পৃথিবী—
একখানি দুঃস্বপ্ন বিবাট
ভ্রান্তিময় মরু-মবীচিক!"
দিল তাবা প্রতিশোধ তোমাব সৃষ্টিবে
জীবনেব মাঝে তব সিংহাসন 'পবে
নিক্ষেপিল ধূলারাশি প্রস্তব কঙ্কব।

কিন্তু আব নহে—আর নহে,
নূতন সৃষ্টিব প্রাতে সে খেলার হোক্ অবসান।
সুধাসিন্ধু ওগো,
আত্মাব গগনাঙ্গনে নিঃশব্দ নির্জ্জন দেশে,
ছিন্ন কব এইবাব বিদেহীব বেশ।
বিশ্বমানবেব দ্বাবে
তোমাব প্রেমেব হোক্ পবীক্ষা কঠোব।

হে সুন্দর
চাহি আজ অগণিত মানবেব হৃদয়-কমলে
জাগ্রত প্রতিষ্ঠা তব,
তোমা সাথে চোখে চোখে মুখোমুখী অন্তহীন অন্তবঙ্গ কথাব ভাষায়
দর্শন-স্পর্শন-সুখ-সম্ভোগ আস্বাদ,
অফুবন্ত জ্যোতিঃ-শক্তি-আনন্দেব ত্রিবেণী-সঙ্গমে
পবিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন !

ওগো প্রেমময,
সেই প্রেম নির্ম্মুক্তির স্থিব নীলিমায
লক্ষ বাহু প্রসাবিয়া ঊর্দ্ধলোকে ধায,
বিশ্বেব হৃদয় কূলে বহি' আনে অমৃত প্লাবন,
দেবতাবা মর্ত্ত্যনবে দান কবে স্বর্গেব আসন,
যেই প্রেমে মহাব্যোমে আবর্ত্তিত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তাবা আদি
বক্ষা কবি' পবস্পব প্রলয় সংঘাত
ভুবনে ভুবনে বর্ষে দিবা-নিশা-কুসুম-সম্ভাব,
বিশ্বজযী মৃত্যুজেতা সেই প্রেম খুলে দাও বিশ্বেব মানবে।

ওগো ভগবান,
আজি চাহি তোমাব মিলন
অন্তব-লক্ষ্মীব-সাথে অঙ্গে অঙ্গে চাহি তব প্রেম আলিঙ্গন
মব দেহে মব প্রাণে,
ধমনীব বক্তদোলে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
প্রতি কর্ম্মে প্রতি পদে জীবনেব বহুধা বিকাশে,
রূপে বসে গন্ধে গানে,

আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভাষে রোমাঞ্চ-পুলকে,
বক্ষের যৌবন-মত্ত মদির উল্লাসে
চাহি তব শরীরী পরশ,
চাহি তব পূর্ণ প্রকটন !

হে অসীম,
দাও ধরা সসীমার ব্যগ্র বাহুপাশে
কম্পিত অধরে তার আঁকি দাও অমর চুম্বন
কণ্ঠে দাও মিলনের বৈজয়ন্তী পারিজাত-মালা !

ওগো জ্যোতির্ম্ময়,
যেই অন্ধ গুহা মাঝে পশে নাই আদিম আলোক,
গলিত শবের গন্ধে আকুল পিশাচ আর যত শিবাদল
ভ্রমে মহাসুখে,
অচলায়তনরূপী সে পাতালপুরে
সত্যের ভাস্কর দীপ্তি হোক্ অভ্যুদিত !

হে পরম,
কত কবি কত ঋষি কত বেদ বেদান্ত পুরাণে
নিরূপি' স্বরূপ তব গাহিল বন্দনা,
শিল্পীর প্রতিভাদীপ্ত লক্ষ তুলিকায়,
ভাস্কর্য্যের চারু প্রতিমায়,
স্থানুশৃঙ্গে গুহাবক্ষে প্রস্তরে পর্ব্বতে,
যত রূপে তব পূজা হ'ল সমাপন,
আজি এসো সর্ব্বরূপে সর্ব্বভূতে সকল সঙ্গীতে
নব সৃষ্টি লাগি'।
মানুষেরে দেবজন্ম-দ্বিজত্ব প্রদানি'
সত্য কর অস্তিত্ব তোমার !

একী অশরীরী দৈববাণী আজি শুনিনু চকিতে,
"আসিতেছি—আসিতেছি
তপোমগ্না আমাবস্যা-রজনীর তপস্যার শেষে।
আসিতেছি সাফল্যের স্বর্ণচ্ছটা-বিচ্ছুরিত
ঊষার উন্মেষে।"

দামিনী আবর্ত্তি দীপে আকাশের গায়
কী অপূর্ব্ব এ আখর !
"মৃত্যু কভু সত্য নহে,
ঝঞ্ঝা নহে জীবনের চরম প্রকাশ !
শান্তি—শান্তি—শান্তি !"

শ্রীবিহারীলাল বড়ুয়া

রবীন্দ্রনাথের প্রতি *

'না' বলিয়া হাসিয়া উড়াতে
পারি না যে 'হাঁ' তোমার ! হয়ত বা লুকানো তাহাতে
হেন ঋদ্ধি, যার তুলনায়
আমাদের জ্ঞানগর্ব্ব মরে লাজে তুচ্ছ নিঃস্বতায়।
বিস্ময়ে পরাণ ভরি উঠে
হেরি যবে তোমা সম অভিজ্ঞের সহজ আনন্দ নাহি টুটে,
তবু জানি, অন্ধ তুমি নহ,
দেখিছ সকলি অহরহ।
সত্য করি কহ মোরে, সুদক্ষিণ নিরিখে তোমার
নিদাঘের দীর্ঘ দিবা, গহন নিশীথ অন্ধকার
কর কি নির্ণয় ?
আত্ম-ভোলা যে করুণা তোমার আননে উথলয়,
কুশাগ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিল্পীর নিখুঁৎ নিপুণতা,
যাহা কিছু রিক্ত হিয়া উল্লসিয়া সবা 'পরে জাগায় মমতা,
—এরা কি লিখিল চারুচিহ্ন তব করতল পরে ?
আঁকিল কি আলিপনা পাখ্‌না-পরাগে
ভীতি-কম্প্র প্রজাপতি তোমার অঙ্গুলি পুরোভাগে
প্রায় মুঠিগত যবে ঝলমল চিত্রপক্ষ তার ?
চেষ্টা তব পূর্ণ হ'লে বুঝি তার ছিল না নিস্তার !

---

* Sturge Moore-এর To Rabindranath Tagore-নামক কবিতার অনুবাদ।

আত্মার গরিমা
বিজ্ঞজননিরূপিত মহিমার সীমা
উল্লঙ্ঘন করিয়া কি উড়িয়া পলায়,
মুক্তপক্ষে অপ্সরীর-প্রায় ?
মহীয়সী প্রচেষ্টার বলে
তারে ধরিবারে গিয়া মোরা শুধু লভি কি করলে
দুচারিটি সুনীল পালক ?
—আত্মাপলাতক।

সত্য কি অক্ষম মোরা অতি
রূঢ় স্পর্শে অণুমাত্র করিবারে তার কোনো ক্ষতি ?
—রূপমুগ্ধ শিশু যথা পতঙ্গেরে অপটু মুঠিতে
আঁটি আঁটি পারে না আঁটিতে,
বিস্ময় পুলক বিমোহিত,
স্পর্শিবারে দ্বিধান্বিত চিত্‌ !
সে পতঙ্গ শোনে যদি প্রেমাকুল আবাহন তার,
সাহসিকা উপযাচিকার
দুর্ব্বার আবেগ ভরে লুটায়ে কি পড়িবে অধরে,
হারা-সুখ ফিরিবে কি ঘরে,
উৎসুক ভাবনা মাঝে মরমের ব্যগ্র প্রতীক্ষায়
লভিতে কুলায় ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

পুস্তক-পরিচয়

মৌরীফুল—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
"এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে"—শ্রীবুদ্ধদেব বসু
(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)।
মৃত্তিকা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (নাথ ব্রাদার্স, ২৩সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট)।

বিভূতিবাবুর উপন্যাস "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" প্রকাশিত হওয়ায় তার প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনায় ও জয়নির্ঘোষে বাঙ্গলা সাহিত্যাকাশ যে রকম মুখরিত হয়ে উঠেছিল তাতে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম যে, বিভূতিবাবুর গল্পের দাবীও কম নয়। বোধ হয় সেই শ্রেণীর বাঙ্গলা সাহিত্যামোদীর সংখ্যা অল্পই হবে যাঁরা বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর উমারাণীর গল্প পড়ে মনে মনে তাঁকে বিজয়মুকুট পরিয়ে দেন নি। অথচ এই উমারাণী সম্বলিত প্রথম গল্পের বই "মেঘমল্লার" যখন প্রকাশিত হল তখন পাঠকের দৃষ্টি তেমনভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হল বলে। মনে হয় নি। এখন বিভূতিবাবুর উপন্যাস সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক স্তিমিত হয়েছে, এই অবসরে তাঁর দ্বিতীয় গল্পের বই "মৌরীফুল" প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর গল্পের পরিচয় নেওয়ার সহজ অবকাশ উপস্থিত হবার কথা।

মৌরীফুলের উপাদান সংগ্রহ হয়েছে পল্লীগ্রাম ও আমাদের জীবনের সামান্য অনাড়ম্বর ঘটনা-সমাবেশ ক্ষেত্র থেকে। অথচ অনাড়ম্বর ঘটনা সন্ধানের চেষ্টায় মাঝে মাঝে একটু বেশী করেই আড়ম্বর এসে পড়েছে—মেঘমল্লারেও এটুকু বাদ যায় নি। যা হোক্ মৌরীফুলের পল্লীগ্রাম বিভূতিবাবুর হাতের গড়ন পেয়েছে। একদিকে গ্রাম্যতা, অজ্ঞতা, নির্ম্মমতা প্রভৃতির সঙ্গে সরলতা, আতিথ্য, সৌহার্দ্দ্য, প্রীতির অপরূপ সমন্বয়, আর একদিকে উদার গ্রাম্য প্রকৃতির অকুণ্ঠিত সুসার ও অসার দান,—গ্রামের এই রমণীয় পরিচয় বিভূতিবাবুর গল্পে বিফল হয় নি। নদীর ধারের মৌরীর ভরা ক্ষেত থেকে পরিব্যাপ্ত মৌরীফুলের সুতার গল্প আর প্রবাসে মাঠের মাঝখানে ব্রাঞ্চ লাইনের ষ্টেশনের ধারে ষ্টেশনবাবুদের নিরানন্দ বিরল জীবনযাত্রা—এ দুটি চিত্র যে কোন পাঠকের মন মুগ্ধ করবে। প্রথম গল্প মৌরীফুলের নাম থেকেই বইটির নামকরণ। এই গল্পটিতে চরিত্র-গত দ্বন্দ্ব উজ্জ্বল হয়েছে। দরিদ্রের সংসারে গৃহস্থের নির্ম্মমতায় গ্রাম্যবধূ সুশীলার সুকুমার মনোবৃত্তি অন্তর্হিত হয়েছিল, স্বামী-কিশোরীর বিবাহিত জীবনের প্রথম উত্তপ্ত অনুরাগ অকালেই গ্রামের তাস পাশা ও যাত্রার আড্ডায় সমাধিস্থ হওয়াই তার প্রধান কারণ। শ্বশুর শাশুড়ীর হাতে নির্য্যাতনের অন্ত ছিল না, স্নেহের কাঙাল সুশীলা এই নির্য্যাতনের ফলে নিজেও হয়েছিল মুখরা, কাণ্ডজ্ঞানহীন। এ সত্ত্বেও সুশীলা তার স্বামীর হারানো প্রণয় পুনর্জ্জীবিত করবার জন্য চেষ্টা করতে ছাড়ে নি, কিন্তু যে আদর সোহাগ একদিন আপনা থেকেই নিঃসৃত হয়েছিল আজ তার কাঙাল হতে গিয়ে লাঞ্ছনাই সার হল। বিক্ষুব্ধ ভীত সুশীলা অতঃপর লোভে পড়ে যা করে বসল তার পরিণাম হল অনুচিত অখ্যাতি ও অকালমৃত্যু। এই করুণা-বঞ্চিত, অত্যাচারিত, অন্তর্বেদনাপূর্ণ গ্রাম্য বধূটির জন্য সকল পাঠকেরই হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই,—অথচ বিশেষ করে কাউকে দোষ দিতেও মন সায় দেবে না। শ্বশুর

শাশুড়ীব সামান্য বিবেচনাব অভাব, নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবকেব স্ত্রীব প্রতি নির্ম্মম অমনোযোগিতা ও সমস্ত সমাজেব একটা কর্ম্মনাশা নিস্পন্দতা আজও আমাদেব জীবনেব সামনে যে কুয়াসাব অন্তবাল সৃজন কবে বেখেছে,—দোষ তাবই।

অন্য গল্পগুলিব মধ্যে "বোমান্স"টিও অনেককে মুগ্ধ কববে। দুই বোনেব বালিকা-মনেব ঈষৎ প্রেমেব ইসাবা ও তাবতম্য এই গল্পটিকে বঙীন ও সুষমা-মাণ্ডত কবেছে। 'বাক্ষসগণ'-এ সেবাপবাযণ বেণুব নিঃস্বার্থ বমণীসুলভ অন্তবঙ্গতাব চিত্র পাঠককে অন্যমনা কববে। দুঃখেব বিষয় এ তিনটি ছাডা বইটিব বাকি সাতটি গল্পেব মধ্যে আব কোনটি উল্লেখযোগ্য নয়। 'জলসত্র', 'খুঁটিদেবতা', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'গ্রহেব-ফেব' প্রভৃতি হয অতি-কল্পিত, নয গল্পেব উপযুক্ত উপাদানেব অভাবে নিবর্থক পণ্ডশ্রমে পবিণত হযেছে। এতে বইটি বড অসম প্রকৃতিব হয়েছে।

"গ্রহেব ফেব" সম্বন্ধে আমাব কিছু বক্তব্য আছে। এব নাযক অধ্যাপক বাজচন্দ্রবাবুব গাণিতিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা কববাব আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে কবা হযেছে এক ধূমকেতুব ভবিষ্যদ্বাণীকাব। লেভেবিয়ে ও অ্যাড্যামস্ কর্ত্তৃক নেপচুন গ্রহেব ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়ে নিউটনেব মাধ্যাকর্ষণ থিওবীব জয়জযকাব হযেছিল বটে, কিন্তু ধূমকেতুব সংখ্যা অতি নির্দ্দিষ্ট ও তাদেব আবিষ্কাবকদের নাম জগদ্বিখ্যাত, তাব মধ্যে একটি বাঙ্গালীবও নাম পাওযা যায় না। এ হেন গল্পেব অবতাবণা করে লেখক রাজচন্দ্রবাবুকে 'বিবিঞ্চি বাবা'ব সমকক্ষ কবে তুলেছেন। যা অতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে খণ্ডন কবে বা যা সর্ব্বজনবিদিত নজিবকে নাকচ কবে তা নিয়ে গম্ভীব গল্প উপন্যাস বচনা সম্বন্ধে আমাব আপত্তি নিবেদন কবি।

১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে কোন বাঙ্গালী এভবেষ্ট গিবিশৃঙ্গে উঠেছিল বা ব্র্যাড্ম্যানেব বেকর্ড স্কোবিংকে পবাভূত কবেছিল—এ নিয়ে কি গম্ভীবভাবে গল্পবচনা চলতে পাবে? বলা বাহুল্য অন্য হিসেবে গল্পটি অসাধাবণ হযেছে। বাজচন্দ্রবাবুব তন্ময়তা ও মস্তিষ্ক-বৈকল্য মনকে যেমন মুগ্ধ কবে, তেমনি ধূমকেতুটিব আবিষ্কাবেব উদ্যোগ ও সাফল্যও মনকে নিগূঢ়ভাবে অভিভূত কবে।

আব এক কথা বলাও প্রযোজন মনে কবি। মৌবীফুল গল্পে সুশীলাব অপমৃত্যু অত্যন্ত অস্বাভাবিক হযেছে—একেবাবে দায়ে পড়ে খুন কবা। 'বাক্ষসগণ' গল্পে বেণুব অকাল-বৈধব্য-ফল থেকে নিজে অব্যাহতি পাওযাব জন্য নাযকেব উল্লাস—সার্থক নয, রূঢ হয়েছে। যদি গ্রন্থকাব নাযককে এই উল্লাসেব উপযোগী কবে গড়তেন,—ইতব বা হৃদযহীন কবতেন, সে আলাদা কথা, পক্ষান্তবে তিনি কবেছেন তাকে বেণুব অন্তবঙ্গতায় মুগ্ধ। বিভূতিবাবুব মত পাকা লেখকেব কাছ থেকে এসব কাঁচা হাতেব কাজ একটু বিসদৃশ লাগে।

বিভূতিবাবুব বিভিন্ন গল্পগুলিব কথা ছেড়ে দিযে এখন বোধ হয তাদেব সম্বন্ধে মোটামুটি হিসাব নিষ্পত্তি কবা যেতে পাবে। আমাব মনে হযেছে বিভূতিবাবুব পল্লীজীবন বা আমাদেব অবাস্তব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবনাবলীব চিত্র খুব নিখুঁৎ, বমণীয় কিন্তু অনতিগভীব,—surface deep। যদি শবৎবাবুব লেখাব সঙ্গে তুলনা ক্ষমার্হ হয় তবে বলা চলে যেখানে বিভূতিবাবু নম্র সুষমাময় ও অনতিগভীব সেখানে শবৎবাবু কত সতেজ কত জীবন্ত কত বিশিষ্ট কত গভীব হতেও গভীবতব!

নানা কাবণে বুদ্ধদেববাবুব নূতন উপন্যাস "এবা আব ওবা এবং আবও অনেকে" সন্দিগ্ধচিত্তে গৃহীত হবে। এতে অবিবাহিত বাঙ্গালী যুবক যুবতীদেব যে অবাধ

মেলামেশা ও প্রেমালাপেব ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে পাঠককে হতভম্ব হতে হবে। বোধ হয় মানুষেব স্বভাবেব এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে সমাজেব শাসন অগ্রাহ্য কবে কোন শিথিল ব্যবহাব বহুদিন ধবে আয়ত্ত না কবলে তাব সম্বন্ধে অসঙ্কোচে স্বীকার্য্য আলোচনা কবতে দ্বিধা বোধ হয় কিন্তু 'এবা আব ওবা'ব পাত্র-পাত্রীবা যে বকম অসঙ্কোচে শিথিল প্রেম ও দৈহিক কামতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় পবীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে বাঙ্গলাব মার্জ্জিত সেট্‌কে স্বাধীন প্রেম সাধনায় বহুযুগ সিদ্ধ বলতে হয়। গল্পে উদ্দাম কল্পনাশক্তিকে কতখানি মুক্তি দেওয়া সম্ভব বা তাতে সমাজেব অলঙ্ঘনীয় গণ্ডীকে কতখানি স্বীকাব কবে নিতে হয় তা সাহিত্যেব বৈয়াকবণিকবা বিচাব কববেন। আমাব কিন্তু আশা হয় যে অনেকেই আমাব সঙ্গে একমত হবেন যে এবা আব ওবাব যুবক যুবতীদেব অসংযমে পাঠকেব মন সায় দেবে না। আধুনিক মার্জ্জিত সেট্‌বা যদি কালচাব কৌলিন্যে পাকা হয়ে সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবাব চেষ্টা কবেন তবে সমাজ এই সেট্‌কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্কৃতি দেবে না। অতএব যেখানেই সমাজেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব ছবি আঁকা হবে সেখানেই সমাজেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিশোধেব ছবি দেখাতে হবে,—ইঙ্গিতেই হোক বা স্পষ্ট কবেই হোক। এটা গল্প বা উপন্যাস লেখকেব অবশ্যকর্ত্তব্য! পক্ষান্তবে সমাজেব পটভূমিকাকে একেবাবে বিলোপ কবে সখেব পাত্র-পাত্রীদেব অবতাবণা হতে পারে না, যদি না তা ব্যাপক হয়।

এটুকু বাদানুবাদ ত্যাগ কবলে "এবা আব ওবা" সম্বন্ধে অনেক গণ্ডগোল মিটে যায়। যদি মেনে নেওয়া যায় যে বাঙ্গলা সমাজেব মার্জ্জিত সেট্-এব পক্ষে সব বকম পবিপক্কতাই স্বাভাবিক তা হলে "এবা আব ওবা"ব শর্ব্ববী, অতনু, সাবিত্রী, অমিতা ও লুসী, ললিতাদেব ববণ করতে বাধবে না—অন্ততঃ তাদেব স্পর্দ্ধা, আত্মম্ভবিতা ও তথাকথিত মার্জ্জিত রুচিব চাকচিক্যেব জন্য।

বইটিব একটি প্রশংসনীয় জিনিষ তাব অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গেব উপকবণ। এটাও মানতে হবে যে, যে আধুনিক বীতিতে ইউবোপীয় সাহিত্যে ঘটনা সন্নিবেশেব বদলে চিত্তেব আবর্ত্তময় গতিকে অধিকতব প্রকট কবা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় সে বীতিব পবিকল্পনায় বুদ্ধদেববাবু অগ্রণী ও ওস্তাদ। তা হলেও সাহিত্যেব রূপ ও বসসৃষ্টিতে বুদ্ধদেববাবুব মনে শৈথিল্য এসেছে মনে হয়।

উপবোক্ত দুইখানি বই শেষ কবে কেউ যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রেব নূতন গল্পেব বই "মৃত্তিকা" পড়েন ত নিশ্চয় স্বস্তিব নিশ্বাস ছাড়বেন। গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রেই জানেন যে প্রেমেন্দ্রবাবু গল্পলেখায় ধ্রুব প্রেবণা লাভ কবেছেন; "মৃত্তিকা" পড়ে সে ধাবণা একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। তাঁব ভাষায় যেমন বাইবেব চাকচিক্য নেই, তেমনি গল্পেব সঙ্গেও তাব বিবোধ নেই। ভাষাব ও গল্পেব এই নিবিড় সংযোগ বিশেষ ক্ষমতাব পবিচায়ক। বহুল পবিমাণ সংযম ও বস না থাকলে এটা ঘটে ওঠা সম্ভব হয় না। তাঁব চবিত্রগুলিও বৈচিত্র্যময়;—যে সব চবিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে উপেক্ষিত ও অজানা ছিল তাদেব তিনি খুঁজে বাব কবে সমুজ্জ্বল, সার্থক ও আমাদেব আত্মীয় কবে গড়েছেন। গল্পগুলিব মধ্যে বোধ হয় 'মৃত্তিকা'ই ববমাল্য পাবে;—এতে ধীবে ধীবে পাঠকেব মনকে নিয়ে গিয়ে হৃদয়-বহস্যেব এক নিবিড় কন্দবে হাজিব কবে। 'সুরু ও শেষেব" তুল্য অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আধুনিক বাঙ্গলা গল্পে অতি অল্পই চোখে পড়ে। "শবযাত্রা"য় শবযাত্রীদেব বিভিন্ন মনোভাব মানবমনেব দু'একটি গুপ্ত দ্বাবোদ্ঘাটন

করেছে। "প্রতিবেশিনী"র ম্যাট্রিক পাশ বিমলার স্নেহার্দ্র উদ্দাম হৃদয় দরদী মনে অহৈতুকী করুণার প্রতিধ্বনি জাগাবে। সমাজ এই বালিকার আচরণ বুঝবে না কিন্তু প্রেমেন্দ্রবাবুর পাঠকের কাছে তা অবোধ্য থাকবে না। প্রেমেন্দ্রবাবুর এই সব গল্পে নিশ্চয় কোথাও কোনও ত্রুটি আছে কিন্তু সে সকল ত্রুটির কথা উত্থাপন করবার প্রয়োজন হবে না যদি তিনি আমাদের মনে যে আশার সঞ্চার করেছেন তা আধুনিক অন্যান্য গল্প-উপন্যাস-লেখকদের মত অকালে বিনাশ না করেন।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Necessity of Communism.—BY JOHN MIDDLETON MURRY, Jonathan Cape, 136 pages. 3s 6d.

On Marxism To-day.—BY MAURICE DOBB, No 10 of the Day to Day Pamphlets Published by Leonard and Virginia Woolf The Hogarth Press, 48 pages. 1s. 6d

The Teachings of Karl Marx.—BY V I. LENIN, No. 1 of the Little Lenin Library, Martin Lawrence, Ltd 48 pages 9d

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল্ মার্ক্স্ মানুষের ইতিহাসের যে একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আধুনিক কমিউনিজ্ম্ বা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা তারই উপর। তাঁর মতবাদ বহুদিন পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছিল কারণ সম্পূর্ণ অভিনব চিন্তা-ধারার প্রতি সাধারণ লোকের অবজ্ঞা স্বাভাবিক। প্রচলিত ধারণা ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে প্রশ্ন বা তর্ক না করাই নাকি প্র্যাক্‌টিকাল্ মানুষের লক্ষণ। যে মূলসূত্রগুলির উপর নির্ভর ক'রে সমসাময়িক সমাজ গড়ে উঠেছে সে সমস্ত নির্ব্বিচারে মেনে চলা এই মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু যখন আর্থিক পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কোন বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তখন চিরাভ্যস্ত বিশ্বাসেও নাড়া পড়ে—তখন বাধ্য হয়ে সকলকেই রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা কিম্বা যুক্তিসঙ্গত সমর্থনের চেষ্টা দেখতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য জগতে মার্ক্স্-তত্ত্বের বিশদ চর্চ্চা এই সাধারণ নিয়মের উদাহরণ।

ইংল্যাণ্ডে এই নূতন উদ্যমের আধুনিকতম দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচ্য বই তিনখানির নাম করা যেতে পারে। লেখক তিনজনই খ্যাতনামা—পুস্তকগুলি সুখপাঠ্য না হলেও শিক্ষাপ্রদ। আজকাল সাহিত্যিক-সমাজে মিড্‌ল্টন্ মারির সুনাম আছে; সম্প্রতি ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট লেবার পার্টিতে যোগ দিয়ে লেখা ও বক্তৃতার সাহায্যে তিনি প্রবল উৎসাহে প্রচার-কার্য্যে নেমেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাই সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর বই লেখার হেতু। মরিস্ ডব্ শিক্ষক ও সুপণ্ডিত; তাঁর নব্য রাশিয়ার আর্থিক ইতিহাস তাঁকে সুপরিচিত করেছে। মার্ক্সের ভক্ত হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ, তাই গুরুর মতামত সম্বন্ধে তাঁর পুস্তিকাখানি প্রণিধানযোগ্য। লেনিনের পরিচয় সর্ব্বজনবিদিত; মার্ক্সের মতবাদ বিষয়ে তাঁর ছোট গ্রন্থটি রুষভাষায় একটি বিশ্বকোষের অন্তর্গত। প্রবন্ধ হিসাবে ১৯১৪ সালে নির্ব্বাসনে লিখিত হয়। মস্কোর লেনিন্-ইন্‌ষ্টিটিউট্

সম্পাদিত লেনিনেব গ্রন্থাবলীব ইংবাজি অনুবাদ মার্টিন্ লবেন্স্ লিমিটেড্ ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশ কবছেন। সময়সাপেক্ষ সেই কাজ সম্পন্ন হবাব আগেই লেনিনেব প্রধান লেখাগুলি বহুল প্রচাবেব জন্য স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাব আকাবে মুদ্রিত কবা স্থিব হয়েছে।

মিড্‌ল্‌টন্ মাবিব প্রধান বক্তব্য তাঁর বইখানিব বিজ্ঞাপন ও মুখবন্ধে অল্প কথায় পাওয়া যায়। তাঁব মতে ইংল্যাণ্ডে সাম্যতন্ত্র স্থাপন অবশ্যম্ভাবী। 'সাম্যবাদ ভিন্ন তাঁব স্বদেশেব ধ্বংসোন্মুখ সমাজেব উদ্ধাবেব অন্য আশা নেই।' কিন্তু কমিউনিজ্‌ম্ যে আকাবে আজ পৃথিবীতে পবিচিত—সেই রুষদেশজাত বল্‌শেভিজ্‌মেব অমানুষিক রুদ্ররূপ ববণ কবা ইংবাজদেব পক্ষে অসম্ভব। ১৯১৭ সালে বাশিয়াব যে অবস্থায় বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল সুসভ্য সংযত ইংল্যাণ্ডেব পক্ষে তাব অনুরূপ দুর্দশা মিড্‌ল্‌টন্ মাবি অভাবনীয় মনে কবেন (১০৭ পৃষ্ঠা)। মস্কোব উপদেশ ইংল্যাণ্ডেব অনুকবণযোগ্য নয়। অতএব সে-দেশে নব-সাম্যবাদেব প্রয়োজন আছে এবং সেই অভাবই মিড্‌ল্‌টন্ মাবি পূর্ণ কবতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁব বিশ্বাস মার্ক্সেব সঙ্গে তাঁব মতভেদ নেই—তিনি নিজেকে মার্ক্সেব শিষ্যরূপেই গণ্য কবেন। লেনিনেব প্রচাবিত মার্ক্স-তত্ত্বেব বিশ্বজনীনতা অস্বীকাব ক'বে ইংল্যাণ্ডে অন্ততঃ নূতন প্রণালীতে সাম্যতন্ত্র গড়ে তুলবাব স্বাধীনতাব দাবী মিড্‌ল্‌টন্ মাবিব প্রধান উদ্দেশ্য।

লেখাব স্বচ্ছতা, ভাষাব আবেগ ও লেখকেব আন্তবিকতা মাবিব বইখানিকে উপভোগ্য কবেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থশাস্ত্রবিশাবদ কীন্‌সেব মতখণ্ডন (১১৪, ১৩৬ পৃষ্ঠা), লণ্ডন স্কুল্ অব্ ইকনমিক্সেব সমালোচনা (১২১ পৃষ্ঠা) এবং ব্রিটিশ শ্রমিক-নেতাদেব প্রতি বিদ্রূপ (৮০, ১০০ পৃষ্ঠা) উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থে তিনটি ভাবেব ধাবা নির্দ্দেশ কবা সহজ। তাব মধ্যে সাম্যতন্ত্রেব অবশ্যম্ভাবিতা ও সাম্যবাদের ইংবাজি সংস্কবণেব চেষ্টা সম্বন্ধে অনেক কথা স্বতঃই মনে আসে। কিন্তু গ্রন্থকাবেব আধ্যাত্মিক আলোচনা—যীশুব জীবনেব একটি বিশেষ ব্যাখ্যা—মানুষেব জীবনে জড়জগতেব বহিঃস্থিত শক্তিব প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচকেব কিছুই বলবাব নেই। ধর্ম্ম-প্রধান বিশ্বাস তর্কেব বাইবে। মার্ক্সেব নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তিব সঙ্গে মাবিব দৃষ্টিভঙ্গীব পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে। ধনিক ও শ্রমিকেব সজ্ঘর্ষ-সমস্যায় মাবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীব বুদ্ধিজীবীদেব শ্রেণীগত স্বার্থ পবিহাব ক'বে শ্রমিকদেব সঙ্গে যুক্ত হবাব উপদেশ বাববাব দিয়েছেন। সন্দেহ হয় যে এই বিপুল আত্মবিসর্জ্জনেব বাণীব উৎস আত্মাব কল্যাণ বা মানসিক শান্তিব সন্ধান। সাম্যবাদে বিশ্বাস কবতে পাবলে ডি এইচ্ লবেন্সেব জীবন, মাবিব মতে, ট্র্যাজেডিতে পবিণত হত না (১২৮, ১৩০ পৃষ্ঠা)।

বর্ত্তমান ধনিক-সমাজেব অনিবার্য্য পবিণতি সাম্যতন্ত্র—মিডল্‌টন্ মাবি মার্ক্সেব এই বিশ্বাসেব পুনবাবৃত্তি কবেছেন বটে কিন্তু তাঁব লেখাতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও যুক্তিপ্রয়োগেব অভাব থেকে গেছে। শুধু ইংল্যাণ্ডেব সমস্যাব পবিধিব ভিতব তাঁব চিন্তা আবদ্ধ এবং সমাজেব পুনর্গঠনে যাদেব পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাদেব লক্ষ্য কবেই তাঁব বই লেখা একথাও তিনি অস্বীকাব কবেন নি। অবশ্য ধনতন্ত্র মানব-সভ্যতাকে আত্মহত্যাব পথে নিয়ে চলেছে সপ্তম পবিচ্ছেদে একথা বোঝাবাব চেষ্টা আছে। হেন্‌বি ফোর্ড্ প্রচাবিত সুনিযন্ত্রিত ধনতন্ত্রেব আদর্শে যুক্তিব ফাঁকটুকু ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় ধবা

পড়েছে—ডিট্রয়টের শ্রমিকদের উন্নতির ফল দেখা যায় কভেন্ট্রি-র বেকারসংখ্যার বৃদ্ধিতে। এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ প্রভৃতির 'বুর্জোয়া' আন্তর্জাতিকতার ভ্রান্তি ও নিষ্ফলতা প্রদর্শিত হয়েছে (৭০ পৃষ্ঠা)। তবুও মারির বইখানিতে মার্ক্সের মূলসূত্রগুলি সম্যক্ আলোচিত হয়েছে বলা চলে না। মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষে—যে কোন যুগের প্রচলিত চিন্তার ধারা ও সাধারণ মতামত এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই যুগের প্রভুশ্রেণীর স্বার্থপ্রণোদিত—শ্রেণীবিশেষের প্রভুত্বের বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত—ভবিষ্যতে শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠাতেই এই সংগ্রামের অবসান—মার্ক্সের এই সকল মত মরিস্ ডব্ ও লেনিনের পুস্তকে এবং লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, ধনতন্ত্র যে মানুষের ন্যায়বুদ্ধিকে পদে পদে আঘাত করে একথা বার্ণার্ড্ শ তাঁর সোশ্যালিজ্‌মের ব্যাখ্যায় যেমন ক'রে পরিস্ফুট করেছেন;—মিডল্‌টন্ মারির লেখাতে তার পরিচয় নেই। তিনি নিশ্চয় এ সব বিশ্বাস করেন, কিন্তু অন্যকে বোঝাবার চেষ্টার অভাব পাঠকের মনকে পীড়া দেয়। ধনতন্ত্র অচল হলেই যে সাম্যতন্ত্র স্থাপিত হবে এর স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শনের দায়িত্ব লেখকের। ভুল্‌লে চলবে না যে কমিউনিজ্‌ম্ ছাড়াও অন্যপ্রকারের সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্ভব। মারি সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করবার পর বইখানির 'সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা' নামকরণ সঙ্গত হয় নি বলতে হবে।

মার্ক্সের মতের সত্যাসত্য যাই হোক না কেন তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। মিড্‌ল্‌টন্ মারি নিজের মনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের চেষ্টায় তার বিকৃতি ঘটিয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস। এই বিকারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মারির বইএর একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ে পাওয়া যায়। তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডে বিনা বিপ্লবে সাম্যতন্ত্র স্থাপন সম্ভব। মত সমর্থনের জন্য এঙ্গেল্‌স্-এর রচনা থেকে যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন (১২৭ পৃষ্ঠা) তার পরবর্ত্তী অংশটুকু বোধহয় তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। মারির বিশ্বাস হয়ত সত্য প্রতিপন্ন হতে পারে কিন্তু তাকে মার্ক্সের মত ব'লে প্রচার করা উচিত নয়। কার্ল্ কাউট্‌স্কির সঙ্গে তর্কযুদ্ধের সময় লেনিন্ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ধনিকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন সম্বন্ধে মার্ক্সের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল। এই ধারণা আধুনিক সাম্যবাদীদের মনে বদ্ধমূল। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি মিড্‌ল্‌টন্ মারির বিতৃষ্ণা জার্ম্মান সোশ্যাল্ ডিমোক্রাট্‌দের মতের অনুরূপ। মরিস্ ডব্ লিখেছেন (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)—বের্ণ্‌ষ্টাইনের যে "সংশোধিত" সাম্যবাদ ইউ-রোপে প্রতিপত্তি হারিয়েছে ইংল্যাণ্ডে নবীন বুদ্ধিজীবিগণ তারই পুনরাবৃত্তি করছেন।

মারির মতে বিরাট ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে মার্ক্স্-মন্ত্রে দীক্ষিত করাই সাম্য-বাদীদের প্রথম কর্ত্তব্য। তারপর পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের সংখ্যাধিক্য হলেই সাম্যতন্ত্রের গোড়াপত্তন হবে। মার্ক্সের গোঁড়া শিষ্যদের দৃঢ়বিশ্বাস এ আশা অমূলক। মারির ধারণা যে ইংল্যাণ্ডে ইটালীয় ফ্যাসিজ্‌ম্ বা জার্ম্মাণীর নাজি-আন্দোলনের অনুরূপ শাসক-শ্রেণী-পরিচালিত কোন সশস্ত্র বাধা সোশ্যালিজ্‌মের পথরোধ করবার চেষ্টা করবে না। প্রকৃত মার্ক্স্-তত্ত্ব অনুসারে এই নির্ভরশীলতার কোন হেতু নেই।

মিডল্‌টন্ মারির নিজের বিশ্বাসকে মার্ক্স্-প্রদর্শিত পন্থা ব'লে প্রচারের প্রতিবাদ করা আমার এই সুদীর্ঘ সমালোচনার উদ্দেশ্য। তাঁর আর একটি ভ্রান্তির উল্লেখ ক'রে

আমি এ প্রসঙ্গ শেষ কবব। মার্ক্সেব জীবনেব নিঃস্বার্থপবতা তাঁব মতেব যথার্থতাকে আংশিক ভাবে অপ্রমাণ কবে এ মন্তব্য নিবর্থক—কেননা স্বার্থবুদ্ধি সকল শ্রেণীকে চালিত কবে এই কথাব অর্থ এ নয় যে প্রতি শ্রেণীব প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বার্থপব। কিন্তু সকল আপত্তি সত্ত্বেও স্বীকাব কবতে হবে যে মাবিব বইখানি অত্যন্ত মূল্যবান। ইংল্যাণ্ডেব চিন্তাশীল লোকেবা যে যুগসমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাব সুন্দব নিদর্শন। লেখাব গুণে মাবিব বইখানি অনেক পাঠককে ইংল্যাণ্ডেব অবস্থা সম্বন্ধে ভাবতে শেখাবে—কোন লেখকেব পক্ষে এব চেয়ে বেশী সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

মবিস্ ডবেব নূতন বইখানিব বিরুদ্ধে আমাব আপত্তি তাব প্রাঞ্জলতাব অভাব। বইখানিব ক্ষুদ্র আয়তনই বোধহয় এব জন্য দাযী। কোন কোন প্রসঙ্গে তিনিও এবাব গোঁড়া মার্ক্স্-পন্থীদেব বিবাগ-ভাজন হবেন ব'লে আশঙ্কা হয। কিন্তু তাঁব বইটিতে অল্পেব ভিতব মার্ক্সেব মূলতত্ত্বগুলিব আলোচনা শিক্ষাপ্রদ হযেছে বলা যেতে পাবে যদিও কমিউনিজম্ সম্বন্ধে ল্যাস্কিব লেখাব সবসতা ও প্রসাদগুণ এ বইএ নেই। ইতিহাসেব যে ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্ভব ও আবশ্যক এবং ইতিহাস সম্বন্ধে মার্ক্সেব ধাবণাব যেটি বৈশিষ্ট্য মবিস্ ডব্ তা সযত্নে বোঝাবাব চেষ্টা কবেছেন।

লেনিনেব পুস্তিকাটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কার্ল্ মার্ক্সেব জীবনেব সংক্ষিপ্ত পবিচয; তাবপব তাঁব মতবাদেব বিববণ; পবিশেষে মার্ক্স সম্বন্ধে সকল ভাষায প্রধান প্রধান লেখাব তালিকা। ইংবাজিতে সাম্যবাদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থই প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হবে সন্দেহ নেই। মবিস্ ডব্ পর্য্যন্ত অনেকাংশে লেনিনেব অনুসবণ কবেছেন।

হেগেলেব দর্শন থেকে মার্ক্সেব চিন্তাধাবাব উৎপত্তি। কিন্তু যেখানে হেগেল্ 'আইডিযা'ব লীলা দেখেছিলেন, ফয়ববাকেব প্রভাবে মার্ক্স সেখানে দেখলেন জডশক্তিব ঘাত-প্রতিঘাত। সমাজেব পবিবর্ত্তনেব মূলসূত্রও মার্ক্স হেগেলেব dialectics-এব থেকে পেযেছিলেন—thesis, antithesis ও synthesis-এব রূপ তিনি সমাজেব বিবর্ত্তনেব ব্যাখ্যায প্রয়োগ কবলেন। এব থেকে মার্ক্সেব বিশ্বাস হ'ল যে মানুষেব ইতিহাস যুগে যুগে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষেব বিভিন্ন রূপ প্রকাশ ক'বে আসছে ও তদনুসাবে মানুষেব সভ্যতা ও চিন্তাব আকৃতি পর্য্যন্ত পবিবর্ত্তিত হচ্ছে। প্রত্যেক যুগে শাসক-শক্তিব বিরুদ্ধে শাসিত-শ্রেণীব বিদ্রোহ মাথা তুলতে বাধ্য এবং সে সঙ্ঘর্ষেব ধ্রুব পবিণাম শ্রেণীভেদেব উচ্ছেদ অথবা সাম্যতন্ত্র। অর্থনীতিব আলোচনা ক'বে মার্ক্সেব সিদ্ধান্ত হ'ল যে শ্রমিকই সমস্ত ধনোৎপাদনেব মূল, কাবণ আমবা যাকে মূলধন বলি শাবীবিক শ্রম ব্যতীত তাব উৎপত্তি অসম্ভব। অথচ শ্রমিকেবা তাদেব শ্রমেব যথার্থ মূল্য পায় না। বিনামূল্যে এই অতিবিক্ত ধনোৎপাদনই ধনতন্ত্রেব প্রধান অবলম্বন। বাষ্ট্রশক্তি নিবপেক্ষ নয়—ধনিকেব স্বার্থসিদ্ধি মাত্র তাব উদ্দেশ্য; এমন কি গণতন্ত্রেও তাব অন্যথা হয না। সেইজন্য স্বল্পসংখ্যক সাম্যবাদীদেব নেতৃত্বে বলপূর্ব্বক সমাজেব পবিবর্ত্তনেব চেষ্টা মার্ক্স-নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

এই সকল মত খণ্ডনেব চেষ্টা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। লেনিন্ ও মবিস্ ডবেব মার্ক্স সম্বন্ধে অখণ্ড বিশ্বাস কিন্তু তাঁদেব লেখা পড়ে তাঁদেব উৎসাহ অন্য লোকে সংক্রামিত হবে কিনা সন্দেহ। অল্পেব ভিতব মার্ক্সেব মতেব পবিচয এবং সে সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধাবণা দূবীকবণই তাঁদেব বই-এব সার্থকতা।

মরিস্ ডবের দৃঢ় বিশ্বাস যে সাম্যবাদ ভিন্ন অন্য প্রকার সোশ্যালিজমের ভবিষ্যতে কোন আশা নেই। আজকাল তাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক দলের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তাঁর শেষ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য—

"Indeed, apart from Historical Materialism, what other than a petulant desire for newness should demand a transformation of the basis of the existing social order? Save as Marxist Socialism or Communism, Socialism seems emphatically to have no future as an historical force . . It is hard to deny that of most of the significant events of recent history the Marxist has made sense where ordinary bourgeois thought has made wrong forecast or has found only bewilderment . Was the pre-war Marxist analysis of capitalism and war or that of the *Great Illusion* the more realistic? There are points in history when traditional concepts come into conflict with contemporary experience, and at such times wise men think that history has gone mad But it is thought, not history, that is unreasonable, and only the barrenness of thought that thinks otherwise."

শ্রীসুশোভন সরকার

Alexanderplatz.—BY ALFRED DOBLIN (Martin Secker).
Etzel Andergast.—BY JACOB WASSERMANN (George Allen & Unwin, Ltd)

বর্ত্তমান জার্ম্মান এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখকদের একজন অগ্রণী হচ্ছেন আলফ্রেড্ ড্যবলিন্। বার্লিনের এই চিকিৎসক-লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস "ভালেনষ্টাইন" লিখে সুবিখ্যাত হন। "আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্" উপন্যাসখানি তাঁর এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখন রীতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বার্লিনে আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্ নামে একটি জায়গা আছে, সেটি নগরের সম্ভ্রান্ত সভ্য পল্লীকে চোর, ডাকাত, খুনী, বদমায়েসের বস্তি হতে বিভিন্ন করেছে; সহরের দুই বিভিন্ন জাতের মধ্যভূমিতে মানবজীবনের আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্বময় ইতিহাস হচ্ছে এই উপন্যাসখানি, সেজন্য ড্যবলিন উপন্যাসের নাম দিয়েছেন শান্ত সভ্য নগর ও under-world-এর মধ্যবর্ত্তী স্কোয়ার আলেকজাণ্ডারপ্লাৎস্।

উপন্যাসের আরম্ভ হচ্ছেঃ ফ্রান্ত্স্ বিবারকফ্ নামে এক বার্লিনের মজুর টেগেল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পথে বাহির হয়েছে, বার্লিনের জনতাভরা পথ, তার কাজ নেই, বন্ধু নেই, অন্তরে শান্তি নেই, কিন্তু সে সৎ জীবন যাপন করতে মনস্থ।

ফ্রান্ত্স্ খবরের কাগজ বেচবার কাজ নিলে; তার মেয়ে-বন্ধু হল, নারীর প্রেমে জীবন আনন্দিত হল। তার সঙ্গীরা তাকে প্রলুব্ধ করে চুরি করবার জন্যে, একবার দলে পড়ে সে চুরি করার সহায় হল, কিন্তু নিজের অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে। সে বিশ্বাস-ঘাতক হতে পারে ভেবে চোরের দলের সর্দ্দার তাকে চলন্ত মোটরগাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিলে; যদি সে মরে যায়, তাদের চুরির সাক্ষী থাকবে না। সে মরল না, তার

একটি হাত ভেঙে গেল, কিন্তু তাব অন্তব এ আঘাতে দমল না; সে জীবন-সংগ্রাম আবাব নতুন কবে আবন্ত কবলে, সে যোদ্ধা, সে আলোব পূজাবী, অন্ধকাবকে জয় কববে।

চোবেব দলেব সর্দাবকে সে ক্ষমা কবলে। সে এক প্রণযিনী লাভ কবলে, তাব অনুবক্তা সেবিকা, সেই প্রেমই তাব শক্তি, তাব জীবনেব অঙ্গ। কিন্তু তাব এক বদমাযেস বন্ধু তাব বান্ধবী মিত্‌সেকে ভুলিযে এক বনে নিযে গেল; মিত্‌সে তাকে ভালবাসে না, সে কামুকেব প্রস্তাবে বাজী হল না; কামোন্মত্ত বাইনহোল্ড মিত্‌সেকে খুন কবলে, বনেব এক গহ্বরে মৃতদেহ পুঁতে পালাল।

এই নিদাকণ আঘাত ফ্রান্ত্‌সেব বুকে বড বেদনায় বাজল, তাব প্রেমকে তাব বিশ্বাসঘাতক বন্ধু হত্যা কবলে। কিন্তু তবু ফ্রান্ত্‌স্ বিবাবকফেব আত্মা হাব মানল না; অন্ধকাবেব অনুচবেবা তাকে ভুলাতে চায, বেদনায তাব অন্তব ভেঙে গেল বটে কিন্তু মানবাত্মা জয়ী হল।

গল্পটি সুখপাঠ্য নয। কিন্তু আলেকজাণ্ডাবপ্লাৎস্ উপন্যাসখানিব শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তাব এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখনভঙ্গী, এক্সপ্রেশনিষ্ট কথাশিল্পীব দৃষ্টিতে মানবজীবনকে নবভাবে সত্যরূপে দেখা। খুনেব চেষ্টা, কামলালসাব জন্য হত্যা, প্রতিহিংসাব জয ইত্যাদি যে সব বোমহর্ষক ঘটনা, অন্তবেব উদ্বেলতাময অবস্থা আছে, কোন বোমাণ্টিক বা বিযেলিষ্ট লেখক সেগুলি কি ভাবে লিখতেন তা আমবা অনেক উপন্যাসেই পডেছি।

এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্ কি, তা না বুঝলে উপন্যাসখানি বোঝা যাবে না। বোমাণ্টিক লেখকগণ জীবনেব বাস্তবতা, তাব কদর্য্যতা, বীভৎসতা, বেদনাময সত্য হতে পালিয়ে প্রকৃতিব সৌন্দর্য্যালোক জীবনেব বঙীন কল্পলোক সৃষ্টি কবতে চেযেছিলেন, তাব প্রতিক্রিয়ারূপে হল বিযালিজ্‌ম্ ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্,—জীবনকে যথাযথ সত্যভাবে আঁকতে হবে তাব নগ্ন কদর্য্যতা উদ্ঘাটিত ক'বে; ভাবেব বসেব বঙীনতাব দুর্ব্বলতা চলবে না; আর্ট হবে জীবনেব প্রতিবিম্ব, সাহিত্য হবে জীবনেব ফটোগ্রাফি।

ইম্‌প্রেশনিজমেব নগ্ন বাস্তবতা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণভাবাক্রান্ত সাহিত্যেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবলেন একদল এক্সপ্রেশনিষ্ট লেখক। তাঁবা বল্‌লেন, মানবজীবনকে ভাসা-ভাসা দেখে ইম্‌প্রেশনিষ্ট তাব ছবি এঁকেছে, জীবনেব সত্যকে তাবা গভীবভাবে উপলব্ধি কবে নি, বাহিবেব আববণ ভেদ ক'বে মানবাত্মাব শক্তি ও সৌন্দর্য্যলোক তাবা দেখেনি। আর্ট বোমাণ্টিকেব অলীক বঙীন স্বপ্নলোক সৃষ্টি কববে না বা বিযালিষ্টেব জীবনেব ফটোগ্রাফিক ছবি আঁকবে না; প্রকৃতি ও জীবনেব মধ্যে যে অনন্ত গূঢশক্তি আপনাকে বিকশিত কবছে, আর্ট তাবি কথা বলবে, অন্তর্নিহিত সত্যেব উদ্ঘাটন কববে।

এক্সপ্রেশনিষ্টেব এই নব দৃষ্টিতে প্রতি ব্যক্তি প্রতি বস্তু এক নব সত্তা লাভ কবল, অনন্তেব সঙ্গে তাব যোগ। এক্সপ্রেশনিষ্ট কথাশিল্পী যখন এক বোগীব গল্প বলে, যে বোগী হয়ে ওঠে পৃথিবীব সকল বোগীব প্রতীক, মানবজীবনেব ব্যাধিব বেদনা সে বহন কবছে; সে একা, ভিন্ন নয; বিশ্বসৃষ্টিব মধ্যে যে ভাঙন যে ব্যাধি বযেছে, সে তাবি রূপ; তাব যাতনা নিখিল মানবাত্মাব বেদনা; তাব সংগ্রাম, মানবাত্মাব সংগ্রাম। বিযালিজমেব নগ্ন বাস্তবতা, কদর্য্য বীভৎসতাব তলে মানবাত্মাব সৌন্দর্য্যলোক বয়েছে, এক্সপ্রেশনিষ্ট শিল্পী তাবি কথা বলেন।

মানবজীবনকে নবদৃষ্টিতে দেখাব প্রয়াসে উপন্যাসেব সব চবিত্র ব্যক্তিত্ব হাবিযে হয়ে উঠল প্রতীক। আলেকজাণ্ডাবপ্লাৎসেব ফ্রান্ত্‌স্ বিবাবকফ শুধু বার্লিনেব এক

মজুর নয়, সে মানব-যোদ্ধা, মানবসভ্যতার সঙ্গে সে যুদ্ধ করছে সয়তানের শক্তিগুলির সঙ্গে।

রিয়ালিজমের সাহিত্যে যে নিরাশা, হতাশ্বাস, সভ্যতার বিকৃতি, ভাঙনের রূপ পাই, এক্সপ্রেশনিজম্ তার প্রতিবাদ; নিরাশার অন্ধকারে সে সত্যের আলোর জন্য সাধনা করছে, প্রেমের আনন্দলোক উদ্ঘাটিত করছে, মানবাত্মার জয়গান গাইছে।

ফ্রান্ত্স্ বিবারকফের গল্প মানবাত্মার সংগ্রামের কথা, আঘাতের পর আঘাত পেয়ে সে দমল না, হার মানল না।

উপন্যাসের শেষ অংশের প্রথমে ডাবলিন লিখছেন, The man's broken But a new Biberkopf will now be shown, far superior to the man we have known, and who, we may expect, will make a better job of things.

গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার লিখছেন, The way leads to freedom, to freedom it goes, the old world must crumble Awake, wind of dawn!

And march in step, right, left, right, march on, march on, we march to war, a hundred minstrels march before, with fife and drum, drrum, brrum, for one the road goes straight, for another it goes crooked, one stands fast, another falls, one rushes past, another falls, drrum, brrumm, drrumm!

এৎসেল আনডেরগাষ্ট আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, Maurizius Case-এ বালক এৎসেলের কথা পড়েছি। এক নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়েছে আর সেই দণ্ডদানের সহায়ক ছিলেন তার পিতা, এই ভেবে বালক আনডেরগাষ্টের মনে শান্তি রইল না, দণ্ডিত ব্যক্তি সত্যি দোষী না নিরপরাধী, তা জানাবার জন্য কিশোর এৎসেল গৃহত্যাগ করে বাহির হয়ে গেল। ব্যক্তি ও সমাজের সংগ্রামে নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রতি অবিচারে কিশোর মনে যে দ্বন্দ্ব ও বেদনা জাগল, তা ভাসারমান পরম শক্তির সহিত বর্ণনা করেছেন Maurizius Case উপন্যাসখানিতে।

"Etzel Andergast" উপন্যাসে এৎসেল যুবক, তার অন্তর শান্তিহারা; মহাযুদ্ধাগ্নিদগ্ধ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে জীবনের সত্য, আত্মার আনন্দ, পৃথিবীভরা শান্তির সুর খুঁজতে গিয়ে সে দিশাহারা হয়ে গেছে। একবার সে ভাবল, হয়ত মানুষের জ্ঞানের পথে সে সত্যের সন্ধান পাবে, সে তিন শত প্রধান প্রধান পুস্তকের তালিকা তৈরী করল, দিনরাত বইএর পর বই পড়ে যেতে লাগল,—দর্শন, ধর্ম্মের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, জীব-বিজ্ঞান, কত রকমের বই; কিন্তু তার সত্যানুসন্ধিৎসু মন কোথাও শান্তি পেল না, চারিদিকের সমাজ ও জীবনে অবিচার, অপ্রেম, ভাঙন, ব্যর্থতা দেখে ব্যথিত অন্তরে যে সব প্রশ্ন জাগে, তার কোন উত্তর পেল না।

বই পড়া ছেড়ে এৎসেল আবার মানবজীবন দেখতে বাহির হল। সরল সহজ জীবন নয়, যেখানে মানবজীবন দুঃখে ভেঙে পড়েছে, অত্যাচারে দ্বন্দ্বে কামনায় কদর্য্য বীভৎস, সেই underworld তাকে আকৃষ্ট করল—গরীবদের বস্তি, কুলিদের সহরতলী, বারবনিতাদের পাড়া—সভ্য ভদ্র ধনী সমাজের প্রান্তদেশে দুঃখদারিদ্র্যের নীতিহীন বিশৃঙ্খল নরনারীসমাজ, সেখানে সে তার যৌবন-হৃদয় নিয়ে জীবনের সত্য খুঁজতে গিয়ে পেল শুধু বেদনা।

এই সময় সে ডাক্তাব কেযাবকোভেনেব সংস্পর্শে এল। এক শক্তিমান চবিত্রেব শান্ত প্রভাব আব এক অশান্ত চবিত্রে কিরূপ ক্রিযাবান হয়ে উঠতে পাবে, তাব দৃষ্টান্ত দেখি, ডাক্তাব কেযাবকোভেনেব সঙ্গলাভে এৎসেলেব চবিত্রেব পবিণতিতে।

ব্যাপাবটি এইরূপ ঃ বোডেবিশ্ লুট্গেন্ নামে এৎসেলেব এক বন্ধু আত্মহত্যা কবে, মহাযুদ্ধেব শেষে যখন জার্ম্মানীব সব যুবকদেব স্বপ্ন ভেঙে গেছে, জীবন অর্থহীন, যুদ্ধেব জন্য সকল ত্যাগ দুঃখভোগ ব্যর্থ, সেই সময় কোন ব্যর্থপ্রেমিক যুবক যে আত্মহত্যা কববে, তাতে ভাববাব কিছু নেই। কিন্তু মুস্কিল বাধল জেসিকে নিযে; জেসি বোডেবিশ্কে ভালবাসত, ঘবে গ্যাস ভবে সেও আত্মহত্যাব চেষ্টা কবে; বোডেবিশেব বোন হিল্ডে তা জানতে পেবে জেসিব বাড়ী এসে তাকে বাঁচায, কিন্তু জেসি আত্মহত্যা কবতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সুতবাং এৎসেলেব সাহায্যে হিল্ডে জেসিকে তাদেব বাড়ী নিযে এল, জেসিকে ঘবে বন্ধ ক'বে হিল্ডে ও এৎসেল পালা ক'বে দিনবাত তাকে পাহাবা দিতে লাগল। দু'দিন এমনি পাহাবা দেবাব পব, ডাক্তাব কেযাবকোভেনেব নাম শুনে এৎসেল তাঁব কাছে যায়, তিনি যদি জেসিব কোন ব্যবস্থা কবতে পাবেন। ডাক্তাব কেযাবকোভেন সত্যিই অদ্ভুদ্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; তাঁব সংস্পর্শে তাঁব কথাবার্ত্তায জেসিব মন বদলে গেল, ডাক্তাব তাকে তাঁব হাস্পাতালে নিয়ে গেলেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে ডাক্তাব কেয়াবকোভেনেব সঙ্গে এৎসেল আনডেবগাষ্টেব পবিচয় আবম্ভ হল। এৎসেল তখন গৃহহাবা; সে কোন এক স্থানে স্থিব থাকতে চায় না; এক বাত এক বন্ধুব বাড়ীতে অপব বাত অন্য বন্ধুব বাড়ীতে, এমনি ক'বে সে বাত কাটায।

ডাক্তাব কেয়াবকোভেন এৎসেলকে সেক্রেটাবী নিযুক্ত ক'বে নিজেব বাড়ি এনে বাখলেন। এৎসেলেব নবজীবন সুরু হল। সে পেল নাবীব প্রেম। ডাক্তাব কেয়াব-কোভেনেব স্ত্রীব সঙ্গে তাব ভালবাসা হল। এই প্রেমেব মধ্যে সে জীবনেব সার্থকতা, সত্য, আনন্দ হয়ত খুঁজে পেত; কিন্তু সে প্রেম তাব নতুন জীবনে আবাব নব দ্বন্দ্ব নব বেদনা আনলে; প্রেমেব সত্য খুঁজতে গিযে সে এক দম্পতিব শান্তিব গৃহ ভেঙে আনলে দুঃখেব আগুন; যে আগুনে এৎসেলেব অন্তবও দগ্ধ হল। সত্যেব সন্ধানপথে সংঘাতেব পব সংঘাতেব ব্যথায শ্রান্ত হযে কেযাবকোভেন-পবিবাবেব ভাঙা ঘব হতে সে পালাল অনুশোচনায, তাব মাযেব স্নেহময গৃহে সে শান্তিব আশ্রয খুঁজতে গেল। এইখানে গল্পেব শেষ।

উপন্যাসখানিতে যে সব চবিত্রগুলি এৎসেলেব জীবনপথে দেখি, তাদেব কেহই সহজ, সুস্থ নয়, কেহ সমাজেব অত্যাচাবে বিকৃত, কেহ জীবনেব ব্যর্থতাব বেদনায় করুণ, কেহ কামনাব লালসায় বীভৎস, কিন্তু সবাব অন্তবে যে দ্বন্দ্বলীলা দেখতে পাই, তা অপূর্ব্ব।

চঞ্চলচিত্ত সত্য-সন্ধানী গৃহ-হাবা এৎসেল আন্ডেবগাষ্ট; সুখান্বেষ্টা, বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন শক্তিপূজাবী লবিনেয়াব, সে একদিন Kapp Putch-ব দলে ছিল, তাবপব হল কমিউনিষ্ট ডন্-জুয়ান; নীতিবোধহীন অভিনেত্রী নর্ত্তকী এমা স্পেয়াবলিং, তাব জন্যে বোডেবিশ আত্মহত্যা কবল, সেজন্য সে বিশেষ ব্যথা অনুভব কবেনি, সে আইন জানে না, বিচাববোধ তাব মনে জন্মাযনি। এই অসুস্থ চঞ্চল জগতেব মধ্যে ডাক্তাব কেয়াবকোভেনেব চবিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুস্থ শক্তিব স্থিব ভূমিব মত; কিন্তু

সে ভূমিতেও ভাঙন ধরল ; এই মহান পুরুষের সত্তার ধ্বংসের ট্রাজেডির সম্মুখে মাথা নত হয়ে আসে। Spiritual Crisis, মানবাত্মার দুঃখময় সংঘাতের ট্রাজেডির কথা এমন শক্তির সহিত, হৃদয়ের বেদনার সহিত ভাসারমানের মত খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Western Influence in Bengali Literature.—
By Priyaranjan Sen (Calcutta University)

Western Influence in Bengali Novel.—
By Priyaranjan Sen (Calcutta University)

পাশ্চাত্যমনের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপথে সমগ্র জগৎ আজ আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের শতধারার সম্মিলনে আমাদের সাহিত্যের মৌলিক ধারাটি এক অভিনব রূপ নিয়েছে, যার ব্যাপকতাও যতো বেশী গভীরতাও ততো। এই নবরূপটির আবির্ভাব হতে আজ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বহিঃশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এর ওপর চলে এসেছে—তার কতোখানি আমরা আমাদের সহজ প্রতিভায় আত্মসাৎ করেছি এবং সে-ই বা আমাদের কতোখানি আত্মসাৎ করেছে তার একটা সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন আমাদের এই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ভার নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। ডক্টর সুশীলকুমার যে-পঁচিশটি বছরের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা করেছেন, সে হলো গৌরচন্দ্রিকার যুগ—Formative Age। শশাঙ্কমোহন রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এসেছেন তাঁর 'বঙ্গবাণী'তে। এ বইখানি কতকটা ঐতিহাসিকতার দাবী করতে পারে, কতকটা,—কারণ, আধুনিক যুগের আলোচনায় ধারাবাহিকতা ঠিক রক্ষিত হয় নি। তাঁর 'বাণীমন্দির'-এর প্রবন্ধগুলি Obiter Dicta জাতীয়। 'মধুসূদন' Dowden-এর 'Shakespeare—His Mind and Art'-এর অনুসরণে লিখিত—ভালো বই। শশাঙ্কমোহনের তিনখানি বইই মূল্যবান্, যদিও তাঁর লিখনভঙ্গীতে এমন একটা অবাঞ্ছিত বক্রতা আছে যে মনে হয় অনেক জায়গায় তাঁর বক্তব্য ঠিক স্পষ্ট হয় নি অথবা বক্তব্য বিশেষ না থাকায় ভাষা ফেনিল হয়ে উঠেছে। তবু স্বীকার করতেই হবে বিচারসাহিত্য হিসাবে এগুলি অভিনব সৃষ্টি। আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

প্রিয়রঞ্জনবাবুর 'Western Influence in Bengali Literature' বইখানিতে দুটি বস্তু লক্ষ্য করলাম—ঐতিহাসিকতা আর প্রভাবের হেতু—তথা স্বরূপ-বিচার। ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০) থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা কখন্ কোন্ পথে বয়ে এসেছে এবং ওই বিশিষ্ট পথ দিয়েই বা কেন এসেছে গ্রন্থকার সূক্ষ্মভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য অনেকস্থলেই তাঁকে ইঙ্গিতের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিষয় এতো ব্যাপক যে চারশো পৃষ্ঠার একখানি বইএ সব কথা বিশদভাবে বলা সম্ভবপর নয়।

প্রথমেই আছে পাশ্চাত্যপ্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাঙলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। এ-আলোচনা অবশ্যম্ভাবী ; নইলে প্রভাবের স্বরূপ ও পরিমাণ বোঝা অসম্ভব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশটি 'Contact with the West: before the Christian era' আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ব'লে মনে হয়. কারণ, এযুগের সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু গ্রন্থকার বল্‌তে চান বাইরের প্রভাব আত্মসাৎ করার শক্তি সকল দেশের থাকেনা, এদেশের আছে—'India was not so stolidly impervious to outside influences'; এবং আছে বলেই ১৫০ বছরে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে এমন বিপুল পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে।

আসল বিষয়বস্তুর সূচনা হোলো তৃতীয় পরিচ্ছেদে—ইংরাজ আমলের প্রথম অংশে নবপ্রভাব কোন্ কোন্ পথে এলো তারি হিসাব নিকাশ (Channels of the new influence)। এই অংশে প্রাথমিক প্রেরণার বিভিন্ন প্রবাহগুলি আলোচিত হয়েছে এবং ভাবীকালের বিপুল সম্ভাব্যতার বীজ কেমন ক'রে এই সঙ্কীর্ণ সীমার প্রভাবের ভিতর অনুস্যূত হয়েছিল তার বিচার করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। এইটিকে বলা যেতে পারে সূত্র এবং পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলি এরি ভাষ্য। ইউরোপীয়, বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডীয় বহুমুখী চিন্তাধারার সঙ্গে এই সময় হতেই এদেশবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আরম্ভ। পরিচ্ছেদটির নাম Bengal's Favourite Authors। 'Favourite' শব্দটির মূল্য অত্যন্ত বেশী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই 'favourite'-কে আবিষ্কার করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ, সেটি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কাল এবং নবরূপের আকস্মিক আবির্ভাবে স্বাভাবিক মূঢ়তার দিন। তখন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বৈদেশিকদের ক্রিয়াশীলতাই ছিল বেশী। কাজেই 'favourite'-কে চিনে নিতে পঞ্চাশ বছরেরো বেশী সময় লেগে গেল। এই 'favourite'-দের প্রভাব আমাদের নবতর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই কাজ করেছে। সেদিনকার সেই আরব্ধ সাধনা আজো নানানতররূপে সিদ্ধিলাভ করছে। মধুসূদনে যার অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে তাই পুষ্পিত হয়েছে। অতি আধুনিকদের সাধনার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত, যদিও এ সাধনার গতি এবং প্রকৃতি বলিষ্ঠ নয়। তবু, আজ না হোক্, দুদিন পরেও পুষ্প তার স্বভাবধর্ম্মে ফলে উত্তীর্ণ হবেই। প্রিয়রঞ্জনবাবু এই অংশটির আলোচনায় একটি বিষয়ে নজর দেন নি বলেই মনে হোলো। এদেশে যখন মধু-বঙ্কিমের যুগ এলো, ইংরাজী সাহিত্যে তখন Victorian Age। তবু আমাদের মধু-বঙ্কিমের সাহিত্য এতো পেছিয়ে পড়ল কেন? তাঁদের সাহিত্য এদেশের পক্ষে নতুন হতে পারে, কিন্তু সাগরপারে antidated। পরিচয়ের আংশিকতা এর কারণ বলে সহজেই মনে হবে। কিন্তু এর চেয়ে সঙ্গততর কারণ দীর্ঘদিনের অনুশীলনের অভাবে জাতির মানসিক জড়তা। স্বাধীন দেশের চিন্তধারার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলা পরাধীন দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আজো তাই আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার ঠিক সুরটি লাগ ছে না ; বলিষ্ঠ প্রাণস্পন্দনের বড়োই অভাব দেখছি। তথাকথিত প্রগতির ভিতর দুর্গতির লক্ষণই বেশী। শরৎ-রবির পর থেকে এ-সাহিত্যে স্বতন্ত্রতার চেয়ে পরতন্ত্রতার রূপই অধিক মিল্‌ছে। আত্মস্থ করে বিশিষ্টতা দেওয়ার প্রতিভার অভাবে আবর্জ্জনাই জমে উঠছে। প্রথম পরিচয়ের যুগেই এমনি হওয়া স্বাভাবিক

ছিল ; কিন্তু ঠিক তা হয়নি। এতো কাল পরে, যখন বাঙলা প্রিয়রঞ্জনবাবুর মতে "may be believed to have developed her own tendencies," তখন এ-বিপর্য্যয়ের কারণ কি ? প্রিয়রঞ্জনবাবু ভেবে দেখবেন।

এইবার পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আর অষ্টম পরিচ্ছেদের কথা। প্রথম তিনটিতে আছে চতুর্থ পরিচ্ছেদের রৌপিক ফলশ্রুতির অর্থাৎ 'favourite author-দের প্রেরণা কিভাবে আমাদের কাব্যে, নাটকে এবং গদ্যসাহিত্যে রূপায়িত হয়ে এসেছে, তারি বিবরণ। অষ্টমে আন্তর ফলশ্রুতি অর্থাৎ 'Matter and Spirit'-এর বিচার।

কাব্যের 'Sonnet'-রূপের আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য', 'দেবতার বিদায়', 'নৈবেদ্যের' কবিতা প্রভৃতিকে 'Sonnet'-এর পর্য্যায়ে ফেলেছেন। আমি এগুলিকে চতুর্দ্দশপদী পয়ার ব'লে মনে করি। মধুসূদন Sonnet-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করেছিলেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই প্রতিশব্দটীর সৃষ্টি হয়েছিল। Sonnet—সনেট্, কোনো প্রতিশব্দের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। আরেক কথা। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী', 'মেঘদূত', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতিকে 'accurately as blank verse' ব'লে ধরা যায় না ; 'but rhyming lines which are run on or unstopped'—সত্যি কথা। কিন্তু 'jingle of similar sounds is not altogether absent'—কোথা থেকে ? তাছাড়া 'altogether' শব্দটির অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হোলো না। 'But never prominent'—'never' কি ঠিক ? 'মানসসুন্দরী'র

'ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে গন্ধবাষ্প তার,
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার'

—এ তো বিশুদ্ধ পয়ার, এমন কি যতিটি পর্য্যন্ত নিখুঁত। বোধহয় 'never' নয়, 'not always' গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। 'এবার ফিরাও মোরে', 'সমুদ্রের প্রতি', 'হিমালয়' প্রভৃতিরো এই ছন্দ, কেবল পঙ্ক্তির অক্ষর সংখ্যা চৌদ্দ না হয়ে আঠারো।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' কি নিখুঁত Epic-লক্ষণাক্রান্ত ? 'সাহিত্য-দর্পণ'-কে তিনি মানেন নি ; কিন্তু 'Paradise Lost'-কেও যে ঠিক মেনেছেন তা মনে করি না। 'মেঘনাদবধকাব্য' সংস্কৃত মহাকাব্য আর ওদেশের Epic-এর মিলনফল।

নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের আলোচনাটুকু সংক্ষিপ্ত হলেও সর্ব্বাঙ্গীন। গ্রন্থকার যথাসম্ভব প্রমাণপ্রয়োগের ওপর আপনার বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই বিষয়ের ওপর thesis লিখে সেদিন এক ভদ্রলোক বিলাতী Ph. D নিয়ে এসেছেন যা প'ড়ে আমরা কিন্তু হতাশ হয়েছি। প্রিয়রঞ্জনবাবু যে স্মৃতির ওপর নির্ভর করেননি বা অযথা কল্পনার রঙ ফলিয়ে মরীচিকার সৃষ্টি করেননি এতে আমরা আনন্দিত। অনেকের ধারণা রাশিয়ার Gerasim Lebedeff-এর প্রভাব আমাদের শিশুনাট্য-সাহিত্যের ওপর খুব বেশী, গ্রন্থকার তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন বাঙলা নাটক তথা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব এবং প্রগতির মূলে এদেশে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী Theatre-এর প্রভাবই বেশী। আমরাও তাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। Lebedeff বাঙলা বই ('Disguise' আর 'Love is the Best Doctor'-এর

বাংলা অনুবাদ) অভিনয় কবেছিলেন। কিন্তু ১৮৩১ সালেব ডিসেম্বব মাসে বাঙালীবা প্রসন্নকুমাব ঠাকুবেব বেলেঘাটাব বাগানবাড়ীতে যে-বই নিযে প্রথম Theatre কবেন, তা বাঙলা নয, ভবভূতিব সংস্কৃত নাটক 'উত্তববামচবিতে'ব Wilson-কৃত ইংবাজী অনুবাদ। ওব সঙ্গে ছিল Julius Caesar? লক্ষ্য কববাব বিষয নয কি?

এব পবে থিযেটাবে অভিনযযোগ্য বাঙলা নাটকেব আবির্ভাব হয। তা সত্ত্বেও ইংবাজী নাটকেব অভিনয় বহুদিন ধবে চলেছিল। সেই থেকে পাশ্চাত্য আদর্শে আমাদেব সাহিত্যে অসংখ্য নাটকেব সৃষ্টি হযেছে, বিদেশী নাটকেব অনুবাদও হযেছে প্রচুব। গিবীশচন্দ্র, অমৃতলাল, ববীন্দ্রনাথেব হাতে বাঙলা নাট্যসাহিত্য স্বাতন্ত্র্য লাভ কবেছেও যথেষ্ট। প্রিযবঞ্জনবাবু কি খুব আশাবাদী? তিনি 'নাট্যমন্দিব' 'নাট্যনিকেতন' প্রভৃতি নামে বাঙালীব আত্মস্থতাব লক্ষণ দেখে সুখী হয়েছেন; বলেছেন এই নামকবণ 'has a significance of its own'। কিছু significance হযতো আছে এবং শিশিববাবুব মতন প্রতিভাশালী নটেব আবির্ভাবও হযেছে দেশেব সৌভাগ্যেব ফলে। কিন্তু নাট্যসাহিত্যে decadence লাগ্‌লো কেন? সেই থোডবডিখাডা খাডাবডিথোড ১৯১২ সাল থেকেই চল্‌ছে, অবশ্য ববীন্দ্রনাথেব রূপকনাট্য আব মন্মথবাবুব একাঙ্কিকা বাদ দিয়ে। আত্মস্থ বাঙালীব প্রতিভাও কি উদবস্থ হযে গেল? আমাদেব সাহিত্যেব এই অতিআধুনিক যুগটি অদ্ভুত।

এইবাব গদ্যসাহিত্যেব কথা। সকল দেশেবি মতন আমাদেবো গদ্যসাহিত্য বযসে সকলেব ছোটো। প্রাক্‌পাশ্চাত্যযুগে এর অস্তিত্ব ছিল না বল্‌লেই চলে। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি এব বহুরূপ—উপন্যাস, ছোটো গল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্যবিচাব, গদ্যকাব্য, ইতিহাস, জীবনচবিত, আত্মচবিত, ব্যাকবণ, অভিধান, হাস্যকৌতুক নানান্ দিকে গদ্যধাবা প্রাণেব প্রাচুর্য্যে শত তবঙ্গে আবর্ত্তিত হতে হতে চলেছে। এই দিকেই পাশ্চাত্যপ্রভাব যতো অতল, ততো ব্যাপক। মাত্র দেডশো বছবে কি আশ্চর্য্য শক্তিই এ পেযেছে! শবৎ-ববিব গদ্যে যে বিশ্বদীপন জ্যোতিঃ প্রকাশিত হযেছে, নিমানন্দ-চণ্ডীদাস-বমাইপণ্ডিতেব গদ্যে কি তাবি latency ছিল? বৈদেশিকেব হাতে যাব প্রথম ব্যাকবণ অভিধানেব জন্ম হলো, বৈদেশিক যাব চলাব পথ বাৎলে দিলে বিলাতী Syntax-এব ছাঁচে ঢালা কিম্ভূত-কিমাকাব রূপেব সৃষ্টি ক'বে, তাই আজ বিশ্বমনেব নাট্যশালা হযে দাঁডিযেছে! আশ্চর্য্য। প্রিযবঞ্জনবাবু এই অতিপ্রযোজনীয অংশটিকে বডোই সংক্ষিপ্ত কবেছেন, মনেব ক্ষুধা ঠিক মিট্‌লো না।

অবশ্য উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁব একখানি পৃথক্ বই আছে—'Western Influence in Bengali Novel'। এইটিই তাঁব প্রথম বই। ছোটো বই, তবু চমৎকাব। সামান্য একআধটু অসামঞ্জস্য যা চোখে পডেছে, তাবি আলোচনা কবি।

বাঙলাব কথাসাহিত্যে প্রথম সৃষ্টিলগ্নে একদিকে বিশেষতঃ 'Vernacular Literature Society'-ব কল্যাণে হতে লাগ্‌লো অজস্র ইংবাজী বইএব অনুবাদ; অন্য দিকে বিদ্যাসাগব ইত্যাদিব নজব বইলো সংস্কৃতেব ওপব এবং আবেকদল ঝোঁক দিলেন পার্শী, আববি, উর্দ্দুব দিকে। শেষদলেব চেষ্টা নিষ্ফল হলো; কাবণ, ওঁদেব সাধনা 'failed to capture the imagination of the public'। প্রিযবঞ্জনবাবু এব কাবণ বলেছেন—'Incidents described in these books take

place as a rule outside India heroes and heroines have strange, outlandish names' ইত্যাদি। কিন্তু, তাই কি? বিলাতী বইএর 'incidents'-ও তো এদেশী নয় এবং তারো 'heroes and heroines'-এর নাম আমাদের কাছে 'strange'। তবে এ কথাটা অবশ্য সত্যি যে আরবী পার্শী বইগুলি অবাস্তব রোমান্সধর্ম্মী। একটা কথার অর্থ বুঝলাম না—'The facts, mentioned above, will support the theory that even without the help of English, or for the matter, western literature in general, the Bengali novel would have come to its own'। কিন্তু 'above' যা 'mentioned' আছে তা হচ্ছে—আরবী পার্শী গল্পে মন ঠিক সাড়া দিলে না ব'লে 'the demand for western stories was so strong that ' ইত্যাদি। পরের প্যারাতেও রয়েছে—'It is not a fact that only in translation or in plot or in style only, our writers were influenced by western authors . Even in the matter of ideas the Bengali novelist learnt much and accepted much from England and other countries '

স্বর্ণকুমারীর কথাও আলোচিত হয়েছে দেখ্‌লাম। অনুরূপা নিরুপমা কি পাশ্চাত্যপ্রভাবের অতীত? প্রিয়রঞ্জনবাবুর গণ্ডীর বাইরে ব'লেও তো তাঁদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-বিচারে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের ধারা এসে মিশেছে। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার রসায়নে সকলগুলির 'এক আশ্চর্য্য কেমিক্যাল্ কম্পাউণ্ড্ তৈরী হয়েছে। প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—'He (Rabindranath) is not pre-eminently a novelist , he is a poet first. Hence in the history of Bengali novels he does not occupy the same position as he does in his poetry'—খুবই সত্যি; তবু, তাঁর উপন্যাস, বিশেষ ক'রে 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', এমন কি সেদিনকার 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' পর্য্যন্ত (অবশ্য শেষ ছুটির কথা প্রিয়রঞ্জনবাবু আলোচনা করেন নি) আদর্শের দিক্ দিয়ে যাই হোক, শিল্প হিসাবে চমৎকার। 'ছোটো গল্পে' তিনি 'not only the pioneer but also the best'—আমরাও তা মানি। কিন্তু একি তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি? প্রিয়রঞ্জনবাবু কিছুই বলেন নি। আমার মনে . হয় এক্ষেত্রে তিনি প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন ফরাসীর কাছে, কিন্তু পরে রাসিয়া, বিশেষতঃ Turgenev আর Tchekov, তাঁর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে। Scandinavian-দের কাছে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঋণী, কিন্তু ছোটো গল্পে ওঁদের কৃতিত্ব কম বলেই আমার বিশ্বাস। মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রিয়রঞ্জনবাবুর বেশ কৃতিত্ব দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন নন; কাজেই তাঁর পাশ্চাত্য ঋণ সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করতে হয়। এবং তাতে পাণ্ডিত্যের তথা অন্তর্দৃষ্টির দরকার। শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

'The assimilation of western idea and ideals is more and more thorough and the borrowing, if any, is more and more

indirect, ideas are so closely assimilated that it is not at all possible to distinguish if they are eastern or western' ।

খুব চমৎকার। তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের ওপর ইংরাজী প্রভাব কম, রাসিয়ান্ আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্‌ই বেশী।

ছোটো গল্প সম্বন্ধে গ্রন্থকার প্রায় নীরব। এ নিয়ে অনেক কথাই কিন্তু তাঁর বল্‌বার ছিল।

এইবার প্রথম বইখানির অষ্টম পরিচ্ছেদ। এখানে সাহিত্যের 'matter' আর 'spirit'-এর আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মানুষের স্থান খুব উচ্চে। এর মূলে Comte-র নিরীশ্বর মানববাদের (Positivism) প্রভাব খুবই বেশী একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। Fichte-এরও কিছু আছে। James-এর Pragmatic Philosophy আর Whitman-এর কাব্যও এই দিক্ দিয়ে আমাদের সাহিত্যে প্রচুর কাজ করেছে ব'লে মনে করি। এঁদের কথার উল্লেখ না দেখে একটু বিস্মিত হয়েছি। পাশ্চাত্য সংস্পর্শের গোড়া থেকেই আমাদের সমাজের নারীদের ওপর আমাদের নজর পড়েছে। বিদ্যাসাগর ভূদেব বঙ্কিমের ভিতর দিয়ে নবীনচন্দ্রে এমন কি চিত্তরঞ্জনেও নারী যে-রূপ পেয়েছেন, তার মূলে বিলাতী নারীর আদর্শ যথেষ্ট থাকলেও এদেশী আদর্শ একেবারে মুছে যায়নি। রবীন্দ্রনাথের নারী অপরূপ সৃষ্টি। সেকালের 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'উর্ব্বশী'র ভিতর দিয়ে অপরূপের মধ্যে আপনার সত্তা হারিয়ে ফেলেছে!

প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে দেশাত্মবোধের কথা। দেশাত্মবোধের যে-রূপটির সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত, তার মূলে যে পাশ্চাত্য প্রেরণা আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বাত্মবোধে পরিণত হয়েছে, প্রিয়রঞ্জন-বাবুর ভাষায় 'nationalism merging in internationalism,' কিন্তু এতে পশ্চিমা Percentage-ই কি বেশী নয়?—অন্ততঃ আজকাল?

ধর্ম্মেও পাশ্চাত্য প্রভাবের বহু মুখফলের কথা গ্রন্থকার সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। Dogma-র স্থানে আজ বিচার এসেছে। ওদেশের rational philosophy এদিকে যথেষ্ট কাজ করেছে মানি; কিন্তু Science-এর প্রভাবও কি খুব বেশী নয়? ইউরোপের মধ্যযুগের Scholastic Philosophy ছিল Dogmatic—Bacon-এর সময় থেকে হোলো Rational। Bacon ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্ গণিতজ্ঞ। পুরানো সংস্কৃতির মূলেও বিজ্ঞানের প্রভাব যথেষ্ট ব'লে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানজ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি তাঁর 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় হয়তো জগদীশচন্দ্রের প্রভাব আছে।

প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—'The theosophical and spiritual movements, both western in origin।' আডিয়ারে Theosophical Society-র প্রতিষ্ঠাত্রী Madam Blavatsky রাশিয়াবাসিনী, কাজেই 'western'; কিন্তু Theosophy-কে 'western in origin' ব'লে মনে করি না। গীতার 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি'—এই তো 'Immanence of God' এবং এরি ফল হোলো 'Solidarity of Man'—'অহং তং ন প্রণশ্যামি'। আর Spirit-এর

কথা পুরাণে তো আছেই; 'ব্রহ্মসূত্রে'ও পাই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এগুটির জন্য পাশ্চাত্য দেশই আমাদের কাছে ঋণী। Movements-ই শুধু বিলাতী। তা ছাড়া, হীরেন্দ্রনাথের 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-কে Theosophy-র দ্বারা প্রভাবিত বল্‌তে আমার আপত্তি আছে; এখানিকে আমি সর্ব্বদর্শনসমন্বয়রূপেই দেখেছি।

নবম বা উপসংহার পরিচ্ছেদে প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেছেন—

The receptivity of the Bengali mind deserves some credit · who will say that this receptivity has been all for good ?

সত্যিই ভাব্‌বার কথা। এর ভালোমন্দ দুটো দিকই প্রবল। বিশেষতঃ এই অতিআধুনিক যুগের সাহিত্য দেখে ভয়ই হয়।

শেষে একটা কথা ব'লে রাখি। বইখানির ২৮৪ পৃষ্ঠায় দেখলাম—

'Still, a sentence like the following which is either English or Sanskrit, but certainly not Bengali '

'নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল। (সীতারাম, ৮ম পরিচ্ছেদ)'

সংস্কৃতে বাক্যবিন্যাস এমন হতে পারে না। অসমাপিকা আর সমাপিকা ক্রিয়ার সমানকর্তৃকত্ব হতেই হবে।

এইবার আমার উপসংহার। প্রিয়রঞ্জনবাবু বিশেষতঃ এম্‌-এ পরীক্ষার পাঠ্য হিসাবেই বইদুখানি লিখেছেন; কিন্তু আমাদেরো অর্থাৎ সাধারণ পাঠকদেরো এতে যথেষ্ট উপকার হয়েছে। অনুরোধ করি 'Ten More Plays of Shakespeare-এর মতন আরেকখানি বই তিনি আমাদের যেন উপহার দেন। আমাদের অতিআধুনিক সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের মাত্রাও বেড়েছে, জটিলতাও বেড়েছে। আলোচিত বই দুখানি থেকে তাঁর শক্তির ওপর আমার বিশ্বাস জন্মেছে বলেই এ ভার তাঁকে দিলাম অর্থাৎ নেবার জন্য অনুরোধ কর্‌লাম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: বই দুখানি বাঙলায় লিখলেই কি ভালো হতো না? আমাদের সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যও তাতে বেড়ে যেতো আর অশিক্ষিত অর্থাৎ ইংরাজী-না-জানা অভাগ্য বাঙালীদেরো উপকার হতো। অবশ্য তাতে জুবিলি বিসার্চ প্রাইজ্‌ বা পি, আর্‌, এস্‌, মিল্‌তো না আর—থাক্‌। মোটের ওপর বাঙলা অনুবাদের সময় যায় নি।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

নীল-লোহিত—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—কমলা বুক ডিপো।

এগারটী ছোট গল্পের সমষ্টি। অধিকাংশ গল্পের plot বা আখ্যান-ভাগ নাই বলিলেই হয়। তথাপি তাহাতে অন্য জিনিস এত আছে যে পুস্তক পাঠ করিয়া কেহই নিরাশ হইবেন না। প্রমথবাবুর লিখনভঙ্গী গৌড়জনের সুপরিচিত। সেই লিখনভঙ্গী পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় যে রস সঞ্চার করিয়াছে, তাহাই সমজদার পাঠককে ভরপূর আনন্দ দান করিবে।

প্রথম তিনটী গল্পের নায়ক স্বয়ং নীল-লোহিত। এই মুখরনয়ন গল্পবাগীশ নায়ককে খুব গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকের পছন্দ নাও হইতে পারে। তবে আমার Tartarin

de Tarascon বা BaronMunchausen অপেক্ষাও নীললালকে বেশী ভাল লাগিযাছে। মাত্র তিনটী গল্পে আশা মিটে নাই। সাধাবণ পাঠকেব তবফ হইতে আমাব আবেদন যে প্রমথবাবু নীল-লোহিতেব মুখে যত গল্প শুনিয়াছেন সবগুলি এক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট কবিয়া প্রকাশ করুন।

বাকী গল্পগুলি-সম্বন্ধে আমাব বেশী বক্তব্য নাই। সবগুলি এক দবেব নয়। সবেসও আছে নিবেসও আছে। প্রাণবন্ধু, সিতিকণ্ঠ ও বীববলেব চিত্র নীললোহিতেব মত সমুজ্জ্বল না হইলেও খুব চিত্তাকর্ষক হইযাছে। পূজাব বলি, দিদিমাব গল্প ও ভূতেব গল্প এ পুস্তকে না দিলেই ভাল হইত, কেন না ইহাদেব plot নিতান্ত মামুলী ধবণেব এবং চৌধুবী মহাশযেব সর্ব্বজনবিদিত বচনাচাতুর্য্যও ইহাতে বিশেষ প্রকাশ পাইতে পাবে নাই।

তবে প্রমথবাবুব লেখায গল্পটা উপলক্ষমাত্র। আখ্যান ছাডাও অনেক জিনিস এই পুস্তকে আছে। নানা স্থানে যে সব শ্লেষোক্তি আছে, তাহা সত্যই সুন্দব। কেহই বাদ পডেন নাই, ক্ষত্রিযত্বকামী বঙ্গীয কাযস্থসন্তান হইতে সুবতেব লাড্ডু পুবী পর্য্যন্ত। গ্রন্থকাবকে নানা বিদ্যায় পাবাধিগত বলিযা সকলেই জানেন। তবু তামাক সাজা, হাতী ধবা, ঘোডায চডা, ঘুডী ওডান ইত্যাদি ব্যাপাবে তাঁহাব এরূপ আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে বলিযা কেহই সন্দেহ কবেন নাই। তবে জানা বস্তুটাই ত সব নয়। তামাক সাজা ও ঘুডী ওডান আমবা পাঁচজন হযত চৌধুবী মহাশযেব চেযে ভালই জানি কিন্তু বিদ্যা প্রকাশ কবিবাব ক্ষমতা আমাদেব নাই।

মোট কথা, আলোচ্য পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সুন্দব হইয়াছে। আমবা সকলকে পডিতে অনুবোধ কবি।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Shakespeare through Eastern Eyes—BY RANJEE G SHAHANI with an introduction by J Middleton Murry, and an appreciation by Emile Legouis (Herbert Joseph, London)

অমব কবি শেক্‌স্‌পীযবেব কবিত্ব প্রাচ্যেব হৃদয় স্পর্শ কবে কি না সে কথা নিযে লেখক আলোচনা কবেছেন। তাঁব বক্তব্যেব মূল নীতি,—কাব্য সার্ব্বভৌম নয়; বস সার্ব্বভৌম, কিন্তু সে বসকে প্রকাশ কর্ত্তে গেলে, প্রকাশভঙ্গী স্থানকালপাত্রেব অনুযাযী পৃথক পৃথক আকাব ধাবণ কবে। প্রাচ্য এতদিন তোতাপাখীব মত পাশ্চাত্যেব শেখানো বুলি আউডেছে, নকলনবিশী ছিল এতদিন ধবে প্রাচ্যেব আধুনিক শিক্ষাব মেকী মাপকাঠী, কিন্তু এখন তাব ঘুম ভেঙ্গে গেছে, মেকী ধবা পডেছে, সে আজ ভাল ক'বে দেখে শুনে জীবনেব পথে চল্‌তে চায, যাঁকে জগতেব শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে সে শিখে এসেছে তাঁব কথাই ভেবে দেখ্‌তে চায,—বাস্তবিক তিনি প্রাচ্যেব আদর্শেও জগতেব শ্রেষ্ঠ কবি কিনা। ডক্টব সাহানী এই বিষয নিযে নানাভাবে আলোচনা কবেছেন; প্রাচ্যে, ভাবতে, শেক্‌স্‌পীযবেব নাটক কি ভাবে পডানো হয, কি ভাবে

অনুবাদ করা হয়, কি ভাবে অভিনয় করা হয় সে সব ভাল ক'রে দেখে শুনে এবং অতীন্দ্রিয়ের প্রতি প্রাচ্যের সহজ অনুরাগের কথা মনে ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচ্যের চক্ষে শেক্স্‌পীয়রের আসন অত্যুচ্চে নয়। তা ছাড়া বাস্তবিক কথা, ইংলণ্ডের এই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জীবনের কোনও সমস্যার বিষয়ে গভীর চিন্তা ক'রে কোন সমাধান করতে পারেন নি, সাহিত্যের কোনও বিশেষ রূপ সৃষ্টি ক'রে যাননি, নোতুন পথে চলবার ও চালাবার যে প্রতিভা, সে প্রতিভা তাঁর ছিল না ; সুতরাং শেক্স্‌পীয়র এতদিন যে উচ্চ সিংহাসনে বসে ছিলেন আসলে তা তাঁর মোটেই প্রাপ্য নয়।

ডক্টর সাহানীর এই আলোচনার এক দিক থেকে মূল্য আছে ; প্রাচ্যই হোক্ আর পাশ্চাত্যই হোক্ ভাল ক'রে পূর্ব্বগামীদের মত পরীক্ষা করবার অধিকার সকলেরই আছে ; সুতরাং দীর্ঘকালব্যাপী পাশ্চাত্যানুকরণের মোহ যদি কাটতে আরম্ভ করে, আমাদের নিজের চোখ দিয়ে যদি আমরা জগৎকে দেখতে আরম্ভ করি তবে আমাদের সেটা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নেই। আত্মনির্ভরতা, স্বাবলম্বন, মঙ্গলের পথে আমাদের নিয়ে যাবে ; পরবশ্যতা বিবিধ দুঃখের মূল ; এ কথা আমরা যতই বুঝ্‌তে পারবো ততই ভাল। কিন্তু নিজের পায়ে চলতে পারাই পরম পুরুষার্থ নয়, ঠিক পথে যাওয়ার কথাও ভাবতে হবে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাত, মিষ্টিক সাধনা ছাড়া আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না,—এ সব কথা ব'লে যাঁরা ভারতের জাতীয়তাকে একটা বিশেষ রূপ দিতে চান, তাঁরা হিন্দু সভ্যতার একটা মনগড়া আদর্শ স্থির করেছেন। হিন্দু চেয়ে এসেছে ধর্ম্মার্থকাম একত্র এই তিনেরই সেবা,—"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ, যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ—কবির মধ্যে কালিদাসকে সে শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে, শেক্স্‌পীয়রকেও সেইরূপ অন্তরের ভক্তি উপহার দিতে পারে সে, দেশগত রুচিভেদ তার পথে অন্তরায় নয়। সাহিত্যের নোতুন প্রকাশভঙ্গীর সৃষ্টি তো কালিদাসও করে যাননি, কালিদাসও তো মিষ্টিক সাধনা শ্লোকে প্রকাশ ক'রে প্রাচ্য পাঠকের চিত্ত জয় করেননি, তাঁরও তো শব্দ-চয়ন ও সরসতা, নব নব চিত্রের সৃষ্টি ও সমাবেশ, পরম সম্পদ। সুতরাং ডক্টর সাহানীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রাচ্য হয়েও আমরা একমত হতে পারলাম না।

লেখকের উপকরণও অভ্রান্ত নয়। তিনি শেক্স্‌পীয়র যে আমাদের দেশে ভাল ভাবে অধ্যাপনা হয় না তার নজীরস্বরূপ শিক্ষাগারের ব্যঙ্গ্যচিত্র উদ্ধৃত করেছেন, সেরূপ ব্যঙ্গ্যচিত্র আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল সাহিত্যিকের সম্বন্ধেই সৃষ্টি করা যেতে পারে। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পত্রে রবীন্দ্রনাথের সুললিত রচনার দুর্দ্দশা কি ভাবে হয় তার যাঁরা পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা একথা অবিসংবাদিতভাবে স্বীকার করবেন। আর, ভারতীয় ভাষায় শেক্স্‌পীয়রের আক্ষরিক অনুবাদ যে হতে পারে অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে,—গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথ্।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

The Meaning of Modern Sculpture—By R. H Wilenski
(Faber and Faber)

বিলেন্সকি আজকালের শিল্পজগতে পরিচিত একজন উচ্‌কপালে শিল্পজ্ঞ বলে। কিন্তু বজার ফ্রাই-র আধুনিক ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধে যে ফিলিষ্টিয়াদ্বেষী নাসিকাকুঞ্চনে ভয় পেয়েছিলুম, সে স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব বিলেন্সকির নেই। তার উপরে বিলেন্সকি বলেছেন যে ভালো ভাস্কর্য্যের ছবি দেখেও নাকি তৃপ্তিলাভ সম্ভব। কারণ ভালো মূর্ত্তির যথাযোগ্য আকার নাকি স্বতই ফোটোদৃর্শনেও মনে আসে।

অবশ্য এ বই সমালোচনার অধিকার তাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জোরালো তর্কবসাল রচনা হিসাবেও বইটা ভালো লেগেছে। প্রধানত গ্রীক শিল্পের মাহাত্ম্য ধ্বংসেই বিলেন্সকির মনোযোগ। কয়েকজন অসত্যবাদী ব্যবসাদার গ্রীক্ পণ্ডিত দীর্ঘকাল ধরে গ্রীক্ উৎকর্ষের কল্পিত কাহিনী চালিয়ে লোকের ভাস্কর্য্য-জ্ঞান বিকৃত করেছেন, এই হল বিলেন্সকির প্রতিপাদ্য। ধরা যাক্ ফিডিয়াস্‌কে। তাঁর কোনো কাজ নেই এবং তিনি পার্থেনন্-শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন ওবরসিয়র। অথচ আজো ফিডিয়াস্-জয়ন্তীতে বহু পণ্ডিত প্রমত্ত। যে সব বিখ্যাত গ্রীক্ ভাস্করদের কোনো কাজ কেউ দেখেনি, তাঁদের দিব্যদর্শক ভক্তদের বিলেন্সকি উপভোগ্য ঠাট্টা করেছেন। এবং কয়েকটী প্রস্তর-ব্যবসায়ী কি রকম উলঙ্গ মূর্ত্তি তৈরি করিয়ে হাতটা বা পাটা ভেঙে মাটিতে রেখে তারপরে গ্রীক নামে বিক্রি করত, তার ইতিহাসও সুখপাঠ্য। তাছাড়া অনেক তথাকথিত গ্রীক্ মূর্ত্তিই নাকি রনেদী রোমানদের ফরমায়েসে করা—মূর্ত্তিটী উলঙ্গ পুরুষ বা মেয়ে হবে, তা নাকি তাদেরই ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করত। এবং তাছাড়া যা গ্রীক্ ভাস্কর্য্যে থাকে, তা direct carving নয়। বিলেন্সকির মতে একেবারে পাথর খোদাই না করলে ভাস্কর্য্য হয় না। কারণ ভাস্কর্য্য হচ্ছে বিয়োগের কাজ, চিত্রকলা বা clay modelling যোগের কাজ। কঠিন প্রতিযোজক বস্তুর সঙ্গে সহযোগিতায় ভাস্কর্য্যের জন্ম। ভাস্কর্য্যের রূপ তাই খানিকটা পাথরের টুকরার মধ্যেই থাকে। গ্রীসে ছিল চিত্রকলারই প্রাধান্য, ভাস্কর্য্যের নয়।

এই গ্রীক্ ভূত মধ্যযুগে য়ুরোপের ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছিল বটে। কিন্তু রেনেশাঁস্ আবার একে আনে। অবশ্য তখনও মাইকেল এন্‌জেলো ছিলেন। কিন্তু মাইকেল এন্‌জেলোর স্বকীয় প্রতিভান্বিত কাজও গ্রীক্ নামে বেচতে হত। এক ব্যবসাদার তো ধরা পড়ে গিয়ে শাস্তিভোগই করে। তারপরে এল রোমান্টিক্ মুখের উপরে ঝোঁক্, এল অসম্পূর্ণতা, শিল্পহীন চরিত্রচিত্রণ। বিলেন্সকির মতে এর চূড়ান্ত হল এপ্‌ষ্টাইনের অসাধারণ প্রতিভায। এপ্‌ষ্টাইনের ব্রন্‌জ্ কাজের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি ঝোঁক দিয়ে, তাঁর পাথরের কাজের উপর বিলেন্সকি অন্যায় করেছেন। যাই হোক্, তারপরে এলেন সত্যকার শিল্পীরা, বিলেন্সকির বন্ধুরা—মুর্, বেড্‌ফর্ড, গদিয়ে, মোদিল্লিয়ানি, জাড্‌কিন্ ইত্যাদি। মাইওল বা ডবসনের শুধু নামোল্লেখ করা হয়েছে—যদিচ তাঁরা মুর বেড্‌ফর্ড্ আদির চেয়ে বেশি সফল, বেশি শক্তিশালী। বোধ হয় তাঁরা বিলেন্সকির বিশেষ বন্ধু নয়। এখানে বলা যাক্—পাছে দর্শক শিল্পাতিরিক্ত গুণে মুগ্ধ হয়, সেই ভয়ে মাইওল্ বা ডব্‌সন্ মূর্ত্তির শরীর বা মুখ বিকৃত গতশ্রী করেন না। এবং পোর্ট্রেট করা যে পাপ নয়, ডব্‌সনের লিডিয়া লোপোকোভা নামে মিসেস্ কেন্‌সের প্রতিমূর্ত্তি দেখেও তা বোঝা যায়।

অবশ্য শিল্প তথা ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বিলেন্সকির সাধারণ মতামতে ভুল নেই। তিনি নিজেই সক্রেটিসের ঘন, বক্ররেখা ও গোলের নিছক্ সৌন্দর্য্যের কথা উদ্ধৃত করেছেন। রাস্কিনও অক্স্‌ফর্ডে একটী স্ফটিক দেখিয়ে তার মধ্যেই ভাস্কর্য্যের প্রধান গুণের কথা বলেন। এড্‌না সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট্ মিলে তো তাই কবিতাই লিখেছেন Euclid alone has looked on beauty bare। আর যদি রেনল্ড্‌সের কয়েকটী কথাও উদ্ধৃত হয়, তাহলেই বিলেন্সকি সাবেককেলে হয়ে পড়েন। অবশ্য চৈনিক, পারসীক, নিগ্রো, সুমেরীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিলেন্সকির সশ্রদ্ধ জ্ঞান আছে। কিন্তু Gudea বা Chertihotep বা অনুরাধাপুরের বুদ্ধমূর্ত্তির পাশে তাঁর বন্ধুদের কাজের ছবি প্রায় অর্থহীন ছেলেমানুষী বল্‌লেই হয়—আধুনিক ভাস্কর্য্যের ছাপ পড়া সত্ত্বেও। অবশ্য দোষ এ সব শিল্পীদের একলার নয়। ভাস্কর্য্য স্থাপত্যেরই প্রধান অঙ্গ। আর স্থাপত্যশিল্প বলে কোনো শিল্পই আজ নেই। তাই আধুনিক কাব্যের চেয়েও আধুনিক ভাস্কর্য্য ভিত্তিহীন ও বাহুল্যময়। অধিকন্তু এই সব শিল্পীরা এপ্‌ষ্টাইনের অসাধারণ দক্ষতাও পান নি। আর পাছে কোনো ভাস্কর্য্যবর্জ্জিত বিশেষত্ব তাঁদের পেয়ে বসে, পাছে জনচৈতন্য তাঁদের কাচের জানলা ভেঙে দেয়, এই ভয়েই এই শিল্পীদের সময় যায়। এই নেতি-র শুষ্ক অভ্যাসেই এঁদের রচনা প্রায়ই ব্যর্থ ও অনেক সময়েই বিরক্তিকর হয়ে পড়ে—বিশেষ করে বিলেন্স্‌কিদের জন্যই। বিলেন্স্‌কি বলেছেন—The modern sculptors have lost faith in the nineteenth century attitude They no longer value contacts with local and individual manifestations of life, they seek comprehension of universal and constant characters divined behind the individual manifestations। সাধু অন্বেষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়ত বা বিশ্বের এই অন্তর্রহস্য ধরবার মতো যথেষ্ট পরিশ্রম এঁরা করেন নি বা সে অধিকার এঁদের নেই। কিম্বা হয়ত সমাজ ও সমসাময়িক মানসিক অভ্যাসের বাইরে গেলেই শিল্প ব্যর্থ হয়। কবিতাতে তো তাই পিওর পোয়েট্রি খুঁজলে এডোয়ার্ড লিয়ারের কাছে যেতে হয়। এবং যে দেশের শিল্পে এঁরা মুগ্ধ ও যার অনুকরণ এঁরা প্রায়ই করে থাকেন, সেই মিশরীয় নিগ্রো ভারতীয়াদি শিল্প কিন্তু বরাবর সমসাময়িক ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মেনেছে।

অবশ্য এ সত্ত্বেও বিলেন্সকির বইটী ভালো লাগে। তাতে শিক্ষাও পাওয়া যায়। কিন্তু অজন্তা ও মহামল্লপুরমে এক জাতের কাজ নেই ও লিঙ্গরাজ মন্দির আছে ভুবনেশ্বরে, ভুবনেশ্বরীতে নয়।

শ্রীবিষ্ণু দে

Texts and Pretexts.—By Aldous Huxley (Chatto and Windus)
Poems and Translations.—By Robin Flower (Constable)
Thirty Poems.—By Nora Nisbet (Basil Blackwell).
A Tale of Troy.—By John Masefield (Heinemann)

সকল দেশেই এক জাতীয় লোক আছে কাজ করিতে না পাইলে যাহারা হাঁপাইয়া উঠে, কর্ম্মবিরতি যাহাদের নিকট অনস্তিত্বের নামান্তর। ভালো হউক, মন্দ হউক, একটা কিছু প্রত্যক্ষগোচর কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেই হইবে, নহিলে সময় বৃথা নষ্ট হইল। এ ধরণের লোকের সাক্ষাৎ পাইলে অলডাস্ হাক্স্‌লি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ্যে জর্জ্জরিত করিতে দ্বিধা করেন না, অথচ "টেক্স্‌ট য্যাণ্ড প্রিটেক্স্‌ট্‌" পড়িতে পড়িতে ভয় হয়, লোকে তাঁহাকেই এই দলভুক্ত ভাবিলে খুব অন্যায় করিবে না। অলডাস্ হাক্স্‌লি কৃতী পুরুষ। বয়স তাঁহার আজও চল্লিশ পার হয় নাই, ইতিমধ্যেই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের উচ্চচূড়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অক্স্‌ফোর্ড হইতে তিনি বাহির হইলেন সাফল্যের ধ্বজা উড়াইয়া। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত করিতে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ উপলক্ষে মায় এ অধম ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত দেখিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত মৌলিক তাঁহার রুচি, তাই তাজমহলের রূপরেখা তাঁহার নিকট ব্যর্থ। চরকা-আন্দোলনের ফলে ল্যাঙ্কাশিয়ারের তন্তুবায়গণের দুর্দ্দশা হইবে, অহিংসা-নীতির প্রবর্ত্তক তাহা বোঝেন না বলিয়া হাক্স্‌লি তাঁহার খর্ব্বদৃষ্টির খর সমালোচনা করিয়াছেন। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, বড়নভেল, ভ্রমণকাহিনী, শিল্পবিচার, সাহিত্য-প্রবন্ধ, দার্শনিক গবেষণা, রচনার এহেন কোন বিষয় আছে যাহাতে তিনি আপন নামাঙ্কিত পুস্তক প্রকাশ করেন নাই? তাই আজ ইংলণ্ডের আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁহারই নাম সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। অবশ্য তিনি এমন কবিতা, বা নাটক, গল্প বা উপন্যাস আজও লেখেন নাই যাহা কবিতা হিসাবে, নাটক হিসাবে, বা গল্প হিসাবে প্রথম শ্রেণীত্বের দাবী করিতে পারে, এমন কোনো দার্শনিক মতবাদের অট্টালিকা গড়েন নাই যাহাতে মানবমনের বর্ত্তমান সমস্যাগুলি যথাযথ সমাধান লাভ করিয়া নির্ব্বিরোধে বিশ্রাম করিতে পারে; রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির এমন কোনো তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেন নাই যাহাতে জাতিবৈষম্য বা সম্পত্তিবৈষম্যের নিরাকরণ হয়। এই স্তরের প্রতিভা হাক্স্‌লির অনায়ত্ত। তাঁহার প্রতিভা ধ্বংসপ্রবণ, অভাবদ্যোতক। বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষ তাঁহার প্রধান প্রেরণা। জীবনে, সাহিত্যে, চিন্তায়, সাধনায় যেখানেই মেকী, অস্বচ্ছতা, অগভীরতা, সংকীর্ণতা আসন পাতিয়াছে, হাক্স্‌লির তীক্ষ্ণসন্ধানী দৃষ্টি সেখানেই আলোকপাত করিয়া তাহাদের অকাম্য কদর্য্যতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান বিত্তসিদ্ধ আত্মতুষ্টির যুগে, গণমনের রঞ্জন-ব্যবসার যুগে, ইহা অত্যন্ত গৌরবের কথা। এ মনোবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনার আকর্ষনী-শক্তি। মনে হয় পরিশীলিত সমাজের আলোচনার এমন কোনো বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান একেবারে তাজা ও নির্ভরযোগ্য নহে। আর লেখার চমকপ্রদ দ্যুতিমান ভঙ্গীতে, পরিহাসের আপাত-নিরীহ রুদ্রতায়, ও বক্তব্যের অনাবৃত স্পষ্টতায় তিনি ইতিমধ্যেই রাসেল বা শ-এর সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কবিতাসংগ্রহ, একটু নূতন ধরণের—an anthology with commentaries। সংগ্রহে ইংরাজী কবিতার সংখ্যাই অত্যধিক, তবে ফরাসী,

ইতালীয়, লাতিন কবিতাব সংখ্যাও কম নহে। এগুলিব ইংবাজী অনুবাদ দেওয়াব প্রযোজন হাক্‌স্‌লি বোধ কবেন নাই, যেহেতু এ ভাষাগুলিব সহিত তিনি পবিচিত। অথচ গ্রীক ও জর্ম্মান হইতে বচন বা শ্লোক উদ্ধাব কবিব'ব সময় মূল না দিযা অনুবাদ দিযাছেন, বোধহয নিজে জানেন না বলিযা। যে হাক্‌স্‌লি এত জিনিস জানেন, এ দুটি বিখ্যাত ভাষা তাঁহাব জানা নাই ইহাতে দুঃখ ও আনন্দ দুইই হয। দুঃখ, তাঁহাব জ্ঞানেব অসম্পূর্ণতায; আনন্দ, তিনিও সীমাবদ্ধ মানুষ ভাবিয়া, যে কথা হাক্‌স্‌লি-উপাসকেবা প্রায়ই ভুলিযা জান। ইংবাজী কবিতা নির্ব্বাচনে হাক্‌স্‌লি পবপদাঙ্কিত মার্গে যাইতে লজ্জা বোধ কবেন, ইংবাজী কাব্য-সমুদ্র হইতে এমন কবিতা-মৎস্য (তাঁহাব স্বকীয উপমা) তুলিতে চান যাহা পলগ্রেভ, কুইলাব-কাউচ ও ব্রিজেস-এব জালে ধবা পড়ে নাই।

স্বীকাব কবিতে হইবে কবিতা হিসাবে বইটি ভালোই হইযাছে। সুপবিচিত কবিব সহিত অপবিচিত কবিব, সুপবিচিত কবিতাব সহিত অপবিচিত কবিতাব স্থান কবিযা দিযা হাক্‌স্‌লি আপন বিদ্যাবিস্তাবেব ও উদাব বসবোধেব পবিচয় দিযাছেন। কিন্তু তাঁহাব বিশ্বাস ইহাতে তাঁহাব হাক্‌স্‌লিত্ব ফুটে না। তাই কবিতা-গুলিকে বিষয়ভেদে প্রায ত্রিশটি গুচ্ছে বিভাগ কবিযা তিনি তাহাদেব উপব নানা মন্তব্য প্রক্ষেপ কবিযাছেন। মন্তব্যেব প্রয়োজনীয়তা তিনি ভূমিকায বিবৃত কবিযাছেন—

In a rapidly changing age, there is a real danger that being well-informed may prove incompatible with being cultivated. To be well-informed, one must read quickly a great number of merely instructive books To be cultivated, one must read slowly and with a lingering appreciation the comparatively few books that have been written by men who lived, thought and felt with style.

In the course of last half century, the conceptions in terms of which men interpret their experience have been altered by science out of all recognition Superficially, therefore, much of the great poetry of the past is out of date But only superficially, for the fundamental experience remains almost unaltered. It is not difficult to decode, as it were, the older interpretations, to translate them into our own terms This is one of the things I have tried to do in my commentaries

এইখানেই তাঁহাব স্পর্দ্ধিত অভীপ্‌সা ও তদনুরূপ সাধনাব স্বল্পতা ধবা পড়ে। এমন নহে যে তিনি কোনো ভালো কথা বা চিন্তাযোগ্য টিপ্পনী কবেন নাই। হাক্‌স্‌লিব কোন লেখাই একেবাবে তুচ্ছ হইতে পাবে না। কিন্তু হাক্‌স্‌লি বলেন, তিনি এই পুস্তকে দিতে চাহিযাছেন সমসাময়িক মনোবৃত্তিব সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ— দান্তে যাহা মধ্যযুগেব বেলায কবিয়া গিযাছেন তাঁহাব "দিভিনা কোমেদিয়া"য, It would have been better, I repeat, to write both poetical text as well as commentaries oneself—a new Divine Comedy,

দান্তেব কবিত্বশক্তি তাঁহাব থাকিলে তিনি নিশ্চয তাহা কবিতেন ; তবে তিনি সবিনয়ে স্বীকাব কবিতেছেন যে সে-শক্তি তাঁহাব নাই। এই হীনতায তিনি লজ্জিত নহেন, যেহেতু বিগত সহস্র বৎসবেব মধ্যে এ শক্তি পাঁচ ছয জন নবনাবী ব্যতীত কাহাবও ভাগ্যে জোটে নাই। অতএব হাক্স্লিব আত্মতৃপ্তি বজায় বহিল। তিনি নির্ভাবনায প্রাচীন কবিতাব সহিত আধুনিক মন্তব্য গাঁথিতে লাগিলেন।

ভুলিয়া গিযাছি কোন দার্শনিক একবাব বলিয়াছিলেন, মূর্খে একঘণ্টায যত প্রশ্ন কবিতে পাবে, জ্ঞানীব্যক্তি সাবা জীবনেও তাহাব উত্তব দিযা উঠিতে পাবেন না। হাকস্লিকে মূর্খ বলাব দুঃসাহস কাহাবও থাকিতে পাবে না, তবু এ বইটি পডিবাব সময বাব বাব সেই কথাটাই মনে আসে। জীবন, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন তোলা হইযাছে, কিন্তু যে স্বতঃবিবোধহীন সুসঙ্গত মীমাংসা সুগভীব সাধনাব ফল, তাহা কোথায ? ভাষাব চোখ-ঝলসানো ছটা তাহাব অভাব পূবণ কবিতে পাবে না। একটা উদাহবণ নেওযা যাক। কাব্যে স্পষ্টতা কাহাকে বলে, ও অস্পষ্টতাব দোষ গুণ লইযা চিবন্তন তর্ক চলিযা আসিতেছে। হাক্স্লি অস্পষ্টতাব বিবোধী— I like things to be said with precision and as concisely as possible অতি সুস্পষ্ট উক্তি; কিন্তু দুঃখেব বিষয তিনি সেই সঙ্গেই জুডিযা দিযাছেন— This does not mean, of course, that I would like all poets to say their say in four line epigrams and the style of Voltaire Certain things (কোনগুলি ? , can only be expressed at considerable length and in terms of the most improbable metaphors, an abracadabra of magic syllables There are occasions when the poet who would write precisely must be (by the standard of text-book prose) obscure and fantastic.। সুতবাং দেখা যাইতেছে, হাক্স্লিব অতি-আধুনিক বিজ্ঞতা সত্ত্বেও, পুবাতন সমস্যা যেখানেই ছিল, সেখানেই বহিযা গেল। সমস্ত বইটি এইরূপ অন্যমনস্ক ও ব্যস্তসমস্তভাবে লেখা। নবযুগেব দান্তেব উপযোগী গ্রন্থ প্রণযন কবিতে চাহিলে গভীবতব সমাহিত সাধনাব প্রয়োজন।

সমুদ্রে জোয়াব-ভাঁটাব মতো সাহিত্যেব বাজাবে তেজী-মন্দী-ব খেলা চলে, একথা সাহিত্যসেবী মাত্রেই জানেন। হাক্সলিব মতে ইংলণ্ডেব বর্ত্তমান কাব্য-বচনায় মন্দা লাগিযাছে। কথাটা সত্য। কাব্যবচনাব পবিমাণ কিছুমাত্র কমিযাছে বলিয়া লাগে না, ববং বোধ হয উত্তবোত্তব বাডিয়াই চলিযাছে ; ইহাও বলা চলে না যে যাঁহাবা লিখিতেছেন, তাঁহাবা সকলেই অকবি। তবু একথা মানিযা লইতে হয, তাঁহাদেব মধ্যে কেহই মুখ্য কবি নহেন, গৌণ কবি। কাব্যে মুখ্য-গৌণেব সীমা বেখা নির্দ্ধাবণ কবা সহজ নহে, অসম্ভব বলিলেই হয। টেনিসন, ব্রাউনিং, বোজেটি, সুইন্বার্ণ, ইঁহাবা মুখ্য কবি কি না, ইহা লইয়া অনন্তকাল তর্ক চলিতে পাবে। কিন্তু ইঁহাদেবও অনুরূপ প্রতিভান্বিত কবি আজকাল ইংলণ্ডে কেহ লিখিতেছেন কিনা সন্দেহ। বহুশতাব্দীব্যাপী কাব্যসাধনাব ফলে ইংবাজীভাষাব সম্পদ এতই বাডিযা গিয়াছে যে অনুপ্রেবণাব অভাব অনাযাসেই শিল্পচাতুর্য্য দিযা লুকানো যায। তাই আজকালকাব কবিদেব বচনা অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও অনেকাংশে উপভোগ্য হইযা উঠিযাছে। এখানে অবশ্য সেই সব কবিব কথা বলা হইতেছে যাঁহাবা উদ্ভট মৌলিকতাব চর্চ্চা কবেন না।

কিন্তু সৃজনী-প্রতিভার স্থান কখনই মার্জ্জন-পরিপাটিত্ব দিয়া পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই ইহাতে যে-তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহার আড়ালে থাকে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা। এই ভাবিয়া দুঃখ হয়, যাঁহারা এত সুন্দর করিয়া বলিতে পারেন, তাঁহাদের বলিবার কথা কেন আরো গভীর, আরো বিশাল হইতে পায় না।

রচনাভঙ্গীতে আপাত-সারল্য ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কত যে বিচিত্র কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাহা মিস্ নোরো নিস্‌বেট্-এর "থার্টি পোয়েম্‌স্"-এর যে কোনোটিতে চোখ বুলাইয়া গেলে বুঝিতে পারা যায়। অথচ ইনি নবীন কবি, এই ত্রিশটি কবিতার গুচ্ছ হাতে করিয়াই কাব্যলোকে ইঁহার প্রথম প্রবেশ-পদক্ষেপ। আশা করা যায়, কালক্রমে ইনি আরো অগ্রসর হইবেন। ইঁহার রচনায় সংযমের দৃঢ়তা ও রুচির সৌকুমার্য্য প্রশংসনীয়। স্বশীল ও স্বেতর—সাব্‌জেক্‌টিভ্ ও অব্‌জেক্‌টিভ্—গীতি-কবিতার এই দুই বিভাগেই তাঁহার কৃতিত্বের উদাহরণ স্বরূপ, দুটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল—

DARK STAR

Lovely are these:—
The morning light on trees,
Blue satin seas
With white embroidered sails,
Moon-drunken Nightingales
Thick honey, dropping slow
Lovely are these
But I was born
Under a strange, dark star,
I am a foamless wave forlorn
Drawn upwards for a space ,
Striving to reach
The moon's untroubled face,
And doomed to die
Defeated by the terror of the sky

THE DEFAULTER.

Dawn through a narrow window steals apace
Spilling cold light upon the sleeper's face.
One hand is flung back and upward, with the fingers
Uncurled as though to seize
Something that fled with night. A shadow lingers,
Like a caress, upon heavy eyes
That mock our busy world with faint surprise

ব্রিটিশ মিউজিয়মের হস্তলিখিত পুঁথি বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ রবিন্ ফ্লাওয়ার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। প্রকৃত পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ, ধীরত্ব। সে গুণ ইঁহার আছে। কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইনি কবিতা লিখিতেছেন, অথচ প্রকাশ করিবার জন্য তাড়াহুড়া করেন নাই। সস্তা ছাপাখানার যুগে এ প্রকাশকুণ্ঠা নিশ্চয়ই সম্ভ্রমের যোগ্য। "পোয়েমস্ এণ্ড ট্রান্‌স্‌লেশনস্"-এর স্বল্পাংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, অধিকাংশই নূতন। ইনি জাতিতে আইরিশ। অনুবাদখণ্ডে ইনি অষ্টম শতাব্দী হইতে

সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন আইরিশ ভাষায় লিখিত গীতিকবিতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে একটি লুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সাহিত্যসেবীগণের নিকট ইহা কম লাভের কথা নহে। অনুবাদপন্থা সম্বন্ধে ইনি বলেন—

Some apology is perhaps necessary for the substitution of simpler English lyrical measures for the intricate and subtly interwoven harmonies of alliteration and internal rhyme in the Irish. But the attempt to borrow these qualities of verse could only end in a mechanic exercise, which might be a metrical commentary, but could not be poetry And to translate poetry by less than poetry is a sin beyond absolution

অনুবাদ করার জন্য ডাঃ ফ্লাওয়ারকে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না বলিয়া বোধ হয়। মূল জানা না থাকায় মূলের প্রতি তাঁহার অনুবাদ কোন অবিচার করিয়াছে বলা যায় না, তবে সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই সুখপাঠ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বিগতযুগের সুপণ্ডিত শিক্ষক উইলিয়ম্ ক্রুবি-র কথা মনে পড়ে, যিনি অনেকগুলি গ্রীক কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'আয়োনিকা়স্'-এ ক্রুবির যে সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, ডাঃ ফ্লাওয়ার তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ক্রুবি-র অনুবাদ ইংরাজী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, এমন কি কাব্যচয়নগ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে। এ সৌভাগ্য ডাঃ ফ্লাওয়ার-এর পক্ষে ভাবা শক্ত।

মৌলিক কবিতাতে ফ্লাওয়ার শক্তির আভাস দিয়াছেন কিন্তু বড় কবি হইয়া উঠিতে পারেন নাই, সাধারণের অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, কিন্তু অসাধারণত্ব তাঁহাকে এড়াইয়া গিয়াছে। বাঙালীর সহিত আইরিশ-এর প্রকাণ্ড মিল, প্রখর দেশাত্মবোধে। তাই ফ্লাওয়ার-এর স্বদেশ-প্রীতি-মূলক একটি কবিতা এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল।

THE PASSAGE.

The dark cliff towered up to the stars that flickered
And seemed no more than lights upon its brow,
And on the slippery quay
Men talked—a rush of Gaelic never-ending
I stepped down to the boat,
A frail skin rocking on the unquiet water,
And at a touch she trembled
And skimmed out lightly on the moonlit seaway.
I lying in the stern
Felt all the tremble of water slipping under,
As wave on wave lifted and let us down
The water from the oars dripped fiery , burning
With a dull glow great globes
Followed the travelling blades A voice rose singing
To the tune of the running water and loud oars
" I met a maiden in the misty morning,
And she barefooted under rippling tresses,
I asked her was she Helen, was she Deirdre?

She answered: 'I am none of these, but Ireland
Men have died for me, men have still to die,'"
The voice died then and, growing in the darkness,
The shape of the Great Island
Rose up out of the water hugely glooming,
And wearing lights like stars upon its brow

আর একটি কবিতায় ফ্লাওয়ার বলিতেছেন তিনি একরাত্রে ঘুমাইয়া পড়েন The Trojan War's Economic Causes নামক বইটি পড়িতে পড়িতে—জানিতে ইচ্ছা করে কার্ল্ মার্ক্স্-এর কোন ভক্ত শিষ্য বইটি লিখিয়াছে, সন্দেহ জাগে হয়ত এ ব্যাপারটা কবিকপোলকল্পিত। ঘুমের ঘোরে—কবিকে স্বপ্নে পাইল।

Then, as the hours of night grew deep
A dream came through the passes of sleep
Of the silly stories of Homer's telling
The press of the ships, the gathering hum,
Iphegeneia dying dumb,
The Greek tents white on the Trojan shore,
Achilles' anger and Nestor's lore,
The dabbled hair of the heroes lying
Mid the peace of the dead and the groans of the dying,
Hector dragged through the battle's lust,
The locks of Priam down in the dust,
Andromache's agony, Ilion's fall
And, over all,
The lovely vision of naked Helen

ভাবিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয় যে তিন হাজার বছর পূর্ব্বেকার এক অন্ধ (?) কবির "silly stories" আজও ইউরোপের কবিচিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এ প্রভাবের প্রতাপ প্রতিপন্ন হয় মেস্‌ফিল্ড্-এর 'এ টেল্ অব্ ট্রয়' পড়িলে। মেসফিল্ড আজ ইংলণ্ডের রাজকবি, কিন্তু তাঁহার কবিযশ বহুদিন হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এরূপ উচ্চপদস্থ কবিও ট্রয়ের আবাল্য পরিচিত কাহিনী লইয়া কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন নাই। হোমার, ভার্জ্জিল, গ্রীক নাট্যকারত্রয় প্রভৃতি মহাকবিগণের সমকক্ষতা কবিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কারণ বিভিন্ন ছন্দে রচিত এগারোটি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা এই ট্রয়-কাহিনী মেস্‌ফিল্ড্ এমনভাবে সাজাইয়াছেন যাহাতে আদ্যোপান্ত গল্পটি বলিয়াও পূর্ব্বগামী কবিগুরুদিগের পুনরাবৃত্তি অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না হয়। যে ঘটনাটিতে মেস্‌ফিল্ড্ সকলের চেয়ে বেশী সময় ও মনোযোগ দিয়াছেন তাহা বোধহয় পূর্ব্বতন কোন কবিরই দৃষ্টি যথেষ্টভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই—অর্থাৎ সেই সুবিখ্যাত কাষ্ঠঘোটকের অনুষ্ঠানটি। ইহার বর্ণনায় তাঁহার উৎসাহের সীমা নাই—ট্রয়-কাহিনীতে ইহা অযথা প্রাধান্য পাইয়াছে। বেশ বোঝা যায়, আজ পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অক্সফোর্ডের প্রান্তস্থ সুরম্য বোর্‌স্ হিলে শান্তশিষ্ট হইয়া বসবাস করিলে কি হইবে, তাঁহার যৌবন-প্রারম্ভের সামুদ্রিক জীবনের চঞ্চলতা ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তা এখনও তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। আর ভাষা, মেসফিল্ড-এর ভাষা এমনই গদ্যধর্ম্মী যে স্বয়ং ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুনিলেও চমকিত হইয়া উঠিতেন। "এ টেল্ অব ট্রয়"-এর আরম্ভ এইরূপ :—

Menelaus, the Spartan King,
Was a fighting man in his early spring,
With a war-cry loud as a steer's bellow,
And long yellow hair, so the poets sing

হোমারের সাগর-গম্ভীর ষট্‌পর্ব্বিকাকে স্মরণ করিলে এ ছন্দ কানে অত্যন্ত লঘু ঠেকে সন্দেহ নাই, মনে হয় ইহা সূর্য্যের পাশে জোনাকির মতো নিষ্প্রভ, তথাপি মেসফিল্ড অকারণে ইহাকে ব্যবহার করেন নাই। তিনি জানেন ব্যালাড্‌-জাতীয় ছন্দের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে গল্পের গতি অত্যন্ত দ্রুত করিয়া তোলা যায়, আর তিনি যে ভুল করেন নাই তাহা প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত যাইবার পূর্ব্বে বোঝা যায় —

But he wearied of war, and longed to bide
In quiet at home by his fireside ,
He wooed and wedded the beautiful Helen
And carried her home to be his bride

And little delight was hers, poor thing,
To be tied till death to the Spartan King,
She moved in a cage of the Spartan court
Like a bright sea-bird with a broken wing.

Paris came from a Trojan glen,
The prince of the world's young famous men,
With a panther's eye and a peacock air,
Even the goddesses wooed him then

He came from Troy to the Spartan port,
He moored his galley · he rode to court
In a scarlet mantle spanged with gold
On a delicate stallion stepping short

Helen and he knew each from each
That a red ripe apple was there in reach,
The loveliest girl and the loveliest lad
Ready to learn and ready to teach

He said, " O Helen, why linger here
With the King your husband year by year?
What life is this to a star like you,
The brightest star in the atmosphere?

O beautiful girl, I love but you,
And a life of love is your rightful due
Come with me over the sea to Troy,
Where Queens shall ride in your retinue."

She said to him, " O Paris, my own,
Since I married him I have lived so lone
That life is bleak as a withered bone,
O take me hence into light and life,
My spirit within me turns to stone "

Then Paris said, " But we will not fly
Like thieves that have heard a step draw nigh
You are the Queen and I am I ;
I'll carry you off to my golden ship
At noonday under your husband's eye "
So it was planned, so it was done,
Paris and she were there at one,
The sentry bribed and the door undone,
With a waiting ship and a rising wind
Helen was off with Priam's son

মেসফিল্ড এ কথা ভোলেন নাই যে সর্ব্বত্র এ ছন্দ সুপ্রযোজ্য নয় ; তাই ভাবভেদে তিনি ছন্দবিভেদ অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। ষট্পর্ব্বিকা ইংরাজী কাব্যে খুব সুপ্রচলিত নয়, অথচ ক্লাইটেম্নেষ্ট্রার উক্তিতে মেসফিল্ড তাহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ দিয়াছেন ;—

I am that Klytaimnestra whom Agamemnon wedded,
Queen of a beautiful land in a city rich in gold
Would that my happy fortune might strike me suddenly dead

কিন্তু মেসফিল্ড তাঁহার কবিত্ব শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখাইয়াছেন এই বইটির পরিশিষ্টে—

Though many died and many fled
To live as beasts do, without bread,
Or home, or bed,

Yet many, like myself, am slave,
Weeping the life the spirit gave
Into the grave

However long our lives may be,
There is no hope of getting free
To such as we.

Swallows will come again, and flowers,
Not Troy, who guarded with her towers
That life of ours

What help in giving way to tears?
To those most hurt by Fortune's spears
A spirit nears

The spirit whom the prisoner knows,
And broken wretches faint from blows,
It comes most close

And though I tread the unknown stair
Up, into Death, I shall not care,
It will be there

ভুবনবিখ্যাত নগরীশ্রেষ্ঠ ট্রয়ের অগ্নি-ধ্বংসের পর বিজিত ক্রীতদাসীকৃত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা রাজকুমারী কাসাণ্ড্রার এই মর্ম্মস্পর্শী খেদোক্তি মানবের ও নিয়তির নিষ্ঠুর হত্যালীলার উপর একটি সকরুণ ভাবঘন প্রশান্তির যবনিকা টানিয়া দেয়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The Letters of D. H. Lawrence (Heinemann)
Apocalypse—By D H Lawrence (Secker)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমসাধ্য সৌখীনতা লরেন্সের পত্রাবলীতে একেবারেই পাওয়া যায় না। লরেন্সের রচনায় যে স্বতঃস্ফূর্তিতে, যে প্রতিভার আয়াসহীনতায় মুগ্ধ হই, সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য পাই এই পত্রাবলীর অনেকগুলিতেই। লরেন্স্ মারা যাবার পর দুটী বই বেরোয়। প্রবন্ধটীতে মানবজীবন ও যীশু সম্বন্ধে যে মনোযোগ ছিল, তা নিছক্ সাহিত্যিক মূর্ত্তি পেয়েছিল The Man Who Died-এ। Apocalypse তারই আরো স্পষ্ট ও যুক্তিপ্রবণ মতামতের প্রচার। মরণাহত লরেন্সের এই শয্যাশায়ী রচনার অসংশোধিত আশ্চর্য্য গদ্য ভূমিকা-লেখক অল্ডিংটনের মতো সবাইকেই অভিভূত করে। ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য জুড়ে যে কি ছন্দ আনা যায় ও কি যুক্তিহীন কাব্যলোক সৃষ্টি করা যায়, তা দেশছাড়া নির্য্যাতিত রোগীর এ শেষ রহস্যোদ্ঘাটনেও পাওয়া যায়। যে প্রতিভা তাঁর সব রচনাতেই অতীতে আমাদের কমবেশি অভিভূত করে'ছ, সেই প্রাণশক্তির আভাস এ দুটী বইয়েও ক্ষণে ক্ষণে পেলুম—যদিচ চিঠিগুলি পেশাদার পত্রলেখকের নয় ও প্রবন্ধটী টীকার সংযত রীতিতেই লেখা।

এ দুটী বই পড়ে আমার মনে হল যে লরেন্স্ সম্বন্ধে মুখ্য বিবেচ্য হচ্ছে এই প্রতিভাই, এই অসাধারণ প্রাণশক্তি ও রূপদক্ষতাই। লরেন্স্ ছিলেন ব্লেকের জাতের। পৃথিবীর ব্লেকেরা, পাস্কালেরা, গান্ধীরা আর যাই করুন, সাধারণ বুদ্ধির, সমাজশোভন স্বাস্থ্যের ধার ধারেন না। তাঁদের মতামতে যে লাভ হয় না, তা নয়। লরেন্স্ বা ব্লেকের মস্তিষ্কহীনতাবাদ আমাদের অনেকেরই জীবনবোধ ধারালো করতে পারে। কিন্তু তাঁদের মতবাদে যেটুকু অনুকরণীয় সে হচ্ছে তাঁদের সঙ্গতির আকাঙ্ক্ষা, জড়চৈতন্য বা প্রাণচৈতন্যের একচ্ছত্রতা স্বীকার নয়। সাধু পল বা গান্ধী যেরকম একদেশদর্শী মাত্রাজ্ঞানহীন, তাঁদের বিপক্ষের নেতারাও তাই। অবশ্য লরেন্স্ নিজেকে ঠকান্ নি—তাঁর মতের পারমার্থিক ও নৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের দায়িত্বও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। স্বীকার করেন নি শুধু তার মানসিক অসম্ভবতাটুকু। ইংরেজি রোমান্টিক্ উচ্ছৃঙ্খলতার শৃঙ্খল লরেন্সের কলমেও জড়ানো ছিল।

অল্ডাস্ হাক্স্লির সানুরাগ শ্রদ্ধা সেইজন্যই লরেন্সের প্রতি উৎসরিত হয়েছিল। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ হিসাবে অগ্রগণ্য হলেও হাক্স্লির মধ্যে ঐ একটু পলীয় ভাব, একটু সেকালের ব্রাহ্ময়ানা, দেহের প্রতি একটু বিতৃষ্ণা গোপন আছে। এবং হাক্স্লি জানেন যে সে ভাব একেবারেই কাম্য নয়। তাই সাদা ও কালোর মতো হাক্স্লি ও লরেন্সের বন্ধুতা। এই বন্ধুতার সব চেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হচ্ছে—পত্রাবলীর ভূমিকা যাতে তিনি লিখেছেন—He might propose impracticable schemes, he might say or write things that were demonstrably incorrect or even, on occasion (as when he talked about science), absurd. But to a very considerable extent it didn't matter. What mattered was always Lawrence himself, was the fire that burned within him, that glowed with so strange and marvellous a radiance in almost all he wrote। এবং ডায়েরির থেকে—"He is one of the few people I feel real respect and admiration for. Of most other eminent people I have

met I feel that at any rate I belong to the same species as they do But this man has something different and superior in kind, not degree" A being, somehow, of another order, more highly conscious, more capable of feeling than even the most gifted of common men। এবং যদিচ লরেন্স্ ছিলেন অতি অমায়িক বন্ধুতাপ্রবণ ও সাদাসিধে মানুষ—তবু To be with him was to find oneself transported to one of the frontiers of human consciousness। এই আশ্চর্য্য বোধশক্তিই, অগোচরজ্ঞানই, কল্পনার এই বাস্তবতাই লরেন্সের রচনাকে ও অনেকাংশে জীবনকে অদ্ভুত করেছে। কারণ লরেন্সের প্রকাশক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

লরেন্সের জীবনীর দ্বারা যে তাঁর সাহিত্যরচনার অর্থ করা যায় না, হাক্স্লির একথা আমিও মানি। এবং লরেন্সের মতো আর্টিষ্টের পক্ষে পারিপার্শ্বিকের ছায়াও যে গৌণ, তাও আমি জানি। (আবেগজীবন্ত কল্পনায়, তীব্র বোধশক্তিতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বহু অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তার প্রখর উপলব্ধিতে তাঁর জীবন চঞ্চল ও রচনা অসামান্য হয়ে উঠেছিলো) লরেন্সের মন ছিল হুইট্‌ম্যানের সেই শিশুর মতো, যে প্রতিদিন পৃথিবীতে নূতন ক'রে চ'লে যেত, যার কাছে বিশ্ব ছিল নিত্য নূতন আবিষ্কার। লরেন্সের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সে আবিষ্কারে শুধু জানার চেনার বিস্মিত আনন্দ নেই, তাতে আছে পরিচিতের অন্তরস্থ রহস্য—সমস্ত কিছুর পরিচয়ান্তের মিলনান্তের the essential otherness, বা বিশ্বের আদি রহস্য। তাই প্রেমের বিস্ময়কর একাত্মতার মতোই, প্রেমের অতিগভীরেও যে দুই চৈতন্যের নগ্ন দ্বৈততা, সেই ভেদরহস্যও লরেন্সকে মুগ্ধ করেছিল। সভ্যতার বিজলীআলোয় এই অমাবস্যার রহস্যময় উপলব্ধি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বুদ্ধির স্পষ্টতায় অভ্যস্ত ও পল্লবগ্রাহী হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আমাদের তাই লরেন্সকে দুর্ব্বোধ্য লাগ্‌তে পারে। বিশেষ করেই লাগতে পারে, কারণ লরেন্সের মতে এই otherness-এর উপলব্ধিতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এইখানেই তাঁর তত্ত্ব, তাঁর নীতি ও সভ্যতাসংস্কারের ভিত্তি। ১৯১৪ সালে গার্নেট্‌কে লেখা এক চিঠিতে এই চৈতন্যলোকের কথাই লরেন্স্ লেখেন—

" but somehow, that which is physic—non-human in humanity, is more interesting to me than the old-fashioned human element, which causes one to conceive a character in a certain moral scheme and make him consistent The certain moral scheme is what I object to In Turgenev, and in Tolstoy and in Dostoievsky, the moral scheme into which all the characters fit—and it is nearly the same scheme—is, whatever the extraordinariness of the characters themselves, dull, old, dead When Marinetti writes 'It is the solidity of a blade of steel that is interesting by itself, that is, the incomprehending and inhuman alliance of its molecules in resistance to, let us say, a bullet The heat of a piece of wood or iron is in fact more passionate, for us, than the laughter or tears of women' —then I know what he means He is stupid, as an artist, for

contrasting the heat of the iron and the laugh of the woman Because what is interesting in the laugh of the woman is the same as the binding of the molecules of steel or their action in heat it is the inhuman will, call it physiology, or like Marinetti, physiology of matter, that fascinates me. I don't so much care about what the woman feels—in the ordinary usage of the word That presumes an ego to feel with I only care about what the woman is—what she is—inhumanly, physiologically, materially—according to the use of the word but for me, what she is as a phenomenon (or as representing some greater inhuman will), instead of what she feels according to the human conception . You mustn't look in my novel for the old stable ego of the character There is another ego, according to whose action the individual is unrecognisable, and passes through, as it were, allotropic states which it needs a deeper sense than any we've been used to exercise, to discover are states of the same single radically unchanged element (Like as diamond and coal are the same pure single element of carbon The ordinary novel would trace the history of the diamond—but I say, 'Diamond, what! This is Carbon.' And my diamond might be coal or soot, and my theme is carbon)" চৈতন্যের এই গভীর স্তরে বারবার আসে অন্যের কঠিন অন্যতা—otherness। এই অন্ধকার নিঃসঙ্গলোক ফ্রেজার্ ও ফ্রয়েড্ পাঠান্তেও কল্পনায় অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে। ভুল বোঝার সে সম্ভাবনা লরেন্স্ও জানতেন। কিন্তু তাঁর শক্তি—হাক্স্লির ভাষায় daimon তাঁকে তবু মুক্তি দেয়নি। আর তিনি বাস্তবিক মুক্তি চান্ নি—নিজের স্বভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্ষমতার জ্ঞানও তাঁর ছিল—যদিও তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন। তাই তিনি বন্ধু গার্নেট্‌কে লিখেছিলেন Sons and Lovers প্রসঙ্গে—It is a great tragedy, and I tell you I have written a great book। নিজের এ বিশেষ শক্তিকে লরেন্স্ বহু বাধা থাকলেও কখনো অপমান করেন নি, করতে পারেন নি। আর্টিষ্ট চরিত্রের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিশে এই অসামান্য দৈবশক্তির ভার তাই লরেন্স কে সারা জীবন ব্যথিত করেছে। কারণ লরেন্সের স্বভাব খুবই বন্ধুতাপ্রবণ, খুবই হৃদ্য। এবং লরেন্সের পরিচিতেরা তাঁর সঙ্গলাভে মুগ্ধই হয়েছেন। কিন্তু লরেন্সের হৃদয়বৃত্তি তবুও অতৃপ্ত। ক্যাথারিন্ কার্সোয়েলকে তিনি যা লেখেন, তা তার নিজের সম্বন্ধেও খাটে— "I think you are the only woman I have met who is so intrinsically detached, so essentially separate and isolated, as to be a real writer or artist or recorder Your relations with other people are only excursions from yourself. And to want children and common human fulfilments is rather a falsity for you,

I think. You were never made to meet and mingle, but to remain intact, essentially, whatever your experiences may be."

কিন্তু হাক্স্‌লি যে ভাবে মারির ঈষদ নাটকীয় Son of Woman-কে উড়িয়ে দিয়েছেন, সে ভাবে বোধ হয় লরেন্সের বাল্যযৌবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর বাড়ীর ছাপ ওড়ানো যায় না। লরেন্স্‌ যে হাক্স্‌লি হলেও হাক্স্‌লির মতো না লিখে লরেন্সের মতোই লিখতেন, একথা হঠাৎ মানা কঠিন। অবশ্য লরেন্সের বিষয়ে এসব মতামত গৌণ। লরেন্সের স্বকপোলকল্পিত বাইব্‌ল্‌-ব্যাখ্যাও আমরা না মান্‌তে পারি। খৃষ্টধর্ম্ম যে মানুষের স্বার্থপরতা ও কর্ত্তৃত্ব-কামনার বেলায় প্রায় চোখ বুজে মানব-সাধারণকে ছেড়ে কয়েকটী সম্ভ্রান্ত-স্বভাব ব্যক্তির আত্মসাধনায় ঝোঁক দিয়েছে; এবং এর ফলে যে পৃথিবীতে দুঃখ অসম্পূর্ণতা ঘৃণ্যতার বন্যা বয়ে চলেছে, তার প্রতি-বিধান যে রক্তাম্বর যথার্থশাসক রাজা (বা মুসোলিনি?) ও ক্ষাত্র আভিজাত্য, এসব তত্ত্ব শিরোধার্য্য না হয় নাই করলুম। বর্ত্তমান য়ুরোপ ছেড়ে অজ্ঞাত ইট্রুরিয়া, অতীত মিশর, অসভ্য মেক্সিকো বা ভারতবর্ষে মুক্তি সন্ধানেরই বা বাধ্যতা কি? লরেন্সের আসল দান হচ্ছে তাঁর কাব্য যার উচ্ছল প্রাণবন্যা শুধু হাক্স্‌লিদের, গার্নেট-দের বা মোরেল এস্‌কিথ্‌কেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, কেম্‌ব্রিজের পরীক্ষাগার থেকে গণিতপূজারী রাসেল্‌কেও বার করেছিল। তাছাড়া এই শ-গান্ধীর মানসিক যুগেও এই আশ্চর্য্য সত্য কথা কেবল মৃতপ্রায় লরেন্সের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিলো— What man most passionately wants is his living wholeness and his living unison, not his own isolate salvation of his "soul" Man wants his physical fulfilment first and foremost, since now, once and once only, he is in the flesh and potent For man, the vast marvel is to be alive. For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive Whatever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty, the marvel of being alive in the flesh The dead may look after the afterwards But the magnificent here and now of life in the flesh is ours, and ours alone, and ours only for a time We ought to dance with rapture that we should be alive and in the flesh, and part of the living, incarnate cosmos I am part of the sun as my eye is part of me That I am part of the earth, my feet know perfectly, and my blood is part of the sea My soul knows that I am part of the human race, my soul is an organic part of the great human soul, as my spirit is part of my nation In my own very self, I am part of my family There is nothing of me that is alone and absolute except my mind, and we shall find that the mind has no existence by itself, it is only the glitter of the sun on the surface of waters (পৃঃ ২২২—৩, Apocalypse).

শ্রীবিষ্ণু দে

The Secret of the Golden Flower (a Chinese Book of Life)—translated and explained BY RICHARD WILHELM with a European Commentary By C G JUNG (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co , Ltd)

চৈনিক ধর্ম্মগ্রন্থেব আলোচনা কবিলে দেখা যায়, ভাবতবর্ষেব ন্যায় প্রাচীন চীনেও যোগসাধনা প্রচলিত ছিল—There exists an esoteric movement, which has devoted itself with energy to the psychological method, that is, meditation, Yoga practice (Wilhelm) —গুরু-পবম্পবাক্রমে চিনা সাধকেবা ধ্যান-ধাবণাদি যোগাঙ্গেব অনুষ্ঠান কবিতেন , এবং তাঁহাদেব সাধনাব সৌকর্য্যেব জন্য যোগ-মার্গেব পথপ্রদর্শকরূপ 'যোগদীপিকা'-সমূহ সঙ্কলিত হইত। 'আই-চিন্' (I Chin) —এই 'Secret of the Golden Flower' যাহাব অনুবাদ—ঐরূপ একখানি দীপিকাগ্রন্থ। উহাব পূবা নাম 'T'ai I Chin Hua Tsung Chih'। আই-চিন্ অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ—ইয়ুং (Dr. Jung) ইহাকে a pearl of great insight বলিযাছেন। ইহা অত্যুক্তি নহে।

এই গ্রন্থ খৃষ্টীয অষ্টম শতকেব শেষভাগে 'তাও'-সাধক (Taoist adept) লু ইযেন (Lu Yen) কর্ত্তৃক গ্রথিত হয। লু ইযেন বলেন ইহা তাঁহাব স্বকপোলকল্পিত নহে—চৈনিক অষ্ট চিবজীবীব অন্যতম সিদ্ধপুরুষ কুযান্ ইন্‌সি (Kuan Yin-hsi) (যাঁহাব আদেশে লাওট্‌জ—Lao Tze—প্রখ্যাত Tao Te Ching সংকলন কবেন)—তিনিই এই আই-চিন্ গ্রন্থেব আদিম উৎস। সে যাহা হউক, গ্রন্থকর্ত্তা নিজ গ্রন্থে প্রাচীনতব Yu Ching, Su Wen, Yin-Fu-Ching, লঙ্কাবতাব সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত কবিযাছেন এবং বুদ্ধদেব, কনফুচি ও লাওট্‌জেব স্পষ্ট নামোল্লেখ কবিযাছেন। বস্তুতঃ এ গ্রন্থ বচিত হইবাব পূর্ব্বেই চৈনিক চিত্তক্ষেত্র মহাযান-বুদ্ধধর্ম্ম, লাওট্‌জেব তাও-ধর্ম্ম ও কন্‌ফুচিব আশ্রমধর্ম্মেব ত্রিবিধ ধাবায অভিষিক্ত হইযাছিল। সুতবাং এ গ্রন্থ ঐ ত্রিবেণীসঙ্গমেব সাক্ষাৎ ফল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এ অমূল্য গ্রন্থ পাশ্চাত্য পাঠকেব অগম্য ছিল। পবে Legge ইহাব অনুবাদ প্রকাশ কবেন। কিন্তু সে অনুবাদ নহে—'হনুবাদ'। সে অনুবাদে মূলেব প্রকৃত পবিচয পাওয়া যাইত না। ঐ বিকৃত অনুবাদ পাঠ কবিযা পাশ্চাত্যেবা এ গ্রন্থকে কতকগুলা ভোজবাজি ও আবর্জ্জনার নিবিড জঙ্গল মনে কবিতেন। অত্রাবস্থায বিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম ১৯২৯ সালেব শেষার্দ্ধে সংক্ষিপ্ত টীকাসহ ঐ আই-চিনেব জার্ম্মান অনুবাদ প্রকাশ কবিযা কেবল বিশেষজ্ঞেব নহে, সর্ব্ব-সাধাবণেব কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। ঐ টীকাসহ বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী (Psycho-analyst) ডক্টব ইযুংযেব European Commentary (পাশ্চাত্য বার্ত্তিক) সংযুক্ত ছিল। ১৯৩০, ১লা মার্চ্চ উইল্‌হেল্‌ম মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাব ঠিক এক বৎসব পবে জার্ম্মান ভাষাভিজ্ঞ কেবি বেনস্ (Cary Baynes) জার্ম্মান হইতে ঐ মূলগ্রন্থ, টীকা ও বার্ত্তিকেব ইংবাজী অনুবাদ প্রকাশিত কবেন। তৎসহ উইল-হেল্‌মেব শোকসভায তাঁহাব বন্ধু উক্ত ডক্টব ইয়ুং যে অভিভাষণ পাঠ কবেন (In Memory of Richard Wilhelm), তাহাবও অনুবাদ সংযুক্ত হয। এ ইংবাজি গ্রন্থ সুধী-সমাজে বেশ সমাদৃত হইয়াছে। অতএব বাঙ্গালী পাঠকেব তৎসহ পবিচয হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ রিচার্ড উইল্‌হেল্‌মের কথা বলি। তিনি মিশনরি-রূপে চিনদেশে বসতি করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু অচির মধ্যে চৈনিক প্রজ্ঞা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। তাহার ফলে তিনি চিনের ধর্ম্মগ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং কেবল চিনা-বিদ্যায় বিশারদ (Sinologue) হন, তা নয়—কিন্তু চৈনিক কৃষ্টির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করেন। (Penetrated deeply into the secret and mysterious life of Chinese Wisdom—Dr Jung)

তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইয়ুং তাঁহার সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন –In that vast territory of knowledge and experience, Wilhelm worked as master of his profession　　　No sooner had he encountered the secret of the Chinese soul than he perceived the treasure hidden there for us

অধিকন্তু উইল্‌হেল্‌ম was an initiate in the psychology of Chinese Yoga, to whom the practical application of the I Ching was an ever renewed experience (Dr Jung) ইহাকেই বলে—যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—এরূপ যোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন আই-চিনের মত গ্রন্থের অনুবাদক হইবার যোগ্যতা কাহার ?

কিপলিং বলিতেন—

> For East is East and West is West
> And ne'er the twain shall meet
>
> —প্রাচ্য-সে প্রাচ্যই রবে, প্রতীচ্য পশ্চিম
> কভু না মিলিবে দুহুঁ কালেও অন্তিম।

উইল্‌হেল্‌ম ইহার প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন— East and West are no longer to remain apart। বস্তুতঃ আদর্শের উচ্চ ভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই বিধাতার অভিপ্রেত—সেই জন্যই তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষ ও সংঘাত ঘটাইয়াছেন। ডক্টর ইয়ুং এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সার কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The European invasion of the East was a deed of violence on a great scale and it has left us the duty—nobblesse oblige—of understanding the mind of the East। তিনি বলেন ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ ঘটিয়াছিল—রোম প্রাচী বিজয় করিয়াছিল বটে—ফলে? What happened when Rome overthrew the near East politically The spirit of the East entered Rome and out of the most unlikely corners of Asia Minor, came a new spiritual Rome। এবারও ইতিহাসের সেই আবর্ত্তনই হইবে—আবার প্রাচ্য প্রতীচ্যকে আপনার অধ্যাত্মশক্তিতে অভিভূত-পরাজিত করিবে। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা ইতিমধ্যেই তাহার লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন—

The spirit of the East penetrates through all our pores and reaches the most vulnerable places of Europe.—Dr Jung.

If we but briefly investigate the fields covered to-day by, what is called, ' occult thought,' (we find) millions of people are included in these movements and Eastern ideas dominate all of them — Cary Baynes

যাঁহারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া প্রাচ্যের প্রজ্ঞাধারা প্রতীচ্যে অবতারণ করাইয়াছেন, রিচার্ড উইল্‌হেলম্‌ তাঁহাদের একজন মুখ্যতম। তাঁহার যোগ্যতার প্রধান নিদর্শন এই যে, প্রতীচ্যসুলভ সঙ্কীর্ণতা ও হঠকারিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। He was able to let the European in himself to slip into the background Towards the foreign culture of the East, Wilhelm displayed an extraordinarily large amount of *modesty*—something unusual in an European। বাস্তবিক শিষ্যভাবে উপসন্ন না হইলে—শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ না বলিলে, প্রাচ্য ভারতী প্রতীচ্যের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত হন না। অথচ সাধারণ প্রতীচ্য মানবের attitude কি? All mediocre minds in contact with a foreign culture, either lose themselves in blind self-deracination or in an equally uncomprehending, as well as presumptuous, passion for criticism (Dr Jung)। রিচার্ড উইল্‌হেলম্‌ এরূপ mediocre mind ছিলেন না—সেই জন্যই তিনি চৈনিক প্রজ্ঞায় নিষ্ণাত হইতে পারিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এত 'পণ্ডা'-বাদ বলা সত্ত্বেও বার্ত্তিককার ডক্টর ইয়ুং পাশ্চাত্য অহমিকার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বার্ত্তিকের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—The aim of my commentary is the effort to build a bridge of psychological understanding between East and West —'আমার বার্ত্তিক রচনার উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বুঝা-পড়ার একটা সেতুবন্ধন করা'। তাহাই যদি হয় তবে তিনি সমস্বরে বলিলেন কেন?—We should do well to confess at once that fundamentally speaking, we do not understand the utter unworldliness of a text like this (I Chin)—indeed we *do not* want to understand it

ইহাকেই বলে—'গোড়ায় গলদ'—ভাষ্য রচনা করিব অথচ মূল বুঝিতে চাহিব না। বাস্তবিক ইয়ুংয়ের European Commentary ভাষ্যও নয়, বার্ত্তিকও নয়—উহা তাঁহার অভিমত 'Unconscious'-এর উপর একটা প্রকাণ্ড প্রবন্ধ। ঐ প্রবন্ধে আত্মমত সমর্থন জন্য ইয়ুং কোথাও কোথাও চিনা গ্রন্থ হইতে মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে কদর্থ বা কষ্ট কল্পনার সাহায্যে ঐ Unconscious-এর থিওরির সহিত তাহার সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। Unconscious বা অব্যক্ত সংবিৎ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির সহিত সুপরিচিত ভারতীয় দার্শনিকের নিকট একেবারেই অভিনব নয়, ইহাকেই ম্যায়ার, লজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা subliminal Consciousness বলিয়াছেন। ঐ 'Unconscious' ডক্টর ইয়ুংয়ের ব্যসন (hobby)—যেমন Repression of sexuality (কাম-প্রচ্ছদ) তাঁহার গুরুকল্প ফ্রয়ডের (Freud) ব্যসন। শিশুকন্যা যখন মাতার স্তন্যপান করে, সেটা তার প্রচ্ছন্ন কামক্রিয়ার অব্যক্ত অভিব্যক্তি! ফ্রয়ড ও ইয়ুং ঐ অব্যক্ত সংবিদ্‌ (Uncons-

cious বা Psyche) সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—সেজন্য আমরা তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞ বটে। ইয়ুং বলিয়াছেন—There can evolve spontaneously out of the Unconscious, contents which the conscious cannot assimilate। ঠিক কথা—কিন্তু পাগলের পাগলামি ও যোগীর যোগবিভূতি কি এক উৎস হইতে উদ্ভূত? ঐ subliminal consciousness ছাড়া জীবের যে একটা supraliminal consciousness আছে—যে সংবিৎ কলাবিদের কলাসিদ্ধিতে এবং ধ্যানীর সমাধিতে অভিব্যক্ত হয়—একথা বোধ হয় ইয়ুং এখনও আবিষ্কার করেন নাই। ইংরেজ অনুবাদক কেরি বেনস্ যথার্থই বলিয়াছেন—Much has been taught him in recent years about the hitherto unsuspected elements in his psyche, but the emphasis is all too often on the static side alone, so that he finds himself possessed of little more than an inventory of contents। আমরা জানি, প্রত্যেক জীবের অভ্যন্তরে অব্যক্ত শক্তিপুঞ্জ নিহিত আছে—ঐ শক্তিসমূহের অভিব্যক্তিই প্রকৃত যোগ (Development of the powers latent in man)। বেনস্ একথা লক্ষ্য করিয়াছেন—He contains within his psyche a store of unexplored forces, which, if rightly understood, would give him a new vision of himself and help safeguard the future for him। এজন্য যোগপ্রণালীর গভীর অনুশীলন এবং আই-চিনের মত যোগদীপিকার প্রগাঢ় অনুধাবন আবশ্যক। ইয়ুংয়ের বার্ত্তিকে কিন্তু ঐরূপ অনুশীলন ও অনুধাবনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইয়ুং বলেন—The Western man is innocent of his own apparatus। ভারতীয় ও চৈনিক যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে এ অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হইতে পারে। ইয়ুং আরও বলেন—We veil from ourselves our real human nature with all its dangerous, subterranean elements and its darkness।—সেই subliminal consciousness-এর কথা। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন 'আসুরী সম্পৎ' ছাড়া জীবের কি দেবী সম্পৎ নাই—lifegiving empyrean elements নাই—যাহাকে আমরা supraliminal consciousness বলিলাম? যাহার জ্যোতিঃ ঐ অন্ধতমস ভেদ করিয়া ধ্যানধারণা-সমাধিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)।

ইয়ুং সারা জীবন 'Practice of Psychiatry and Psychotherapy' করিয়াছেন (ইহা তাঁহার নিজ মুখের কথা)।—যাঁহার কেবল Pathology-র সহিত পরিচয়, যিনি Anatomy চর্চ্চা করিবার সুযোগ পান নাই—তিনি যে দেহবিজ্ঞান আংশিক ভাবেই জানিবেন ইহা বিচিত্র নহে। অতএব ইয়ুংয়ের ঐকদেশিক দৃষ্টির কাছে যদি যোগের প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিভাত না হইয়া থাকে তাহাতে আমরা বিস্মিত হইব কেন?

ইয়ুং লিখিয়াছেন—The art of letting things happen, action in non-action, letting go of one-self became a key to me, with which I was able to open the door to the 'way.' The key is this We must be able to let things happen in the psyche . Consciousness is for

ever interfering, helping, correcting and negating, and never leaving the simple growth of the psychic processes in peace। অতএব কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? Allow the psychic processes to go forward without interference—to put aside the activity of the conciousness। এই যে wise passivity—উদাসীন নির্যোগ—ইয়ুংয়ের মতে ইহাই প্রকৃত যোগ এবং ইহাই আই-চিন্ গ্রন্থকারের অনুমোদিত! এই প্রণালীর প্রয়োগ করিয়া তিনি নাকি অনেক মনোরোগীকে নীরোগ করিয়াছেন—This detachment is an effect which I know very well from my professional practice; it is the therapeutic effect par excellence, for which I labour with my students and patients। কিন্তু মনোরোগী—বিশেষতঃ মনোরোগিণীর পক্ষে যাহা সুব্যবস্থা, ধ্যানী-যোগীর পক্ষেও কি তাহাই?—চৈনিক ও ভারতীয় যোগশাস্ত্রে দেখা যায় যে, চিত্তকে পরিকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে * এবং পৌরুষ ও প্রযত্ন দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে—পৌরুষেণ প্রযত্নেন লম্ভনীয়া শুভে পথি। বস্তুতঃ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ জন্য যে শুভ ও সার্থক উদ্‌যোগ, তাহাই 'যোগ'। এজন্য যমনিয়ম চাই, অভ্যাস বৈরাগ্য চাই। আই-চিন্ গ্রন্থে Laziness and Distraction ক্ষালন জন্য এ সম্পর্কে বহুবিধ উপদেশ আছে।† আরও চাই আসন (Sit like a withered tree before a cliff—sit quietly with upright body and fix the heart in the centre —I Chin), চাই প্রাণায়াম (In order to steady the heart one begins by cultivating the breathing power . . But the deeper secrets cannot be effected without making the breathing rhythmical —I Chin),—চাই প্রত্যাহার—আবৃত্তচক্ষুঃ হওয়া—('If one closes the eye and reversing the glance directs it inward . . Only when one looks and harkens inward, does the organ nor go outward nor sink inward — I Chin), চাই ধারণা—one-pointedness—(When you fix your heart on one point, then nothing is impossible for you —I Chin), চাই ধ্যান (Meditation)—প্রত্যয়ের একতান প্রবাহ (If for a day you do not practise meditation, this light streams out who knows whither?—I Chin) এবং সর্ব্বশেষ চাই সমাধি—(The Light is contemplation Fixation without contemplation is circulation without Light. Fixating contemplation is indispensable, it ensures the strengthening of illumination)

এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে ইয়ুং বড় চিত্তক্ষেপ করেন নাই—তাঁর preoccupation—মনোনিবেশ—ঐ Unconscious লইয়া। ঐ অধমতারণ Unconscious-এর সাহায্যে তিনি সমস্ত জগৎসমস্যার সমাধান করিতে চান। তাঁহার মতে যোগ একটা

*It is the washing of the heart and the purification of the thoughts, it is the bath —I CHIN

†The veil of *Maya* cannot be lifted by a mere decision of reason, but demands the most thorough-going and wearisome preparation, consisting in the right payment of all debts to life

abnormal psychic condition Our way begins in European reality and not in Yoga practices, which would only serve to lead us astray as to our own reality *

আই-চিনের গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যোগবিদ্যা রহস্য রাখিতে হইবে—'গোপ্যা কুলবধূরিব'—'Disciples! Keep it secret and hold to it strictly!' 'Make the Light circulate· that is the deepest and most wonderful secret' সেইজন্য তিনি অনেকস্থলে 'সন্ধ্যা'-ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন—যাহা বহির্দৃষ্টিতে হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। 'Red blood becomes milk The fragile body of the flesh is sheer gold and diamonds' 'In the purple hall of the city of jade, dwells the god of utmost emptiness and life' 'Create an immortal body by melting and mixing.' 'The Heavenly Heart lies between sun and moon' 'Look at the end of your nose'—(সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং—গীতা)—'Fix on the point which lies exactly between the two eyes' (ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্—গীতা)। ইয়ুং এ সকলের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিবেন কি করিয়া ?

প্রাচ্য প্রজ্ঞার মর্ম্মজ্ঞ হওয়ার পক্ষে ডক্টর ইয়ুংয়ের প্রবল বাধা তাঁহার superiority-complex (তাঁহার গরিমা-গ্রন্থি)। উইল্‌হেল্‌মে আমরা যে বিনীত শিষ্যভাব প্রত্যক্ষ করি, ইয়ুংয়ে তাহার অত্যন্ত অভাব। তাঁহার ঔদ্ধত্য প্রাচ্য পাঠককে পীড়া দেয়। দুই একটা নমুনা দেখুন—'Measured by the Western intellect, Eastern intellect can be described as childish' (অথচ অধ্যাপক Cowell-এর মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই intellect-এর পুষ্পফল দেখিয়া বলিয়াছেন—It makes the 'European head dizzy!')—'The East came to its knowledge of inner things with a childish ignorance of the world' 'There could be no greater mistake than for a Westerner to take up the direct practice of Chinese Yoga'। (অথচ তাঁহার বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম ঐ যোগসাধনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন)। কোন কোন প্রাচ্যের অন্তরে যেমন লঘিমাগ্রন্থি (Inferiority-complex) খুব প্রকট—তাঁহারা প্রাচ্য দেশের কোন কিছু ভাল ভাবিতে পারেন না,—তেমনি ইয়ুংয়ের মত পাশ্চাত্যের অভ্যন্তরে ঐ গরিমা-গ্রন্থি। উহা এত জটিলভাবে জড়িত, যে তাঁহারা চেষ্টা সত্ত্বেও উহার প্রভাব এড়াইতে পারেন না। তাই ইয়ুং স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছেন—We will investigate the psyche and its depths by a tremendously extensive historical and scientific knowledge We are already building up a psychology to which the East found entrance only through abnormal psychic conditions

---

* এ কথার অর্থ কি ? Western way জুদা হইল কিরূপে ? ইয়ুং ত নিজেই বলিয়াছেন—The psyche possesses a common substratum × × As a common human heritage, it transcends all differences of culture and consciousness and does not consist merely of contents capable of becoming consciousness, but of latent dispositions toward identical reactions (p 83)

সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বুদ্ধির বড়াই। অথচ বার্গসঁ, অয়কেন প্রভৃতি পাশ্চাত্যেরাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বুদ্ধি (Intellect) চরম সত্য নির্দ্ধারণে অপারগ। ইহার সম্বল—তর্ক, যুক্তি, ব্যাপ্তিজ্ঞান—তত্ত্বের তুঙ্গভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। সে জন্য বুদ্ধির পর বোধি চাই—Intellect-এর উপর Intuition চাই। ঐ বোধি যোগসাধনাসাপেক্ষ—উহা বিজ্ঞান-বামনের অধিগম্য নহে।

ইয়ুং নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন—Intellect does in fact violate the soul, when it tries to possess itself of the heritage of the spirit. It is in no way fitted to do this (p 81)

বিজ্ঞানের প্রয়োগ নাই, তা নহে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যেমন বুদ্ধির উপর বোধি—তেমনি বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান—প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুযাৎ। Scientific method must serve it errs when it usurps a throne . . It is not the only way of comprehending—(Dr Jung).

অর্থাৎ বিজ্ঞানের স্বধর্ম্ম প্রজ্ঞানের অনুচর হওয়া—যে দাস, সে যেন প্রভুর আসন অধিকার না করে। এ প্রসঙ্গে কেবি বেনস্ বেশ কথা বলিয়াছেন—We have to see that the spirit must lean on science as its guide in the world of reality and that science must turn to the spirit for the meaning of life

যোগশাস্ত্রের প্রচারকেরা ঠিক ইহাই করিয়াছেন—যোগ অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিক কোন কিছু নহে—It is rigidly scientific—ইহার ভিত্তি মনোবিজ্ঞানের সুদৃঢ় তথ্যের উপর প্রোথিত—তবে উহা psychic মাত্র নহে—যোগ metapsychic—অতি-বিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রজ্ঞান। ইয়ুংয়ের কথায় বলি—It does not consist of sentimental, exaggeratedly mystical, institutions, bordering on the pathological and emanating from ascetic recluses and cranks, the wisdom of the East is based on practical knowledge coming from the flower of Chinese intelligence, which we have not the slightest justification for undervaluing (p 78).

এই যোগের লক্ষ্য কি? আই-চিন্ বলেন, ইহার লক্ষ্য 'তাও'-সিদ্ধি। তাও (Tao) কি? It is the undivided One—It is that which has nothing above it (যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ) —It is the fixed pole in the whirl of phenomena (অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ), It is that which exists through itself—the final world principle, the primordial spirit (পরিভূঃ স্বয়ংভূঃ)—the creative Light, the Light of Heaven, the Light of the Essence (জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ)—এক কথায় বেদান্তের ব্রহ্ম। It is that land that is no-where, which is our true home—তদ্ধাম পরমং মম—তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ব্রহ্মের মত তাও-ও দেশকালের অতীত—' Overcomes time and space.' ' It is incorporeal space where a thousand and ten thousand places are one place . . It is immeasurable time when all the æons are

like a moment—কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনী—নিমেষঃ কশ্চ কল্পঃ স্যাৎ। The 'Tao,' though motionless (অনেজদ্ একং), is the means of all movement and gives it law—যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ। স্যৎ ও ত্যৎ, রয়ি ও প্রাণ, জীব ও জড়, প্রকৃতি ও পুরুষ যেমন ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার (modes of manifestation)—Yang-Yin, Hsing-Ming, Kun-Chien, Hun-Po অর্থাৎ Logos-Eros, Animus-Anima, Essence-Life, পুং-স্ত্রী—ঐ তাওর bipolar phenomena এবং তাও spirit ও matter-এর দ্বন্দ্বমুক্ত একাকার অদ্বৈত তত্ত্ব—যিনি ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। যিনি যোগসিদ্ধ—'he penetrates the magic circle of polar duality and returns to the undivided Tao.' অতএব তাও-সিদ্ধি ও ব্রহ্মসাযুজ্য একই কথা—ইহাই প্রকৃত 'শূন্যতা'-সাধন। 'The Confucians call it the centre of emptiness, ... and in our Taoism the expression is 'to produce emptiness'। ইহাই বুদ্ধদেবের—সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো—(ধম্মপদ)

আই-চিন্ গ্রন্থের পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, গ্রন্থকার অনেক স্থলে 'The backward-flowing movement of the life forces -এর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—" The meaning of the Golden Flower depends wholly on the backward-flowing method. If it is not allowed to flow outward but is led back by the force of thought, so that it penetrates the crucible of the creative and refreshes heart and body and nourishes them, that also is the backward-flowing method. Therefore it is said The meaning of the Elixir of Life depends entirely on the backward-flowing method This is the sublimation of the seed into power. If we reflect on this, we see that the ancients really attained long life by the help of the seed-power present in their own bodies, and did not lengthen their years by swallowing this or that sort of elixir But worldly people lose the root and cling to the tree top. . . The fool wastes the most precious jewel of his body in uncontrolled pleasure, and does not know how to conserve the power of his seed . . The seed that is conserved is transformed into power, and the power, when there is enough of it, makes the creatively strong body "

ইহাকেই এদেশে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া বলে। আমরা মানব অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ কিন্তু পাদপেরা ঊর্দ্ধস্রোতঃ। মানবকে যোগের দ্বারা ঊর্দ্ধস্রোতঃ হইতে হইবে। তখন তাহার রেতঃ ওজে পরিণত হইবে। ইহাকেই পতঞ্জলি কায়সম্পৎ বলিয়াছেন। কায়সম্পৎ কি ?

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ—৩।৪৬

রেতঃ ওজে পরিণত হইলে কেবল যে, দেহ বজ্রের মত দৃঢ় হইবে তাহা নহে, শরীর হইতে একটা ছটা বিচ্ছুরিত হইবে। উইল্‌হেল্‌ম্ তাঁহার টীকায় এই লাইটের কথা বলিয়াছেন কিন্তু এই সম্পর্কে চিনা গ্রন্থের সহিত ভারতীয় গ্রন্থের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা লক্ষ্য

কবেন নাই। চৈনিক বিগ্রাতে তিনি বিশাবদ ছিলেন কিন্তু যতদূব বুঝা যায় হিন্দু প্রজ্ঞাব সহিত তাঁহাব ঘনিষ্ঠ পবিচয় ছিল না।

আব একটি বিষবেব প্রসঙ্গ কবিয়া এই আই-চিনেব পবিচয় শেষ কবিব। সেটি spirit-fire-এব উজ্জ্বলন এবং ঐ বসায়ন দ্বাবা শবীবেব নবীকবণ (Rejuvenation)। এই চৈনিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেকবাব উল্লেখ আছে। " This influence is intended to strengthen, rejuvenate and normalise the life processes . If this method of ennobling is not applied, how will the way of being born and dying be escaped? . . . Only after the completed work of a hundred days will the Light be real, then will it become spirit-fire The circulation of the light is the epoch of fire . . The heart is the fire, the fire is the Elixir."

ইহাকেই আমবা এদেশে কুণ্ডলিনীব জাগবণ বলি। মূলাধাব হইতে উত্থিত হইয়া এই ত্রিবলীরূপিনী Serpent-fire মেরুদণ্ডেব সুষি (Canal) পাব হইযা ষট্‌চক্র ভেদ কবিযা সহস্রাবে সদাশিবেব সহিত সঙ্গতা হন। ইহাই কঠোপনিষদেব নাচিকেত-অগ্নি। যিনি ত্রিনাচিকেতঃ হন তিনি, 'তবতি জন্মমৃত্যু'—তাঁহাব যোগাগ্নিময় শবীব হয এবং তিনি জবা, বোগ ও মৃত্যুব অতীত হন।

ন তস্য বোগো ন জবা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শবীবম্॥

আধিভৌতিক দিক্ হইতে যোগসিদ্ধ পুরুষেব এই অবস্থা হয। আব আধ্যাত্মিক দিক্ হইতে? আই-চিনেব ভাষায বলি, " Then the Golden Flower begins to bud Eternal is the Golden Flower which grows out of inner liberation from all bondage to things —That Golden Flower blooms in the purple hall of the city of jade The Heavenly Heart rises to the summit of the creative, where it expands in complete freedom Then one has the ability always to react to things by reflexes only Then body and heart are completely controlled and one is quite free and at peace, letting go all entanglements, untroubled by the slightest excitement, with the Heavenly Heart exactly in the middle

ইহাকেই আই-চিন্ "action in inaction" বলিযাছেন—গীতাব শাবীবং কেবলং কর্ম্ম। ইয়ুং ইহাকে " reunion with the laws of life represented in the unconscious" বলিয়াছেন। সে অবস্থায "Instead of being in it, one is above it।" * ইহাই প্রকৃত নির্দ্বন্দ্ব হওযা—The union of the opposites on a higher level of consciousness। এইরূপ দ্বন্দ্বাতীত

---

*What, on a lower level, had led to the wildest conflicts and to emotions full of panic, viewed from the higher level of the personality, now seemed like a storm in the valley seen from a higher mountain top —DR JUNG, p 88

পুরুষ "outgrows, that is, raises the level of consciousness to a higher plane।" ইহাকেই সাংখ্যেরা বলেন—প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ। তখন তিনি সাক্ষী দ্রষ্টা মাত্র হন, কর্ত্তা বা ভোক্তা থাকেন না। ইহাই জীবন্মুক্তের দশা। যিনি জীবন্মুক্ত—তাঁহার আই-চিন্ বা কনক কমল পূর্ণ বিকশিত।

এই Golden Flower বা কনক কমল কি? It is the immortal spirit body—the Heavenly Heart, terrace of life, the light of Heaven—উপনিষদের হৃৎপদ্ম বা দহরাকাশ। তদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। এই যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-গৃহ ইহাই ব্রহ্মের পরম আলয়—যদন্তরা তদুপাসিতব্যম্ (ছান্দোগ্য)। কারণ, হৃদি অয়ম্—সেই জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ঐ কনক কমলে নিত্য বিরাজিত আছেন।

হৃৎপদ্মকোশে বিলসৎ তড়িৎপ্রভম্।

'The Golden flower is the Light and the Light of Heaven is *Tao*'.

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমরা :—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কয়েকটা নতুন কবিতা
একটী কথা :—বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটী নতুন কবিতা

দুটীই গ্রন্থকারমণ্ডলীর তরফ থেকে বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা প্রকাশিত ও এম্, সি, সরকারের দোকানে প্রাপ্তব্য। প্রত্যেকটীর দাম চার আনা।

প্রকাশকদের অনুগ্রহ থেকে কবিতাকে (যা বাংলা দেশে চলে না) বাঁচাবার জন্যে এই দুই বিখ্যাত কবি ও তাঁদের আরো কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধু মিলে গ্রন্থকারমণ্ডলী করেছেন। উদ্দেশ্য—প্রকাশকের ব্যবসাদারী চাল ছেড়ে শুধু সাহিত্যিক কারণে ও অতি সস্তায় বই বার করা। বুদ্ধদেব বাবুর "বন্দীর বন্দনা" ও অচিন্ত্যবাবুর "অমাবস্যা" পাঠে তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, সে ধারণা অসম্পূর্ণ। মাসিক পত্রিকায়ও তাঁদের অজস্র কবিতা আছে। "একটী কথা", "বন্দীর বন্দনা"-র কবিতা থেকে স্বতন্ত্র এবং "আমরা" ও অমাবস্যা"র কোনো মিল নেই। ভবিষ্যতে এই গ্রন্থধারায় আরো বই বেরোবে। আশা করি আপাততঃ কাব্যামোদীরা গ্রন্থকারমণ্ডলীর এই সুলভ বই দুটী কিনে, পড়বেন। বই দুটীর পুনর্মুদ্রণ হবে না। এবং কবি দুজন তো পরিচিত।

শ্রীবিষ্ণু দে

Hitler—By Emil Lengyel (George Routledge & Sons)

হেলীর ধূমকেতু যখন আকাশে প্রথম দেখা গিয়েছিল, তখন তার উজ্জ্বল পুচ্ছের বহর দেখে পৃথিবীর অনেকেই ভেবেছিলেন যে আরও কাছে এলে সেই লেজের ঝাপটে পৃথিবী একদিন চুরমার হয়ে যাবে। সন্ধিক্ষণ পার হয়ে যাবার পর দেখা গেল যে সে পুচ্ছ বাষ্পগুচ্ছ বই আর কিছুই নয় এবং সেটি পৃথিবীর ধাক্কায় দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে অতিসৌরলোকে অনির্দ্দেশ যাত্রা সুরু করেছে।

জার্ম্মানীর রাজনৈতিক আকাশের এই বর্ত্তমান জ্যোতিষ্কটিকে Dr. Lengyel ভাষায় না হোক অন্ততঃ ভাবে ধূমকেতুর পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে Hitler-এর প্রবর্ত্তিত নাজীমতবাদের মূলে গঠনমূলক বা প্রগতিশীল পরিবর্ত্তনের লেশমাত্র নেই। নাজীমতবাদ অন্তঃসারশূন্য—তার মূলে আছে, জাতিগত দ্বেষ এবং দাম্ভিকতা। ঋণপীড়িত, হৃতসর্ব্বস্ব ও বন্দী জার্ম্মানীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বাস্তবতার কঠিনস্পর্শে নাজীমতবাদের ধূমপুচ্ছ বেশী দিন অবিভক্ত থাকবে না এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই এই ধরণের ছেলেভুলানো মতবাদের যা পরিণতি হয়ে থাকে তা লাভ করবে।

টিউটন্ আজ আত্মহারা। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে চৈতন্য ও চিন্তাধারা তার জীবনকে প্রণোদিত করেছিল আজ আর তা কার্য্যকরী নয়। সেগুলির মূলে ছিল তখনকার জার্ম্মানীর বিরাট শক্তি এবং উদ্দীপ্ত ও জীবন্ত সাম্রাজ্যবাদ। সে শক্তির মূলোচ্ছেদ করেছে টিউটনের জাতিশত্রু এবং জ্ঞাতিশত্রুর দল; আর সে উদ্দীপ্ত সাম্রাজ্যবাদের মূলে বিষপ্রয়োগ করেছে জার্ম্মানীর বিভিন্ন সাম্যপন্থী জনমণ্ডলী। তাই আজ জার্ম্মানী Bismarck-কে ফিরিয়ে চাইলেও পাচ্ছে মাত্র Hitler-কে; আজ সে অতিমানুষের প্রার্থনা করে, উত্তরে পাচ্ছে বনমানুষ। তার কারণ, গোবরে পদ্মফুল ফোটে না।

দুর্ব্বহ কর এবং দুস্তর ঋণের ভারে জার্ম্মানী আজ মুমূর্ষু। Hitler আশ্বাস দিয়েছেন, "বিদেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক চাপিয়ে আভ্যন্তরিক কর কমার; ঋণ বা সুদ শোধ করব না; চাইলে লড়ব।" তাই আজ জার্ম্মানী আশার নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

গত মহাযুদ্ধের সমস্ত গ্লানি এবং পরকালীন অপমান জার্ম্মানীর উপরে চাপান হয়েছে, টিউটন্-গর্ব্ব আজ আহত; নিজ দৌর্ব্বল্যে ক্ষুব্ধ। হিট্লারের বাণী—"চাইলে লড়্ব"—তার মৃতপ্রায় আত্মাভিমানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই নাজীদলের এই সংখ্যাপুষ্টি।

সুদ ও ঋণ ধনবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। য়িহুদিরা গত যুদ্ধে উভয়পক্ষেই প্রচুর অর্থলাভ করেছে, তারাই টাকা দিয়ে লড়াই চালিয়েছিল। তারা সুদ এবং রক্তপাত উভয়ের জন্যই দায়ী। Hitler বলেন, "অতএব য়িহুদিপীড়ন করো।" জার্ম্মানী সমর্থনসূচক ঘাড় নেড়ে বলে, "হাঁ, তাই করবো; কারণ সুদ ও ঋণ শোধ দেবার শক্তি আমাদের নেই।" এ-সমস্ত কথাই ধনবাদের প্রতিকূল, অথচ Hitler প্রকাশ্যে ধনিকতন্ত্রের শত্রু নন। শোভিয়েটবাদ তাঁর দুই চক্ষের বিষ। তাঁর মতে ধনবাদ ভাল যতক্ষণ সে ধনভার নর্ডিক জাতির উপর ন্যস্ত আছে; য়িহুদীর অর্থ জার্ম্মানীকে সর্ব্বনাশের পথে চালিয়েছে।

Hitler-এর অনুগত নাজীদলের সংখ্যাধিক্যের কারণ দেখিয়েছেন Lengyel উপরের যুক্তিগুলি দিয়ে। কিন্তু Lengyel বলেন, জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অবস্থায় বহিঃসাহায্য ভিন্ন লড়বার সামর্থ্য নেই, এবং বিদেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক চাপালে সে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা দুরাশায় পরিণত হবে।

ফলকথা Lengyel বলতে চান যে Hitler একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ, সে ধাপ্পাবাজি আজও রাষ্ট্রশাসনরথ টানার কাজে প্রযুক্ত হয়নি ব'লে তার স্বরূপ ধরা পড়েনি; অতএব সাধু সাবধান। Hitler-কে লোকচক্ষে ভুল বোঝাবার জন্যই হয়ত Lengyel-এর লেখা জীবনী সৃষ্টি হয়েছে। Hitler সমাজপন্থী এবং য়িহুদিদের উপর খড়্গহস্ত, যদিও হাতে তাঁর খাঁড়া নেই এবং Lengyel-এর মতে কখনো আসবেও না। খৃষ্টানদের প্রতিও Hitler যে সুপ্রসন্ন নন্ তার প্রমাণ তিনি Ludendorf-এর সহযোগী এবং Ludendorf চান প্রাচীন টিউটনদের পৌত্তলিকতার প্রত্যাবর্ত্তন। Hitler-এর সাম্যপরিপন্থিতা, য়িহুদি ও খৃষ্টান বিদ্বেষ, সোভিয়েটভীতি প্রভৃতির একটাকেও সুনজরে দেখেন না বলেই Lengyel হয়তো এই জীবনী নিরপেক্ষভাবে লিখতে পারেন নি। জীবন্ত সমসাময়িকের নিরপেক্ষ জীবনী শুধুচোখে লেখা দুরূহ; অথচ এভাবের রাজনৈতিক অনুবীক্ষণযন্ত্র চোখে লাগিয়ে তার সহজ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়।

রাজনৈতিক মতবাদের ভাঙ্গাগড়া আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়েই চল্‌ছে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ তার নিজের মতে পৃথিবীকে নতুন এবং সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে অথবা পারবে না, একথা জোর গলায় হেঁকে বলা বিপত্তি ও আপত্তিজনক, ঐতিহাসিক রীতিবিরুদ্ধ তো বটেই। আরও বিশেষ যখন এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি এখনও পর্য্যন্ত এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পায়নি যার ব্যবহার বা অপব্যবহারের দ্বারা সে জার্ম্মানীর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

একটা সন্দেহ স্বতঃই মনে জেগে ওঠে। Hitler-এর রাজনৈতিক মতগুলি বিশেষ ক'রে ফ্রান্স্ ও আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত। বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রচাররীতির খুব প্রচলন হয়েছে। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বহিঃ ও অন্তর্সঙ্কটের নিরাকরণের একমাত্র উপায় মনে হয় বিস্‌মার্ক-প্রবর্ত্তিত যুগে ফিরে যাওয়া; গায়ের জোরে বাহিরের দাবী নাকচ করা এবং গায়ের জোরেই সেই ভাবে আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা এবং ঐক্য স্থাপনা করা যে ভাবে এক তথাকথিত চৈনিক রাজা তাঁর রাজ্য হতে ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ করেছিলেন। Hitler-এর সাফল্য নির্ভর করছে নাজীদলের সংখ্যার উপর এবং তাদের সমবেত শক্তির উপর। তবে কেন Lengyel হিট্‌লারের আশুপতনের ব্যগ্র বায়সবাণী করলেন? সন্দেহ হয়!

তবু বইখানি উপভোগ্য হয়েছে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, গ্রাম্য জীবনাদি, মূল চরিত্রের বিশেষত্ব ও ঘটনাবলী আঁকার ফাঁকে ফাঁকে, নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হিট্‌লারের বিরুদ্ধে প্রচার হিসাবে লেখকের এ বিষয়ে দক্ষতার প্রশংসা করতে হবেই। তবু নিরপেক্ষ ভাবী ঐতিহাসিক এরই ভিতরে অনেক উপযোগী মালমশলা পাবেন।

Hitler রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে যখন Landsberg-এর দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময়ের লেখা Mein Kampf-এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু তত্ত্ব

পাওয়া যায়,—কিন্তু' সম্পূর্ণ বোধগম্য ভাবে নয়। Dr. Lengyel-এর বইখানি Hitler-বিরোধী হলেও, Mein Kampf-এর পাশাপাশি পড়লে সম্ভবতঃ হিট্‌লার-স্বজীবনীর অবোধ্য অংশগুলি সরল হয়ে আসে।

Mein Kampf-এর অসাধারণ কিশোর বা বালকটি যা হিট্‌লার পাঠককে স্বীয় Vienna প্রবাসকালীন প্রতিকৃতি ব'লে বিশ্বাস করাতে চান্‌,—Dr. Lengyel-এর কলমের খোঁচায় তার চেহারা দাঁড়ায় একজন সাধারণ ছোক্‌রা রাজমজুরের। হিট্‌লারের বাবা ছিলেন অষ্ট্রো-ব্যভেরীয় সীমান্তের সামান্য শুল্কবিভাগীয় নায়েব। তাঁর মা ছিলেন জাতিতে Czech, বংশগত টিউটন্‌ আভিজাত্য—বা নর্ডিক প্রাধান্যবাদের মূলে যে সহজ বীজ থাকে হিট্‌লারের ভিতর তা নেই। হিট্‌লার্‌ নর্ডিক্‌ নন্‌; তিনি যে মিশ্র আল্পীয়, তা আমরা তাঁর চেহারা এবং বংশাবলী থেকে জান্‌তে পারছি। একজন আল্পীয়ের পক্ষে নর্ডিক্‌ প্রাধান্যবাদ প্রচার করা যে শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিচায়ক—তার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশেও আমাদের পরিচয় আছে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দুপ্রাধান্য, এ্যাংলো-স্যাক্সন্‌ বা টিউটনের পক্ষে নর্ডিকপ্রাধান্য অথবা নিগ্রোর পক্ষে নিগ্রোপ্রাধান্য বিশ্বাস করা স্বাভাবিক,—যদিও অপরের পক্ষে তা কষ্টকর। কিন্তু মঙ্গোলীয়ের পক্ষে য়িহুদিজাতির প্রাধান্য প্রচার করা অশোভনীয় ও অস্বাভাবিক, অপরের পক্ষে কষ্টকর তো বটেই। হিট্‌লার্‌ চরিত্রের এই বিশেষ বিকৃতিগুলি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের অনুশীলনযোগ্য।

শ্রীপ্রতাপকুমার বসু

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ইডেন হাউস, ৪ও৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪০

পরিচয়

মুক্ত বা 'অস্তং গতঃ'

মুক্তি=ব্রাহ্মী স্থিতি

মোক্ষবাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যাহাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভবন।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি—কৌষী, ১।৪
ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

ইহারই নামান্তর অমৃতত্ব-সিদ্ধি—

বিদ্বান্ ব্রহ্ম, অমৃতঃ অমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭
যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—বৃহ, ৪।৪।১৪
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—শুক্ল যজুঃ, ৩১।১৮

ঐ ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি যে দেহান্তে পরলোকেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই—দেহসত্ত্বে ইহলোকেও হইতে পারে।

এবং মুক্তি-ফলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৭।৫২

কেননা, মোক্ষ প্রতিবন্ধ-ক্ষয় বা 'অন্তরায়ধ্বস্তি'র উপরই নির্ভর করে।

ঐহিক বা ইহলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম জীবন্মুক্তি—

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র (অর্থাৎ ইহলোকে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে—বৃহ, ৪।৪।৭
ইহ (এখানে) চেদ্ অবেদীদ্, অথ সত্যম্ অস্তি—কেন ২।১৩

—এবং আমুষ্মিক বা পরলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম ক্রমমুক্তি।

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে—মুণ্ডক, ৩।৬।২

এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যা-জন্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান, যাহার ফলে মুক্তি) প্রতিবন্ধ-ক্ষয়াপেক্ষয়া স্থিতম্ ইতি

ঐহিকম্ অপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্ দর্শনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১

কিন্তু ঐ মুক্তি ঐহিকই হউক আর আমুষ্মিকই হউক, এভাবে দেখিলে, উহা ব্রহ্ম-সাযুজ্য, ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মের সহিত একীভাব।

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

'মোক্ষের অনন্তর, মুক্তির নিরন্তর ব্রহ্ম-সংপত্তি'—সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি (ছান্দোগ্য, ৬।৮।১)

তখন সেই সনাতন চিরন্তন, অজর অমর অক্ষর সতের সহিত, ব্রহ্মের সহিত, জীবের একীভাব হয়।

ঐ একীভূত ব্রহ্মিষ্ঠকে, ঐরূপ ব্রহ্মে স্থিত পুরুষকে যাজ্ঞবল্ক্য 'প্রতিবুদ্ধ' বলিয়াছেন—

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা
অস্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।—বৃহ, ৪।৪।১৩

'এই গহন (অনর্থ-সংকুল) দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যাঁহার আত্মা অনুবিত্ত (ব্রহ্মবিৎ) হইয়াছে, তিনি 'প্রতিবুদ্ধ'।

'প্রতিবুদ্ধ' কেন? যেহেতু, তিনি মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছেন। তাই শাক্যসিংহের সার্থক নাম বুদ্ধ—কারণ, তিনি সম্বুদ্ধ—সম্যক্ জাগরিত—'The fully wake One'।

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥—মাণ্ডূক্যকারিকা, ১।১৬

'অনাদি-মায়া-ঘোরে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, * তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্ন-হীন দ্বৈতহীন ব্রহ্মতত্ত্ব।'

মজ্ঝিমনিকায়েরও ঐ কথা—

ধম্মং দেসিযমানে চিত্তং পক্খন্দতি, পসীদতি সংতিট্ঠতি বেনিঞ্চতি।

'তখন চিত্ত উদ্‌বুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয়, সন্তুষ্ট হয়, অক্ষোভিত হয়।'

সেইজন্য কঠ-উপনিষদ্ মোক্ষকামীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—কঠ, ৩।১৪

'উঠ, জাগ, প্রবুদ্ধ হইয়া সদ্‌গুরুর সকাশে 'বোধি' সঞ্চয় কর'—ইহ-জীবনে স-শরীরেই কর—

---

*He *awakes* of the long dream of life, dreamt during *Sansara* and finds (it) resting upon the delusion that his real essence has something in common with the components of his personality (অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চস্কন্ধ) —The Doctrine of the Buddha, pp 334 and 340

এই Delusion বা মায়া অনাদি-সিদ্ধ (অনাদি মায়য়া সুপ্তঃ)—সেইজন্য Grimm ইহাকে 'Gigantic and *incessant* self-mystification' বলিয়াছেন।

ইহ চেদ্ অশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ—কঠ ৬।৪
'যদি শরীর ভ্রংশের পূর্ব্বেই প্রবুদ্ধ হইতে পার,' তবে—
প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪
—প্রতিবোধ-বেদ্য সেই 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে' জানিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্যলাভ করতঃ অমৃতত্বের অধিকারী হইবে। ইহারই নাম মোক্ষ।

ব্রহ্মে স্থিতি না স্বরূপে অবস্থান ?

অন্য ভাবে দেখিলে, মোক্ষকে ব্রহ্মসাযুজ্য না বলিয়া জীবের 'স্ব-রূপে অবস্থান' বলা যাইতে পারে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১ 'মোক্ষে জীবের স্ব-রূপ-আবির্ভাব।'

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্ব-রূপস্য। (মোক্ষে) যং দশা-বিশেষং আপদ্যতে, স স্ব-রূপাবির্ভাবরূপঃ, ন অপূর্ব্বাকারোৎপত্তিরূপঃ—রামানুজ ভাষ্য।

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য-উপনিষদের উপদেশ স্মরণীয়—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'এই 'সম্প্রসন্ন' জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে স্থিত হন।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই ভাবেই জীবকে 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়াছেন এবং জীবের 'স্বেন ভাসা, স্বেন জ্যোতিষা'র উল্লেখ করিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৯)।

বৌদ্ধেরা; জীবের এই 'স্ব-রূপে অবস্থান'কে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাণ-দশার বর্ণনায় বলেন—

He reposes in the boundlessness and infinitude of his own highest essence (Grimm's Doctrine of the Buddha, p 359)

This, his inscrutable essence, the Saint (the Perfected One) enters, to it he withdraws, in it he rests (Ibid, p 196).*

---

* সম্ভবতঃ এই 'Inscrutable, Essence'ই বুদ্ধদেবের কথিত 'বিজ্ঞানধাতু', as opposed to 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'। মৈত্রেয়ী-উপনিষদ্ ইহাকে 'প্রত্যক্ ধাতু' বলিয়াছেন—

অনন্দাৰ্দ্ধিঃ পরঃ সোঽহমস্মি
প্রত্যক্ ধাতুর্নাত্র সংশীতিরস্তি—১।১১

ঐ 'বিজ্ঞানধাতু' বিজ্ঞানস্কন্ধ নহে। বিজ্ঞান-ধাতু সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি এই:—বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহং—(দীঘনিকায়, ১১)

অর্থাৎ বিজ্ঞানধাতু 'is invisible, boundless, all penetrating'

ঐ বিজ্ঞানস্কন্ধ অন্যান্য চারিটি স্কন্ধের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের 'Personality' রচনা করে। ঐ Personality আমার প্রকৃত 'আমি' নহে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—'তং ন এতং মম, ন এসোহম্ অস্মি, ন মে সো অত্তাতি— This does not belong to me, this am I not, this is not myself' (মজ্ঝিমনিকায় 28th Discourse), কারণ, our true essence lies behind our personality (Grimm, p 227) *All* determinants within us have nothing to do with our *essence,* which is not subject to the laws of arising and passing away (Ibid, p 312)

এই Inscrutable Essence-ই হিন্দুর লোকোত্তর আত্মা (Transcendental Self)—যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'অসঙ্গ পুরুষ,' জীবের 'অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্ম অভয় রূপ' বলিয়াছেন—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্—বৃহ, ৪।৩।২১
অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬ ও ৪।৩।২২

যেহেতু ঐ Essence লোকোত্তর (transcendental), সেইজন্য ঐ 'স্ব-রূপ'কে উদ্দেশ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫
যিনি বিষয়ী (বিষয় নহেন), যিনি দ্রষ্টা (দৃশ্য নহেন), যিনি জ্ঞাতা (জ্ঞেয় নহেন) —তাঁহাকে, সেই pure subject-কে জানিবে কি প্রকারে ?

সেই আত্মা যে, নেতি নেতি—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—বৃহ, ৪।২।৪
'ঐ আত্মা নেতি নেতি—নির্দ্দেশের অতীত। তিনি অগ্রাহ্য—কখনও গৃহীত (বিদিত) হন না।'

বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

The Atma, our kernel, cannot be grasped at all, by means of cognition. × × × The true one is therefore not to be discovered as an object of cognition × × it is transcendent (Grimm's Doctrine of the Buddha, pp. 499 and 515).

আমরা জানিয়াছি যে, চতুর্বেদ 'মহাবাক্যে' সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করেন—সোহং, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য, এই যে অহং ও ত্বং, এই যে আত্মা—ইনি জীবাত্মা নহেন—সেণ্ট পল যাহাকে Soul বলিয়াছেন সেই soul নহেন, ইনি প্রত্যগাত্মা (Monad)—সেণ্টপলের 'Spirit'।

পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যখন অমৃত, তখন এই প্রত্যগাত্মাও নিশ্চয়ই অমৃত। যাজ্ঞবল্ক্য 'অন্তর্যামী'-ব্রাহ্মণে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ (বৃহ, ৩।৭।৩-২৩)। এই 'ধ্রু' (Formula) তাঁহার মুখে একবার নয়, দুইবার নয়, ঐ স্থলে একুশবার শুনিতে পাই। আমরা আরও জানিয়াছি যে, ব্রহ্মে স্থিতি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি (ছান্দোগ্য, ২।২৩।১)—বিদ্বান্ ব্রহ্ম অমৃতঃ অমৃতম্ (বৃহ, ৪।৪।১৭) 'অমৃত ব্রহ্মকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

জীবের স্বরূপে অবস্থানেরও ঠিক্ ঐ ফল—কারণ, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ এবং ঐ অবস্থায় জীব 'realises his true nature'।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি। তস্য হ ন দেবাশ্চন অভূত্যৈ ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি—বৃহ, ১।৪।১০

'অতএব অদ্য ও এখানে যিনি জানিতে পারেন 'আমিই ব্রহ্ম', তিনি এ সমস্তই হন। দেবতাদের সাধ্য নাই—তাঁহার ঐ ভাব বারণ করিবে। কারণ তিনি এ সকলেরই আত্মা হন।'

ইহাই জীবের স্ব-রূপে অবস্থান। সাংখ্যেরা ইহাকে 'কৈবল্য' বলেন।

কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি—যোগসূত্র, ৪।৩৪

তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাস-ভাষ্য

ইহাই মুক্তি—তখন পুরুষঃ স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে (১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)

তুরীয় ও মোক্ষ

আমরা জীববাদের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, জীবের সুষুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, নিবিড় হয়—তখন জীব 'প্রাজ্ঞ আত্মা' কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া) স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায়, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

অর্থাৎ সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবের একাকার অনুভূতি হয়। (পরিচয়, প্রথম বর্ষ ৫৫৭-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং তখন ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ—সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated। যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থার বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। তত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

ঐ প্রগাঢ় সুষুপ্তি-অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর (subject and object-এর) দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িক ভাবে অদ্বৈতে স্থিতি হয়।

The transition is × × from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all—whereby subject and object become one —Deussen, p 142

এই সুষুপ্তির উপর তুরীয় অবস্থা—তখন স্বরূপে অবস্থানের ফলে ঐ একাকার ভাব আরও নিবিড়তর হয়।

অবস্থাত্রয়-ভাবাভাব-সাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যাচক্ষতে—সর্ব্বসার-উপনিষদ্ অর্থাৎ—'the spiritual then subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things '

ইহাই সমাধি-অবস্থা। জীবের সুষুপ্তি স্বভাবজ—কিন্তু এই সমাধি যোগজ, সুদীর্ঘসাধন-সাপেক্ষ।

কিন্তু সুষুপ্তিই হ'ক, আর সমাধিই হ'ক, সেই সেই অবস্থায় অন্তরাত্মার সহিত (with the eternal knowing subject) জীবের যে একীভাব হয়, তাহা সাময়িক মাত্র। ঐ স্বরূপে-অবস্থান অস্থায়ী (a transcient union)—ঐ যোগ 'প্রভাবাপ্যয়ৌ'—উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য নিবিড় সুষুপ্তি বা তুরীযের মহিমা কীর্ত্তন করিলে, জনক তাঁহাকে বলিলেন—অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহ বাহ্য, পরে কহ আর'। তুরীযের উপরের যে অবস্থা, উহাই মোক্ষ। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে ঐ স্বরূপে সমাপত্তি সুস্থিত, স্থায়ী ও অচ্যুত হয় ('becomes fixed, established and permanent')।

যাজ্ঞবল্ক্য ঐ মোক্ষের প্রতি জনকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্।—বৃহ ৪।৩।৩২

'মুক্ত পুরুষ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত, দ্রষ্টা (সাক্ষী, * Sole Subject without Objects) এবং অ-দ্বৈত (One without a second)। হে সম্রাট্। ইহাই ব্রহ্মলোক।'

বলা বাহুল্য এ 'লোক' স্থান নহে, স্থিতি—place নহে, state—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (গীতা, ২।৭২)। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, এখানে ব্রহ্ম-লোক ব্রহ্মণঃ লোকঃ নহে—ব্রহ্ম এব লোকঃ।

এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষোস্য পরমোলোকঃ এষোস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

'উহাই জীবের পরমাগতি, উহাই পরম সম্পদ্, উহাই পরম লোক, উহাই পরমানন্দ।'

---

*He (মুক্ত পুরুষ) takes 'his stand as a complete stranger (উদাসীনবৎ আসীনঃ) and thereby as a free man, over against the world, including the elements of his own personality '—The Doctrine of the Buddha, p 336

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট যে মোক্ষ-তত্ত্বের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা আরও গভীর, আরও অগাধ।

স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়, তান্যেব অনু বিনশ্যতি—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইত্যরে ব্রবীমি—বৃহ, ৪।৫।১৩

'যেমন সৈন্ধবখণ্ড (lump of salt) অনন্তর—অবাহ্য (অন্তর-রহিত ও বাহ্য-রহিত), সর্ব্বত্র রসঘন—তেমনি অরে! এই আত্মা অনন্তর অবাহ্য কৃৎস্ন-বিজ্ঞানঘন। অর্থাৎ 'নুর-তামাম' (কবীর)। এই আত্মা সমুদায় ভূত হইতে (পঞ্চভূতের সংঘাত দেহ হইতে—অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়) সমুত্থিত হইয়া, তাহাদের অনুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হন। দেহের বিগমে (প্রেত্য) তাঁহার সংজ্ঞান থাকে না।'

যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে বৈনাশিকের (Nihilist-এর) কথার ঐরূপ প্রতিধ্বনি শুনিয়া মৈত্রেয়ী চঞ্চল হইয়া বলিলেন, 'স্বামিন্! এ কি বলিলেন? আমাকে যে গভীর মোহে নিক্ষেপ করিলেন। আমি যে কিছুই বুঝিতেছি না—

অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপিপৎ, ন বা অহম্ ইমং বিজানামি—বৃহ, ৪।৫।১৪

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'অয়ি! শঙ্কিত হইও না—আমি মোহকর কিছুই বলি নাই—ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি—এই আত্মা 'অবিনাশী অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'—অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪) —আত্মার উচ্ছেদ নাই বিনাশ নাই—আত্মা অব্যয়, অক্ষয়, অদ্বয়। কিন্তু যে মোক্ষদশার কথা বলিলাম, সে অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ অন্তর্হিত হয়, যখন subject ও object coalesce করে, যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-রূপ ত্রিপুটী তিরোহিত হয় এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে (as the pure objectless knowing subject) প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞান (consciousness) থাকিবে কিরূপে? দেখ—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরম্ অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কম্‌অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুযাৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীযাৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

'যে অবস্থায় দ্বৈত যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যে অবস্থায় সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? কে

কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে স্বাদন করিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে মনন করিবে? কে কাহাকে স্পর্শন করিবে? কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে?'

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই অন্যত্র একটু ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন—

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে অবস্থায় অন্য যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে।'

কিন্তু যে অবস্থায় দ্বৈত তিরোহিত হয়, 'অন্য' থাকেই না, উপাধি 'সপদি গলিত' হয়—তখন আত্মার সংজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? অতএব—

ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।

অর্থাৎ মুক্তদশায় বিদেহী আত্মা—The imperishable, indestructible Atma (অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা আত্মা) has no further consciousness of objects, because as knowing Subject, he has everything in himself, nothing outside of himself—consequently 'has no longer any contact with matter' (মাত্রা-অসংসর্গস্ত্ব অস্য ভবতি—মাধ্যন্দিনশাখা)—Deussen's Philosophy of the Upanishads, pp 349-50

ঐ মর্ম্মে অধ্যাপক ডয়সন অন্যত্র বলিয়াছেন—

It is the condition (of deep sleep) in which a man knows himself to be one with the universe, and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness × × × 'In it, there is no duality, no subject and object and consequently no consciousness in an empirical sense'— কারণ, 'To be conscious means There are objects for me' (Schopenhauer)—সেই কথা 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'।

বৌদ্ধের দিক্ হইতে অধ্যাপক গ্রিম্ এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন—

If we come to the true view of recognising everything as Anatta and thereby denying every predicate to our ego, then in that moment the ego ceases to be the subject, (i e, being without object) ceases from its introduction by means of the I-idea into the world of experience It vanishes again into nothing —Grimm's Doctrine of the Buddha, p 187

অর্থাৎ 'Being all, he becomes nothing, because he ceases to have particular consciousness of anything'

ইহাকেই বুদ্ধদেব 'শূন্যতা' বলিয়াছেন।

নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং, ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনং নত্থি—মজ্ঝিমনিকায।

'আমি কোন কুত্র নহি, কোন কাহারও নহি, কোন কিছুতে নহি; কোন কিছু আমার নহে, কোন কেহ আমার নহে, কুত্র কিঞ্চিৎ আমার নহে।'

পুন চ পরং ভিক্খবে। সারিপুত্তো। সব্বসো বিঞ্ঞানানং চায়তনং সমতিক্কমা নত্থি কিঞ্চীতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি—মজ্ঝিমনিকায, ৩

'পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ। হে সারিপুত্র। (নির্ব্বাণী) বিজ্ঞান-আয়তন (sphere of boundless consciousness) সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া, 'কোন কিঞ্চিৎ নাই' এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া অকিঞ্চন-আয়তনে (শূন্যতায়—sphere of Nothingness-এ) সুস্থিত হইয়া বিহরণ করেন।'

এই অবস্থাকে 'শূন্যতা' বলা খুব সঙ্গত নহে কি? কারণ, 'Where all phenomenon has ceased, naming is gone' (Grimm)

'শূন্যতা-সিদ্ধি', 'প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি'—'মোক্ষদশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না, তিনি শূন্যতায় নিমজ্জিত হন'—এ সকল কথায়, যাঁহারা কোমল অধিকারী—যাঁহাদের মনের ধাতু সবল নহে, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী শ্লথ, অসংবদ্ধ—তাঁহারা যে শঙ্কিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কারণ, 'সংজ্ঞা নাস্তি' বলায় আমরা চিন্তারাজ্যের এমন তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম, যেখানে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হওয়া, যেখানে তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ কমল-বিলাসীদিগকে অধ্যাপক গ্রিম কৃপাপাত্র বলিয়াছেন—Shallow thinkers, who are still so closely bound up with their personality, that in their brains there is simply no room left for the idea of the ultra-mundaneness of their essence (The Doctrine of the Buddha, p 164)

যে অবস্থায় জীবভাবের অভাব হইল, ব্যক্তিত্বের বিলোপ হইল, বিষয়-বিষয়ীর অন্তর্দ্ধান হইল, ত্রিপুটী তিরোহিত হইল, এক কথায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হইল—সেই মোক্ষের অবস্থাকে এইরূপ 'shallow thinker'-রা যদি 'নাস্তিত্ব' মনে করেন, তবে তাহা বিচিত্র মানিবার কারণ আছে কি? তাঁহাদের এই সম্ভাবিত ভ্রম অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আত্মা চিরদিনই অবিনাশী—'অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'। সেইজন্য মোক্ষের অবস্থায় বৃত্তির বিলোপ ঘটিলেও শক্তির বিলোপ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এ বিষয়ের বিবৃতি করিয়াছেন :—

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। নহি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ -ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বদতি, বদন বৈ তন্ন বদতি। ন হি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীযম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যদ্ বদেৎ।

২

যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপবিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যৎ শৃণুয়াৎ।

যদ্ বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপবিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীযম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত।

যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপবিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ,—ন তু তদ্ দ্বিতীযম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপবিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বিজানীযাৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

অর্থাৎ ঐ অবস্থায তিনি দর্শন কবেন না। দর্শন কবিযাও দর্শন কবেন না। দ্রষ্টাব দৃষ্টি-শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কাবণ উহা অবিনাশী, কিন্তু যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি দর্শন কবিবেন কিরূপে?

ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ কবেন না, আস্বাদন কবেন না, বচন কবেন না, শ্রবণ কবেন না, মনন কবেন না, স্পর্শন কবেন না, বিজ্ঞান কবেন না—ঘ্রাণ-শক্তিব স্বাদ-শক্তিব, বচন-শক্তিব, শ্রবণ-শক্তিব, মনন-শক্তিব, স্পর্শন-শক্তিব, বিজ্ঞান-শক্তিব যে বিলোপ হয তাহা নহে—ঐ সকল শক্তিই অবিনাশী, কিন্তু সে অবস্থায যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আঘ্রাণ বা আস্বাদন বা বচন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শন বা বিজ্ঞান কবিবেন?' অর্থাৎ আত্মাব কোন শক্তিবই বিলোপ ঘটে না—কাবণ তিনিই—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা বসয়িতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ
—প্রশ্ন, ৪।৯

মুক্ত স্বধাম-গত

আব এক ভাবে দেখিলে, মুক্তিকে স্ব-রূপে অবস্থান না বলিযা স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন বলা যাইতে পাবে। ঋগ্‌বেদেব ঋষি জীবকে আহ্বান কবিযা বলিয়াছেন—

হিত্বা অবদ্যং পুনবস্তম্ এহি—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।৮

হে জীব! 'অবদ্য (অঞ্জন, stain) পবিহাব কবিয়া আবাব 'অস্তে' ফিবিযা আইস।'

আমবা এখন যেমন বলি সূর্য্য অস্ত গেলেন—'গতোঽস্তম্ অর্কঃ'—অথবা কালিদাস যেমন বলিযাছেন :—

যাত্যেকতোঽস্তশিখবং পতিবোষধীনাম্—ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখবে চলিলেন,

—বৈদিক যুগে 'অস্ত'-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত হইত না। বেদেব ভাষ্যকাব সায়ন বলেন 'অস্তে'ব অর্থ গৃহ, ধাম। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রেব প্রতি দৃষ্টি কবিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ঋণাবা বিভ্যদ্ ধনমিচ্ছমানো
অন্যেষাম্ অস্তম্ উপনক্তম্ এতি—ঋগ্ বেদ্ ১০।৩৪।১০

'ঋণেব ভযে ভীত ব্যক্তি ধন ইচ্ছা কবিযা বাত্রে অপবেব 'অস্তে' (গৃহে) প্রবেশ কবে।'

উপনিষদেব স্থানে স্থানেও ঐ অর্থে 'অস্ত'-শব্দেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বাণি বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব
সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং গচ্ছন্তি—ছান্দোগ্য, ১।৯।১
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।।৮

বৈদিক ঋষি বলিলেন—'হিত্বা অবদ্যং'—'সমস্ত অবদ্য, সমস্ত অঞ্জন, মলা-মলিনতা পবিহাব কবিয়া 'অস্তে' ফিবিয়া আইস'। আমবা দেখিয়াছি, জীব প্রকৃতপক্ষে নিবঞ্জন—'শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ'—কিন্তু দেহরূপ 'পুবে'ব সহিত সংযুক্ত হইযা সে 'পুবঞ্জন' হয়—

পুবশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুবশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুবঃ স পক্ষী ভূত্বা পুবঃ পুরুষ আবিশৎ॥—বৃহ, ২।৫।১৮

সেইজন্য জীবেব নাম 'পুরুষ'—পুরে যাহাব বসতি। ঐ পুবেব 'অঞ্জন' (stain) যেন তাহাকে উপবক্ত কবে,

স বা অযং পুরুষঃ জাযমানঃ শবীবম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

তাই ঋষি বলিলেন, ঐ উপবাগ ধৌত কবিয়া, শুভ্র স্বচ্ছ হইযা, 'নিববদ্য নিবঞ্জন' হইয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন কব। এইরূপ স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত পুরুষই মুক্ত পুরুষ—তিনি অস্তং গতঃ।* বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে 'অস্তং গত' বলিযাছেন। তাঁহাব নিজেব মুখেব বাণী এই—

—অত্থং গতস্স ন পমাণং (measure) অত্থি, যেন নং বজ্জু (বদেযুঃ) তং তস্স নত্থি (সুত্তনিপাত, ৫)

অধ্যাপক গ্রিম্ ঐ বাক্যেব এইরূপ অনুবাদ কবিযাছেনঃ—

—For him, who has gone home, there is no standard of measure এবং আমাদেব স্মবণ কবাইযাছেন যে, 'Those acquainted with the older sans-

---

* গেটের Faust মহা নাটকেও আমরা এই ধরণের একটা কথা শুনিতে পাই। ফাউষ্ট বলিতেছেন—
Two souls alas! reside within my breast
কে কে ?—একজন মর্ত্ত্যবিহারী, অন্যজন বিমানচারী—
One with tenacious organs holds, in love
And clinging lust, the world in its embraces
The other strongly sweeps, (this dust above),
Into the high *ancestral* spaces,
ঐ Ancestral Spaces ই জীবের নিজ ধাম—তাঁহার 'অস্ত'।

krit literature will see at once that in the Pali word 'Attam gatassa' is hidden the ancient well-known compound word, already found in the Vedas, 'Astamgata,' the root meaning of which is "gone home"

বুদ্ধদেব আবও বলিয়াছেন যে, পবিনির্ব্বাণী (মুক্ত পুরুষ = the Delivered One) 'is submerged in the Deathless'—

—তে পতিপত্তা অমতং (অমৃতং) বিগয্য লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা—(সুত্তনিপাত)। গ্রিম্ বলেন—

'Neither this deathless Nirvana is thus my I, it is rather home in which I am submerged (The Doctrine of the Buddha, p 519) কেননা, মুক্তিতে কি হয ? (We) reach that realm (ধাম) our own proper realm (প্রকৃত স্ব ধাম), "where there is neither birth nor sickness nor becoming old nor dying, nor woe, sorrow, suffering, grief and despair" (The Doctrine of the Buddha, p 197)

নির্ব্বাণেব এই বর্ণনাব সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনাব তুলনা করুন—দেখিবেন, দুইটি একই সুবে বাঁধা।

যঃ অশনাযাপিপাসে শোকং মোহং জবাং মৃত্যুম্ অত্যেতি—বৃহ, ৩।৫।১
'যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, শোকমোহ, জবামৃত্যুব অতীত।'

আমাদেব গন্তব্য স্ব-ধাম কি ? আমাদেব 'মুলুক' (Real Home) কোথায ?

কোন্ মুলুক্সে আযসি হংসা ? (কবীব)—হে হংস (জীব)। তুমি কুতঃ আযাতঃ—তোমাব আযতি কোথা হইতে ? কুতঃ কোথা হইতে ? ব্রহ্ম হইতে—
From God who is our Home —WORDSWORTH

অতএব ব্রহ্মই আমাদেব স্বধাম—

ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি—ছান্দোগ্য, ৬।১০।২
'এই সমস্ত প্রজা (creatures) সেই ব্রহ্ম হইতেই (যিনি 'তৎসৎ') বিচ্ছুবিত হইযাছে'
For, man who is from God sent forth —WORDSWORTH

যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুবিত হয—সেইরূপ।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চবন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চবন্তি—বৃহ, ২।১।২০
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষবাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ—মুণ্ডক, ২।১।১
(ভাবাঃ = জীবাঃ—শঙ্কব)
যতো বা ইমানি ভূতানি জাযন্তে—তৈত্তি, ৩।১

ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইযাই জীব সংসারচক্রে বিবর্ত্তন করে—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে- শ্বেত, ১।৬

এই ব্রহ্মচক্রের প্রথমার্দ্ধের নাম প্রবৃত্তিমার্গ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে জীব খনিজ (Mineral), স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, (Vegetable), অণ্ডজ (Fish, Reptiles, Birds) ও জরায়ুজ (Beasts) প্রভৃতি বহুলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিযা অবশেষে মানবযোনিতে প্রবেশ করে।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কুর্ম্মাশ্চ নব লক্ষং চ দশ লক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধযেৎ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ,

অর্থাৎ, 'স্থাবর ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, কূর্ম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ—ইহার পরে জীব মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করে।'

ইহাকেই বলে Evolution (বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ)। এইরূপে বিবর্ত্তনের সরণী (ladder of evolution) ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া জীব বহু দিনে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হয়।

That spark through æons of the time became a human being * * At first that human being was in the shape of a savage (J Krishnamurti)

সেই অসভ্য ক্রমশঃ অর্দ্ধ সভ্য হইযা ধীরে ধীরে সভ্য হয। এখনও কিন্তু সে প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। বিবর্ত্তনচক্রের বিবর্ত্তনে একদিন সে 'মোড' ফিরিয়া (turning point pass করিযা) নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে। এতদিন জীব বহির্মুখ ছিল, এইবার অন্তর্মুখ হইতে আরম্ভ করে—এতদিন সে ব্রহ্ম-বিমুখ ছিল (His face was turned away from God)—এখন সে ব্রহ্ম-সম্মুখ হয় (His face is turned Godward)—ব্রহ্মবৈমুখ্য ঘুচিয়া এইবার তাহার ব্রহ্ম-সাংমুখ্য হয়। এতদিন তাহার পক্ষে নিযম ছিল—আদান (He grew by grasping)—এখন হইতে তাহার নিযম হয প্রদান (ত্যাগ বা বিসর্গ) (He now grows by giving)। এতদিন তাহার লক্ষ্য ছিল অভ্যুদয—এখন হইতে তাহার লক্ষ্য হয নিঃশ্রেযস। আমরা দেখিয়াছি এই নিঃশ্রেয়স বা Summum Bonum-ই মুক্তি। এতদিন সে ছিল প্রেয়ের পথে—এখন সে প্রেয়ঃ ছাড়িয়া শ্রেযের পথে প্রবেশ করে। এই শ্রেযের পথই মোক্ষ-মার্গ।*

---

* অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্ঞা নিব্বাণগামিনী।
(অন্যা হি লাভোপনিষৎ অন্যা নির্ব্বাণগামিনী)
'লাভের পথ এক, নির্ব্বাণের পথ আর।'

ইহারই চরমে নিঃশ্রেয়স। মানব প্রকৃতপক্ষে 'সুসভ্য' না হইলে এ পথে বিচরণ করিতে পারে না।

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ, 'পূর্ব্বোক্ত যোনি সকল ভ্রমণ করিয়া জীব ক্রমশঃ দ্বিজত্বে উপনীত হয়। দ্বিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব শেষে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।'

এইবার মানব অতি-মানব হইতে আরম্ভ করে—normal evolution-এর সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া super-normal evolution-এর তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। এ পথ অতি দুর্গম পথ—ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—

যিশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—Straight is the gate and narrow is the way and few there be that find it.

এতদিন সে আত্মবিস্মৃত ছিল *—সে যে রাজপুত্র সে কথা ভুলিয়া ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী ছিল 'Gods in exile'—সিংহশিশু মেষভাবে আত্ম হারাইয়া, অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। এখন তাহার নষ্টা স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আইসে—নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্—এবং তাহার মোহবন্ধ ছিন্ন হইয়া যথাকালে স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে।

স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

যিশুখৃষ্ট Prodigal Son-এর Parable-এ এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থেরও উহাই লক্ষ্য—

For man, who is from God sent forth
Doth again to God return

---

* যোগবাশিষ্ঠ এ বিষয় বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন—

হেতুর্বিহরণে তস্য আত্মবিস্মরণাদ্ ঋতে।
ন কশ্চিৎ লক্ষ্যতে সাধো। জন্মান্তর ফলপ্রদঃ ॥ —উৎপত্তি, ৯৫।৮

'জীবের জন্মান্তর বা সংসৃতির একমাত্র হেতু তাহার আত্মবিস্মৃতি।' ভাগবতের পুরঞ্জনের উপাখ্যানে এই তত্ত্ব অতি সুন্দর রূপকের রূপে বিবৃত হইয়াছে। পুরঞ্জন (জীব) আত্মবিস্মৃত হইয়া পুরের সহিত সারূপ্য স্থাপন করিয়া শোকমোহের অধীন ছিল। অন্তিমে তাহার সত্য সখা, নিত্য সখা নিরঞ্জন (দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া) উপনীত হইয়া তাহার স্তম্ভিত স্মৃতির উদ্বোধন করাইলে সে 'নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্' এবং তখন স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সুস্থ ও সুস্থির হইল্।

We resemble children, who though living in a comfortless region (এই 'দুঃখালয়' সংসার), look, full of fear and trembling, upon the immense dark forest that stretches out before them, and cannot be brought by any inducement to enter it,—while, all the time, behind it, in the midst of green meadows, bathed in smiling sunshine stands their parents' house, from which they set out at first.
—The Doctrine of the Buddha, p 195

প্রবাসী দীর্ঘ জীবন-পথ-যাত্রার পর এতদিনে 'অস্তং গত' হয়—স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই 'Getting back to God'-ই মোক্ষ—কারণ, ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম। এইদিনে The wheel has come full circle and I am here. (Shakespeare)

From the flame you came forth, to the flame you will return and thus unite the beginning and the end The purpose of life is to lose the separate self which started as an individual spark — J Krishnamurti's ' By What Authority,' p 29

উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন—

যস্ত বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪
'ব্রহ্মবিজ্ঞানীর আত্মা ব্রহ্ম-ধামে প্রবেশ করে।'
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে—মুণ্ডক, ১।৩
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম—গীতা, ১৫।৬
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ—গীতা, ১৫।৪
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয়। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—মুণ্ডক, ১।৩

সেই বিষ্ণুর পরম পদ—যাহা সংসার পথের পার—সূরিগণ যে পদ ঈক্ষণ করেন, 'অস্তং গত' সেই পদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্—ঋগ্বেদ

সেই জন্যই ব্রহ্ম 'প্রভবাপ্যযৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডুক্য, ৬)—তিনি জীবের 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্' (গীতা, ৯।১৮)—তাঁহা হইতেই জীবের প্রভব, এবং তাঁহাতেই জীবের প্রলয়।

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি - মুণ্ডক, ২।১।১
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম—তৈত্তি, ৩।১।১
'ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, ব্রহ্মদ্বারা স্থিতি এবং অন্তে ব্রহ্মতেই লয়।'

সেই বেদের প্রাচীন বাণী—

তস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বম্—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩২।৮

মোক্ষ = শূন্যতা-সিদ্ধি

এই যে ব্রহ্মধামে প্রবেশ বুদ্ধদেব ইহাকেই শূন্যতাসিদ্ধি বা নিরোধ-সমাপত্তি বলিয়াছেন—

নত্থি কিঞ্চিতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি

(He has won to the sphere of Nothingness (শূন্যতা)

এই শূন্য কি ? এই শূন্য উপনিষদেব নেতি নেতি ব্রহ্ম—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি—(বৃহ, ২।৩।৬)। ইহ সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্য—ন সৎ নচাসৎ (শ্বেত, ৪।১৮)—অতএব 'সঃ' নহে, 'তৎ' (That)। ব্রহ্ম যখন লক্ষণেব অতীত, মননেব অতীত, বচনেব অতীত—

অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—কঠ, ২।১৪

'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে অন্য ; কৃত হইতে ব্যতিবিক্ত, অকৃত হইতে বিভিন্ন'

—এক কথায় 'সর্ব্বকার্য্যধর্ম্ম-বিলক্ষণ' (শঙ্কব)*—তখন তিনি 'শূন্য'বইআব কি ?

স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ. ৪।২।৪

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাব পবিচয়ে বলিযাছেন—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছাযম্ অতমঃ অবাযু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অবসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অনন্তবম্ অবাহ্যম্—বৃহ, ৩।৮।৮

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছাযা নহেন, তমঃ নহেন, বাযু নহেন, আকাশ নহেন ; তিনি বস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তব নহেন, বাহিব নহেন।'

সত্য বটে, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে তিনি পূর্ণ (Plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্—কিন্তু নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (Vacuum)—নেতি নেতি। সেইজন্য শঙ্কবাচার্য্যেব নামে প্রচলিত 'সর্ব্ব বেদান্ত-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বলা হইযাছে—

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাংচ যৎ—যিনি শূন্যবাদীব শূন্য, তিনিই ব্রহ্মবাদীব ব্রহ্ম।

উপনিষদে এই শূন্যভাব-সাধনেব উপদেশ আছে—

শূন্যভাবেন যুঞ্জীযাৎ—অমৃত, ১১
শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

---

*The Absolute, the Infinite, is without condition and so cannot be thought × × The Absolute can be nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known —Herbert Spencer's First Principles, pp 73-4

বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন সত্য—কিন্তু তাঁহার 'শূন্য' Nihilum নহে—নাস্তি নহে।* তিনি বলিতেন 'Beyond this seeming 'Nothing'—the true and real is hidden' (Grimm p. 457) তাঁহার নিজের মুখের উদাত্ত বাণী একবার মানস-কর্ণে ধ্বনিত করুন—

অত্থি ভিক্‌খবে। অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্‌খবে। অভবিস্‌স অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং, ন ইদ জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্‌ঞাযেথ। যস্মা চ খো ভিক্‌খবে। অত্থি অজাতং অবভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্‌ঞাযেতি তি।

অত্থি ভিক্‌খবে। তদ্ আযতনং যত্থা ন য়েব পঠবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানং চাযতনং ন বিঞ্‌ঞানানং চাযতনং ন অকিঞ্চন্নাযতনং ন নেব সন্না না-সন্নায়তনং, নাযং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমা সুরিযো। তদ্ অহং ভিক্‌খবে। ন এব আগতিং বেদামি ন গতিং ন থিতিং ন চুতিং ন উপপাতিং। অপ্পতি টঠং অপ্পবত্তং অনারম্ভনং এব তং। এস এব অন্তো দুক্‌খস্‌সেতি—উদান, ৮।১, ৩

ইহার অনুবাদ এই :—

There is, O Bhikkhus, That which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved Unless, O Bhikkhus, there were That, which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved—there could not be cognised here the springing-out of what is born, has become, is created and evolved And surely, because, O Bhikkhus, there is That, which is unborn, has not become is uncreate and unevolved—therefore is cognisable the out-springing of what is born, has become, is created and evolved ' (Translation in ' Light from the East,' p 51)

ঐ Unborn Uncreate Unevolved—ঐ 'অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং'-ই উপনিষদের নির্গুণ নিরুপাধি নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অস্তং গত (স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত) হইলে—সেই ব্রহ্মের সহিত, সেই শূন্যের সহিত সুনিশ্চল সাযুজ্য হয়। ঐ সাযুজ্যই মুক্তি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

*The *nothing* (শূন্য), that we regarded so long as the measureless black pall spread over the abyss of absolute annihilation, into which every living being must one day fall—now becomes the mysterious veil that lies over our own *innermost essence* —The Doctrine of the Buddha, p 195 ·

৩

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই এলিয়ট সাহেব গৌণভাবে আমার অদৃষ্টচক্র ফিরিয়েছিলেন, তাই তাঁকে আমার এত ভাল ক'রে মনে আছে। গল্পটা উল্লেখযোগ্য শুধু এই দেখাবার জন্য যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা আতঙ্ক ছিল যে আমাকে একদিন ভারত শাসনের ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা হবে। উঠতে বসতে এই কথা আমায় শুনতে হত। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর পাঁচরকম কারণে আশা হচ্ছিল যে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাব। ইতিমধ্যে লাট-বাহাদুরের কুচবেহারে শুভাগমন হল, রাজ্যের কর্ত্তাদের কারদানির জন্য সাহেব তুষ্টও হলেন। পিতাঠাকুর পাকা রাজনীতিবিৎ ছিলেন। রাজ্য চালনার প্রধান নীতি হচ্ছে এই যে লেন-দেনের হিসাব ঠিক থাকবে, অর্থাৎ অপর পক্ষ ফাঁকি দিয়ে কিছু মেরে না নেয় সেইটে দেখতে হবে। কুচবেহার কর্ত্তৃপক্ষের সেবার চেষ্টা হল যে এত কষ্ট ও খরচ যখন করা গেছে তখন কিছু সুবিধা ক'রে নিতে হবে। ওই রাজ্যে একটা গোলমাল বহুদিন থেকে চলে আসছিল। অমাত্য দুজন ছিলেন। একজন আমার বাবা, অন্যজন এক সাহেব। এই diarchy-র দরুণ ষ্টেটের অনর্থক অনেক-গুলো টাকা খরচ হয়ে যেত। যখন এলিয়ট সাহেব বাবাকে পুরস্কৃত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন বাবা ষ্টেটের এই দুঃখের কথা তুললেন, "কাজ দুজনের মত যখন নেই, তখন আমাদের একজনকে সরিয়ে দেবার অনুমতি দিন।" খানিকক্ষণ আলোচনার পর সাহেব বললেন—"নেটীব রাজ্যে একজন নেটীব দেওয়ান চাই। কাজেই তোমার যাওয়া হতে পারেনা। তুমি যদি সিবিলিয়ান হতে, তাহলে না হয় সাহেবকে সরিয়ে নিয়ে তোমার একার উপর সব ভার দেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নয়, তখন হিন্দুস্থান সরকার কিছুতেই রাজী হবেন না।" তারপর খুব সৌজন্য ক'রে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলে সার্বিসে ঢুকছে, না?" বাবা কলকাতায় এসে আমায় আদেশ করলেন যে সিবিলিয়ান আমায় হতেই হবে। ফলে, ইস্পাতের ফ্রেমে একখণ্ড কর্কের ছিপি বসান হল। ফ্রেমের অদৃষ্ট!

ছিপিরও গ্রহের ফের। কোথায় ঘরের কোণে বোতলে আঁটা পড়ে থাকবে, তা না এক প্রকাণ্ড কারখানার ষ্টীল ফ্রেমের ওজন পড়ল তার ঘাড়ের উপর। কর্কের তৈরী বলেই পিষে গুঁড়ো হয়ে যায় নেই। বহুদিন থেকেই ফ্রেমের জন্য এদেশী পেরেক সংগ্রহ হচ্ছিল। ইস্পাত না

হলেও কাঁচা লোহার পেরেক অনেক মিলছিল। কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে লাটের নিরর্থক সৌজন্যের ফলে একটা কর্কের ছিপিকে সেই কাজে লাগানো হল, তাঁকে আমি অভিনন্দন না ক'রে থাকি কি ক'রে? তাঁর বিদ্যার কথা জানি না, তবে তাঁর কীর্ত্তিকে অঘটনঘটনপটীয়সী বললে দোষ কি?

আমার ছেলেবেলার শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলেছি। মন্ত্রীপুত্রের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নই স্বাভাবিক। সে স্বপ্ন অনেক দেখতাম। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে হাকীম হওয়ার উচ্চাশা কখনও হয় নেই, যদিচ আমায় ক্রমাগত লোভ দেখানো হত যে নেটীব সিবিলিয়ান ত এইবার কমিশনার হয়েছে, আর দু-পাঁচ বছরে লাটও হবে। লাট হওয়ার লোভ কিছুতেই হত না। ভাবতে ইংরেজ সরকারের প্রাধান্য তখন সবে একশ বছরের। তাই তার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার উৎসাহ ছিল না। বরং খুব ইচ্ছা হত যে একটা দেশী রাজ্য হাতে নিয়ে গ'ড়ে তুলি। কে জানে ভবিষ্যতে কি সুযোগ হবে। এদেশের পাঁচহাজার বছরের বিচিত্র ইতিহাসে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উত্থান ও পতন ত কত শত হয়ে গেছে। চাকরী সম্বন্ধে আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ দেখি নেই। প্রথম বয়সে মাত্র একজন বড় চাকরী নিয়েছিলেন। অধিকাংশের নজর সেদিকে ছিল না। আজ যে তাঁরা অনেকেই বর্ত্তমান ভাবতের টোডরমল মানসিংহের পদে অধিষ্ঠিত সে কেবল দেশের হাওয়া বদলেছে ব'লে, সরকার দেশের লোককে শাসনকার্য্যে সহায় হতে ডেকেছেন ব'লে।

আমাদের এক Bohemian Society, ভবঘুরে সমিতি, ছিল। তার বৈঠক বসত প্রধানত বন্ধুবর প—র গোয়াবাগানের বাসায়। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের উপদ্রব ছিল না। এক পণ্ডিত মশায় ছিলেন। তিনি চমৎকার লোক। আমাদিকে সর্ব্বদা ভূরি ভোজনে তৃপ্ত রাখতেন। আমাদের সমিতির সাধারণ কার্য্যক্রম ছিল তাসখেলা ও জলযোগ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে প্রোগ্রামও বিশিষ্ট রকমের হত। "গোড়ায় গলদ" পাঠ ও অভিনয় আমাদের খুব প্রিয় জিনিস ছিল। দুয়েকবার Variety Programme-এর মত হয়েছিল। কমিটি ঠিক করলেন কে কি অভিনয় করবে। অভিনেতাদের পারদর্শিতার দিকে কমিটির ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আদেশ অনুসারে কেউবা বাংলা গান করতেন, কেউ ইংরেজী সঙ্গীত চর্চ্চা করতেন, কেউবা তিব্বতী ভাষায় অভিনয় করতেন। সব কথা এখন মনে নেই, তবে ভূ— এমন সরসভাবে "আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে" আবৃত্তি করেছিলেন যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সকলেই তখন নববিবাহিত। বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের

কবিতা আবৃত্তি অল্প বিস্তব সবাইকেই কবতে হত। তবু এমনটি কখনও শুনি নেই। আমাদেব ডাক্তার বন্ধু এক ইংরেজী গান কবলেন। এ বিষযে সেইদিন তাঁব হাতে-খড়ি হল। পবে বিলেতে কতবাব শুনেছি, স্নান কবতে কবতে তিনি খুব জোব ইংবেজী গান গাইছেন। আমাব অদৃষ্টে পড়েছিল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধেব প্রায় সবটাই কড়ি ও কোমল, মানসী ও সোনাব তবী হতে চুবী। কিন্তু বিষয-মাহাত্ম্য এমনই জিনিস যে মণ্ডলীব সকলেবই বেশ ভাল লেগেছিল, অর্থাৎ আমায় কেউ বই বা দোয়াত ছুঁড়ে মাবেন নেই।

আমাদেব কলেজেব কবছব ববীন্দ্রনাথ ছাত্র-মহলে খুব দেখা দিতেন। তিনি নানাস্থানে প্রবন্ধপাঠ কবতেন। আমবা দল বেঁধে যেতাম, আব পাঠ হযে গেলেই 'গান, গান' ক'বে চীৎকাব কবতাম। এই সব সভাতেই "আমায বোলোনা গাহিতে বোলোনা", "আমায় সত্য মিথ্যা সকলই ভুলাযে দাও" ইত্যাদি গান প্রথম বেব হয। কবিবব তখন আমাদেব ববিবাবু ছিলেন। কর্ত্তাবা তাঁকে নেক নজবে দেখতেন না। অনেক বাড়ীতে তাঁবা বলতেন যে ববি ঠাকুব বড় মানুষেব ছেলে, কাজ নেই কর্ম্ম নেই, ব'সে ব'সে ছেলে বখাচ্ছে। যখন এ সব ব্যাপাবেব হিসেব নিকেশ হবে, তখন হযত দেখা যাবে যে, প্রথম বঙ্কিম, তাবপব কবি সত্যিই তিনপুরুষ বখিয়েছেন। খুব ভালই কবেছেন, কেননা সুবোধ বালকেব দৌবাত্ম্য বড বেশী হযেছিল।

একটা বিষয়ে আমাব কবিববেব বিরুদ্ধে নালিশ আছে। অত বড় লোককে যখন কাঠগড়ায় খাড়া কবছি তখন আমাব কেসটা খুলে বলা দবকাব। বালিকাবধূব সঙ্গে প্রেমচর্চ্চাকে তিনি ঠাট্টা কবেছিলেন, সেজন্য আমাদেব কাবও মনে ব্যথা লেগেছিল, এ আমি শুনি নেই। ববং কেউ কেউ সেই কবিতা থেকেই লাইন তুলে প্রেমপত্রে নিজেব ব'লে চালিযে দিতেন। কিন্তু তখনকাব দিনে ফিবিঙ্গীবা যে পথে ঘাটে দুর্ব্বল লোককে নির্য্যাতন কবত সে বিষয়ে কবি কোন কথা লিখলেন না। কিন্তু কোথায কোন্ জাযগায একবাব দুচাবজন কাপুরুষ ছেলে মুক্তি-ফৌজেব সাহেবকে মেবেছিল তাই উপলক্ষ্য ক'বে লম্বা কবিতা বেব হল। এ জিনিসটা তখনও একচোখোপনা মনে হত, এখনও হয।

ফিবিঙ্গীবা কিংবা গোবা সেপাইবা সেকালে লোকেব সঙ্গে যে কি ব্যবহাব কবত তা হয়ত একটু বয়স্থ লোক সকলেবই জানা আছে। আমাদেব শিক্ষাব বিশেষ প্রযোজন ছিল সত্য, কিন্তু এতে যে বাজাব গৌবব হানি হয়। তবু, কর্জ্জন সাহেবেব আগে কোন লাট গোবাদেব জুলুমেব প্রতিবিধান কবতে সাহস কবেন নেই। আজ এ অত্যাচাব

খুব কমে গেছে। হয়ত লোকেও আব বরদাস্ত করবে না, সবকাবও কববেন না। কিন্তু আমি যখন চল্লিশ বছব আগেব কথা লিখতে বসেছি, তখন আমাব এ সব অপ্রিয় কথা না লিখেও উপায় নেই। অপ্রিয়, কেননা নিজেদেবই বদনাম। অপমান হজম কবাতে ত কোন গৌববই নেই। আমি বড় বড় ব্যাপাবেব, অর্থাৎ খুন খাবাবীব, কথা প্রত্যক্ষ কিছু জানি না। সে সম্বন্ধে কিছু বলছিওনা। তবে আমাদেব যে কাবণে দলবদ্ধ হযে ময়দানে চলতে ফিবতে হত, সেটা একালেব ছেলেদেব জানা ভাল। ছেলেবেলায় ইংবেজদেব সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে তাবা ন্যায যুদ্ধ ছাড়া অন্যায যুদ্ধ জানে না। হযত ভদ্রবংশীয ইংবেজ সম্বন্ধে এটা সত্যি, কিন্তু আমাদেব আমলেব গোবা সেপাই কি মেটে সাহেব যে ন্যায় যুদ্ধেব উপাসক ছিল না তাব প্রমাণ খুব সুলভ।

একদিন আমবা জনাতিনেক ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময হঠাৎ নজবে পড়ল স্কোযাবেব ভেতব হাল্লা। দূব থেকে দেখি, তিন-চাবজন ইংবেজী কাপড়-পবা লোক একটি বাঙ্গালীব ছেলেকে মাবছে, লোক জমে গেছে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। আমবা নির্ব্বিবোধী লোক। শুধু দেখবাব জন্য বেড়া ডিঙ্গিযে সেই দিকে দৌড়ালাম। ততক্ষণে পেণ্টুলুন-পবা লোকগুলো গলিতে ঢুকে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি একটি বছব চৌদ্দব ছেলে জখম হযে ভুঁইযে পড়ে, আব পাশে একটা হোঁৎকা গোছেব লোক দাঁড়িযে বক্তৃতা দিচ্ছে, বর্ণনা কবছে কি হয়েছিল। তাব মাথায খুব ঢেউ খেলান তেড়ী, গায়ে জালেব গেঞ্জী, পবণে মালকোঁচা মাবা ধুতি। বক্তৃতা শেষ ক'বে সে খুব জোবে নিজেব বুক চাপড়ে ছুতিনবাব বল্‌লে, "ধিক্! বাঙ্গালীব জীবনে ধিক্।" আগেই বলেছি আমবা ছিলাম নিবীহ লোক। মাথা হেঁট ক'বে চলে গেলাম। সে লোকটাকেও পিটিযে দিতে পাবলাম না। শত ধিক্!

আব একদিন গড়েব মাঠে খেলা ভাঙ্গবাব পব আমবা কযেকজন ফিবছি এমন সময দেখি যে এক বাঙ্গালী ছাত্রকে দুটো ফিবিঙ্গী দাঁড়িয়ে খুব ঘুষো লাথি মাবছে। পাশে আবও দুতিনজন ফিবিঙ্গী দাঁড়িযে স্বজাতিকে সাবাস দিচ্ছে। আমাদেব দল নেহাৎ ছোট ছিল না। দুএক-জনের হাতে বংশদণ্ডও ছিল। তৎক্ষণাৎ আমবা চাবিদিকে দাঁড়িয়ে গেলাম আব ফিবিঙ্গীদেব বললাম, "এ চলবে না। একজন একজন লড়াই কব।" তাই কবতে হল। বাঙ্গালীটি বাহাদুব ছেলে ছিল। খুব ঠুকলে তাব প্রতিদ্বন্দ্বীকে। শেষ তাব বুকে ব'সে মাপ চাইযে ছাড়লে। এ পর্য্যন্ত নালিশ কববাব মত কিছু হয় নেই। কিন্তু ফেববাব পথে মনুমেণ্টেব কাছে আবার ছেলেটিকে কজন ফিবিঙ্গী ঘিবে দাঁড়াল। বোধ হল সেই

প্রথম দলই। ভাগ্যিস আমবা পিছনেই ছিলাম। আমবা হুঙ্কাব ছাডতেই তাবা বেগতিক দেখে বণে ভঙ্গ দিলে।

আমাব নিজেব কখনও বণে ভঙ্গ দিতে হয নেই। ধাক্কা ধুক্কি যা খেযেছি এক-আধবাব, সে অতি সামান্য ব্যাপাব। তা সে ঋণও গায বাখি নেই। তবে একবাব passive resistance কবতে হয়েছিল। ঘটনাটা গল্প হিসেবে মন্দ নয। আগেই বলেছি, মাঠে আমবা বড় একটা একা একা ঘুবতাম না। একদিন ডালহৌসিব মাঠে খুব বড় খেলা ছিল। কথা ছিল আমবা সকলে ক্লাব থেকে যাব। কিন্তু আমি যখন পৌঁছলাম, তখন একটু দেবী হযেছে। সকলে চ'লে গেছে। ইতস্ততঃ কবছি এমন সময় বাস্তাব ওপাবেব মাদ্রাসা ক্লাবেব ছেলেবা বললে, "চল বাবু, ম্যাচ্ দেখতে যাবে না ?" গেলাম তাদেব সঙ্গে। তখনকাব দিনে পযসা দিয়ে ম্যাচ্ দেখাব বেওযাজ বড একটা ছিল না। মাঠেব তিনদিক খোলা থাকত। একটা জাযগা বেছে আমবা চাবজন সামনে দাঁডালাম। খানিক পবে পেছনে বিজাতীয আওযাজে চীৎকাব শোনা গেল, "Make room, হট যাও।" হঠাৎ আমাব মাথাব উপবে এক বেতেব ঘা পডল। বেতটা হেঁচকা মেবে টেনে নিযে দূবে ফেলে দিলাম। ফিবে দেখি, Buff পলটনেব জনা পঁচিশেক বীব যোদ্ধা বেগে লোক সবিযে দিচ্ছে। অবহেলে সবিয়ে দিলে। যতক্ষণে তারা তুই সাব দিয়ে দাঁডিয়ে গেল ততক্ষণ আমাব মাদ্রাসাব সঙ্গীবা অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। আমি একা পড়লাম সেই সেপাইদেব লাইনেব সামনে। অবস্থা সঙ্গীন। এক মুহূর্ত্ত ভাবলাম মাব খাব, না স'বে পড়ব। তাবপব মনে হল স'বে ত পড়ছিই আজ কত শ' বছব, না হয মাবই খাই। কে জানে হযত কুঁডেমিই ধবল, কে আবাব সবে। ক্রমশঃ বুঝতে পাবলাম যে আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলে ঠেলে মাঠেব গণ্ডীব মধ্যে ঢুকিযে দিচ্ছে। তখন আমিও, "একা কুম্ভ," পেছনে ঠেলতে আবম্ভ কবলাম। গ্রাম্য ইংবেজীতে নানা বকম শ্লীল অশ্লীল ঠাট্টা তামাসা কানে আসতে লাগল। তুএকটা গাঁট্টাও মাথায খেলাম। আমাব পেছনে ঠেলা কিন্তু বন্ধ হল না। ইতিমধ্যে একজন linesman "পিছে, পিছে হট্ যাও" বলতে বলতে নিশান হাতে এসে পড়ল। সেও Buff সেপাই। হয়ত তাব সাঙ্গাতদেব সঙ্গে চোখে চোখে কিছু ইসাবাও হয়ে থাকবে। যাই হোক, লোকটা যেই আমাকে "পিছে, বাবু," ব'লে ঠেলা মাবলে, অমনি পশ্চাতেব তুজন সেপাই ফাঁক হযে গেল। ফলে আমাব দেহেব উপবটা পেছনে ঝুঁকে পডল। কিন্তু আমি আগে থেকেই গোড়ালি কাদায় গেড়ে পা ফাঁক ক'বে দাঁড়িয়েছিলাম, তাই পড়ে গেলাম না। তখন সেই অবস্থায আমাকে সেপাই তুটো টিপে

ধরলে। আমি দুই কনুই দিয়ে তাদের পাঁজরার উপর passive resistance বার দুই চালাতেই তারা কোঁক ক'রে আবার ফাঁক হয়ে পড়ল। সুবিধা পেয়ে আমি পিছিয়ে তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলুম। ততক্ষণে খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার খেলা দেখার মত অবস্থা ছিল না। পিছন থেকে লাথি, গাঁট্টা, ধাক্কা ক্রমাগত খাচ্ছিলাম। বিপদে পড়ে আমিও যে চাঁট দু-চারটে মারি নেই তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি জবাব দিচ্ছিলাম মোটামুটি দুধারের পাঁজরার উপরে। একটা কথা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে কোন পক্ষেই ক্রোধের উদ্রেক হয় নেই। তারা যা করছিল অভ্যাস দোষে, আমি যা করছিলাম ভয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট এই রকম ধস্তাধস্তি চলল। আর বেশীক্ষণ চলে না। আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করছে। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, "Let him be, Jim" (ছেড়ে দে, জিম)। এতক্ষণ আমার মুখ দিয়ে ভাল মন্দ একটি কথাও বের হয় নেই। এখন ফিরে বললাম, "Thank you"। আমার ডান পাশের সেপাইটি আমার সামনে সিগারেট কেস খুলে ধ'রে বললে, "You are a plucky lad"। আমি তাকে জানালাম যে আমার প্রায় হয়ে এসেছে। সে আমায় ভুঁইয়ে বসবার জায়গা ক'রে দিয়ে বললে, "আমার পাঁজরাগুলো তোমায় সহজে ভুলবে না।" আরাম ক'রে ম্যাচ্ দেখে টলতে টলতে বাড়ী ফিরলাম।

কোন রকম জাতিবিদ্বেষ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। জাতি-বিদ্বেষ সকল অবস্থাতেই ঘৃণ্য জিনিস। তাছাড়া, সেকালের যা সমস্যা ছিল আজকের সমস্যা তা নয়। সুতরাং আমার গল্প থেকে আজকের প্রযোজ্য কোন নীতি কেউ টেনে বের করলে আমার উপর অবিচার হবে। যে কালের কথা আমি বলছি তখন ব্যায়াম চর্চ্চার দরকার ছেলেদের মনে খুব জেগে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বেই শোভাবাজার ক্লাব ফুটবলে আর টাউন ক্লাব ক্রিকেটে অনেকটা এগিয়ে গেছল। আমাদের সময়ে প্রথমে মোহনবাগান, পরে ন্যাশনাল ফুটবল খেলতে নামল। বুট প'রে খেলা চলে গেল প্রধানতঃ ন্যাশনালের উদাহরণে। নন্দলাল শুধু-পায়ে shinguard পরা দুচারটে পা ভাঙ্গার পর ভয় ভাঙ্গতে লাগল। ক্রমে বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব খেলার ধারা তৈরী হয়ে উঠল। শোভাবাজারের right wing, বড়বাবু, অবশ্য চিরকালই শুধু-পায়ে খেলতেন। ক্রিকেটে বাঙ্গালী কখনও বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। তবু ঢাকার সুধন্বা রাখড়ার খেলা যা ছিল, টাউন ক্লাবের কুলদারঞ্জন, শিবপুরের প্রমদারঞ্জন ও বিশপস্ কলেজের শ্রীশ দে তার চেয়ে অনেক উন্নতি ক'রে গেলেন। যতীনবাবুর (রাখড়ার) বিখ্যাত সেকেলে underhand (তিনি বলতেন,

ছেঁচড়া) bowling প্রমদারঞ্জনের scientific bowling-এর সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না। ক্রিকেট খেলায় একটা নীরব সাধনার দরকার। হয়ত সেটা বাঙ্গালী প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ফুটবলে কিন্তু যে গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো বোধহয় বাঙ্গালীর অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। উপরন্তু ফুটবল-প্রীতির আর একটা কারণও দেখা যেত। আমাদের অত্যন্ত লোভনীয় জিনিস ছিল কেল্লার গোরাদের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষ, বলপরীক্ষা। এই কেল্লার গোরা আমাদের চোখে ছিল মূর্ত্তিমান পশুবল। এদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি না হলে নিজেদের পশুবলের উৎকর্ষ সাধন কি ক'রে হবে। এমনও দেখেছি যে ম্যাচের পর খেলোয়াড়রা ব'সে ব'সে হিসেব করছে কে কটা গোরাকে আছাড় দিয়েছে। যেন সেটা গোল দেওয়ার চেয়েও দরকারী জিনিস! শোভাবাজারের ব্যাক কালী মুখুয্যে দর্শকের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন প্রধানতঃ মানুষ ঘায়েল করতে পারতেন ব'লে। বাঙ্গালীর ঘুষো খেলা তখন সুরু হয়েছে। তবু ওটা যে কলকাতার নিত্য জীবনে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস তা সকলেই বুঝত। শেখার সুযোগের অভাব ছিল। যারা খুব উৎসাহী তারা অনেক পয়সা গুঁজে কেল্লায় শিখে আসত। পাঠককে একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার যে বর্ত্তমান লেখক সব খেলা খেললেও নিতান্তই হাতুড়ে চিরদিন।

আমি যে বছর কলেজে ঢুকলাম তখন পর্য্যন্ত কলেজ ক্লাব ছিল না। ক্রমশঃ সেটা গ'ড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠপোষকের এত অভাব ছিল যে আমরা অনেক চেষ্টা ক'রেও ক্লাবটাকে জমকাল করতে পারি নেই। খেলা সম্বন্ধে প্রেরণা সংগ্রহ ক'রে আনতে হত অন্য বড় বড় ক্লাব থেকে। যাই হোক, ক্রমশঃ আমাদের নিজস্ব খেলার দল খাড়া হল, দুচারটে ম্যাচও খেলা হতে লাগল। ফুটবলের রঙ্গীন জামা তৈরী হল। এখন দেখতে পাই আমাদের অত সাধের লাল নীল রঙ্গের বদলে কলেজ টীম নিতান্ত prosaic নীল রঙ্গের জামা পরেন। রঙ্গীন জামা প'রে প্রথম ম্যাচটা আমার বেশ মনে আছে। আমি ব্যাকে খেলছিলুম। হটাৎ এক ষাঁড় দূর থেকে জামার ঝকঝকে গোলাপী রঙ্গ দেখে আমাকে শিঙ্গে চড়াবার মৎলব ক'রে চড়াও হয়ে এল। আমার নজর ছিল বলের দিকে। গোলকীপার তাড়াতাড়ি গোলের ডাণ্ডাটা খুলে নিয়ে ষাঁড়কে মেরে আমায় রক্ষা করলেন। কাজটা সহজে হল না। কথায় বলে, red rag to a bull। আমাদের বড় সাহেব পয়সার বেশ সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। প্রথম কড়া নিয়ম জারী হল যে বিকেলে সবাইকে কসরতের আখড়ায় হাজিরা দিতেই হবে। তারপর হুকুম হল যে যারা ক্লাবে খেলবে তাদের

কসরৎ না করলেও চলবে। শতকরা আশী জনের অঙ্গ সঞ্চালন করবার কোন ইচ্ছাই ছিল না, কি ক্লাবে, কি আখড়ায়। কিন্তু তাদের ক্লাবে ঢোকার পথ আমরা বেশ সুগম ক'রে দিলাম। ফটকের কাছে খাতা হাতে ধরণা দেওয়া নিত্যকর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল। এই রকম ক'রে যত টাকা সংগ্রহ হত, বড় সাহেব সরকার থেকে আবার তত টাকা মঞ্জুর করতেন। এত সুবিধা না ক'রে দিলে ক্লাবটি আঁতুড়েই মারা যেত। গ্রিফিথস্ সাহেব আমাদের সুখ দুঃখ বুঝতেন ব'লেই তাঁকে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। ছেলেপিলে ত একটু স্বার্থপর হয়েই থাকে।

এই ফুটবলের নেশা কিন্তু সবাই ভাল চোখে দেখতেন না। একদল কর্ত্তা-ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা বলতেন হাডুডু, কপাটি, গুলি-ডাণ্ডাই বাঙ্গালীর পক্ষে প্রশস্ত। বিদেশী খেলায় তার কিসের দরকার। আর একদল আবার এঁদের চেয়েও গোঁড়া। তাঁদের মতে আড্ডা মাত্রই ছাত্রদের পক্ষে খারাপ, তা সে তাসের আড্ডাই হোক, আর ব্যায়ামের আড্ডাই হোক। ওসব স্থানে গেলে ছেলেরা সিগারেট খেতে এবং শা— ব'লে গালাগাল দিতে শেখে। এই মর্ম্মে একবার একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এসব কুসংস্কার যাঁরা ভেঙ্গে দিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান আমার বন্ধুরা। ভূ— মালকোঁচা মেরে ফুটবলেও যেতেন, পরীক্ষাতেও ফার্ষ্ট হতেন। পরের জীবনে চাকরে মানুষের কাম্যলোকে উঠেও তার মোহনবাগান-প্রীতি মন্দা হয় নেই। সুহৃদ ন—রও ঐ দশা। তাঁকে আদালত ছাড়া কোন ব্যাপারে পাওয়া কত কঠিন তা সবাই জানেন। অথচ ক্রিকেট, ফুটবল, কি সাঁতারের স্থানে দরকার হলে এটর্ণি ফিরিয়ে দিয়েও তিনি সেখানে হাজির হন। আবার আমার মত মানুষও ছিল যারা খেলার হুজুগে পরীক্ষা ভাসিয়ে দিলে, আর বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত খেলা খেলা করেই কাটিয়ে দিলে। মোটের উপর আমাদের মধ্যে দেহচর্চ্চার (দেহতত্ত্বের নয়) হাওয়াটা জোর বয়েছিল। তবে আমাদের হাত পা ছোঁড়াই সার হল, সাফল্য পেলে পরবর্ত্তী ছেলেরা।

কলেজে একটা Debating Society ছিল, যেখানে নানাবিষয়ে তর্ক বিতর্ক হত। আমাদের দলের কেউ সেখানে বিশেষ নাম করেছিলেন ব'লে মনে নেই। এটা আশ্চর্য্য, কেননা আমাদের অনেকেই পরের জীবনে হাইকোর্টে বক্তৃতা ক'রে যেমন জজকে তেমনি মক্কেলকে অক্লেশে ঘায়েল করেছেন। তবে স্বীকার করতে হয় যে এক প্র— ছাড়া রাজনৈতিক সভায় কেউ সুবিধা করতে পারেন নেই। আমাদের ঠিক আগের দলের সুরেন মল্লিক, নীরদ চাটুয্যে প্রভৃতি বেশ ভাল বক্তা ছিলেন। এই তর্ক-সভার কর্ত্তা ছিলেন উইলসন সাহেব। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাদের

সঙ্গে খুব মিশতেন। আমাদেরও তাঁকে খুব ভাল লাগত। কিন্তু কি হল কে জানে, আস্তে আস্তে ছেলেরা তাঁর ওপর নারাজ হয়ে গেল। শেষ একদিন হল কি, তিনি হোষ্টেলে যে ঘরে ঢুকতে লাগলেন, ছেলেরা জাত যাবে ব'লে তাদের জলের কুঁজো ফেলে দিতে লাগল। এই নিয়ে একটু গোলযোগও হয়েছিল। একদিন আমাদের সভায় হিন্দুর বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে তর্ক হচ্ছিল। আমি হিন্দুর বিলেত গেলে জাত যায় এই মর্ম্মে আমার সাধ্যমত একটা ছোট-খাটো বক্তৃতা করলাম। উইলসন সাহেব সভাপতি ছিলেন। সভার পরে তিনি বাইরে এসে মহা গরম হয়ে আমায় বললেন, "তোমরা সবাই hypocrite, মনে এক, মুখে এক। তুমি নিজে বছরখানেক বাদে বিলেতে যাবে, অথচ আজ সভায় বললে বিলেত যাওয়া উচিত নয়। সেদিন হোষ্টেলের ছেলেরা হঠাৎ এমনি হিন্দু হয়ে উঠল যে আমি ঘরে ঢুকতেই তাদের জল নষ্ট হয়ে গেল।" আমি নিবেদন করলাম, "স্যার, হোষ্টেলের কথা আমি জানি না, আমি সেখানে থাকি না। কিন্তু তর্ক-সভায় তর্কের খাতিরে মানুষ যা বলে সেটা তার মত ব'লে কেউ ধরে না।" তাতেও সাহেব ঠাণ্ডা হলেন না। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের অঙ্কের অধ্যাপক লিটল্ সাহেব। তাঁর বদ মেজাজী ব'লে খ্যাতি ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের অন্তর বড় ভাল ছিল। তিনি উইলসনকে একটু চেঁচিয়েই বললেন, "এ তুমি কি রকম কথা কইছ? আমাদের কেম্‌ব্রিজ, অক্‌সফোর্ডে কি হয়? ইউনিয়ানের সভায় যার যেদিক ইচ্ছা তর্কের সময় ত সেইদিক নেয়।" তখন আমিও সুবিধা পেয়ে উইলসন সাহেবকে বললাম, "মশায়, আর এক কথা, আপনি জাত তুলে গালাগাল দেন কেন? যা বলবেন আমাকে বলুন, তোমরা তোমরা তোমরা করেন কিসের জন্য?" লিটল সাহেব বল্‌লেন, "খুব ঠিক কথা। সেদিন আমি এই ছোকরাকে দুষ্টুমি করার জন্য ধরেছিলাম। ওর বাঁদরামীর জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে বাঁদর বল্‌লে অবশ্য দোষ হবে।" আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ বা গবেষণার কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না। আমরা এম এ ক্লাসে এক বৈজ্ঞানিক সমিতি স্থাপন করেছিলাম। সেখানে অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক বিজ্ঞান-বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান, তাঁরাও নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়তেন।

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় আমি ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। সেইজন্য বি এ পাশ হওয়া পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা থিয়েটার দেখার অনুমতি পাই নেই। বাই নাচ দেখা ত ইহজীবনে হল না। কিন্তু দুবার বিলেত থেকে ইংরেজী কোম্পানী এসেছিল শেক্স-

পীযাবের নাটক প্রয়োগ ক'রে দেখাতে। একবাব Milne, আব এক-বাব Potter-Bellew। সে অভিনয় আমবা অনেকবার দেখেছিলাম। বাড়ী ও কলেজ ছু জায়গা থেকেই, শুধু অনুমতি নয়, আদেশ পেয়েছিলাম। এই সব কোম্পানীব অভিনেত্রীবা সাধুচবিত্র, এদেব দেখলে দোষ নেই, এই বোধহয় অভিভাবকদেব সংস্কাব ছিল। এ সংস্কাবটা যে নেহাৎ কুসংস্কাব তা অনেক পবে জানলাম। কিন্তু যেদিন আমরা হ্যামলেট দেখতে প্রথম যাচ্ছি, আমাব মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, তবে যে তোদেব থিযেটাব দেখা বাবণ?" আমি তখন উত্তব দিলাম, "সে বাঙ্গালা থিয়েটাব।" মা বল্লেন, "কে জানে, বাবু? বাংঙ্গলা ইংবেজীতে কি এসে যায়?" মেয়েদেব বুদ্ধি পুরুষদেব চেয়ে অনেক logical, ন্যায়সঙ্গত, হয়ে থাকে। তখন, খুব বেশী দিন আগের কথা নয় এই ইংবেজী অভিনেত্রীদেব বিলেতেই এত নীচ জাতি মনে কবত যে গির্জ্জায় সাধাবণ কববস্থানে এদের মাটি দেবার হুকুম ছিল না। মোট কথা, আমাদেব সময়ে কলকাতা সমাজে একটা শুচিবাই বেশ প্রবল ছিল।

বাজনৈতিক আবহাওয়াব কথা একটু বলি। কলকাতাব সঙ্গে আমাব পবিচয় ১৮৯০ সালে। লর্ড বিপনেব বাজত্বেব ও ইলবার্ট বিলের জেব তখনও চলছে। ছোট জাতের সাহেবদেব যে নেটীব বিদ্বেষেব কথা বলেছি সেটা এবই ফল। কারণ, সিপাহী-বিদ্রোহ তখন বহু পুবাতন ব্যাপাব। বছব পাঁচ-ছয় আগে বড়লাটের শুভ আশীর্ব্বাদ নিযে কংগ্রেস মহাসভাব বোধন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুবেন্দ্রনাথ ও তাঁব মত ছুযেকজন নামকাটা সেপাইএর দৌলতে উক্ত মহাসভা সবকাবেব চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনা কাবণে, কেননা কংগ্রেসেব কর্ত্তারা নিবীহ জীব ছিলেন, ইংবেজেব সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ তাঁদের স্বপ্নেবও অগোচব ছিল। Consent Bill-এব দরুন যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল সেটা কতকটা অন্য ধবণেব। তাব মূলে একটা দুর্দ্দম জাতিবিদ্বেষ ছিল। সবকারও সেটা বুঝতেন। তাই বঙ্গবাসীব দলকে ধ'বে বাজদ্রোহেব জন্য সাজা দিলেন। আমাব ছুজন সহপাঠী কলকাতা কংগ্রেসে সেবক হযেছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মে ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁবা কলেজে বেশ প্রকাশ্যভাবে বঙ্গবাসীওয়ালাদেব নিগ্রহে আনন্দ প্রকাশ কবতেন। কলকাতাব বাঙ্গালী সমাজ তখন বঙ্গবাসীব দল আব সঞ্জীবনীব দল এই ছুই দলে বিভক্ত ছিল। আব এঁদেব পরস্পবেব বিদ্বেষেব দরুন কলকাতায় প্রায় সকল কাজই পণ্ড হত। এই ঝগড়ার বিষ কলেজে মেসে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বেনেটোলার এক মেসে দোলেব দিন মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত হযে গেল। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতনী আর হিউগেনোদের

অনেক কাটাকাটি হযে যাওয়াব পবে যেমন এক পলিতিক দল উঠে আস্তে আস্তে তুবকমেবই গোঁড়াদেব হটিয়ে দিলে, আমাদেব কলকাতাতেও তেমনি এক পলিতিকদল হিতবাদী কাগজ বেব কবলেন। তাঁবা অবতীর্ণ হলেন তুই গোঁড়া দলকেই "হিতং মনোহাবিচ তুলর্ভং বচঃ" শোনাবাব জন্যে। ক্রমে এই পলিতিক দলই বাঙ্গলার আকাশ ছেযে ফেললে। তাঁদেব সামনে গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ তুই বণে ভঙ্গ দিলেন। অবশ্য তাঁবা তখন আব হিতবাদীব দল বইলেন না, কাবণ হিতবাদী প্রথম তুই একজন সম্পাদকেব পবেই সনাতনীব ধ্বজা উড়ালেন। যাকে বিপ্লবপন্থী বলা যায়, এবকম কেউ আমাদেব সময় ছিল না। যাবা ইংবেজকে শত্রু ভাবত তাবাও বিক্টোবিয়াকে মহাবাণী ব'লে মানত। এটা খুব স্পষ্ট বোঝা গেছল কযেক বছব পবে। মহারাণীব মৃত্যু হলে গড়েব মাঠে যে অপৰূপ দৃশ্য সে সময় একদিন দেখা গেছল, তাব একমাত্র মানে এই হতে পাবে যে জনসাধারণ রাণী বিক্টোবিযাকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা কবত। সেই দৃশ্য দেখেই ত লাট কার্জ্জন বলেছিলেন, "If it is real, what does it mean ?" ১৮৯৫ সালে ইংলিসম্যান কাগজে এক উড়ো চিঠি, A Rampant Epistle, নামে ছাপা হয। সে চিঠিব লেখককে ধবলে দণ্ডবিধি আইনেব ১৫৩ এ ধাবা অনুসাবে সাজা দেওয়া চলত। কিন্তু একটা মস্ত ভাববাব কথা হচ্ছে এই যে তাতে সম্পাদকেব জাত ভাইদেব বলা হয়েছিল, "তোমরা স'বে পড়। আমবা মহারাণীব নামে এদেশ শাসন কবব।" অর্থাৎ ঐ শ্রেণীব পাগলাদেব মনেও তখন ইংলণ্ডেশ্ববেব সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কবাব ভাব আসে নেই। চিঠিখানা নিতান্ত নগণ্য, তবে ইংলিশম্যান তাব খুব সদ্ব্যবহার বছবখানেক ধ'বে কবেছিলেন। আর দেশী কাগজওয়ালাবা সেটাকে ইংলিশম্যান আফিসেব জাল ব'লে ধ'বে নিয়েছিলেন। কেননা ওবকম সংযত পাগলামীও তাঁদের কল্পনার বাহিবেব জিনিস ছিল। চিঠিটা জাল নয়, কাবণ তাব খসড়া আমি দেখেছি। পাঠকেব মনে একটা ধাবণা ক'রে দিতে চেষ্টা কবলাম যে আমাদেব ছাত্র-জীবনে রাজনৈতিক হাওয়া মৃত্নমন্দ গতিতেই বইত। বিক্টোরীয় যুগের ভব্যতাব গণ্ডী ছাড়িযে যায় নেই। কে জানে, হয়ত সে হাওযাকে সময় থাকতে কল চালানোব কাজে জুড়ে দিলে, আজ ইউবোপেব ঝঞ্ঝাবায়ু এদেশ বিধ্বস্ত কবত না।

বাজনীতি চর্চ্চা আমাব অধিকাবেব বহির্ভূত। মাঝে মাঝে লোভে প'ড়ে গণ্ডী পাব হযে যাই, পবে পস্তাতে হয়। এই বেলা আব একটা গল্প জুড়ে দেওয়াই ভাল। আমরা কলেজে থাকতে বোডিসিয়া ব'লে এক রণতরী গঙ্গায় এসে লাগল। পেছনে পেছনে এল একটি ছবির মত

সুন্দর টরপিডো বোট, নাম মারাথন। এই দুই জাহাজের মাল্লারা শহরের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধবধবে সাদা কাপড়, হাসিহাসি মুখ, হেলেদুলে চলন, দেখে আমি ত মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মনে হত এইসব লোক নিয়েই বোধহয় বোডিসিয়া একদিন রোমানদের হাযরান ক'রে তুলেছিলেন, এরাই হয়ত মারাথনে ইরানের দুর্দ্ধর্ষ বাদশাহকে হটিয়ে দিয়েছিল। একদিন এদের মাত্র দুজন আমাদের চুনাগলির পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশ জন মেটে সাহেবকে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলে। আমাদের বাড়ীর পাশে এক চেলা কাঠের দোকান ছিল সেইখান থেকে ক্ষেপনীয় অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে শত্রুদের উপর বর্ষণ করতে লাগল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! যুদ্ধজয়ের পর কাঠের দোকানে গিয়ে, আবার একটা দশ টাকার নোট খেসারত দিয়ে গেল। আমি স্থির করলাম এরা সাহেবের সেরা, এদের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। পরদিন দুজন মারাথনের মাল্লাকে ধরলাম ইডেন গার্ডেনে। ব'সে ব'সে তারা আমাদের সঙ্গে কত গল্প করলে। তাদের মাল্লার জীবন যে কি সুন্দর আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে। আমরা ধরলাম, "চল, তোমাদের জাহাজ দেখাও। আমরা টরপিডো বোট কখনও দেখি নেই।" একজন বললে, "আজ নয়, কাল এসো। জাহাজে উঠে আমাদের ডাক দিও। আমার নাম বার্বার, ওর নাম উড। মনে থাকবে? Barber is one who shaves, and Wood is something you can't shave with!"

পরদিন গেলাম। বড় জাহাজটা ত বেশ দেখা হল। কিন্তু মারাথনের সামনে যে গোরা পাহারা দিচ্ছিল সে ঢুকতে দিলে না। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকটা খোট ছাড়লে না, "No orders!" ইতিমধ্যে খুব জরিঝক্কা পরা এক বড় সাহেব বোডিসিয়া থেকে বেরিয়ে এলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি স্বয়ং নৌ-বহরের অধিনায়ক। তাঁর কাছে নালিশ করলাম। তিনি গোরাটার সঙ্গে কথা কয়ে এসে খুব ভদ্রভাবে বললেন, "তোমরা নেটীব কাপড় প'রে এসেছ তাই ঢুকতে দিচ্ছেনা। ও কেল্লার গোরা, ওর ওপর আমার কোন অধিকার নেই। I am sorry, boys!" তবু দাঁড়িয়ে রইলাম জাহাজের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে। সাহেবদের মজলিসে আমাদের কত হোমরা-চোমরা কর্ত্তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তীর্থের কাকের মত, আমাদের কিসের লজ্জা। আমরা প'রে এসেছিলাম গরম ইজার আর সার্জের গলাবন্ধ কোট। অর্থাৎ আমাদের অফিসকা কাপড়া। তাকে বললে কিনা নেটীব ড্রেস! হঠাৎ দেখি দুই বন্ধু বেরিয়ে আসছেন মারাথন থেকে। তাঁদের আমাদেরই মত পোষাক, শুধু মাথার উপর, আমরা

যাকে monkey cap বলতাম, সেই জিনিস। তাড়াতাড়ি তাদেব শিবস্ত্রাণ চেয়ে নিয়ে আমবা মাথায় দিলাম। গোবাটা হেসে বললে, "এই ত এইবাব বেশ সাহেবী কাপড হয়েছে, চলে যাও ভেতবে।" ভেতবে গিযে আমাদেব সেই তুই বন্ধুব সন্ধান করলাম। তাবা এক গাল হেসে উঠে এল, ঘুবে ঘুবে আমাদেব সব দেখালে। চা খাওযালে, সিগাবেট দিলে পর্য্যন্ত। আসবাব সময় আমাব ভাই তুটো টাকা তাদেব দিতে গেল তাবা কিছুতেই নিলে না। বললে, We don't rob boys। পবেব জীবনেও মানোয়াবী গোবাদেব সঙ্গে যখনই আলাপ হয়েছে বড় আনন্দ পেয়েছি। একেবাবে ছোট ছেলেব মত প্রকৃতি। গল্পটা থেকে পোষাকেব মাহাত্ম্য পাঠকেব হৃদয়ঙ্গম হল ত ? আমাব ত হযেছিল। ঘটনাটা আমাব স্মবণীয় কেননা জীবনে সেই প্রথম ইউবোপীযান ড্রেস পবা। একবাব কাশী বেড়াতে গেছলাম সেখানেও পোযাক-বিভ্রাট ঘটেছিল। ব্যাস-কাশীতে বামনগবে কাশী-নবেশেব কেল্লা। সে কেল্লাব অনেক স্তুতিবাদ শুনে দেখতে গেলাম। কিন্তু ফটকেব প্রহবী আটকে দিলে। বললে, "নাঙ্গা শিব অন্দব যানে কা হুকুম নেহি।" তাড়াতাড়ি মলমলেব টুপী জোগাড় ক'রে আনিয়ে প'বে কেল্লা দেখা হল। বাঙ্গালীব মাথাকে এত ভয় কেন সকলেব ?

১৮৯৫ সালে বাজদববাবেব সঙ্গে সাক্ষাৎ পবিচয় হল। মহাবাজেব হুকুম এল যে আমি বড় হযেছি, এবাব আমাকে যথাবীতি তাঁব দববাবী হতে হবে। কুচবেহাবে গেলাম। আবাব পোষাক-বিভ্রাট! আমাব সে সার্জেব গলাবন্ধ কোর্ত্তা ত চলবে না। চুড়িদাব পায়জামা ও আঙ্গবাখা প'বে, মাথায় মুবেঠা বেঁধে গিয়ে দববাবে হাঁটু গেড়ে বসলাম। যখন ডাক পড়ল তিনবাব কুর্ণিশ ক'বে রাজসিংহাসনেব সামনে গিযে দাঁড়ালাম। আতব-মাখা রুমালেব উপব এক আশবফি রেখে মহাবাজেব সামনে ধবলাম। তিনি ঈষৎ হেসে আমাব নজব স্পর্শ কবলেন। আবাব কুর্ণিশ ক'বে পিছু হেঁটে নেমে এলাম। বোমান্টিক প্রকৃতি হওয়াব অনেক জ্বালা! নিজেব আসনে ব'সে একটু ক্ষণ চোখ ঢেকে বইলাম। সব যেন বেঠিক হযে গেছে। কোথায় বয়েছি. এ কোন শতাব্দী, কে বাজা, কে আমি ? চকিতেব মত মনে হল যেন আমাব জীবনেব মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। তবে স্বপন আব কতক্ষণ থাকে।

কলকাতাব অনেক কথাই আমাব বলা হল না। প্রথম যখন আসি তখন খুব কম লোকেব সঙ্গেই পবিচয় ছিল। যে কজন চিনতাম তাঁবা আমাদেব আত্মীয়, আমাদেব জেলাব লোক। তাঁদেব মধ্যে প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ গিবীশবাবু ও ক্ষুদিবামবাবু। তুজনেই অধ্যাপক ছিলেন, আব তুজনেই জানতেন যে ছেলেপিলেব শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, পুবোমাত্রায় কি.

ক'রে আদায় করতে হয়। সকলের হেনস্তার জিনিস ধুতিকে যাঁরা আজ সম্মানের পদবীতে তুলেছেন গিরীশবাবু তাঁদের মধ্যে প্রধান। সেকালের বিলেত-ফেরৎ, কিন্তু ফিরে এসে অবধি একদিনও ইজার পরেন নাই। অথচ তাঁর অতি বড় শত্রুও তাঁকে কোনদিন নড়বড়ে ঢিলেঢালা মানুষ বলতে পারে না। ক্ষুদিরামবাবু নামে হিন্দু হলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম, যাঁরা কখনও খোসামোদ করতেন না, মিথ্যা কথা, মিথ্যাচার জানতেন না। এ দুজনের কাছে ছাত্রজীবনে অনেক আশীর্ব্বাদ, অনেক শিক্ষা পেয়েছি।

আমার বিবাহসূত্রে কলকাতার অনেক বনেদীঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা হল। একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। সেকালের কলকাতার exquisites, সেকালের কাপ্তান, আজ আর নেই। একদিন তাঁদের কথা বলব। হয়ত এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব। তাতে পাঠক যদি আমায় ধামাধরা বলেন তাহলেও রাগ করব না।

আমার ছাত্রজীবনের যথার্থ গুরুর নাম এইবার করব। তাঁর কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখতে পেরেছিলাম বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু আরও অনেক জিনিস শিখেছিলাম যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের বাইরে। তাঁর নাম বললে অনেকেই চিনবেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন বিলেতে পাশ করি তিনি লিখেছিলেন, "এত আমার গুরুদক্ষিণা হল না, বাবাজী। সেটা বাকী রইল, ভুলো না।"

আমার বিদ্যার্জ্জন-নামক প্রহসনের খুঁটি-নাটি চেপে যাওয়াই ভাল। কোনরকমে বিএ পরীক্ষার মোহানা পার হয়ে গেলাম, কিন্তু Post-Graduate নদী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা বানচাল! বন্ধুরা সকলেই বিজয়পতাকা উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে জীবন সংগ্রামে যাত্রা করলেন। আমাকে নিয়ে আমার কর্ত্তৃপক্ষ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেকালে যদি কোন ছোট ছেলের কোথাও লেখাপড়ায় মনোযোগ হত না, তাকে কটন ইস্কুলে পাঠান হত, যদি না সে নিজের বুদ্ধির জোরে সরকারী reformatory-তে ঢুকে পড়ত। তেমনি একটু বয়স্থ ছেলেদের চালিয়ে দেওয়া হত বিলেতে, কেননা সেখানে তখনকার দিনে বিনা শ্রমে বিনা আয়াসে ব্যারিষ্টার হয়ে আসা যেত। আমার সার্বিস পরীক্ষা পার হওয়া সম্বন্ধে সকলে সন্দিহান হলেন। কিন্তু তাঁদের আশা, পাস হয়ে যায় ভালই, নইলে ব্যারিষ্টার ত হবে। এদিকে আমি প্রাণপণ টানাটানি করছিলাম যাতে বিলেত না যেতে হয়। শেষে একদিন শুনলাম যে বিলেত যদি না যাই ত ডেপুটী কলেক্টর হতে হবে। হাকীমী আমার অদৃষ্টে বাজছে। ভাবলাম, তাই যদি হয় ত তপ্ত বালির পূজা কেন করি; দীপ্ত সূর্য্যের উপাসনা করা যাক। বাবাকে জানালাম

যে আমি বিলেত যেতে রাজী আছি। এর ভেতর আর একটা কথা ছিল সেটা প্রকাশ করি। ব্রেজিলের সেনানী সুরেশবাবুর নাম সকলেই শুনেছেন। তাঁকে আমি খানদুই চিঠি লিখেছিলাম আমায় সেই দেশে একটা গতি ক'রে দিতে। মনে করলাম, বিলেত থেকে ব্রেজিল যাওয়া সোজা হবে। কিন্তু অদৃষ্ট কি এড়ান যায়? আমি ছমাস কাল bar-এ জমা দেওয়ার টাকাটা ধ'রে রাখলাম। শেষে শুনলাম সুরেশবাবু মারা গেছেন। সেপাইগিরি অদৃষ্টে নেই, হবে কোথা থেকে? এত কথা'ত আর কলকাতায় থাকতে জানতাম না। কাজেই শ্বেতদ্বীপে পাড়ি জমাবার জোগাড়যন্ত্র করতে লেগে গেলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ও সম্পত্তির স্বরূপ

চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। তার মধ্যে কারা যেন সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে পথ চলছে। আলো নেই, বাতাস নেই—পাতালপুরীর মূর্চ্ছাহত জীব অঙ্গারের মত নিঃশ্বাস ফেলছে। চক্ষে তাদের ধ্বংসের ইঙ্গিত, কশ বয়ে উত্তপ্ত শোণিত ঝরে পড়ছে, পাতালের ক্লেদ গায়ে মেখে দংশন করতে উদ্যত, গরলের ভার বহন করতে পারছে না, শুধু উন্মত্ত জিঘাংসায় পাষাণের গায় আছড়ে পড়ছে।

অন্ধকার গুহার মুখে প্রভাতের আলো দেখা যাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকার বুঝি স্বচ্ছ হয়ে এল। দূরে ধানভরা মাঠে প্রকৃতির নবান্ন-উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে, প্রকৃতির বুক রসভারে ভরে উঠছে। বর্ষার জলভরা নদীর সে উদ্দামতা নেই—তীরের কারাশৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলবার তপস্যা তার শেষ হয়েছে। গুহামুখে প্রভাতী গান শোনা যাচ্ছে, "জীবন মরণ-জয়ী হে রহস্যময়ী দ্বার খোলো, খোলো দ্বার।"

জীবন-নাট্যের এই দুইটি দৃশ্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাবার চেষ্টা যুগযুগান্তর ধরে চল্‌ছে। প্রকৃতির জীবনে যে মঙ্গল-রূপটি ফুটে উঠছে তা মানুষের জীবনে সহজ ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠল না। মানুষ অনাদিকাল থেকে সেই রহস্যময়ীর দ্বারে করাঘাত করছে কিন্তু ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে পথ চলার অবসান বুঝি কখনও হবে না।

কিন্তু রহস্যময় জীবন-নাট্যের আর একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে আছে যা আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। পাতালপুরীর পাষাণ-ভিত্তির উপর একটা হাস্যমুখর সোনালী রাজ্য গড়ে উঠেছে। সেখানে কত রঙ, কত ঐশ্বর্য্য, কত সহস্র প্রকারের বিলাস-সজ্জা—সেখানে মানুষের কামনার অন্ত নেই, কর্ম্মপ্রেরণার শেষ নেই—এ যেন সর্ব্বগ্রাসী বর্ণবিলাসী দানবের স্বর্ণপুরী।

তিনটি দৃশ্যের এই যে অপূর্ব্ব নাট্য এর যবনিকা কেমন করে পড়বে তা এই নাট্যের নাট্যকারই জানেন। কিন্তু মানুষকে এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বার করতে হবে এটাই হল চিন্তার দিক দিয়ে তার নবযুগের সাধনা।

একটা কথা কিন্তু খুব সহজেই মনে আসে; সেটা এই যে পাতালপুরী ও স্বর্ণপুরী এই দুটোই মানুষের সৃষ্টি। স্বর্ণপুরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাতালপুরীর অন্তঃস্থলে। স্বর্ণপুরীর মানুষ তার জীবনের রস ও সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করছে অস্বাভাবিক উপায়ে এবং ভোগও করছে অস্বাভাবিক উপায়ে। এ যেন খনির মধ্যে থেকে খনিজ পদার্থ আহরণ করা। যা

যায় তাব ক্ষতিপূবণ নেই। বৃক্ষ যেমন কবে পৃথিবীব গোপন স্তব থেকে বস আহবণ কবে তেমন কবে জীবনীশক্তি আহবণ কবাব কোন ব্যবস্থা নেই। তা যদি থাকত তা হলে মানুষেব জীবনে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা দেখতাম না, তাব ভোগ ও কামনায় এতখানি শক্তিক্ষয় ও অপচয় দেখতাম না, তাব জীবনে পবদেহাশ্রিত পবান্নজীবী parasitic-এব ঘৃণ্যতাও দেখতাম না।

গ্রীক দার্শনিক Aristotle মানুষেব জীবনেব এই অস্বাভাবিক কার্য্যে পবিণতিব একটা কাবণ নির্দ্দেশ কবেছিলেন। ভোগ জিনিষটা মানুষেব ঐশ্বর্য্যময় প্রকৃতিব বিচিত্র প্রকাশ। ভোগেব মধ্যেই তাব কল্পনা, সুকুমাববৃত্তি, শিল্পসাধনা ও সৃজনীশক্তি মূর্ত্তি পেয়ে থাকে। তাই মানুষ অর্থনৈতিক জীবনে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন কবে অথবা ব্যবহাব কবে সে সকলেব মধ্যে তার ব্যক্তিত্বটাকেই খুঁজে পায়। কিন্তু সমাজ-জীবনেব জটিলতা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য-বিনিময়েব (exchange) সুবিধাব জন্যে যখন মুদ্রাব প্রচলন হল তখন থেকে দ্রব্যেব উৎপাদন ও ব্যবহাব সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হয়ে লাভ ও লোভনিবৃত্তিব উপায় হয়ে দাঁডাল। নিজেব পবিশ্রমে ধন উৎপাদন কবাব মধ্যে যে ব্যক্তিত্বেব স্ফূর্ত্তি দেখতে পাই তা ক্রমশঃ লোপ পেলে এবং সমাজেব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাধাবণেব স্কন্ধে ধন উৎপাদন কববাব ভাব চাপিয়ে দিয়ে অবসব ভোগেব চেষ্টা কবতে লাগল। এই ভাবে ক্রমশঃ অর্থনৈতিক অনৈক্যেব সৃষ্টি হল এবং সমাজেব স্তববিভাগে এই অনৈক্যটা বদ্ধমূল হয়ে দেখা দিল।

কয়েক বৎসব আগে ববীন্দ্রনাথ একটি ইংবাজী প্রবন্ধে এই সমস্যাব আলোচনা কবেছিলেন। তাঁব মত হচ্ছে এই যে সমাজ-জীবনেব অপেক্ষাকৃত আদিম অবস্থায় property ছিল মানুষেব সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিব বাহন-স্বৰূপ, উহা সমাজেব সংযত শক্তিকে জাগিয়ে বাখত এবং সমষ্টিব মঙ্গলেব জন্যে নিয়োজিত হতে পাবত। এই অবস্থাটা Aristotle যাকে মুদ্রা-প্রচলনেব পূর্ব্বেব অবস্থা বলেছেন সে অবস্থা কখনই নয়; কাবণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেব অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থায় property জিনিষটা সঞ্চিত ও সংহতৰূপে দেখা দেয় এবং তখনই সেটা একটা institution বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হতে পাবে। সে যাই হোক ববীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটাকেই মানুষেব সহজ জীবন যাপনেব অবস্থা বলে ধবে নিয়েছেন। তাবপব তিনি বল্‌ছেন যে magnanimity ও extravagance এই দুটো প্রবৃত্তি মানুষেব প্রকৃতিব মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং প্রাচীন কালেব বাজাদেব অপবিমিত ঐশ্বর্য্য ও অতিবিক্ত ব্যয় এই দুটো প্রবৃত্তিবই চবম প্রকাশ। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি বলে ভুল কবলে চলবে না। এই অমিতব্যয়িতাব মধ্যে নাকি বিংশ শতাব্দিব ক্ষুদ্র মানুষেব স্বার্থপব

লোলুপতা নেই, কারণ সেকালে property জিনিষটা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং সমষ্টির মঙ্গলসাধন করত।

তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বা আদর্শবাদের দিক দিয়ে institution of property-র সমর্থন করা খুব শক্ত নয়। এ সম্বন্ধে দার্শনিক Green-এর মতবাদ পণ্ডিতগণ সর্ব্ববাদিসম্মত বলে গ্রহণ করেছেন। Green-এর মতে property-টা হচ্ছে "realised will" অর্থাৎ বহির্জ্জগতে আত্মোপলব্ধির বাহ্য প্রতীক। "Will" কথার অর্থ সাধারণ ইচ্ছা নয়—will বল্‌তে তিনি ধরে নিয়েছেন একটা "constant principle in virtue of which each seeks to give reality to the conception of a well-being which he necessarily regards as common to himself with others"। অর্থাৎ মানুষ অন্তরে যেটাকে সত্যি সত্যি শ্রেয় বলে মনে করে সেটা সাধারণভাবেও শ্রেয় বটে, কারণ ব্যষ্টির সত্যিকার মঙ্গলের সহিত সমষ্টির সত্যিকার মঙ্গলের কোন বিরোধ নেই—এই শ্রেয়কে মানুষ বহির্জ্জগতে উপলব্ধি করে property-র মধ্য দিয়ে। মানুষ যে property-কে কামনা করে তা শুধু আধিভৌতিক জীবনের অভাব নিবৃত্তির জন্য নয়—"it is different from mere provision to supply a future want"। Property শুধু "instrument of satisfaction" নয়—উহা "instrument of expression"-ও বটে এবং সেই হিসাবে property হচ্ছে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই মানুষের একটা অপরিহার্য্য অংশ।

পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠানের মূলেই এমন একটা আদর্শ থাকে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সমন্বয়শক্তিকে প্রবুদ্ধ করা। কিন্তু সমাজ-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে যে কোন প্রতিষ্ঠান তার আদর্শসম্মত রূপ গ্রহণ করতে পারে না অথবা হারিয়ে ফেলে। মানুষ শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়েছে সভ্যতার ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুবই পাওয়া যায়, এবং যা এক সময়ে ছিল শিব তা কালক্রমে বানরে পরিণত হয়েছে তারও পরিচয় আমাদের সমাজে খুবই মেলে। আদর্শবাদী Green আদর্শবাদের ঝোঁকে এই মোটা কথাটা ভুলে যান্‌নি। তাই তিনি বলেছেন—"When one set of men are secured in the power of getting and keeping the means of realising their will in such a way that others are practically denied the power, in that case it may truly be said that property is theft"। বাস্তবিক ইতিহাসে institution of property-র বিকাশ ও বিবর্ত্তনের যে পরিচয় পাই তার থেকে একথা বলা চলে না যে property সমাজের

সমন্বয়শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে অথবা মানুষের "realised will" বা সমষ্টির মঙ্গলের প্রতীক হতে পেরেছে। তাই সভ্যতার ইতিহাসকে Karl Marx-এর মত যাঁরা অর্থনীতির চোখ দিয়ে দেখছেন তাঁরা institution of property-র সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না।

রবীন্দ্রনাথ Green-এর মত যে শুধু আদর্শ বা তত্ত্বচিন্তার দিক্ দিয়ে property-র স্বরূপনির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন তা নয়, তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রাচীনকালে বিশেষ করে আমাদের দেশে property জিনিষটা ব্যষ্টির ধন ও সমষ্টির মঙ্গলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিল। তার কারণ এই যে ধনীর ধন সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কথাটা নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ এটা শুধু আদর্শবাদী দার্শনিকের উক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সভ্যতার কথা তুলেছেন, ইতিহাসের নজীর দিয়ে নিজের মতের সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন কালের property-র ঐশ্বর্য্যময় রূপটা প্রকাশ পেয়েছে extravagance-এর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যাকে extravagance বলেছেন সেই স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীনকালের দেব-মন্দির নির্ম্মাণে। প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের বিরাট সমৃদ্ধির মূল প্রেরণা এসেছে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে এ কথা তিনি বোধহয় অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যখন শুনি' যে 'সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য ও দরিদ্র ব্যক্তিও এই সমৃদ্ধির মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন কথাটা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। কবির রঙীন চশমা এঁটে যাঁরা প্রাচীন সভ্যতার ঐশ্বর্য্যরূপ নিরীক্ষণ করেন তাঁদের পক্ষে কথাটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত সহজ। আধুনিক যুগের যন্ত্রমূলক সভ্যতা সাধারণ মানুষের সৃজনীশক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে এইরূপ একটা অভিযোগ কবি ও দার্শনিকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের স্থান-কতটুকু ছিল তা ভেবে দেখবার বিষয়। প্রাচীন craftsmanship বা শিল্পকৌশল আমাদের কবিত্বকে মুগ্ধ করে। হিন্দুর মন্দিরের কারু-কার্য্য, বৌদ্ধের চৈত্যের গৌরবময় ঐশ্বর্য্য, মিশরের পিরামিডের বিশালতা, মুসলমানের তাজের শিল্প-নৈপুণ্য প্রাচীনকালের শিল্পসাধনার নিদর্শনরূপে আজও এই কলকারখানার যুগের মানুষকে বিস্মিত করে দেয়। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মানুষ এই বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যের সমৃদ্ধি থেকে বহু দূরেই অবস্থান করত। জনসাধারণ বলতে আমরা যাদের বুঝি তারা চিরকালই সভ্যতার ভারবাহী পশু ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগের Gothic শিল্প সম্বন্ধে Webb দম্পতি বলেছেন—"What a multitude of labourers quarried the stones and the stones of the cathedral walls

on which half a dozen skilled and artistic masons carved gargoyles"।

আধুনিক যুগে পাবস্য দেশেব rug ও carpet শিল্পেব অসাধাবণ সৌন্দর্য্য কবিব কবিত্বেব উৎস খুলে দেয়। কিন্তু যখন ভাবি যে পাঁচ কিংবা ছয় বৎসবেব শিশুকে দিনেব মধ্যে বাব-চোদ্দ ঘণ্টা পবিশ্রম কবিযে এই carpet তৈবী হয়, যখন ভাবি শিশুব বক্তে এই carpet বক্তবঞ্জিত হযে দেখা দেয তখন মনে হয় যে এই Art-এব মধ্যে মানবজাতিব মঙ্গল নেই। স্বর্ণপুবীব অতুল ঐশ্বর্য্যেব কথা ভাবতে গিযে পাতালপুবীব দাসত্ব-জর্জ্জবিত দবিদ্র শ্রমজীবীব কথা কবিত্বেব ঝোঁকে ভুলে যাওয়া খুবই সহজ। তাই মনে হয় যে তাজমহলের কবি কালেব কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল যে এক বিন্দু অশ্রুজল দেখেছিলেন সে অশ্রুজল শাজাহানেব নয—সে অশ্রুজল শত শত অত্যাচাবিত মানুষেব যাবা সভ্যতাব বা Art-এব ভাববাহী পশু বলে গণ্য হযে এযেছে। প্রাচীনকালেব যে extravagance বা স্বেচ্ছাচাবিতা Art-এব মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল তাতে কবে সাধাবণ মানুষেব বা সমষ্টিব মঙ্গল সাধিত হয়েছিল এ কথা বিশ্বাস কবা যায় না: কাবণ এব মূলে ছিল exploitation, পবান্নজীবী parasite-এব জঘন্যতা —এব মধ্যে welfare বা সমষ্টিব মঙ্গল কিছুতেই থাকতে পাবে না।

ববীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রাচীন যুগেব শিক্ষা, বোগীব সেবা, অন্নসত্র, বাস্তাঘাট এসবেব জন্যে ধনীবা অকাতবে অর্থ ব্যয কবতেন ; তাই তখনকাব কালে property জিনিষটা ছিল সামাজিক কর্ত্তব্যবোধেব প্রতীক ও বাহন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এই প্রকাব সদনুষ্ঠানেব প্রেবণা এসেছে ধর্ম্মেব দুর্দ্ধর্ষ শাসন থেকে। সাধাবণ মানুষকে exploit কবে অবসবভোগী অভিজাতশ্রেণীব যে সঞ্চয় সেই সঞ্চয়কে ধর্ম্ম সাধাবণেব মঙ্গলেব জন্য নিযোজিত কবেছিল এ কথা অবশ্য স্বীকাব কবে নেওযা যেতে পাবে। ইউবোপেও মধ্যযুগে church-এব অক্ষুণ্ণ প্রভাব মানুষেব অত্যাচাবী প্রকৃতিকে কতক পবিমাণে প্রশমিত কবেছিল এবং ধনীব social responsibility বা তাব সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত কবে বেখেছিল। কিন্তু ধনীর exploitation বা শোষণ সমাজেব কাজে লেগেছে বলেই তাব সকল দোষ নষ্ট হযে গেল তা আব যে কেউ স্বীকাব করুক অন্ততঃ ববীন্দ্রনাথ কখনই কববেন না। বাস্তবিক কোন প্রতিষ্ঠানেব utility বা কাজে লাগাটাই আসল কথা নয়। তা যদি হত তা হলে যে ব্যক্তি সাবা জীবন জুযাচুবী কবে এবং পবকে শোষণ কবে ধন সঞ্চয কবলে সে যদি মৃত্যুকালে তাব সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে দান কবে যায তা হলে তাকে দানবীব বলতাম। এই ধরণেব দানটাই যে বড জিনিষ নয় এইটাই

সকল দিক দিযে বোঝাব সময এসেছে। আধুনিক মানুষ এই প্রকাব দানকে অপ্রযোজনীয করে তুলতে চায়; কাবণ যে সমাজ এই প্রকাব দানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে সে সমাজকে কখনও সুস্থ ও সবল বলব না। ধর্ম্ম প্রাচীন যুগেব ধনীব শোষণকে আপনাব কাজে লাগিযেছে; ঠিক তেমনি কবেই তা মানুষেব বক্তলোলুপ হিংস্র প্রকৃতিকেও কাজে লাগিযে শক্তিসক্ষম কববাব প্রযাস পেয়েছে। কিন্তু এই শোষণ-ব্যবস্থাকে দূব কববাব চেষ্টা ধর্ম্ম কোন দিনই কবেনি। ধনীব উপব আপনার সম্মোহিনী শক্তি বিস্তাব কবে ধর্ম্ম তাকে পদানত কবেছে, আবাব দবিদ্রকেও "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven", এই প্রকাব মাথা পেতে অত্যাচাব সহ্য কববাব বাণী শুনিযে মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বীর্য্য কবে বেখেছে। কিন্তু ধনী ও দবিদ্রেব মধ্যে সে প্রাচীন কালেব বিবোধ, চাপা দিলেই তা নষ্ট হয না এবং সেকালেব শোষণজাত property কতকটা দবিদ্রেব জন্য ব্যয়িত হত বলেই তা বড হয়ে ওঠে না।

বাস্তবিক একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে প্রাচীন সভ্যতাব অর্থনৈতিক বনিযাদ এতটা কাঁচা ছিল যে তাব উপব একটা ঐশ্বর্য্যময ইন্দ্রপুবী গডে তোলা বিশ্বামিত্রেব স্বর্গসৃষ্টিব মতই একটা নিবর্থক প্রযাস হযে দাঁডিযেছিল। প্রাচীনকালেব সমৃদ্ধিব বঙীন মায়ায অন্ধ হযে property-ব অন্তর্নিহিত স্বরূপটিকে ভুলে গেলে চল্‌বে না। অবসবভোগী অভিজাতসম্প্রদায় ও সাধাবণ শ্রমজীবীব মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ সভ্যতাব সকল স্তবেই দেখতে পাওয়া যায সেই শ্রেণীবিভাগেব উপবই প্রাচীন সমাজেব সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। এমেবিকাব প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ Veblen বলেছেন যে এই শ্রেণীবিভাগেব সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ আমবা দেখতে পাই মানুষেব বর্ব্বব অবস্থায যখন নাবী ছিল দাসী এবং পুরুষ ছিল সেই সম্পত্তিব ভোক্তা ও বক্ষক। ক্রমশঃ এই শ্রেণীবিভাগ সমাজেব মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। Property-ব ভোগেব মধ্যে যে মানুষ তাব ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পায় একথা সে ভুলে গেল। Property বা সম্পত্তি সম্মান বা প্রতিপত্তিব প্রতীক হযে উঠল। ধনসঞ্চযেব মধ্যে মানুষেব কর্ম্মপ্রেবণাব যে বিচিত্র প্রকাশ তা অন্তর্হিত হল এবং property জিনিষটা অপবেব উপব প্রভুত্ব কববাব উপায় হযে দাঁডাল। তাই Veblen বলেছেন, "By a further refinement wealth acquired passively by transmission from ancestors or other antecedents presently becomes even more honorific than wealth acquired by the possessor's own effort"। মানুষেব অর্থনৈতিক জীবনেব এই পবিণতিব একটা দিক্ আছে যা বিশেষ কবে লক্ষ্য কবাব

জিনিষ। সেটা এই যে শ্রমবিমুখতাই ক্রমশঃ মানুষের কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল, কারণ বর্ব্বর মানুষ কায়িক পরিশ্রমকে দাসত্ব ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলে মনে করতে শিখলে। এই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর একটা বড় জিনিষ গড়ে উঠতে পারে না। প্রাচীনকালের এই শোষণজাত সভ্যতার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি ছিল এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল বালির ভিত্তি। এ যেন একটা অভ্রস্পর্শী পিরামিড্—যার চারিদিকে শুধু মরুভূমির তৃষ্ণা ও নগ্নতা। এই জন্যই সেই বর্ণবিলাসী যুগের রক্তরাঙা রঙ্গালয় মহাকালের ফুৎকারে বুদ্‌বুদের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। অতীতের উৎসবরাত্রির কত গান, কত নৃত্য, কত রঙ-বেরঙের বাতি, নূপুরের রিণিঝিণি, সারেঙের স্বপ্নভরা তান—মোহমদির কণ্ঠে রূপসীর কত হাসিগান, মর্ম্মর হর্ম্ম্যবুকে কামনার তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা—এসকলই মসীলিপ্ত একাকার হয়ে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে।

বাস্তবিক property জিনিষটাই এমন যে তাকে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখলে তা সমাজের সমন্বয়শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলে, তার সৃজনী-শক্তির উদ্বোধনের পথে বাধার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই property-র ঐশ্বর্য্যরূপটা তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে। তাই তিনি বলেছেন, "Property is the objective manifestation of our taste, our imagination, our constructive faculties, our desire for self-sacrifice"। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে property-র objective manifestation-টা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। Veblen যাকে "conspicuous waste" বলেছেন সেই সুস্পষ্ট অপচয়ই প্রাচীন যুগের Art-এর মধ্যে অতিকায় হয়ে ফুটে উঠেছে। ভাবী কালের Art জীবনের সৃজনীশক্তির বাহন হয়ে উঠবে তখনই যখন property-টা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সমাজের সমন্বয়শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের লোলুপতাকে অবজ্ঞা করেছেন। তিনি বলেছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্যের দুর্ব্বল জাতিসমূহকে আপনার লোলুপতার যূপকাষ্ঠে বলি দেবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে আছে। তা ছাড়া আজকালকার সহরের সভ্যতাও পল্লীজীবনকে শোষণ করে বেঁচে আছে। কিন্তু এই শোষণ বা exploitation-এর সমস্যাটা আসলে সেই প্রাচীন কালেরই সমস্যা—এটাকে আধুনিক সমস্যা বললে ভুল করা হবে। পূর্ব্বে বলেছি যে প্রাচীনকালে ধর্ম্ম এই সমস্যাকে আপনার মন্ত্রবলে চাপা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মন্ত্রের আর সে শক্তি নেই, তাই exploitation-এর নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং ধনিক ও শ্রমিকের সেই আদিমকালের বিরোধটা নৃশংস হয়ে জেগে উঠেছে। আধুনিক

সভ্যতাব বিপুল ঐশ্বর্য্য মানুষেব সঙ্ঘজীবনেব কর্ম্মচেষ্টায তিলে তিলে গডে উঠেছে। তাই সাধারণ মানুষ আব সভ্যতাব ভারবাহী পশু হযে থাকতে চায় না। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যে তাব অংশ নেই। ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Where the temptation of high living, normally confined to a negligible section of the community, becomes widespread, its ever-growing burden is sure to prove fatal to civilisation"। ববীন্দ্রনাথ যাকে high living বল্‌ছেন তাবই ভিত্তিব উপর প্রাচীনকালেব সভ্যতা গডে উঠেছিল। আধুনিক যুগে যে বাজসিক ভোগ-প্রবৃত্তি একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদাযেব মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জনসাধাবণেব মধ্যে বিস্তাব লাভ কবছে এইটাকেই ববীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতাব ধ্বংসেব লক্ষণ বলে মনে কবেন। কিন্তু এই high living চিবকালই পবদেহাশ্রিত parasite-এব ঘৃণ্যতাব উপব প্রতিষ্ঠিত বলেই তা ধ্বংসেব কাবণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁবা ভাবী কালেব নূতন সমাজ গডে তুল্‌তে চান তাঁবা মনে কবেন যে এই পবজীবিতাব ধ্বংস হবে সর্ব্বসাধাবণেব অপব্যয় প্রবৃত্তিব মধ্য দিযে।

আমবা রবীন্দ্রনাথেব যে প্রবন্ধেব আলোচনা কবছি সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবাব কিছুকাল পবেই তিনি বাশিযায গিয়েছিলেন। বাশিয়াব নূতন সমাজ-ব্যবস্থাব উদ্যোগ-পর্ব্ব চাক্ষুষ দেখে তাঁব কবিচিত্ত যে বিশেষ-ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল—তাব প্রমাণ "বাশিযাব চিঠি"তে পাই। ববীন্দ্রনাথ নিজে জমিদাব, অভিজাতশ্রেণীব মানুষ, তা ছাড়া তাঁব চুলও পেকেছে। এ অবস্থায সাধাবণ মানুষ বাশিযাব প্রাচীন-সংস্কাব-বিবর্জ্জিত সমাজ-ব্যবস্থা দেখে পুলকিত হয়ে উঠবে এরূপ আশা কবা অন্যায। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব মত মানুষেব সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তাঁকে লোকে আব যাই বলুক Die-hard বলতে সাহস কববে না, কাবণ তিনি নবীনেব পূজাবী, সত্যেব পূজাবী, সমাজেব অন্ধ সংস্কাব থেকে চিবকাল নিজেকে আশ্চর্য্যভাবে মুক্ত বেখেছেন। এত বড মন নিয়ে তিনি বাশিয়াব নব-বিধানেব স্বরূপ উপলব্ধি কববাব চেষ্টা কবেছেন। তাঁব প্রাচীন মতামত বদ্‌লেছে কি না এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কবে আমাব প্রসঙ্গ শেষ করব।

ববীন্দ্রনাথ তাব সর্ব্বপ্রথম চিঠিতে লিখেছেন, "চিবকালই মানুষেব সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেবই সংখ্যা বেশি, তাবাই বাহন, তাদেব মানুষ হবাব সময নেই।" তাবপব বলেছেন, "আমি অনেক দিন এদেব কথা ভেবেচি, মনে হযেচে এব কোন উপায নেই। একদল তলায না থাকলে আব একদল উপবে থাকতে পাবে না, অথচ উপবে

থাকাব দরকাব আছে।” তাঁব উক্তিটা পড়ে হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি Aristotle-এব মতই Philosophy of Leisure-এব ব্যাখ্যা কবে পাতাল-পুবীব ভিত্তিব উপব যে অবকাশেব স্বর্ণপুবী গড়ে উঠেছে তাবই মহিমা কীর্ত্তন কবছেন। তিনি বল্‌ছেন, “জীবিকানির্ব্বাহ কবাব জন্যে ত মনুষত্ব নয, একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম কবে তবেই তাব সভ্যতা। সভ্যতাব সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশেব ক্ষেত্রে ফলেছে।” আশ্চর্য্যেব ব্যাপাব এই যে প্রায় এই প্রকার তর্কের সাহায্যেই Aristotle-এব মত অত বড় rational দার্শনিকও দাসত্বপ্রথাব সমর্থন কবেছিলেন। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব মত এত বড় culture-এব পূজাবী কথাটাকে নিঃসংশয় চিত্তে মেনে নিতে পাবেন নি। তাই তিনি বলছেন, “যাই হোক আমি ভালো কবে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিযে বেখে, অমানুষ কবে বেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে এ কথা অনিবার্য্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কাব আসে।” কবিব এই উক্তি থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট কবেই মনে হয়। সেটা এই যে কবিব মনে একটা দ্বিধা ও সংশয় জেগেছে। Institution of property-ব যে ৰূপটা ববীন্দ্র-নাথেব কবিচিত্তকে মুগ্ধ কবেছিল সে ৰূপটা যে তাব আসল ৰূপ নয় এৰূপ একটা সন্দেহ তাঁব মনে জেগেছে। Private property বা ব্যষ্টির ধনসম্পত্তিই আমাদেব সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যেব সৃষ্টি কবেছে। এই বৈষম্যেব সমস্যাটা প্রাচীন যুগে এতটা প্রবল হয়ে ওঠে নি, কাবণ ধর্ম্ম ও অন্ধ সংস্কাব মানুষকে এই বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য কবেছিল এবং wealth বা ধন যে সমাজেব সংহতিশক্তির ফল এ ধারণাটাও সর্ব্বসাধারণেব মনে খুব স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু মূল সমস্যাটা চিবকালই বয়ে গেছে। আজকেব দিনে ববীন্দ্রনাথ যাদেবকে “সভ্যতাব পিলসুজ” বলেছেন তাবা নীচেব অন্ধকাবকে অস্বীকাব কবতে চাচ্ছে উপবেব আলোব সন্ধানে। তাই “দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের বঙ্গভূমিতে নিজেকে বিবাট কবে দেখতে পাচ্ছে।” অবশ্য এ জিনিষটা বাশিযায সম্ভব হযেছে একটা সামাজিক ও বাষ্ট্রিক বিপ্লবেব সাহায্যে। যে সকল প্রাচীন সংস্কাব ও প্রতিষ্ঠান সকল প্রকাব বৈষম্যকে সমর্থন ও পালন কবে এসেছে সেই সকল সনাতন জিনিষকে বাশিয়ার বিপ্লবীরা “একেবাবে জটে ধবে টান মেবেছে।” অর্থনৈতিক জীবনে private property-কেও তাবা জটে ধবে টান মেবে নির্ম্মূল কবাব চেষ্টা কবেছে। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে “সমস্ত মানব সাধাবণেব মধ্যে এবা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা কিছু এবা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ

কবো—মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং—কাবো ধনে লোভ কোবো না। কিন্তু ধনেব ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনেব লোভ আপনিই হয়। সেইটাকে ঘুচিয়ে দিয়ে এবা বলতে চায—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ।” Abolition of private property-ব এই প্রকাব সুন্দব দার্শনিক ব্যাখ্যা আব কেউ কবেছেন কিনা আমাব জানা নেই। কিন্তু এই কথাটাকে শুধু একটা ব্যাখা বলে ধবে নিলে ভুল করা হবে। এই বিবাট আদর্শকে কবি খুব স্পষ্টভাবে সমর্থন কবেছেন, কাবণ তিনি বল্‌ছেন যে “মা গৃধঃ” ও “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ”। উপনিষদেব এই দুইটি কথাব তাৎপর্য্য তিনি বাশিয়ায় গিযে স্পষ্ট কবে বুঝেছেন। শুধু আদর্শেব দিক দিয়ে নয অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাব দিক দিযেও কবি private property-ব অস্তিত্বেব কোন সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না। কবি বলেছেন যে পাশ্চাত্যেব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য অনেকেব চোখে ধাঁধাঁ লাগিযে দেয। কিন্তু ধনী ও দবিদ্রের প্রভেদ থাকায় ধনেব সে “পুঞ্জীভূত রূপ” যেখানে সবচেযে বড় কবে চোখে পডে তাকে কবি সর্ব্বান্তঃকবণে ঘৃণা কবেন। তার কাবণ এই যে “এই সমৃদ্ধি যদি সমান ভাবে ছড়িযে দেওয়া যেতো তা হলে তখনই ধবা পডতো, দেশেব ধন এত কিছু বেশি নয যাতে সকলেবই ভাতকাপড যথেষ্ট পবিমাণে জোটে। এখানে (অর্থাৎ বাশিয়ায) ভেদ নেই বলেই ধনেব চেহাবা গেছে ঘুচে, দৈন্যেবও কুশ্রীতা নেই—আছে অকিঞ্চনতা।”

শ্রীবীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অমরু-শতক

অমরু-শতক—অমরু কবির প্রেমের কবিতা।

কিন্তু প্রথমেই এক বিপুল সমস্যা—অমরু নামে নাকি কোনো কবি ছিলেন না এবং কবিতাগুলির রচয়িতা নীরস অদ্বৈতবাদী দার্শনিক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

এ জাতীয় অনুমানের কারণ কি আগে তারই আলোচনা করি—অবশ্য সংক্ষেপে।

মাধবকবির 'শঙ্করদিগ্বিজয়' নামে একখানি কাব্য আছে। শঙ্করাচার্য্যের জীবনের একটি চমৎকার রসাল উপাখ্যান এর এক স্থানে দেখ্‌তে পাই। শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের বাড়ীতে উপস্থিত, উদ্দেশ্য মিশ্র-প্রবরকে তর্কে পরাজিত ক'রে স্বমতে অর্থাৎ অদ্বৈতমতে দীক্ষিত করা। মণ্ডনের পত্নী উভয়ভারতী (শারদা)—ইনি নাকি নারীরূপিণী সরস্বতী—ক'রলেন পূর্ব্বপক্ষের উপস্থাপন। পূর্ব্বপক্ষটি আদিরসঘটিত। আজন্ম ব্রহ্মচারী শঙ্কর আদিরসের ধার ধারেন না। কিন্তু পরাজয়, বিশেষতঃ নারীর কাছে পুরুষের পরাজয়, মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। শঙ্কর একমাসের সময় নিয়ে বেরুলেন আদিরস চর্চ্চা ক'রতে। সুযোগও মিলে গেল। আকাশপথে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শঙ্কর দেখলেন মৃগয়া ক'রতে এসে হঠাৎ রাজা অমরক মারা গেছেন এবং তাঁর শবদেহ ঘিরে তন্বীতরুণী রাণীরা (সংখ্যায় একশ') আকুল হয়ে কাঁদছেন। শঙ্কর যোগবলে ঢুক্‌লেন অমরকের দেহে; ফলে রাজা উঠলেন বেঁচে। আদিরস চর্চ্চা চল্‌তে লাগ্‌ল অবাধে, অবিশ্রান্তভাবে—সময় মোটে একমাস। কাজ উদ্ধার ক'রে শঙ্কর রাজদেহ হতে বেরিয়ে এলেন এবং বলাই বাহুল্য, রাজার আবার মৃত্যু হলো।

এই ঘটনা হতেই অনেকের অনুমান শঙ্কর রাজা অমরকের নামে 'অমরু-শতক' রচনা ক'রেছিলেন।

অমরু নামে স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এমন লোকেরও কিন্তু অভাব নেই। আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁর 'ধ্বন্যালোক' নামে রসগ্রন্থে ব'লেছেন,—'তথা হি অমরুকস্য কবেঃ মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধাঃ এব'। আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন নবমশতাব্দীর লোক, কাজেই অমরু(ক) তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী।

এতেও কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হয় না, যেহেতু, শঙ্করও জন্মেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে।

আমার বিশ্বাস অমরু-শতক শঙ্করের রচনা নয়। তাঁর জীবনের সঙ্গে আদিরসের ব্যাপক বা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না। নিতান্তই একটি

ক্ষণিক প্রয়োজনে এ সাধনা তাঁকে ক'রতে হয়েছিল—এ তাঁর জীবনের এক অতি আকস্মিক অভাবনীয় ঘটনা, হয়তো বা দুর্ঘটনাই। নিষ্কাম সন্ন্যাসী যে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের সঙ্গে একখানি সকাম শৃঙ্গারশাস্ত্রও জগৎকে উপহার দিয়ে যাবেন এমন মনে করাই অসঙ্গত।

অমরু-শতকের কবি হয়তো অমরুই। নাও যদি হয়, ক্ষতি কি? Shakespeare-ই লিখুন আর Bacon-ই লিখুন Hamlet Hamlet। আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অমরু-শতকের আলোচনা।

গোড়াতেই বলেছি অমরুশতক প্রেমের কাব্য—ধারাবাহিক কাব্য নয়, কালিদাসের শৃঙ্গারতিলক বা ওমরের রুবাইয়াতের মতন অসংবদ্ধ কবিতার মালা। কিন্তু সংখ্যা একশ' নয়, একশ' দুই এবং মতান্তরে একশ' তেষট্টি—নানান ছন্দে রচিত এবং সকলগুলিই চতুষ্পদী; কেবল একটি দ্বিপদী—অনুষ্টুভ্ ছন্দে লেখা।

মিলন, বিরহ, বাসকসজ্জা, অভিসার, খণ্ডিতা, মান প্রভৃতি বিচিত্র-বিষয় নিয়ে কবিতাগুলির রচনা; কিন্তু শৃঙ্খলা নেই অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ঐক্য নিয়ে কবিতাগুলি পর্য্যায়ক্রমে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো নয়। স্বকীয়া এবং পরকীয়া দুরকমেরই নায়িকা আছে। রসশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার যে নানানতর ভেদ দেখতে পাই, অধিকাংশ কবিতাতেই কৌশলে তার উপবর্ণন দেখা যায়। হিন্দীকবি বিহারীলালের 'সতসই'-ও এই জাতীয় শৃঙ্গাররসের কাব্য; তবে সতশই বড়ো বই—সতশই সপ্তশতীর অপভ্রংশ, যদিও বিহারীকাব্যে কবিতার সংখ্যা আটশর কম নয়। হয়তো বা বিহারীলালের ওপর অমরুর প্রভাব আছে। বাঙলায় অমরু প্রায় অপরিচিত; কিন্তু হিন্দুস্থানে তা' নয়। অমরু-শতকের একাধিক হিন্দী সংস্করণ আছে।

কোনো কবিতাতেই জয়দেবী মাধুর্য্য দেখলাম না এবং ছন্দও সব জায়গায় ভাবের অনুগত ব'লে মনে হলো না। প্রেমের কবিতার মার্ম্মিক মাধুরীর প্রয়োজনীয়তা যতখানি, রৌপিকেরও তার চেয়ে কম নয়। 'গীতগোবিন্দে' দ্বিতীয় লক্ষণই প্রবল। এদিকে গীতগোবিন্দ অতুলনীয়, অনুকরণের অতীত; এর 'কান্তকোমলপদাবলী' নাম সার্থক। কিন্তু ভাব ও রসের দিকে বড়ো অগভীর—ভক্ত নই বলেই হয়তো আমার এরকম ধারণা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুটি লক্ষণই বর্ত্তমান।

কিন্তু ভাষায় ছন্দে ললিতমধুর না হলেও অমরু-শতক চমৎকার। চমৎকার এই জন্যে যে এতে ব্যঞ্জনালক্ষণ বেশী। তাই ব'লে প্রত্যেকটি কবিতারই যে এই সম্পৎ আছে, তা' নয়। তবে নিকৃষ্টশ্রেণীর কবিতার সংখ্যা কম। প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে যা নিত্য ঘটে এমন অতি সাধারণ অবস্থার বর্ণনা ক'রতে ক'রতে কবি একসময় তা'র ওপর এমন

একটি অপরূপ স্পর্শ দিয়ে দিয়েছেন, যা'তে অতি সাধারণ অসাধারণের পর্য্যায়ে উঠে গিয়েছে। এই dramatic touch অমরুর বৈশিষ্ট্য এবং এ প্রতিভা শ্রেষ্ঠ কবিদেরই থাকে। অনেক স্থলে কবি ইঙ্গিতে যে-রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, বাচাল ভাষার তা' স্বপ্নেরও অতীত। এই সব কারণে বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবের আংশিক অভাবসত্ত্বেও, অমরু-শতককে চমৎকার না ব'লে উপায় নেই। ভাষা এবং ছন্দগত মাধুরী-সৃষ্টির শক্তি যে কবির ছিল না এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

> সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
> ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবং বিধোঽভূৎ
> ইতি নিগদতি নাথে তির্য্যগামীলিতাক্ষ্যা
> নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং নকিঞ্চিৎ ॥'

এমন কবিতা অল্প হলেও আছে। কিন্তু মাত্র চারটি চরণের অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে একটি অখণ্ড ভাবকে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেওয়া কঠিন নয় কি ?

অমরু প্রেমের কবি এবং তাঁর প্রেম কামগন্ধহীন অতীন্দ্রিয় প্রেম নয়। নারীপুরুষের যৌনসম্পর্কই তাঁর কাব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু। অমরু-শতকের একমাত্র রস শৃঙ্গার এবং স্বকীয়া পরকীয়া দু'রকমেরই নায়িকার কথা থাকলেও পরকীয়ারই ওপর কবির টান বেশী। টীকাকার অর্জ্জুনবর্ম্মদেব আবার বলেছেন—'পরস্ত্রীগতোঽপ্যয়ং রসঃ...ন পাতকায়' এবং প্রামাণ্য ধরেছেন বাৎস্যায়নের বাক্যকে 'অন্যথা বাৎস্যায়নো মহর্ষিঃ পরস্ত্রীসাধনং কথং প্রণীতবান্ ?' অর্জ্জুনবর্ম্মদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক, তখন হয়তো ভাবতের কোথাও পবিত্র সুনীতি সমিতির অস্তিত্ব ছিল না। শৃঙ্গাররস আদিরস—বৈষ্ণবমতে মধুর রস। প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের সকলেরই এই রসটির ওপর অল্পাধিক আসক্তি ছিল। তাঁরা জানতেন—'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।' কথাটা অতিশয় সত্য। শৃঙ্গাররসকে বাদ দিয়ে শ্রেষ্ঠকাব্য দুনিয়ার কোথাও রচিত হয় নাই, হতে পারেও না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সংস্কৃতকাব্যের বিচারভার এখনো আদালতের ওপর পড়ে নাই। এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো—রসোত্তীর্ণ শৃঙ্গারই আমার আলোচ্য। আমি সাহিত্যের কথা বল্‌ছি, sexology-র নয়। সত্যকার সাহিত্যিক ঐন্দ্রজালিক। তাঁর যাদুমন্ত্রে কদর্য্য সুন্দর হয়ে ওঠে। কুৎসিতকে তাঁরাও কুৎসিত বলেই জানেন এবং তার নগ্নতাকে মূর্ত্তি দিতে তাঁরাও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু জীবনে সুন্দর এবং কুৎসিত দুইই আছে আর সাহিত্যের অর্থ 'criticism of life'; কাজেই সাহিত্যেও কুৎসিতের

স্থান আছেই। শিল্পী একে অস্বীকাব কবেন না; কিন্তু তাঁব সৃষ্টিতে এ থেকে যায় প্রচ্ছন্ন এবং মূর্ত্তি পবিগ্রহ কবে সুন্দব। কালিদাসেব কুমাবসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা সাহিত্য, ববীন্দ্রনাথেব বিজযিনী, মানসসুন্দবী, চিত্রাঙ্গদা সাহিত্য; বসরূপটি বাদ দিযে সাহিত্যেব ভিতব থেকে যাবা শুধু ক্লেদ উদ্ধাব ক'বতে চায়, অর্থাৎ Oscar Wild এব ভাষায 'those who find ugly meanings in beautiful things', তাদেব নিজেব মনেবই ক্লেদেব ওপর আসক্তি আছে বলতে হবে, তাবা নিজেবাই 'corrupt'। এই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মন নিয়ে যাবা অমরু-শতক পডতে যাবে, তাদেব কাছে এ কাব্য নিশ্চয়ই অশ্লীল। কিন্তু সত্যকাব সাহিত্যবসিক যাঁবা, তাঁরা অমরুকে প্রথম শ্রেণীব কবি ব'লে গ্রহণ ক'ববেন।

কযেকটি কবিতাব বাঙলা অনুবাদ দিলাম। অনুবাদ মূলেব অনুগত কববাবই চেষ্টা কবেছি, তবু মর্ম্মানুবাদ (ববঞ্চ free translation) বলাই ভালো। মূল শ্লোকগুলি পাদটীকায ক্রমানুসাবে দেওয়া হলো—

১। ওদেব বাতেব প্রেম-আলাপন
উচ্চকণ্ঠে উষায কহিছে শুক,
পাশে গুরুজন—নবীনা বধূব
লজ্জায় হলো অকণিত সোনামুখ;
কান হ'তে বধূ পলকে খসায়ে
টুকটুকে বাঙা পদ্মবাগেব দানা
সমুখে ধবিল—দাড়িমেব বীজ?—
তুলে নিল পাখী, অমনি নিমেষে মূক।

২। কোথায় চলেছ, অযি কবভোরু, এই নিশীথে?
প্রাণেব চেয়েও প্রিযতব মোব বক্ষেব ধন যেথায় আছে।
একা পথে ভয, তন্বী, তোমাব লাগে না চিতে?
পাঁচখানি শব ধনুকে জুড়িযা সঙ্গী যে মোব মদন আছে।

১। দম্পত্যোর্নিশি জল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ—
স্তৎপ্রাতর্গুরুসন্নিধৌ নিগদতঃ শ্রুত্বৈব তারং বধূঃ।
কর্ণালম্বিতপদ্মরাগশকলং বিন্যস্য চঞ্চোঃ পুরো
ব্রীডার্ত্তা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্ ॥১৬॥

২। ক্বপ্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বত কথং ন বিভেষি বালে
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥৭১॥

৩। সখীরা আমায় ব'লে চ'লে গেল—
'ঘুমায়ে পড়েছে, তুইও ঘুমা'।
আমি ধীরে ধীরে বঁধুর অধরে
আবেশে আঁকিনু গোপন চুমা;
সহসা নিরখি রোমাঞ্চ তা'র
ফুটিয়া উঠেছে দেহের তলে—
কপট বঁধুয়া নয়ন দুখানি
মুদে আছে তবে ঘুমের ছলে!
লাজে মরে যাই, কি আর বলিব?
বঁধুয়া আমার অতুলনীর—
যখন-যেমন-তখন-তেমন—
বিধিমতে লাজ হরিল প্রিয়।

৪। বঁধুর অধরে দংশন-ক্ষত হেরি কা'র কৌতুকে
অভিমানে বধূ লীলাকমলের আঘাত হানিল মুখে,
কমলের রেণু নয়নে লেগেছে—জ্বালার কাতর বঁধু
মুদিল নয়ন; অমনি পলকে অনুশোচনায় বধূ
রাঙা ঠোঁটদুটি মুকুলিত করি সোনামুখ আনমিয়া
প্রিয়ের নয়নে ফুৎকার দিল, ব্যথায় ব্যাকুল হিয়া।
অমনি চতুর প্রিয়
চুমায় চুমায় রাঙিল ও ঠোঁট—পুলক অসহনীয়।

৫। নীলপদ্মদলে নয়, দৃষ্টি দিয়ে নিরমিল মালা,
কুন্দ নয়, শুভ্র হাসি—সেই পুষ্পে সাজাইল ডালা;
কুম্ভে নয়, পয়োধরে করিল সে অর্ঘ্যবিরচন,—
প্রিয়তরে নিজ অঙ্গে অপরূপ মঙ্গলাচরণ।

৩। সুপ্তোঽয়ং সখি সুপ্যতামিতি গতাঃ সখ্যস্ততোঽনন্তরং
প্রেমাবেশিতয়া মযা সরলয়া ন্যস্তং মুখং তন্মুখে।
জ্ঞাতেঽলীকনিমীলনে নয়নযোর্ধূর্তস্য রোমাঞ্চ তো
লজ্জাসীন্মম তেন সাপ্যপহৃতা তৎকালযোগ্যৈঃ ক্রমৈঃ ॥৩৭।

৪। লীলাতামরসাহতোঽন্যবনিতানিঃশঙ্কদষ্টাধরঃ
কশ্চিৎকেসরদূষিতেক্ষণইব ব্যামীল্য নেত্রে স্থিতঃ।
মুগ্ধা কুড্মলিতাননেন্দু দদতী বায়ুং স্থিতা তত্র সা
ভ্রান্ত্যা ধূর্ত্ততযাঽথবা নতিমৃতে তেনানিশং চুম্বিতা ॥৭২।

৫। দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥৪৫।

বিদ্যাপতির রাধার মুখেও শুনি ঃ—

'পিয় যব আওব এমঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥'

অন্যত্র—

'যব হরি আওব গোকুলপুর
আলিপন দেওব মোতিমহার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥'

৬। শয্যায় মোর এলো যবে প্রিয়তম,
নীবীবন্ধন আপনি খসিল মম,
নিতম্বতটে লুটাল শিথিল শাড়ী ;—
এইটুকু শুধু স্মরণ করিতে পারি।
তার পরে হায় সে যে কে, আমি কি, লীলা সে কেমন ধারা,
কিছু মনে নাই, বিস্মরণীর অতলে হয়েছে হারা।

৭। স্তনপট হতে চন্দন-লেখা নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে ;
অধরতলের তাম্বুলরাগ ঘুচে গেছে,
নীল অঞ্জন গ'লে গেছে আর পুলকের স্বেদ জাগে দেহে,
রোমাঞ্চময় শিহর এখনো লাগে দেহে ;—
মিথ্যাবাদিনী, স্নানে গিয়েছিলি ? নদীজলে সব ধুয়ে এলি ?
আমি কি জানি না প্রসাধন যতো কাহার অঙ্গে থুয়ে এলি ?

নায়িকা দূতীকে পাঠিয়েছিলেন আপন নায়কের কাছে, নিজের প্রয়োজনে সম্ভবতঃ। তারপর, এইসব।

৮। বিজনে মোরে ডাকিল বঁধু গোপনকথা আছে ;
কৌতূহলে কাননতলে বসিনু তা'র কাছে।

৬। কান্তে তল্পমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বয়ং বন্ধনা—
দ্বাসো বিশ্লথমেখলাগুণধৃতং কিঞ্চিন্নিতম্বে স্থিতম্।
এতাবৎ সখি বেদ্মি সাম্প্রতমহং তস্যাঙ্গসঙ্গে পুনঃ
কোঽহং কাস্মি রতংনুবা কথমিতি স্বল্পাপিমেন স্মৃতিঃ॥১০১

৭। নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতট নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেষং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্॥১০৫-পরিশিষ্ট।

৮। অহং তেনাহূতা কিমপি কথয়ামীতি বিজনে
সমীপে চাসীনা সরসহৃদয়ত্বাদবহিতা।

কানে কানে কি কহিল প্রিয়তম,
সহসা দেখি ধরেছে বধু কবরীখানি মম।
আমি কি করিলাম?
অধরে মোর অধর তা'র চাপিয়া ধরিলাম।

ফলে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—অবশ্য একটু বদ্‌লে—

'অধরে অধর বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখিল রুধিয়া'।

৯। অলক্তকের রাঙাকলঙ্ক ললাটপটে,
কঙ্কণ-লেখা কণ্ঠতটে,
কাজলকালিমা আননে জেগে
তাম্বুলরাগ নয়নে লেগে ;—
রজনীলীলার লিপিকা অঙ্গে বহিয়া ঊষায় ফিরিল যবে ;
বঁধুরে নিরখি অভিমানিনীর হিয়া বেদনায় গুমরি মরে।
তুলিয়া করের লীলাকমলেরে নাসার তলে
ঘননিশ্বাস ফেলিল মানিনী ঘ্রাণের ছলে।

প্রথম অংশটি দেখে চণ্ডীদাসের রাধাকে মনে পড়ে যায়—

'ছুঁইওনা ছুঁইওনো বঁধু ওইখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভালো॥
অধরের তাম্বুল নয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

১০। ধরে নাই প্রিয়া অঞ্চল মোর,
বাহুলতা দিয়া বন্ধ করেনি দ্বার,

ততঃ কর্ণোপান্তে কিমপি বদতাঘ্রায় বদনং
গৃহীতা ধম্মিল্লে সখি স চ ময়া গাঢমধরে ॥৯৮।

৯। লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রাগলে
বক্ত্রে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগোঽপরঃ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিংগতাঃ ॥৬০।

১০। লগ্না নাংশুকপল্লবে ভুজলতা ন দ্বারদেশেঽর্পিতা
নো বা পাদযুগে স্বয়ং নিপতিতং তিষ্ঠেতি নোক্তং বচঃ।
কালে কেবলমম্বুদালিমলিনে গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠ—
স্তন্ব্যা বাষ্পজলৌঘকল্পিতনদীপূরেণ রুদ্ধঃ প্রিয়ঃ ॥৬২।

চবণে আমাব লুটায়ে পড়েনি,
'যেয়ো নাকো, বঁধু',—বলেনি একটিবাব ;
তবু মোব যাওযা হলো না,—তখন
সজল আষাঢ় নেমেছে ধবণীতলে ;
সমুখ পথেব তটিনী ভবিল
কানায় কানায় প্রিয়াব বাষ্পজলে।

১১। সহসা অধবে দংশন লভি
পলকে চকিতা কাঁপাইয়া ছুটি কব
'না, না, ছাড়ো, শঠ,'—বোষভবে কয়,
ভুরুছটি নাচে কামনায় থবথব,
সীৎকাবে যাব চপল নয়ন,—
বভসে তাহাবে যে কবিল চুম্বন,
সেই পে'লে সুধা , মূখ দেবতা
বৃথা ক'বে মবে সমুদ্রমন্থন।

১২। সমুখে আসি প্রেমেব বাণী শোনায যবে প্রিয়,
বুঝিতে নাবি তখন মোব নিখিল ইন্দ্রিয
নযান হ'য়ে বয়ানখানি নিবখে বঁধুয়াব
কিম্বা শোনে শ্রবণ হ'যে মধুব ঝঙ্কাব !

এমনি একটি প্রকাশবৈচিত্র্য ববীন্দ্রনাথের মধ্যে পাচ্ছি—

'অস্তশিখবে স্থর্য্যেব মতো সমস্তপ্রাণ মম
চাহিয়া বযেছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম।'

১৩। সে আজ বিবহী-মোব গৃহে, সে যে দিকে দিগন্তবে,
সে মোব সমুখে, মোব পিছনে সে, সে যে শয্যা'পবে,
সে আমাব পথে পথে, সে আমাব নিখিল ভুবনে,
আব মোব কেহ নাই, কিছু নাই আমাব জীবনে,
শুধু সে, শুধু সে, সে সে, সে ছাড়া অস্তিত্ব আব নাই,—
এই কি অদ্বৈতবাদ ? কে বলিবে, কাহাবে শুধাই ?

১১। সংদষ্টেঽধরপল্লবে সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্ত্তিতভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায মথিতো মূঢৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ ॥৩৬॥

১২। ন জানে সংমুখায়াতে প্রিযাণি বদতি প্রিযে।
সর্ব্বাণ্যঙ্গানি কিং যান্তি নেত্রতাং কিমু কর্ণতাম্ ॥৬৪॥

১৩। প্রাসাদে সা দিশিদিশি চসা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা
পর্য্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য।
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি মে কাপি সা স
সা সা সা সা জগতিসকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ ॥ ২।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

'মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপদগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তা'র
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।'

সংস্কৃত কবিরও এমনি একটি শ্লোক রয়েছে—

'সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥'

কিন্তু

—'এই কি অদ্বৈতবাদ ?'

এর তুলনা আছে ? এই একটি মোহনস্পর্শে কবিতাটি অপরূপ হয়ে গিয়েছে।

বাহুল্যভয়ে বেশী অনুবাদ দিতে পারলাম না এবং প্রয়োজন আছে ব'লেও মনে করি না।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

ইতিহাস

(সূচনা)

সভ্যজগতে ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবাব একটা বিশেষ প্রয়োজন সর্ব্বদাই থাকে। ঘটনাব পাবম্পর্য্য কিংবা বৈশিষ্ট্য ধবা পড়ে সেই মতামতেব সংস্পর্শে। নচেৎ, মানুষ ঘটনাস্রোতে খড়-কুটোব মতন ভেসেই চলে, জীবনের কোন অর্থ ও সার্থকতা থাকে না। যে ব্যক্তি জ্ঞানত অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত নয়, যা ক'বে হোক দিন গুজবান কবাই যাব সমস্যা কিংবা অভ্যাস, সেও জীবনেব অসার্থকতা ও নিবর্থকতাব বেদনা অনুভব কবে। কেবলমাত্র গতানুগতিকতাব মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, তাবও পিছনে ইতিহাস-সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধাবণা কাজ কবতে থাকে, বিশ্লেষণ কবলেই বোঝা যায়। বহির্জগতেব ও অন্তর্জগতেব সঙ্গে যাঁদেব দ্বন্দ্ব নেই, অর্থাৎ যাঁবা কোনপ্রকাব পবিবর্ত্তনেব বিরোধী, তাঁদেব ধাবণা এই যে তাঁদেব মৃত্যুব পবই পৃথিবী উৎসন্ন যাবে, ইতিহাসেব গতি মন্দা হবে। যাঁবা কল্পলোকে ফিবে যেতে চান, কিংবা এই লোকেই গোলোক প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা কবেন তাঁদেব ইতিহাস-সংক্রান্ত মতামত পূর্ব্বোক্ত মতামতেব কাব্য-সংস্কবণ। বিপ্লব-পন্থীদেব ধাবণা, ইতিহাসেব গতি ক্রমশই দ্রুততব হয়ে স্বর্গবাজ্যেব দিকে অগ্রসব হচ্ছে। 'গতিব ক্ষেপ দাদুবীব, কূর্ম্মেব নয়।' তাঁদেব কাছে ইতিহাসেব ধর্ম্ম হল উন্নতি। অতএব এই সমাজে সুখে বসবাস কবতে হলে, এই সমাজ থেকে উদ্ধাব পেতে হলে, একে ভেঙে নতুন সমাজ তৈবী কবতে হলে ইতিহাসেব ধর্ম্ম বুঝতে হয়। কাবণ, পাবিপার্শ্বিকেব সঙ্গে সমাবেশ সাধন ক'বে ভালভাবে এবং আবো ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কবা তাব ওপব নির্ভব কবছে।

শুধু তর্কেব খাতিবে স্বীকাব কবা চলে যে অ-সামাজিক ব্যক্তিব ইতিহাস-সংক্রান্ত সংস্কাবেব কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত, অ-সামাজিক ব্যক্তিব অস্তিত্ব নেই। দ্বীপে আটক হবাব পূর্ব্বে ববিনসন ক্রুসোর সমাজ ছিল, দ্বীপে থাকবাব সময় যে বকমে আহাব সংগ্রহ কবতেন বা অসভ্যদেব সঙ্গে ব্যবহাব কবতেন তাব মধ্যে পূর্ব্বতন সামাজিক সংস্কাব বীতিমতই প্রকট ছিল, সেই সমাজে ফিবে আসবাব জন্য ব্যগ্রতাও তাঁব কমেনি। এক কথায়, রবিনসন ক্রুসোব অবস্থা বর্ত্তমানকালেব সংসাবত্যাগী আশ্রম-বাসীদেব অবস্থাব কথাই স্মবণ কবিয়ে দেয়। সত্যকাবেব যোগী কালাতীত হবাব জন্য সাধনা করেন শোনা যায়। তিনিও ইতিহাসের হাত থেকে, ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলাব প্রয়োজন থেকে পবিত্রাণ পেয়েছেন ব'লে মনে হয় না। যোগী সমগ্র বিশ্বেব কল্যাণ-চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন,

বিশ্বেব অকল্যাণ হযেছে, অকল্যাণেব পথে অগ্রসব হচ্ছে, না ভাবলে কল্যাণ-চিন্তাব প্রযোজনই থাকে না। তা ছাড়া, যোগেব ইতিহাস আছে, আবাব যোগীবও ইতিহাস আছে, এবং সমাজ কি ভাবে যোগীকে দেখে এসেছে তাবও ইতিহাস আছে।

বুদ্ধিজীবিদেব কথা স্বতন্ত্র নয়। দার্শনিকদেব সব প্রচেষ্টাব মূলে একটি প্রশ্ন লুকিয়ে থাকেই থাকে—কাল-বস্তু মনেব বচনা, না তাব কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ মহাকালেব ইচ্ছায পবিবর্ত্তন, না, পবিবর্ত্তনেব একটি গুণেব নাম কাল? অর্থশাস্ত্রেব মূলকথা মূল্যনিরূপণ, সেখানেও কালক্ষেপে মূল্যেব গুরুত্ব ও লঘুত্ব নিরূপিত হয়। বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রেও কালেব উৎপাত। বৈজ্ঞানিকেব পবীক্ষাগাবে ইতিহাসেব প্রবেশনিষেধ থাকলেও, পবীক্ষাব পূর্ব্ববতন ইতিহাস, মনসা-দেবীব মত, কোন না কোন ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ লাভ কবে। আইনষ্টাইন কালকে বশ কবতে চেষ্টা কবেছেন—অঙ্ক কষে। কিন্তু তাঁব পূর্ব্বে মাইকেলসন, মবলি, মিন্‌কাওস্কী, ম্যাক্‌সোয়েল না থাকলে তিনি অন্য কিছু হতে পাবতেন, যা হয়েছেন তা হতে পাবতেন না নিশ্চয়। আদৎ কথা এই, সব জ্ঞানই জীবনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, জীবন সামাজিক, অতএব জ্ঞান সমাজেব সঙ্গে যোগসাধনেব একটি প্রধান উপায়। আবাব যখন নানা কাবণে সমাজেব সঙ্গে সহযোগ-সাধন অসম্ভব হয, তখন নতুন জ্ঞানেব অর্থাৎ বিজ্ঞানেব সাহায্যে পুবাতন সমাজ ভাঙা হয়, নতুন সমাজ গড়াব চেষ্টা চলে। অতএব বুদ্ধিজীবি ও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিব ইতিহাস-সম্বন্ধে সত্য-সংস্কাব-সৃষ্টিব প্রতি কর্ত্তব্য বয়েছে। এ বিষয়ে যিনি উদাসীন তিনি জ্ঞানেব উন্নতি কবতে পাবেন না।

বিশেষত ভাবতেব এই যুগে। শাসক-সম্প্রদায (তাঁবা আবাব ভিন্ন জাতি) বলছেন, "ধীবে ধীবে ইতিহাস চলে, আমাদেব দেশে, ইংলণ্ডে, তাই চলেছে, প্রমাণ এডমণ্ড বার্কেব উক্তি, অতএব প্রথমে প্রাদেশিক বৈঠকে আংশিক স্বাবলম্বন, যোগ্যতাপ্রমাণেব পব সম্পূর্ণ, তাব পব দিল্লীতে দু-ইয়াবকী, সেখানে যোগ্যতাপ্রমাণেব পব ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়াব মতন স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা। ভাবতে ইতিহাসেব ধাবা এই হওয়া উচিত, অতএব এই হবে।" শাসিতেব মধ্যে এক শ্রেণী অন্তত উত্তব দিচ্ছেন, "আমবা প্রস্তুত, তবে ইতিমধ্যে আপোষে যদি গোটাকয়েক সর্ত্ত খাড়া কবতেই হয়, তবে সেগুলিকে আমাদেব শুভেব জন্যই প্রয়োগ কবা চাই, এবং কিছুদিন পবে সেগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে।" ইতিহাসের অর্থ যে ক্রমোন্নতি দু'দলই স্বীকাব কবেছেন—হোব্ থেকে মহাত্মাজী পর্য্যন্ত। বছব বাবো পূর্ব্বে ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদেব অন্য ধাবণা ছিল, মহাত্মাজীব বাক্যে আস্থা বাখলে, তাঁব আদেশ মান্য কবলেই আমবা একটা বিশেষ তাবিখে ইতিহাসেব স্ববাজ-অধ্যায়েব

পাতা খুলে ফেলব। সে ধারণা আর নেই। এখন ক্রমোন্নতির যুগ। সমাজ-সংস্কারেও এই নতুন ধারণা কাজ করছে। উচ্চশ্রেণীরা, (অর্থাৎ মহাত্মাজী ও মালব্যজী) হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত, কিন্তু চতুর্বর্ণের ওপর হাত না দিয়ে। একে ইতিহাসের কমঠ-সংস্কার বলা চলে।

কূর্ম্ম অবতার এদেশেরই কল্পনা হলেও, এবং কমঠ-বৃত্তি এদেশের একটি সুপরিচিত সাধনা হলেও, ইতিহাস-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ধারণা কিন্তু আমাদের নয়। আমাদের কার্য্যাবলী থেকে অন্য কোন ধারণা উদ্ভূত হয়নি বলেই শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধামত একটি ধারণা আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের পণ্ডিতবর্গ নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ইতিহাসের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে কোন মত সৃষ্টি করতে পারেননি বলেই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জীববিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদকে যেমন সামাজিক পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হয়েছিল, তেমনি অন্ধভাবে তাকে আমরা এই দেশে প্রয়োগ করছি। এটা আমাদের অনুকরণ, সৃষ্টি নয়। সেই জন্য পার্থক্য শুধু তালে, শাসক ও ব্রাহ্মণ চাইছেন ঠায়ে চলতে, শাসিত এবং হরিজনেরা চাইছেন ধূনে। লয় সমান। জীবজগতের অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ কোন কালেই সমাজে প্রযোজ্য নয়, এমন কি ইংলণ্ডেও নয়, বিশেষত এখন। ভুল অনুকরণে শক্তির অপচয় হয়, সঞ্চয় হয় না। ভারতবর্ষের দায়িত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী, আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে। অপচয় শুধু পাপ নয়, বোকামী।

অনেকে বলতে পারেন, আমাদের দেশে ইতিহাসের নতুন ধারণা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মনোভাব এই যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির আবর্ত্তন কিংবা ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত-পরিকল্পনার সাহায্যে এ যুগের ব্যাখ্যা ও কর্ত্তব্য নিরূপিত হতে পারে। মনোভাবটিকে অসম্ভবনীয়তার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সভ্য জগতের, বিশেষতঃ জার্ম্মাণ দার্শনিকদের মতামত উদ্ধৃত করা হয়। হিন্দু পৌরাণিক ও নীটশে, স্পেংগলারের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণণীয়ক হল ইতিহাসের এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা। শুধু সত্যের খাতিরে এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে হিন্দু পৌরাণিকের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক, এবং আজকালকার পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য আধিভৌতিক, জোর আধিদৈবিক। কিন্তু ফলে একই দাঁড়ায়। সেইজন্য এই দুটি ধারণাকে একত্র সমালোচনা করা চলে। এই সব বৃহৎ পরিধির আবর্ত্তনের তুলনায় আমাদের পরিচিত সভ্যযুগের আবর্ত্তন এতই ছোট যে তার মধ্যে মানুষের সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে ওঠে। অতিবৃহতের মধ্যে ছোট-খাট কর্ত্তব্যগুলি দিশা হারায়। যে অর্থের সন্ধানে ইতিহাসের ধর্ম্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন জন্মায়, সেই সন্ধানের প্রারম্ভেই ব্যর্থতা

স্মরণ করা কিংবা আত্মবিশ্বাস হারানো উচিত নয়। মানুষ বাদ দিয়ে ইতিহাসের অর্থ থাকেনা, অন্ততঃ মানুষের কাছে। আসল কথাই এই যে অতি পুরাতনকালে, যখন মানুষ নিজের মতে বাইরের সম্বন্ধকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেনি, তখন কালের পরম্পরা ও প্রসার সম্বন্ধে কোন রীতি আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অল্পদিন হল আমরা অতীত-সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে উঠেছি, তারই কৃপায় আমরা কালপ্রবাহের গতি ও রীতি এবং সেই গতি ও রীতির সাহায্যে বর্ত্তমানের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতের প্রগতি বুঝতে শিখছি। এখনও আমাদের ধারণা নিশ্চিত ও দৃঢ় হয়ে ওঠেনি, সেটি ধ্যানে পরিণত হয়নি। বৈজ্ঞানিকের বিবেচনার বহির্ভূত হয়ে এই অস্পষ্ট ধারণা লজ্জায় আত্মগোপন করছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের যে রীতি ব্রহ্মার যোগনিদ্রা থেকে উদ্ভূত হয়ে সেই নিদ্রায় লীন হবেই হবে, যে গতির গুপ্ত অভিসন্ধি জানবার অধিকার কোন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণীর জন্মগত সংস্কারমাত্র, সে পরিবর্ত্তন শুধু স্বপ্নবিলাস, সত্যকারের পরিবর্ত্তনই নয়। তার সাহায্যে বর্ত্তমান জগতের জাগ্রত ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—তা সে ধারণাতে ইচ্ছাপূরণের যত সুযোগই থাক না কেন। তার সাহায্যে বৈচিত্র্যের মর্ম্মকথা প্রকাশ পায় না, কারণ 'এব চ' মন্ত্র উচ্চারণে শুধু একীকরণই সাধিত হতে পারে। আগে যা ছিল, পরেও তাই হবে, রূপ ও আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হবে না—এ কথা নীট্‌শের কল্পিত জরাথুষ্ট্রার মুখেই শোভা পায়। নিয়তির চাপে সমীকরণ এবং কলকারখানা ও যন্ত্রের চাপে সমীকরণের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই। ব্রহ্মা কিংবা ব্রহ্মের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করলে ঐতিহাসিক ও ব্রাহ্মণ একই ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তা হলে সমূহ বিপদ, অব্রাহ্মণের পক্ষে, যাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পুরাণের মতে কলিযুগে ব্রাহ্মণ নেই যখন, তখন ঐতিহাসিকের কাজও কমে গেল। এই প্রকার অতিপ্রাকৃতের হস্তে ইতিহাসের রীতি-উদ্‌ঘাটনের ভার ন্যস্ত করলে প্রুশিয়ান রাজ্যই হয়ে ওঠে ব্রহ্মের একমাত্র প্রকাশ, ব্রাহ্মণ ও প্রোফেসার হয়ে ওঠেন একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী, এবং দর্শন হয়ে ওঠে সোঽহংবাদ।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের এ অর্থ নয় যে আমাদের কোন ইতিহাস ছিল না। বক্তব্য এই, আমাদের যে ইতিহাস ছিল মাত্র এখনই আমরা বুঝতে পারি। এই অর্থেই সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস। বক্তব্য এই যে অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে ইতিহাসের অর্থ পাওয়া যাবে না। অর্থের পদ-গুলি প্রকৃতির মধ্যেই আছে, যদিও সে প্রকৃতির ক্রিয়ায় ও ব্যবহারে এমন 'অসম্ভব' ঘটনা ঘটে যার হদীস্ পাওয়া যায় না বলে তাদেরকে 'অ-প্রাকৃত' নাম দেওয়া হয়। মাত্র এইভাবে দেখলেই ইতিহাস স্বকপোল-

কল্পনার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে। বাহ্যপ্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের আচার-ব্যবহার কি ভাবে গড়ে উঠেছে, আমরা কতটুকু স্বাধীন, কতটুকু নিয়তির অধীন, কতটুকু নির্ব্বাচন করেছি, কতটুকু নির্ব্বাচিত হয়েছি জানবার পরই ইতিহাস বাহ্য হয়ে উঠতে পারে। নচেৎ, ইতিহাস কল্পনাবিলাসীর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাসের নিকটতম সম্বন্ধ ভূগোল। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অন্য কোন অর্থ নেই—ঘটনা কিছু বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। ঘটনার ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক হতে পারে, সে জন্য ব্যাখার বিষয়কে, অর্থাৎ ঘটনার সম্বন্ধ ও পারম্পর্য্যকে যতটা বাহ্য করা যায় ততই ভাল।

মানুষ সমাজ-বদ্ধ হয়েছে বাঁচবার জন্য। বাঁচবার প্রধান উপায়ের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে আজকাল নিষ্কাম-ধর্ম্মের কোঠায় তোলবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তার আদি ছিল সকাম, ভুললে চলবে না। কি করে বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা যায়—এইটাই ছিল মানুষের একটি প্রধান সমস্যা। যতদিন থেকে খাদ্য-সমস্যা ততদিন থেকে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মূলে ইকনমিক ফ্যাকটরটি সর্ব্বদাই ছিল, এবং সে ফ্যাকটরটি, অঙ্কের ভাষায়, প্রাইমারী, অর্থাৎ একে আর অন্য কোন ফ্যাকটর-দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। ধরা যাক, আদিম যুগের কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন একটি উপায় উদ্ভাবন করলে, সেই থেকে একটি জাতির খাদ্য-সংগ্রহের ভার, কিংবা অন্য কোন শত্রুর কবল থেকে বাঁচবার ভার তার লাঘব হল, খানিকটা শক্তি সঞ্চিত হল, যার জোরে সেই জাতি অন্যদিকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। আদিম যুগের আবিষ্কারের পিছনে ও পরে এই বাঁচবার তাগিদ ছিল, নচেৎ আবিষ্কারের প্রচার হতো না, একটি আবিষ্কারের সঙ্গে অন্য আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় কোনটাই টিঁকতে পারত না। যখন একটি কোন আবিষ্কারের সাহায্যে, পূর্ব্বের অপেক্ষা ও অন্যের অপেক্ষা ভাল ভাবে বাঁচবার উপায় প্রচারিত হলো, তখন সেই আবিষ্কারের সাহায্যে ও তাকে কেন্দ্র করে সেই সমাজ নতুন ভাবে গড়ে উঠতে লাগল। কেননা সমাজ ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক, বাঁচা এবং আরো ভাল করে বাঁচা। যে সমাজে আবিষ্কারক জন্মাল না কিংবা যে সমাজ অনুকরণ করতে পারল না সে পিছিয়ে পড়ল, এই জীবনসংগ্রামে। এই চলল কিছুকাল—অর্থাৎ নতুন নতুন আবিষ্কার, সেই সঙ্গে নতুন উপায়ে সমাজ গঠন।

কিন্তু আবিষ্কারের গতি সমাজের পুনর্গঠনের গতির চেয়ে দ্রুততর হতে বাধ্য। আবিষ্কার করে জনকয়েক লোক, কিন্তু সমাজ সব লোককে নিয়ে। জনকয়েক লোক তাদের সমগ্র অবসর নিয়োজিত করতে পারে সৃষ্টির কাজে। এই দুই গতির ভিন্ন হারের

ফলে সমাজের অগ্রস্থতি সম্ভব হয়। যখন শিকার ছিল একমাত্র খাদ্যসংগ্রহের উপায়, তখন শিকারীসমাজের আচার-ব্যবহার, মানুষের সঙ্গে মানুষের, এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ, সম্পত্তি-জ্ঞান ও ধর্ম্ম গঠিত হয়েছিল শিকার-বৃত্তির চারপাশে। পশুচারণ যুগে (কিংবা টাইপে) দেখা গেল যে পশুর সাহায্যে শক্তির কম খরচে খাদ্য সংগ্রহ করা চলে। পশুকে বশে আনবার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাষ করা সম্ভব হল। নচেৎ মাটি আঁচড়ানো, ঝুম-চাষ, বাগান-চাষই ছিল। লোক সংখ্যা বেড়েই চলেছে, গ্রাম তৈরী হচ্ছে, মানুষ বসবাস করছে ঘর বাড়ীতে। তাদের জন্য একটা সুনিশ্চিত খাদ্যসরবরাহের প্রয়োজন। সেই থেকে পুরুষ কর্ত্তা হয়ে উঠল, সম্পত্তি বর্ত্তমান আকার ধারণ করলে, স্বর্গের আকার বদলে গেল, ভগবান পুরুষ সেজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। প্রত্যেক যুগে পুরাতন অবস্থার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকত, কোন টাইপই শুদ্ধ ছিল না। যে জাতি পূর্ণভাবে কল-কারখানাকে গ্রহণ করেছে, সে জাতিরও মধ্যে চাষবাস পরিত্যক্ত হয়নি, অন্যে পরে কা কথা! কৃষিপ্রধান জাতির মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভূসম্পত্তির মালিকমাত্র হয়ে ধনশালী হয়ে উঠলেন। ছোট চাষীরা আর খেতে পায় না, অথচ বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্য একটি শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা বাড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে পুরাতন কলের সার্থকতা কমে এসেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে, অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে নতুন কল তৈরী হল। নতুন কারখানার টাকা আসতে লাগল পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কাছ থেকে। পূর্ব্বতন সমাজের অতিরিক্ত লোক-সংখ্যা আর অতিরিক্ত রইল না, অনেকে কলকারখানায় চাকরী নিলে, কেউ বা বিদেশে চলে গেল। আজ দেড়শ বৎসর মাত্র গোটাকয়েক দেশে এই ব্যাপার ঘটছে, এবং অন্য দেশ এখন সেই সব দেশের অনুকরণ করছে। কারণ এ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রচুর লোকের যথেষ্ট অন্নসংস্থান হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদের প্রথম ফল উপভোগ করলেন ধনী-সম্প্রদায়। তাঁরা এখনও সেই ফলভোগ করছেন—মাত্র এইটুকু বল্‌লে ইতিহাসের রীতি বোঝা যাবে না। একটু তলিয়ে দেখতে হবে। বিজ্ঞানের ফলে প্রথম উন্নতি হল যন্ত্রবিস্তার, তার দরুণ কল-কারখানার প্রসার হল। এক একটি কল যেমন অনেক লোককে খাওয়াতে পারে, তেমনি অনেক লোকের বদলেও সে কাজ করতে পারে। অতএব লোকদের তাড়িয়ে দিতে হয়, কিন্তু বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম অনেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে মজুরদের কলকারখানার কাছে কাছে রাখলেই মালিকদের সুবিধা হয়। সুবিধা দুই প্রকারের—এক, যদি চাহিদা বাড়ে তখন সরবরাহ করবার জন্য বেশী লোকের প্রয়োজন

হবে ; আব এক প্রকাব—শ্রমিকেব একদল যদি মজুবী বেশী চেয়ে বসে তা হলে অন্য শ্রমিকদলেব চাকবী পাবাব আশঙ্কায় তাবা জব্দ থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে চাহিদা তখন বেড়েই চলেছে, নতুন আকাব নিযেছে। কল তৈরীব জন্য নতুন কাবখানাব প্রয়োজন হল। ইংলণ্ড এই কল তৈবীব ভাব নিলে। জনকযেক লোক আবাব কাজ পেলে। তাদেব মজুবী বাডল। সেই সঙ্গে তাদেব সংখ্যা বেড়েই চল্ল। তাবা যত বাড়ে তত পবিমাণে তাদেব মজুবী জোটে না। কিন্তু বিজ্ঞান,—অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকে জয ক'বে সামাজিক উৎপাদনেব উপায়—ব'সে থাকবাব ছেলে নয়। সে শুধু দিতেই জানে। কখন দিতে হয়, কি দিতে হয, কাকে দিতে হয, কিভাবে দিতে হয় সে জানেই না—বোকা ছেলেব মতন। প্রথমে সে তা জানত। কিন্তু এখন বিজ্ঞান একটা শ্রেণীব বৃত্তি হযে উঠেছে, যে শ্রেণীব স্রষ্টা এই ধনীসম্প্রদায, যে বৃত্তি পরবিত্তভোগী, যাব উদ্দেশ্য অন্য শ্রেণীব উদ্দেশ্য-সাধনেব উপায় আবিষ্কাব কবা। এই সময় ধনী-সম্প্রদায বিজ্ঞান শিক্ষাব জন্য অনেক টাকা দিলেন, নতুনধবণেব বিশ্ববিদ্যালয, বড বড ল্যাববেটাবী তৈবী কবলেন, নিজেদেব কাবখানায় বৈজ্ঞানিকদেব মাইনে দিয়ে বাখলেন, তাঁদেব জন্য পবীক্ষাগাব তৈবী কবলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদেব কেনা গেলেও বিজ্ঞানকে কেনা যায না। এইখানেই আবাব বিপদ ঘটল। কল যেমন থামে না, বিজ্ঞানও তেমনি থামে না। তাই কলেব মালিক নতুন সুব গাইতে বাধ্য হলেন। আজ তাঁবা বলছেন, 'কিছুদিন বিজ্ঞানেব উন্নতি বোধ কবলে পৃথিবীব মঙ্গল হয়।' আজ তাঁবা পেটেণ্ট কিনে লোহাব সিন্ধুকে তুলে বাখছেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে মুনাফাতে টান পড়ে, তাকে ভাগবাটোয়াবা কবতে হয়। সেইজন্য হয বিজ্ঞান বন্ধ কবা চাই, নচেৎ বিজ্ঞানেবই সাহায্যে ক্ষতি কমিযে লাভ বাডানো চাই। শেষ উপাযটিব নাম সায়ান্টি-ফিক্ ম্যানেজমেণ্ট, ব্যাশন্যালিজেশন। কিন্তু, উদ্দেশ্য একই, উচ্চ-হাবেব মুনাফা বক্ষা কবা। উপায় একই, শ্রমিকদেব নিজেদেব শ্রেণীতে থাকাব চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত কবা। ধনীসম্প্রদাযেব দাস বৈজ্ঞানিকেব তথা বিজ্ঞানেব দৌলতেই আজ সমাজেব এই শ্রী।

কল-কাবখানাব মালিক ধনীসম্প্রদায় সহজে নিজেদেব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছাডবাব পাত্র নন। বিজ্ঞানেব হাত থেকে পবিত্রাণ পাবাব জন্য তাঁবা অন্য উপায গ্রহণ কবতে বাধ্য হলেন। অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাব কুফল বুঝতে পেবে তাঁবা প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ কবতে প্রযাসী হলেন। সেইজন্য গতকয়েক বৎসব ধবে ব্যবসায-বাণিজ্যে ট্রষ্ট, কার্টেলেব প্রসাব হচ্ছে। গোটাকয়েক সমবায় বিশেষ কোন দেশ ও সাম্রাজ্য অতিক্রম

কবলেও বেশী সংখ্যক সমবায দেশেব মধ্যেই বিস্তৃত। কিন্তু দেশেব বাজাব বডই মন্দা। সেইজন্য ছোট গণ্ডী তৈবী কবাব প্রয়োজন হল। ভিন্ন দেশেব একচেটিয়া ব্যবসাব সঙ্গে প্রতিযোগিতাব বাধাবিপত্তিও অনেক। সেইজন্য এই বৃহৎ সমবায়গুলি উপনিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসাবে মনোনিবেশ কবলে। ভের্সাই সন্ধিতে পৃথিবীব বাকী অংশটুকু ধনীজাতিব, ধনীশ্রেণীব মধ্যে বণ্টন হয়ে গেল। উপনিবেশেব ব্যবসায় মুনাফা বেশী, বাজাব ভাল, সস্তায় কাঁচামাল ও মজুব পাওয়া যায়, এবং ব্যবসায় বাজশক্তিব সাহায্য পাওয়া যায়। উপনিবেশে ধনতন্ত্র না প্রবেশ কবলে ধনতন্ত্র মাবা যাবে, স্থানাভাবে। ধনতন্ত্রেব সব চেয়ে উন্নত অবস্থা হল একচেটিয়া ব্যবসা, এবং তাবই বাজাব হল উপনিবেশ। এই অধিবাজক-শাসনেব বেডাজালে ভাবতবর্ষ জডিয়ে পডেছে। গত কযেক বৎসবে আবো বেশী কবে, কাবণ অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ-জিলাণ্ড এখন প্রায় স্বাধীন বাজ্যেব সামিল, অর্থাৎ সে দেশেও ধনীসম্প্রদায় উঠেছেন, তাঁবাও মুনাফা বাডাতে চাইছেন। জগতেব ইতিহাসেব যে ধাবা প্রবল হযে উঠেছে তাবই সহযোগে ভাবতবর্ষেব বর্ত্তমান অবস্থা বুঝতে হবে।

শুধু এইটুকু বল্‌লে যথেষ্ট হবেনা। বাহ্যত, এখন ধনতন্ত্রেব বোল-বোলাও অবস্থা। কিন্তু ভেতবে ঘুণ ধবেছে। বাহ্যত, অন্তত ওযেলস্ এবং তাঁহাব শিষ্যবৃন্দেব কাছে, জগৎ এক হযে আসছে। পৃথিবীব নানা স্থানে ছোট-বড দল তৈবী হচ্ছে, পৃথিবীতে একটি মহাবাজ্য-স্থাপনেব পক্ষে এ চিহ্নগুলি শুভ মনে হওয়া স্বাভাবিক। একধাবে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য, অন্য ধাবে উত্তব ও দক্ষিণ আমেবিকা, বলকান দেশেও তিন-চাবটি ছোট বাজ্য বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, ফবাসী-পোল-চেক মিলে একটা দল হয়েছে। তা ছাড়া আফ্রিকা ও এসিয়াব প্রায় সবটাই যুবোপের কোন না কোন বাজ্যেব অধীনে। তবুও কোথায যেন শনিব দৃষ্টিপাত হয়েছে। পৃথিবীব একাংশে, মাত্র দু বৎসব আগে, ১৯৩১ সালে, লক্ষ লক্ষ মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হল, কফি গুঁড়িয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহাব কবা হল, সৈনিক বেখে খনি থেকে পেট্রল এবং ববাব গাছ থেকে ববাব নেওয়া বন্ধ কবা হল, তুলোব ক্ষেত গাছ ও ফুলশুদ্ধ চযে ফেলা হল, চিনি যাবা তৈবী কবে তাবা পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান ক'বে উৎপাদন কমিয়ে দিলে; তামা, টিন, দস্তা, আলুমিনিযম বেশী প্রস্তুত হচ্ছিল বলে খনিতে মজুবেব সংখ্যা ও খাটবাব সময় কমানো হল, চিলিব সোবাব ব্যবসা উৎসন্ন গেল, কলে তৈবী সোবাব জন্য। কিন্তু পৃথিবীব অন্যধাবে লোকে খেতে পাচ্ছে না, মজুরী কমে গেছে, লোকেব সংসাব খবচ জোটে না, দু কোটিব ওপর শ্রমিকেব হাতে কাজ নেই, প্রত্যেক

জাতি বপ্তানী কববাব জন্য প্রস্তুত, আমদানী কবতে অনিচ্ছুক। চাবধাবে শুল্কেব বেড়া, বড় বড় কল-কাবখানা বন্ধ, টাকাব বাজাব, শেয়াবেব বাজাব যায় যায়, সমগ্র যুবোপ আমেবিকাব কাছে ঋণী, অথচ আমেবিকা সে ঋণ শোধ নেবে না জিনিষ নিয়ে, বীতিমত ও যথাযোগ্য টাকা ধাব দিয়ে সাহায্যও কববে না, জার্ম্মানীব হাতে টাকা নেই. ফ্রান্সেব হাতে বিস্তব সোনা। এই সোনাব সংসাব ছাবখাব হয়ে গেছে, অথচ সোনাব কমতি নেই, পৃথিবী জুড়ে। এই প্রাচুর্য্যেব মধ্যে দৈন্যকে শনিব দৃষ্টি ছাড়া কি বলা চলে? যে শিশু বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রেব দ্বাবা লালিত-পালিত সেই শিশুই বড় হয়ে বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রকে মেবে ফেলতে চায়। ইতিহাসেব নিয়মই এই।

এই প্রবন্ধে ইতিহাসেব স্থূলধাবা ও তাব একটি মাত্র বীতিব ইঙ্গিত কবা হল। ধাবাটি ধন-সমাগমেব ও বিজ্ঞানেব ইতিহাস-দ্বাবা পুষ্ট। বীতি হল এই যে কোন একটি অনুষ্ঠানেব মধ্যেই তাব ধ্বংসেব কাবণ লুকানো থাকে। ধ্বংসেব কাবণ ভগবানেব ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়। তাব কাবণ ধনতন্ত্র-মূলক সমাজেব প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীব তদবস্থস্থিতিপ্রবণতা, এবং বিজ্ঞানেব কৃপায় নব-নব উপায়ে উৎপাদনেব প্রাচুর্য্য। এই সামাজিক জীবনেব স্থিতি, প্রগতি ও অবনতিব ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে—অর্থাৎ মানুষ তাব সমবেত চাহিদা ও চেষ্টাব ফলে যে উপায়ে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় কবেছে কিংবা চেষ্টা কবছে জয় কবতে তাবই ইতিহাসেব সাহায্যে। ভাবতবর্ষেব ইতিহাস জগতেব ইতিহাসেব অঙ্গ, বৈশিষ্ট্য তাব পাবিপার্শ্বিকেব।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ *

খড়দহ

কল্যাণীয়েষু

গানের আলাপের সঙ্গে "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেচ সেটা মন্দ হয়নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকেনা মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সঙ্গীতের সমস্তটাই অনির্ব্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্ব্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্য্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্ব্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েচে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েচে, "যদেতৎ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।" বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েচে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক্ পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড়-মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয়, যখন "এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।" যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে একথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূল খাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

"পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েচে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। এ'কে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলঙ্কৃত করা হয় না। তা হোক্, পাশেই আছেন কাঁকন পরা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্চেন। নিজের রচনা নিয়ে অহঙ্কার করচি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্ত্তিটা করেচি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্চে না,

---

* পত্রখানি শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

তাব যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারি আলোচনা চল্‌চে। বক্ষ্যমান কাব্যে গন্থটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তাব কলাবতী বধূ দবজাব আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মাবচে, তাব সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি বসিকদেব উপভোগ্য হবে বলেই ভবসা কবেছিলুম। এব মধ্যে ছন্দ নেই বল্‌লে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বল্‌লেও সেটাকে বলব স্পর্দ্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা কবি। ব্যাখ্যা কবব কাব্যবস দিয়েই।

বিবাহ-সভায় চন্দনচর্চ্চিত বব কনে টোপব মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়িব উপব বসেচে। পুরুৎ পড়ে চলেচে মন্ত্র, ওদিকে আকাশ থেকে আসচে সাহানা বাগিণীতে সানাইয়েব সঙ্গীত। এমন অবস্থায় উভযেব যে বিবাহ চলেচে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই সানাই বাজনা সেই মন্ত্র পড়া লেগেই আছে। তাব সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনাবসীব জোড়, ফুলেব মালা, ঝাড়লণ্ঠনেব বোশনাই। সাধাবণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্চে বচন অনির্ব্বচনেব সদ্য মিলনেব পবিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দবকাব সযত্নে তা সংগ্রহ কবা হয়েচে। কিন্তু তাব পবে? অনুষ্ঠান তো বাবোমাস চলবে না। তাই বলেই তো নীববিত সাহানা সঙ্গীতেব সঙ্গে সঙ্গেই বব বধূব মহাশূন্যে অন্তর্দ্ধান কেউ প্রত্যাশা কবে না। বিবাহ অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হোলো কিন্তু বিবাহটা তো বইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে সাহানা বাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি, মাঝে মাঝে তাব সঙ্গে বেসুবো নিখাদে অত্যন্ত শ্রুত কড়া সুবও না মেশা অস্বাভাবিক, সুতবাং একেবাবে না-মেশা প্রার্থনীয় নয। চেলি বেনাবসীটা তোলা বইল, আবাব কোনো অনুষ্ঠানেব দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীব বা চতুর্দ্দশপদীব পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা কবিনে। এমন কি বাম-দিক থেকে রুনুঝুনু মলেব আওয়াজ গোলমালেব মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটেব উপব বেশভূষাটা হোলো আটপৌবে। অনুষ্ঠানেব বাঁধা বীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হোলো এই যে উভয়েব মিলনেব মধ্যে দিযে সংসাবযাত্রাব বৈচিত্র্য সহজরূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসাবযাত্রা আছে এমনো ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুবে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু যে সংসাবটা প্রতিদিনেব, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিবদিনেব কবে তুলচে, যাকে চিবন্তনেব পবিচয় দেবাব জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলঙ্কৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ

চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেই জন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্ম্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস আদি কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তন স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রং-ফলানো চওড়া বলেই লোকে ঐটের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে উত্তর-রামচরিত রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েচেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ঐ দেখ, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্য-সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হাল্‌কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চল্‌তে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনীচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

বোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর, বাসরঘর পর্য্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্ব্বত্র। সেই গতি-ভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া-বাঁচিয়ে পোষাকী সাড়ির প্রান্ত তুলে ধরা আধা ঘোমটা টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ৎ। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য্য হয়ে বসব না এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েচি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্য্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারিনে। যাঁরা দৈব দুর্য্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারী বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দ্দিনের পূর্ব্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মত্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েচি।

বড়ো চিঠি লিখতে অনুরোধ করেছিলে। বড়ো চিঠিই যে ভালো চিঠি এমন মোহ মনে স্থান দিয়ো না। ইতি দেওয়ালি, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

(১)

বিশ্বাসের জগতে স্বপ্ন যে মানুষের জীবনকে অনেকখানি সরস করেছে তা স্বীকার করতেই হবে। সংসারের বহুবিধ ক্লেশে পীড়িত হয়ে মানুষ নানা সুখের কল্পনা ও কামনা করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে কামনা তার সহসা পূর্ণ হয় না, কল্পনাও ফলবতী হয় না। কিন্তু কখনো কখনো স্বপ্নে সেই কামনা মূর্ত্ত হয়ে তার চিত্তকে আনন্দ প্রদান করে, তাই তখন নির্ধন ধন সঞ্চয় করে, দরিদ্র দারিদ্র্যমুক্ত হয়, বিরহীর প্রিয় সন্দর্শন ঘটে, কেউ বা শত্রুকে নিপাত করবার আনন্দলাভ করে আর কখনো বা আরাধ্য দেবতা রূপ পরিগ্রহ করে ভক্তের ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি বিতরণ করেন। অন্ধ-বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ সেই স্বপ্ন বিচার করে ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখের ছবিই না অঙ্কিত করে!

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ স্বপ্ন বিচার করতে সুরু করেছে। তাই প্রাচীন আসিরীয়ায় যে ধর্ম্মশাস্ত্র আমরা পাই তা এই স্বপ্ন বিচারেই ভরা, হিব্রু সাহিত্যের Apocalypse ও ভারতীয় বেদও শাস্ত্রীয় মতে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝবার বস্তু নয়. স্বপ্নের মতই তা ঋষিদের চিত্তাকাশে প্রতিভাত হয়েছিল। আর সেই সব শাস্ত্র অবলম্বন করেই প্রাচ্যদেশসমূহে কত বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যুক্তির নির্ম্মম হিসাবে স্বপ্নের জগৎ যে মায়ার খেলা ব্যতীত আর কিছু নয় তা নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নেরই যে বাস্তব জীবনের ব্যবহার থেকেই সৃষ্টি হয়—আর তাদের ভেতর যে কোন গূঢ় রহস্য নেই তা মনস্তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে স্বপ্নে আমাদের তিনটী শক্তি প্রবল থাকে—দেখবার, শুনবার ও কথা বল্‌বার। আর এ সব শক্তির ক্রিয়া চলে বেশীর ভাগ হয় মনের কোন লুপ্ত বাসনা না হয় জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট কোন বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করে। সুপ্তের পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ অবস্থানও কখনো কখনো স্বপ্নের সৃষ্টি করে থাকে। কখনো কখনো বা চোখের পাতার সঙ্গে তারকার সংস্পর্শে যে সব বর্ণের (ocular spectra) সৃষ্টি হয় সেই গুলিকে অবলম্বন করেও স্বপ্নের লীলা চলে। এই সব হিসাবে দেখা যায় আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নই হচ্ছে অলীক—কোন না কোন যোগসূত্র অবলম্বন করে মায়ার রচনা। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকেরা সব স্বপ্নেরই যে অর্থ নির্দ্দেশ

করতে পেরেছেন তা নয়, রহস্যময় স্বপ্নও আছে—যেমন creative dreams। কখনো কখনো গণিতজ্ঞ স্বপ্নে নূতন তথ্যের, কবি নূতন ছন্দের বা সুর-সাধক নূতন সুরের সন্ধান পান। সে সব স্বপ্নকে অলীক বলা চলে না, তাই বার্গসোঁর মতে এগুলি স্বপ্ন নয়—জাগ্রত অবস্থায় লুপ্ত-স্মৃতি মাত্র। সেগুলির সন্ধান জাগ্রত অবস্থাতেই মিলেছিল—শুধু অন্যান্য চিন্তার চাপে স্মৃতির অতল গহ্বরে বিলুপ্ত হয়েছিল—স্বপ্নাবস্থায় তাদের পুনরাবির্ভাব হয়েছে মাত্র। কিন্তু যে সব স্বপ্নে ভবিষ্যৎদর্শন ঘটে সেগুলির সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক নীরব—সেখানে বার্গসোঁ বলেছেন "I stop on the threshold of mystery."

সম্প্রতি ডান সাহেব (J. W. Dunne) নামক এক পণ্ডিত তাঁর An Experiment with Time পুস্তকে সেই রহস্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এডিংটন, রাসেল, ওয়েল্‌স প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করেছেন এবং এ পুস্তক যে বর্ত্তমান শতকের পুস্তকাবলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করবে এ বিশ্বাসও তাঁরা লেখায় ব্যক্ত করেছেন (the most important book of our age)। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ডান সাহেব যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন সেগুলি বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বের জগতে একটা 'হুলুস্থুল' বাধাবে—কারণ সে সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

ডান সাহেব তাঁর পুস্তকে Time বা কালপ্রবাহ সম্বন্ধে বিচার করেছেন। এই বিচারের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে স্বপ্নতত্ত্ব। তিনি নিজে নানা সময়ে যে সব স্বপ্ন দেখেছেন সেগুলিকে প্রথমে বিশ্লেষণ করে—যেগুলির সঙ্গে জীবনের অতীত অনুভূতির যোগ রয়েছে সেগুলিকে বর্জ্জন করেছেন আর যে সব স্বপ্নে তিনি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের আভাস পেয়েছেন সেইগুলির বিচার করে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি বিচার করবার পূর্ব্বে তাঁর অদ্ভুত স্বপ্নগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম স্বপ্ন ঘটে ১৮৯৮ সনে। ডান তখন সাসেক্সের এক হোটেলে। তিনি রাত্রিতে স্বপ্নে দেখলেন যে ঘড়িতে ঠিক ক'টা বেজেছে এই নিয়ে তিনি হোটেলের এক চাকরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। ডান বলছেন যে বিকেলে সাড়ে চারটা বেজেছে। কিন্তু চাকর বল্‌ছে যে রাত্রির সাড়ে চারটা। তখন ডানের মনে হলো যে হয়ত তাঁর ঘড়ি সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়ে গেছে—তিনি জান্‌তে পারেন নি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে নিজের ঘড়িটা বের করে দেখতে পেলেন যে তিনি যা ভেবেছিলেন তাই হয়েছে—অর্থাৎ বিকেল

সাড়ে চারটায় ঘড়িটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় ডানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নটা আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে তিনি তখনই আলো জ্বেলে দেখতে চাইলেন যে ঘড়ি সত্যই বন্ধ হয়েছে কিনা। ঘড়ি সাধারণতঃ তাঁর বিছানার পাশে থাক্‌তো, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘড়ি সেস্থানে দেখতে পেলেন না—তখন বিছানা থেকে উঠে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ঘড়িটা ড্রয়ারের ভেতর পেলেন। ঘড়ি বের করে দেখ্‌লেন যে সত্যই সাড়ে চারটেতে পৌঁছে ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়েছে। তাঁর তখন সন্দেহ হলো যে ঘড়িটা বিকেল সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়েছিল—তিনি দেখেও ভুলে গিয়েছিলেন, সেই জন্যই স্বপ্নে এ কাণ্ড। তিনি ঘড়িটায় পুনরায় চাবি দিলেন, কিন্তু ঠিক সময় জানতে না পারায় কাঁটা না নেড়ে ঘড়িটা রেখে দিলেন। সকালে উঠে যখন ঘড়িটা মেলাতে যাবেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে ঘড়ি ঠিকই চল্‌ছে—মাত্র ২।৩ মিনিটের তফাৎ। পূর্ব্বদিনের বিকেলে বন্ধ হলে তিন-চার ঘণ্টার প্রভেদ হত। তখন তাঁর মনে হলো যখন তিনি স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন তখনই ঘড়িটা বন্ধ হয়েছিল—ঘড়িটা খুঁজে বের করতে দু-তিন মিনিট লেগেছিল এই জন্যই ঘড়িটায় দু-তিন মিনিটের প্রভেদ হয়েছে। ঘড়িটার টিক্ টিক্ হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই হয়ত তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নে যে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে চারটায় রয়েছে দেখ্‌তে পেলেন তার কোন অর্থ তিনি তখন খুঁজে পাননি, সেটা রহস্যময়।

সাসেক্স থেকে ডান ইটালীতে যান। ইটালীতে সরেন্তোর এক হোটেলে তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন ঘটে। সকালে একদিন তাঁর ঘুম ভাঙ্‌তে বিছানায় শুয়ে ক'টা বেজেছে জান্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। ঘড়িটা ছিল মশারির বাইরে একটা ছোট টেবিলের ওপর। শুয়ে শুয়ে ঘড়িটা দেখবার কোন উপায় ছিল না—উঠতে তাঁর তখন খুব আলস্য। অলস-চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে তাঁর তন্দ্রার অবস্থা এলো। তাঁর দৃষ্টি উপরে নিবদ্ধ, চোখের ওপরে প্রায় এক ফুট উঁচুতে শূন্যে সেই স্থানটা সাধারণ দিনের আলোয় আলোকিত, আর তার চারিধারে সাদাটে আবছায়ায় ঘেরা। এই অবস্থায় তিনি ঘড়ি দেখতে পেলেন। দেখলেন যে ঘণ্টার কাঁটা আটটায়, মিনিটের কাঁটা বারো ও এক-এর মাঝখানে আর সেকেণ্ডের কাঁটা স্পষ্ট দেখা যায় না। আরও সঠিক সময় দেখবার জন্য চেষ্টা করতে তাঁর ভরসা হলো না—ভয় হলো স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে। তিনি মিনিটের কাঁটার অবস্থান থেকে অনুমান করলেন যে সেটা বারো থেকে এক-এর যে ব্যবধান তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে—সুতরাং সময় হবে আটটা আড়াই মিনিট। এই সিদ্ধান্ত করেই তিনি উঠে পড়লেন ও মশারির বাইরে থেকে ঘড়িটা টেনে এনে দেখলেন যে তখন ঠিক আটটা বেজে

আড়াই মিনিট। ডান এই অদ্ভুত মিলে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন ও মনে করলেন যে তাঁর দেখবার হয়ত একটা নূতন রকমের ক্ষমতা আছে।

ডানের তৃতীয় স্বপ্ন অন্য ধরণের। ১৯০১ সালে বুয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিক হিসাবে তিনি ছুটি পেয়ে ইটালীর উপকূলে আলাস্‌সিওতে হাওয়া পরিবর্ত্তন করছিলেন। এখানে তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে তিনি আফ্রিকায় নীলনদের ধারে খার্ত্তুমের নিকটে একটী শহরে অবস্থান করছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনটী শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ থেকে আস্‌ছে। তারা অত্যন্ত শ্রান্ত, তাদের পোষাক বেরঙা হয়ে গেছে, মুখ রৌদ্রে পুড়ে কালো হয়েছে। তাদের চেহারা দেখে ডানের মনে হলো যে তারা সৈনিক —আর সেই রেজিমেণ্টের সৈনিক যাতে তিনি নিজে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সুদান পর্য্যন্ত তিনটী লোক কেন পায়ে হেঁটে এসেছে—এই কথা ভেবে ডান বিস্মিত হলেন। তাদের এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তারা উত্তর দিল যে তারা Cape থেকে সত্যই বরাবর হেঁটে আস্‌ছে। তিনজনের একজন বল্‌লো যে পথে তার খুব কষ্ট হয়েছিল —Yellow fever-এ প্রায় মারা যেতে বসেছিল। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন সকালে ডান খবরের কাগজ খুলেই বড় হেড লাইনে দেখ্‌তে পেলেন— The Cape to Cairo—"Daily Telegraph"—Expedition at Khartoum। সংবাদে দেখ্‌তে পেলেন যে তিনজন শ্বেতাঙ্গ সত্যই Cape থেকে খার্ত্তুম পর্য্যন্ত অভিযান করেছিল—পথে তিনজনের একজন জ্বরে মারা গেছে। বাকী দুজন গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। অবশ্য ডানের স্বপ্ন দেখবার অনেক পূর্ব্বেই খার্ত্তুমে অভিযান পৌঁছেছিল—কারণ যে সংবাদ-পত্রে ডান খবর পান তা লণ্ডনে ছাপা। অভিযান খার্ত্তুমে পৌঁছুবার পরদিন লণ্ডনে সংবাদ প্রকাশিত হয় আর সে সংবাদ আরও কয়েকদিন পর আলাস্‌সিওতে আসে।

পরের স্বপ্নটা ডানের ঘটে ১৯০২ সালে আফ্রিকাতে। তিনি তখন Orange Free State-এ নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। এখানে তিনি একবার স্বপ্নে দেখেন যে তিনি একটী উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন—খুব সম্ভব একটী পাহাড়ের ধারে। জমিটা সাদাটে। আর জমির ফাটল দিয়ে জমাট বাষ্প বেরুচ্ছে। তাঁর মনে হলো যে তিনি একটী দ্বীপে রয়েছেন। আর সেই দ্বীপের আগ্নেয়গিরির উৎপাত শীঘ্রই সুরু হবে বলে সন্দেহ হতে দ্বীপটা উড়ে যাবে বলে তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন আর সেই দ্বীপের "চার হাজার" অধিবাসীকে রক্ষা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। তাদের রক্ষা করবার এক উপায় ছিল তাদের জাহাজে তুলে দেওয়া। তিনি স্থানীয় ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে নানা ভাবে বিপদের

কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন ও জাহাজ পাঠিয়ে দিতে বল্‌লেন। নানা স্থানে ছুটোছুটি করে অবশেষে মেয়রকে চিৎকার করে বল্‌লেন যে চার হাজার লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। পরদিন সকালে ডান সংবাদপত্র খুলেই বড় হেডলাইনে দেখতে পেলেন—Volcano Disaster in Martinique—Town Swept away—An Avalanche of Flame—Probable loss of over 40,000 lives।

আর একটি হেডলাইনে দেখলেন—A Mountain Expodes। পাহাড় বিস্ফোরণের জন্য জাহাজ সেই পথে এগুতে পারেনি। অগ্ন্যুৎপাতের পরে কতকগুলি জাহাজ যে সব অধিবাসী বেঁচে ছিল তাদের অন্য দ্বীপে সরিয়েছিল। এই স্বপ্নের সঙ্গে ঘটনার প্রায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। গরমিল হচ্ছে জন সংখ্যায়। ডানের স্বপ্নে বারবার ৪০০০ হাজার অধিবাসীর কথা উঠেছে কিন্তু সংবাদপত্রে ৪০,০০০ হাজার অধিবাসীর কথা রয়েছে। ডান কিন্তু সংবাদপত্র পড়বার সময় ৪০০০ হাজারই পড়েন—১৫ বৎসর পরে সংবাদপত্রের ঐ অংশ নকল করবার সময় তাঁর এই ভুল ধরা পড়ে। অন্যান্য সংবাদপত্র থেকে তিনি পরে যে খবর সংগ্রহ করেন তাতে জান্‌তে পারেন যে ঐ সংখ্যার কোনটীই সত্য নয়।

Cape থেকে কাইরো পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ-অভিযান ও Martinique Disaster সম্পর্কীয় দুটী স্বপ্ন সম্বন্ধে মনে হতে পারে যে এ দুটী হচ্ছে Identifying Paramnesia—যাতে প্রমাণ হয় যে ডান স্বপ্ন দেখেন নি—শুধু সংবাদপত্রে পড়ে তাঁর সেইরূপ অলীক স্বপ্নের কথা মনে হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু এই ব্যাপারের দু'বৎসর পরে ডান পুনরায় যে সব স্বপ্ন দেখলেন তাতে আর তিনি মনে করতে পারলেন না যে তাঁর স্বপ্নগুলি অলীক। স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি রেলিংএ ভর দিয়ে একখানি তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চারদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন, হঠাৎ সেই কুয়াসা ভেদ করে তক্তার উপর দিয়ে একটা বিশাল সর্পাকার বস্তু নীচে নেমে গিয়েছে দেখতে পেলেন। পরমুহূর্ত্তে বুঝতে পারলেন যে এটা হচ্ছে দমকল থেকে ছেড়ে দেওয়া জলধারা—ধূঁয়ার ভেতর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে ধূঁয়ার ভেতর রাশি রাশি লোক লাফিয়ে পড়ছে, কণ্ঠনালি রুদ্ধ হলে যেরূপ শব্দ করে সেইরূপ শব্দ করছে—আর ধূঁয়া গাঢ় ও অধিকতর কালো হয়ে চারিদিক ব্যাপ্ত করছে। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন সকাল বেলা ডান খোঁজ করেও কোন খবর পাননি, কিন্তু সন্ধ্যার সংবাদপত্রে জান্‌তে পারলেন যে পারিসে একটা বড় কারখানায় আগুন লেগেছিল, কারখানার মেয়েরা আগুনের জন্য সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে না পেরে

balcony-তে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে তাদের নামিয়ে নেবাব যতক্ষণ সুব্যবস্থা না হয় ততক্ষণ দমকল থেকে জলধাবা বর্ষণ কবে bolcony-টা আগুন থেকে বাঁচিয়ে বাখবাব চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু ভেতব থেকে হঠাৎ গাঢ় ধূম আসায় তাদেব শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৯০৪ সালে ডান একবাব স্বপ্নে দেখেন যে তিনি দুখানি জমিব মাঝে একটী সরু গলি দিয়ে চল্‌ছেন—দুধাবে লোহাব বেলিং—আট-নয ফুট উঁচু। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে বাঁ ধাবেব জমিতে একটী পাগলা ঘোড়া ছুটোছুটি কবছে। বেলিংএব ভেতব দিয়ে বেবোবাব কোন পথ নেই দেখে তিনি নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে লাগলেন। একটু পবেই পেছন থেকে ঘোড়াটা ছুটে আস্‌ছে বুঝ্‌তে পাবলেন ও প্রাণপণে পলায়ন কববাব চেষ্টা কবতে লাগলেন। এই অবস্থায় তাঁব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পবদিন তিনি নিজেব ভাইয়েব সঙ্গে নদীতে মাছ ধবতে গেলেন। জল থেকে যখন তিনি মাছি তাড়াতে ব্যস্ত তখন তাঁব ভাই ডেকে বল্‌লো—একটা ঘোড়া ছুটে আস্‌ছে। ডান তখন নদীব ওপাবে তাকিয়ে যা দেখলেন তা তাঁব গত রাত্রেব স্বপ্নেব সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। সরু পথ, দুধাবে বেলিং, আব ঘোড়াটা পাশেব জমির ভেতব ভীষণ বেগে ছুটোছুটি কবছে—প্রভেদ এইটুকু যে বেলিংটা লোহার নয—কাঠেব। তখন তিনি তাঁব ভাইকে বল্‌লেন যে বেলিংএ কোথাও দরজা নেই, ঘোড়াটা বেরুতে পারবে না সুতবাং ভয় নেই। এই বলে তিনি যেই মাছ ধবতে সুরু কবেছেন অমনি তাঁব ভাই চেঁচিয়ে উঠলোও তিনি সামনে তাকিয়েই দেখতে পেলেন যে ঘোড়াটা কি কবে বেলিং ডিঙ্গিযে বেবিযে পডে সরু পথ বেয়ে তাঁদেব দিকে ছুটে আস্‌ছে। তাঁবা পাথবেব টুকবো ছুঁড়ে মাবতে মাবতে পেছিযে গেলেন—ঘোড়াটা পাশ কাটিযে ছুটে চলে গেল।

১৯১৩ সনেব শবৎকালে ডান আব একটী স্বপ্ন দেখতে পান। এ স্বপ্নে দেখেন স্কটলণ্ডেব Firth of Forth Bridge-এর নিকটবর্ত্তী উঁচু বেলপথেব বাঁধ, নীচে সমতল ঘাসেব জমি। স্থানটী তিনি পূর্ব্বে চিন্‌তেন। স্বপ্নে এই স্থানটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ তাঁব নজবে পডলো যে উত্তবাভিমুখী একটী ট্রেণ বাঁধেব ওপব দিয়ে এসে নীচে পড়েছে—কয়েকখানি গাডী নীচে শায়িত, আব বড বড পাথবেব খণ্ড গড়িয়ে এসে নীচে পড়েছে। এই স্বপ্ন দেখবাব পবদিন তিনি তাঁব বোন্‌কে ঘটনাটী বিবৃত কবলেন ও হাস্‌তে হাসতে বল্‌লেন যে তিনি বন্ধুবান্ধবদের স্কটলণ্ড যেতে বাবণ কববেন। ১৪ই এপ্রিল সত্যই স্কটলণ্ডগামী একটী মেল ট্রেণ Firth of Forth-এব ১৫ মাইল দূবে লাইনচ্যুত হয ও বাঁধের ওপব দিয়ে এসে নীচে পড়ে।

এ রকমেব স্বপ্ন ডান আবও দেখেছেন—তবে অনেক ছাঁটকাট করে যেগুলিব সত্যতা সম্বন্ধে তাঁব কোন সন্দেহ ছিল না সেইগুলিবই বিবৰণ তিনি দিয়েছেন। এ স্বপ্নগুলিব বিচাবে তিনি মনে কবেন না যে এগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনাব ছায়া হিসাবে তাঁব চিত্তে প্রতিফলিত হযেছে—বা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ধববাব কোন বিশেষ ক্ষমতাব জন্যই তিনি এই স্বপ্নগুলি দেখেছেন। জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত সাধাবণ ব্যাপাব মানুষেব ঘটে এগুলি তাবই অসংলগ্ন আভাস মাত্র। শুধু নূতনত্ব হচ্ছে এগুলি ঘটনা ঘটবাব পূর্ব্ববাত্রে স্বপ্ন হিসাবে আস্‌ছে—যদি ঘটনাব পববর্ত্তী বাত্রিতে এ স্বপ্নগুলি দেখা হতো তাহলে কোনই নূতনত্ব থাকতো না। ডান যে কোন medium হয়েছিলেন তাও বলা চলে না—তাঁব অদৃষ্টদর্শনেব ক্ষমতাও ছিল না। স্বপ্নগুলিব ভেতব কোন অসাধারণ ব্যাপাবও নেই। কালপ্রবাহেব গতিকে যদি একটী নূতন ধাবা (dimension) হিসাবে ধবা যায় তাহলে বল্‌তে হবে যে ডানেব অনুভূতিতে ঘটনাগুলি কখনো কখনো এই কালপ্রবাহে স্ব স্ব স্থানচ্যুত হয়ে ধবা পড়ছিল। কালপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন বল্‌লে এ সব অনুভূতিব অর্থনির্দ্দেশ চলে না, কালপ্রবাহ বস্তুতঃ নানা বিভিন্ন খণ্ডে বিভাজ্য, ডানেব ব্যাপাবে এই খণ্ডগুলি ওলট-পালট হচ্ছিল—কালেব অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ঘট্‌ছিল না।

এব কাবণ নির্দ্দেশ কবতে গিয়ে ডান সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে স্বপ্ন হচ্ছে অতীতকালেব ও ভবিষ্যৎকালেব অনুভূতিব আভাস বা image দিয়ে গঠিত। যে কালপ্রবাহেব ভেতব দিয়ে জগৎ চলেছে তা শুধু আমাদেব নিজেদেব মনেব তৈবী বাধায় বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ কালেব যে অংশকে আমবা বর্ত্তমান বলি সেটার কোন স্থায়ীত্ব নেই—জাগ্রত অবস্থায় আমবা যে চৈতসিক বাধা mentally imposed barrier তৈরী কবি তাতেই বর্ত্তমানেব উৎপত্তি—সেই বাধা বিনষ্ট হলে কাল-প্রবাহে অতীত ও ভবিষ্যৎ অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—তখন আমবা অতীতেব ছায়াও যেমনি ধবতে পাবি ভবিষ্যতেব ছায়াও তেমনি ধবতে পারি। এখানে ডান সাহেবেব কথাব মূল উদ্ধাব কবলে তাঁব কথা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে।

The dreams were composed of **images of past experience and images of future experience blended together in approximately equal proportions.**

That the universe was, after all, really stretched in time, and that the lop-sided view we had of it—a view with the "future" part unaccountably missing, cut off from the growing "past" part by a travelling "present moment"—was due to a purely mentally

imposed barrier which existed only when we were awake? So that, in reality, the associational net-work stretched, not merely this way and that way in space, but also backwards and forwards in Time, and the dreamer's attention, following in natural, unhindered fashion the easiest pathway among the ramifications, would be continually crossing and recrossing that properly non-existent equator which we, waking, ruled quite arbitrarily athwart the whole

একথা যদি সত্য হয় যে আমাদের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে সম্বদ্ধ অতীতের ছায়াও যতটা ধরা যায় ভবিষ্যতের ছায়াও ততটা ধরা যায়—তাহলে শুধু স্বপ্নেই তা' সম্ভব হয় কেন? চেষ্টা করলে সে সব ছায়া জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ পেতে পারে না কি? ডান সাহেবের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জাগ্রত অবস্থায় যদি অতীতের ছায়া চিত্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতের ছায়া ধরা পড়তে পারে। এ সিদ্ধান্ত দৃঢ় করবার জন্য ডান সাহেব নানা বই নিয়ে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় তিনি যে উপায় অবলম্বন করেন সেটা একটু নূতন রকমের। যে বই তিনি পূর্ব্বে কখনো পড়েননি অথচ পরমুহূর্ত্তে পড়তে চাইছেন—সেই বইয়ের নামের ওপর দৃষ্টি সম্বদ্ধ করা ও একাগ্রচিত্ত হওয়া। একাগ্রতা এনে যে সব ছায়া মনে ভেসে আসে তার থেকে অতীতের ছায়াগুলিকে সরিয়ে দিয়ে অপরিচিত ছায়াগুলিকে রাখতে হয়। তারপর বই খুললেই এই সব ছায়ার কিছু খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। এই উপায়ে ডান সাহেব নূতন নূতন বই নিয়ে যে সব পরীক্ষা করেছেন সেগুলি প্রায়ই সফল হয়েছে ও তাঁর পূর্ব্ব সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করেছে।

Relativity অনুসারে ভবিষ্যৎ দর্শনে বিশ্বাস চলে—কিন্তু তা অন্যরূপে। 'ক'এর ভবিষ্যৎ 'খ'এর নিকট বর্ত্তমান হিসাবে ধরা পড়তে পারে। কিন্তু 'ক'এর নিকট যা ভবিষ্যৎ তা ঘটবার দু-তিন দিন পূর্ব্বে যে 'ক'এর নিকটে তা ধরা পড়তে পারে সে কথা Relativity বিশ্বাস করে না। ডান সাহেব নানা ভাবে সেই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কালপ্রবাহের যে বিশিষ্ট গতি আছে তা না জানার দরুনই আমরা অদূর ভবিষ্যৎ দর্শনে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কালপ্রবাহের গতি এমনই ধরণের যে আমরা চেষ্টা করলেই কোন এক বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে যেমন অদূর অতীতের স্মৃতি ধরতে পারি তেমনি অদূর ভবিষ্যতের ছায়াও ধরতে পারি। তার ভেতর কোনই অলৌকিকতা নেই—বিজ্ঞানের হিসাবেই তা সম্ভব।

(২)

ডান সাহেবের কথা সংক্ষেপ করে বললে এই দাঁড়ায় যে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের চিত্ত এত বিক্ষিপ্ত ও বাহ্যজগতের সঙ্গে ব্যবহারে এত

জড়িত হয়ে পড়ে যে তখন আমরা ভবিষ্যতের ছায়া কিছুই ধরতে পারি না। স্বপ্নে যখন বাহ্যজগতের সঙ্গে চিত্তের ব্যবহার থাকে না, তখন ভবিষ্যতের ছায়া কখনো কখনো সেখানে ভেসে আসে। জাগ্রত অবস্থাতেও চিত্তের একাগ্রতা আন্‌তে পারলে ভবিষ্যতের ছায়া ধরতে পারা যায়। কালপ্রবাহের গতিতে সত্যই অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কোন ব্যাপার নেই—জাগ্রত অবস্থায় বা চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থাতেই বর্ত্তমানের ধারণা জন্মে, আর সেটা না থাক্‌লে শুধু থাকে কালপ্রবাহের গতির একটা মাত্র ধারা। ডান সাহেবের এই মতগুলিকে যখন বিজ্ঞানের জগৎ মেনে নিয়েছে তখন আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যেসব অনুরূপ মত আছে সেগুলিও প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে নিদ্রার দুটী অবস্থাভেদ আছে—একটী স্বপ্ন, অন্যটী সুষুপ্তি। স্বপ্নের শব্দগত অর্থ হচ্ছে নিদ্রা, যোগরূঢ় অর্থ নিদ্রিতের 'বিজ্ঞান' বা 'দর্শন' (প্রসুপ্তস্য বিজ্ঞানম্)। এ অবস্থায় নিদ্রিতের নিদ্রা গাঢ় নয়, মন সক্রিয় থাকে ও মনের নানারূপ সৃষ্টি ও কল্পনা চলে। আর সুষুপ্তি হচ্ছে গাঢ় নিদ্রার অবস্থা, তখন মনের কোন কামনাই থাকে না—কোন স্বপ্নদর্শনও হয় না। তাই মাণ্ডুক্য-উপনিষদে সুষুপ্তিকে বলা হয়েছে—"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্।" স্বপ্নে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি বর্ত্তমান থাকে—বাসনা সূক্ষ্মাকারে প্রবল থাকে, তাই জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যে সব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে স্বপ্নেও সেই সমস্ত ব্যাপারই তার সম্ভব হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিসমূহের ক্ষণিক লয় প্রাপ্তি হয়, সেই জন্যই মনের সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধ হয়। থাকে শুধু অবিক্ষিপ্ত চৈতন্য—সে অবস্থা যোগের সমাধির অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদে আত্মা বা ব্রহ্মকে 'চতুষ্পাদ' বলা হয়েছে—আত্মার সেই চারটী পাদ বা স্থান হচ্ছে—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তস্থান, ও "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। বস্তুতঃ এই চারটি, আত্মার বিভিন্ন অবস্থা ব্যতীত আর কিছু নয়। জাগরিত স্থান—"বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ"। এ অবস্থায় আত্মা 'বহিঃপ্রজ্ঞ' অর্থাৎ আত্মার তখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ ও সেই জগতের বিষয়সমূহে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। আত্মা তখন 'সপ্তাঙ্গ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নানাভাবে বিষয় গ্রহণ করবার শক্তি তার প্রবল। আত্মা তখন 'একোন-বিংশতিমুখ'—অর্থাৎ তখন 'পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও চতুরন্তঃকরণ' সক্রিয়। এ অবস্থায় আত্মা স্থূল জগতের বিষয়সমূহ উপভোগ করে—আর তার বিশ্বব্যাপী ব্যবহার চলে।

আত্মাব যখন এই বহির্মুখিতা বন্ধ হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি যখন ভেতবে প্রবিষ্ট হয় তখনই স্বপ্নাবস্থাব আবম্ভ। তাই বলা হয়েছে—"স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ।" এ অবস্থায় আত্মাব ক্রিয়া স্বপ্নদর্শন, জ্ঞান অন্তর্মুখী। আত্মা তখন সূক্ষ্ম বাসনাসমূহই ভোগ করে—স্থূলজগতেব সঙ্গে তাব কোন সম্বন্ধ থাকে না—মনেব বিভূতিসমূহেবই অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। আত্মা তখন তৈজস বা তেজোময। স্বপ্নেব এই অর্থ ছান্দোগ্য-উপনিষদেও নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। 'যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা তদা সম্পন্নো ভবতি। স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনম্ স্বপিতীতি আচক্ষতে। স্বম্ হ্যপীতো ভবতি'—অর্থাৎ যখন কোন লোকেব নিদ্রা যাওযাব কথা বলি তখন বুঝতে হবে যে সে তাব সৎ বা পবমাত্মাব সহিত মিলিত হযেছে। সে তখন নিজেব ভেতব প্রবিষ্ট হয়েছে (স্বম্-হ্যপীতো ভবতি) ও সেই অর্থেই 'স্বপিতি' কথা ব্যবহাব কবা হয়। বাসনাগুলি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলেই মন সেগুলিকে অবলম্বন কবে লৌকিক জগতেব বিষয়েব অনুরূপ বিষয়সমূহ সৃষ্টি কবে। তাই স্বপ্ন নানাপ্রকাব বিৎশক্তিময়—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ভাবেব লীলাও চলে।

সুষুপ্তিব অবস্থায় এ সমস্ত লীলাব অবসান হয। তাই সুষুপ্তিকে বলা হয়েছে "একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দমযো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ"। সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রাব অবস্থায় আত্মা 'একীভাব'প্রাপ্ত হয় তখন নানা বিষযে আত্মা বিক্ষিপ্ত নয়। বাসনাসমূহ সামযিকভাবে বিনষ্ট নয়। তাব বাসনা বিনষ্ট হলেই বহুব বা দ্বৈতেব জ্ঞানও থাকে না—তখন প্রজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি একীভূত ও ঘনীভূত হযে ওঠে। আত্মা সে অবস্থায় আনন্দময ও আনন্দভোজী অর্থাৎ আনন্দ অবলম্বন কবেই আত্মাব তখন স্থিতি হয়। আত্মা তখন চেতোমুখ—সমস্ত চেতনা তখন কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। আত্মাব তখন আনন্দময় ও আনন্দভোজী হবাব কাবণ এই তখন বিষযবিষয়ী আকাবে ও গ্রাহ্যগ্রাহকভাবে কোন মানস ব্যাপাব ও আয়াস থাকে না, কোন প্রকাব ক্লেশও থাকে না—শুধু থাকে আনন্দ। আত্মা তখন চিন্ময় বলেই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষযে বিজ্ঞানেব কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী অর্থাৎ অন্তবে থেকেই সমস্ত শক্তিকে নিয়মত কবে, এবং সেইজন্য আত্মা, এই অবস্থায় সমস্ত ভাবেব উৎপত্তি ও বিলয়স্থান ; আত্মা সমস্ত জগতেব কাবণ। সেইজন্যই সুষুপ্তিব নামান্তব—কাবণ শবীব।

কিন্তু আত্মাব এ অবস্থাও শেষ অবস্থা নয়। কাবণ সুষুপ্তিব অবস্থা সাময়িক, নিদ্রাব ঘনত্বেব অবসান হলেই সুষুপ্তি অবস্থাব সমাপ্তি হয়, সে অবস্থা নিববচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ সে অবস্থা আনন্দময় ও চিন্ময় বটে কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী হলেই আত্মার শেষ অবস্থা লাভ

হয়। আত্মাব সে শেষাবস্থা হচ্ছে চতুর্থপাদ বা তুবীয় স্থান, যাকে বলা হয়েছে "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। মাণ্ডুক্যে এই তুবীয় অবস্থার যে বর্ণনা বয়েছে সেটা হচ্ছে—

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং। অদৃশ্যম্-অব্যবহার্য্যম্-অগ্রাহ্যম্-অলক্ষণম্-অচিন্ত্যম-অব্যপদেশ্যম্-একাত্মপ্রত্যয়সাবং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

[তুবীয়পাদ অন্তঃপ্রজ্ঞও নয় বহিঃপ্রজ্ঞও নয়, কিম্বা উভয়েব মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্নও নয়, ঘনীভূত প্রজ্ঞাও নয়, জ্ঞাতাও নয় অচেতনও নয়। এই চতুর্থপাদ অদৃশ্য নয়, এব সঙ্গে কোন ব্যবহাব চলে না, সে অবস্থা ইন্দ্রিয়েব বিষযীভূত নয়, চিন্তাব অতীত, ও শব্দ দ্বাবা নির্দ্দেশনীয় নয়। তার কোন লক্ষণ নেই—স্বকীয় অনুভূতিব ব্যাপাব। এ অবস্থা নানা প্রপঞ্চেব নিবৃত্তিস্থান, শান্ত বা নির্ব্বিকাব, মঙ্গলময় ও অদ্বৈত। এই আত্মাব প্রকৃত অবস্থা—একমাত্র জ্ঞাতব্য সত্য]।

এখানে আমাদেব 'তুবীয়' অবস্থা আলোচনাব কোন আবশ্যকতা নেই—শুধু সুষুপ্তিব সঙ্গে প্রভেদ দেখাবাব জন্যই তাব উল্লেখ। সুষুপ্তি তুবীয় অবস্থাব অনুরূপ হলেও প্রাবব্ধ কর্ম্মসূত্র থাকে বলেই সুষুপ্তিব পর পুনবায স্বপ্ন ও জাগবণ আসে। কর্ম্মবীজ. নষ্ট হলেই সুষুপ্তি ও তুবীয়েব অবস্থায় কোন প্রভেদ থাকতো না। তাই বলা হযেছে—

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি
পুনশ্চ জন্মান্তব-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥

[সুষুপ্তি সময়ে যখন দেহেন্দ্রিযাদি সমস্তই স্বকাবণে বিলীন হয় তখন জীব তমোগুণে আবৃত হয়ে আনন্দময় রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জন্মান্তবার্জ্জিত প্রাবব্ধ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকায সৎরূপ লাভ কবেও সেই জীব আবাব স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।]

সুষুপ্তিব অবস্থায় প্রাণবাযু কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাও নানা উপনিষদে বিশদ কবে বলা হয়েছে। জাগবণ ও স্বপ্নেব অবস্থায প্রাণবাযু আমাদেব দেহেব নানা নাড়ী বেয়ে ইতস্ততঃ বিচবণ কবতে থাকে। কিন্তু স্বপ্নহীন নিদ্রাব অবস্থায় প্রাণবাযু হৃদয় থেকে শিবোদেশ পর্য্যন্ত যে সব নাড়ী বিস্তৃত বয়েছে সেই সব নাড়ীতে প্রবেশ কবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এব স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নম্ ন বিজানাত্যাসু তদা নাডীষু সৃপ্তো ভবতি তম্ ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্ন ভবতি।

[সুপ্তাবস্থায় যখন সমস্ত শান্ত হয় ও কোন স্বপ্নদর্শন ঘটে না তখন প্রাণবায়ু নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে—তখন কোন পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না—আত্মা তেজসম্পন্ন হয়।]

এই নাড়ীকে হৃদয়ের নাড়ী (হৃদয়স্য নাড্যঃ) বলা হয়েছে। নাড়ী বহুসংখ্যক তন্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রধান—সেটী হৃদয় থেকে শিরোদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত। প্রাণ সেই নাড়ীগত হলেই মানুষ অমৃতত্ব বা অমরত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু অন্যান্য নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট হলে ইতস্ততঃ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়।*

এই কথাই আরও স্পষ্ট করে অন্যত্র বলা হয়েছে—যখন মানুষ সুপ্ত হয় ও যখন কোন স্বপ্ন দেখে না তখন প্রাণবায়ু একীভূত হয়। তখন বাক্ নামসমূহের সঙ্গে, চক্ষু সমস্ত রূপের সঙ্গে, শোত্র শব্দসমূহের সঙ্গে ও মন সমস্ত চিন্তার সঙ্গে সেই একীভূত প্রাণবায়ুতে বিলীন হয়। আর জাগরণের অবস্থায়, জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় তেমনি প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয়সমূহে প্রত্যাগত হয় ও নানা বাহ্য লোকের সঙ্গে তার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।*

পূর্ব্বেই বলেছি যে সুষুপ্তির যোগের সমাধির অবস্থার অনুরূপ। সুষুপ্তিতে একাগ্রচিত্ততা সাধারণভাবে আসে, কিন্তু সে অবস্থা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না বলেই বোধহয় প্রাচীন ঋষিরা যোগাবলম্বনে বহুক্ষণস্থায়ী একাগ্রচিত্ততা আনবার উপায় উদ্ভাবন করেন। যোগাবলম্বনে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হলে যোগীর চিত্তে সম্পূর্ণ স্থিরতা আসে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অভ্যন্তরে লয় প্রাপ্ত হয়, বাক্ দর্শন, ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে দৃশ্যমান জগতের কোন যোগাযোগ থাকে না—মনে কোন বিকল্পাত্মক জ্ঞান থাকে না—সমস্ত চিৎশক্তির একত্র সমাবেশে তখন চিত্ত তেজোময় হয়, বাহ্য জগতের সঙ্গে ব্যবহার না থাকায় চিত্ত তখন আনন্দময় হয়। এ অবস্থায় কালজ্ঞান থাকে না—অতীত ও ভবিষ্যৎ তখন সমভাবে চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকাতেই আমাদের কালজ্ঞানের উৎপত্তি। সুতরাং সেই জগতের সঙ্গে যখন কোন ব্যবহার

---

* শতম্ চৈকা হৃদযস্য নাড্যঃ —
তাসাম্ মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি। (ছান্দোগ্য)।

* যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তথৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শোত্রং সর্ব্বৈ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতো সর্ব্বাদিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথাযতনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। (কৌষিতকী উপনিষদ্)।

আর থাকে না তখন কালপ্রবাহ সম্বন্ধে আমাদেব আব কোন ধাবণাই থাকে না। এই কথা সিদ্ধপুরুষেবা সাঙ্কেতিক ভাষায় নানা প্রকারে ব্যক্ত কবেছেন—

জহি মণ পবণ ণ সঞ্চরই ববি সসি ণাহ পবেস
তহি বঢ় চিত্ত বিসাম কৰু সরহেঁ কহিঅ উএস ॥

[সবহ উপদেশ কবছেন—সেই সমাধিতে চিত্তেব বিশ্রাম সাধন কর যেখানে ববি শশী প্রবেশ কবে না, যেখানে মনপবন সঞ্চবণ কবে না।]

ববি শশী হচ্ছে দিবাবাত্রিরূপ কাল প্রবাহেব প্রতীক। সমাধির অবস্থায় কালপ্রবাহের জ্ঞান থাকে না, সেইজন্য বলা হয়েছে যে সেখানে রবি শশীব প্রবেশ নাই; প্রাণবায়ুব চলাচল বন্ধ হয় বলেই মন স্থিবীকৃত হয়—তখন আব সে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কবে না।

এই হিসাবেই বোধহয় আমাদের যোগ ও দর্শনশাস্ত্রে ধবা হয়েছে যে যোগীগণ ত্রিকালদর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁদেব নখদর্পণে। সমাধির অবস্থায়, তাঁদেব কালপ্রবাহেব গতিসম্বন্ধে জ্ঞানেব ভূতভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান হিসাবে পৃথক সমাবেশ না হয়ে একত্র সমাবেশ হতো—সুতবাং লৌকিক হিসাবে যা অতীত ও ভবিষ্যৎ, তা তাঁদেব নিকট সমাধির অবস্থায় স্পষ্ট প্রতিভাত হতো—এ বিশ্বাস শাস্ত্রকাবদেব ছিল। সুষুপ্তিব অবস্থাতেও তা কিয়ৎপবিমাণে ঘটা সম্ভবপব কাবণ সুষুপ্তি ও সমাধিতে চিত্তেব অবস্থা শাস্ত্রকাবদেব হিসাবে অনুরূপ। আমবা পূর্ব্বেই দেখেছি যে হিন্দুদর্শনানুসাবে স্বপ্নের অবস্থা সুষুপ্তিব নিম্নস্তবেব কিন্তু স্বপ্নাবস্থা থেকেই চিত্ত সুষুপ্তিতে প্রবেশ করতে পাবে। তাই স্বপ্নাবস্থাব সহসা লয় হয়েই সুষুপ্তি আসে না—সে লয় ক্রমশঃ সাধিত হয়, সুতবাং স্বপ্ন যখন সুষুপ্তিব কিনাবায় এসে পৌছায় তখন সুষুপ্তির অবস্থায় যে সমস্ত অনুভূতি হয় সেই সমস্ত অনুভূতিই যে কিয়ৎপবিমাণে চিত্তে প্রতিফলিত হবে না তা কে বল্‌তে পাবে ?

তাই একথা আমবা নির্ভয়েই বল্‌তে পারি যে কালপ্রবাহেব গতি ও স্বপ্ন সম্বন্ধে ডান সাহেব বিজ্ঞানসম্মত-প্রথানুসাবে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কবেছেন তাব পবিচয় আমাদেব দর্শনশাস্ত্র থেকে পূর্ব্বেই পেয়েছি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জগৎ থেকে আস্‌ছে বলেই যা নূতন ঠেকেছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

মাঞ্চুকুয়ো

১

মাঞ্চুরিয়ার সমস্যা আজ দু'বছর ধরে সমস্ত জগৎকে চিন্তিত করে তুলেছে। এই প্রদেশের আধিপত্য নিয়ে চীন ও জাপানের সঙ্ঘর্ষ আজকের দিনের নৈরাশ্য বৃদ্ধি করছে দু'টি কারণে। এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সখ্য ও এশিয়ার ঐক্য বর্ত্তমান যুগে যে স্বপ্নমাত্র, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অন্যদিকে জগদ্ব্যাপী মহাসংগ্রামের পর যুদ্ধনিরোধের যে বিপুল উদ্যম ও নবযুগ প্রবর্ত্তনার যে বিশাল আশা থেকে জেনীভার জাতিসঙ্ঘ জন্ম নিয়েছিল তার নিষ্ফল পরিণতি এই ব্যাপারে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

চীন ও জাপানের সঙ্ঘাত অবশ্য নূতন নয়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের পর থেকে এই ষাট বছর বারম্বার তার পরিচয় পাওয়া গেছে। ইউরোপের সংস্পর্শের ফল দুই দেশে ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বিদেশীর কার্য্যকলাপে চীনবাসীদের মনে বহুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিদেশের প্রতি অবজ্ঞার ভাব অবিচলিত থেকে গেল। সেইজন্য বিংশ শতাব্দীর আগে ইউরোপের কাছে শাসনপদ্ধতি, সমরকৌশল ও নানা বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা চীনে প্রবল হয়নি। পক্ষান্তরে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর থেকেই জাপানীদের সাধনা হলো এই যে ইউরোপের অস্ত্র-শস্ত্র, রণচাতুর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতা আয়ত্ত করে এমন শক্তিপ্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে জাপান পৃথিবীর প্রধান জাতিগুলির সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারে। অতি অল্পদিনের মধ্যে আশাতীত সাফল্য লাভ করে জাপান যখন প্রাচ্যে তার আধিপত্যের সূচনা করলে তখনও চীনের উদাসীন অলস তন্দ্রাজড়িত ভাব কেটে যাবার লক্ষণ দেখা যায়নি।

চীনের বিরুদ্ধে জাপানের নবার্জ্জিত শক্তির প্রয়োগ প্রতীচ্যেরই পদানুসরণের চিহ্ন। জাপানী সৈন্য ১৮৭৪ সালে সামান্য কারণে ফর্মোজা আক্রমণ ও পর বৎসর লুচু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া জাপানের প্ররোচনায় চীনের বশ্যতা অস্বীকার করলে পরে, ১৮৯৪ সালে চীনের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কোরিয়াতে জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় ঠিক এই সময়ে জাপানের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সম্মিলিত প্রভাবে ব্যর্থ হলেও রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর (১৯০৫) এ অঞ্চলেও জাপানের গতিরোধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনে বাণিজ্য ও বসবাস

সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ অধিকাব অর্জ্জন কবেছিল তার প্রত্যেকটিতে জাপানেবও অংশ থেকে গেল। ১৯১৪ সালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বেল্‌জিয়মেব নিবপেক্ষতা অগ্রাহ্য হওয়াব প্রতিবাদে সমস্ত জগৎ যখন প্রতিবাদ-মুখরিত, ঠিক সেই সময় চীনেব আপত্তি সত্ত্বেও জাপান চীনেব ভিতর দিয়ে সৈন্য চালনা কবে জার্ম্মানদেব হাত থেকে শান্‌-টুং প্রদেশ অধিকাব কবে। অন্য সকল দেশ যখন যুদ্ধে ব্যস্ত সেই অবসবে (১৯১৫) জাপান দুর্ব্বল চীনের কাছে একুশটি দাবী জানায়—তাব মধ্যে যেগুলি চীনকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ কবতে হয়েছিল তার ফলে মাঞ্চুবিযায় জাপানেব অধিকাব বিশেষ কবে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। ১৯২২ সালে এমেবিকাব অনুবোধে শান্‌-টুং প্রদেশ চীনকে প্রত্যর্পণ কবা হয় বটে, কিন্তু ওয়াশিংটন্ চুক্তিব ফলে চীন-অঞ্চলে জাপানেব শক্তি অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত থেকে গেল বলা যেতে পাবে। পাঁচ ছ' বছব আগে জাপান শান্‌-টুং প্রদেশে শান্তি বক্ষাব জন্য দু'বাব সৈন্য প্রেবণ কবেছিল এ কথাও মনে রাখা ভাল। অর্দ্ধশতাব্দীব ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে চীনেব সীমাব মধ্যে জাপানী সেনাব আবির্ভাব এবং চীনেব আভ্যন্তবিক ব্যাপাবে জাপানেব হস্তক্ষেপ একেবাবেই বিবল নয়।

এই সঙ্ঘর্ষে এখন পর্য্যন্ত বাববাব চীনেবই পবাজয় হয়ে এসেছে। জাপানেব শাসকেবা সুদক্ষ, যুদ্ধেব সবঞ্জাম ও ব্যবস্থা জাপানে সুনিয়ন্ত্রিত, শিক্ষিত যোদ্ধা হিসাবেও জাপানীদেব সহিত চীনবাসীদেব তুলনা হয় না। ভৌগোলিক সংস্থাপনেব গুণে জাপানেব পক্ষে চীন আক্রমণ সহজ এবং জাপানী নৌবাহিনীব সামনে চীনেব উপকূলস্থ জনপদগুলি অসহায়। বহুদিন পর্য্যন্ত চীনেব উপব জাপানেব প্রভুত্বস্থাপনেব পথে দু'টি মাত্র বাধা ছিল—পূর্ব্বদেশে বাশিয়া, এমেবিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতিব স্বার্থ এবং চীনেব বিবাট বিস্তাব। কিন্তু ১৯১৯ সালেব পব থেকে চীনেব পুনর্জন্মেব প্রতীকস্বরূপ জাতীয় মনোভাবেব দ্রুত প্রসাব তৃতীয় একটি বাধাব সৃষ্টি কবেছে একথা বলতেই হবে।

২

চীন-অঞ্চলে জাপানীদেব উদ্দেশ্য ঠিক সাম্রাজ্য-বিস্তাব বলা চলে না —উপকূলস্থিত দ্বীপগুলি ব্যতীত শুধু কোবিযা ও মাঞ্চুবিয়াব দক্ষিণপ্রান্তস্থ লিয়া-টুং উপদ্বীপ মাত্র জাপানবাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত। ইউবোপীয়দেব অনুকবণে প্রাচ্যে আপন ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠাব ইচ্ছা চীনেব সম্বন্ধে জাপানেব প্রতিকূলতাব অন্যতম কাবণ। বর্ত্তমান জগতেব প্রধান বাষ্ট্রসমূহেব মধ্যে আজ জাপানেব যে পদমর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে চীনে প্রভুত্বস্থাপনেব উপব তা অনেকাংশে নির্ভর কবে। কিন্তু চীনের সঙ্গে জাপানেব

ব্যবহাবেব মূলে বয়েছে জাপানেব আর্থিক অবস্থা নিবাপদ ও উন্নত কববাব প্রচেষ্টা।

জাপানেব লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে. অথচ ক্ষুদ্রাযতন দেশটির এমন সামর্থ্য নেই যে স্বকীয় সম্পদে দেশবাসী সকলেব আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেব ব্যবস্থা কবতে পাবে। মুসোলিনীব ভাষায় জাপানকে বর্ত্তমান জগতেব proletarian nation-দেব অন্যতম বলে অভিহিত কবা যায়। এ অবস্থায় জাপানীদেব মতে দু'টি মাত্র উপায় অবলম্বন সম্ভবপব—কেননা আধুনিক ইটালীয়দেব মতন জাপানীদেবও বিশ্বাস যে জনসংখ্যানিবোধেব চেষ্টা জাতিব পক্ষে অকল্যাণকব ও দেশেব পতনেব সূত্রপাত। প্রথম উপায় দলে দলে বিদেশে বসতি স্থাপন। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, এমেবিকা প্রভৃতিতে জাপানীদেব অবাধ প্রবেশেব দ্বাব রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া বিদেশে বসবাসেব ফলে স্বদেশের লোক ও শক্তি ক্ষয় অনিবার্য্য,—পববাষ্ট্রে বাস কবে স্বদেশেব সঙ্গে যোগ বক্ষাও প্রায় অসম্ভব। তাই জাপানীরা তাদেব ব্যবসাবাণিজ্যকে এমনভাবে উন্নত কবতে চায় যাতে করে বর্দ্ধিষ্ণু লোকসমষ্টিব আর্থিক কল্যাণ আপনা হতেই সম্পন্ন হবে।

বাণিজ্যেব শ্রীবৃদ্ধিব জন্য কতকগুলি অঞ্চলে প্রতিপত্তি ও একাধিপত্য প্রয়োজন এ বিশ্বাস সকলেবই মনে বদ্ধমূল। নানা দেশেব সঙ্গে জাপানের ব্যবসা আছে বটে কিন্তু একমাত্র চীনেই তার প্রভুত্বস্থাপন সম্ভবপব। দেশবাসীদের আর্থিক উন্নতিসাধনেব সঙ্কল্প ও চীনেব বাহিবে অন্যত্র সে উদ্দেশ্যসিদ্ধিব পথে বিস্তর বাধা—চীনে জাপান কর্ত্তৃক কর্ত্তৃত্ব স্থাপনেব সবিশেষ চেষ্টাব মূল কাবণ এই দু'টি।

চীনের মধ্যে আবাব উত্তর সীমান্তে মাঞ্চুবিযা নামে পবিচিত তিনটি প্রদেশেব মূল্য জাপানের নিকট অত্যন্ত অধিক। মাঞ্চুরিয়া, জাপান ও কোবিয়াব প্রতিবেশী, মাঞ্চুবিয়াব ধনসম্পদ সুপ্রচুর, ভবিষ্যতে তাব উন্নতির সম্ভাবনাও অসীম। ঊনবিংশ শতকেব শেষে বিদেশী শক্তিবৃন্দের মনে যখন চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ কবে নেওয়ার সঙ্কল্প উদিত হয় তখন থেকেই জাপানেব দৃষ্টি মাঞ্চুবিয়ার উপব ন্যস্ত। ১৯০৫ ও ১৯১৫ সালেব সন্ধিগুলির ফলে মাঞ্চুবিয়াব দক্ষিণ অংশে জাপানেব কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়াও অন্য তিনটি কাবণে জাপানীদেব কাছে এই প্রভুত্ব ন্যায়সঙ্গত মনে হয়। জাপান সবে দাঁড়ালে চীন রাশিয়ার হাত থেকে মাঞ্চুবিয়া বক্ষা কবতে পাববে না। তাই রাশিয়ানদেব বিতাড়িত করতে সহস্র সহস্র জাপানী মাঞ্চুবিয়ায় দেহবক্ষা কবেছে। দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্যুদ্ধেব প্রকোপে চীন যখন বিধ্বস্তপ্রায় তখন জাপানেব ইঙ্গিতেই মাঞ্চুবিয়ায় শান্তিভঙ্গ করতে কেউ সাহস পায়নি। গত পঁচিশ বছরে মাঞ্চুরিয়াব

অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধির মূলে রয়েছে জাপানের অর্থ, পরিশ্রম ও নেতৃত্ব,—জাপানীদের এ বিশ্বাসও দৃঢ়মূল।

মাঞ্চুরিয়া জাপানের উপনিবেশ একথা অবশ্য সত্য নয়—সে দেশে জাপানী অধিবাসীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি জাপানের শস্যভাণ্ডার হয়ে উঠছে। এই প্রদেশের তুলা, লোহা, কয়লা ও কাঠ জাপানের বহু ফ্যাক্টরীকে আজ কর্ম্মরত রেখেছে। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী পণ্যদ্রব্য বহুলপরিমাণে বিক্রয় হয়। জাপানী ধনিকেরা মাঞ্চুরিয়ার সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টায় অর্থনিয়োগ করে প্রভূত লাভ করছে। এই অঞ্চলে আর্থিক কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত রয়েছে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর হাতে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে এই কোম্পানী জাপানের তত্ত্বাবধানে আসে। সেই অবধি এর অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি বিস্ময়জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রেললাইনের দুই পাশের ভূমিখণ্ড জাপানের সম্পত্তি—লাইন রক্ষার জন্য কোম্পানীকে সৈন্য রাখার ক্ষমতা চীন বাধ্য হয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই কোম্পানীর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি—ফ্যাক্টরী, খনি, জাহাজের ডক্, ট্যুরিষ্ট্‌দের জন্যে হোটেল, কর্ম্মচারিদের জন্য স্কুল ইত্যাদি; কোন কিছুরই অভাব নেই। জাপানীদের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ এই বিশাল বিদেশী শক্তি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার সকল ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করছে।

অথচ এতদিন পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়া চীনেরই অংশ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। সম্রাটদের পতনের পর নূতন রিপাব্লিক্‌কে প্রদেশ-তিনটির শাসক বলে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। যে সন্ধি কয়েকটির উপর মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত সে সবগুলি চীনেরই সঙ্গে সন্ধি। চীনদেশে ঘোর অরাজকতার দিনেও মাঞ্চুরিয়ার স্বাতন্ত্র্য দাবী করা হয়নি, মনে রাখা আবশ্যক। মাঞ্চুরিয়ায় চীনের অধিকার যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এ বিষয়ে চীনবাসীদের মনে অন্ততঃ বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তারা কখনও ভোলে না যে মাঞ্চুরিয়ার আধুনিক উন্নতির হেতু শুধু জাপানের অর্থ ও নেতৃত্ব নয়—গত কয়েক বৎসরে যে লক্ষ লক্ষ চীনবাসী মাঞ্চুরিয়ায় বসতি করেছে তাদের শারীরিক শ্রম ও কর্ম্মকুশলতা ভিন্ন এ উন্নতি অসম্ভব হতো। দুর্ব্বল চীনের কাছ থেকে জাপান যে অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেগুলি অন্যায়, চীনের সকলেরই এই এক মত। সে অধিকার ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নূতন জাতীয়দলের এই বিশ্বাস জাপানের পক্ষে সন্দেহ ও ত্রাসের কারণ।

প্রতিবেশী জাতি দুইটির স্বার্থবুদ্ধিতে এবং ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার সঙ্ঘাতে মাঞ্চুরিয়ার জটিল সমস্যা গঠিত।

৩

দু'বছর আগে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হয়। জাপানী-পরিচালিত রেল-লাইনগুলির প্রতি-যোগিতা করে চীন নূতন লাইন নির্ম্মাণ করাতে এ গোলযোগের সূত্রপাত। জাপানের মতে পূর্ব্বতন সন্ধিগুলির গুপ্তসর্ত্ত অনুসারে চীনের এ স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছে, চীন বলে এ সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকার কোন কালে দেওয়া হয়নি। এই মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেলে অন্য কারণে—এই সময় মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কোরীয় প্রজা ও চীনা অধিবাসীদের মধ্যে সহসা একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় এবং মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে নাকামুরা নামে এক জাপানী সেনাধ্যক্ষ নিহত হন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে দস্যুরা জাপানী রেল-লাইন আক্রমণ করামাত্র জাপানী সৈন্যেরা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার প্রধান নগরগুলি অধিকার করে। যেরূপ ক্ষিপ্রভাবে এ কাজ সম্পন্ন হয় তার থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে সমস্ত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া অধিকার জাপানীরা পূর্ব্ব থেকে স্থির করে রেখেছিল। জাপানে সৈন্য-বিভাগ মন্ত্রীসভার অধীন নয়—সুতরাং মাঞ্চুরিয়া অধিকার হয়ত সেনাপতি-দের সঙ্কল্পমাত্র ছিল; কিন্তু তাঁদের কাজ জাপানী জনসাধারণের যে সানন্দ সমর্থন পেলে তার ফলে মন্ত্রীদেরও অন্য পন্থা অবলম্বনের কোন উপায় রইল না। এদিকে চীনের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত জাপানের আচরণের তীব্র প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ জাপানী পণ্যবর্জ্জনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হলো, কেননা বয়কট্ ব্যাপারে বহুদিনের শিক্ষানবিশীর ফলে চীনেরা সিদ্ধহস্ত। অল্পদিনের মধ্যে এইরূপে চীনের প্রধান বন্দর শাঙ্ঘাই-নগরীতে জাপানী-বাণিজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। বর্জ্জন-আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য ও জাপানী প্রজার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ-স্বরূপ তখন জাপান শাঙ্ঘাই আক্রমণ করে। কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় এবং ইংল্যাণ্ড ও এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে শাঙ্ঘাই-অঞ্চল থেকে জাপানী সৈন্য অপসৃত হলো। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের মুষ্টি শিথিল হবার কোন লক্ষণ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনার জন্য জাপানেরই অনুরোধে জাতিসঙ্ঘ লীটন্ সমিতির নিয়োগ করেন। এই সমিতির সিদ্ধান্ত জাপানের অনুকূল হবে না এ আশঙ্কায় কিছুদিন হলো জাপান মাঞ্চুরিয়াকে এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেছে। জাপানের ছায়াশ্রিত, পৃথিবীর এই নবীনতম রাষ্ট্রটির নাম হয়েছে মাঞ্চুকুয়ো। চীনের অন্তর্গত প্রদেশে যে ক্ষমতা ব্যবহার করা চলে না, তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যে অবশ্য তার পথে কোন বাধা থাকবে না—এই প্রত্যাশাই মাঞ্চুকুয়ো-সৃষ্টির ভিত্তি।

লীটন্ সমিতিব সিদ্ধান্ত এখন জাপান নির্ব্বিবাদে পদদলিত কবছে। মাঞ্চুকুয়োকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবাব উদ্দেশ্যে দলে দলে জাপানী সৈন্য ও কর্ম্মচাবী সে দেশে প্রেবিত হচ্ছে, চীন যাতে তাব নষ্ট অধিকাব পুনরুদ্ধাব না করতে পাবে সেজন্য সীমান্তে অভিযানেব ব্যবস্থা হয়েছে। মাঞ্চুবিয়ায় স্বাধিকাব পুনঃপ্রতিষ্ঠাব চেষ্টা চীনেব পক্ষে স্বাভাবিক একথা বোধহয় কেউ অস্বীকাব কববে না। সম্প্রতি জেহোল প্রদেশে যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গেল তাব কাবণ চীনেব এই চেষ্টা ও জাপানেব তাতে বাধাদান। এখন পর্য্যন্ত এই ঘাত-প্রতিঘাতে জাপানই বিজয়ী হয়েছে এ কথা বলা বাহুল্য।

৪

বিগত মহাযুদ্ধেব পব জেনীভায় যখন জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধবিগ্রহ থামানোই তাব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা তখন বিধিবদ্ধ হয় যে জাতিসঙ্ঘেব সভ্যেবা নিজেদেব মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবাব আগে বিবাদেব অবসানেব জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। জাতিসঙ্ঘেব কোন সভ্যেব, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘর্ষ নিবারণেব তিনটি পন্থাব মধ্যে অন্ততঃ একটি অনুসবণ কবাব দায়িত্ব এড়াবাব ন্যায্যতঃ কোন অধিকাব নেই। তৃতীয় কোন দেশেব মধ্যস্থতা, হেগ্ নগবীব বিচাবালযেব শবণাপন্ন হওয়া কিম্বা জাতিসঙ্ঘেব কাউন্সিল্ বা সংসদেব উপব বিবাদ-নিষ্পত্তিব ভাব অর্পণ—এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি শান্তিবক্ষাব জন্য নির্দ্ধাবিত হযেছিল। মাঞ্চুবিয়ায সংঘর্ষ হওযা মাত্র চীন তৃতীয় প্রণালীব অনুসবণ কবে, কিন্তু জাপান প্রথম থেকে জাতিসঙ্ঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য কবাব ফলে আজ সর্ব্বত্র লীগ্ অব্ নেশন্সেব প্রতিপত্তিহ্রাস ও সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হযেছে।

গত দুই বৎসব জাপান জাতিসঙ্ঘকে পদে পদে অপমান কবছে অস্বীকাব কবা চলে না। ১৯৩১ সালেব ৩০শে সেপ্টেম্বব লীগেব সংসদ স্থিব কবলেন যে মাঞ্চুবিয়ায় দস্যুব প্রকোপ কমামাত্র জাপানেব সৈন্য অপসৃত কবতে হবে। জাপান এ প্রস্তাবে সম্মত হবাব পব দেড বছব কেটে গেছে। ইতিমধ্যে মাঞ্চুবিয়ায জাপানী সেনাবল বর্দ্ধিতই হযেছে। এতদিনেও দস্যুদমন না হযে থাকলে জাপানেব পক্ষে কথাটা গৌববজনক নয। কোন নির্দ্দিষ্ট তাবিখেব মধ্যে সৈন্য অপসাবণেব প্রস্তাবে জাপান অবশ্য কিছুতেই সম্মতি দেযনি যদিও লীগ্ কাউন্সিলেব অপব সকল সভ্যেবই মতে ১৯৩১ সালেব ১৬ই নভেম্বব জাপানেব মাঞ্চুবিযা শাসনেব শেষ দিন ব'লে সাব্যস্ত কবা সমীচীন বোধ হযেছিল। লীটন্ সমিতিব নির্দ্ধাবণ অনুসাবে (১৯৩২) মাঞ্চুবিযা চীনেব অন্তর্গত থাকাই ন্যায়সঙ্গত; তবে জাপানেব স্বার্থবক্ষাব

জন্য উভয়পক্ষেব সম্মতি অনুসাবে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থাব উদ্ভাবন প্রযোজনীয়। চীন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবতে প্রস্তুত, এব বেশী কোন দাবী জাপানেব পক্ষেও শোভন নয়। কিন্তু জাপান এখন মাঞ্চুকুযোকে স্বাধীন বাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ও তাব সীমাবিস্তাবেব চেষ্টায ব্যস্ত। লীটন্ বিপোর্ট সেজন্য সম্পূর্ণ অবহেলিত হযেছে। এব পব জাতিসঙ্ঘ আব কিছু কববেন কিনা সন্দেহ কিন্তু সহজেই বোঝা যায যে এ অপমান কাটিযে ওঠা দুঃসাধ্য।

লীগ্ অব্ নেশন্সেব দুর্ব্বলতাব কাবণ সুস্পষ্ট। সঙ্ঘেব বিধানে পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ সর্ব্বক্ষেত্রে নিযমবিগর্হিত কবা হয়নি, যুদ্ধঘোষণা না ক'বে অপব দেশ আক্রমণ কবাব যে প্রথা জাপান অনুসবণ কবছে সে সম্বন্ধেও লীগেব নিয়মাবলীতে পবিষ্কাব কোন নিষেধ নেই। সর্ব্বজাতিব সমতা বজায বাখাব জন্য, জাতিসঙ্ঘেব কোন নির্দ্ধাবণ সকলেব সম্মতি ছাডা গৃহীত হতে পাবে না—এই নিয়মেব ফলে জাতিসঙ্ঘ স্বভাবতঃই শক্তিহীন। অবশ্য ব্যবস্থা আছে যে বিবাদী ভিন্ন অপব সকলে একমত হলে তাবা লীগেব উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য যে কোন উপায অবলম্বন ক'বতে পাববে। কিন্তু দেশ বিশেষেব প্রতি বলপ্রয়োগ অনেকেবই চোখে জাতিসঙ্ঘেব আদর্শচ্যুতিব নিদর্শন ব'লে গণ্য হওযা সম্ভব। বাশিয়া ও যুক্তবাষ্ট্র এখনও লীগ্ থেকে স্বতন্ত্র বয়েছে। জাপান যদি এখন লীগেব সভ্যপদ ত্যাগ কবে তবে তাব অবস্থা আবও সঙ্কটাপন্ন হবে এ আশঙ্কাও আছে। পৃথিবীব প্রধান বাষ্ট্র-গুলিব সহায়তা ভিন্ন জাতিসঙ্ঘেব কিছু কবাব উপায় নেই অথচ তাদেব মধ্যে অনেকেবই জাপানেব প্রতি আন্তবিক সহানুভূতি বযেছে এ সন্দেহও অমূলক নয়।

জাতিসঙ্ঘেব শক্তি অবশ্য স্বল্পপবিসব কিন্তু মাঞ্চুবিয়াব ব্যাপাবে সেই সামান্য ক্ষমতা পর্য্যন্ত যথাযোগ্য ব্যবহৃত হযেছিল বলা চলে না। জাতি-সঙ্ঘেব অস্তিত্ব না থাকলে সম্ভবতঃ জাপান চীনেব উপব আরও বেশী অত্যাচাব কবতে পাবত। কিন্তু একথাও সত্য যে প্রথম থেকে লীগ্ সংসদ যদি দৃঢভাবে জাপানেব কাজেব প্রতিবাদ কবতেন—জাপানেব সঙ্গে বাজনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদ, বিদেশ থেকে জাপানেব অর্থসাহায্য বন্ধ বা জাপানেব পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন এই সব প্রস্তাব যদি প্রথমেই আলোচিত হত—তাহলে জাপান কখনও এতদূব অগ্রসব হবাব সাহস পেত না। গত দু'বছবেব ইতিহাস পর্য্যালোচনায স্পষ্টই দেখা যায যে লীগেব দৌর্ব্বল্যেব সঙ্গে সঙ্গে জাপানেব ঔদ্ধত্য বেডে চলেছে। লীগ্ অব্ নেশন্সেব সাবধানতা এ ক্ষেত্রে মাবাত্মক হযেছে বলা চলে, কেননা এতে শুধু প্রাচ্যে নয় সর্ব্বত্রই জাতিসঙ্ঘেব প্রতিপত্তি লুপ্তপ্রায হযেছে। চীনেব বিরুদ্ধে জাপানেব শত অভিযোগ থাকলেও সে বিবাদেব সমাধান জাতিসঙ্ঘেব হাতে

দেওয়াই উচিত ছিল। জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ও আন্তর্জাতিক কলহে কোন দেশের যথেচ্ছ আচরণের স্বাধীনতা দাবী, এ দুটি পরস্পর বিরোধী।

লীগ্ অব্ নেশন্‌সের অকৃতকার্য্যতার একটি প্রধান কারণ এ সম্বন্ধে জনমতের অভাব, তাই এর শোচনীয় পরিণতির জন্যে শুধু লীগ্‌কে দায়ী করা চলে না, দোষ সকলকেই ভাগ ক'রে নিতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনসাধারণ সজাগ ও দৃঢ়চিত্ত হলে গভর্ণমেণ্ট্‌গুলিকে বাধ্য হয়ে লীগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করতে হত। জাতিসঙ্ঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র। অন্ততঃ প্রধান দেশসমূহে জনমত কোন বিষয়ে প্রবল হলে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার শক্তি জাতিসঙ্ঘ আপনা হতেই অর্জ্জন করে। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে এশিয়ার নানা দেশের ঔদাসীন্য মনকে পীড়া দেয়।

স্বার্থবুদ্ধি বা অন্য যে কারণেই হোক এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই জাপানের ব্যবহারে সব চেয়ে বেশী আপত্তি জানিয়েছে। চীনদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বরাবরই সদ্ভাব ছিল। নবীন চীন নানাভাবে এমেরিকার কাছে ঋণী। জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন শত্রুতাও সর্ব্বজনবিদিত। ১৯৩২ সালের প্রথমে পররাষ্ট্র সচিব মিষ্টার ষ্টিম্‌সন্ ঘোষণা করেন যে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে পূর্ব্বতন সন্ধি ভঙ্গ ক'রে যদি কোন নূতন ব্যবস্থা হয় তবে সে বিধানকে যুক্তরাষ্ট্র মেনে চল্‌বে না। সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘের পরিষদ (এসেম্‌ব্লি) মিষ্টার ষ্টিম্‌সনের এই non-recognition প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে মাঞ্চুকুয়োকে স্বাধীন রাজ্য ব'লে স্বীকার করা হবে না। পৃথিবীর সকল জাতি যদি এই একটি সামান্য ব্যাপারেও একমত হয়ে চলে তবে জাপানকে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হবে, কেননা জাপানের আর্থিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা এমন নয় যে জাপান অন্য দেশের উপর নির্ভর না ক'রে বরাবর তাদের উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে।

৫

জাপান যে শুধু জাতিসঙ্ঘের কভেনাণ্ট্ বা বিধান লঙ্ঘন করেছে তা নয়—দুইটি অন্য সন্ধি ভঙ্গের অপরাধ স্খালনও তার পক্ষে অসম্ভব। ১৯২২ সালে নয়টি রাজ্য সম্মিলিত হয়ে সন্ধি করে যে চীনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অধিকারহ্রাস বা রাজ্যক্ষয় করবার চেষ্টা কেউ করবে না, জাপান সেই ন'টি রাজ্যের অন্যতম। ১৯২৮ সালে জাপান কেলগ্ প্যাক্ট্ স্বাক্ষর করে—তাতে যুদ্ধের দ্বারা নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়াস সকল দেশের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে। জর্ম্মানী একটি মাত্র সন্ধিলঙ্ঘনের অপরাধে ১৯১৪ সালে সভ্যসমাজ থেকে বহিষ্কৃতপ্রায়

হয়েছিল। চীনের সীমানার মধ্যে মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন জাপানের তিন-তিনটি সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করার নিদর্শন।

জাপানের সমর্থনে অনেকগুলি যুক্তি ব্যবহার করা হয়। সে সম্বন্ধে কিছু ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

প্রথমতঃ এ কথা বলা হয়েছে যে বস্তুতঃ জাপান লীগ্ কভেনাণ্ট বা কেলগ্ প্যাক্ট্ লঙ্ঘন করেনি। উক্ত সন্ধিপত্র দুটিতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়েছে কিন্তু জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে বলা চলে না। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে বলপ্রয়োগ প্রতিশোধ বা reprisals নামে আজ পর্য্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ব'লে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। চীনের সঙ্গে বিদেশী শক্তিবৃন্দের ব্যবহারে এর প্রচুর দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। গত দশবৎসরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও জাপান নানা কারণে চীনে সৈন্য প্রেরণ করেছে। কিন্তু এই যুক্তি জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার বা মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন সমর্থন করে না। সামান্য বলপ্রয়োগ ও বিশাল অভিযানের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে—প্রথমটির নামে একটি সমগ্র প্রদেশ অধিকার বা রাজ্য জয় কখনই চলে না। লীগ্ কভেনাণ্ট্ বা কেলগ্ প্যাক্টের কোন অর্থ থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই জাপান সন্ধিভঙ্গের দোষে দোষী। আর ১৯২২ সালের সন্ধিটি যে লঙ্ঘিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জাপানের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে চীনকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র রাজ্য বা জাতি ব'লে গণ্য করা অনুচিত। চীনদেশ অরাজক—অন্য রাজ্য সম্বন্ধে সভ্যসমাজ যে সব বিধিবিধান স্থির করেছে চীনে সেগুলি খাটে না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ১৯২২ সালে যখন চীনে অরাজকতা আরো ব্যাপক ছিল তখন জাপান চীনের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে দ্বিধাবোধ করেনি, মাঞ্চুরিয়ায় গোলযোগের প্রথম অবস্থায় জাপান জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টার পরিবর্ত্তে চীন গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বতন্ত্র আলোচনার প্রস্তাব করেছিল, চীনের শাসকেরা বয়কট্ আন্দোলন নিরোধ করতে পারেন নি বারম্বার এই অভিযোগ আনবার সময় জাপানের স্মরণ ছিল না যে চীন অরাজক। তাছাড়া একথা কখনই বলা চলে না যে কোন একটি দেশ অরাজক কিনা এ সিদ্ধান্ত অপর একটি দেশের উপর নির্ভর করবে। একমাত্র জাতিসঙ্ঘই এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার অধিকারী। লীগের একটি সভ্যও যখন মুক্তকণ্ঠে জাপানের সমর্থন করতে সাহস পায়নি তখন এ যুক্তির অসারতা স্বতঃসিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ অনেকে বল্‌তে পারেন যে মাঞ্চুকুয়ো চীনের কবল থেকে মুক্তির চেষ্টা করছে—জাপান ক্ষুদ্র পরাধীন জাতির সাহায্য করছে মাত্র।

একথাও বলা হয় যে মাঞ্চুরিয়া চীনের প্রাচীন সীমার বাইরে তার স্বাতন্ত্র্য-লাভের প্রয়াস দোষের নয়। লীটন্ সমিতির মতামত এ সম্বন্ধে প্রণিধান-যোগ্য। সমিতির সভ্যেরা জাপানের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে দেশে কোন আন্দোলন নেই; জাপানের আশ্রিত হয়েও অধিবাসীরা চীনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করতে কিছুমাত্র ব্যগ্র নয়, সে অঞ্চলে তথা-কথিত জাতীয় দল জাপানেরই উৎসাহে উদ্ভূত ও এখন পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় মাত্র। বস্তুতঃ মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতার পিছনে জাতীয় কোন প্রেরণা নেই—জাপানের স্বার্থসিদ্ধিই এর ভিত্তি। তা না হলেও চীনের সীমানার মধ্যে অকস্মাৎ জাপানের এই পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তির প্রশংসা করা শক্ত—কারণ সর্ব্বত্র এর অনুকরণ চল্‌লে মঙ্গলের চেয়ে বিপদের সম্ভাবনাই বেশী।

উপরের যুক্তি তিনটি after-thought মাত্র। জাপানের চীন আক্রমণের আসল কারণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে আপনার স্বার্থ সংরক্ষণ। মাঞ্চুরিয়া জাপানের আর্থিক উন্নতির পথে যে কত বড় সহায় সে কথা বোঝা সহজ। কিন্তু যে উপায়ে আজ জাপান সে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে তার ফল জাপান ও সমস্ত জগতের পক্ষে বিষময়। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করতে গিয়ে সকল পৃথিবীর বিরাগভাজন হওয়া কি পরিণামে মঙ্গলজনক? নবীন চীনের সঙ্গে অন্তহীন দ্বন্দ্ব কি এতই বাঞ্ছনীয়? এমেরিকা, চীন বা অন্য দেশে জাপানী বাণিজ্যের সবিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা কি নিতান্ত অল্প? জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ধ্বংসের জন্য দায়ী হওয়া কি গৌরবের কথা? জাপানের প্রকৃত বন্ধু ও স্বয়ং জাপানীদের এসব কথা ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

শ্রীসুশোভন সরকার

ঝড়

(এল্, এ, জি, ষ্ট্রং হইতে)

মুখে ভীষণ ভ্রূকুটী, বিড বিড কবিযা বকিতে বকিতে এবড়োখেবড়ো সরু পথ দিয়া সে চলিতে লাগিল। তাবপব খোলা জমি, খানিক দূব গিযাই সে বাস্তা ছাড়িযা চড়াই ধবিল। আশেপাশে এখানে ওখানে ছোটখাটো কাঁটা-ঝোপ। মনেব ভিতবকাব বাগেব চোটে উরুব উপব অমানুষিক চাপ দিযা চলায নবম ঘাসে তাহাব পা বসিয়া যাইতে লাগিল। ঝুঁকিযা পড়িযা শবীবেব সমস্ত শক্তি দিয়া সে চড়াই উঠিতে লাগিল। থমথমে আকাশ—একবাব সে-দিকে চাহিয়াও দেখিল না; তাহাব সর্ব্বাঙ্গ বহিযা স্বেদস্রাব—সে-দিকেও দৃক্‌পাত কবিল না। রুদ্ধ আক্রোশে তাহাব মন ভাবাক্রান্ত।

খানিক পবে চড়াই শেষ হইলে কষ্টেব অবসান হইল। নিববলম্ব মেঘেব মত তখন সে স্বচ্ছন্দ গতিতে দুলিযা চলিল। হঠাৎ একটা হালকা হাওযা উঠিযা তাহাব কপাল ছুঁইল। প্রচণ্ড বিবাগ সত্ত্বেও তাহাব স্নিগ্ধ আদব সে অর্দ্ধসচেতনভাবে স্বীকাব না কবিয়া পাবিল না। অথচ তাহাব মনেব ভাব তখন উপশান্তি বা লাঘবতাব পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই সে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে অগ্রসব হইতে লাগিল। সামনেব বড় বাস্তা তখনও কিছু দূবে। অধীব পদতাড়নায এই দূবত্বকে সে যেন মুহূর্ত্তেব মধ্যে গ্রাস কবিতে চায। পাকা বাস্তাব উপব তাহার বুটেব লোহা কযেকবাব খট্ খট্ কবিয়া উঠিল। এক লাফে সে মাঠেব ভিতব পড়িতেই সবুজ তৃণেব আস্তবণেব মধ্যে সে শব্দ বিলীন হইযা গেল।

কিছু দূবে দুটী কুলি বাস্তা মেবামত কবিতেছিল—অবরুদ্ধ বাতাসে তাহাদেব একজনেব কণ্ঠস্বব সুস্পষ্ট শোনা গেল।

"জো! ঝড আসছে!"

জোব সঙ্গী বলিল, "হুঁ! বাজ পড়তেও পাবে।"

উহাব স্বব বেশী গম্ভীব, কিন্তু কম স্পষ্ট।

পথিক তাহাদেব কথায় কর্ণপাতও কবিল না—আকাশেব দিকে চাহিয়াও দেখিল না। সূর্য্যেব নিষ্প্রভ আলোকে যেন লজ্জাব আভাস। উপত্যকাব উপবে চাবিদিক হইতে বিবসাকৃতি মেঘেবা আসিয়া জড হইতেছে, তাহাদেব প্রান্ত মেডেনহেযাবেব পক্ষ্মেব মত সূক্ষ্ম। ত্রস্ত বিহঙ্গ-

কুল আতঙ্ক-বিহ্বল,—তাহাদের কলনাদে নিরাশার কাতরতা। কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পথিক চলিতে লাগিল।

একটা নারী। কাছে থাকিলে সমস্ত দেহমন তাহাকে একান্তে চায় কেন? কাছে না থাকিলেই তাহাকে একবারও মনে পড়ে না, এই বা কি রকম? কেন, কেন এ ঝঞ্ঝাট। দূরে গেলে তাহাকে চেনাই যায় না, যেন তাহার অন্তরাত্মা সুদ্ধ বদলাইয়া যায়। যখন তাহার কাছে থাকে, কি শান্ত, তাহাকে খুসী করায় মেয়েটীর কি আগ্রহ। ভুলিয়াও একবার জোর করিয়া কোন কথা বলে না। খুব যেন সুখী, তাহার অসন্তুষ্টির যেন কোনও কারণই নাই। অথচ, একবার যদি চোখের আড়াল হইল, অমনি চিঠি, আর তাহাতে দুনিয়ার যত খুঁতখুঁতি, যত আপত্তি। "কেন ও কথা বল্লে?" ('ভ্যালা. যা হোক, আমার মনে আছে নাকি?') "কেন ও কাজ করলে?" ('বেশ করেছি, আলবৎ করব') "কেন এ কাজ করলে না?" "আমায় অপমান করছ? বেশ না হয় মুখ্যু আছি, জানই ত বাপু আমি মুখ্যু, তা আমায় অপমান করার কি দরকার ছিল?" ('আঃ জ্বালা, আমার একমাত্র কাজই কি তোমার সমালোচনা করা?') যখন কাছে থাকে হাসির ঝরণা, দূরে গেলেই তাহার প্রত্যেকটী কাজে আপত্তি!

আর এই যে অভিযোগ, মোটেই ঝাঁঝালো নয়—ভাবিতে ভাবিতে পাথরে হোঁছট খাইয়া সে বেশ গালভরা দিব্য দিল—কেবল অসহ্য ছিঁচ্‌কাঁদনে মেয়েলিপনা! "আমি জানি আমি তোমার নেহাৎ অযোগ্য—তোমার পায়ের ময়লা হবার যোগ্যতা আমার নেই, তবু আমাকে অমন ঠাট্টা কোরো না, আমার প্রেমকে উপহাস কোরো না।" সব নিপাতে যাক।

আকণ্ঠ রাগে গরগর করিতে করিতে, দাঁতে দাঁত ঘসিতে ঘসিতে সে পথ চলিতে লাগিল। কি অসহ্য ন্যাকামি! এতটুকু আত্মসম্মানও কি নাই? সোজা হইয়া একবার দাঁড়াইতেও কি সে জানে না? কিন্তু সত্যই সে পারে না—না চোখের সামনে, না চিঠির কাগজে। শুধু অন্তহীন অভিযোগের বোঝা, তাও সামনাসামনি কিছু বলার সাহস নাই। একবারও কি কিছু বলার মত বলিয়াছে? একবার সে একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল—ঝোঁকের মাথায় টানিয়া বডিস একটু ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। তাতেই কি ছাই আপত্তি করিল! সেফ্‌টিপিন আঁটিয়া বসিয়া বোকার মত হাসিতে লাগিল। হাঁ, যদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিত, কি মুখে এক ঘা কসিয়াও দিত, তাহা হইলে না হয় বাহুবন্ধে নিষ্পেষিত করিয়া, উষ্ণ চুম্বনে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দুর্বিনীতা প্রিয়াকে

বশ মানাইত। মাঝে মাঝে একটু আধটু কডা কথা নইলে চলে কি? সে চায এমন নাবী যে তাহাব সহিত সমানে যুদ্ধ কবিবে, তাহাব উদ্দাম আবেগেব সহিত পাল্লা দিবে। এমন স্ত্রীব দ্বাবা পবিচালিত হইতে তাহাব আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ বেতসলতা লইযা সে কবিবে কি? এ না পাবে মাথা খাডা কবিযা দাঁডাইতে, না জানে বেশ চোখা চোখা কথা বলিতে। "আমি তোমাব অনেক নিচে, তাই আমাকে অশ্রদ্ধা কবো। তোমাব কাছে নিজেকে বিলিযে দিয়েছি. তাব এই প্রতিদান! কেন, আমি কি বাস্তাব মেয়েমানুষ?" বাস্তাব মেযেমানুষেব সম্বন্ধে কি জানে সে? কেমন হয বাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিলে—কেবল কথা, আব কথা, শুধু কথাই জানে।

ঠিক এই বকম একখানি চিঠি তাহার হাতে। চলিতে চলিতে সে দোমড়ানো চিঠিখানি সমান কবিতে লাগিল। হাতেব ঘামে জাযগায় জায়গায় লেখা মুছিযা গিয়াছে—যাক্ এ বসপাত্র তুবাব চাখে কাব বাবাব সাধ্য! আগাগোড়া একই কথা কেবল ওজব আব আপত্তি—কেবল অসহ্য প্যানপ্যানানি। না, চাঁদ, আব তোমায় এমন চিঠি লিখতে দেওয়া হবেনা। আগে আগে এই বকম চিঠি পাওয়াব পব বাগে সে দু এক দিন আব দেখা কবে নাই, তাই দেখা হইলে তাব রূপেব আকর্ষণে বাগেব কথা ভুলিযাও গিযাছে; ডেজীব সান্নিধ্যে তাহাব সর্ব্বাঙ্গে কামনাব বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ কামনায় তাহাব অন্তবাত্মা ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। তাহাব মা যে তাহাকে খোঁচা দিযা অনুক্ষণ বলিবে ডেজী তাহাব উপযুক্ত নয়—ডেজীকে বিবাহ কবিযা সে সুখী হইতে পাবিবে না, এ কথা সে শুনিতে চায় না। অথচ এই দুৰ্দ্ধৰ্ষ আকর্ষণেব হাত হইতে সে কিছুতেই পবিত্রাণ পাইতেছে না। ডেজী ভাল তাহাকে বাসে; সেও কি কবিযা বলিবে বাহুপাশে বন্দিনী ডেজীকে ভালবাসে না? ডেজীকে দেখিলেই তাহাব সব সংশয কোথায় মিলাইযা যায়; আবাব ডেজীদেব বাডীব গলিব মোড ফিবিলেই কুণ্ডলীকৃত সাপেব মত সব সংশয় ভিড পাকাইযা আসে।

এবাব কিন্তু আব না। এই শেষবাব। আবাব ঐ চিঠি। দুপুব বেলায এক বোঝা কাঠ আসিবে। তাহাব আগে কোনও কাজ নাই। ভালই হইল। বাগেব প্রথম অবস্থায়ই সে ডেজীব সঙ্গে দেখা কবিযা একটা হেস্তনেস্ত করিবে। মাথাব উপবে পুঞ্জীভূত মেঘ, মনের ভিতব ক্রোধেব পুঞ্জীভূত বাষ্প। তাহাব মানসিক অবস্থাব সঙ্গে প্রকৃতিব কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। হন্ হন্ কবিযা চলিতে চলিতে সে অবাক হইয়া ভাবিল, খড়েব আগুনেব মত তাহাব বাগ দপ কবিযা জ্বলিয়া উঠিযাই নিভিযা যায়; আজ ত এতক্ষণ ধরিয়া তুষেব আগুনের মত তাহাব

অন্তরে ক্রোধেব বহ্নি জ্বলিতেছে। সে আগুনেব হল্‌কায় তাহার মন যেন পুড়িয়া যাইতেছে।

বড় বাস্তা মাইল তুই পিছনে পডিয়াছে। তাহাবই উপব দিয়া একখানি মোটব চলিযা গেল, তাহাব হর্ণেব বিকট শব্দ শোনা গেল—সামনে কোন বন্ধনমুক্ত ঘোড়া পড়িয়া থাকিবে। মেবিভেল পাহাড়েব উপবে উঠিবাব সময় তাহাব গিয়াব বদলানোব শব্দ পর্য্যন্ত অতি স্পষ্ট শুনিতে পাইযা সে একটু আশ্চর্য্য হইল। তাহাব পবিবেষ্টনীব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সে একবাব চাবিদিকে চাহিল। সূর্য্য প্রায় অদৃশ্য—আকাশ কাঁচা চামডাব মত ঘোলাটে। উপত্যকাব উপবে কালো মেঘেব স্তূপ প্রাসাদচূড়া বচনা কবিযাছে। বৃষ্টি পডিবে। বেশ ত।

আবেকটা চড়াই—তাহাব পবেই ডেজীর বাডী দেখা যাইবে। সে জোবে পা চালাইল—এই ত আসিয়া পডিয়াছে। ঐ যে! বুদ্ধি বটে, এই ঝডেব মুখে কাপড শুকাইতে দিতে বাহিবে আসিযাছে। কই, এখনও দেখিতে পায•নাই বুঝি? নিঃশব্দ পদসঞ্চাবে যুবতীটীব দিকে সে আগাইয়া চলিল। কি নীবেট আহাম্মক—এই সময়ে কাপড় শুকাইতে দেয়।

একখানা চাদবেব ব্যবধানে। চাদবখানা লইযা একটু অসুবিধায় পডিয়াছে। দড়িব উপব কিছুতেই চাদরখানা থাকিতেছে না। ডেজী শান্তভাবে চাদবটীকে বাগাইযা আটকাইযা দিল। এইবার বাডীব ঠিক সামনে। যাঃ দেখিযা ফেলিল বুঝি। এক মুহূর্ত্ত একটু অবাক হইযা ডেজী তাকাইযা বহিল—যেন নিজেব দৃষ্টিকে বিশ্বাস কবিতে পাবিতেছে না। পব মুহূর্ত্তেই ডেজী উৎফুল্ল হইযা ছুটিয়া আসিল। "ডেভ্ না কি! আজ হঠাৎ এ বকম অসময়ে যে। এস না গো—ভেতবে এস। তোমায দেখে বড্ড আনন্দ হচ্ছে।"

ডেজীকে দেখিয়া ক্ষণিকেব জন্য ডেভ্-এব বাগ পড়িয়া আসিল। ডেজীকে আলিঙ্গন করিবাব তুর্জ্জয় কামনা তাহাব সর্ব্ব অঙ্গ যেন শিথিল কবিযা দিল। কিন্তু না ঃ—চিঠি ত ভোলা যায় না—ডেভেব মনেব মধ্যে বাগ আবাব ঘনাইযা আসিল। দাঁতমুখ খিঁচাইযা সে ডেজীকে বলিল "এই হতভাগা চিঠিব জন্যে এসেছি।" হাতে তখন ডেজীব সেই দোমডান চিঠি। আনন্দেব উচ্ছ্বাসে ডেজী তাহা দেখিতে পাইল না। নিজেব মনে অজস্র বকিযা চলিল। "আঃ, চল না ঘবেব ভেতবে। এদ্দূব থেকে তেতে পুড়ে এসেছ, একটু জিবোও—"

"দেখছ এই চিঠি?" বলিযা ডেভ্ ডেজীর চোখেব সামনে চিঠিখানা ধবিল। ডেজী একবাব দেখিল, কিন্তু ডেভেব বাগেব কারণ বুঝিতে

না পাবায বলিল, "ওঃ, আমাব চিঠি! ও ছাই আবাব পড়ছ কেন? কিন্তু তুমি এলে আমাব যা ফুর্ত্তি হয়।" মেয়েটা কি উন্মাদ নাকি? এতটুকু বুদ্ধিও কি ঘটে নাই?

"শোন, এই চিঠিব জন্যে তোমাব কাছে এসেছি।" কটমট কবিয়া ডেজীব দিকে তাকাইযা ডেভ্ বলিতে লাগিল, "তুমি আমাব নামে অনেক নালিশ কবেছ। তোমায নাকি অসম্মান কবেছি! আবও কত কি।" উত্তেজনায় ডেভী ফুঁসিতে লাগিল। "শোন, তুমি ক্রমাগত এই বকম চিঠি লিখবে, আব আমি মুখ বুজে সহ্য কবে যাব—এ হবে না। আমি শেষবাব বলে দিচ্ছি—এ চলবে না।" ডেভেব কণ্ঠস্বব অস্বাভাবিক শান্ত, সংযত।

এতক্ষণে ডেজী বুঝিতে পাবিল। সে মাথা একটুখানি পিছনে হেলাইয়া করুণ দৃষ্টিতে একবাব ডেভেব দিকে চাহিল। অন্য সময় ডেজীব মাথা হেলাইবাব এই ভঙ্গীটা ডেভেব কাছে বড মধুব ঠেকিত, আজ ইহাই তাহাব কাছে অসহ্য ন্যাকামি বলিযা বোধ হইল।

"ওঃ ওই চিঠি। ডেভী তোমায় মিনতি কবি ও চিঠি তুমি ছিঁডে ফেলো—ও চিঠি আব পড়ো না। কি ছাই সব লিখেছি ওতে—ওব কি কোনও মানে আছে? একটু ঠাণ্ডা—"

"যদি মানেই না থাকে, ও চিঠি লিখতে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল কে?"

"তোমাব দুটী হাতে ধবি, ডেভী, চল না!"

"গোল্লায় যাও। ফি বাব এই বকম চিঠি লেখ কেন, বলবে?" ডেভেব নির্ম্মম আঘাতে ডেজীব চোখে ব্যথার ক্ষীণ আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। "চল না লক্ষ্মীটী ভেতবে।" "এব পবেব চিঠির জন্যে কথা জমা হচ্ছে বোধহয়।" বিকৃত স্ববভঙ্গী কবিয়া ডেভ্ ডেজীব চিঠি হইতে পড়িতে লাগিল—"তুমি বাজাবেব মেযেমানুষেব মত আমার সঙ্গে খাবাপ কথা বল।' কেন আমাব মুখের সামনে বলতে কি হয়! নাঃ তা করবে কেন? চিঠিব কাগজে না হলে কি কাঁদা যায? অসহ্য।" ডেভেব আয়ত নীলাভ চক্ষুতে অশ্রু ফুটিযা উঠিল।

"ওগো, ওগো আমাব খুব অন্যায় হযেছে। তোমাব পায়ে মাথা খুঁড়ে বলছি আব কখনও ও বকম চিঠি লিখব না। তুমি ত জান আমি কি একা। শুধু বাবা আব আমি। মা নেই যে বুদ্ধি দেবে। তুমি চলে গেলে খালি মনে হয় মা যা শেষ বলে দিয়েছিল!" ডেজীব কপোল বাহিয়া অঝোরে অশ্রু ঝবিতে লাগিল।

"কি বলেছিল তোমাব মা? কখন?"

মৃত্যুশয্যায়।”

ডেভ্ একটু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু না—বাগকে সে আজ জীযাইয়া বাখিবে। আবাব কান্না। ন্যাকামি!

“দেখ, বেশ ভেবে চিন্তে বেছে নাও—হয় তোমাব মা, নয় আমি। হয় তোমাব মুখ বন্ধ হবে—কিন্তু মুখ ত তোমাব বন্ধ হবে না—মুখ তোমাব থামবে না—আমাব প্রতি কাজে দোষ ধববে, আব মবা মাব নাম ক’বে চোখেব জল বেব ক’বে আমায ভোলাবে ভেবেছ? কিন্তু আমি ভুলছি না আর। সব দোষ তোমাব, তোমাব, তোমাব।” ডেভ্ চেঁচাইতে লাগিল—কথাগুলি কুৎসিত শোনাইল, তাহাতে সে মবীয়া হইয়া উঠিয়া আরও কদর্য্য ভাষায় ডেজীকে গালাগালি দিতে আবম্ভ কবিল।

টপ্ টপ্ কবিযা বড় বড কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। ডেজী এত দুঃখেব মধ্যেও উদ্বিগ্ন হইযা মেলা কাপড়গুলিব দিকে একবাব চাহিল। ও কি সাংঘাতিক কেজো মেযে। ডেভ্ ডেজীব দিকে আগাইযা আসিল। তাহাব ক্রোধবিকৃত মুঁখেব দিকে চাহিযা ডেজী ভযে শিহরিয়া উঠিল। “ডেভ্” বলিয়া ডেজী তাহাকে কণ্ঠলগ্ন কবিবাব জন্য তাহাব দুই বাহু বাড়াইল। “ডেভ্! বটে।” বলিযা ডেভ্ জোব কবিয়া তাহাব হাত ছাড়াইয়া লইল, “কাছে থাকলেই ডেভী, ডেভী, আব দূবে গেলেই—আমি বদমাইস। মা মবা কচি মেয়েব ওপব জুলুম কবি। একদিন জুলুম কাকে বলে—”

ডেজীব কোমল মসৃণ স্কন্ধে ডেভেব নখ বসিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্রিয়েব কামনা মানুষকে কত হিংস্র কবিয়া তুলিতে পাবে জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি কবিয়া ডেভ্ একটু আতঙ্কিত হইল—খুসীও যে হইল না তাহা নয। ডেজী তাহাব দেহযষ্টি ঋজু কবিয়া তুলিযা ডেভেব সামনে এক অভিনব নাবীত্বেব গৌববে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিযা শান্ত, ধীবভাবে শুধু বলিল, “বেশ ব্যথা দিতে চাও, দাও, হ্যাঁ দাও।” দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ডেভ্ বলিল, “উঃ কি সয়তানী! বেটাছেলেকে অপ্রস্তুত কবতে কি চমৎকাব জানে!” হঠাৎ ডেজীকে ছাড়িয়া দিয়া সে একটু দূবে সবিয়া দাঁড়াইল। তাব পব ঘুবিয়া দাঁড়াইযা সে জোবে পা ফেলিয়া চলিতে সুরু কবিল।

ব্যাস্, আপদ চুকিয়া গেল। নাঃ ডেজীকে সে কিছু বলে নাই; ডেজী ত বলিতে পাবিবে না যে সে তাহাকে মাবিযাছে। তাহাকে ফেলিয়া চলিযা যাই, এই সব চেযে ভাল পন্থা। বটে! আমাকে দৌড়াইয়া ধবিবে। দেখ না। বেশ হইয়াছে। এখন কুকুরেব মত হাঁফাক। ডেজী তাহাকে প্রায় ধবিযা ফেলিয়াছে। দু’একবাব ডেজীব কাছে ধবা না দিয়া

দৌড়াইয়া এড়াইযা তাহাব মনে হইল নেহাৎ ছেলেমানুষী হইতেছে। দাঁড়াইযা পড়িযা সে বলিল, "বেশ। কি চাও বলত!"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে ডেজী বলিল, "ওগো তোমাব দুটী পাযে পড়ি আমায ফেলে বেখে অমন কবে চলে যেও না। তোমাব যা ইচ্ছা কবো আমি বাধা দেব না। মাবো, আমায মাবো, আমি তাই চাই।" উত্তেজনায ডেজী কাঁপিতেছিল। বিস্রস্তবেশ ডেজীব ব্লাউজেব ফাঁক দিয়া তাহাব অনাবৃত বক্ষস্থলেব আক্ষোভ দেখা যাইতেছে — তাহাব উষ্ণ নিঃশ্বাস ঝলকে ঝলকে ডেভেব মুখে আসিযা লাগিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ কবিবাব এক দুর্দ্দমনীয ইচ্ছা ডেভেব সর্ব্ব অঙ্গে যেন এক বন্যা আনিযা দিল। প্রবল চেষ্টায় আত্মসংযম কবিয়া ডেজীব অনাবৃত কাঁধে হাত বাখিযা ডেভ্ দাঁড়াইযা বহিল। শ্রান্তিতে ডেজীব মাথা হেলিযা পড়িযাছে—ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধব, নাসাপুট স্ফুবিত হইতেছে। ডেভ্ সভযে চক্ষু মুদিল। অতি ধীবে ডেভ্ বলিল, "না না তুমি নয়"। ডেজী ডেভেব আবও কাছে ঘেঁসিয়া আসিযা বলিল, "ডেভি, তোমাব যা ইচ্ছে কবো, আমাব দেহেব উপব অত্যাচাব কবো, কিন্তু দোহাই তোমাব চোখ বুজে থাকো না। আমাব বড্ড ভয় কবছে। লক্ষীটী একবাব তাকাও। শুন্‌ছো ? সত্যি শুন্‌ছো ? তোমাব দুটী পাযে পড়ি একবাব তাকাও।" নিস্পন্দ ডেভ্‌কে দেখিয়া আতঙ্কে ডেজী চীৎকাব কবিযা উঠিল। তাব পব হঠাৎ ডেভেব মুখে এলোপাতাড়ি ঘুসি মাবিতে লাগিল।

ডেভ্ একটু হাসিযা নির্বিকাব চিত্তে ডেজীব শিলাবৃষ্টিব মত আঘাত সহ্য কবিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেব সঙ্গে গাযেব জোব খাটাইযাই বা লাভ কি? আচ্ছা রাগেব মাথায পাথবে মাথা খুঁড়িযা মবিবে না ত? মরুকগে। ডেভ্ চোখ বুজিয়াই বহিল।

আস্তে আস্তে পা সবাইয়া সে একবাব খপ্ কবিযা ডেজীকে বেশ শক্ত কবিযা ধবিযা ফেলিল। তাব পব বেশ জোবে একবাব দম লইযা তাহাব সমস্ত দেহেব শক্তি দিযা ডেজীকে দূবে ছুঁড়িয়া ফেলিযা দিল। ধুপ্ কবিযা ডেজী ঘাসেব উপব গড়াইয়া পড়িল, যন্ত্রাণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ কবিল। কপাল ভাল, পাথবের উপড পড়িয়া মাথা ফাটে নাই।

তাব পব ঘুবিযা দাঁড়াইযা একবাব চোখ মেলিযা চাহিল। তাব পব দৌড়। প্রথমে বেশ জোবে, তাব পব দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দৈত্যেব মত। চোখ বুজিযা থাকিতে হইবে নইলে ওদেব মায়া কাটানো যায না। মনে পড়িল ইস্কুলেব বইযে কাহাব কথা পড়িয়াছিল, যে এমন অবস্থায় কান বন্ধ কবিযাছিল। চোখ বোজা কিন্তু তাব চেয়েও ভাল।" ডেভী! ডেভী! নাঃ শোনাও ত আর যায না। চোখ কান দুই বুজিতে হইবে। পাগলেব

মত চীৎকার করিতে করিতে ডেভ্ ছুটিয়া চলিল। হোঁচট খাইয়া, কাঁটা ঝোপে পড়িয়া গিয়া পা দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। পথের পাশ হইতে গরু ঘোড়া ভয় পাইয়া পালাইয়া গেল। বিকৃত মুখভঙ্গী করিতে করিতে ঢালু পথ দিয়া সে তীব-বেগে ছুটিয়া চলিল। একবার পা ফস্কাইলে হয়ত হাত পা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে। মস্ত এক ফোঁটা জল তাহার চোখের পাতায় হঠাৎ আসিয়া আচমকা এমন এক ধাক্কা মারিল যে সে একটু থতমত খাইয়া চোখ মুছিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইল। আকাশের ভীষণ মূর্ত্তি।

আকাশ যেন সীসার পাতের ছাত, তাহার কোথাও ঘোলাটে কমলা রঙ্গের, তাহারই পিছনে ঘন নীল, ধূসর, গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, নানান রঙ্গের মেঘ ভিড় পাকাইয়া আসিতেছে। দূরে উপত্যকার উপরে ঘন মেঘের প্রাসাদ। ছোট ছোট পাৎলা মেঘের টুকরা এই মেঘস্তূপে কখনও আসিয়া লাগিতেছে, কখনও বা খসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার ঠিক দক্ষিণে এক রাশ বেগুনী ও নীল রঙ্গের মেঘ যেন কলহপ্রিয় রমণীর মত অঞ্চল আন্দোলিত করিয়াই মুহূর্ত্তে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অঙ্গে জড়াইয়া লইয়া। দূরে এক টুকরা মেঘ কোন্ দিকে যাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন স্থির হইয়া কি ভাবিল, তাহার পর অকস্মাৎ মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার নিচে অন্ধকারের ঘন যবনিকা সমস্ত বস্তুকে দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া দিল। প্রান্তরের দিক হইতে শীতল বায়ুর প্রবাহ ডেভের দিকে ছুটিয়া আসিল—ভীষণ মেঘের স্তূপ নামিয়া আসিবার আগেই যেন সেখানকার সব হাওয়া পালাইয়া যাইতে চায়। সমস্ত পৃথিবী যেন আসন্ন বিপদের ভয়ে চোখ বুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

ডেভ আর একবার হাসিয়া আবার নিচের দিকে ছুটিতে লাগিল। ভ্রূকুটীকুটিল আকাশের দিকে চাহিয়া ডেভ্ বলিল, "দেবো, আজ ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা। ভিজবার আগে নিচের আশ্রয়ে পৌছাবোই।" আরও জোরে ডেভ্ ছুটিতে লাগিল। তাহার পায়ের নিচে সরু ফিতার মত রাস্তা জাগিয়া রহিয়াছে। আসিবার সময় যে দুই বুড়াকে দেখিয়াছিল তাহারা বোধহয় মাথা গুঁজিবার জায়গা খুঁজিয়া লইয়াছে। ঘরের মধ্যে বসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা কি রকম ঘাবড়াইয়া গিয়াছে ভাবিতে ডেভের ভারী হাসি পাইল। গরম বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় পড়িতে চায়। যাক্। এই ত পথ! পা দুটা যেন একটু আড়ষ্ট হইয়া আসিল না? দোষই বা কি? তিন মাইল ত প্রায়

হইল, তাব উপব কত দিনেব অনভ্যাস। কিন্তু হ্যাবি শুনিলে বলিবে কি ? হ্যাবি বুড়ো যে বলে এখানে হাঁটা খুব সোজা।

বাঃ এই ত। উঃ। আব কতটুকুই বা ? উঃ আব ত পাবি না। চুলোয় যাক। এইবাব ! নিঃশ্বাস যে আব চলে না। মুখেব ঘাম চোখেব দৃষ্টি ঝাপসা কবিয়া দিতেছে। যাক, নামিবাব সময় অনেকটা সহজ। উঃ, চোখেও ত আব দেখা যায় না। শেষে পা দুটাও যাইবে না কি ?

পথ ত মিলিল। টলিতে টলিতে সে ছুটিতেছে। ভীষণ পবিশ্রমে তাহাব সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইযা আসিয়াছে। শুধু নিজেব কণ্ঠস্বরে তাহাব বিশ্বাস হইতেছে সে এখনও বাঁচিয়া আছে। ও কিছু না। বিশ্রাম কবিলেই সব ঠিক হইযা যাইবে।

অন্ধকাব। আকাশেব দিকে চাহিযা ডেভ্ দেখিল কালির মত আকাশ—যেন একটা মস্ত কাফ্রিব মুখ নিচেব দিকে তাকাইয়া আছে। আকাশ তাহাব দিকে চাহিযা যেন ভীষণ ভ্রূকুটী কবিল—সে চাহনি দেখিতে না পাবিয়া সভয়ে ডেভ্ চোখ বুজিয়া বসিযা পড়িল। এক নিমেষে সমস্ত দৈত্যপুবীব কাড়ানাকাড়া বাজিযা উঠিল। তাব পব সে কি প্রবল ধাবায় বৃষ্টি ! বিদ্যুতেব তীব্র আলোতে ডেভেব চোখ ধাঁধিযা গেল, বজ্রেব ভীষণ নির্ঘোষ ডেভেব কানে তালা লাগাইযা দিল। মুষল-ধাবে বৃষ্টি আসিযা ডেভেব মুখে সজোবে আঘাত কবিতে লাগিল, যেন শত শত দৈত্য নিষ্ঠুব উল্লাসে মাতিয়া ডেভেব মুখে জলেব ধাবা ছুঁড়িযা মাবিতেছে। বৃষ্টি। অসম্ভব ! এ শুধু বৃষ্টি নয। নিশ্চয়ই দেখিতে না পাইয়া সে নদীব জলে ঝাঁপাইযা পড়িযাছে। ডুবিয়া মবিতে হইবে। নিস্তাব নাই।

বৃষ্টি। চাবিদিকে বৃষ্টিব অভেদ্য প্রাচীব। বিদ্যুতেব অবিবত ঝলক খড়খড়িব ফাঁক দিযা আলোব ঝলকেব মত বৃষ্টিব প্রাচীবে আসিয়া আহত হইতেছে। বৃষ্টিব অশ্রান্ত কল্লোলে যেন বজ্রনিনাদও মিলাইযা যাইতেছে। সহসা বৃষ্টিব এই প্রাচীব যেন মন্ত্রপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নিচে বনেব মধ্যে তখনও বৃষ্টিব কলবোল। ডেভ্ দেখিল সে হামাগুড়ি দিযা একটা ঝোপেব দিকে যাইতেছে—মাথাব উপব আকাশ তখনও মসীবর্ণ।

অতি সন্তর্পণে সে কোনও মতে উঠিয়া দাঁড়াইল—কালো আকাশেব গায়ে যেন খড়িমাটি দিয়া লেখা যায। আচ্ছা এ বকম অদ্ভুত খেয়াল তাহাব মাথায় আসিল কেন ? নিশ্চয়ই ঐ বিদ্যুৎ দেখিযা। আবাব অন্ধকাব ঘনাইয়া আসিল। তাব পব কেমন যেন একটা তীব্র বিকট আলোব বন্যাব মধ্যে সে তলাইযা গেল। তাহাব চোখেব সামনে একটা

গাছ—তাহার সমস্ত শাখাগুলি এক মুহূর্ত্তে গলা রূপার মত সাদা হইয়া উঠিল—তাহার পরেই আস্তে আস্তে কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত; তার পরেই অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে ডেভ্ ডুবিয়া গেল। নানান রঙের চরকি তাহার চোখের সামনে আলোর ফুল্কি ছিটাইয়া ঘুরিতে লাগিল—ঘোরার শব্দ যেন তাহার কানে আসিয়া লাগিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া জমিয়াছে। উঃ, এই বুঝি ফট্ করিয়া মাথা ফাটিয়া গেল—রক্তে তাহার সমস্ত চোখ মুখ ভিজিয়া গিয়াছে। কই না? রক্ত ত এত ঠাণ্ডা হয় না। বোধহয় বৃষ্টি। হাঁ, তাই ত। তবে ঝড় ত এখনও থামে নাই—কিন্তু কমিয়াছে, নইলে সে ডুবিয়া যাইত।

উঃ, ভগবান। রক্ষা করো। আর ত পারি না। কোথায় সে? খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া ভেজা ঝোপের ভিতর হইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল—দেখিল তখন পর্য্যন্ত সে অক্ষত। আকাশ নির্ম্মেঘ, বৃষ্টি অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে—বৃষ্টি-ধৌত প্রকৃতি সূর্য্যের কিরণে হাসিতেছে। ঝড়ের অবসানে পাখীরা আনন্দে দিশাহারা হইয়া গাহিতেছে। একটু শ্রান্ত! কিন্তু মনে তাহার কোনও অবসাদ নাই; চলিতে চলিতে সে লুপ্ত শক্তি যেন অনেকটা ফিরিয়া পাইল। তাহার সম্মুখে একটা পাখী হঠাৎ আকাশে উঠিয়া তাহার আনন্দের প্লাবনে সারা আকাশকে যেন ডুবাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িল—ডেজী।

ঝড় তাহার ক্রোধ নিশ্চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। ধীর সমাহিত চিত্তে তাহার আত্মবিস্মৃতির কথা ভাবিতে বসিয়া সে লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। ডেজীর কি হইল। হয়ত ঝড়ে অজ্ঞান হইয়া কোথায় পড়িয়া আছে। হয়ত ভয়ে জাগিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া পালাইতে গিয়া তার মাথায় · না, এ অসম্ভব। নতজানু হইয়া ডেভ্ ডেজীর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

"ভগবান। তুমি এ অযোগ্য সন্তানের প্রাণ ত রক্ষা করিয়াছ। সন্তান কিসে—এই পশুর। যে স্ত্রীলোককে আঘাত করিতে পারে—তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে সে পশু না ত কি?—এই পশুর প্রাণ রাখিয়াছ, ডেজীকে বাঁচাও। তুমি ত জান ডেজী আমার কি। সেই ডেজীকে আমি নিজের হাতে হত্যা করিলাম।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে ডেজীর বাড়ীর দিকে ছুটিল। নিশ্চয়ই তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল। সে কি না ডেজীর অনিন্দ্য শিশুমনকে অমন করিয়া আঘাত করিয়াছে। ডেজী তাহাকে এত ভালবাসে যে সে চাহিলে, এমন কি আছে যাহা ডেজী দিতে পারে

না? সে চলিয়া আসিলে তাহাব মবা মাব কথা ডেজীব মনে পড়ে। তাহাব মা তাহাকে কি বলিযা গিয়াছিল—সে তখন এত ছোট সব কথা ভাল কবিয়া বুঝিতে পাবে নাই—তাই তাব মৃত মাতাব স্মৃতি পাছে অপমানিত হয়, পাছে না জানিযা সে তাহাব মাব অনভিপ্রেত কিছু কবিয়া বসে, তাই ত তাব অত সংশয়। ডেভী চোখ বুজিযা ডেজীব মাব মৃত্যু-শয্যাব ছবিব উপবে একবাব চোখ বুলাইযা লইল। বিশীর্ণ আসন্নমৃত্যু বোগী, একটী কিশোবী সজলনেত্রে তাহাব পাশে বসিযা মাতাব প্রত্যেকটী অনুযোগ বুঝিবাব চেষ্টা কবিতেছে। "হাঁ মা, যা বলছ তাই হবে ; না, তা কখনও কববো না।" সে কেমন কবিযা অমন অন্ধ হইয়াছিল? ডেজী বাঁচিয়া আছে ত? ভগবান শুধু তাহাকে বাঁচাইয়া বাখ, আমাব পাপেব জন্য তাহাকে শাস্তি দিও না। শুধু যদি ডেজী বাঁচিযা থাকে, তাকে কত সোহাগই না করিবে—ভাবিতে ভাবিতে ডেভ্ ডেজীব বাডীব দিকে চলিল।

ঝড় বন্ধ হওযাব ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডেজী আবাব ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতে বাহিবে আসিযাছে। হঠাৎ দেখে টলিতে টলিতে ডেভ্ তাহাব দিকেই আসিতেছে। অধীব আগ্রহে ছুটিযা আসিয়া ডেজী তাহাব হাত ধবিযা ফেলিল। নইলে ডেভ্ সেখানেই পডিয়া যাইত।

"ছিঃ ডেভী। এঃ একেবাবে ভিজে গেছ যে। অসুখ না কবে শেষে। এই সব ঝড়টা মাথার উপব দিয়ে গেছে ত? চল এখন, ঢেব হয়েছে বাডীব মধ্যে গিয়ে কাপড় চোপড ছেড়ে ফেলবে এস।"

শুষ্কমুখ ডেজীব দিকে তুলিযা ডেভ্ নতজানু হইযা বসিযা পডিল। "ভগবান, তোমাব চবণে কোটী কোটী প্রণাম। যাক্ ডেজী তুমি ত ভাল আছ।"

ডেজী একটু অবাক হইয়া ডেভেব দিকে চাহিল। ডেভ্ বলিল, "তোমাব লাগেনি ত? ঝড়েব মধ্যে বাইবে ছিলে না ত?" "ঝড়ের মধ্যে? না গো না, জান, বৃষ্টি আসাব আগেই আমাব কাপড়গুলো তোলা হযে গিয়েছিল।"

"সত্যি ডেজী লক্ষ্মীটী বলো, তোমাব নিশ্চয় খুব লেগেছিল—সেই আমি যখন তোমায় ছুঁডে ফেলে দিলুম।"

"দুব।" বলিয়াই ডেজী হঠাৎ গম্ভীব হইয়া উঠিল। ডেভ্‌কে ধরিয়া চড়াই উঠিতে উঠিতে বলিল, "ডেভ্, আমি আব তোমায কখ্খনও বিরক্ত করব না। তোমায বড্ড চটিযেছিলুল—না? আর কখ্খনও অমন হবে না।"

ডেভ্‌কে ধরিয়া রান্নাঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ডেজী তাহাকে উনুনের কাছে বসাইল। ডেজী রান্নাঘরের সিঁড়ির কাছে যাইতেছে, এমন সময় নেহাৎ সুবোধ বালকের মত ডেভ্‌ বলিল, "ডেজী, এই সমস্ত বৃষ্টিটা আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে। জান, আমি প্রায় ডুবে গিয়েছিলুম—আর আমার চোখের সামনে একটা গাছের উপর যা বাজ পড়ল।"

ঘাড় ফিরাইয়া ডেভের দিকে চাহিয়া ডেজী বলিল, "ওঃ, যা দুর্য্যোগ।"

একা একা বসিয়া অবসাদে ডেভের শরীর যেন ভরিয়া আসিল। সে আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল—বোকার মত। ঝড় তাহার মন হইতে সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত প্রবল অনুভূতি নিশ্চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার মনের ব্যথা ডেজীকে কেমন করিয়া বুঝাইবে—ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। তাহাকে দেখিয়াই কেন ডেজী বুঝিতে পারিতেছে না, সে কত অনুতপ্ত। বোঝাইবার ক্ষমতা যে এখন তাহার নাই। যাক ডেজী ভাল আছে। এটাই কি কম কথা। ডেজীকে তবে মারিয়া ফেলে নাই—ভগবানের কম দয়া।

উপরের ঘরের মধ্য দিয়া ডেজী সিঁড়ির কাছে আসিল। তাহার পর ডেজীর ছোট দু'খানি পা, ক্রমে ডেজীর হাতে এক বোঝা কাপড়, সব শেষে ছোট একখানি মুখ, পরিশ্রমের রক্তিম আভা মাখা।

হাসিতে হাসিতে ডেজী বলিল, "এই নাও কাপড়—বাবার—হাঁ তোমার গায়ে হবে। ও বাবার কথা ভাবছ? নিশ্চয়ই মেরিভেলে আটকে গেছে। হাঁ গো হাঁ বাবা নিজের শরীর বাঁচাতে জানে—সবাই তোমার মত বোকা নয়।"

খপ্‌ করিয়া ডেজীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া যেন শেষবারের মত নিজের কথা বোঝাইতে চাহিতেছে এই ভাবে ডেভ্‌ বলিল, "ডেজী শোন। সমস্ত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে—আমি পড়ে যাই—প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম—আমার দু হাত দূরে একটা গাছ বাজে পুড়ে গেল।"

"ষাট ষাট। তা এখন ওঠ। ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল।"

"ডেজী, যখন আমার জ্ঞান হল—যখন দেখলাম আমি বেঁচে আছি, আমার ভয় হল—ভয়ঙ্কর ভয় হল তুমি ঝড়ে বাইরে পড়ে আছ—বেঁচে নেই—হয়ত আমিই তোমায় মেরে ফেলেছি।"

নাঃ, ডেজী শুনিতেছে না। শোনার দিকে তাহার মন ছিল না, তাহার দৃষ্টি তখন ঘরের ভিতর কাপড়ের আলমারির দিকে নিবদ্ধ।

"কি বোকা তুমি। তোমার ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই?" সে সহাস্যে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "বৃষ্টির অনেক আগে আমি ঘরে এসেছি।

তুমি সেই চলে যাওয়াব পবেই আমি ভিজে কাপড়গুলো নিয়ে ঘরেব মধ্যে ঢুকলুম। কি যে দেবী কবছ। ওঠই নি। লক্ষ্মীটী ওঠ শীগ্‌গীব। যাও কাপড় ছেড়ে এস। তাব পর তোমায় বেশ এক গেলাস গরম ওষুধ খাইয়ে দেব, তা হলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না।"

আব একবাব তাড়াতাড়ি কবিতে তাগিদ দিযা ডেজী অন্তর্দ্ধান করিল।

কি আব কবা। ডেজী বুঝিবে না—কোনও দিনই বুঝিবে না। ডেভেব মনেব মধ্যে যে বেদনাব আগুন জ্বলিযা উঠিয়াছিল তাহাব আঁচটুকুও ডেজীব গাযে লাগে নাই। তবুও একথা ত অস্বীকাব করিবাব উপায নাই যে সে ডেজীব প্রতি দুর্ব্ব্যবহার কবিয়াছে। আব কখনও তাহাকে আঘাত কবা চলিবে না। হযত সব মেযেবই কল্পনাশক্তিব দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। দয়িতের কাছে তাহাবা হয়ত এই বকম হাসিমুখেই সব কিছু গ্রহণ কবে—নিষ্ঠুবতা, নির্য্যাতন পর্য্যন্ত। হয়ত—

ভিজা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ডেভ্ বুঝিতে পাবিল ঝড়ে তাহাব মন হইতে সংশয় ও বিবক্তিব বিবাট বোঝা উড়াইযা লইয়া গেলেও ডেজীব সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই বহিযা গেল।

শ্রীদিলীপকুমাব সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

ভীরু

জানিনা সাঁতার ডুবিবার ভয়ে মরি,
তবু জাগে সাধ ডুবিতে সাগরে : কত কল্পনা করি,
—অতল পরশে কি আছে তোমার,
কতনা মুকুতা-মণি-সম্ভার !
কূলে তব একা আসি'
দেখেছি উদয়-অস্ত-শোণিমা, চাঁদের অমল হাসি
বিম্বিত তব তরল মুকুর 'পরে,
দেখেছি আমার ছায়া লয়ে খেলা করে
উছল তটের উৎসুক ঢেউগুলি।
মজ্জন-ভয় ভুলি'
গহনে তোমার গাহন লাগিয়া ঝাঁপায়ে পড়িতে গিয়া,
তুষার-শীতল পরশনে শিহরিয়া,
ত্রস্ত চরণে ফিরিয়া এসেছি তীরে,
ভেসেছি অশ্রুনীরে ॥

তরণী বাহিয়া খুঁজিয়াছি পরপার,
যতদূরে যাই তত মনে হয় দিশা নাই সীমানার।
ভরা পালে আমি চলেছি ভাসিয়া,
কল কৌতুকে উঠেছে হাসিয়া .
উজানে বাহিয়া শেষে
দুরু দুরু হিয়া হয়েছে শান্ত নিরাপদ কূলে এসে।
ঢেউ পরে ঢেউ ভেঙে পড়ে সিকতায়,
জানি তারা টানি তোমার গভীরে আমারে ডুবাতে চায়।
ফেনিলোচ্ছল তুহিনপরশা বারি
কেন হেন মনোহারী ?
বিভীষিকা ভরা মৃত্যুপসরা ধরিছে কি বুকে তার
মোর তরে গাঁথা তোমার রতনহার ?
আমি নিশিদিন আহ্বান তব শুনি.
স্বপনের জাল বুনি ॥

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

যাত্রা

অমাবস্যা-তমিস্রাবে দুইহাতে ঠেলি' ঠেলি' কোথা
ভাবাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসেব মাঝে পথ করি'
চলিয়াছ সঙ্গহীন কি উদ্দেশে কঠিন যাত্রায় ?
নাহি ভয় বজনীব, বিজনেব, পৃথিবীব, আঁধাবেব মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নাহি তব হৃদয় আমাব ?
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, জীবনেব নাহিকো ঠিকানা,
জনশূন্য সিক্তবালু সৈকত উপরি
চলিযাছ স্থিবদৃষ্টি একা।
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, শুধু আছে আকাশছডানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুব ক্রূব হাসি আঁধাবেব,
জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেছে আঁধাবেব দুর্দ্দম জোযাবে,
বেলাভূমি স্তব্ধ বাত্রি-আঁধাবেব উদ্দামপ্রণযে,
নিঃশ্বাস রুধিছে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তাব মাঝে ব্যগ্রবাহু, প্রিয মোব, চলিয়াছ কোথা ?
কোন্ নাবী কি ঐশ্বর্য্যভাব
ছিনিয়া লইবে বলো বলীয়ান্ দুই বাহু দিযা।
কোন্ দেশ লক্ষ্য তব অভিনব এ জয়যাত্রাব,
পৃথিবীব, বিধাতাব সমুদ্যত বজ্রেব সন্ধান
তোমাবো যাত্রাব সাথে সাথে ধায, সেই সত্য জানো ?
তুমি শোনো নাই বুঝি গায়ত্রীব গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সঙ্কটেব তীব্র আর্ত্তনাদ
দিবাবাত্রি বিশ্বামিত্র একাকী কবিছে ?
ভুলিয়াছ বুঝি, বন্ধু, নব নব পথেব নির্ম্মাণে
পথ কভু হয়নাকো শেষ ?
পৃথিবীতে কোনো পথ আজো কভু হযেছে কি শেষ ?
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব অমাবস্যা-তমিস্রাবে ঠেলি',
দূবে দূবে ফেলি' কালো হিংস্র সাগরে
—শ্যেনকপোতেব প্রেম-কূজনেমুখব কোনো নব অলকায় নহে—
নিয়ে' যাবে বলো কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে।
মিনতি আমাব
যাত্রা করো রোধ
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে

যাত্রা কভু যাবে না থমকি'।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
হেরে নাই এখেনি বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে' যাক্ রাবণের চিতা।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন ক্রূর কালো মদমত্ত সাগরের দীর্ঘ এই পারে ?
ডিয়োটিমা, বলো তো বন্ধুরে।
তাই বলি আমার মিনতি
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

শ্রীবিষ্ণু দে

ভোর

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছো এসে ঘুমেল চোখে
নরম ভোরে ?
ছাখোনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শিখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা ?
ঘুমিয়ে রয়েছো, কতবার এল এমন ভোর
এমন আলো !—
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে
বনের ফটিক ঝর্ণা তলে।
আফ্রোদিতির লঘু আনাগোনা বনের ধারে
শুননি বুঝি ?—
পাপ্ড়ি-হাতের নরম ছোঁয়ায় চম্‌কে উঠে'
অ্যাডোনিস্ হাসে ভোরের মতো।
এম্নি ভোরেই তেপান্তরের মাঠের শেষে
গহন বনে
রাজকন্যার ঘন কালো চুল মেঘের মতো
রাজপুত্রের স্বপনে আসে।
এম্নি ভোরেই আসে একদিন ফুলের কথা
হাওয়ায় ভেসে :—
"মোর সাত ভাই চম্পা জেগেছ ? হয়েছে ভোর"
ঘুম হ'তে জেগে পারুল ডাকে।

আবো কত কথা রূপালী বকেব মালাব মতো
আকাশে দোলে ;
আকাশেব সেই স্বপ্নবা মবা মাটিব সনে
মিশে আছে এই নরম ভোবে।

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমরা কবিতা লিখি

(মার্কিন কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ লিখিত We Write কবিতা হইতে)

আমবা কবিতা লিখি, বিধাতাব শুভ্র আশীর্ব্বাদ
মোদেব লেখনী-মুখে অর্পিয়াছে অন্তহীন প্রাণ ,
মর্ত্ত্যেব মানুষ মোবা শুনি তাই অমর্ত্ত্য আহ্বান,
কল্পনাব পাখা মেলে উড়ে যাই উন্মুক্ত অবাধ !
প্রত্যহেব ধূলি-লিপ্ত বিষ-তিক্ত গ্লানি, অপমান,
জীবনেবে কবে যবে পলে পলে বিকৃত বিস্বাদ,
আমবা আনিয়া দিই ক্ষণিকেব আনন্দ-সংবাদ,
ছন্দোবদ্ধ গান।

আমবা সৌন্দর্য্য-লিপ্সু পৃথিবীবে মোবা বাসি ভালো—
দিগন্ত-প্রসাবী মাঠ, নির্ম্মেঘ উদার নীলাকাশ,
প্রশান্ত নদীব ধাবা, অকুণ্ঠিত স্বচ্ছন্দ বাতাস,
নিশাব সীমন্ত-প্রান্তে অর্দ্ধস্ফুট নক্ষত্রেব আলো ,
প্রথম পবশ-হৃতা কিশোবীব ভীরু ভ্রূ-বিলাস
আমবা লুকাযে দেখি, ভালোবাসি বেণী মেঘ-কালো,
মোদেব বেপথু বক্ষে অতর্কিতে ঘনায ঘোবালো,
ভাবাতুব শ্বাস।

তা ব'লে বধিব নই, কানে মোবা শুনি দিনবাত
ধ্বনিছে চৌদিক হ'তে ধবণীব আর্ত্ত ক্লিষ্ট বোল ,
জীবন-দোলায় নিত্য মবণেব উচ্চকিত দোল
আমবা জানিতে পাবি ; দাব-দগ্ধ নির্ম্মম আঘাত,
দুঃসহ তবঙ্গ-ভঙ্গে তটে তটে তুলিয়া কল্লোল
ভঙ্গুব সঞ্চয় যত অসঙ্কোচে কবে আত্মসাৎ ,—
তবু ত বজনী শেষে ডাকে আসি আসন্ন প্রভাত,
'খোল্ দ্বাব খোল্'।

তনুব লাবণ্য হেবে মোবা হই উন্মাদ-বিহ্বল ,
জানি তবু বক্ত-মাংস, মেদ-মজ্জা, কদর্য্য কুৎসিত
আছে তার অন্তবালে ; কুসুমেব সঙ্কীর্ণ সম্বিৎ
জানি ক্ষুদ্র পতঙ্গেব ক্ষুদ্রতব ক্ষুধার সম্বল ;
মূর্চ্ছাতুব হৃৎ-তন্ত্রী, ভয়-ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ চকিত,
সম্মুখে নিবিড় কালো, পায়ে পায়ে প্রহত উপল—
তবু এ ধবণী পানে চেয়ে চেয়ে চোখে আসে জল,
কণ্ঠে জাগে গীত !

জানি বন্ধু জানি মোবা, এ ধবণী নয় চিবন্তন,
তুমি-আমি তুচ্ছ কথা , সবি হবে নিঃশেষে নিলয়,
স্তব্ধ হবে চবাচব, মহাব্যোমে ব্যাপিবে প্রলয়,
বিস্মৃতি-পাণ্ডুব হবে আজিকাব উদগ্র যৌবন !
তবু এ দেহেব প্রান্তে যতদিন প্রাণ-বন্ধ বয়,
ক্ষণিক খেলেনা ল'যে বচি মোবা অনন্ত স্বপন—
অফুবন্ত গীত-গন্ধে আমাদেব নিজস্ব ভুবন
চিব প্রাণময় !

ছন্দেব শৃঙ্খলে মোবা বেঁধেছি সময়েব গতি,
গ'ড়েছি চিন্ময় বিশ্ব বিস্মৃতিব বাবিধি-বেলায় ,
নশ্বব শূন্যতা শুধু বাহু মেলে ডাকে 'আয' 'আয়',
সৃষ্টিব আনন্দে মোবা ফিবে নাহি চাই তাব প্রতি !
মোদেব সঙ্গীত-বেশ কেঁপে কেঁপে তাবায তাবায়,
লোক হ'তে লোকান্তবে ছুটে চলে ত্রস্ত লঘুগতি—
ভবিষ্যেব স্বপ্ন মোবা, অনাগত জানাবে প্রণতি
আমাদেব পায় ।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জযন্তী

(হান্‌স্‌ কাবোসা-কৃত 'রুমেনিয়ান্‌ ডাযাবি'-ব অন্তস্থ কবিতাব ভাবানুবাদ)

কিশভেব ঊর্দ্ধ চূড়ে কণ্টকিত তুষাব-শয়নে
প্রাণ-বিনিময়ে যাবা অবশেষে লভিলো বিবাম,
তাদেব সমাধিস্তূপ এসো বচি প্রস্তব-চয়নে,
অনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভে এসো লিখি তাহাদেব নাম ।

করেনি আক্ষেপ তারা, চাহে নাই অগ্রে বা পশ্চাতে,
মাগেনি বিবৃতি, আজ্ঞা করিয়াছে নীরবে পালন,
বিদেশের বন্ধ্যা মাটি সিঞ্চি বৃথা হৃদিরক্তপাতে
উপেক্ষার রন্ধ্রে তারা ঢেলে দেছে অখ্যাত জীবন ॥

কোথা এ-ধ্বংসের শেষ ? দিশাহারা মানুষের আঁখি।
অন্ধকার ভবিতব্যে সাবধান, বন্ধু, সাবধান !
যদি দেখো মুমূর্ষুরে, বোলো তারে নম্র কণ্ঠে ডাকি,
যেন সে হিংসার স্পর্শে মৃত্যুর করেনা অপমান।
বোলো তারে শ্রদ্ধাভরে, সে মোদের সবার অগ্রণী ;
বিলুপ্তির ধূলিপথে আমরাও অনুযাত্রি তার।
তার পরে জুনিপারে বিরচিয়া শবপ্রাবরণী,
কোরো, বন্ধু, ধ্রুব পদে, কোরো, বন্ধু, তার অনুসার ॥

কিন্তু যদি ভাগ্যগুণে হেথা হতে পারো ফিরিবারে,
উন্নিদ্র প্রহরী তব থাকে যেন সতত জাগর ,
বিধাতা অচেনা কণ্ঠে ডাকে যদি কখনো তোমারে,
আলস্যের অন্যমনে কোরোনা তাহারে অনাদর।
ভুলোনা তোমার পন্থা নিরন্তর সঙ্কীর্ণ বন্ধুর,
তোমার সুদীর্ঘ বেলা পরিশ্রান্ত শত সাধনায়,
তাহাতে উৎসব নাই, নাই তাহে উল্লাসের সুর,
সন্ত্রস্ত বিশ্রাম তব শৃঙ্গচারী ছাগলের প্রায় ॥

নির্ম্মদ সত্যের বরে চিত্ত তব রহে যেন শুচি।
মিথ্যার দুরভিসন্ধি জাতিদের করেছে পাগল ;
জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বাপিত , সমস্ত অর্গল গেছে ঘুচি,
অবাধে বিহরে বিশ্বে নিশাচর পিশাচের দল।
মোদের শ্রান্তির পরে চক্রচর চর্ম্মচটীসম
নির্ব্বাক নৈরাশ্য আজি ফিরে সদা নিঃশব্দ সঞ্চারে ,
এ-পক্ষী পতত্রহীন অনপত্য জ্বলন্ত নির্ম্মম.
আপনি সে দুঃশাসন, কিন্তু সবে প্রণমে তাহারে।
শিশুর স্মরণ হতে মুছে আজি চোখের নিমেষে
যুগান্তসাধনধন প্রত্যাদেশ আপ্তবাক্যগুলি।
সর্ব্বভুক বুভুক্ষায় নবকীয় দ্রোণকাক এসে,
দেউল উজাড় করে শ্রুতিস্মৃতি লয়ে যায় তুলি।

হয়তো সমাপ্ত লগ্ন, বৃথা ওই অর্ঘ উপচাব ;
বিদীর্ণ মন্দিবকূট ভেঙে পড়ে সন্তপ্তের পবে ,
ভগ্ন সেতু দীপ্যমান , উদ্বেলিয়া উঠে পারাবাব ;
লুপ্ত তীর্থযাত্রাপথ , স্তবস্তুতি শূন্যে কেঁদে মবে ।
উদ্বাস্তু আজিকে আত্মা, নিজগৃহে নাই তার স্থান ;
অন্তবতমেব দ্বাব শৈবালিত, নাই সেথা ভীড ।
মন আজি হিমায়িত, হিমচাবী মৎস্যেব সমান
বিকল বাসনাবাশি, পঙ্গু আশা, চেতনা নিবিড ॥

যদি কোনো সুলগনে পাবো বন্ধু ফিবিবাবে ঘবে,
দেখো যেন প্রহরায কখনো না-আসে অবসাদ ;
স্বার্থেব ভঙ্গুব স্বপ্ন উপাড়িযা ফেলো দৃঢ় কবে ;
নিষ্কলঙ্ক বিস্মবণে ঢেকে দিও এ-চণ্ড প্রমাদ ,
আপনাবে ঘিবে বেখো স্বয়ন্তব শৃঙ্খলাব পাকে ,
অন্তবে হোমাগ্নি জ্বেলো নিরুদ্দেশ দেবতাব তবে ,
নিত্য কবো প্রদক্ষিণ তিনবাব সে-নাচিকেতাকে ,
প্রিযাব সান্নিধ্য, বন্ধু, ইচ্ছা হলে খুঁজো তাব পবে ॥

ধন্য সে, যে পাবে পাখা প্রসারিতে কালেব গহনে ,
অনিষ্টেব মুষ্টি হতে, কেড়ে আনে সে গূঢ় কল্যাণ ;
লঙ্ঘে সে প্রলয়সিন্ধু ; মুক্তিব সানন্দ সন্ধিক্ষণে
অচেনা উতল ছন্দে তাব কাছে কবে আত্মদান ।
জগতেব গোষ্ঠীপতি, জন্মমৃত্যু-অতিক্রান্ত ববি,
তাব দীপ্তি, তাব তেজ জ্বলেনা কি আমাদেব মাঝে ?
অতীত স্নেহেব স্মৃতি, বর্ত্তমান করুণাব ছবি
উদ্বায়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে, দেখোনি কি, নিয়ত বিবাজে ?
তাবায তাবায় কাঁপে আমাদেব চিবন্তন প্রাণ,
সপ্ত সিন্ধু বিচঞ্চল সে-প্রাণেব অমৃত পবশে,
সে-প্রাণেব উপাদানে নির্ম্মিত স্বয়ং ভগবান,
সৃষ্টিব অবেদ্য বার্ত্তা পবিপ্লুত তাহাব হবষে ॥

চিবসুন্দরেব দূত, নামো তবে গিবিশীর্ষ হতে
মৃত ভাবীকথকেবে, মেঘার্ত্ত শ্যেনেবে পরিহবি ।
তোমাব প্রেমেব জ্যোতি ব্যক্ত হোক তমিস্র জগতে,
আত্মীযেব প্রতীক্ষায তব বাণী উঠুক গুঞ্জবি ।

হযনি সৎকাব যাব, উজ্জীবিত হবে সে কেমনে ?
ফিবে চাও, ক্ষেমঙ্কব, লগ্ন আজো হযনি অতীত ,
চূর্ণ যে-মনুষ্যমূর্ত্তি মিশে আছে স্তব্ধ ধূলিসনে,
নবীন বেদীব মূলে কবো তাবে পুনশ্চ প্রোথিত।
নহে তো অপবিচিত তুমি কবো যে-সত্য প্রচাব ;
ইতিমধ্যে বাবম্বাব অগ্নিদীক্ষা দিযেছো নিষ্ঠুব।
যে-সন্দিগ্ধ সীমাসন্ধি মাপে বাজ্য আলোব, ছাযাব,
সেখানে মোদেব কানে হানো তব আগমনীসুব।
বিশুদ্ধ চৈতন্য জাগে জডবক্ষে সে-শিব সঙ্গীতে ;
তোমাব প্রসন্ন দৃষ্টি আনে বিশ্বে অমর্ত্ত্য বিপ্লব ;
তব ইন্দ্রজালে পাশ পবিণত অধবা-বশ্মিতে,
জেতাবে শেখায বন্দী লাঞ্ছনাব দুৰূহ গৌবব ॥

কিন্তু যে প্রথাব জালে বদ্ধমূল অনীহ পাতালে,
কুডায়ে উচ্ছিষ্ট কণা কাটে যাব অনুবৃত্ত দিন,
কবো তাবে আবিষ্কাব গতক্লম তুষ্টিব আড়ালে,
ধবো ওষ্ঠে সুধা বিষ, কবো তাবে ভয়ভ্রান্তিহীন।
দাও তাবে শক্তি দাও, মিতব্যয়ী ধবণীবে জিনে
সে যেন আহবি আনে জীবনেব অজস্র বৈভব ;
আপন দক্ষিণা যেন আপনি সে নিতে পাবে চিনে,
বহেনা গ্রহণে তাব যেন কভু লোভের সংস্রব।
যেন সে নিষ্কুণ্ঠচিত্তে দিতে পাবে উদাব আহুতি
প্রথম সঞ্চযটুকু চিবন্তন হোমাগ্নিব পুটে ;
থাকেনা অভুক্ত যেন অভ্রংলিহ আত্মাব আকুতি ;
অমৃতেব দানসত্রে নিত্য যেন বিত্ত ভবে উঠে ॥

প্রাচীন পথিকসম নির্দ্দেশক চিহ্ন দিও আঁকি
অনুগেব তবে, বন্ধু, বালু-হিম-বল্কল-প্রস্তবে ;
পথে যদি মৃত্যু ঘটে, অন্তকালে বিহঙ্গমে ডাকি
মৈত্রীব কুহকলিপি লিখে যেও শুভ্র পক্ষপবে।
কিশভের ঊর্দ্ধ চূডে কণ্টকিত তুষাবশয়নে
গতাসু বীবের তবে, এসো, তবে কীর্ত্তিস্তম্ভ গডি ;
যাহাবা মাগেনি ক্ষান্তি, ঝাঁপ দেছে অমোঘ মবণে,
তাদেব মহার্ঘ্য নাম, এসো, বন্ধু, জপমন্ত্র কবি ॥

রুমানীব গিবিশ্রেণী মুহ্যমান শীতেব কবলে,
গগনে গগনে কিন্তু বসন্তেব অপূর্ব্ব বিলাস ;
ভূর্জ্জবৃক্ষ জবাশীর্ণ, তবু ছিন্ন কাণ্ডেব ফাটলে
ইঙ্গিতিছে ক্ষণে ক্ষণে নূতনেব বজত প্রকাশ।
উধাও ঝঞ্ঝাব মুখে বৃন্তচ্যুত পত্রেব সমান
মোবা আজ বিতাডিত বার্ত্তাহীন প্রান্তবে প্রান্তবে,
না-জানি অদৃষ্টলিপি, কোথা হবে যাত্রা-অবসান,
অঙ্কুবিবে কোন বীজ এ-সর্ব্বনাশেরে ধন্য কবে !

নক্ষত্রেব কণাসম সংগ্রথিত শ্রদ্ধাব সঞ্চয়
ববে দীপ্র অহবহ, বিচ্ছুবিবে নিষ্কম্প্র আলোকে ,
হয়তো বা যুগান্তবে একদা সে-অমব প্রত্যয়
হানা দিবে অকস্মাৎ ঘনীভূত হৃদযগোলকে ঃ
যদিও সে-অভ্যাঘাতে নাহি গলে তুষাব-স্ফটিক,
তথাপি চিত্রল ছটা কীর্ণ হবে সে-ন্যুব্জ দর্পণে ,
স্পর্শে তাব উদ্ভাসিবে দূবান্তবে অন্য কোনো দিক,
জাগিবে নবীন বহ্নি পুবাতনী পৃথিবীব মনে ॥

ক্ষযিষ্ণু শবেব স্তূপে পবিপূর্ণ কিশভেব চূড়া,
বিস্মৃত বিজয়মাল্য, লৌহমল অসিব ফলকে ;
কিন্তু আজি পুনর্ব্বাব মিষ্ট লাগে বিষতিক্ত সুবা,
মানুষ উৎসবমত্ত অনাবিল প্রেমেব পুলকে।
আবণ্যিক লালসাব উচ্ছৃঙ্খল উত্তবাধিকাব
দীর্ণা চীর্ণা বসুধাবে কবিয়াছে আবাব উর্ব্বরা।
এসেছে পবম মুক্তি, অন্ধকূপ হলো ছাবখাব,
উড্ডীন মানব-আত্মা সন্ধানিছে অচিন্ত্য অমবা।
নিঃসৃত রুধিব হতে স্বসমুত্থ, বক্তবীজসম,
অভয়জয়ন্তীবাহী তরুণেব অক্ষয বাহিনী,
প্রাচীন অনুজ্ঞা যত পবিণত গানে অনুপম,
আজি সাধ্য অসম্ভব, সিদ্ধ আজি পুবাণকাহিনী ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

কৃষ্ণরাও—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)।

মানুষের গল্প শোনার প্রথম যুগে হয়েচে রূপকথার সৃষ্টি। রূপকথা বলতে বোঝায় চেহারাওয়ালা গল্প। মনে হওয়া চাই,—ঠিক যেন দেখতে পাচ্চি। ঐ দেখতে পাওয়াটাই আসল কথা, তার বেশি আর দাবী নেই। গল্পটার প্রমাণ কল্পনায়, যুক্তিতে নয়। কথার সত্য যুগ তখন, অর্থাৎ সত্যকে সেকালে অন্য সাক্ষ্য খুঁজতে হোত না, তার আপনার সাক্ষ্য আপনাতেই। যে সংসারটাকে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়, সম্ভবপরতার দরকার তার আগাগোড়া। তার মধ্যে সৃষ্টিছাড়ার হঠাৎ আবির্ভাবকে কেউ ক্ষমা করে না। রূপকথায় ব্যবহারের বেড়া ডিঙিয়ে সৃষ্টিছাড়ার মহলেই মানুষের চড়ুইভাতি।

সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার পর্ব্বে একটা ছিল প্রাক্‌প্রাকৃতিক যুগ। তখন বিধাতার সৃষ্ট যে প্রাকৃত জগতে মানুষের ব্যবহার ছিল নিয়মে বদ্ধ, তার থেকে নিজের সৃষ্ট অপ্রাকৃত জগতে ব্যবহারের শাসন থেকে নিত সে ছুটি। তখন মানুষের মনের পক্ষে এই ছুটির একান্ত দরকার ছিল। কেননা কঠোর ছিল তার জীবিকার দাবী, সঙ্কীর্ণ ছিল তার ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট সংসার। সেই অবস্থায় সে হাঁপ ছাড়তে চেয়েচে, সেই কল্পলোকে যেখানে যা খুসি তাই হতে পারে।

কিন্তু সংসারেই ঘটুক—গল্পেই ঘটুক—ঘটনামাত্রেরই একটা অভিজ্ঞানপত্রের দরকার আছে, তাকে নিঃসংশয় সত্যের প্রমাণ আনতে হবে। এই নিঃসংশয়তার প্রমাণ প্রাকৃতজগতে একরকম গল্পজগতে আরএক রকম। প্রাকৃতজগতে যে সঙ্গতি তার থাকা চাই সেটা নিয়মের, আর গল্প-জগতে সেটা রূপের। আরব্য উপন্যাস সংসারের নিয়মকে একেবারেই মানলে না কিন্তু রূপ-সঙ্গতিকে তার মানতে হয়েচে। এমন করে তাকে গড়তে হয়েচে গল্প, যে মনে হয়েচে যে দেখতে পাচ্চি। প্রতিদিনের যে দৈনিক জগৎটা সর্ব্বদাই মানুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে তার থেকে দূরে যাবার জন্যেই সেদিন মানুষ বলেচে গল্প বলো। আজ পূজোর ছুটি হলে টাইম টেব্‌ল্ খুলে বসি, ভাবতে থাকি যাব চিতোরে না উটকামণ্ডে, পেশোয়ারে না কন্যাকুমারিকায়। চিন্তাও করিনে হাড়কাটা থেকে যাব কি বাণীমুদির গলিতে। প্রয়োজনের তাগিদে বাসা বদলাবার সময় সে তর্ক ওঠে। কিন্তু ছুটির সময় আমরা খুঁজি দূরকে, অনভ্যস্তকে। গল্প জিনিষটার সুরু হয়েচে ছুটির আয়োজন নিয়ে।

ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে রোমান্স্, যেটা আমাদের রূপকথার সমশ্রেণীর। রাজা আর্থারের কাহিনী হোলো রোমান্স্। ঘরের বাঁধা বরাদ্দ থেকে অঘটন ঘটনের মধ্যে বেরিয়ে পড়বার ফিকির। সেখানকার মাপকাঠি সংসারের গজের মাপকে একেবারে মানে না। খুসি হয় মন সেই জন্যেই, প্রচলিত হিসেব মিলিয়ে চলতে হয় না, জবাবদিহি নেই প্রাত্যহিক প্রয়োজন-বিধাতার কাছে।

শকুন্তলা হোলো রোমান্স্, বইখানা যে পড়ে, নাটকখানা যে দেখে সে নেয় ছুটি। চলে যায় দূরে। এই সব সাহিত্য মানুষের ঘরের মধ্যে দূরকে রচনা করেচে। আশ্বিন মাসে আগ্রায় চিতোরে যাওয়া, আর সার ওয়াল্টর স্কটের নভেল পড়া একজাতের

অধ্যবসায়। আগ্রা চিতোর যেসব স্মৃতির সঙ্গে জড়িত সে হোলো দূরস্মৃতি, তাদের পরিমাপও আমাদের হাটবাজারের মাপের নয়। তাদের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই আপন প্রাকৃত সত্তাকে, কল্পনার পালে দূর ইতিহাসের হাওয়া লাগে, যে হাওয়াতে এককালকার বড়ো বড়ো ওজনের মানুষ তরঙ্গিত প্রবাহে আপন আপন ভাগ্যতরী নিয়ে বাঁচ খেলেচে। কেউ পারে গেছে কেউ তলায়। তখনকার রামায়ণ মহাভারত জাতককথা কাদম্বরী সব কিছুর মধ্যেই ছিল মানুষের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার প্রয়াস।

আজ মানুষ এত বড় ঘোরতর কুণো এবং বুড়ো হয়ে গেছে যে এই ইচ্ছেটা তার একেবারে ঘুচে গেছে তা বলতে পারি নে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম যখন দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা দেখা দিল তখন সমস্ত বাঙালী পাঠকের মন যে কী রকম মাতিয়ে দিল তা এখনকার পাঠকেরা কল্পনা করতে পারবে না। ঘোরো বাঙালী সেদিন হঠাৎ বিপুল পরিমাণে ছুটির রস পেয়েছিল। রস-সাহিত্য মাত্রেই এই ছুটি কোনো না কোনো আকারে আছে।

এখনো মানুষ বলে, গল্প বলো। আজকাল এই গল্পের ভূমিকা প্রধানত বাইরের দিক থেকে ঝুঁকেচে মনের দিকে। সে রাজ্য অতি অপরূপ এবং বিশাল। সেখানেও কত অভাবনীয় নানা সংঘাতে সম্ভাবনীয় হয়ে উঠ্‌চে। কলম্বস যেমন আমেরিকা আবিষ্কার করে ইতিহাসের দিগন্তকে বড়ো করে দিয়েচে, এও তাই। এখানে প্রতিদিন বের হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষেত্র, নতুন নতুন খনি। এই মানস মহাদেশে লেখকদের উপনিবেশীর দল চারিদিক থেকে প্রতিদিন এসে জুটচে। মানুষের মন নিয়ে চষা, খোঁড়া, খোঁজা এর আর অন্ত নেই। এই ঠেলাঠেলির ভিড়ের মধ্যে সেদিনের কথা ভুলেছিলুম যেদিন সারাদিনের কাজের ও খেলার শেষে সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে বলেছিলুম, গল্প বলো।

বাংলা সাহিত্যে এই দূরের কথা ছুটির কথা নেই বললেই হয়, এমন সব কাহিনীর অভাব যার মধ্যে দূরদেশী অজানার রং লেগেচে। তার স্বাদ পাইনে বললেই তার ফরমাস পর্য্যন্ত নেই। অনেক বাঙালীকে দেখেচি বিদেশে, তারা বিদেশের রস পায় না, অত্যন্ত ঘরমুখো তাদের মন। সেখানে যে-ভোজের আসন পাতা তার দিকে সে পিছন ফিরে বসে। বাংলার কথা-সাহিত্য দেখলেই বোঝা যায় বাঙালীর "ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ"।

এমন সময় চারুচন্দ্র দত্তের "কৃষ্ণরাও" বইখানা হাতে এল। লেখক মজলিষি মানুষ, তার উপরে দূরপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় তাঁর স্মৃতি-ভাণ্ডার ভরা। যা দেখেচেন তার মধ্যে সমস্ত মন দিয়ে প্রবেশ করেচেন। বোঝা যায় মারাঠায় তিনি ঘরের লোক ছিলেন। এই ঘরের লোক হবার শক্তি সকলের নেই। যাদের আছে তাদের কথা বলবার শক্তি কম। চারু বাবু বিদেশের লোকসমাজের রস পেয়েচেন এবং গল্পে সে রস দিয়েচেন ঢেলে। তাঁর এই কথাগুলিতে দূর দেশ ও দূর-কালের স্বাদ চমৎকার মিলে গেছে। এ'কেই বলে খাঁটি গল্প। এই রকম গল্প পথিকদের কাছে শোনা যেতে পারে পথের ধারের আসরে। এ'কে গল্পগুজব বলে না যেটা চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাড়ার লোককে নিয়ে কানাকানি।

গল্প হয়ে গেলেও ছেলেরা বলতে ছাড়ে না, তার পরে। এই বইয়ের প্রথম গল্প ফুরোলে আমাকে সেই ছেলেমানুষিতে পেয়েছিল। আমি হঠাৎ চমক খেয়ে

আবিষ্কার করলুম এটা ছোটো গল্প। এই ভেবে মনটাকে গুছিয়ে বসেছিলুম যে এই গল্পটাই এই বইয়ে সর্ব্বব্যাপী। আবার আসন বদলাতে হোলো, তাতে লেখকের উপর কিছু রাগ হয়েছিল। অবশেষে আরো দুটো চারটে গল্প পড়ে মনে মনে মিটমাট করে নিলুম।

আমার দেহ শ্রান্ত এবং কলম কুঁড়ে হয়ে এসেচে। বই এখনো লিখে থাকি কিন্তু বই সমালোচনা করবার মত উদ্বৃত্ত উদ্যম নেই। এই লেখাটাও ঠিক সমালোচনা হোলো না অর্থাৎ সম্যকরূপে কিছুই বললুম না—মনের কথাটা মোটামুটি বলা হোলো। বিপদ এই ঘটল, আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি সেই অপরাধ হোলো নিবিড়—যথা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি। নিতান্তই কুঁড়েমি করেই কিছু বলি নি, সে ওজর আজকের বেমানান হবে।

কৃষ্ণরাও গল্পের যে ভূমিকা সেইটেই অল্প কিছু বদল করে ঐ বইয়েরও ভূমিকা করা যেতে পারে। পথের পাঁচালির আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তার নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিষ ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েচি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েচে অনেক যা পূর্ব্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখ-দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।

ঠিক এই সময়েই প্রবোধ সান্যালের "কলরব" আর "নিশি পদ্ম" বই দুটি আমার হাতে পড়ল। এরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এরা নিছক আধুনিক।

রিয়ালিজ্‌ম্‌ এবং আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে প্রাকৃতিকতা এবং ভাবিকতা নাম দেওয়া যেতে পারে। এই দুটোকে নিয়েই মানুষের কারবার। প্রকৃতিকেও সে স্বীকার করতে বাধ্য, তার সঙ্গে তার আপন ভাবের সৃষ্টিও আপনি এসে মেশে। দুইয়ে মিলেই তার রিয়ালিটি; কোনো একটা সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে বলা চলবে না যে মহাভারতের শকুনিই সত্য আর অর্জ্জুন তা নয়, কিম্বা কর্ণের মধ্যে যে অংশে নীচতা সেই অংশে তা বিরল, যে অংশে মহত্ত্ব সেই অংশটাই বানানো।

মহাভারতে প্রাকৃতিক এবং ভাবিক অনায়াসে মিশে গেছে, এমন কি অপ্রাকৃতও আপন জায়গা নিয়েচে বিনা কৈফিয়তে। অত বড় সর্ব্বগ্রাহী গল্প জগতের আর কোনো সাহিত্যে লেখা হয় নি। ওর মধ্যে সাহসের সীমা নেই।

কিন্তু নবীন মতবাদওয়ালাদের সাহিত্যে ভীরুতা আছে যথেষ্ট। এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি করে এরা কিছুতেই অসঙ্কোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দর চেয়ে ভালো এমন কথা যদি বা অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দর একই দর অন্তত এও তো মানতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো

চলবে না ও মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি—যেহেতু মন্দটাই বিরল্। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনোপুঁটিই পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচকপালে সৌখীনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারীতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তাহলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরগড়া রীতি, অর্থাৎ কন্‌ভেন্‌শন্, নীচতাকেই কৌলিন্যের একমাত্র মর্য্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধারাস্তার আধুনিকতাগিরি।

প্রবোধ সান্যালের "কলরব" পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোনোটাকেই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।

লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন, একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত্ত। তারা পরস্পর কাছাকাছি আছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের নেই। যেমন অনাদৃত গলি যত রকম আবর্জ্জনায় নোংরা দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এ বাড়িতে তেমনি বহুলোকের চিত্তদৈন্য ও অবস্থাদৈন্যের যত কিছু উচ্ছিষ্ট স্তূপাকার হয়ে বাতাসকে মলিন করে তুলেচে। এর মধ্যে অসামান্যতা কোনো চরিত্রে কিছুমাত্র নেই তা নয়—কিন্তু সে কেমন, হাঁসপাতালে মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় নার্স কিম্বা ডাক্তার কিম্বা ছাত্র। তারা মুখ্য নয় তারা গৌণ।

হাঁসপাতালটা সাধারণ সংসারের প্রতিরূপ নয়। সাধারণ সংসার স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে মেলানো, সেইটাকেই বলা যেতে পারে বিরল্। হাঁসপাতাল বিরল্ নয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, ও একটা ছেঁকে আনা জিনিষ। তবু ওর স্বীকৃতির দাবী আছে, কেবল প্রয়োজনের দিক থেকে নয় অস্তিত্বের দিক থেকে। ওটা একটা-কিছু হয়ে দাঁড়িয়েচে অতএব সেই মূল্য তাকে দেওয়া চাই। কলরবের বাসাখানাও নিছক অসুস্থদেরই বাসা। সংসারে তারা এ-গলিতে ও-গলিতে ছড়িয়ে থাকে। তাদের ছেঁকে এনে একটা জায়গায় সংহত রূপ দেওয়া হয়েচে—অর্থাৎ যা ছিল ক্ষেতের মধ্যে তাকে টিনের মধ্যে বিশেষ জারক রসে ডুবিয়ে প্যাক করা হোলো। আচ্ছা তাই সই।

হাঁসপাতাল সংসার থেকে দূরের জিনিষ, স্বতন্ত্র করা তার সত্তা। সেই দূরের দৃশ্য বিশেষ দিনে দেখতে যাওয়া চলে, রোগীরূপে নয়, ডাক্তাররূপে নয়, নিরাসক্ত দর্শকরূপে। সেই হিসাবে এই হাঁসপাতালী গল্পটাকেও কি রোমান্স্ বল্‌ব না। কিন্তু যদি বলি রোমান্টিক তা হলে আধুনিক মতওয়ালারা লজ্জা পাবেন, কেননা ও শব্দটাকে তাঁরা পছন্দ করেন না। উপায় নেই, পাঠক গল্প শুনতে চেয়েচে, লেখক গল্প জুগিয়েচে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার থেকে দূরের দৃশ্যে। মনটা ছুটিতে দূরে যেতেই চায়—গল্প ছুটির জন্যেই। এই দূরের হাওয়া বিচিত্রবর্ণ বসন্তের হতে পারে, হতে পারে ফ্যাকাশে রঙের দরিদ্র শীতের।

আধুনিক লেখকদেব মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রেব লেখা কিছুদিন পূর্ব্বে আমাব হাতে পড়েছিল। মনে হযেছিল তাঁব লেখা বিশেষভাবে আলোচনাব যোগ্য। কিন্তু আমাব দ্বাবা আব ঘটে উঠবেনা। যে লেখকবা অবকাশধনে ধনী সমালোচনা তাঁদেবই পোষায়। আমাব অবকাশ তলায় এসে ঠেকেচে।

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব

তরুণের বিদ্রোহ—শ্রীশবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বদেশ ও সাহিত্য—শ্রীশবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শবৎচন্দ্রেব বই সমালোচনা কবৃতে গিয়ে প্রথমেই তাঁব এই একটা ভাব সকলেব নজবে পড়ে যে শবৎচন্দ্র যে দেশেব মাটিতে জন্মেছেন সে দেশ তাঁব নিজেব; সে দেশেব কোন নিন্দা, সত্য হোক্ বা মিথ্যা হোক্, তিনি অন্যেব মুখ থেকে শুনতে বাজী নন। এই মনোভাব তাঁব 'গোবা' পড়াব ফল কিনা জানি না—কিন্তু গোবাব মনোভাবেব সঙ্গে এই মনোভাবেব যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আব একটি মনোভাবও শবৎচন্দ্রেব লেখায় প্রচুব পবিমাণে দেখতে পাই। সেটি হচ্ছে এই যে দেশ জাতি ও সমাজকে যদি কিছু গালাগালি কবৃতে হয় ত সে তিনি কববেন কাবণ দেশকে তিনিই ভালবেসেছেন কিন্তু অন্যে বল্লেই সেটা দেশদ্রোহিতা হতে বাধ্য। সত্য কি মিথ্যা, এ প্রশ্নই সেখানে বিবেচ্য নয়। এই মনোভাবটি আমাদেব অক্ষম বাঙালী মনেব আত্মসম্মানকে বড় একটি আশ্রয় দান কবে। বাংলা দেশে এই দুইটি ভাবেব সাধাবণ নাম দেশভক্তি যাকে চল্তি কথায় বলে পেট্রিয়টিজ্‌ম্।

এটা গেল দেশভক্তিব এক পিঠ। এব আব একটা দিক্ আছে, সেটা যেমন মনোবম, তেমনি দায়িত্ব-ভাব-শূন্য, সেটা হচ্ছে পবনিন্দাব দিক। এক্ষেত্রেও সত্য মিথ্যা বিচাব কবাটা দেশদ্রোহিতা। দেশভক্তকে মান্তেই হবে যে দেশেব যা কিছু মন্দ তা ইংবাজকৃত। এই দুটি মনোভাব মনেব মধ্যে জাগিযে বেখে এই প্রবন্ধগুলি পড়লে ভাষাশিল্পী শবৎচন্দ্রেব লোকচিত্ত বঞ্জনেব অদ্ভুত ক্ষমতা পাঠককে অভিভূত কববে—একথা জোব কবে বলাব দবকাব কবেনা।

কিন্তু সমালোচনায় দেশভক্তিব স্থান নেই, বিশেষত এই প্রবন্ধগুলিব মধ্যে বহু স্থলেই 'সত্য গোপন কবা পাপস্বরূপ' বলে দৃঢ়কণ্ঠে তাব থেকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দেওয়া হযেছে। জীবনে অনেক পাপ কবা গেছে—কিন্তু পাপ না কব্বাব সুযোগ এত সহজে বড় একটা পাই নি। তাই আজ ভবসা ক'বে উপন্যাস ও গল্পকলাব যাদুকবেব প্রবন্ধ সমালোচনা কবৃতে অগ্রসব হয়েছি। আব একটা ভবসা আমাব আছে। সেটা হচ্ছে উত্যক্ত শবৎচন্দ্রেব প্রতি ববীন্দ্রনাথেব উপদেশঃ "যাকে সুখ্যাতি কবৃতে পাবিনে তাকে নিন্দে কবৃতেও আমাব লজ্জা বোধ হয়।" শবৎচন্দ্রেব সুখ্যাতি আমি প্রচুব কবৃতে পাবি, সুতবাং লজ্জা বোধ কব্বাব কাবণ আমাব সে পক্ষেও নেই।

শরৎচন্দ্রের যে দুখানি বইয়ের সমালোচনা করতে বসেছি তার মধ্যে ‘তরুণের বিদ্রোহ’ বইখানি “১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে রংপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।” এই বক্তৃতার স্পষ্ট উদ্দেশ্য স্বর্গগত দেশবন্ধুর দলের মোক্তাররূপে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গোক্তি ক’রে তাঁর প্রচারিত মতগুলিকে তরুণ দলের কাছে খেলো করা। যিনি যত বড়ই হোন্ না কেন, তাঁর মত বা তাঁর কার্য্যপ্রণালী সমালোচনা কর্‌বার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ব্যঙ্গোক্তিমাত্রের দ্বারা কোনো মতকে খণ্ডন করা হয় না এবং ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা কোন মহৎ ব্যক্তিকে ছোট করাও যায় না। শরৎবাবু লিখেছেন—

“কোথায় কোন এক অজানা পল্লী চৌরীচৌরার হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ ক’রে।” ...“এবার কিছুদিন নিঃশব্দে থাকার পরে, সাড়া পড়ে গেছে। সেবার ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে সাইমন কমিশন। আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জ্জন; সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়ার প্রস্তাব।” জালিয়ানওয়ালাবাগই হোক্ আর সাইমন কমিশনই হোক্—দেশের আন্দোলন কোনো একটা উত্তেজনার ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তার ফল্গুবাহিনী থেকে বন্যার আকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রাণশক্তির দুর্নিবার স্রোতপ্রবাহকে, দেশের কল্যাণের পথে প্রবাহিত করতে, দেশের কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন তাঁরা, যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করেন, তা যে সকল সময়ই, এমন কি কোন সময়ই অভ্রান্ত হয় এমন বলা যায় না। অভ্রান্ত হওয়া যদি সম্ভবও হোতো তা হলেও তার ফল যে সব সময় আশানুরূপ, এমন কি কল্যাণকর হয় তাও নয়। নানা প্রতিকূল নূতন ঘটনায় তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া হয়ত সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এবং লোক-পরিচালনের দুরূহ কার্য্যপ্রণালীতে যদি কোথাও ভ্রান্তি থাকে তবে সেই ভ্রান্তি সংশোধনের সমস্যা—সস্তায় যাদের সহজে উত্তেজিত করা যায় এমন তরুণ দলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কটূক্তি করে—নিরাময় চিত্তে “নিভৃত পল্লী”-কোটরে, যেখানে বাইরের “তর্জ্জন গর্জ্জন গিয়ে পৌঁছবে না”, সেখানে আশ্রয় নিলেও মেটে না।

এই সূত্রে বলা ভাল যে শরৎচন্দ্র, তরুণকুলের ক্রোধ উদ্দীপ্ত না করেও কি ক’রে বক্তব্যে স্পষ্টবাদিতার চেহারা ফোটে তারি চেষ্টায় দিশাহারা হয়ে, এই প্রবন্ধটির মধ্যে তরুণ-স্তুতি ছড়িয়েছেন প্রচুর পরিমাণে ও নির্ব্বিচার প্রশ্রয়ে—আত্মত্যাগে, নিষ্ঠার সঙ্গে খাদি প্রস্তুত কর্‌তে, জেলে যেতে, দেশকে ভালবেসে অকাতরে প্রাণ দিতে এই বাংলার তরুণেরা যেমন এমনটি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ আবার পাতা চারেক পরেই দেখি যে তাদের আর এক মূর্ত্তি। শরৎচন্দ্র এই অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগী যুবকদের নির্জ্জীব বলে ভর্ৎসনা করছেন। বল্‌ছেন “শান্তি-স্বস্তি-হীন সম্মান-বর্জ্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এত লোভের বস্তু?” (এখানে অবশ্য ভারত কথাটা বাংলার প্রতিশব্দ)। “তরুণ-শক্তি যে প্রাণ দিয়ে ধ্বংসের কবল থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা করে এ যদি তারা ভোলে” ইত্যাদি। অথবা “এই যে যুব-সঙ্ঘ, খোঁজ কর্‌লেই দেখা যাবে এর মধ্যে তেরটা দল। কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই” ইত্যাদি। কৌতুকের কথা এই যে এই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের একদলের হয়ে অন্য দলের উচ্ছেদ

সাধনোদ্দেশেই এই বক্তৃতায় সেদিন ব্রতী ছিলেন। যুব-সঙ্ঘে কটা দল সে কথা ছেড়েই দি—অন্ততঃ সেদিন শবৎবাবু যে বৃহত্তব ভাবত-সঙ্ঘেব মধ্যে "মতেব মিল" প্রতিষ্ঠাব 'চ্যাম্পিয়ান' স্বরূপ দাঁড়ান নি সে দিকে "তাঁব" দৃষ্টি আকর্ষণ কব্‌বাব লোক বোধহয় সেখানে ছিল না। অথবা যুবকেবা বোধহয় বিশিষ্ট অতিথিব প্রতি শিষ্টতাব খাতিবে এ কৌতুকাবহ ব্যাপাবটাকে নিঃশব্দে হজম কবেছিল।

অতএব খদ্দব প্রচাবেব প্রতি প্রচুব যুক্তিসম্পর্কশূন্য ব্যঙ্গোক্তিব পব শবৎচন্দ্র এক জায়গায় বল্‌ছেন, "এ দেশেব বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিব মত এই যে মানুষেব জীবনযাত্রাব প্রযোজন নিত্যই কমিযে আনা দবকাব। অভাব-বোধই দুঃখ। অতএব দশ হাতেব বদলে পাঁচ হাত কৌপীন পবিধান—এবং যেহেতু বিলাসিতা পাপ, সেই হেতু সর্ব্বপ্রকাব কৃচ্ছ্রসাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশেব সর্ব্বোত্তম উপায। .... এই ত্যাগেব মন্ত্র সর্ব্বসাধাবণকে মানুষেব ধাপ থেকে পশুব কোঠায় টেনে এনেছে।"

"সর্ব্বপ্রকাব কৃচ্ছ্রসাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশেব সর্ব্বোত্তম উপায" এমন কথা সম্প্রতি কে কোথায বলেছেন সেটা শবৎবাবু বলে দিলেই ভাল কবতেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা অনামা কাল্পনিক মহৎ লোকদেব ঘাড়ে চাপিযে এ যেন 'বাতাসেব গলায় দড়ি দিযে কোঁদল কবা।'

একটা কথা শবৎবাবুব মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিব অবধান কবা উচিত; সেটা এই, মানুষ যখন কোনো বিশেষ সংকল্প সাধনেব উদ্দেশ্যে নিজেব সহজলব্ধ আবামেব পথ ছেড়ে দিযে বিশেষ কোনো কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হয তখন সেই কৃচ্ছ্রসাধনকে "পুরুষকাব" বলে অভিহিত কবা অসমীচীন হয়না। এবং পুরুষকাবেব সঙ্গে "ভগবান কবেছেন" "কপালে লেখা" "সংসাব ত মাযা দুদিনেব খেলা" প্রভৃতি মনোভাব এক পংক্তিতে পাংক্তেয় নয়। সুতবাং কপালেব দোহাই যাবা দেয তাবা সাধকেব দলে নয। পাঁচ হাত কৌপীন যাঁবা পব্‌তে উপদেশ দিযেছিলেন তাঁদেব মনে দেশটাকে "পশুব কোঠায়" টেনে নিয়ে যাবাব কোনো মৎলব ছিল না। পূর্ব্বে যাঁবা দিযেছিলেন তাঁদের হয়ত নিছক আধ্যাত্মিক কাবণ ছিল কিন্তু এবাব যিনি দিযেছেন তাঁব কাবণগুলিব মধ্যে একটি প্রধান যে অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাটা জনসাধাবণেব পক্ষে যে সামযিক সে কথা জাতীয কংগ্রেসেব শাখা-পতিব অজানা থাক্‌বাব কথা নয়। অবশ্য মানসিক সিদ্ধি ও শক্তিলাভও এই উদ্দেশ্যেব অন্যতম হওয়া সম্ভব। ধনী ব্যক্তিকে যদি কোন কাবণে দাবিদ্র্যে দিনযাপন কব্‌তে বাধ্য হতে হয়, তবে ভিক্ষা ও পবমুখাপেক্ষিতাব চেয়ে নিজেব জন্যে নিজেব হাত পা খাটালে তাকে "চাকবেব কোঠায়" গিযে পড়্‌তে হয না। তাতে তাব অর্থসমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান ত হযই, তাছাড়া আত্মনির্ভবশীলতা, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষসাধনে তাব চিত্ত সম্পদ্‌বান হয়।

যুক্তিব বিরুদ্ধে যুক্তি চলে, কিন্তু গালাগালি বা ব্যঙ্গ ত যুক্তি নয়—বাগ। উদাহবণস্বরূপ শবৎচন্দ্রেব লেখা থেকে উদ্ধৃত কবা যেতে পাবে। "একদিন এলো মহাত্মাব অদ্রোহ (?) অসহযোগ। তাব টিকি বাঁধা বইল তাঁব খাদি চবকাব দড়িতে" ইত্যাদি। (২) "স্ববাজেব তাবিখ ধার্য্য হোলো ৩১শে ডিসেম্বব।" (৩) "পশ্চিম ভাবতেব কংগ্রেসেব নেতাদেব মত অমন তাল ঠুকে ঠুকে বেড়িও না।" (৪) চৌবী-চৌবায় হোলো বক্তপাত। মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ কবে।" (৫) "আবার

সেই চবকা, সেই খাদি, সেই বয়কটেব অহেতুক গর্জ্জন, সেই তাড়িব দোকানে ধন্না দেওয়া।" (৬) "মহাত্মাজী হুকুম কব্‌লেও নয়" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কথা—"সর্ব্বকর্ম্ম পবিত্যাগ ক'বে লেখাপড়া শেখানো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত" থাকৃতে কেউ বলেন কিনা আমাব জানা নেই। দেশেব কল্যাণ নির্ভব কবে নানা বিষযেব সাধনায়। তাব মধ্যে কতকগুলি প্রধান ব'লে ধবা যায এবং অপব কতকগুলি আনুষঙ্গিক। দেশেব মুক্তি ও কল্যাণেব পন্থা উদ্ভাবন ও অনুসবণে যাঁবা অগ্রসব সেই সকল মনীষীব মধ্যে যাঁব চিত্তে যে ব্যাপাবেব সাধনাকে দেশহিতেব প্রধানতম উপায় ব'লে মনে হয়, তিনি সেটাকেই বড ক'বে দেখেন ও বড ক'বে বলেন, তাবি জন্যে তাঁব জীবনেব শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্যদান কবেন ও অন্যকে দান কব্‌বাব জন্য আহ্বান কবে থাকেন। উৎসাহেব আতিশয্যে নিজেব উদ্ভাবিত পন্থাকে আবশ্যকেব অতিবিক্ত মূল্য দেওযাও অসম্ভব নয়। কিন্তু লোকশিক্ষা, চবকা, জাতিভেদনাশ, বা স্ত্রীজাতিব উন্নতি যিনি যতই মঙ্গলকব ব'লে মনে করুন না কেন, অন্যান্য মঙ্গলসাধনেব সর্ব্বপ্রকাব চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বন্ধ বাখ্‌তে উপদেশ দেন দেশেব এমন বন্ধু আমাদেব চোখে পড়েন নি। শিক্ষাবিস্তাবেব যাঁবা পক্ষপাতী তাঁদেব মধ্যে ত নয়ই। শবৎবাবু লিখ্‌ছেন, "শিক্ষাবিস্তাব চেষ্টা কব্‌তে মানা কবিনে, কিন্তু এখানে একটা নাইট্‌-ইস্কুল, আব ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে, যা হয, তা ছেলেখেলাব নামান্তব।" এব দ্বাবা শবৎবাবু দেশেব শিক্ষাবিস্তাবেব এ চেষ্টাটা যে আবশ্যকেব পক্ষে ছেলেখেলা, সেই জন্যই দুঃখ কব্‌ছেন, সুতবাং এ অপেক্ষাও অধিকতব শিক্ষাবিস্তাব চেষ্টাকেই সমর্থন কব্‌ছে। শিক্ষাবিস্তাবেব চেষ্টা এদেশে যাঁবাই কব্‌ছেন তাঁবাই শিক্ষাদানেব এই স্বল্প আযোজনেব দীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'বে থাকেন এবং এই চেষ্টাকে বহুগুণ প্রসাবিত, লোকপ্রিয় ও প্রচলিত-কবা চাই এটা জেনেই তাঁদেব এই প্রাণপাত পবিশ্রম। সফলতা লাভ কব্‌তে আমাদেব দেশেব জমিতে দেবী হতে পাবে, এই পর্য্যন্ত। অথচ দেশেব এই শিক্ষা-প্রবর্ত্তনেব যে চেষ্টাকে তিনি ছেলেখেলা ব'লে বর্ণনা কবেছেন সেই চেষ্টা দেখেই আবাব তাব বাহুল্যে তাঁব ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। বল্‌ছেন, "তাঁবা ভাল লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁদেব পবে আমাব ভবসা কম।" অর্থাৎ তাঁবা লোক খাবাপ নয, তবে নির্ব্বোধ। শবৎবাবুব মতে গভর্ণমেণ্ট ছাড়া এ কাজ কেউ কব্‌তে পাবে না। যে দেশে গভর্ণমেণ্টেব ঐকান্তিক চেষ্টা শিক্ষাবিস্তাব-কল্পে জাগানো সম্ভব নয় সেখানে কি হাত পা ছেড়ে মানুষকে তবে বসে থাকৃতে হবে? তাছাড়া, যে কোনো সংস্কাব চেষ্টাব প্রেবণাই ব্যক্তি থেকে মণ্ডলী, এবং মণ্ডলী থেকে জাতিকে অনুপ্রাণিত ক'বে থাকে এবং ক্রমে সেটা জাতীয ব্যাপাবে পবিণত হয়। সুতবাং গভর্ণমেণ্টেব ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিবেকে ব্যক্তি বিশেষেব চেষ্টাব কেবল ছেলেখেলা হয়, একথা অশ্রদ্ধেয়।

এইটুকু প্রবন্ধেব সমালোচনা কব্‌তে অনেকখানি লিখ্‌তে হচ্ছে। তাব প্রধান কাবণ প্রবন্ধটি মহৎ ব্যক্তি ও মহৎ চেষ্টাব প্রতি যুক্তিবিহীন কটুকাটব্যে পূর্ণ এবং তরুণ দলকে উত্তেজিত ক'বে দলবিশেষেব পুষ্টিসাধনই এই বক্তৃতাব উদ্দেশ্য। এমন বক্তৃতা যদি শবৎবাবুব মত মান্য লোকেব মুখ থেকে না বেবোতো এবং একে যদি বাংলাব অক্ষয় কলঙ্কেব মত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত কববাব চেষ্টা না হোতো তবে এব সমালোচনাও দবকাব হোতো না। শবৎচন্দ্র লিখেছেন, "সত্য মনে ক'বে অনেক

অপ্রিয় কথা বলেছি। পুবস্কাব তাব তোলা বইল। এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দু'দিন পবে তিবস্কাবেব বান ডেকে যাবে। কিন্তু আমি তখন হাওডাব নিভৃত-পল্লী মাজুতে" ইত্যাদি। গোডাব লাইনটা একটু বদলে "সত্য মনে ক'বে" না লিখে, 'মহাত্মাব বিরুদ্ধে তরুণদেব উত্তেজিত ক'বে কংগ্রেসে নিজেব দল ভাবী কবব এই মনে ক'বে' লিখলে সত্য মনে কবতে হোতো না তবু সত্যই হোতো। আব বাংলাব তরুণদলকে কোন মন্ত্রবলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত কবা সম্ভব শবৎচন্দ্রেব চেয়ে সে বিদ্যাব বড ওস্তাদ বাংলা দেশে নেই। কোন্ কোন্ বাক্যবিস্ফূরণে তাদেব শ্রেষ্ঠত্বকে অভ্রভেদী ক'বে তোলা যায়, কোন্ কোন্ তুলনায় তাদেব আহত আত্মম্ভবিতাকে নিবাময় আশ্রয় ও নির্ব্বিবোধ প্রশ্রয় দেওযা যায়, কোন্ কথায় তাদেব উদ্দাম কল্পনাকে মাদকতায় মশ্গুল ক'বে তুলতে পাবা যায়—এ বিদ্যাব তিনি যাদুকব। কিন্তু কাল্পনিক চিত্রকে চিত্তহাবী ক'বে প্রকাশ কবাই তাঁব ব্যবসা, ঐতিহাসিক সত্যকে অ-সংস্কৃত ভাবে প্রকাশ কবতে তিনি অভ্যস্ত নন।

পবিশেষে বক্তব্য এই যে এই প্রবন্ধে সত্যভাষণেব খাতিবে অপ্রিয়ভাষণেব কথা স্থানে স্থানে শাসানো আছে—অর্থাৎ শবৎচন্দ্র সত্যেব জন্য অপ্রিয়তাকে ডবান্ নি। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটি বাবংবাব পডেও এই উক্তিব যাথার্থ্য নির্ণয় কবতে পাবলেম না। অর্থাৎ নিতান্ত দুঃসাহসিক সত্যভাষণেব চিহ্ন কোথাও দেখতে পাই নি, ববং বিস্তব স্তুতিবাক্যে বাংলাব তরুণদেব (যাদেব সম্ভাষণ ক'বে এই বক্তৃতা তাদেব) কংগ্রেসেব চেয়ে, ববদোলীওযালাদেব চেয়ে, নিখিল ভাবতেব অন্যান্য সকলেব চেয়ে, অভ্রভেদী আসনে বসিয়েছেন। তাবপব তাদেব দলেব মধ্যে দলাদলিব যে উল্লেখটুকু কবেছেন তাবও ঝাঁঝটুকু মাববাব জন্য তাকে যুগান্তেব অভিশাপ, বাঙালীব জাতীয় উত্তবাধিকাব-কলঙ্ক, প্রকাশ কবেছেন। যাই হোক্ বক্তৃতাটি অক্রোধী ও অকামী মহাত্মাব প্রতি কটু ও ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ, তাও আবাব দলাদলিব সৃজনকল্পে। এ সম্বন্ধে আমি শবচ্চন্দ্রেব স্বদেশ ও সাহিত্যেব "শেষ প্রশ্ন" শীর্ষক একখানি পত্র থেকে দু চাবটি পংক্তি উদ্ধাব ক'বে, আমাব সমালোচনাব এই অংশটি শেষ কবব—পাঠক সন্দেহ কববেন না, এই পত্রখানি এই "তরুণেব বিদ্রোহ"-এব বক্তাবই লেখা।

(১) "মনেব মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও উত্তেজনাব যথেষ্ট কাবণ থাকা সত্ত্বেও যে ভদ্র ব্যক্তিব অসংযত ভাষাপ্রয়োগ কবা চলে না এই কথাটাই অনেক দিনে, অনেক দুঃখে আয়ত্ত কব্‌তে হয়।" আয়ত্ত যে হয় নি তাই প্রমাণ কবতেই যেন অধুনা-আলোচ্য বক্তৃতাটিব অবতাবণা। কত দিনে ও কত দুঃখে আয়ত্ত হবে তাব সঠিক উল্লেখ নেই। (২) "মানুষকে আহত কবায় নিজেব মর্য্যাদা আহত হয় সব চেয়ে বেশী।" আশা কবি ভবিষ্যতে একথা তিনি আব বিস্মৃত হবেন না। "আত্মবক্ষাব ছলেও মানুষেব আত্ম-সম্মানে আঘাত কবা আমাব ধাতে পোষায় না।" এই পত্রেব লেখকও শ্রীযুক্ত শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় !!!

বইখানাব নাম "তরুণেব বিদ্রোহ" দেবাব কাবণ বইয়েব মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না—তবে নামটা বাংলা দেশে ব্যবসা হিসাবে মূল্যবান্ বটে।

এই বইযেব 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধ শবৎচন্দ্র তাঁব অন্তবেব অনপনোদনেয় বেদনা দিযে বচনা কবেছেন। এব প্রত্যেকটি কথা আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন প্রত্যেক ভাবতীয় নবনাবী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কবেন। শিশুকাল থেকে প্রতি পদে স্কুলেব শিশুপাঠ্য

বই থেকে হেড মাষ্টারের আফিসের খাতা পর্য্যন্ত সব আগাগোড়া মিথ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষ। "কর্তৃপক্ষদের উত্তর ওতে কিছু মিথ্যা হয় না—ও সকলেই জানে।" যেটা সকলে জানে সেটা না হয় বোঝা গেল; কিন্তু ভয়ে বা লোভে মিথ্যা বলার এই ক্ষুদ্রতা শিশুর মনে ধীরে ধীরে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে বড় হয়ে মিথ্যা কথা বলার অপমান, হীনতা, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা আমাদের আত্মসম্মানবোধকে আর আহত করে না। একথা যদিও অতীব সত্য যে আমাদের দেশ দুর্ভাগ্য, কেননা এ রাজ্যে সত্য বলা সিডিশন কিন্তু একথাও কম সত্য নয় যে ঘরে এবং বাইরে আমরা আমাদের সামাজিক, সাংসারিক ও ব্যাবহারিক জীবনে অসত্যাচরণকে, আমাদের শিশুদের জীবনের সামনে 'ক্লেভারনেস্' ও 'ট্যাক্টফুলনেস্' চতুরতা ও সংসার-বুদ্ধির আদর্শরূপে দাঁড় করিয়ে থাকি। এরই আব্‌হাওয়াতে তারা বড হয়। সুতরাং যে সম্পাদক শরৎবাবুকে বলেছিলেন গোড়ায় একটা 'যদি' এবং শেষে একটা 'কি না' দিয়ে তিনি রাজদ্রোহ বাঁচিয়ে থাকেন তাঁর এ বিদ্যার শিক্ষা পিতামাতার এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুকাল থেকেই হয়েছে। জাতির এই হীনতা শরৎচন্দ্রের চিত্তে তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধকে পীড়িত করেছে। এবং তাঁর অননুকরণীয় আবেগময়ী ভাষায় তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর মনের এই দুরপনেয় বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরই ভাষায় বলি, "ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস্ না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নিচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?"

'স্বদেশ ও সাহিত্যে'র প্রকাশকের নিবেদন লেখাটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে। ভাষার উপর লেখকের একটি সহজ অধিকার আছে লেখার মধ্যে বাঁধ কোথাও শিথিল হয়ে যায় নি—পড়তে ভাল লাগে।

"আমার কথা"—শরৎচন্দ্রের কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়ার কচকচি। তার রাজনৈতিক দিকের কথা বলতে চাইনে। নৈতিক দিকে একটা কথা বল্‌ব। শরৎচন্দ্র লিখেছেন "আর 'ইন্‌ডিফারেন্স' অর্থে যদি কেউ (ইংরাজরা) এই ইঙ্গিত ক'রে থাকে যে, মহাত্মার কারাবোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজে নি, ত তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়েই বেজেছে" ইত্যাদি। আমাদের বল্‌তে দেশের লোকের মধ্যে ক'জনকে বোঝায় তা জানি না। গভীর ব্যথা অত্যন্ত নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কয়েকজনের বেজে থাক্‌তে পারে, কিন্তু দেশের লোক বল্‌তে যে বিপুল জন-সঙ্ঘকে বোঝায় তাদের ত শতকরা ৯৯ জনের দেশের সম্বন্ধে কোনো অনুভূতিই নেই। বাকী লোকের মধ্যে কয়েক সহস্র যারা দেশের ও মহাত্মার খবর রাখেন তাঁদেরও (শরৎচন্দ্রের কথাই তুলে দি) "আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, সর্ব্বপ্রকারের সুখ সুবিধার কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না ঘটে পান থেকে এক বিন্দু চূণ যেন না খসতে পায়—তার পর স্বরাজ বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে আসা পর্য্যন্ত বল, যা হয় তা হোক্, কোনো আপত্তি নেই।"— অর্থাৎ হয় যদি ত পরের উপর দিয়েই হোক্। তার ফলাফল না হয় তাঁরা কৃপা ক'রে সহ্য করবেন। এমন কি পরের ছেলের মার খাওয়া, প্রাণ দেওয়া নিয়ে সকাল বিকেল চায়ের আসর, মেসের আড্ডা এবং লাটুবাবুদের বৈঠক-

থানায বিজয হুঙ্কাবে ফাটাফাটি পর্য্যন্ত কবতে বাজী আছেন। গভীব বেদনাব কি জাজল্য চিত্র। মহাত্মাব কাবাদণ্ডে কটা থিযেটাব, বায়স্কোপ, একদিনও থালি পড়ে আছে? শবৎবাবুব এই কথাই ত সব চেযে সত্য যে, "তাঁকে মুক্ত কবা দেশেব লোকেবই হাতে। যেদিন তাবা চাইবে, তাব একটা দিন বেশী কেউ তাঁকে জেলে বাখতে পাববে না, তা সে গভর্ণমেণ্ট যত শক্তিশালী হউন।" এই হাস্যকব গভীব ব্যথাটিকে "সে (গভর্ণমেণ্ট) যদি হেসে উড়িয়ে দিযে বলে" ইনডিফাবেন্স—"সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা?"

"স্ববাজ সাধনায নাবী" প্রবন্ধে শবৎবাবু লিখেছেন যে "মেযেদেব স্বাধীনতা যাবা যে পবিমাণে খর্ব্ব কবেছে তাবা সেই অনুপাতেই সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক দিকে ছোট হয়ে গেছে কিম্বা যাবা তাদেব স্বাধীনতা হবণ কবে নি অন্য কোন জাত তাদেব পবাধীন কবতে পাবে নি, পাবে না, ভগবানেব বোধ হয তা আইনই নয।" ভগবানেব আইন আমাব জানা নেই, এবং সে সম্বন্ধে স্পেকিউলেট কবা আমাব ব্যবসাও নয় কিন্তু স্বাধীনতা যদি সকলেবই কাম্য বস্তু হয তবে মেযেদেবও তা থেকে বঞ্চিত কববাব কোনো ন্যায্য কারণ নেই। যে জিনিস ভাল, মঙ্গলকব, সে তাব নিজেব জোবেই মঙ্গলজনক। ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় দেখি প্রাচীন গ্রীস শিক্ষায, শিল্পে, চিন্তায়, সাহিত্যে অতুলনীয; কিন্তু সেখানে নাবীব স্থান কোথায় ছিল? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীব তুর্কী ও মোগলেব কথা বলা যায। ষোড়শ শতাব্দীব তুর্কী ছিল 'টেবব অব্ ইউবোপ'। স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল বলেই তা ভাল, তা বই তাকে স্ববাজ-লাভেব উপায ব'লে উৎকোচেব ব্যবস্থা কবা কেন? কোনো ভাল জিনিসেব মূল্যকে তাতে খর্ব্ব কবা হয না কি?

"শিক্ষাব বিবোধ" প্রবন্ধ পড়লে সেই "তকণেব বিদ্রোহ"-এব বক্তাকে মনে পড়ে। ববীন্দ্রনাথেব কথা ইচ্ছে কবলে শবৎচন্দ্র যতটা স্পষ্ট বুঝতে পাবেন ব'লে আমাদেব জানা আছে এমন অল্প লোকই আছেন অথচ দুঃখের বিষয়, শবৎচন্দ্র অযথা কথাব মাবপ্যাঁচে কতকগুলি অবান্তব তর্কেব সৃষ্টি কবেছেন। পশ্চিমেব কাছে আমাদেব কিছু শেখবাব আছে, এই সামান্য সত্যটুকুতে উষ্মা প্রকাশ কবলে হয়ত দেশভক্তি প্রকাশ পেতে পাবে কিন্তু স্বদেশপ্রিযতা যে প্রকাশ পায় না শবৎচন্দ্রেব উপন্যাসগুলি যাঁবা পড়েছেন তাঁবা সে কথা শবৎচন্দ্রকে তাঁব বই থেকেই স্মবণ কবিয়ে দিতে পাবেন। আসলে শবৎচন্দ্রেব অনন্যসাধাবণ সেন্স অব হিউমাব-এব মধ্যেও কোথায যেন একটা নাটুকে বাঙালী বীব লুকিযে আছে; সে সময়ে এবং অসময়ে তাব যাত্রাব দলেব পোষাকটা পবে আসবে নেমে পড়ে—তাব হুঙ্কাবে চাবি-দিকে হাততালি পড়তে থাকে—তখন আব শবৎচন্দ্রকে চেনা যায না।

ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"একথা মানতেই হবে যে আজকেব দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমেব লোক জয়ী হযেছে। পৃথিবীকে তাবা কামধেনুব মত দোহন কবেছে, সে কোনো একটা সত্যেব জোবে।"

শবৎচন্দ্র লিখ্ছেন—

"লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে এ একটা 'ফ্যাক্ট', কিন্তু একেই যদি মানুষ চবম সত্য ব'লে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃত ত" ইত্যাদি।

শরৎবাবুর মত লোকে যে তথ্য এবং তত্ত্ব, 'ফ্যাক্ট' এবং 'ট্রুথে'র গোলমাল করেছেন, দেখ্‌লে আশ্চর্য্য লাগে। আসল কথা রাগ হলে লোকের আর যুক্তি থাকে না—বিশেষতঃ রাগ প্রকাশের জায়গাটা যদি এমন মাটিতে হয় যেখানে লোকে যুক্তি বা ন্যায়ের চেয়ে বা সত্যের চেয়ে একটা নাটকোচিত স্বদেশিয়ানার জন্য বাহবা দিয়ে থাকে। কতকগুলি অদ্ভুত কথার উপর ভিত্তি করে শরৎবাবু এই বিতণ্ডাটি প্রাণপণে খাড়া করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ দু'চারটে তুলে দেই।

১। সংসারে জয় করা বা কেড়ে নেওয়ার বিদ্যেটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই পশ্চিমের মানুষের বড় সার্থকতা এবং সেটার উপরেই রবীন্দ্রনাথের লোভ।—এটা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্রের একটা আবিষ্কার বটে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তার ধারা আজ বাংলা সাহিত্যে নবশক্তিতে নবীন আলোকে, ভারতবর্ষের ধ্যান ও সাধনার পরমসম্পদ—এই বিশ্বব্যাপার ও মানবচেষ্টার অন্তরালে অজেয় আত্মিকশক্তির পরিচয়বর্ত্তাকে ঘোষণা করছে। এ খবর শরৎবাবুকে আমাদের দেবার দরকার আছে কি?

২। ইংরাজরা পৃথিবীকে কামধেনুর মত দোহন করেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী রয়েছি। এ একটি ফ্যাক্ট, একেই চরম সত্য বলে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে বলেছেন।

৩। পশ্চিমের সভ্যতার বোধ করি এই একটি মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। ইত্যাদি।...

এ যেন নূতন 'লজিক' পড়া কলেজের ছেলের কথায় কথায় ছল ধরে তর্ক করা। 'সারভাইভেল অব্ দি ফিটেষ্ট'-এর রাজ্যে, জগতে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব রূপে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অর্থে, শক্তিতে জীবনের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে মাথা তুলে রাখ্‌তে পেরেছে—যাদের শ্রেষ্টত্বর দাবী এ যুগের কালের যাচাইয়ে পরখ হয়ে গেছে—ঠিক যেমন কোনও এক যুগে পূর্ব্ব দেশের শ্রেষ্ঠত্ব হয়েছিল—তাদের সেই শ্রেষ্ঠত্বকে তাদের অন্তর্নিহিত কোনো মহাশক্তির প্রকাশ বলেই জান্‌তে হবে—কোনো অঙ্কশাস্ত্রই তাকে ফাঁকতালে পাওয়া (এক্‌সিডেন্ট) বল্‌বে না। সেই অন্তর্নিহিত মহৎ শক্তিই তাদের জীবনের মহৎ সত্য—বড় হবার সেই সত্য, একটা 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'। একদিন পূর্ব্ব দেশের লোক তার যে দিক সাধন করেছিল সে দিকে সে সিদ্ধি লাভ করেছিল—আজ পশ্চিম যদি তার কোনো দিকের সাধনায় বড় হয়ে থাকে তবে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে তার কাছে তা শিখ্‌তে হবে বই কি—এতে রাগের কি আছে? যে লোকটা গায়ে ভীমের মত শক্তি সঞ্চয় কর্‌ল—তার গায়ের জোর একটা 'ফ্যাক্ট', সে মেছো-বাজারে গুণ্ডামি ক'রে ঠ্যাঁঠারি বাজারে বাড়ী তোলে এও একটা 'ফ্যাক্ট', কিন্তু তিলে তিলে যখন সে শক্তি সঞ্চয়ের সাধনা করেছে এবং সেই শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তার ভিতরকার রহস্য বা সত্য কি তার পরস্বাপহরণ না গুণ্ডামি?

শক্তিলাভ করা যদি অভিপ্রেত হয় তবে তার সাধনার গূঢ় তত্ত্ব তার একনিষ্ঠতা, তার 'মেথড্‌স্' সব তার কাছ থেকে শিখতে হবে। তারপর আমরা আমাদের শক্তির ব্যবহার কি ভাবে করব তাই দিয়ে আমাদের মেণ্টালিটির (গতির) পরিচয় দেব।

যে বিদ্যুৎ দিয়ে তারা মারছে তাই দিয়ে মানুষকে বাঁচাচ্ছেও ত—সুতরাং মারবার কথাটাই যে একমাত্র ফ্যাক্ট তাও নয়—তাদের জীবনেও নয়। সেইটেই একান্ত ক'রে শেখবার উপদেশ রবীন্দ্রনাথ দেন নি।

তাছাড়া, বড হওয়া বিদ্যাটা ত মাত্র তাদের নর-হত্যাতেই প্রকাশ পায় নি? যে যুগ যুগ সাধনার দ্বারা তারা শক্তি সঞ্চয় করবার মন্ত্র-সকল তাদের জীবনে পরিণত করেছে, তাদের কাজে ও ব্যবহারে, নিষ্ঠায়, আত্মদানে, একাগ্রতায়, তাদের কাজ ও সময়ের সুনিয়ন্ত্রণে, তাদের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যবোধের সাধনায়, ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত হবার শিক্ষায় এবং সর্ব্বোপরি তাদের 'ডিসিপ্লিন ও 'ম্যানলিনেসের' চর্চ্চায় এবং কর্ম্ম সংসাধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, তাদের জাতির অন্তর্নিহিত মহৈশ্বর্য্যের যে পরিচয় পাই, সেই ঐশ্বর্য্যেই তাদের চরিত্রের পরম সত্য। এই সত্যই তাদের বড বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে আলোক স্বরূপ, মরু ও মেরু অভিযানের পাথেয়, পৃথিবীব্যাপী অধিকার বিস্তার ও প্রভুত্ব করবার শক্তির উৎস। এ নিয়ে রাগ ক'রে লাভ নেই। উত্তেজনা প্রকাশ করাই এই বই দুখানির অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রকৃতি। সুতরাং সাময়িক উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে, সাময়িক কাগজের বিস্মৃতি গর্ভে নিহিত থাকলেই লেখক অন্ততঃ কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজের প্রতি ও দশের প্রতি অধিক বিবেচনার কাজ করতেন ব'লে আমার বিশ্বাস। নানা ব্যক্তিগত কারণে চিত্ত যখন বিক্ষুব্ধ থাকে তখন যে সব কথা লোকে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য ক'রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্চারণ করে তাতে বিচারবুদ্ধির চেয়ে উত্তেজনা প্রকাশ পায় বেশী, তাকে সত্যের সামনে বসিয়ে চিরস্থায়ী করবার বুদ্ধিকে সুবুদ্ধি বলা চলে না। সুতরাং এর মধ্যেকার সেই কটি প্রবন্ধ অন্ততঃ ধ্বংস পাবার যোগ্য।

শ্রীজীবনময় রায়।

Talleyrand—By Duff Cooper, (Jonathan Cape)

এককালে জীবনচরিত লিখন নীরস ঘটনা-নির্ঘণ্ট মাত্র ছিল। কিন্তু কয়েক-বৎসর যাবৎ এক নূতন শ্রেণীর পুস্তক রচিত হইতেছে যাহা একাধারে জীবনী ও ইতিহাস, সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। আলোচ্য পুস্তক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মন্ত্রীবর তালের্ঁার জীবনকাল কিঞ্চিদধিক অশীতিবর্ষ। এই অশীতিবর্ষের অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আধুনিক ভারতবাসী আমাদের বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। কুপার সাহেব তালের্ঁাকে উপলক্ষ করিয়া ঐ যুগের ইউরোপীয় রাজনীতির ক্রম-বিকাশ এমন প্রাঞ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইতিহাসে অনভিজ্ঞ পাঠকও সহজেই তাহা বুঝিবেন। এই মহাপুরুষ ইতিহাসে যেন এক অতিকায় কলোসাস্। তাঁহার বামপদ বুর্বন যুগে, দক্ষিণপদ বিক্টোরীয় যুগে। আর এই দুইযুগের মধ্যবর্ত্তী কালের ঘটনাপরম্পরার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। কিরূপ আবেষ্টনের মধ্যে এই অসাধারণ ধীসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি ভাবে তাঁহার শৈশবের ও যৌবনের শিক্ষা হইল, কি প্রকারে ধীরে ধীরে তিনি ফরাসীদেশের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রনীতিবিৎ বলিয়া

খ্যাত হইলেন, তাহা কুপার সাহেব উপন্যাসের ন্যায় সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা বাস্তবিকই চমৎকার। গাম্ভীর্য্য, কবিত্ব ও শ্লেষের অপূর্ব্ব সমন্বয়। লেখকের পাণ্ডিত্যের কথা বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ যে কত স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পাঠক পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। দেখিলে বুঝিবেন যে তাহার জন্য গ্রন্থকার কি কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন। এই কঠিন শ্রমের প্রয়োজনও যথেষ্ট ছিল। কেননা এতাবৎকাল তালের্‌াঁকে লোকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া জানিলেও স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া মনে করিত না। এতদ্দেশে কৌটিল্য ও যবন দেশে মাকিয়াবেলী যে কুটিল রাজনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা অনেকেই তালের্‌াঁকে সেই নীতির মূর্ত্তিস্বরূপ বলিয়া জানিতাম। কুপার এই মন্ত্রীপ্রবরের কার্য্যাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এ ধারণা ভ্রান্ত। কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা পাঠক বিচার করিবেন।

কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তির গুণাগুণের যথাযথ পরিমাণ করিতে হইলে তাঁহার নিজ যুগের মাপকাঠি লইতে হইবে। কেননা, ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তালের্‌াঁর দোষগুণ বিচার করিবার সময় সপ্তদশ শতাব্দীর পিউরিটান শুচিবায়ু, কি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরীয় ভব্যতার আদর্শ লইলে চলিবে না। যে যুগে পম্পাদুর ও দ্যুবারী'র কক্ষ হইতে ফ্রান্সের শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইত, যে যুগে প্রত্যেক নূতন দার্শনিক চিন্তার ধারা গণিকার সাল'তে প্রবর্ত্তিত হইত, যে যুগে কবি তাঁহার প্রত্যেক নূতন কবিতা লইয়া প্রণয়নীর বৈঠক-খানার দিকে ধাবমান হইতেন, সেই তালের্‌াঁর যুগ। সুতরাং তাঁহার কার্য্যাবলী বাইবেলের অনুশাসন-অনুযায়ী হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

তালের্‌াঁর জন্ম সাবেক ফ্রান্সের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ঘরে (১৭৫৪)। সাবেক ফ্রান্স বটে, কিন্তু নামে মাত্র। রাজকুলরবি চতুর্দ্দশ লুইয়ের অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী শাসনের ফলে দেশের অভিজাত শ্রেণী এখন রাজার আসাসোটাবরদারের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। প্রিন্স আছে, ডিউক আছে, কাউণ্ট আছে, আছে সবাই। কিন্তু তাহাদের একমাত্র কাজ খুব জমকালো সুবর্ণখচিত মখমলের পোষাক পরিয়া রাজার চতুর্দ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহের মত বিবর্ত্তন। আর সাধারণ প্রজা, যাহাদিগকে এই জরি-পরিহিত চোপদারেরা canaille বলিত তাহাদের উদরে অন্ন নাই; কিন্তু তাহারা ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দে শনৈঃ শনৈঃ রাজদরবারের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদিগকে আর রিক্তহস্তে গৃহে ফেরানো অসম্ভব। তাহাদের উপদেষ্টা, তাহাদের গুরুস্থানীয় বল্‌টেয়ারপ্রমুখ ভাবুকের দল তাহাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। বলটেয়ার রাজদরবারে ফিরিতেন বটে, কিন্তু তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "জগতের প্রথম রাজারা ত ভাগ্যবান সৈনিকমাত্র ছিলেন। দেশের যে যথার্থ সেবক, তাহার বংশগৌরব নিষ্প্রয়োজন।" নৃপতি উপ-নৃপতিদিগের দিন ফুরাইয়াছে, ধর্ম্মযাজকের প্রভাব অন্তর্হিতপ্রায়—একথা সকলেই বুঝিয়াছিল। রাজার আপন বংশের চৌহদ্দির মধ্যেও এই নূতন চিন্তাস্রোত প্রবেশ করিয়াছিল। কালবৈশাখী তখনও বহুদূরে, ঈশান কোণের আকাশ তখনও সুন্দর নীল, তবু যেন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস, একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি সমস্ত জাতির মন চঞ্চল ও

অশান্ত কবিতেছিল। পবম ভট্টাবক লুই যে ইংবেজ জাতিকে অবজ্ঞাব চক্ষে দেখিতেন, যে ইংবেজেব বাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁহাব মোসাহেব মাত্র ছিল, সেই ইংবেজেব হস্তে শেষ জীবনে তাঁহাব দুর্দ্দশাব একশেষ হইল। মার্লববাব হস্তে লুইযেব নিগ্রহেব কথা পডিযা বাজপুত মাবাঠাব হস্তে বৃদ্ধ আলমগীবেব লাঞ্ছনাব কথা মনে পড়ে। কি বুর্বন কি মোগল, কেহই বুঝিলেন না যে জীর্ণ অট্টালিকাব সংস্কাব কবিযা বাহিবেব ঠাট বজায় বাখা যায কিন্তু তাহাকে আব মজবুত কবা যায় না। উপবন্ত মেবামতেব খবচ দুঃসহ হইযা পড়ে। যখন বাজকুলববি লুই অস্তমিত হইলেন, তাঁহাব জন্য কেহই কাঁদিল না। বাস্তাব canaille তাঁহাব কফিনেব উপব কর্দ্দম নিক্ষেপ কবিল। লুই গেলেন কিন্তু ইংলণ্ডেব সহিত ফ্রান্সেব স্থাযী বোঝাপডা হইল না। কথায় কথায় ঝগডা বাধিতে লাগিল। অবশেষে তালেব্যাঁব জন্মেব সময যে সাত বৎসব ব্যাপী যুদ্ধ চলিল তাহাতে ফ্রান্সেব সম্পূর্ণ পবাজয হইল। Wandiwash-এ ফবাসীব ভাবত-সাম্রাজ্যেব স্বপ্ন চূর্ণ হইল, কুইবেকে কানাডাব বাজ্য বিধাতাপুরুষ ইংবেজেব হস্তে তুলিযা দিলেন। তবু ফবাসীজাতি ইংলণ্ডেব সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িল না। ভাবতেব নানা বাজদববাবে, আমেবিকাব নানা উপনিবেশে লালী, বুসী লাফায়েতেব ন্যায ফবাসী বীব প্রতিহিংসাব পথ দেখিতে লাগিলেন। ভাবতে প্রতিশোধ হইল না। ভাবতেব ভাগ্যদেবতা ইংবেজকে দুলাল বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। আমেবিকায় ফ্রান্সেব প্রচেষ্টা বৃথা গেল না। U. S. A. নামে এক উজ্জ্বল নবীন নক্ষত্র বাজনৈতিক গগনে উদিত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডেব এই বাজ্য-ক্ষয়ে ফ্রান্সেব দুঃখ ঘুচিল না। কিরূপে ঘুচিবে? ফ্রান্সেব অবস্থা তখন সঙ্গীন। বাজ্যেব সমস্ত বোঝা একা বৃদ্ধ বুর্বন বাজাব দুর্ব্বল স্কন্ধে। দেড শত বৎসবেবও অধিককাল প্রজাব প্রতিনিধিগণ একত্র হইতে পায় নাই। যাহাবা পূর্ব্বে সামন্ত ভৌমিক ছিল তাহাবা আজ মোসাহেব মাত্র। ঋণজালে জডিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বাজা কাহাব সাহায্য চাহিবেন? এরূপ অবস্থায পডিলে সাধাবণ গৃহস্থেব যে দশা হয় বাজাবও তাহাই হইল। ভণ্ডগুরুও টোটকা চিকিৎসকের কবলে পড়িলেন। নূতন নূতন মন্ত্রী বাহাল হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্যাব সমাধান হইল না। কালে লম্পট বৃদ্ধ বাজা পবলোকে গমন কবিলেন। সচ্চবিত্র ধীব-প্রকৃতি ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসিলেন। লোকে অনেক আশা কবিতেছিল। চ্যানেলেব আব পাবে ইংলণ্ড। সেখানকাব লোকে বাজ্যেব কি সুন্দব ব্যবস্থা কবিয়া লইয়াছে। বাজা আছেন, কিন্তু তিনি বাজ্যশাসন কবেন না। জবীমখমল পবিযা সাক্ষীগোপালেব মত সিংহাসনে বসিয়া থাকেন। তৃতীয় জর্জ হাতে বাজদণ্ড লইতে গেলেন কিন্তু আমেবিকা হাবাইযা অপদস্ত হইযা পার্লামেণ্ট দমনেব দুবাশা ত্যাগ কবিলেন। কমন্স্-সভা দেশেব সর্ব্বেসর্ব্বা। এরূপ ব্যবস্থা ফ্রান্সে কবিতে পাবিলে কি চমৎকাব হয়! নেতৃস্থানীয় অনেক ফবাসীবই এই মত। তাঁবা চান ইংলণ্ডেব সহিত সখ্য স্থাপন ও ফ্রান্সে নিযন্ত্রিত বাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন। তালেব্যাঁব প্রথম হইতেই এই মূল মন্ত্র ছিল। কুপাবেব মতে এই নীতি হইতে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই। পঞ্চাশ বৎসব নানা বাধা বিপত্তিব পব তিনি এই নীতি অনুযাযী কার্য্য কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ১৮৩০ সালে। কিন্তু ১৭৮৬ সালে ও ১৭৯১ সালেও তিনি এই মতই ব্যক্ত কবিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গিজো বলিয়াছেন যে বুর্বনদেব পুনঃ প্রতিষ্ঠাব অর্থ ১৭৯১-এব constitution-এব পবাজয ও ইংবেজী

constitution-এর জয়। বলটেয়ার মন্টেস্কিউর মত ভাবুকও ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

কুপার সাহেব তালের্ঁার প্রেমপ্রবণতা, অর্থলোলুপতা, কিছুই ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। এ কথাও বার বার স্বীকার করিয়াছেন যে মন্ত্রীপ্রবর নিমকের মর্য্যাদা কখনও রাখেন নাই। কিন্তু কুপারের মতে তিনি তাঁহার ফ্রান্স দেশকে দেশের রাজা বাদশাহের অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া দেখিতেন। তাই অখণ্ড ফ্রান্সের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি আপন প্রভুর স্বার্থবলি দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। আমার বক্তব্য যে আর যাহার স্বার্থই বলি দিয়া থাকুন তালের্ঁা নিজের স্বার্থ কোন দিন বলি দেন নাই। কুপার সাহেবের মত দুচার ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

Every change of allegiance that he made was made by France. * * * Like France he responded to the ideals of 1789 and believed in the necessity of the Revolution, like France he abominated the Terror, made the best of the Directory, and welcomed Napoleon as the restorer of order and the harbinger of peace: like France he restored tyranny and grew tired of endless war and so reconciled himself to the return of the Bourbons When Charles X proved impossible he turned rather wearily, but not without hope, to Louis-Philipe, and once again he reflected the mood of his country. Constitutional monarchy, the maintenance of order and liberty at home, peace in Europe and the alliance with England, to these principles he was never false—and he believed that they were of greater importance than the Kings and Emperors, Directors and Demagogues, Peoples and Parliaments that he served." (P 354)

আলোচ্য পুস্তক যতই সুলিখিত হউক না কেন, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের মনে সন্দেহ থাকিবে যে এই অসীম প্রভাবশালী মন্ত্রীপ্রবরের কোন principles ছিল কিনা।

সাবেক ফ্রান্সে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের জীবন নির্ব্বাহের দুই পন্থা ছিল। তাহারা হয় সেনানী হইত, নয়ত ধর্ম্মযাজক। তালের্ঁার বাল্যকালে এক পায়ে আঘাত লাগায় তাঁহার সেনানী হওয়ার পথ বন্ধ হইল। অতএব তাঁহাকে পাদরী হইতে হইল। কিন্তু সামান্য পুরোহিতের (Abbe) কাজ করিয়া জীবন কাটানো এরূপ প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। তালের্ঁা ধর্ম্মযাজক হইলেও ধর্ম্মপরায়ণ কোনদিন ছিলেন না। তাঁহার কিছুই বাধিত না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা count হইয়া পৈতৃক জমীদারী সব পাইলেন। জ্যেষ্ঠ তাহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া, নিজ বুদ্ধিবলে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে লাগিলেন। সমসাময়িক প্যারিসে স্ত্রীলোকের প্রভাব কত বেশী ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তালের্ঁা একজনের পর একজন সুন্দরীকে সারথি করিয়া তাঁহার জীবনরথ চালাইতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সেই এক সুন্দরীর চেষ্টায় কার্ডিনালের লাল শিরোপা তাঁহার প্রায় হস্তগত হইয়াছিল। কেবল স্বয়ং মহারাণীর শত্রুতায় কার্য্য পণ্ড হইল। অবশেষে নিজ পিতার সুপারিশে বিশপ হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিশপ মহোদয় Agent-General of the Clergy-র পদ পাইলেন। যখন ১৭৮৯ সালে চতুর্দ্দিকে বিপদজালে বেষ্টিত অল্পবয়স্ক রাজা ষোড়শ লুইকে বাধ্য হইয়া প্রজা মহাসভা (States General) ডাকিতে হইল

তখন তালেরাঁর উপযুক্ত সুযোগ মিলিল। তিনি সভার সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে যোগ দিলেন। শুধু যোগ দিলেন তাহাই নহে, চলিত ভাষায় যাহাকে মোড়লী বলে তাহাই করিতে লাগিলেন। বিশপ মহোদয় কোন দলেরই লোক ছিলেন না। রাজকুমার আর্তোয়া, মন্ত্রী কালন, বিপ্লবপন্থী মিরাবো ও দান্তঁ সকলের সঙ্গেই তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল। প্রয়োজন মত সকলের সহায়তা করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিলেন। নিজে বিশপ ছিলেন, তথাপি যখন সুবিধা বুঝিলেন সমস্ত দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করাইবার উদ্যোগ করিলেন। রাজাকে দূর করিয়া দিয়া সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন তাঁহার অভিমত ছিল না, তথাপি কার্য্যতঃ তিনি সেই সাধারণতন্ত্রের দূত হইয়া ইংলণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গেলেন। যখন Terror-এর তাণ্ডব আরম্ভ হইল, রাজা রাণী গিলোটীনে গেলেন, তখন তালেরাঁ ইংলণ্ডেই আশ্রয় লইলেন। রবেস্পিয়ারের মন্ত্রীরা তাহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল। কিছুদিন পরে তিনি ইংলণ্ড ছাড়িয়া আমেরিকায় গেলেন। সেখানে তখন প্রজাতন্ত্রের অত্যন্ত কদর। তালেরাঁ সেই সূত্রে খুব খাতির জমাইলেন ও নিজের নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া লইলেন। অর্থও যথেষ্ট সঞ্চয় করিলেন। এইরূপ যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সঞ্চয় সেই যুগে সকলেই করিতেন। সেজন্য যদি Fox, Clive, Hastings-কে অর্থপিশাচ না বলা হয়, ত ইঁহাকেও বলা চলিবে না।

ফ্রান্সে ডিরেকটরী স্থাপন হইলে পর তালেরাঁ দেশে ফিরিলেন। বারাস তখন প্রধান ডিরেকটর ছিলেন। Madame de Stael-এর আনুকূল্যে তাঁহাকে মুরুব্বী ধরিলেন ও অল্পকালের মধ্যেই আপন কূটবুদ্ধির বলে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইলেন। গল্প আছে যে এই পদ লাভ করিয়া তালেরাঁ অনেকক্ষণ আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করিয়াছিলেন, "অগাধ অর্থ, অগাধ সম্পত্তি"। বারাস বা কেহই তাহাতে আশ্চর্য্য হন নাই। সে যুগে ত আর William Pitt বেশী ছিল না। মন্ত্রীবর পররাষ্ট্র সচীব ছিলেন, সুতরাং পররাষ্ট্রের নিকট হইতে দুই হস্তে পয়সা লুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নূতন প্রেমিকা জুটিতে বিলম্ব হইল না। এই প্রেমিকাকে তিনি পরে যথারীতি বিবাহ করিয়া Princesse de Talleyrand নাম দিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আমাদের কলিকাতার একটু যোগ ছিল। ইনিই ছিলেন সেই Madame Grand যাঁহার জন্য Phillip Francis দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিলেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে।

এই সময়ে নেপোলিয়ন ইটালীদেশে সেনাপতির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তালেরাঁর লোক চিনিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। অমাত্য হইয়াই তিনি সেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া নেপোলিয়ন বুঝিলেন যে রাজধানীতে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বিচক্ষণ বন্ধু আছেন। পরস্পর সাক্ষাতের পূর্ব্বেই এই দুই মহাপুরুষের পত্রদ্বারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। তালেরাঁ প্যারিসে বসিয়া ভিতর হইতে ডিরেকটারীর ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিপাত করিয়া ফরাসী দেশের হৃদয় জয় করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবরের এই সময়ের কার্য্যক্রম সম্বন্ধে কুপার বলিতেছেন,—

"It was typical of Talleyrand that in this, as in every other channel of the vast labyrinth of intrigue, he fulfilled himself no definite function, but served only as the go-between, acquainted with

everybody, knowing everything, and holding in his hands the end of every string ”

ডিরেকটরীর শেষ করিতে মন্ত্রীবরের বেশীদিন লাগিল না। নেপোলিয়ন কন্সল উপাধি লইয়া দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া বসিলেন। তালেরাঁর পরামর্শে তিনি ফরাসী রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মনোযোগ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার মানসে ইউরোপে শান্তি আনয়নের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবেক কালের অভিজাত মণ্ডলীকে দেশে ফিরিতে আমন্ত্রণ করা হইল। এমন কি, বুর্বন রাজকুমারদের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এ সমস্ত ব্যাপারে তালেরাঁ মধ্যস্থ ছিলেন। কিন্তু তখনও বুর্বন বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়নকে ফ্রান্সে সর্ব্বেসর্ব্বা করা। তাহাই করিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কন্সল সম্রাট নাম লইয়া সিংহাসন অধিরূঢ় হইলেন। সীজার ক্রমওয়েল যাহা সাহস করেন নাই নেপোলিয়ন তাহা করিলেন। পরন্তু এই কার্য্যের ফল অপ্রত্যাশিত রকমের হইল। রাজচক্রবর্ত্তীর নজর আর দেশের আভ্যন্তরীন উৎকর্ষসাধনের দিকে রহিল না। কি করিয়া ইউরোপের সর্ব্বদেশে সম্রাটের গরুড়-লাঞ্ছিত ধ্বজা উড়িবে সেই চিন্তাই সার হইল। সচীব তালেরাঁ কন্সলের ভালমন্দ সকল কার্য্যেরই প্ররোচক ও সহায় ছিলেন। এমন কি, এঙ্গীয়ানের নৃশংস হত্যা-কাণ্ডেও তিনি লিপ্ত ছিলেন, যদিও কুপার সাহেবের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু কয়েকবৎসরের মধ্যেই (১৮০৯) বাদশাহের সহিত তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল। তালেরাঁ ফ্রান্সের মঙ্গলকামী ছিলেন, নিজের স্বার্থও যথেষ্ট বুঝিতেন, কিন্তু নিরর্থক দিগ্বিজয়ের সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। বোনাপার্ট-বংশের গৌরব সাধনেও তাঁহার আগ্রহের একান্ত অভাব ছিল। নেপোলিয়ন মন্ত্রীকে ভালবাসিতেন। তথাপি তিনি সম্রাট, তাঁহার কার্য্যে মন্ত্রী আগ্রহ দেখাইবে না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। একদিন দুইজনের কলহ হইল ও তালেরাঁ অমাত্যের কাজে ইস্তফা দিলেন। ইস্তফা দিলেন কিন্তু রাজসভা ত্যাগ করিলেন না। Vice Grand Elector নামে দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিলেন। বাদশাহ প্রয়োজনমত তাঁহাকে দৌত্য কার্য্যে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর হৃদয়ে আর প্রভুভক্তির লেশমাত্র ছিল না। অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীর সহিত সম্রাটের বিবাহের ঘটকালী যে তিনি করিলেন তাহা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ইউরোপের শান্তি সম্বন্ধে চিরদিন তাঁহার যে কল্পনা ছিল অষ্ট্রিয়া ধ্বংস হইলে তাহার ব্যতিক্রম হইবে। সেই জন্যই অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করিবার পাকা বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮০৯ এর পর তালেরাঁ একনিষ্ঠভাবে ভিতর বাহির দুইদিক হইতেই নেপোলিয়নের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সম্রাটের কালপূর্ণ হইয়াছে। ফরাসী জাতিও বিনা-কারণে যুদ্ধে শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নেপোলিয়নের পরাজয়, বুর্বনদের প্রত্যাগমন সহজেই সাধিত হইল। তালেরাঁর প্রভাব এই সময়ে এমন আশ্চর্য্য রকমের ছিল যে রুশিয়ার জার প্যারিসে আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। বুর্বনরাজা মুকুট পরিলে তালেরাঁ আবার পররাষ্ট্র সচীব হইলেন। ফ্রান্সের প্রতিনিধি হইয়া তিনি বিয়েনা কংগ্রেসে স্বদেশের সহিত ইউরোপের সন্ধি স্থাপন করিলেন। এমন সর্ত্তে সন্ধি হইল যেন ফ্রান্স যুদ্ধে কাহারও হস্তে পরাজিত হয় নাই।

তাব পব সম্রাটেব এল্‌বা হইতে পলায়ন, একশত দিবসেব জন্য পুনর্ব্বায় সিংহাসন অধিকাব, এবং সর্ব্বশেষে ওয়াটাবলুতে নেপোলিয়ন-নাটকেব যবনিকা পতন। এই একশত দিবস তালেবাঁব অবস্থা কতকটা ত্রিশঙ্কুব্রেব মত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যেব দোহাই দিয়া দুই বাজাব দববাব হইতেই দূবে বসিয়া বহিলেন। যখন ওয়াটাবলুতে সম্রাটেব নিঃসন্দেহ পবাজয় হইল, তখন মন্ত্রী লুইযেব নিকট গেলেন কিন্তু লুই তাঁহাকে আদব অভ্যর্থনা কিছুই কবলেন না, তখন তালেবাঁ মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়া চলিযা গেলেন। ইহাব পব পঞ্চদশবর্ষ তাঁহাব বাজদববাবেব সহিত কোন যোগ বহিল না।

কিন্তু ১৮৩০ সালে, বৃদ্ধবয়সে পুনবায় তিনি ষড়যন্ত্র আবম্ভ কবিলেন। অবস্থা অনুকূল, প্রজাবা বুর্বন বাজাব উপব যৎপরোনাস্তি বিবক্ত হইয়াছে। প্রজাদলেব একজন উপযুক্ত নেতাও প্রস্তুত। তালেবাঁ আবাব বিপ্লব বাধাইলেন এবং ফ্রান্সেব বাজ-মুকুট অর্লেয়াঁ বংশেব লুই ফিলিপেব মাথায় পবাইয়া দিলেন। এবাব কিন্তু মন্ত্রীত্ব লইলেন না। অর্থ যথেষ্ট সঞ্চয় হইয়াছিল, শুনা যায, এক উৎকোচ গ্রহণেব দ্বাবাই তিনি ছয কোটী ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় কবিয়াছিলেন। লোকে তামাসা কবিয়া বলিত, প্রিন্স যাহা স্পর্শ কবেন তাহাই সুবর্ণ হইয়া যায। লুই ফিলিপেব দূত হইয়া তিনি লণ্ডনে গেলেন এবং সেখানে ইউবোপ সম্বন্ধে তাঁহাব চিবদিনেব ইচ্ছানুযায়ী বন্দোবস্ত কবিযা গৃহে ফিবিলেন।

১৮৩৪ সালেব পব আব সবকাবী চাকবীব সহিত প্রিন্সেব সংস্রব ছিল না। চাবি বৎসব পবে, ৮৪ বর্ষ বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ কবেন। লোকেব কিন্তু বিশ্বাস, যে তাঁহাব শেষ দিন পর্য্যন্ত ফবাসী বাজদববাবে যাহা কিছু ঘটিতেছিল সবেতেই তাঁব হাত ছিল। তিনি স্বহস্তে তাঁহাব জীবনেব আশ্চর্য্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন। তাঁহাব বাবণ ছিল তাই সেই আত্মজীবনী ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয নাই। এখন হইয়াছে। কুপাব সাহেব সেই পুস্তক হইতে তালেবাঁব আপন মন্তব্য স্থানে স্থানে উদ্ধৃত কবিয়া দিযাছেন। কিন্তু এই বিচক্ষণ বাজনীতিজ্ঞ সত্যবাদী বলিযা খ্যাত ছিলেন না, তাঁহাব আপন কৈফিয়ৎ সর্ব্বত্র অমিশ্র সত্য বলিয়া গ্রহণ কবিবাব কাবণ নাই।

আলোচ্য পুস্তকে তালেবাঁব কযেকটী চিত্র সন্নিবিষ্ট হইযাছে। দেখিযা মনে হয তিনি সুপুরুষ ছিলেন। তবে যে নট এত বড় রঙ্গমঞ্চে অভিনয কবে তাহাব বাহিবেব সৌন্দর্য্য তুচ্ছ পদার্থ, তাহাব আকর্ষণী শক্তি অন্তবেব গুণাবলীব উপব প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বাংলা ছন্দের মুলসূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায প্রণীত (প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থকাব, কাবমাইকেল কলেজ, বংপুব ; অথবা দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা)

এক সময়ে আমাব বিশ্বাস ছিলো যে বাংলা ছন্দ সংস্কৃত আর্য্যাব সন্তান ; কিন্তু যে-জৈব নিযমেব শাসনে প্রাণীমাত্রেই বংশানুক্রমিক অবনতিব অধীন, তাবি প্রভাবে আর্য্যাব মাত্রিক পবিত্রতাও বাংলায় আব অবিমিশ্র নেই। শিশুশিক্ষাব অন্যান্য কুসংস্কাবেব মতো এ-ধাবণাও শেষ পর্য্যন্ত টি কলো না ; প্রযোগেব তাগিদে এবং

তার্কিকের নির্ব্বন্ধে মানতে হলো যে বাঙালীর ছন্দশাস্ত্র মূলে হয়তো আর্য্য ঐতিহ্যের ঋণমুক্ত। কিন্তু বাল্য প্রত্যয় ক্ষণস্থায়ী হলেও, তার উপসর্গ দুর্ম্মর। তাই সংস্কৃতের মোহ একেবারে কাটাতে না-পেরে, আমি জোর দিলুম প্রাচীন ছান্দসিকদের একটা নাতিপ্রয়োজনীয় বিধানের উপরে, যার কল্যাণে পদান্ত্য বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা কবির রুচিসাপেক্ষ। অবশ্য কেবল এই বিধিমতোই যে বাংলা কবিতার ছন্দোলিপি বানানো যায় না, তা বলাই বাহুল্য। তাই কোনো এক অখ্যাত আলঙ্কারিকের কাছ থেকে আরেকটা নিয়ম ধার করলুম, যাতে ক'রে আর্য্যার যতি ও ছেদের অভিন্নতা প্রমাণ হলো। কিন্তু এতেও যখন বাংলার মাত্রাপরিমাণ পেলুম না, তখন ওই দুই বিধানের সমর্থনে এক তৃতীয় বিধানের পরিকল্পনা করলুম যার ফলে বাংলা কাব্যে শব্দান্ত্য বিরাম আবার যতি ও ছেদের সমকক্ষ হয়ে উঠলো।

সুবিধার খাতিরে নিয়ম নির্ম্মাণের নামই অবৈধতা; এবং আমার উপরোক্ত বিধিগুলি সেই অভিধারই উপযুক্ত। তবু আমার মনোভাব যুক্তির প্রসাদ থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলো না। আত্মজিজ্ঞাসাকে আমি এই ব'লে নিরস্ত করতে চেয়েছিলুম যে বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি সংস্কৃতের মতো একটানা না-হওয়াতে বাংলা ছন্দে প্রতি শব্দের শেষে যে-অবকাশ আসে, তা সংস্কৃততে শুধু চরণান্তেই বর্ত্তমান, কিন্তু এই দুই অবকাশের কালপরিমাণ যদি এক হয়, তবে তাদের ধর্ম্মও এক হবে এবং পদান্ত্য বর্ণের মতো প্রাগযতি অথবা প্রাগ্‌বিরাম বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতাও স্বয়ম্বশ হতে বাধ্য। অনুমানটা হয়তো নিতান্ত অন্যায্য নয়, কিন্তু এত ক'রেও সকল সমস্যা মিটলো না। অনেক পরিচিত দৃষ্টান্তে এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্কৃত বিধির ব্যতিক্রম তো ঘটলোই, এমন-কি বাংলা কাব্যের একটা বিরাট বিভাগ, অর্থাৎ স্বরমাত্রিক ছন্দ, এই নিয়মের বশ্যতা কোনোমতেই মানলে না। বরং তাকে বিজাতীয় ছন্দরীতির সাহায্যে বোঝা গেলো, তবু সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত করা গেলো না। স্বরমাত্রিককে বৈদেশিক আখ্যা দিতে পারলে, হয়তো গোলোযোগ চুকতো, কিন্তু সেদিকে কোনো সুরাহা ছিলো না। কারণ মেয়েলি ছড়া এবং গ্রাম্য প্রবচন ইত্যাদি যে-ছন্দে রচিত, তাকে পরদেশী বললে, বাংলার প্রাণবস্তুকেই অস্বীকার করা হয়। কাজেই বহু প্রসিদ্ধ ছন্দোবিদের অনুসরণে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক দ্বৈত মেনে নিয়ে, আমি মনে মনে স্থির করলুম যে স্বরমাত্রিক ছন্দই বাংলা কাব্যের আদিম বাহন; তবে তার উৎপত্তি প্রাক্‌সংস্কৃত যুগে হওয়াতে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিধিবদ্ধতা তার নাগাল পায়নি; কিন্তু জগতের সকল কাব্যকলার মূল নিশ্চয়ই এক; সংস্কৃত সাহিত্য স্বেচ্ছায় সেই সহজতাকে পরিহার করেছিলো, তাই বাংলা ছন্দের যে-অংশটা সংস্কৃত-গন্ধী, তার নিয়ম জগতের অন্যান্য ছন্দপদ্ধতির অনুরূপ নয়, যেটা অবিকৃত, তার সঙ্গে বাহিরের সংযোগ সুস্পষ্ট।

এই অদ্ভুত ধারণার ইতিহাস প'ড়ে, অনেকেই হয়তো হাসবেন। কিন্তু তাতে আমি লজ্জিত নই; কারণ বাংলার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষক, তার আনুগত্যে অসম্মান নেই, আছে কেবল গৌরব। আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি, পূর্ব্বসূরিগণের সাধনালব্ধ সিদ্ধান্তকে অকারণে বা অল্পকারণে উপেক্ষা করা আমার স্বভাবে বাধে। উপরন্তু বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্করণ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত এবং বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় সত্যের স্থান নেই। বৈজ্ঞানিক নিব্যূঢ়তার পূজা করেন না, তিনি খোঁজেন

অনুমিতির ব্যাপকতা। তিনি জানেন যে পৃথিবীকে অচল ভেবে তার চারদিকে সূর্য্যকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানোয় সত্যের অপলাপ হয় না, হয় শুধু অনুমিতি-সংখ্যার অনাবশ্যক বৃদ্ধি। অর্থাৎ পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বললে যতগুলি সমস্যার সমাধান করতে হয়, সূর্য্যকে কেন্দ্রে বসালে ততগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না ; তাই বৈজ্ঞানিক সারল্যের খাতিরে আমাদের জগৎকে সৌরকেন্দ্রিক ব'লেই পরিকল্পনা করেন। ছন্দ-সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। এখানেও সত্যাসত্যের ভাবনা ভাবা অসার্থক, যেটা আলোচ্য সে হচ্ছে এই যে নবতর অনুমান অধিক ব্যাপক কিনা। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকরণেও বাংলা কাব্যের ছন্দোলিপি করা সম্ভব, কিন্তু তাহলে বাংলা ছন্দকে দ্বিধা- বা ত্রিধা-বিভক্ত ব'লে মনে করতে হয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ শিরোধার্য্য ক'রেও আমি বাংলা ছন্দের ঐক্য খুঁজি, এবং যখন অন্বেষণ সার্থক হয়, তখনো তাঁর অভিজ্ঞতাকে মূল্যহীন ভাবি না, শুধু মানি যে তাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তীরা সারল্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক এগিয়েছেন।

আমি যত দূর জানি, এই ঐক্যসাধন ব্রতের প্রথম পুরোধা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এ-সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন। "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র"-নামক আলোচ্য পুস্তিকাখানি সেই সন্দর্ভের সংক্ষেপসার। বইখানির রচনারীতি দেখে মনে হয়, গ্রন্থকার বাংলা লেখায় এখনো অনভ্যস্ত। তাছাড়া তাঁর অপ্রাঞ্জল পরিভাষা, ছাপার ভুল এবং ব্যাখ্যার অভাব ইত্যাদি দোষ বইখানির রসগ্রহণের যথার্থ অন্তরায়। কিন্তু এ-সকল দুর্ব্বোধ্যতা এবং দৃষ্টান্ত উদ্ধারে অমার্জ্জনীয় ভুলচুক সত্ত্বেও, অন্তত আমার মনে আর কোনোই সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতিসম্বন্ধে যা বলেননি, তা বক্তব্যই নয়। এই প্রশংসা অমিত হ'লেও বিবেচনাসম্ভূত। সত্য বলতে কি, অমূল্যধনের লেখা যখন প্রথমে সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে পড়ি, তখন মনে কেবল প্রতিবাদই জেগেছিলো ; কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য পুস্তকাকারে হাতে পাওয়ার পরে, আমার মুখ্য আপত্তিগুলির বোধহয় আর একটাও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য এখনো ছোটখাট অনেক বিষয়ে কৌতূহলের তৃপ্তি হয়নি, কিন্তু তার জন্যে হয়তো আমার স্থূল বুদ্ধিই দায়ী। অমূল্যধন যদি তাঁর সূত্রগুলিকে উদাহরণ-সমেত সবিস্তারে লেখেন, তবে আর কোনো অভিযোগ থাকবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। কারণ যাঁর দৃষ্টিতে ছন্দের সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে তিনি কোনোমতেই পরাস্ত হতে পারেন না।

জয়-পরাজয়ের কথা বাধ্য হয়ে পাড়লুম, কারণ ছন্দ-যুদ্ধ আজকালকার সাময়িকীর প্রধান উপকরণ। এই বাক্‌বিতণ্ডার—অনেক সময়ে ভদ্রতাবিরুদ্ধ বাক্‌বিতণ্ডার, অনেকখানিই আমার বুদ্ধির অতীত ; কেননা ছন্দসম্বন্ধে আমার কতকগুলো কার্য্যকারী ধারণা থাকলেও, এ প্রসঙ্গে গভীর অনুশীলন আমি কখনো করিনি। তবে যতটা বুঝি, তাতে মনে হয়, তর্ক মূলত বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে। অবশ্য বাংলা ছন্দ যে বস্তুত ত্রিপথগা, তা কোনো পক্ষই অস্বীকার করেন না, অস্বীকার করার উপায়ও নেই, কারণ এই বিভাগ-তিনটি কেবল অনুমানসাপেক্ষ নয়, শ্রুতিগোচরও বটে। কাজেই দ্বন্দ্ব প্রভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে। অমূল্যধনের প্রতিবাদকেরা বলেন যে প্রকার-তিনটি বংশগত নয়, জাতিগত। অর্থাৎ তাঁদের মতে এই ত্রিধারা বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি, এগুলি অনাদ্যন্ত ও স্বসমুখ। অমূল্যধনের বিবেচনায় বাংলা ছন্দ কার্য্যত তিন প্রকারের—

শুধু তিন কেন বহু প্রকারের, হলেও তার মূলসূত্র এক ও অবিভাজ্য। এ যেন এক পিতার বহু সন্তান, তাদের কায়িক রূপে যতই তারতম্য থাকুক, তাদের রক্তে কোনো পার্থক্য নেই, তাদের তাল এক কিন্তু ঢঙ ভিন্ন। নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে অমূল্যধনের মতই বেশি যুক্তিবান, কারণ একই ভাষায় মাত্রাগণনার পদ্ধতি ত্রিবিধ, এমন মনে করা তো কষ্টকল্পনা বটেই, উপরন্তু তাতে কৃতকার্য্য হ'লেও, প্রয়োগের বেলায় দেখি যে অধিকাংশ প্রাচীন কবিতাই এই ত্রিধা আদর্শের বহির্ভূক্ত থেকে গেলো। এ ক্ষেত্রে যাঁরা প্রাকৃবৈবকি কবিমাত্রকেই ছন্দোদুষ্ট ব'লে ভাবতে না-পারবেন, তাঁদের পক্ষে অমূল্যধনের পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর সাহায্যে এক্‌দেশদর্শিতা তো বাঁচেই, অসম্ভাব্যতাকেও প্রশ্রয় দিতে হয় না।

অবশ্য পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ অমূল্যধনের নূতন আবিষ্কার নয়; ছন্দোবিচারকমাত্রেই ও-দুটির অস্তিত্ব মেনে এসেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীরা ছন্দে কালের প্রভাব-সম্বন্ধে অমূল্যধনের মতো সচেতন ছিলেন না; তাই তাঁরা অক্ষর বা মাত্রার হিসাবেই ছন্দোলিপি বানাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। অমূল্যধন দেখিয়েছেন যে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ কালপরিমাণই হচ্ছে বাংলা ছন্দের প্রাণ। এক ঝোঁকে কতকগুলো কথা ব'লে যাওয়াই বাংলা উচ্চারণের রীতি; কিন্তু বাক্যারম্ভে বাক্‌যন্ত্রের যে-শক্তি থাকে, বাক্যের শেষে স্বভাবতই তা কমে আসে, এবং বাংলা শব্দও যেহেতু কাটা কাটা ভাবে উক্ত হয়, তাই এখানেও ওই উত্থান-পতন ধরা পড়ে। এতে ক'রে স্বরগাম্ভীর্য্যের একটা হ্রাস-বৃদ্ধি চলতে থাকে, এবং সেই স্বরকম্পনই বাংলা ছন্দের প্রধান উপকরণ। অতএব যদি এই পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আদর্শ ও পরিমাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে অক্ষরমাত্রার কম-বেশিতে বাংলায় ছন্দোপতন হয় না; পাঠক বিনাকষ্টেই অক্ষরমাত্রাকে প্রয়োজনমতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ ক'রে নিতে পারে ও নেয়।

অবশ্য একথা বলার ব্যাবহারিক মূল্য অল্পই। কিন্তু ছন্দশাস্ত্র যেহেতু কাব্যরচনার পথনির্দ্দেশ করে না, শুধু কাব্যবোধের উপাদান জোগায়, তাই অমূল্যধনের আবিষ্কারকে আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। এতে ক'রে বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি নিশ্চয়ই ওঙ্কারে পরিণত হলো না, কিন্তু ত্রিবেণীসঙ্গমের সন্ধান মিললো। অর্থাৎ বুঝলুম যে আপাতদৃষ্টিতে বাংলা ছন্দকে স্বরমাত্রিক, আক্ষরিক, মাত্রিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা গেলেও, আলোচনাটিকে এমন এক পর্য্যায়ে তোলা যায় যেখানে এই প্রকারভেদ নিতান্ত নিরর্থক। ব্যবহারের ক্ষেত্রে অথবা বাংলা কাব্যের আধুনিক কাণ্ডে পূর্ব্বানুমোদিত স্তরভেদ এখনো মোটামুটি খাটবে; এবং যে-গদ্যকারেরা অঙ্কব্যতীত ছন্দ লিখতে পারেন না, অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম তাঁদের কার্য্যোদ্ধারের বিশেষ সহায়তা করবে না। কিন্তু যিনি শুধু কাজ চালিয়েই তুষ্ট নন, বিজ্ঞানসম্মত ঐক্যই যাঁর কাম্য, তিনি ভবিষ্যতে অমূল্যধনকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবেন, তবু আলোচ্য বইখানির ঋণ অস্বীকার করবেন না, তাঁকেও মানতে হবে যে গন্তব্যে পৌঁছতে না-পারলেও, পথ-সম্বন্ধে অমূল্যধনের ভুল হয়নি।

আমার ব্যক্তিগত জগতে ঐক্যসাধনের প্রয়োজনটাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। হয়তো সেইজন্যেই আলোচ্য গ্রন্থের এই দিকটাতে বেশি জোর দিয়েছি। কিন্তু তাহলেও এটা আমি জানি যে কেবল সাধারণ সূত্রের উপরে যে-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, যার দ্বারা শুধু অভিন্নতাই সূচিত হয় এবং বৈষম্য অব্যাখ্যাত থাকে, তার মূল্য সামান্য।

সুতরাং অমূল্যধনের নির্দ্দিষ্ট পথে বাংলা ছন্দের সমস্যামূলক ত্রিত্বের কোনো হেতু পাওয়া যায় কিনা, তার বিচারেই এ প্রবন্ধ শেষ করা প্রশস্ত। প্রথমেই শব্দান্তের বিরাম, পর্ব্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ, এই তিন অবকাশের নাম নিয়েছিলুম। এগুলিকে পৃথক আখ্যা দেওয়ার সার্থকতা এই যে এদের কালপরিমাণ এক নয়, ক্রমবিবর্দ্ধমান। ছেদ সাধারণত অর্থের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ছেদে থেমে পাঠকের বুদ্ধি সমাপ্ত বাক্যের মানে বোঝে, এবং আগামী বাক্যের ভাবগ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়। এইজন্যে ছেদের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক, অন্তত মিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পর্ক, খুব নিবিড় নয়। কিন্তু যতি নিঃশ্বাস গ্রহণের কাল; কাজেই যে-ছন্দে যতি দূরে দূরে স্থাপিত, সেখানে শব্দ এবং অক্ষরগুলো একটু তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হতে বাধ্য, কারণ বাক্যের মধ্যে শ্বাস নেওয়া বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ফলে যতি-বিরল ছন্দে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরান্ত, হলন্ত ইত্যাদি সকল অক্ষরই প্রায় সমান ভাবে উচ্চারিত হয়, যৌগিক বর্ণ তার যথার্থ মর্য্যাদা পায় না। গদ্যে তো এ রকম ঘটেই, এমন-কি পয়ারও এই জাতীয় ছন্দ: কারণ অন্তত আট মাত্রার পরে তার প্রথম অবকাশ, এবং দ্বিতীয় অবকাশ ছয় বা দশ মাত্রার পরে। সুতরাং গদ্যে বা পয়ারে বর্ণোচ্চারণের খুব স্পষ্টতা নেই, আছে একটা ঝোঁক অথবা তান; এবং তার ফলে যুক্ত অযুক্ত, লঘু গুরু, সব অক্ষরই পয়ারে একমাত্রিক ব'লে গণ্য হয়। পয়ারের এই গুণকেই রবীন্দ্রনাথ শোষণশক্তি নামে অভিহিত করেছেন।

পক্ষান্তরে অবকাশ যেখানে ঘন ঘন আসে, সেখানে শ্বাসের অনটন না-থাকাতে প্রত্যেক বর্ণ তার প্রকৃত ওজন পেতে পারে। এই শ্রেণীর যতিবহুল ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান নামে পরিচিত। এর চাল দ্রুত, ধ্বনি তরঙ্গায়িত এবং এর শোষণ-শক্তি ফলত সুপরিমিত। অর্থাৎ এতে যৌগিক স্বর, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ, হলন্ত অক্ষর ইত্যাদির মাত্রাসংখ্যা দুই এবং সময়ে সময়ে তিন। তথাকথিত স্বরবৃত্ত অথবা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ, আমার মতে, শব্দান্ত্য বিরামের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এ-ছন্দে শব্দান্ত্য বিরামই শ্বাসের অবকাশ, যতি নিতান্ত গৌণ। কাজেই এখানে পাঠকের নিঃশ্বাসের পুঁজি সাধারণ উপায়ে ব্যয়িত হয় না, তার সদ্ব্যবহার করতে গেলে, তাকে অতিরিক্ত কাজের ভার নিতে হয়। ফলে, বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে-স্বরাঘাতের সূচনা হয়, এখানে সেটা, ইংরেজি উচ্চারণের মতো, শব্দে শব্দে অনুরণিত হতে থাকে। অমিত্রাক্ষরের কারবার ছেদকে নিয়ে। এখানে অর্থ এবং আবেগই একমাত্র লক্ষ্য, ছন্দশিল্পের কারিকুরি নেহাৎ নগণ্য। হয়তো সেইজন্যেই তাতে যত নিষেধের ব্যতিক্রম চলে, অন্যত্র তা সম্ভব হয় না। সেখানে শ্বাসের অবকাশ এতই অপ্রচুর যে ছোটখাট অসম্পূর্ণতার হিসাব রাখা আর তার সাধ্যে কুলায় না। একটা অবিরাম ও উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গের উপরে ত্রুটি ঢাকবার ভার ছেড়ে দিয়ে, পাঠক ছেদের উদ্দেশে এমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে যে তার স্বাভাবিক বিজোড়বিদ্বেষকে উপেক্ষা ক'রেও, তাকে তিন পাঁচ বা সাত ইত্যাদির মতো অযুগ্ম সংখ্যায় অনায়াসেই থামানো যায়।

এই বিরাম, যতি ও ছেদ সম্বন্ধে যা বললুম, তার প্রকাশ্য উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেখক পরিশিষ্টে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করেছেন। এ-ধারণা যদি ভ্রান্তও হয়, আমার শৈশব যতিপ্রিয়তা থেকেই যদি এর জন্ম হয়ে

থাকে, তবুও ক্ষুণ্ণ হবো না ; কারণ এ-প্রসঙ্গে যদিও বা ভুল করি, তাহলেও অন্যত্র তিনি আমার অজ্ঞানান্ধকারে সত্যই জ্ঞানদীপ জ্বেলেছেন। সে-সব কথার সংক্ষেপসার দিলুম না, কারণ সমগ্র গ্রন্থখানিই এত সংক্ষিপ্ত যে তাকে আর কমানো আমার সাধ্যের অতীত। তাছাড়া পুস্তকখানির সারসংগ্রহের জন্যে যতটা সময় ও স্থানের দরকার, তা আমার নেই। তাই অমূল্যধন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েই আমি ছুটি নিচ্ছি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Adventures of the Black Girl in Her Search for God—By Bernard Shaw (Constable)

বার্ণাড শ-এর অনন্যসাধারণ লিপিদক্ষতা বিশ্ববরেণ্য। তাঁর কলমের খোঁচাটি পর্য্যন্ত আজ নাট্য জগতে প্রভূত অর্থ উৎপাদনে সমর্থ এবং তিনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। অথচ গত বৎসর Knysna-তে যখন একটানা পাঁচ সপ্তাহ আটক পড়ে লেখবার প্রচুর অবসর পেলেন তখন সামান্য এক কাফ্রি-কন্যার রূপকথা লিখে পাদ্রী-মহলে অনর্থ বাধিয়ে বসলেন। ধর্ম্মগ্রন্থে অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা অবশ্য তিনি বহুবারই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জগৎকে জানিয়েছেন কিন্তু এই স্বল্পাঙ্গ বইটির শেষভাগে দীর্ঘায়িত তর্কালোচনাতে বাইবেল-উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে তার নিশ্চয়তা আমাদের মত অ-খৃষ্টীয় নিরাসক্ত মনেও চঞ্চলতা এনে দিয়েছে।

বিষয়টি মামুলি এবং শ কোন গভীর তথ্য বা জটিল সমস্যার অনাবশ্যক সৃষ্টি করেন নি ; তথাপি ইউরোপীয় চিন্তাজগতে তাঁর ক্ষুদ্রকায় বইটি অবলম্বন করে আজ যে ঝড় উঠেছে তার প্রকোপ দেখে মনে হয় তিনি জীবনের সায়াহ্নকালে যে প্রশ্নটি তুলেছেন তার পিছনে অনেকখানি সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। মনে অবশ্য সন্দেহ জাগে যে ইউরোপ হতে বাইবেলের প্রভাবের সমূল উচ্ছেদ সম্ভব কিনা, কারণ বর্ত্তমান নিরীশ্বরবাদের যুগেও ইংরাজ ও মার্কিন জনসমষ্টি ঐ ধর্ম্মগ্রন্থকে স্বয়ং পরমেশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করে থাকে। ভক্তি অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হওয়ায় গ্রন্থটির প্রচার ও ব্যবহার আশ্চর্য্য ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যথা, ভূত বা রোগ তাড়াবার কবচ, আদালতে শপথ গ্রহণ, যুদ্ধে bullet proof, আরও কত কি। এই সকল যাদুকরী মোহকে আগলে আছে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও শক্তিমান গির্জ্জা-সঙ্ঘ।

কিন্তু আলোচ্য বইটিতে শ বাইবেল পড়ার ঔচিত্য অস্বীকার করেছেন, গ্রন্থটির মহত্ত্ব স্বীকার করেও। অসভ্য পৌত্তলিকতা হতে চেতনের বিকাশ ও বৃদ্ধির এই যে কল্পনা, এর বাস্তবতা অর্দ্ধেক ভ্রান্ত হলেও প্রাণের গভীর প্রেরণা নিঃসৃত বলে তিনি মেনে নিয়েছেন। অনুবাদকদের অত্যদ্ভুত লিপিদক্ষতা, কবিপ্রতিভা, সংযম ও শালীনতা তাঁকেও মুগ্ধ করেছে। তথাপি তিনি বাইবেলের প্রভাব নষ্ট করতে চান, কারণ মানব-চৈতন্য স্বভাবতঃ অলস এবং এই আলস্যের জন্য সাধারণ শিক্ষিত লোক রাশীকৃত আবর্জ্জনা পরিষ্কার না করেই নূতন জ্ঞানের বোঝা মনের ভাণ্ডারে

জড় করে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে এবং বহু অনাসক্ত ও উন্নত মনেও পুরাতনের সঙ্গে নূতনের জোড়াতাড়া ও গোঁজামিল দেবার প্রবল অভ্যাসদোষ থেকে যায়। তাঁর মতে মানব সমাজে বর্ত্তমান নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার মূলে পুরাতনের এই দূষনীয় আকর্ষণীশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেল হতে মেকী, সংকীর্ণ ও কদর্য্য অংশগুলি উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে মহত্ত্বের সঙ্গে সেগুলি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে ভক্ত মনে আসন গ্রহণ করেছে যে বাছাই চলে না। অর্থাৎ নোয়ার ক্রুদ্ধ দেবতা ও জোবের তার্কিক দেবতার সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্রাযিষ্ট এক হয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন যে যখন চৈতন্যরূপ সূক্ষ্ম ভাবধারা স্থূলকায় দেবতাদের সহজ সঞ্চরণে আবিল হয়ে ওঠে এবং ধর্ম্মের নামে অভ্যাসদোষ মানুষের মনে স্থান অধিকার করে মানবচৈতন্যকে নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ করে, তখন সচেতন মানবমনের তরফ থেকে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের লেখা শ-এর জীবনী পড়লে ধারণা জন্মায় যে বুদ্ধি-দীপ্ত ঔদ্ধত্য বশতঃ বুঝি চিরকালই শ ক্রাযিষ্টকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছেন। শ-এর সব লেখা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি তবে এই বইটি পড়ে সে ধারণা দূরীভূত হয়েছে। ক্রাযিষ্টকে তিনি অস্বীকার করেন না, তবে কয়েকটি সরল সত্য কথা আগলে রাখবারও প্রয়োজন বোধ করেন না, বিশেষ করে তাতে যখন বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাই অধিক। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়েছেন যে পুঁথির জীর্ণ কাগজ চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় সত্যের একমাত্র বাহন নয়।

বিপর্য্যয়ের প্রমাণের অভাব নাই। বার্মিংহামের বিশপ সম্প্রতি ভীতি প্রকাশ করেছেন যে ইংরাজ গির্জ্জা-পন্থীরা বিজ্ঞানের সংঘাতে পথভ্রষ্ট হয়ে ক্রাযিষ্টকে ছেড়ে গোঁড়ামির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছে। শ তারই রেশ টেনে গত মহাযুদ্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণের সাহায্যে আরও প্রমাণ করেছেন যে ধর্ম্মপ্রাণ সুসভ্য ইউরোপ যেরূপ দ্রুতগতিতে আজ অস্ত্র নির্ম্মাণে মত্ত, তাতে অ-খৃষ্টীয়দের আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখা উচিত।

অনেকের ধারণা শ অতিরিক্ত নাটকীয়, এবং আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁর প্রকৃতি-গত বিরোধ থাকার জন্যেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠলেই বিশেষণপ্রাচুর্য্য ও অতিকথনের ভারে তিনি নিজের বক্তব্যকে কলুষিত করে তোলেন। কিন্তু আলোচ্য বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে তাঁর সত্যনিষ্ঠার প্রাখর্য্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সত্য হয়তো মানুষের সীমাবদ্ধ চৈতন্যের উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ও নিজের রূপ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করে অতিবড় ঔদ্ধত্যেরও মাথা নত করে দেয়—কিন্তু নিষ্ঠার মাধুর্য্য সনাতন। শ-এর বহুমুখী প্রতিভার অন্তর্নিহিত এই নিষ্ঠাই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

গল্পের কথা এখনও বলা হয়নি। একটি কাফ্রি-কন্যার ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসা কথনচ্ছলে রূপকথার ছাঁদে বইটি লেখা হয়েছে। উড্‌কাট চিত্রে বিচিত্র, ক্ষুদ্রকায় বইটির রচনাভঙ্গীতে সারল্যের মৌলিকতা ফুটে উঠেছে। ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় উলঙ্গ কাফ্রি-কন্যার আমদানি যাঁরা উদ্ভট মনে করতে পারেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে আফ্রিকাই জগতের মধ্যে আজ একমাত্র মহাদেশ অবশিষ্ট আছে যেখানে অতীত হতে আহৃত সংস্কারের ভার মানবমনকে গতিহীন করতে পারেনি। সে দেশে শিশুসুলভ সরল মনের নির্ভীক ও নির্লজ্জ প্রশ্ন কথার চাতুরীতে প্রবোধ মানে না। বালিকাটির কাছে যখন ঈশ্বর পূর্ণগ্রহণ বা ভূমিকম্পের মতই প্রত্যক্ষ সত্য

ও বাস্তব, তখন সে মিশনারীর কথায় না ভুলে যে একটা লগুড় হাতে নিজেই ঈশ্বর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

একটু অস্বস্তি স্বতঃই মনে জেগে ওঠে যখন নিছক রসের সরলতা বিচিত্রতর করে তুলতে শ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে বিকৃত করে তোলেন। গল্পের প্রারম্ভে মিশনারী চরিত্র অঙ্কনে তিনি অমার্জ্জনীয় একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মহিলা মিশনারীমাত্রেই প্রণয়-ব্যাপারে বৈফল্যবশতঃ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে পরমার্থ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন না তা শ-এর জানা উচিত ছিল। গল্পটিতে মিশনারী-চরিত্রটি অবশ্য গৌণ কিন্তু নিরর্থক নিষ্ঠুর টিপ্পনীর দ্বারা এক শ্রেণীর লোকদের গাত্রদাহ উপস্থিত করিয়ে তাঁর রচনার সম্পদ অণুমাত্রও বেড়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু তাঁর শিল্পচাতুর্য্যের এমনি মহিমা যে কূট তর্কের মধ্যে যুক্তিবৈষম্য প্রয়োগ করেও তিনি রচনাকে সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য করতে পারেন।

চঞ্চলচিত্ত, মুখরা, সত্যসন্ধানী কাফ্রি-মেয়েটির ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য, স্পর্দ্ধা ও আত্ম-সংস্থা অবলীলাক্রমে বাইবেলের দুর্দ্ধর্ষ সংহার-মূর্ত্তি দেবতাদের পরাস্ত করে আমাদের জুজুর ভয়পীড়িত মনকে উৎফুল্ল করেছে। ক্রাইষ্টের সন্ধান মিললো যাত্রা-শেষে নয়, পথিমধ্যে কূপপার্শ্বস্থ সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়। তিনি প্রথমে ক্ষিপ্র হস্তে দুই একটি 'ম্যাজিক' দেখিয়ে বালিকাটির হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁর বিনয়-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েও বালিকা চিরন্তন প্রশ্নটি পরিত্যাগ করলে না। অবশেষে ঐ অমায়িক ভদ্রলোকটিকেও স্বীকার করতে হলো—'to find him such as you must go past me'।

গোঁড়া খৃষ্টানদের যাঁরা এইখানে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হাহুতোস্মি করতে থাকবেন তাঁদের আশ্বাস দিয়ে সমালোচনাটি এই বলে শেষ করতে পারি যে বালিকাটির অহমিকা আর বেশী দূর গড়ায় নি। ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসার বাতুলতা মস্তিষ্কে প্রবেশ করা মাত্র চতুর বালিকা সনাতন প্রথামত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান লালন পালন ও বৃক্ষ রোপণে অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিলে।

অবশ্য এইরূপ জীবন্ত সমাধি লাভ করবার পূর্ব্বে তার সবল দৃষ্টির আলোকে বিজ্ঞানের সংকীর্ণতা, শিল্পের অসারতা ও মহম্মদের একদেশদর্শিতা উদ্ভাসিত হয়ে তার চিত্তকে তিক্ত করে দিয়েছিল।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Where is Science Going?—By MAX PLANCK, with a Preface by Albert Einstein, translated and edited by James Murphy, (George Allen & Unwin Ltd)

বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার ও তার ভাবার্থ সম্বন্ধে ইদানিং এতগুলি বই লেখা হয়েছে যে তার তর্কবিতর্কের কচ্‌কচিতে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে বল্লেই হয়। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে এই দুরূহ বাদানুবাদ পুনঃসঞ্জীবিত করা কেন। অপরপক্ষে এ কথা মনে করাও অসঙ্গত হবে না যে এই বাদানুবাদের একটা সুরাহা

করবার জন্য প্লাঙ্ক আইনষ্টাইন তুল্য মহারথীদের বিধান নেওয়া নিতান্ত মন্দ প্রস্তাব নয়। আলোচ্য বইটির সম্পাদক মার্ফি কতকটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ দুই বৈজ্ঞানিকের কাছে গমন করেছিলেন। উপরন্তু আইনষ্টাইনের কাছে তিনি এ প্রস্তাবও করেন যে পুস্তকপ্রকাশক ও কাগজওয়ালার কল্যাণে ইংরাজীশিক্ষিত দেশে 'আপেক্ষিকতা'র যতটা প্রচার হয়েছে, আপেক্ষিকতার চেয়েও নব্যবিজ্ঞানের যা ঢের বেশী গভীর তত্ত্ব সেই Quantum law বা মাত্রাতত্ত্বের ততটা প্রচার হয়নি, অতএব এই তত্ত্বটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত করানো অবশ্যকর্ত্তব্য। এ প্রসঙ্গে আইনষ্টাইন্ একরকম এই কথা বলেন যে সাধারণবোধ্য করতে গিয়ে যে সাহিত্য রচনা করা হয় তাতে বিজ্ঞান বেচারী মারা পড়ে। এডিংটন্ জীনস্ প্রভৃতির লেখায় যে আদর্শবাদ ব্যক্ত হয়েছে সে বিষয়ে মত জানতে চাইলে আইনষ্টাইন্ বলেন—এ সব বৈজ্ঞানিক সাধারণ পাঠকের জন্য সাহিত্যের তাড়নায় য'ই লিখুন না কেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক অন্তরাত্মা কখনই কোন অবৈজ্ঞানিক কথার আমল দেবে না। অর্থাৎ পাকা বৈজ্ঞানিক আপন গণ্ডীর বাইরের কোন ব্যাপারেই ফতোয়া জারী করবেন না।

এ সত্ত্বেও বিজ্ঞানবৃদ্ধ প্লাঙ্ক এই সাধারণপাঠ্য বই কেন রচনা করেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিজ্ঞান রচনা করতে হলে কতকগুলি জিনিষ মেনে নিতেই হয়, সুতরাং কোন্ কোন্ জিনিষ মেনে নেওয়া হচ্ছে তার তালিকা দেওয়া বৈজ্ঞানিকেরই কাজ। এই বিষয়ের জবানবন্দীতে প্লাঙ্ক বলেছেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক হয়েই বাহ্য-জগতের অতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও পুরাপুরি আস্থাবান।

যে মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আইনষ্টাইন বইটিকে অলঙ্কৃত করেছেন তা যেমন মনোজ্ঞ তেমনি শ্রদ্ধামণ্ডিত। তা থেকে একটু উদ্ধৃত করলাম,—

> I am sure Max Planck would laugh at my childish way of poking around with the lamp of Diogenes Well! why should I tell of his greatness? His work has given one of the most powerful of all impulses to the progress of science His ideas will be effective as long as physical science lasts And I hope that the example which his personal life affords will not be less effective with the later generations of scientists

মার্ফি প্লাঙ্কের একটি ছোট্ট জীবনচরিত দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায় তাঁর এই personal life-এর প্রভাব তাঁর কাজে, লেখায় ও তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে কত সজীব। আজ পঁচাত্তর-এর কাছাকাছি বয়সে তিনি দেশের সর্ব্বোত্তম বৈজ্ঞানিক আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন আর বিজ্ঞানে তাঁর সত্যসন্ধানী খরদৃষ্টি, অকৃত্রিমতা ও ঔদার্য্য, শুধু দেশবাসীর নয়, সারা জগতের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে বিপুল সম্ভ্রম অর্জ্জন করেছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে প্লাঙ্ক গত পঞ্চাশ বছরের বিজ্ঞান বিকাশের একটা বিবরণ দিয়েছেন। এ বিবরণে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তার একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথাটা এই—সাধারণ লোক মনে করেন যে relativity-র মূলসূত্র হল দেশ কাল ও তার মাপযোগ এই সমস্তকেই আপেক্ষিক বলে প্রতিপন্ন করা। তা নয়,—আসল কথা এই যে দেশকালময় four dimensional world-এ যে কোন

দুটি ঘটনা সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ একটা পরিমাণ দিয়ে যুক্ত। আপেক্ষিকতা যে ধ্রুবমানকে উড়িয়ে দেয়নি, এ সংবাদটুকু সাধারণ পাঠকের নিশ্চয় কাজে লাগবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্লাঙ্ক জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মত তাঁর আগের বইয়েই সুচারুরূপে বিবৃত হয়েছে। তাঁর মতে প্রত্যক্ষমাণ জগতের পিছনে একটা বাস্তব অস্তিত্বমান জগৎ রয়েছে। অবশ্য এ কথা যুক্তি দিয়ে (formal logic) প্রমাণ করা যায় না কিন্তু যুক্তিবলে খণ্ডনও করা যায় না। বৈজ্ঞানিক জগৎ এই আসল জগতেরই প্রতিবিম্ব,—nature's image in science। কিন্তু এ প্রতিবিম্ব অসম্পূর্ণ, আস্তে আস্তে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। পরীক্ষা ও নিরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সৃজিত হচ্ছে না, বৈজ্ঞানিকের মন থেকে স্বপ্রণোদিত হয়েই তা সৃজিত হচ্ছে, সুতরাং বিজ্ঞান-কল্পিত জগৎ অভিজ্ঞতার ফল নয় ররং অভিজ্ঞতা-কর্ত্তৃক পরিশাসিত পরিকল্পনার ফল। সম্মুখে যখন বাধা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলি যখন আর বিজ্ঞানকে পথ দেখাতে পারে না, তখন বৈজ্ঞানিকের মনে ঐকান্তিক চিন্তার ফলে নূতন তথ্য বিকশিত হয়ে ওঠে। তার পর যাচাই করার ফলে এগুলি কর্ত্তিত বর্জ্জিত বা সম্প্রসারিত হয়ে গৃহীত হয়। এমনি করে মনের এলোমেলো ও হাতধরা প্রণালীতে বা ররাতলব্ধ অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নীত হয়। অতএব বিজ্ঞান কখনই কোন ব্যাপারেরই শেষ মীমাংসা সম্পাদন করে না, বিজ্ঞান সকল অবস্থাতেই তখনকার মত কাজ চালাবার কলকাঠি। বিজ্ঞানের সকল রকম সূত্রও তাই, বিজ্ঞানাঙ্কিত জগতের চিত্রও তাই। কিন্তু এ চিত্র অঙ্কিত করবার জন্য একান্তভাবে ও নির্ব্বিবাদে দু-একটি জিনিষ মেনে নেওয়া চাই। প্রত্যক্ষ জগতের পিছনে একটা আসল জগতের অস্তিত্ব এইরকম একটা অবলম্বন। প্লাঙ্কের মতে এই আসল জগৎকে মেনে নিলেও বিজ্ঞান কোনদিনই তার শেষ পর্য্যন্ত নাগাল পাবে না, কেবল ক্রমশ তার দিকে অগ্রসর হবে, অগ্রসরের পথ কোনদিনই একেবারে রুদ্ধ হবে না। পথ চলাতেই বিজ্ঞান সফলকাম,—আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের যত বিজয়সিদ্ধি হয়েছে সবই এর অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে।

এ কথা বলা বোধহয় বাহুল্য হবে না যে বিজ্ঞানে অস্তি নাস্তির বিচার মাথা তুলে উঠেছে এই নূতন তত্ত্ব থেকে যে বস্তুর মধ্যে সবই ফাঁকি, বস্তুভাগ শূন্যমাত্র। অণু ছিল এতদিন বিজ্ঞানের আদি সত্তা এখন অণু হয়ে দাঁড়িয়েছে সবটাই প্রায় ফাঁকা, শুধু দু দশটি ইলেকট্রণের রঙ্গভূমি। আবার ইলেকট্রণ তার বস্তুসত্তা হারিয়ে এসে ঠেকেছে শুধু তরঙ্গে। তরঙ্গ বটে কিন্তু কিসের তরঙ্গ তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এই থেকেই এসেছে সাকার অস্তিত্বের (objective reality) প্রতি সন্দেহের প্ররোচনা ও তাই থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি নিরূপণের প্রচেষ্টা।

এর পরের দুটি পরিচ্ছেদে প্লাঙ্ক আলোচনা করেছেন causation and free will—যাকে বলা যেতে পারে হেতুধর্ম্ম বা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা ও ইচ্ছার স্ববশতা। বিজ্ঞানের পক্ষে যে দৃঢ় অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলতা তার আর একটি। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার শাসনে সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আনয়ন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র কাজ। যেখানে যেখানে বিজ্ঞান দখল পায়নি, বলতে হবে সে সব স্থানে কার্য্যকারণ সূত্রও তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। শুধু পদার্থবিজ্ঞানে নয় অন্যান্য বিজ্ঞানেও,—যেমন জীবতত্ত্বে, উদ্ভিদতত্ত্বে, ধনতন্ত্রে, মনস্তত্ত্বে, এমন কি

সমাজতত্ত্বেও এই কার্য্যকাবণ শৃঙ্খলাবই অনুসন্ধান চলছে ও যতই এ সব বিজ্ঞানেব উন্নতি হচ্ছে ততই কার্য্যকাবণসূত্র প্রযোগেব সফলতা প্রমাণিত হচ্ছে। এব মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে হঠাৎ Quantum law,—মাত্রাবিধি, এসে হাজিব হযেই কার্য্যকাবণেব একাধিপত্যেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড়িয়েছে।

হেতুবিধিব দার্শনিক ও যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি কি, সে সম্বন্ধে প্লাঙ্ক এক অপরূপ ও মনোহব বিশ্লেষণ বচনা কবেছেন। তাঁব এ বচনা পঁযাকাবেব বৈজ্ঞানিক সাহিত্যেব পাশে স্থান পাবে বলা বোধহয অত্যুক্তি হবে না। প্রচলিত ইউবোপীয ন্যায ও দর্শনবাদ আলোচনা কবে প্লাঙ্ক দেখিযেছেন যে হেতুবিধি বা কার্য্যকাবণ শৃঙ্খলাব কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ নেই। হেতুবিধিকে একেবাবে গোড়া থেকেই স্বীকাব কবে নিতে হয়, হেতুবিধিব ওপবই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীব প্রতিষ্ঠা। হেতুবিধি আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে প্রায সব কিছুকেই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা কবে এসেছে, বিবোধ উপস্থিত হযেছে ইলেক্‌ট্রনেব নবাবিষ্কৃত আচবণ থেকে। এই আচবণ ধবা পড়েছে নব্যগণিতে, যাব অনুসাবে ইলেক্‌ট্রনেব অবস্থিতি ও গতিমান নির্দ্দেশ কবে বলা অসম্ভব, গণনায তাব খানিকটা অনিশ্চিত হবেই হবে। আব কতখানি অনিশ্চিত হবে তাব পবিমাণও এই নব্যগণিত নিরূপণ কবে দিযেছে। পাখীটা খাঁচাব ঠিক কোনখানটিতে আছে তা নির্ণয কবে বলতে পাবি না কিন্তু খাঁচাব চৌহদ্দি আমবা নির্দ্দেশ কবে বলে দিতে পাবি। এই উদাহবণটি আমবা এখানে জুড়ে দিলাম, যদিও প্লাঙ্ক এব উল্লেখ কবেন নি। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পাবে যে তাহলে ও-গণিত কোন কাজেব নয, কিন্তু এ আপত্তি ঠাঁই পাবে না কেননা ও-গণিত পদার্থ-বিজ্ঞানেব অণু পবমাণু ও ইলেক্‌ট্রনেব অনেক আচবণ ব্যাখ্যা কবেছে যা অন্য কোন গণিতমতে ব্যাখ্যাত হতে পাবেনি। আব এ গণিতেব মূলে বয়েছে মাত্রাবিধি,—যাতে বলা হয় যে, শক্তি একমাত্রা থেকে পববর্ত্তী মাত্রায উঠতে নামতে পাবে কিন্তু মধ্যবর্ত্তী কোন অঙ্কে উপস্থিত হতে বা স্থিব থাকতে পাবে না। দেখা গেছে ইলেক্‌ট্রন ঠিক এই নিযমানুসাবেই শক্তি ভোগ কবে থাকে,—আব এ ছাড়াও মাত্রাবিধি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হযেছে।

প্লাঙ্ক বলছেন যে, প্রথমত ইলেক্‌ট্রনেব অবস্থিতি বা গতিমান নির্ণয কবা যাচ্ছে না বলে এ প্রমাণ হয না যে ও দুটি কার্য্যকাবণসূত্র অনুসাবে নিযন্ত্রিত হচ্ছে না। তাঁব মতে নূতন গণিতকে একদিন হযত এমন কবে ঢেলে সাজানো যাবে যাতে হেতুবিধিব অমোঘতা বজায় থাকবে। দ্বিতীয কথা, অবস্থিতি প্রভৃতি কতকগুলি অভিজ্ঞানকে এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ধবা যাচ্ছে না বলেই যখন হেতুবিধি নিযে এই বিবোধের সৃষ্টি, তখন এও ভেবে দেখা দবকাব যে অবস্থিতিই বা বিজ্ঞানে এমন পবমপদ লাভ কবল কিসে। এতদিন সে পদ সে পেযেছিল কেননা তা দিযেই হেতুবিধি প্রযোগক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ কবেছিল। কিন্তু কোনক্ষেত্রে যদি অবস্থিতি বা গতিমানেব বদলে মাত্রাই পবমপদ পায়,—যদি কোন কিছু কয মাত্রা শক্তিব আদান প্রদান কবলে এই দিযেই ঘটনা-পবম্পবা সুনিয়ন্ত্রিত কবা সম্ভব হয, তবে অবস্থিতি ও গতিমানেব প্রতি আমাদেব পূর্ব্বকাব অশেষ নির্ভবশীলতা জলাঞ্জলি দিতে ক্ষতি কি? ববং এইটিই মনে হয যে অবস্থিতি ও গতিমানেব অভিজ্ঞান সেই পর্য্যাযেব যা সমষ্টি-সম্পর্কে খাটে, খাঁটি ব্যষ্টি সম্পর্কে নয; পবন্তু মাত্রাব প্রকৃত প্রযোগক্ষেত্র ব্যষ্টিতে। অথবা এমনই যদি হয যে কার্য্যকাবণ শৃঙ্খলাসূত্র বিসর্জ্জন না দিলে বিজ্ঞানেব প্রগতি রুদ্ধ হবে, তবে তাব বদলে

যে সূত্র স্বীকাব কবলে সে প্রগতি সিদ্ধ হবে সেই সূত্রই বিজ্ঞান অবাধে গ্রহণ কববে। কোন সূত্রেবই স্বয়ংসিদ্ধ অধিকাব নেই, সেই সূত্রই স্বীকার্য্য যা ব্যাবহাবিকক্ষেত্রে পবীক্ষা নিবীক্ষাব বিশ্লেষণে টিঁকে থাকতে পাবে।

প্লাঙ্ক তাঁব আলোচনায় অহং ও ইচ্ছাশক্তিব লীলাব কথাও বাদ দেননি। তিনি বলেন এ দুটি বিষযে জোব কবে কোন কথা বলা সম্ভব নয, তবে এইটেই যেন মনে হয যে যতই সকল বকম বিজ্ঞানেব উন্নতি হবে ততই মানবচবিত্র, ইচ্ছা ও মনেব ক্রিযা-কলাপ, এমন কি মহানুভব ও মহাজ্ঞানীদেব কার্য্যাবলী ও প্রতিভা ইত্যাদি সমস্তই গণনাব আযত্তাধীন হযে পডবে, কিন্তু অহং-এব দ্বাব থেকেই বিজ্ঞানকে ফিবতে হবে। বিজ্ঞানেব নিত্য নূতন বিজযসাধন যেমন তাব সার্থকতাব পবিচয দিচ্ছে, তেমনি বিজ্ঞানেব এত অধিকাব বিস্তাব সত্ত্বেও সাধাবণেব মনে ঐশী শক্তিব অস্তিত্বে বিশ্বাস ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঐশী শক্তি, অহং ও আধ্যাত্মিকতা বিজ্ঞান-পর্য্যালোচনাব বাইবে,—religion belongs to that realm that is inviolable before the law of Causation and therefore closed to science।

একটা জিজ্ঞাস্য, ভাবতীয ন্যায বা দর্শন কি হেতুবিধি ও বিজ্ঞান এবং reality সম্বন্ধে আধুনিক প্রসঙ্গোপযোগী কোন কিছু আলোক-সম্পাত কবতে পাবে না ?

শ্রীগিবিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Sleepwalkers—By HERMANN BROCH (Martin Secker)
The Forty-second Parallel—By JOHN DOS PASSOS (Constable)

পশ্চিমেব লেখকেবা দিনে দিনে এমন লিপিচতুব হয়ে উঠছে যে প্রায় সকল আধুনিক পুস্তকই সুপাঠ্য, এবং অনেকগুলি স্মবণীয। কিন্তু তাহলেও সাহিত্যিক উৎকর্ষ কমেছে বই বাড়ে নি। যদিও এটা বিশেষ ক'বে নভেলেবই যুগ, এবং প্রতি বৎসবেই একাধিক ভালো নভেল মুদ্রিত হয, তবু যথার্থ মহৎ উপন্যাস যুদ্ধেব পবে বড একটা আব দেখা যাযনা। এই সিদ্ধান্তে পৌছানোব জন্যে টল্‌ষ্টয অথবা হার্ডিকে প্রতিমান হিসাবে ধবা নিষ্প্রযোজন। তাঁদেব তুল্য লেখক সকল দেশে এবং সকল কালেই বিবল, কিন্তু মুব, গল্‌স্‌ওযার্দি, ওযেল্‌স্, বেনেট্ ইত্যাদিব মতো দ্বিতীয় শ্রেণীব কথকদেব তুলনাও আধুনিকদেব পক্ষে ক্ষতিকব। এই দুববস্থাব কাবণ নির্দ্দেশ কবা শক্ত। এব মূলে হযতো কোনো একটা কাবণ নেই; হযতো জীবনেব সার্ব্বত্রিক দুর্দ্দশাই নভেলেও প্রতিবিম্ব ফেলেছে। কিন্তু পাবিপার্শ্বিক সর্ব্বনাশ নভেলকে যতই ক্ষুণ্ণ করুক না কেন, আন্তব দৈন্যই তাব প্রধান শত্রু। এ-মতে সম্প্রতিবিদবা সম্ভবত অধীব হযে উঠবেন, এবং একথা কিছুতেই অস্বীকাব কবা যাযনা যে প্রসঙ্গ ও প্রকবণেব বৈচিত্র্যে নবীনেবা প্রবীণদেব বহু পশ্চাতে ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু এটাও সুনিশ্চয যে নভেল বচনায কেবল উদ্ভাবনাশক্তিই যথেষ্ট নয, তাব জন্যে সত্যনিষ্ঠাও হযতো অনাবশ্যক, যেটা অপবিহার্য্য, সে-গুণ হচ্ছে লবেন্স্ যাকে বলছিলেন thought adventure, অর্থাৎ দুঃসাহসিক ভাবুকতা।

লরেন্স্ ছাড়াও দু-একজন উত্তরসাময়িক ঔপন্যাসিক ওই গুণের মর্য্যাদা বুঝেছেন, সত্য, কিন্তু অধিকাংশই আজ সনাতন আদর্শে আস্থাহারা। অবশ্য এ-মনোভাব মার্জ্জনীয়; এবং সত্যন্ত্র উপন্যাসের নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানসারূপ্য আমার অনুমোদিত। কিন্তু তর্ক বাধে বিশেষণটির অর্থ নিয়ে। সাহিত্যসভায় আত্মজীবনীর বস্ত্রহরণ শিল্পবিরুদ্ধ ব'লেই সেখানে আত্মোপস্থিতি নিষিদ্ধ নয়, এবং নভেলে ভালো-মন্দের ব্যক্তিগত বিচার অশোভন হলেও তাতে একটা জাগতিক মূল্যজ্ঞান শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, আবশ্যিকও। নৈরাজ্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা যে সমার্থবাচক নয়, এই আর্য্যসত্যটিকে আমরা আজ ভুলতে বসেছি। নৈরাজ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা; এবং যে-ব্যক্তি বিধিবদ্ধ বিশ্বকে অহমিকার অহৈতুক অসংস্থিতিতে পর্য্যবসিত করতে পেরেছে, নৈর্ব্যক্তিক তার উপযুক্ত আখ্যা নয়, তার আখ্যা বৈনাশিক। কাজেই সাহিত্যকে যদি যথার্থ ই অনাত্ম ক'রে তোলা কাম্য হয়, তবে মূল্যজ্ঞান বাদ দিলে চলবেনা, বরং কোনো একটা লোকোত্তর আদর্শকে প্রাণপণ ব'লে আঁকড়ে ধরতে হবে। সুতরাং ঔপন্যাসিক যদি শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কল্পনাকে বস্তুবিশ্বের সীমান্তরিত না-করেন, চোখে অতিমর্ত্ত্য নিরীক্ষার কজ্জল না-লাগান, মানবজীবনের পরমার্থ মেনে না-নেন, তবে তিনি হয়তো মমত্ববোধের মাদকতা কাটাতে পারবেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিষকুণ্ডলী এড়াতে পারবেননা, তবে তিনি হয়তো সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবেন, কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যের জীবন্মুক্ত বিশ্বন্তরতার সন্ধান পাবেননা। ঐতিহ্যনির্দ্দিষ্ট পথে চলা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য, এবং মানুষের পশুত্ব অস্বীকার করা অবশ্যই আজ অসম্ভব, তবু আমরা যদি প্রুস্ৎ, লরেন্স্, উল্‌ফ্ বা জয়েস্-এর মতো আমাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একটা নবাবিষ্কৃত নিকষে পরখ ক'রে দেখতে না-পারি, তবে নৈর্ব্যক্তিক হয়েও আমাদের রচনা সাংবাদিক সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতেই আজীবন আবদ্ধ থাকবে।

অবশ্য নূতন প্রতিমান প্রতিষ্ঠা সকল দেশেই দুষ্কর। কিন্তু ঘটনাচক্রের সমাবেশে সর্ব্বস্বান্ত জার্ম্মানিতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছে। জার্ম্মানি আজ এমন একটা সর্ব্বনাশের করলে যে কোনো একজন ব্যক্তির—তা তিনি স্বয়ং নররাবণ হলেও—অধ্যবসায়ে তাকে আর প্রকৃতিস্থ করা যাবেনা। কাজেই এই ব্যষ্টিবিলাসী দেশ আজকে সমষ্টিবাদের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়েছে। এ-বিবরণ কম্যুনিষ্টদ্বেষী নাৎসিদের সম্বন্ধেও খাটে। কারণ তারা যদিও রুষদের শুনিয়ে শুনিয়ে তারস্বরে প্রাচীন জার্মেনিয়ার মৌখিক প্রশস্তি গাইছে, তবু কার্য্যত ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রীয় মঙ্গলকে বড় ক'রে দেখাই তাদের মতবাদের মূলসূত্র, এবং এইজন্যেই তারা আজ এত প্রতাপান্বিত। সমাজতন্ত্রের অনুকম্পায়ীরা যে নাৎসি-প্রবর্তিত রাষ্ট্রনিষ্ঠাকে ভয়ের চক্ষে দেখেন, তা আমি জানি, কিন্তু উদারপন্থী মনুষ্যধর্ম্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। যাঁরা বিশ্বমানবের প্রতিভূ, তাঁরা ব্যক্তিমানবকে জনহিতার্থে আত্মবলি দিতে উপদেশ দিয়েছেন; এবং দেশভক্তদের আদর্শও তদনুরূপ। দেশই হোক আর ব্রহ্মাণ্ডই হোক, যদি সামান্য মানুষের আত্মোৎসর্গে কোনো অতিমানুষিক সত্তার কল্যাণ সম্ভবপর হয়, তবে বুঝতে হবে যে বস্তুত মানুষ নগণ্য নয়, তার জীবন প্রকৃতপক্ষে পরমার্থময়। আমার বিবেচনায় টমাস্ মান্ থেকে সুরু ক'রে হের্মান্ ব্রখ্ পর্য্যন্ত, জার্ম্মানির সকল প্রথম শ্রেণীর লেখকই মানবজীবনের এই মর্য্যাদা মেনে নিয়েছেন। হয়তো সে-দেশের প্রাত্যহিক জীবন

বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্যে আজ একেবারে বঞ্চিত ব'লেই এই অতীন্দ্রিয়প্রিয় জাতি আত্মিক গৌরবের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু কারণ যাই হোক এই অন্ধ বিশ্বাসের সাহিত্যিক ফল সত্যই লোভনীয়। অন্ততপক্ষে বর্ত্তমান জার্ম্মানির আখ্যানশিল্পে যে-গভীরতার পরিচয় পাই, তার জোড়া মিলে কেবল ফরাসী ক্যাথলিকদের উপাখ্যানে এবং রুষ বোল্‌শেভিক্‌দের কথাসাহিত্যে। কারণ এই দুই দলও মানবাত্মার অনন্ত দারিদ্র ও অপার বৈভবে একান্ত আস্থাবান।

বলাই বাহুল্য যে এতাদৃশ উপন্যাসে গল্পাংশ উপলক্ষ্যমাত্র, আসল উদ্দেশ্য লেখকের জাগতিক নিরীক্ষার প্রকাশ। ফলে এ-ধরণের আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্বসীমা অত্যন্ত অস্পষ্ট; তারা চরিত্র নয়, একটা আদর্শ। কিন্তু এতে ক'রে তাদের ব্যক্তিস্বরূপ কমেনা, বরং তার মূর্ত্তিমান অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে; তাদের উত্থান-পতন পাঠকের মনে যে-আবেগ সঞ্চার করে, তথাকথিত বস্তুধর্ম্মী পাত্রপাত্রীরা তার ত্রিসীমানাতেও আসতে পারেনা। ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও দুর্ব্বোধ্য নয়, কারণ যে-নর-নারীর সঙ্গে আমাদের নিত্যকার আদান-প্রদান চলে, তারা এমনি প্রবৃত্তিসঙ্করে গঠিত যে তাদের আচরণের অর্থ আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই তাদের জীবনে যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন আমরা তাকে আর ট্রাজিডি ব'লে ভাবতে পারিনা, কেননা ট্রাজিডির মৌল রহস্য হচ্ছে তার প্রণোদনার অলৌকিক বিশুদ্ধি, তার চরিত্রাবলীর ঐকান্তিক একাগ্রতা, তার সংঘাতের নিখিলব্যাপ্ত মাহাত্ম্য। হের্মান্ ব্রখ্-এর মানস পুত্র-কন্যারা এই অবিমিশ্র ট্রাজিডিধাতুতে নির্ম্মিত, তাদের সমস্যা হচ্ছে সাজুয্যের সমস্যা, তাদের বেদনা নিঃসঙ্গতার বেদনা, তাদের জগৎ মূল্যধ্বংসের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। অতএব "দি স্লিপ্‌ওয়াকর্স্"-কে "ম্যাজিক্ মাউন্টেন্"-এর সমগোত্রীয় ব'লে মনে করতে হয়, তার সমকক্ষ খুঁজলে যেতে হয় "জু স্যুস্"-এর কাছে। অবশ্য ব্রখ্ এখনো মান্ বা ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার্-এর মতো অমরত্বের দাবি করতে পারেননা, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি খুব সম্ভব তাঁর প্রথম রচনা, সুতরাং নিরাশ হবার হেতু নেই. ইতিমধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন।

উপন্যাসের সমালোচনায় গল্পের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া প্রথাসিদ্ধ, কিন্তু এখানে সে-নিয়মের ব্যতিক্রম অনিবার্য্য। তার মানে এ নয় যে এই সাত-শ-পৃষ্ঠাব্যাপী, তিনখণ্ডে-বিভক্ত উপন্যাসখানিতে আখ্যায়িকা নেই; তার মানে শুধু এই যে পুস্তকখানির আখ্যানসূত্র এমনি জটিল, এতই বিস্তৃত যে তাকে দু-চার পাতায় সরল করা অসাধ্য। নানা উপায়ে, বিবিধ দৃষ্টান্তের অনুকরণে, গল্পে, কবিতায়, নাট্যে, নির্ব্যাজ দার্শনিক সন্দর্ভের সাহায্যে ব্রখ্ যে-তত্ত্বটিকে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন, সে হচ্ছে এই যে গত পঞ্চাশ বৎসরে পাশ্চাত্য সমাজ এমনি ব্যক্তিপ্রধান হয়ে উঠেছে যে প্রলয়ের অনর্থই তার উপযুক্ত উপসংহার। আজকালকার অরাজকতার বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে রিনেসেন্স্-যুগের মানুষ যবে অখণ্ড ধ্রুপদী আদর্শকে অচল ভেবে জীবনের মধ্যে বস্তু ও আত্মার দ্বৈত আনলে, সেইদিনই আধুনিক সর্ব্বনাশের আরম্ভ। এই ভেদবুদ্ধির ছিদ্র দিয়ে যে-শনি ঢুকলো, এখনো পর্য্যন্ত তারি দশায় য়ুরোপ বিধ্বস্ত। কারণ জীবনকে দ্বিধা করাই যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে তাকে শতধা করতেও কোনো বাধা থাকতে পারেনা। যখন শুধু আত্মার জন্যেই আধ্যাত্ম চিন্তার দরকার, তখন কেবল আর্টের খাতিরে আর্টচর্চ্চাও সঙ্গত। সুতরাং শুধু লোকহত্যার জন্যে যুদ্ধ, খালি পরস্বাপহরণের

উদ্দেশ্যে বাণিজ্য, মাত্র উত্তেজনার নিমিত্ত বিদ্রোহ ইত্যাদি মতবাদও নৈয়ায়িকের সমর্থন পেলে। এর একমাত্র সমাপ্তি মৃত্যুতুল্য নিঃসঙ্গতায়, এবং তারি প্রসাদে সংসার আজকে শ্মশানে পরিণত।

এই মহাবাণীকে ব্রখ্ চারটি আদর্শ চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে ফোটাতে চেয়েছেন। ফন্ পাসেনভ্ জাতীয়তার প্রতীক, কাজেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার সঙ্গে চক্রচর সৌন্দর্য্যরসিক বের্ট্রাণ্ড্-এর আত্মিক সহযোগ স্থাপিত হলোনা। এদিকে বের্ট্রাণ্ড্ ছিলো কল্পনাজীবী, সুতরাং বিপ্লবী হের এশ্-এর সংঘাতে তাকে আত্মহত্যা করতে হলো। কিন্তু হের্ এশ্ও জড়জগতের বিশেষ ধার ধারতোনা, অতএব উগ্নো-নামক নির্ব্বিবেকী পরজীবীটি যখন আসরে নামলো, তখন ফন্ পাসেনভ্-এর হলো বুদ্ধিভ্রংশ এবং হের্ এশ্-এর ঘটলো অপঘাত। কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধা ক'রে নিয়েও উগ্নো শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হতে পারলেনা। জীবনযুদ্ধে নির্জ্জিত হয়েও অন্য তিনজন তাদের একনিষ্ঠার জোরে পারিপার্শ্বিক শূন্যতাকে চরম কালে প্রায় আত্মীয়পূর্ণ ক'রে এনেছিলো, কিন্তু উগ্নোর বিজনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেলে। তার রমণীসম্ভোগ বলাৎকারের রূপ ধরলে, বংশবৃদ্ধিকে সে উপসর্গ ব'লে ভাবলে, নাগরিক সম্মান তাকে সাধারণের সন্দেহভাজন ও উপহাস্য ক'রে তুললে। ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার চূড়ান্তে উঠে সে বেঁচে রইলো বটে, কিন্তু তার ঘৃতপুষ্ট দেহের ভিতরে হয়তো শুধু মৃত্যুর প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলোনা। অথচ উগ্নো নেহাৎ মন্দ লোক ছিলোনা। সাধু-সজ্জনদের মতো সেও কায়-মন-বাক্যে চেয়েছিলো স্থায়িত্ব; শুধু সে যেটা বোঝেনি তা হচ্ছে এই যে অসহযোগে স্থায়িত্ব উৎপন্ন হয়না, সার্ব্বভৌম সদ্ভাবেই তার জন্ম। কিন্তু যে-ম্রিয়মাণ জগতে উগ্নো স্থান পেয়েছিলো, সেখানে ঐক্য তো স্বপ্নাতীত বটে, এমনকি হিতকারী বার্তাবিনিময়ের ভাষা সুদ্ধ সে-সমাজ থেকে লোপ পেয়েছে। মূল্যনাশের এই অবশ্যম্ভাবী অবসান।

"দি স্লিপ্ওয়াকার্স্"-এর পরে "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" পড়া এক দিক দিয়ে যেমন অতৃপ্তিকর, অন্য দিকে তেমনি কৌতুকপ্রদ। শের্উড্ এণ্ডার্সন্, অর্নেষ্ট্ হেমিঙওয়ে প্রভৃতির মতো জন্ ডস্ পাসজ্-ও তাঁর অতি আধুনিক উপন্যাস থেকে কেবল দার্শনিকতা নয়, "সাহিত্যিকতা" সুদ্ধ বাদ দিতে প্রস্তুত। এই হাল-আমলের লেখকেরা ঘোরতর জড়বাদী, মন ব'লে কোনো জিনিসে তাঁরা বিশ্বাস করেননা; তাই তাঁদের গল্পের ঝোঁক বিষয়ীকে ছেড়ে বিষয়ের উপর। তাঁদের রচনা অনাত্মরীতির অতিভূমি। এই সমস্ত কাহিনীর কুশীলবেরা সিনেমাছবির মতো কেবল কাজই ক'রে যায়, কখনো এতটুকু ভাবেনা, এবং তাঁদের সাহিত্যাতিরিক্ত শিল্পাদর্শের এইখানেই শেষ নয়। তাঁরা দৈনিকপত্রের হাবভাবের নকল ক'রে আত্মপ্রসাদ পান, ব্যাকরণ ও যতিচিহ্নকে অকাতরে বলি দেন, অর্থসঙ্গতির অশঙ্কায় সদাসর্ব্বদা বেপমান থাকেন। কিন্তু তাহলেও তাঁদের পুস্তকাবলীতে একটা একাগ্র সাধনার, একটা নিষ্কাম সংযমের, একটা আত্মসমাহিত সজীবতার আভাস মেলে, যার পাশে ড্রাইসার্কে তো বাকসর্ব্বস্ব ব'লে মনে হয়ই, এমনকি সিন্ক্লেয়ার্ লুইস্কেও বাহুল্যময় লাগে।

এ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু তাহলেও আমার বিশ্বাস যে এই কুসংস্কারের একটা বিচারসাপেক্ষ ভিত্তি আছে। ড্রাইসার্-লুইস্-জাতীয় প্রাচীনপন্থী মার্কিনী লেখকদের সঙ্গে যাঁরাই ঘনিষ্ঠ, তাঁরাই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে

ওঁদের চরিত্রাবলীর পটভূমির সঙ্গে ওয়েল্সীয় কল্পলোকের সৌসাদৃশ্য কত বিশদ। এই আমেরিকান জগতেও উনিশ শতকের নিঃসংশয় বিজ্ঞান ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরূপে বিরাজমান, এখানেও সকল সাংসারিক সমস্যা শুধু সদিচ্ছার দ্বারা সমাধানসাধ্য, এ-সমাজেও মানুষমাত্রেই প্রচ্ছন্ন উদারনীতির আধার। এ-চিত্র শুধু যে অসত্য, তা নয়, উপরন্তু দুঃসহ অভিজ্ঞতার ধাক্কায় আমরা আজ অন্তত এইটুকু শিখেছি যে এ ধরণের মানসলোকের সংসর্গও বিপজ্জনক। কারণ, জগৎ মূলত মঙ্গলময়, এই রকম শুভবাদের আড়ালে বাস করছিলুম ব'লেই মহাপ্রলয়ের দিনে আমাদের মনে প্রতিবাদের প্রবৃত্তি জাগেনি, মুখে এসেছিলো অসার অতিবাদ। সুতরাং উত্তরসামরিক সাহিত্যেও যখন সেই অসত্যের পুনরুদ্ধার দেখি, তখন বিতৃষ্ণাবোধ তো স্বাভাবিক বটেই, অধিকন্তু সহজেই মনে হয় যে এ-সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি নয়, প্রচারকার্য্য।

প্রথমে দার্শনিক উপন্যাসের পক্ষে যে-ওকালতি করেছি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উপরোক্ত অভিমত তার পরিপন্থী। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই আর বিরোধ থাকবেনা। স্বকীয় তুলাদণ্ডে ভারি কথার বাটখারা দিয়ে জগৎকে ওজন করা অসার্থক ব'লেই দার্শনিক নিরীক্ষার প্রয়োজন, কারণ সার্ব্বজনীন বিচারবুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত মানদণ্ডের সমীকরণই তত্ত্বদর্শনের প্রধান কর্ত্তব্য। এবং নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যসাধনাও যেহেতু একের ভাবনা-বেদনাকে সকলের ভাবনা-বেদনার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তাই অনাত্মরীতির সঙ্গে দার্শনিকের কোনো বিবাদ নেই। প্রচারকের মনোভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেটা সর্ব্ববাদিসম্মত, যার মূলমন্ত্র প্রত্যাখ্যান নয়, পরিগ্রহণ, তার বিজ্ঞাপন অনাবশ্যক, কিন্তু ভেদবুদ্ধি দলপুষ্টি ব্যতিরেকে টিঁকতে পারেনা, সুতরাং প্রচারকার্য্যই তার নিত্যকর্ম্ম। মানুষমাত্রেই অতুল মর্য্যাদার অধিকারী, এবং তাই তার আত্মবলিদানে জগতের মঙ্গল নিশ্চিত, একথা বলা এক, আর মানুষমাত্রেই কুসংস্কারাপন্ন, এবং বিজ্ঞানই তার একমাত্র মুক্তিমার্গ, এ-তথ্য জাহির করা অন্য। এই মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ আছে। যে ঔপন্যাসিক প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ রূপসৃষ্টি শক্ত নয়; তিনি জানেন যে মানবচরিত্র ক্রিষ্টালের মতো, নীতিকারের হস্তাবলেপে তার অন্তরঙ্গ শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলে সে সহজ সৌন্দর্য্যে স্বসমুথ হয়ে ওঠে। অন্য দলের পক্ষে এই রকম নিরীহ সহিষ্ণুতা দুর্লভ, তাঁরা স্থির করেছেন যে জগত্রাণের বীজমন্ত্র শুধু তাঁদেরই আয়ত্তে, কাজেই যে-মানুষ সে-দীক্ষা অগ্রাহ্য করে, তার উচ্ছেদ-কামনায় তাঁরা বাধ্য। ফলে তাঁদের উপন্যাস হিতোপদেশ হিসাবে মহার্ঘ হ'লেও জীবনের চিত্র হিসাবে অতিরঞ্জিত। পূর্ব্বে বলেছি যে সত্যনিষ্ঠা হয়তো ঔপন্যাসিকের অভিষ্ট নয়; কিন্তু সত্যকল্পতা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য্য লক্ষণ। সাহিত্য যতই কল্পনাপ্রবণ হোকনা কেন, তার সঙ্গে কোনো পরিচিত তত্ত্বের সংঘর্ষ ঘটলে, ক্ষতি একা সাহিত্যেরই। এইজন্যেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিকে অবৈকল্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চান; কারণ যে-শিল্প অবিকল, অখণ্ড, তার সম্পূর্ণতা কোনো অভিমতবিশেষের যাথার্থ্যের সঙ্গে বিজড়িত থাকেনা. সে স্বাবলম্বী, কাজেই তার অদৃষ্টে সংঘাতের দুঃখ নেই, সে সকল পক্ষপাতের অতীত।

বলাই বাহুল্য যে এই সকল মতামত আমার নিজস্ব চিন্তার ফল। আমি যে-লেখকসম্প্রদায়ের কথা বলছি, তাঁরা প্রকাশ্যে কোনো আধিদৈবিক আদর্শে বিশ্বাস

করেননা, তাঁরা জীবনকে যেমন দেখেন, ঠিক তেমনি ক'রেই আঁকতে চান; ফোটোগ্রাফের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুনিষ্ঠাই তাদের অভিপ্রেত পদ্ধতি। এবং বোধহয় সেইজন্যেই জন্ ডস্ পাসজ্ আলোচ্য উপন্যাসের বেশ খানিক অংশ পুরাতন দৈনিক-পত্রের পাঠোদ্ধারে ভরেছেন। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" কোনো মানুষের জীবনচরিত নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চৌদ্দ বৎসরই তার মুখ্যপাত্র। এবং আমাদের কালের প্রকৃত স্বরূপ যেহেতু সংবাদপত্রেই সুপরিস্ফুট, তাই যুগচিত্রের প্রত্যেক প্রতীকের বহিঃরেখা তিনি টেনেছেন আষ্টপ্রহরিক খবরের রঙে। এই কালের ট্র্যাজিডি কতকগুলি সঞ্চরণশীল মূর্তির সাহায্যে রূপায়িত হয়েছে। মূর্তিগুলি মার্কিনী জীবনের বিভিন্ন ধারার বিগ্রহ, ধ্বংসোন্মুখ সময়স্রোতের বুদ্বুদ, তারা নানা কারণে নানা স্থানে উদ্ভূত এবং সকলেই য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রলয়পয়োধিতে বিলুপ্ত। তারা এরূপ অন্তঃসারশূন্য ও নৈমিত্তিক, জীবনের এমন সমস্ত অখ্যাত স্তরে তাদের উৎপত্তি, এতই অপ্রতিষ্ঠ তাদের ব্যক্তিত্ব যে তাদের দিনগত পাপক্ষয়ের বিবরণে তত্ত্বদর্শন তো দূরের কথা, কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার সুদ্ধ অবকাশ নেই। কিন্তু আখ্যানবস্তুর এই অকিঞ্চনতা বইখানির সারসংগ্রহে বাধা দিলেও, তাতে ক'রে গ্রন্থকারের জাগতিক নিরীক্ষা ররং উজ্জ্বলতর হয়েছে। কারণ ফটোগ্রাফের পদার্থনির্ভর সত্যপরায়ণতা প্রসিদ্ধ হ'লেও, তার ব্যাপকতা অসীম নয়। অতএব জীবনের অকৃত্রিম আলেখ্য ব'লে যদি কোনো ফোটোগ্রাফের সুনাম থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে ফোটোগ্রাফার জীবনের কোনো একটা দিককে সমগ্রতার পরমোত্তম প্রতিনিধিরূপে বেছে নিয়ে তবেই গ্রাহকযন্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন। এবং এই নির্ব্বাচনের পিছনে জীবনসম্বন্ধে একটা মন্তব্য উহ্য থাকেই থাকে।

কিন্তু এই চিরনিয়ম যদি আলোচ্য লেখকসম্বন্ধে প্রযোজ্য নাও হয়, জন্ ডস্ পাসজ্-এর মনে যদি দার্শনিকতার ছায়ামাত্রও না-থাকে, তবুও মানতে হবে যে নিছক সহজজ্ঞানের সাহায্যে তিনি যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেই একই সত্য হের্মান্ ব্রথ্ অর্জ্জন করেছেন অতিচেতন বুদ্ধির কল্যাণে। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্"-এ যত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাদের আত্মাও সুষুপ্ত, তারাও নিঃসঙ্গতার দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত, তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেহের মিলন হয়তো বা ঘটে, কিন্তু মনের সালোক্য একেবারেই অসিদ্ধ থেকে যায়, তারাও চলে মৃত্যুর অভিযানে, কেননা বিশ্বে ধ্রুব পাদপীঠ পাবার যোগ্য মূল তাদের নেই,—তাদের জীবন একটা এমনি নিরর্থ উদ্যোগে উপদ্রুত যে যুদ্ধের সর্ব্বনাশকেও তারা গন্তব্য ব'লে ধরে নিয়ে শান্তি পায়। তাছাড়া উভয় পুস্তকেই রচনারীতির একটা সাদৃশ্য আছে: দুই লেখকই কোনো প্রাচীন প্রকরণকে মেনে চলতে রাজি নন, এমনকি বিপ্লবী আদর্শকেও তাঁরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননা; গদ্য, পদ্য, সাংবাদিক সংক্ষিপ্ততা সকল পদ্ধতিতেই তাঁদের সমান পক্ষপাত। তবে ব্রথ্ আর্টের তথাকথিত কমঠবৃত্তিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেননা, বিনা প্রয়োজনে গল্পের মধ্যে অনবগুণ্ঠিত তত্ত্বকথার অবতারণা করেন; এবং জন্ ডস্ পাসজ্ শিল্পকে এত ভঙ্গুর ভাবেন যে শিল্পাতিরিক্ত কোনো বস্তুকে কোল দিতে তিনি নারাজ, এমনকি তাঁর মতে ঔপন্যাসিকের পক্ষে ভাবুকতাও হয়তো অমার্জ্জনীয়। বুঝি সেইজন্যেই "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" "দি স্লিপ্ওয়াকার্স্"-এর চেয়ে সুখপাঠ্য, এবং "দি স্লিপ্ওয়াকার্স্" "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্"-এর চেয়ে

গভীরতর। কিন্তু দুখানিই অসাধারণ পুস্তক, তাই আশা করি চিন্তাশীল পাঠক কোনোটিকেই বাদ দেবেননা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Freedom in the Modern World—BY JOHN MACMURRAY, with a Preface by C A Siepmann (Faber and Faber Ltd)

প্রতীচ্যদর্শনক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে জন্ ম্যাক্মারে একজন উদীয়মান লেখক। বিগত ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের Grote অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অক্সফোর্ডের বেলিয়ল্ কলেজে ইঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় এবং অক্সফোর্ডে যে চিরাগত অধ্যাত্মবাদের আবহাওয়া প্রবহমান তাহারই মধ্যে ইঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই পুস্তিকাখানিতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাই।

পুস্তিকাটির আলোচ্যবিষয়—"বর্ত্তমান জগতে স্বাধীনতার স্বরূপ"। ইহার আয়তনের তুলনায় ইহার ভাবগৌরব যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য তত্ত্বগুলি এত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে যে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা গ্রন্থখানি পাঠ না করিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রন্থকারের পরিচয়-প্রদান-সূত্রে যে ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে ঠিক এই কথারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানির যোড়শ অধ্যায় ব্রিটিশ ব্রড্কাষ্টিং কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বেতার শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির একরকম যথাযথ পুনরুল্লেখ। বেতার জগতের শ্রোতৃবর্গ অপেক্ষা বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর নিকট ইহার যে একটা অবশ্যম্ভাবী আবেদন আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া ইহার বহুলপ্রচারের প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের বিচারনৈপুণ্য প্রশংসার্হ।

গ্রন্থকারের উপক্রমণিকা ব্যতীত দুই পর্য্যায়ে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। প্রথম পর্য্যায়ে চারটি বক্তৃতায় "বর্ত্তমান উভয়সঙ্কট" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্য্যায় বারটি বক্তৃতায় পর্য্যবসিত এবং এগুলির আলোচ্যবিষয়—"সত্যের স্বরূপ ও স্বাধীনতা"। প্রথম বক্তৃতায় "সত্যই কি বর্ত্তমান সময়ে এক উভয়সঙ্কট উপস্থিত?"—এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের সকল দুঃখ, সকল ব্যর্থতার মূলীভূত কারণ এই যে আমরা সেই আস্তিক্যবুদ্ধি, সেই আত্মনির্ভরতা ও শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছি যাহা আমাদের সকল কর্ম্মপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। যে কেন্দ্রীভূত আশা ও বিশ্বাসের জৈবপ্রেরণায় আমাদের জীবন চরম কামনার বস্তু হইয়া উঠে, সে বিশ্বাস ও আস্থা আজ অন্তর্হিত। তাই আমাদের জীবন এত দুর্গত, এত মোহাবিষ্ট, এত লক্ষ্যহীন। সেইজন্যই একএক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় বলিয়া উঠি, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' —'কোন্ দেবতার উপাসনা করিব?' জীবনের সেই ধ্রুবতারা আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাই 'পথ কোথায়?' বলিয়া ফিরিতেছে। মনে হয় বুঝি বা মানবজীবনের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আত্মপরীক্ষা করিলেই দেখি যে এটা মুখের কথামাত্র, প্রাণের

সাড়া এতে পাই না। "এই উন্নতিকল্পে আমরা কি ত্যাগস্বীকার করিতে পারি?—কারণ এই ত্যাগস্বীকারই আমাদের বিশ্বাসের মানদণ্ড। সমরনীতিতে আমরা বিশ্বাস না করিতে পারি কিন্তু শান্তিতেই কি আমাদের বিশ্বাস আছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরাই যাক্—ভারতের স্বাধীন হইবার যোগ্যতায় কি আমরা বিশ্বাস করি?—আমার তাহা মনে হয় না। তবে কি আমাদের বিশ্বাস যে ভারতের স্বাধীন হইবার যোগ্যতা নাই?—নিশ্চয়ই তা' আমাদের বিশ্বাস নয়।" মূলকথা, "আমাদের জীবনের সমস্ত আদর্শ আজ প্রাণহীন, এগুলিতে বিশ্বাসও নাই, অবিশ্বাসও নাই। এইখানেই আমাদের উভয়সঙ্কট"। এই উভয়সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাই "আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়, আমাদের চিন্তা ও হৃদয়াবেশের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে"। (পৃঃ ২৪—৫)

এইরূপে হৃদয়াবেশ ও হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির দিক্ হইতে দেখিলে সহজেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য বা বৈষম্য লক্ষিত হয়। এটাও সেই বর্ত্তমান সমস্যারই আর একটা দিক। "বর্ত্তমান যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের অবসানের সময় হইতেই জ্ঞানরাজ্যের পরিধি সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে ভাবপ্রবণতা বা হৃদয়াবেগের দিক্টা পরিণতিলাভ করে নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে চিন্তাশক্তির দিক্ হইতে সভ্যতার উচ্চগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়াছি বটে কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দিক্ হইতে এখনও আমরা আদিম অসভ্য অবস্থায় রহিয়া গিয়াছি। সেজন্য আজ এমন একটি জায়গায় আসিয়া পৌছিয়াছি—যেখানে জ্ঞানের অধিকতর প্রসার ক্রমশঃই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিবে।" (পৃঃ ৪৩)

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে "এই উভয়সঙ্কটের উৎপত্তি আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বিচ্ছেদে নয়, ইহার মূল আমাদের হৃদয়েই নিহিত। মানবজীবনের যাহা একান্ত কাম্য ও উপাস্য তাহা চিন্তা বা ধীশক্তি বা বিজ্ঞান দ্বারা নির্ণীত হয়না—তাহা কেবল হৃদয়বৃত্তির আলোকপাতেই প্রকাশ পায়। "জীবন কোন বিজ্ঞানের কোঠায় পড়ে না, এটা একটা আর্ট।" (পৃঃ ৫১)

পরিশেষে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্যের নিষ্কর্ষ উপসংহারে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"বর্ত্তমান সমস্যার উত্তরে আমার এই বলিবার আছে যে আমরা জীবনের মূলীভূত বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং সেইজন্যই ক্রমশঃ আমাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে ইহা খুব স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি।" কিন্তু "ধর্ম্ম বা নীতি বলিতে যথার্থ বা প্রাণবান্ ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান বুঝি—ধর্ম্মের বা নীতির কতকগুলি বহিরাবরণ ও উপকরণ বা কাল্পনিক প্রতীক নহে। ধর্ম্মের অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরসঙ্গ ও সাহচর্য্য ব্যতীত উহা অনর্থক; এবং নীতি অর্থে বুঝি—মানব জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস, নচেৎ উহা কাল্পনিক মায়াজাল বা বাগাড়ম্বর মাত্র।" (পৃঃ ২০০)

এই বিশ্বাসই মানব জীবনে কর্ম্মপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। "যখন তাহার সন্ধান আর মিলে না তখন বাধ্য হইয়াই মানুষ জীবনের নিষেধাত্মক আর একটি উৎস আবিষ্কার করে, সেটি ভয়।" মানুষ ভয়ের প্রেরণাতেই যখন চলে তখন তার আত্মনির্ভরপ্রসূত, আনন্দাত্মক সহজ সাবলীল গতিচ্ছন্দ অন্তর্হিত হয়। তখন মানুষ স্বভাবতই শক্তির শরণ নেয়—এবং সেই শক্তি রাজদণ্ড বা সমাজদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ" হইয়া উঠে। "মানুষ তখন ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কে আচারতান্ত্রিক হইয়া উঠে।"

(পৃঃ ২০৯)। আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম অনেকটা এই আচারনিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠানতন্ত্রতারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ "দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে খৃষ্টধর্ম্ম বলিতে যা বুঝায় তাহার অনেকটাই যিশুখৃষ্টের বা সেন্ট পালের ধর্ম্মানুশাসনের সহিত সম্পর্কবিরহিত" (পৃঃ ২১০)। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে "সমাজসেবা বলিতে যা বুঝায় তাহার উপর আমার কোন আক্রোশ আছে।" আমি "যাহার নিরসনার্থে উদ্যত তাহা জনসেবা, সমাজসেবা বা রাষ্ট্রসেবার উপলক্ষ্যে মানুষের নীতি বা কর্ত্তব্যজ্ঞানকে স্থানভ্রষ্ট করা।" (পৃঃ ২১০)। যদি জনসেবাকেই মানুষের একমাত্র আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তবে স্বভাবতই মানুষের চেষ্টা ও আশা সমাজগঠনেই আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ হইবে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্রনীতিই একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মোক্ষ হইয়া উঠিবে। "ইহার চরম পরিণতি হইতেছে হয় বলশেভিকবাদ নতুবা ফ্যাসিষ্টবাদ। কারণ বলশেভিজম্ বা ফ্যাসিজম্ অন্ধ প্রতিষ্ঠানতন্ত্রতার আদর্শানুকল্পিত। কিন্তু আমি ইহার একটিরও উপাসক নই। আমার বিশ্বাস মানুষের জীবনের সার্থকতা বা উৎকর্ষ তাহার মানবত্বের পূর্ণবিকাশের উপরই নির্ভর করে এবং এজন্য তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়।" (পৃঃ ২১৩)

আধুনিক জীবনযাত্রার আর একটি অভাবের দিকে গ্রন্থকার পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। "আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান কালে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিকৃষ্টতম বিশেষত্ব তার সৌন্দর্য্যবোধের অভাব ও তৎপ্রতি অনাস্থা।" কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে "সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুসমঞ্জস আচরণই নীতিসম্মত আচরণ।" (পৃ ২১৪)। পরিশেষে এককথায় যদি আমার বক্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে বলি "আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়াই আমাদের নৈতিক জীবনের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে আমাদের আত্মস্থ বা আত্মসমাহিত হইতে হইবে, আমাদের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।" এ ত প্রাচীর পক্ষে নূতন, অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী নয়, তাহারই প্রতীচ্য সংস্করণ মাত্র।

শ্রীসরোজকুমার দাস

The Common Reader—BY VIRGINIA WOOLF (The Hogarth Press)
Criticism—BY DESMOND MACCARTHY (Putnam)

ক্রনেতিয়ের্ ও লেমেয়্ত্রের মধ্যে সমালোচনার জাতিবিচার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব এখন ইতিহাসের ব্যাপার হয়ে পড়েছে, সে যুদ্ধে আনাতোল্ ফ্রঁসের মতো আমিও লেমেয়্ত্রের দলে। বাস্তবিক সমালোচনার মাপকাঠি শেষ পর্য্যন্ত তো ব্যক্তিগত রুচির কথাই। অবশ্য রিচার্ডস্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমনা সমালোচকেরা নৈর্ব্যক্তিক বিচারের চেষ্টা করছেন। তাঁর ছাত্র উইলিয়ম এম্‌সনের Seven Types of Ambiguity বিশ্লেষণ জাতীয় সমালোচনার বই। কিন্তু মোটামুটি ম্যাক্কার্থি তাঁর ভূমিকায় সমালোচনা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা মানতে হয়। তিনি বলেছেন, যে শুধু aesthetic emotion ও technical perfection নিয়ে যাঁরা চঞ্চল, তিনি তাদের সঙ্গে নেই। তাঁর সমস্ত স্বভাব দিয়ে তিনি পড়েছেন, সাড়া দিয়েছেন ও সমালোচনা লিখেছেন।

বলা বাহুল্য, তাঁর ব্যক্তিত্বকে সকলের ভালো না লাগতেও পারে। এই কারণেই শয়ের লেখা আমার পক্ষে কষ্টপাঠ্য। সুখের কথা, Criticism-এর লেখককে ঠিক তেমনি অসহ্য লাগে না। এমন কি, যদিও রেবেকা ওয়েষ্ট্ ম্যাক্-কার্থির নাম গসের সঙ্গেই নিয়েছিলেন তবু পরলোকগত সে জীবন্ত বিশ্বকোষের চেয়ে ম্যাক্কার্থিকে আরো নাগরিক ও সাহিত্যিক বলে মনে হল। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই জাতের বই রিভিউ করা। প্রায় ত্রিশটী প্রবন্ধ—ডান্ ও রিচার্ড্সন্ থেকে এলিয়ট্ ও জয়স্—সমস্তগুলিকে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে পড়ে তার সমালোচনা এক্ষেত্রে অসম্ভব। বিশেষ করেই তাই, কারণ শ্রীমতী উল্ফের The Common Reader নামে যা, এখানি কাজে তাই, অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখা। এর প্রায় সব প্রবন্ধেই সায় দিতে পারা যায়। কথাগুলি লেখা প্রায়ই ভালো। ডানের প্রবন্ধই ধরা যাক্। স্পষ্ট সহজ বুদ্ধির কথা, প্রায় শ্রীমতী উল্ফের Donne After Three Centuries-এরই মতো। কিন্তু কোনো লেখাই ভাবায় না, আর যদিও বা ভাবায় তবু শীঘ্রই সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নেওয়া বা উড়িয়ে দেওয়া যায়। এলিয়ট্ লিখলে হয়ত ডানের অদৃষ্টপূর্ব্ব কোনো গুণ চোখে পড়ত, কিন্তু এ রকম সুখপাঠ্য হত কি? অবশ্য ম্যাক্কার্থির প্রবন্ধগুলিতে সারবান কথা নেই ভাবলে ভুল হবে। তাঁর প্রতি প্রবন্ধেই গ্রহণীয় বক্তব্য আছে। তিনি বহু পড়াশোনা করেছেন ও সাহিত্যাদির বিষয়ে ভেবেছেন। তিনি কোনো highbrow দলে নেই, অথচ তিনি টম্লিন্সনের মতো এলিয়ট বা লরেন্সের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে বাহাদুরি বোধও করেন না। এই প্রবীণ সমালোচকের সৌজন্য ও উদারতা মুরুব্বিবহুল সাময়িক সাহিত্যের মধ্যে তাই খুসি করেছে। জয়সের মহান্ সাধনার বিফলতা বা হাক্স্লির অসম্পূর্ণতার কথা ম্যাক্কার্থি যখন বলেছেন, তখন সে কথা সাধারণ প্রবীণের অসহ্য সঙ্কীর্ণতাজাত হয় নি। প্রসঙ্গত, হাক্স্লির সঙ্গে Point Counter Point-এর Quarles-এর মিল, রিচার্ডসন ও রস্কিনের সঙ্গে প্রুস্ৎ বা কার্লাইলের সঙ্গে লরেন্সের কোথায় সাদৃশ্য আছে, এই রকম কথা আপাতবোধ্য হলেও ম্যাক্কার্থি লিখেছেন বেশ।

শ্রীমতী উল্ফের The Common Reader-এ জনসনের একটী কথা রয়েছে "I rejoice to concur with the common reader, for by the common sense of readers, uncorrupted by literary prejudices, after all the refinements of subtlity and the dogmatism of learning, must be generally decided all claim to poetical honours"

যদিচ এ বাক্যে অনেক তর্কের কথা আছে, সে না হয় থাক্, কিন্তু শ্রীমতী উল্ফ সাধারণ পাঠক তো ননই, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে সায় দিয়ে উৎফুল্ল হবার অধিকারও তাঁর আছে কিনা সন্দেহ। লণ্ডনের টাইপিষ্ট্ মেয়েরা কি পড়েন জানি না, কিন্তু বোধহয় যাঁরা *The Countess of Pembroke's Arcadia, Dorothy Osborne's Letters, Swifts' Journal to Stella, Lord Chesterfield's Letters* পড়ে খুসি হন বা যাঁরা *James Woodforde* বা *Skinner, Dr. Burney's Evening Party, Jack Mytton, Mary Wollstonecraft* প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানবান, তাঁদের পথেঘাটে বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য শ্রীমতী উল্ফের প্রবন্ধগুলি আমরা পড়তে পারি, মোটামুটি মান্তে পারি ও পড়তে ভালো লাগে। তার কারণ

যদি আমাদের common-sense হয় ও তার ফলে যদি শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ উৎফুল্ল হন, তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। অবশ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধ The Strange Elizabethans-এ তিনি সাধারণের মতো বলে, ড্রেক্‌ সিড্‌নি, বেকন্‌ আদির কথা না ভেবে গোদোহনরতা মার্সি হার্ভি ও তার ভাই গাব্রিএল হার্ভির বিষয়েই লিখেছেন। তবু মাঝে মাঝে অতিতীক্ষ্ণতা, সৌকুমার্য্যের ক্রটি ও বিস্তার অন্ধতা থাকলেও শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ প্রকারান্তরে তা ব'লে কিছু অন্যায় বা অশোভন বলেন নি। মারি বা পাউণ্ড্‌ জাতীয় লেখকের সমালোচনার পরে এই স্বচ্ছন্দ চিত্রবহুল রচনাপাঠে স্বস্তি পাওয়া যায়। এবং ম্যাক্‌কার্থির Criticism-ও এই জন্য ভালোই লাগল। অবশ্য শ্রীমতী উল্‌ফের ও ম্যাক্‌কার্থির সমালোচনা ঠিক একজাতের নয়। যথা, প্রুস্তের উপরে ম্যাক্‌কার্থির সারগর্ভ উপাদেয় প্রবন্ধটীতে লেখক এক জায়গায় বলেছেন,

Personally, nothing would induce me to live in Proust's world How I should have missed in him, as a man, contact with the common massive satisfactions of life, and the steadiness of fundamental good nature!

শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ তাঁর ROBINSON CRUSOE-তে প্রসঙ্গত লিখেছেন—"Thus when JUDE THE OBSCURE appears or a new volume of Proust, the newspapers are flooded with protests Major Gibbs of Cheltenham would put a bullet through his head to-morrow if life were as Hardy paints it, Miss Wiggs of Hampstead must protest that though Proust's art is wonderful, the real world, she thanks God, has nothing in common with the distortions of a perverted Frenchman

এবং সেই কারণেই বোধহয় ম্যাকুকার্থির John Donne ও শ্রীমতী উল্‌ফের Donne After Three Centuries দুটীই ভালো এবং স্বভাবতই অনেকটা একরকম হলেও বিভিন্ন। দু একটী কথাই শুধু ধরা যাক্‌। গসের নাম ক'রে ম্যাক্‌কার্থি বলেছেন যে ডানের মন সিড্‌নি বলে জাতের এলিজাবিথানের। এবং শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ বলেছেন যে এলিজাবিথানদের বিশেষত্বগুলির কিছুই ডানের স্বভাবে ছিল না। এলিজাবিথানদের বাক্যবহুলতা, বিস্তৃতির ঝোঁক, নাটকীয় ভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমতী উল্‌ফের কথাগুলি শ্রোতব্য। এবং তাঁর মতে ডান্‌ ঠিক এর বিপরীত। সেইজন্যই ম্যাক্‌কার্থি ডানের Anniversaries লেখার জন্য লজ্জিত বোধ করেন ও শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ লেখেন—

True, the rocket bursts, it scatters in a shower of minute, separate particles—curious speculations, wiredrawn comparisons, obsolete erudition, but winged by the double pressure of mind and heart, of reason and imagination, it soars far and fast into a finer air .

ইত্যাদি। কিম্বা ম্যাক্‌কার্থির ধর্ম্মকবিতা সম্বন্ধে একটীমাত্র কথাই ধরা যাক্‌—ডানের ধর্ম্মকবিতাগুলির মধ্যে যেটা তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব সে হলো the monotony of the experience expressed। শ্রীমতী উল্‌ফের কাছে এই অভিজ্ঞতা full of contraries and agonies এবং সেইজন্য এই কবিতাগুলি are poems of climbing and falling, of incongruous clamours and solemnities ইত্যাদি। এবং সেইজন্যই এই কবিতাগুলির ডাকে আমরা

সাডা দিই—একঘেয়ে ঘুমপাডানিব সুব এতে জাগে না, জাগে, আগ্রহ ও বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা ও কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা।

তাছাড়া এ দুই বইযেব বচানাবীতিতেও প্রভেদ আছে।

শ্রীবিষ্ণু দে

The Revolt of the Masses—BY JOSE ORTEGA Y GASSET, (George Allen & Unwin Ltd)

গ্রন্থকাব তাঁহাব প্রতিপাদ্য নিবন্ধ পঞ্চদশ অধ্যাযে লিপিবদ্ধ কবিযাছেন। এই পুস্তকেব সাবভূত বক্তব্য তাঁহাবই ভাষায যথাসম্ভব উদ্ধৃত কবিতেছি।

'জগতেব শাসক কে?"—এই অধ্যায়েব সূচনাতেই গ্রন্থকাব তাঁহাব ধাবণা স্বল্পাক্ষবে ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ কবিযা বলিযাছেন। তাঁহাব মতে ইউবোপীয সভ্যতা স্বাভাবিক নিযমানুসাবেই জনসংঘেব বিদ্রোহ সংঘটন কবাব। অপব দিকে ইহাবই আব এক ভয়াবহ পবিণতি দেখিতে পাই মানবচিত্তেব আমূল নৈতিক অবনতিতে। (পৃঃ ১৩৭)

আজিকাব দিনে সমস্ত জগদ্ব্যাপী একটা গভীব নৈতিক অবনতিব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জনসাধাবণেব এক অত্যুগ্র বিদ্রোহিতাই তাহাব অন্যতম প্রকাশ এবং নৈতিক অবনতি হইতেই এই জগদ্ব্যাপী অবনতিব উৎপত্তি। ইউবোপেব অবনতিব কাবণ অবশ্য একাধিক। ইহাব একটি মুখ্য কাবণ এই যে ইউবোপেব আত্মকর্তৃত্ব ও অবশিষ্ট জগতেব উপব প্রভুত্ব আজ তাহাব অধিকাবচ্যুত। ইউবোপেব স্বীয প্রভুত্বে অনাস্থা জন্মিয়াছে এবং জগতেব অবশিষ্টাংশেবও কোন ধাবণাই নাই যে ইউবোপ তাহাব শাসক। পবম্পবাগত একাধিপত্য আজ ছত্রভঙ্গাবস্থায পর্য্যবসিত।

সর্ব্বত্রই কি বকম একটা অনাস্থা ও অনিশ্চিযতাব ভাব পবিলক্ষিত হইতেছে। অদূব ভবিষ্যতে কি বা কাহাকে কেন্দ্র কবিয়া মানুষেব সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম চালিত হইবে তাহা কেহ জানে না। এজন্য মানুষেব জীবন যাত্রা 'দিনগত পাপক্ষয়ে'ব মতই হইয়া উঠিযাছে। সমস্ত জগতেই যে একটা অধ্রুব চাঞ্চল্যেব ভাব পবিলক্ষিত হইতেছে তাহা কোনও সৃষ্টিব সূচনা নয, তাহা আত্মপ্রবঞ্চনা বা মাযামুগ্ধতাবই নামান্তর। এ অবস্থায যাহা আমাদেব নিকট অনিবার্য্য বা অপবিবর্ত্তনীয নির্ব্বন্ধেব মত আসে তাহাই আমাদেব একমাত্র স্থিব প্রতিষ্ঠাভূমি ও আশ্রয। পক্ষান্তবে যাহা কিছু আমাব ইচ্ছামত গ্রহণ বা বিসর্জ্জন কবিতে পাবি তাহা আমাদেব জীবনকে মায়াজালে আবৃত কবিযা বাখিবে। পুরুষও যেমন আজ বুঝিযা উঠিতে পাবে না কোন্ পন্থা অবলম্বন কবিয়া বা কোন প্রতিষ্ঠানেব সেবায তাহাব জীবনেব সার্থকতা লাভ কবিবে, নাবীও সেরূপ জানেনা কোন্ শ্রেণীব পুরুষ তাহাব পক্ষে একান্ত কাম্য।

কোন এক বৃহৎ ঐক্যসাধনায় আত্মোৎসর্গ না কবিলে ইউবোপীয় মানব বাঁচিতে পাবে না। যখন এ বিষযে তাহাব কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয তখনই তাহাব

অধঃপতন আরম্ভ হয় ও তাহার আত্মিক শক্তি অন্তর্হিত হয়। আমাদের চক্ষের সম্মুখেই তাহার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। যে সব মানবসমষ্টি আজ জগতের বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত তাহারা প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ক্রম বিবর্ত্তনের প্রভাবে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আরও কোন উন্নততর অবস্থায় উন্নীত করা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। এই জাতিগুলি ইউরোপের পক্ষে কেবল অতীতের দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়া ইহার ক্রমবিবর্ত্তনের গতিরোধ করিয়াছে। মনে হইতেছে যেন জাতিসংঘের এই সংহত অবস্থা বিশ্বমানবের শ্বাসরোধ করিয়াছে। তাই আজ মানব এই অচলায়তনের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিতে কহিতেছে। ইহাতেই তার মুক্তি, ইহাতেই তাহার জীবন। পূর্ব্বে যাহা মুক্ত আকাশের তলে নিত্য বিহার ছিল আজ তাহা নিতান্তই প্রাদেশিক, অবরুদ্ধ আকাশেরই প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সকলেই জীবনের এক নূতন প্রেরণা আবিষ্কারে সচেষ্ট। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে এখনও তাহ'ই হইতেছে—অর্থাৎ যে-বিষপ্রয়োগে এই অনাসৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহাই পূর্ণমাত্রায় সেবন করিয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে অনেকে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছ। ইহাই আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ। ইহাই বিনাশের সুনিশ্চিত পথ। দীপে নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ বহুক্ষণব্যাপী আলোকের উল্লাস হয়, মরণোন্মুখ প্রাণীর শেষ প্রশ্বাস যেরূপ গভীর হয়, ইহাও তদনুরূপ। এই যে বর্ত্তমানকালে সমরনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে জাত্যভিমানের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ হইতেছে, তাহা ইহারই অন্তিম-প্রয়াণ সূচিত করে।

এই সমস্ত জাত্যভিমান বা জাতীয়তাবাদ নির্দ্দেশশূন্য সুড়ঙ্গের মত। যে শক্তির প্রভাবে মানুবসমষ্টি জাতিতে সংহত হয়, জাত্যভিমান সেই শক্তিরই প্রতিকূলাচরণ করে। সেই মৌলিক শক্তি সংযোজনপর, জাত্যভিমানমূলক শক্তি বর্জ্জনপর। জাতি-গঠনের এক অবস্থায় জাতীয়তাব্যঞ্জক শক্তির একটা মূল্য আছে এবং তাহা উচ্চ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ইউরোপে এখন সমস্তই সুগঠিত বা অতিমাত্রায় সুসংবদ্ধ। সেজন্য জাত্যভিমানের প্রয়োজন আর নাই। ইহা এখন ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে একটি বায়ু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া সার্থকতালাভ না করায় ইহা শুধু প্রবঞ্চনা হইয়া উঠিয়াছে। আদিম অসভ্য অবস্থার সহিত ইহার যে মূলগত সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় জাতীয়তাবাদ ক্রমাভিব্যক্তিশক্তির বিরোধী।

গ্রন্থকারের নিবন্ধের সহিত আমাদের ভাবগত ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক পুস্তকখানি গভীর ও মৌলিকচিন্তাশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শ্রীসরোজকুমার দাস

If the Blind Lead—(An Essay for the Post-Democratic Age), A Realist Surveys Modern Culture, (Benn)

The Coming Struggle for Power—JOHN STRACHEY, (Gollancz)

বর্ত্তমান সভ্যতাব এখন সঙ্কটময় অবস্থা। তাকে বাঁচাতে হলে সমাজেব আমূল পবিবর্ত্তনেব প্রযোজন। কিন্তু পবিবর্ত্তনেব পব সভ্যতা কি আকাব নেবে তা নির্ভব কবছে সমাজ যে ভাবে পবিবর্ত্তিত হবে তাব ওপব। একদল বলছেন, শিক্ষাব দ্বাবা সমাজেব স্তবকে উন্নত কবতে হবে, অন্যদল বলছেন, স্তব-বিভাগেব জন্যই সর্ব্বনাশ হযেছে, অতএব বিপ্লবেব প্রযোজন। প্রথম দলেব একজন প্রতিনিধি পিঙ্ক্—যাঁব অন্য একটি লম্বা প্রবন্ধ, A Realist Looks at Democracy, কিছুদিন পূর্ব্বে সুধীসমাজেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিল। দ্বিতীব দলেব প্রতিনিধি, জন্ ষ্ট্রেচী যাঁব মতামত শ্রমিকদলেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গডে উঠেছে। দুজনই সভ্যতাব হিতকামী, দুজনই সাধাবণতন্ত্রেব দোষ সম্বন্ধে সচেতন। এ ছাডা তাঁদের মতে অন্য কোন মিল নেই। সভ্যতাব দুর্দ্দিনে দুই শ্রেণীব এই দুইজন সত্যসন্ধিৎসু লেখকেব বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

পিঙ্ক্ বলেন—সভ্যতা কালাতীত নয, কাল-সাপেক্ষ, বর্ত্তমান যুগেব চিহ্ন হল বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য; অতএব বর্ত্তমান সমাজেব যে সব আচাব-ব্যবহাব ও শিক্ষা-দীক্ষা বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসাবেব প্রতিকূল সেগুলিকে বর্জ্জন কবতে হবে। কিন্তু বর্জ্জন কবা শিক্ষিতব্যক্তিব পক্ষেও শক্ত, কাবণ বিদ্যা-বুদ্ধিব ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বাধাবিপত্তি সৃজন কবে। বিশেষতঃ, গ্রীস, বোম, ও মধ্যযুগেব অন্ধসংস্কাব এবং পুবাতন অনুষ্ঠান আমাদেবকে বর্ত্তমানেব উপযোগী সভ্যতা সৃষ্টি কবতে বাধা দেয। এবং সেজন্য ইতিহাসশিক্ষাই দাযী। ইতিহাস হয় বিজ্ঞান, না হয কল্পনা-বিলাস। ইতিহাস বিজ্ঞান হতেই পাবে না, অতএব গলস্ওযার্দ্দিব 'ফবসাইট সাগা' না পডে ভিক্টোবীয়ান যুগেব মোটা মোটা ইতিহাস পডা নিবর্থক। ইতিহাস আমাদেব এমন কোন্ মূল্য নির্দ্ধাবণ ক'বে দিতে পাবে যাব দ্বাবা আমবা ভবিষ্যতেব পাথেয সংগ্রহ কবতে পাবি? ঐতিহাসিকদেব মধ্যেই মতেব কোন ঐক্য নেই, অতএব তাঁদেব কোন মতামতই ভবিষ্যৎ সমাজেব উপকাবে আসতে পাবে না।

ইতিহাসেব মধ্যে যে মূলতথ্য সমাজেব কার্য্য-নিযামক বিধি বেঁধে দিতে পাবে, সেটি ঐতিহাসিকেব সংস্কাব নয, সেটি হল যুগ-ধর্ম্ম। যুগ-ধর্ম্ম কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষাব বিষয-বস্তু নয। বিষয-বস্তুটি ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়েব আর্ট ও সাহিত্যেব শিক্ষাপদ্ধতিতে ঐতিহাসিক মনোভাবই প্রকৃত বস-চর্চ্চাব অন্তবায হযেছে। বিজ্ঞান শিক্ষাব বেলাও তাই—বিশ্ববিদ্যালয়েব বিজ্ঞান সামাজিক হিতসাধন থেকে বিচ্যুত। সেখানে বিজ্ঞানেব জন্যই বিজ্ঞান আলোচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়েব বাইবে স্বাধীনতা ও ভদ্রতা লোপ পাচ্ছে—ফ্যাসিজ্ম্ ও কম্যুনিজমেব পীডনে। তাই পিঙ্ক্ সাহেব বলছেন—শিক্ষাব উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নতুনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, বিদ্যালয়েব পাঠ্য বিষযকে ঢেলে সাজতে হবে। তিনি চান প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একই সঙ্গে জীবতত্ত্ব, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব পডুন, কাবণ এই বিদ্যাগুলিই যুগ-ধর্ম্মেব সঙ্গে যোগ-সাধন কবতে সমর্থ। এক কথায়, প্রত্যেক দেশেব বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশেব এবং এই কালেব উপযুক্ত সমাজ সৃষ্টি কবাব সুযোগ প্রস্তুত করুক। শিক্ষাব বিষয়গুলিকে

যুগধর্ম্মের উপযুক্ত করে সাজাবার পর বিসার্চ্চের কথা ওঠে। এখনকার যে বিসার্চ্চ হচ্ছে সে সব উদ্দেশ্যহীন ও এলোমেলো। তাদেরকে সামাজিক কল্যাণের দ্বারা গ্রথিত করতে হলে একটি দেশ-জোড়া শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করা চাই। তার পর আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা-সমিতির প্রয়োজন। পিঙ্কের মতে, শিক্ষার দ্বারা সভ্যতাকে প্ল্যানের মধ্যে আনিতে হবে। অবশ্য প্ল্যান তৈরী করবেন উচ্চশিক্ষিতেরা, যাঁদের সংখ্যা অল্প, কারণ যে-সে লোক শিক্ষিত হতেই পারেনা, সাধারণ-তন্ত্রবাদী জন-সাধারণ যাই বলুক না কেন। সভ্যতা-উদ্ধারের ভার রাম-শ্যামের হস্তে ন্যস্ত করে ওয়েলসের কোন বংশধরই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না—শ্রেণীগত আভিজাত্যে এবং উচ্চশিক্ষার অভিমানে আঘাত লাগে।

এ সব কথা আমাদের নিতান্তই মনোগত। জাতি-ভেদ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সঙ্কুল, সাধারণ-তন্ত্রে অনভ্যস্ত দেশে পিঙ্কের মন্তব্য সোজাসুজি মরমে পৌছবে। তাঁর লেখা আবার বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় দীপ্ত। কিন্তু গম্ভীরভাবে পিঙ্কের মন্তব্য আলোচনা করলে মনে হয় (সে আলোচনায় ষ্ট্রেচীর বইখানি খুব সাহায্য করবে) যে কুলীনের দ্বারা সভ্যতার কুল ও শীল রাখা বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব। তাঁদের দ্বারা সভ্যতার পঙ্কোদ্ধারও হবে না, নতুন সভ্যতার মৃত্তিকা-খননও হবে না। তাঁদের বংশ, বুদ্ধি ও শিক্ষার গৌরব সমাজের একটি শক্তিশালী শ্রেণীর আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। স্ত্রৈণ স্বামী যেমন নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করবার জন্য উচ্চৈস্বরে নিজের পৌরুষ প্রকাশ করেন, তেমনিভাবে এই কুলীন-সম্প্রদায় তাঁদের শ্রেণীগত কুসংস্কার ও ভয়-ভাবনাগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্যই উচ্চশিক্ষা, বুদ্ধি ও সুপ্রজননের জয়গান করেন। যাঁরা পঙ্কিল করেন কিম্বা পঙ্কজের সামিল তাঁদের হাতে পঙ্কোদ্ধারের ভার দেওয়া মূর্খতা। আসল কথা এই—যে সামাজিক কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের আশ্রয়েই শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠিত হয়েছেন। সেই জন্য মুখে হা হুতাশ করাই তাঁদের শোভা পায়, সভ্যতা রক্ষা করা, নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করা, সমাজ সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যার নিরাকরণ করা তাঁদের সাধ্যাতীত। অন্তত পশ্চিম য়ুরোপে ও আমেরিকায়। সে দেশে তাঁদের অপারগতা যুগধর্ম্মেরই চিহ্ন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক নিয়তির, অনিচ্ছার নয়। এ দেশে হয়ত তাঁদের কাজ এখনও বাকী রয়েছে। ষ্ট্রেচী এই কথা বলছেন, ইতিহাসের ধর্ম্ম ও রীতির নজীরে। পিঙ্ক ইতিহাস মানেন না, সেই জন্য বিশ্ব-নাট্যের কোন ভূমিকায় কুলীন সম্প্রদায় অভিনয় করছেন কিম্বা ভারতবর্ষের মতন দেশে করতে পারেন তিনি বুঝতেই পারেন নি। অথচ পিঙ্ক সাহেব যুগ-ধর্ম্ম মানেন! যুগধর্ম্মের একটা পারম্পর্য্য আছে, তার কারণ আবিষ্কার করাই ইতিহাসের প্রধান কাজ। সেই কারণের ফলাফল ও অর্থ নিরূপণ করাই প্রত্যেক সমাজ-তাত্ত্বিকের কাজ। যে কাজ পিঙ্ক করতে পারেননি সে কাজ ষ্ট্রেচী সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন।

যুগধর্ম্ম কথাটি ধরতাই বুলি হয়ে উঠেছে। তার প্রকৃত তাৎপর্য্য বোঝবার জন্য ষ্ট্রেচীর বইখানি পড়া একান্ত কর্ত্তব্য। এমন বই এক যুগে একখানা লেখা হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার মূলধারা ও তথ্যটি এই বইখানিতে যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, লেখকের জানিত ইংরেজীতে লেখা আধুনিক অন্য কোন বইতে অমনভাবে হয়নি। ষ্ট্রেচীর মতে এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল, উপনিবেশে ধনতন্ত্রের বিস্তার, এবং বিস্তারের কারণ, অ-নিয়ন্ত্রিত বাজারের সন্ধান। দেশের ধনী-সম্প্রদায় স্বদেশী বাজারের অবস্থা দেখে শুনে উপলব্ধি

করেছেন যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মুনাফা কমবে বই বাড়বে না। সেইজন্য তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করতে মনস্থ করেছেন। এক পন্থা হল, বৃহৎ সমবায়ের রচিত একচেটিয়া-ব্যবসার দ্বারা উৎপাদনের মাত্রা কমান, অন্য পন্থা হল বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও পরিদর্শন-কার্য্যের অযথা অপব্যয়কে লঘু করা। মামুলী অর্থশাস্ত্রের monopoly, crisis ও planned economyর মতগুলি অনুশীলন ক'রে ষ্ট্রেচী দেখাচ্ছেন যে তার মধ্যে সার-পদার্থ কিছুই নেই, আছে শুধু ধনতন্ত্রকে যা করে হোক রক্ষা করবার নিষ্ফল প্রয়াস, আছে শুধু ধনতন্ত্রে পুষ্ট অধ্যাপকদের ধনতন্ত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ষ্ট্রেচীর মতে কেন্‌স্‌ ও শ্লেটার প্রবর্ত্তিত planned economy এই অধোগামী ধন-তন্ত্রকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না। ইতিহাস, অর্থাৎ যুগ-পরম্পরার রীতি অনুসারেই উপনিবেশের মধ্য দিয়ে ধন-তন্ত্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বুদ্ধিজীবীর কর্ত্তব্য হল লেবার-পার্টির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের হাতে দেওয়া, সেই সঙ্গে উপনিবেশ-গুলিকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে মুক্তি দেওয়া। ষ্ট্রেচী যুগধর্ম্মের প্রকৃতি ও ইতিহাসের রীতিনীতি বুঝে শ্রমিকতন্ত্রে বিশ্বাসী, এবং পিঙ্ক্‌ সাহেব ইতিহাসের মর্ম্ম না গ্রহণ করে, যুগ-ধর্ম্ম অনুসারে বুদ্ধিজীবীর দ্বারা সভ্যতা-সৃষ্টির প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

পরিচয়ের পাঠকবর্গকে ষ্ট্রেচীর অন্তত ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য নামের তিনটি অধ্যায় পড়তে অনুরোধ করছি। ধর্ম্ম কেন এখন য়ূরোপ থেকে লোপ পেয়েছে, বিজ্ঞান কেন সেখানে আর অগ্রসর হতে না পেরে মিথ্যাদর্শনের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়েছে, বর্ত্তমান সাহিত্যে কেন এমন ভীষণ নৈরাশ্যের ছাপ পড়েছে জানবার জন্য বইখানি পড়া আবশ্যক। ষ্ট্রেচীর মতে কারণ হল এই যে সমাজের বর্ত্তমান গঠনে সব মূল্যের মাপকাঠি হয়েছে টাকা—তাই হতে বাধ্য, যতদিন সমাজ এমন শ্রেণীর থাকবে যাঁদের সকল কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফার হার বৃদ্ধি করা। যেদিন মুনাফার বদলে কল্যাণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে সেদিন ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সুদিন আসবে। যতদিন শ্রেণীবিভাগ থাকবে ততদিন কল্যাণ-চিন্তাও অসম্ভব, ততদিন ধর্ম্ম হবে সামাজিক ক্ষতের প্রলেপ মাত্র, বিজ্ঞান হবে যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ, ও সাহিত্য হবে নিরর্থক বুদ্ধিবিলাস। ষ্ট্রেচীর বই মুখ্যত ইংরেজের জন্য লেখা হলেও, তার মূল কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ভারতবাসীর লাভ বই ক্ষতি হবে না। এ ধরণের নির্ভীক বই এ দেশে লেখা সম্ভব নয়—এইটাই সব চেয়ে বড় দুঃখ। বাংলা দেশের প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর বইটা পড়া উচিত বললে যথেষ্ট বলা হলো না। তাঁরা যদি ভাল করে এই বইটা পড়েন তা হলেই বুঝব যে ভবিষ্যৎ সমাজ রচনা করবার জন্য তাঁরা খানিকটা প্রস্তুত হয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিষয়ক এত উৎকৃষ্ট বই সচরাচর চোখে পড়ে না।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।